জাতীয় চরিতাভিধান

প্রথম খণ্ড
(অ - ও)

সম্পাদক
নিশীথ রঞ্জন রায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

জাতীয়
চরিতাভিধান

জাতীয় চরিতাভিধান

প্রথম খণ্ড

(অ—ও)

সম্পাদক
নিশীথ রঞ্জন রায়
অধিকর্তা
ইন্‌স্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

JATIYA CHARITABHIDHAN—I
[Translation of Dictionary of National Biography]
Edited by N. R. Ray
Director, Institute of Historical Studies
Calcutta-700 017

প্রকাশনকাল : জুন, ১৯৮৯

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
দীপ্তি প্রিন্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

মূল্য : ষাট টাকা

Published by Sri Shibnath Chattopadhyay, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of production of Books and Literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education). New Delhi.

আধুনিক ভারতবর্ষের যাঁরা স্রষ্টা সেই সব
মহাপ্রাণদের উদ্দেশে বর্তমান প্রজন্মের
শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপ
নিবেদিত।

সূচীপত্র

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

Dictionary of National Biography গ্রন্থটি 1972 সালে প্রয়াত ডঃ শিবপদ সেনের সম্পাদনায় ইনস্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ থেকে প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ-এর সহযোগিতায় প্রকাশ করা সম্ভব হল। আমাদের উদ্দেশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব স্মরণীয় নরনারী, ভারতীয় কিংবা ভারতে বসবাসকারী বিদেশী, জাতিগঠনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের জীবনী বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া।

মূল ইংরেজি গ্রন্থে কিছু কিছু তথ্য বাদ পড়েছিল। প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থের জন্য সেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই বাংলা অনুবাদে সেই সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া, আলোচিত চরিত-সংখ্যা ইংরেজি গ্রন্থের চেয়ে বাংলা অনুবাদ গ্রন্থে কিছু বেশি আছে।

স্বাধীনতালাভ অর্থাৎ 1947 সাল পর্যন্ত ঘটনাবলী মূল ইংরেজি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়। অনুবাদেও সেই ধারা রাখা হয়েছে। ফলে 1947 সালের পর কার্যকলাপ এবং ক্ষেত্রবিশেষে যাঁরা এখন জীবিত নেই তাঁদের 1947 সালের পরবর্তী জীবন-কাহিনী অথবা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যু তারিখও এই অনুবাদে দেওয়া সম্ভব হয় নি। পরবর্তী কোন সংযোজন খণ্ডে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতোত্তর কালের জীবনকথা পরিবেশন করতে আমরা প্রয়াসী হব। এই গ্রন্থের অনুবাদ সংশোধন এবং পরিমার্জন কাজে সহায়তা করেছেন ডাঃ নরেন ভট্টাচার্য্য, শ্রী শোভন বসু, ডাঃ বাণী কুমার ষড়ঙ্গী, শ্রীমতী কমলা সরকার ও শ্রীমতী গীতা ঘোষ। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিশীথ রঞ্জন রায়
অধিকর্তা
ইনস্টিটিউট অফ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ

কলকাতা
বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৯৬

ভূমিকা

বিদেশে বহুদিন পূর্বেই জাতীয় চরিত অভিধান রচিত হয়েছে। সেই ধারা অনুসরণ করে ভারতবর্ষে এই প্রথম জাতীয় চরিত অভিধান রচিত হল বলা যায়। আমাদের দেশে অবশ্য ইংরেজি বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েকটি জীবন-কথা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সে সবের লক্ষ্য খুবই সীমিত। সাধারণত কোন একটি সম্প্রদায় বা অঞ্চল বিশেষের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে রচিত হয়েছে 'Eminent Mussalmans', 'Eminent Parsees', 'Eminent South Indians' প্রভৃতি গ্রন্থ। কিম্বা 'Men and Supermen of Hindustan', 'ভারতবর্ষ কি বিভূতিয়ান' বা 'অর্বাচীন চরিত্র কোষ' জাতীয় গ্রন্থে মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতবাসীর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি রাজ্য সরকারের স্বাধীনতা সংগ্রামীর 'হু'জ হু' জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এগুলি মূলত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। প্রত্যেক রাজ্যের হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী—যাঁরা দেশের সামগ্রিক উন্নতিবিধানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন নি তাঁদের কথা লেখা হয়েছে। সম্প্রতি ভারত সরকার একটি গ্রন্থ 'Dictionary of Martyrs' প্রকাশ করেছেন, তাতে কেবল বিপ্লবীদের কথা বলা আছে, অনেকটা 'Who's Who in the Freedom Movement' গ্রন্থের ধাঁচে লেখা। এইসব গ্রন্থে কেবল কোন অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের কথাই লেখা হয়েছে। মাত্র অল্প কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতার নাম এতে স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এর কোনটিকেই যথার্থভাবেই ভারতের জাতীয় চরিত অভিধান বলা চলে না।

এই সব কারণে প্রকৃত অর্থে একটি জাতীয় চরিত অভিধান রচনার প্রয়োজন স্বভাবতই অনুভূত হয়। বর্তমান গ্রন্থটি এই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত ; আমাদের লক্ষ্য আঠার ও উনিশ শতকের নানা বিষয়ে কৃতী ভারতীয়দের জীবনকথা সংকলন করা।

1972 সালে—অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পঁচিশ বর্ষ পূর্তি বৎসরে এই অভিধান যেসব ভারতীয় এবং ভারত-প্রেমী বিদেশী যাঁরা এদেশকে স্বদেশ মনে করতেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্যাগ, সেবা, উদ্যম ও শ্রমে বর্তমান ভারত গঠন করেছেন তাঁদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অভিধানটি শ্রদ্ধা-অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদিত হল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের প্রজন্মকে পূর্বসূরীদের কাছে তাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

চার খণ্ডে এই চরিত অভিধান সম্পূর্ণ হবে। চার খণ্ডের কালসীমা 1800 সাল থেকে 1947 সাল পর্যন্ত। ইতিহাস একটি বহমান ধারা, তা খণ্ডরূপে দেখা চলে না। তবুও এভাবে কালসীমা ধার্যের অন্যতম কারণ আঠার ও উনিশ—এই দুই শতকের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। উনিশ শতকের প্রথম দিকে নূতন নূতন ভাবনা-চিন্তা এবং নানা শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জাতীয় জীবনে যে জাগরণ দেখা দেয় তারই সফল পরিণতি হল 1947 সালে বিদেশী শাসনের অবসানে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালও আবার ভারতের ইতিহাসে একটি স্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করে। এই সালে কেবল যে দেশ ভাগ হয়েছিল তা নয়, আরও অনেকে নূতন চিন্তা এবং কার্যকলাপ যা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সমাজে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে তারও সূত্রপাত হয়েছিল।

জাতীয় চরিত অভিধানের চারটি খণ্ডটিকেই যেন কখনও একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলে মনে করা না হয়। এই অভিধান রচনার কাজ অব্যাহত থাকবে। 1947 সালের পরবর্তী পঁচিশ বছরের কথা কয়েকটি সংযোজন খণ্ডে লেখা হবে। তারপরে কয়েক বছরের ব্যবধানে পরবর্তী সংযোজন খণ্ডগুলি প্রকাশিত হবে।

এই অভিধানে উনিশ শতকের শুরু থেকে 1947 সালে স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত ভারতের রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, ব্যবসা, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের জীবনী সংকলিত হয়েছে। ভারত-বিখ্যাত অল্প কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মানুষের সঙ্গে সঙ্গে

আঞ্চলিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট নরনারীর কথা অর্থাৎ জেলাস্তর থেকে শুরু করে রাজ্যস্তর এবং জাতীয় স্তর পর্যন্ত সকল শ্রেণীর প্রতিনিধির কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। সীমিত সামর্থ্য ও পরিসরের কথা চিন্তা করে নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য বাধ্য হয়েই একটি নীতি গ্রহণ করতে হয়। নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব ছাড়াও ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য যাঁরা চেষ্টা করেছেন তাঁদের নামই মূলতঃ নির্বাচন করা হয়। এই কারণে সাধারণভাবে সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা, ক্রীড়াবিদ্ ইত্যাদি কয়েকটি শ্রেণীর মানুষের নাম যুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

1947 সাল পর্যন্ত কালসীমা নির্ধারণের ফলে স্বভাবতই অবিভক্ত ভারতবর্ষের কথা আমাদের আলোচ্য বিষয়। এ কারণে বর্তমান পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের অনেক অধিবাসী কিংবা দেশভাগের সময় যারা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তির জীবনকথা এই অভিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ধরনের কিছু নাম নির্বাচন অনেকের মনঃপূত না হলেও সে সম্বন্ধে কোন বিতর্ক উঠতে পারে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। 1947 সালে দেশভাগের পর পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মানুষ অ-ভারতীয় বলে পরিচিত হলেও দেশভাগের পূর্বে তাঁরা কিন্তু আমাদের মতই ভারতীয় ছিলেন। অবশ্য তাঁদের কারুর কারুর বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি এবং কার্যকলাপ এদেশের অনেকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু সেজন্য জিন্না, ইকবাল, নাজিমুদ্দিন কিংবা সোহরাবর্দি'র মত ব্যক্তির নাম 1947 সালের পূর্ববর্তী সময়ের জাতীয় চরিত অভিধান থেকে বাদ দেওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। 1947 সাল থেকে 1972 সাল পর্যন্ত বিধৃত সংযোজন খণ্ডে অবশ্য কেবলমাত্র ভারতের অধিবাসীদের কথা বলা হবে।

British Dictionary of National Biography কিংবা বিদেশের ঐ জাতীয় গ্রন্থের অনুসরণে রচিত হলেও সে গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের এই অভিধানের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। যাঁদের জীবনকথা বলা দরকার তাঁদের মধ্যে যদি কেউ জীবিত থাকেন, তাহলে সেই সব ব্যক্তির নামও আমরা গ্রহণ করেছি। চলতি রীতি থেকে এ-ধরনের ব্যতিক্রম অনেকে হয়তো সমালোচনা করবেন। আমাদের বক্তব্য কিন্তু পরিষ্কার। আমাদের উদ্দেশ্য হল যে সকল মানুষের শ্রম ও আত্মত্যাগের ফলে বর্তমান ভারতবর্ষ গঠিত হয়েছে তাঁদের উদ্দেশ্যে এই অভিধান শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করা। এই ধরনের যে সব মানুষ আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন এবং যাঁদের ত্যাগ ও কৃতিত্ব প্রয়াত দেশ-গঠনকারীদের চেয়ে কোনমতেই ন্যূন নয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তুলনায় বেশি উজ্জ্বল, শুধুমাত্র জীবিত থাকার কারণে তাদের নাম বাদ দিতে হবে, এ যুক্তি কোন মতেই সমীচীন বোধ হয় না। এই বৈষম্যমূলক নীতির ফলে দেশ-গঠনের ইতিহাস আংশিক বা বিকৃত হওয়াই সম্ভব। যদি কোন ব্যক্তিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয় তবে তাঁর জীবিতকালের মধ্যে না করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করতে হবে? অবশ্য এইসব মানুষের পরবর্তী জীবনের কার্যাবলী যদি ভিন্ন ধরনের বলে প্রতীয়মান হয়, সেকথা এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে কিংবা সংযোজন খণ্ডে উল্লেখ করা হবে।

1947 সাল থেকে 1972 সাল পর্যন্ত বিধৃত প্রস্তাবিত সংযোজন খণ্ডে আজও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের কথা দেওয়া হবে না। অনতিকাল পূর্বে যেসব ঘটনা ঘটেছে, মাত্র অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে তার ইতিহাসসম্মত মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। সেজন্য সমসাময়িককালের মানুষের ক্রিয়াকলাপের বিচার সঙ্গত বোধ হয় না। অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় বিতর্কের সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে জীবিত ব্যক্তির কথা বাদ দেওয়ার নীতিই গ্রহণ করা ভাল।

এই চরিত অভিধানের চারটি খণ্ডে প্রায় 1400 ব্যক্তির নাম গ্রহণ করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে নামগুলি নির্বাচন করা হয়। প্রথমে প্রতি রাজ্যের এ্যাডভাইসারি কমিটি, রিসার্চ সুপারভাইসর এবং রিসার্চ ফেলোরা নিজ নিজ রাজ্যের কৃতী ব্যক্তিদের নাম স্থির করেন। রাজনীতিবিদ্, ধর্মসংস্কারক, সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ্, বিজ্ঞানী, প্রশাসক, আইনজীবী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে এই নামগুলি ভাগ করা হয়। পরে সেগুলি নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়। প্রথমে 1964 সালে এইরূপে একটি তালিকা তৈরি হয়, 1969 সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই তালিকা ভালভাবে পরীক্ষা করে সংশোধন করা হয়। সেই তালিকা বিভিন্ন বৃত্তিতে কৃতী ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হয়। তাঁদের মতামত অনুসারে তালিকাটি কয়েকবার সংশোধন করা হয়। ফলে, প্রথম তৈরি তালিকায় কয়েকটি নাম বাদ পড়ে, নতুন কয়েকটি নাম আবার যোগও করা হয়। তালিকাটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশ বা অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নাম থাকে। এই চূড়ান্ত নামের

তালিকাটি যে সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে অবশ্য সংশয় আছে। এইমাত্র বলা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পরের মতামতে এত অমিল ঘটে যে সর্বজনস্বীকৃত একটি নামতালিকা তৈরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাধ্যমত সকল যোগ্য ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও যদি বিশেষ কোন নাম বাদ পড়ার জন্য কেউ মনে আঘাত পেয়ে থাকেন আমরা নিরুপায়। বোধ করি এইরকম ক্ষেত্রে সকলকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

কাজের সুবিধার জন্য প্রথমে রাজ্যভিত্তিক নামতালিকা তৈরি করা হলেও শেষে সমগ্র দেশের ভিত্তিতে সেগুলি একসঙ্গে মিলিয়ে একটি পূর্ণতালিকা তৈরি করা হয়। কোন রাজ্য, অঞ্চল, জাতি বা ধর্ম নয়, কেবলমাত্র বর্ণানুক্রমে নামগুলিকে সাজানো হয়েছে। উল্লিখিত ব্যক্তির একটিমাত্রই পরিচয় তিনি ভারতীয়— নিছক কোন অঞ্চলের অধিবাসী যেমন বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, কিংবা কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের, যেমন হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ কিংবা হরিজন—মানুষ নন। আশা করা যায় এই রকম সাজানো পদ্ধতি দেশবাসীর মনে জাতীয় সংহতি বা ঐক্যবোধ সৃষ্টি করবে, বিশেষ করে বর্তমানে দেশজুড়ে যে বিভেদ বা অনৈক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তার দূর করে বর্তমান প্রজন্মের মনে ভারতীয়-বোধটি উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে বিশেষ সহায়ক হবে।

সাধারণত পদবী অনুসারে বর্ণানুক্রমে নামগুলি সাজানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হল বানান বৈষম্য, একই ভারতীয় পদবী ইংরেজিতে নানাভাবে লেখা হয়, যেমন—Datta, Dutt বা Dutta ; Majumdar বা Mazumdar ; Bose, Bosu বা Basu ; Ghose বা Ghosh ; Mitra বা Mitter ; Roy বা Ray ; Barua বা Borooah ; Chatterjee বা Chattopadhyaya ; Banerjee বা Bandopadhyay ; Mukherjee বা Mukopadhyay ইত্যাদি। ইংরেজি নানান হিসাবে বর্ণানুক্রমে সাজানো হলে সাধারণ পাঠকদের যে বিড়ম্বনা বা অসুবিধা ভোগ করতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যে পাঠকের অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বিভিন্ন বানান বজায় রেখেও পদবীগুলিকে একটি শ্রেণীর মধ্যে সাজিয়েছি। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

Datta-র অধীনে Datta, Dutt এবং Dutta,
Majumdar-এর অধীনে Majumdar এবং Mazumdar,
Bose-এর অধীনে Bose, Bosu এবং Basu,
Ghosh-এর অধীনে Ghosh এবং Ghose,
Mitra-র অধীনে Mitra এবং Mitter,
Roy-এর অধীনে Roy এবং Ray,
Barua-র অধীনে Barua এবং Borooah,
Banerjee-র অধীনে Banerjee, Bonnerji এবং Bandopadhyay,
Chatterjee-র অধীনে Chatterjee এবং Chattopadhyay,
Mukherjee-র অধীনে Mukherjee এবং Mukhopadhyay।

এভাবে সাজানোর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক বানান জানা না থাকলেও তা খুঁজে বার করতে পাঠকের কোন অসুবিধা হবে না মনে হয়।

আর একটি বড় সমস্যা হল অনেক সময় আদৌ কোন পদবী ব্যবহার করা হয় না। ভারতের নানা অঞ্চলে এটা প্রচলিত সাধারণ নীতি। এসব ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব নামের শেষ অংশটি অনুসারে বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে, যেমন, রাজেন্দ্র প্রসাদ নামটি প্রসাদের অধীনে দেওয়া হয়েছে। সেখানে তা সম্ভব নয়, কিংবা এ রকম ভাগের ফলে আরও বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, সেখানে সাজানো হয়েছে পুরো নামের আদ্য অক্ষর হিসাবে। যেমন, ভগৎ সিং, ভগবান দাস প্রমুখ। আবার কয়েকটি দক্ষিণ ভারতীয় নামের যে কোন অংশ প্রথমে উল্লেখ করা হয়, যেমন, Alluri Sitarama Raju-কে বলা হয় Sitarama Raju, Alluri—মুসলিম নামের বেলাতেও নামের যে-কোন অংশ প্রথমে লেখা হয়, যেমন, Mohammad Ali, Ali, Mohammad, Shaukat Ali, কিংবা Ali, Shaukat— সারা দেশে এত রকমভাবে নাম লেখার

রীতি আছে যে বর্ণানুক্রমে সাজানোর সময় একটি স্বীকৃত সাধারণ নিয়ম স্থির করা বেশ কঠিন। নাম লেখার একটিমাত্র পদ্ধতি অনুসারে নামগুলিকে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যে পদ্ধতিতেই নাম লেখা হোক না কেন তার যে কোন একটি জানা থাকলে একই শিরোনামে অধীনে আসল ব্যক্তিটির নাম খুঁজে বার করতে মনে হয় সাধারণ পাঠকের অসুবিধা হবে না। আরও একটি কথা বলা দরকার। নাম যে-ভাবে বেশি পরিচিত তারই বর্ণানুক্রমে তা সাজানো হয়েছে। যেমন ঘোষ, অরবিন্দ-র বদলে শ্রী অরবিন্দ, প্রথম নামটি অবশ্য ক্রস রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত চারটি খণ্ডে নামগুলি এভাবে সাজানো হয়েছে—প্রথম খণ্ড : এ থেকে ডি, দ্বিতীয় খণ্ড : ই থেকে এল, তৃতীয় খণ্ড : এম থেকে আর এবং চতুর্থ খণ্ড : এস থেকে জেড্। প্রতি খণ্ডে আনুমানিক 300 থেকে 500 জীবনী থাকবে। প্রতি খণ্ডে সেই খণ্ডভুক্ত জীবনীর লেখকের নামও থাকবে।

আপন আপন কাজ এবং কৃতিত্বের বিচারে জীবনীগুলির পরিসর কোথাও বেশি কোথাও কম, সাধারণত 600 শব্দ থেকে 2000 শব্দের মধ্যে। কখনও কখনও 1000 বা 1600 শব্দও আছে। এক হাজার ব্যক্তির জীবনী লিপিবদ্ধ করতে হলে, নিজ নিজ গুণের হিসাবে তাঁরা যখন আবার পরস্পর সমতুল্য নন, স্বভাবতই সকলের ক্ষেত্রে পরিসরের তারতম্য ঘটতে পারে।

জাতীয় চরিত অভিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা দরকার। গবেষক পাঠকদের কথা মনে রেখে প্রতি জীবন-কথার শেষে নির্বাচিত গ্রন্থ-তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় শুধু প্রকাশিত বইয়ের নাম নয়, অপ্রকাশিত নথিপত্র, ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত কাগজপত্র, রিসার্চ ফেলোদের নেওয়া সাক্ষাৎ-কার, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে লেখকরা যেসব তথ্য বা সংবাদ জানেন সেগুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এই ধরনের তথ্য সংযোজন খুবই প্রয়োজন, এদের গুরুত্ব কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। কারুর কারুর সম্বন্ধে যেমন অনেক কিছুই জানা যায়। অন্য অনেকের ক্ষেত্রে আদৌ তা নয়। এছাড়া বিভিন্ন রিসার্চ ফেলো বা লেখকরা এগুলি তৈরি করেছেন। এ কারণে স্বভাবতই গ্রন্থপঞ্জীর মান সর্বত্র একরকম রাখা সম্ভব হয়নি। আর একটি কথা, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যেসব তথ্য পাওয়া যেতে পারে সেগুলির উপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, আত্মচরিত, জীবনী, সংবাদপত্র, সাহিত্য, পুস্তিকা ইত্যাদি, এসব কারণে এই গ্রন্থপঞ্জী কৌতূহলী পাঠকের কাছে বিশেষ উপযোগী হবে মনে হয়।

কয়েক শ্রেণীর মানুষ, যেমন, যাঁরা এমন অঞ্চলে বাস করতেন যা পরে পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত হয় কিংবা দেশ বিভাগের পর যাঁরা পাকিস্তানে চলে যান তাঁদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে 1947 সালের পর তাঁদের কর্মধারা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কাজে আমাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য না থাকায় সরাসরি পাকিস্তান কিংবা নতুন দিল্লীর পাকিস্তান হাই কমিশন মারফৎ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাও বিশেষ ফলবতী হয়নি। তথ্য সংগ্রহের জন্য কাউকে সরাসরি পাকিস্তানে পাঠানো রাজনৈতিক কারণে সম্ভব ছিল না। সেজন্যে ভারতে বসেই এই ধরনের মানুষ সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতেই বাধ্য হয়ে তৃপ্ত হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের তথ্য বিশেষ করে কারুর কারুর জীবনের শেষ পর্বের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে যথেষ্ট নয় সে বিষয়ে আমরা সচেতন। আশা করি আমাদের অক্ষমতার কারণটি পাঠকরা উপলব্ধি করতে পারবেন।

জীবনী রচনার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব একটি সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য যে নির্দিষ্ট (ফর্ম) রিসার্চ ফেলোদের দেওয়া হয় এবং লেখকদের কাছে পাঠানো নির্দেশনামার প্রতিলিপি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হল। বত্রিশ জন রিসার্চ ফেলো বিভিন্ন রাজ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন এবং তিনশ পঞ্চাশ জন ব্যক্তি জীবনীগুলি রচনা করেছেন। কাজেই তথ্য সংগ্রহ বা জীবনী রচনার ক্ষেত্রে সর্বত্রই যে একই রীতি মেনে চলা হয়েছে, তা কিছুটা দুরাশা বৈকি। রচনাগুলি সম্পাদনার সময় অবশ্য যতদূর সম্ভব একটি সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে একথা বোধকরি কখনই বলা চলে না। তাছাড়া সকল ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান আমাদের কাম্য মনে হয়নি। প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব রচনা বা উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য বজায় না রাখলে গ্রন্থটি পাঠকের মনোগ্রাহী হবে না।

1963-64 সালে এই অভিধান রচনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথম বছরটি অতিবাহিত হয় নানা আনুষঙ্গিক কাজে, যেমন দেশব্যাপী সংগঠন, বিভিন্ন রাজ্যে রিসার্চ ফেলো নিয়োগ ও তাদের শিক্ষাদান, প্রাথমিক নাম-তালিকা তৈরি, কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তার নির্দেশনামা তৈরি, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দল, জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা লাভের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। কাজটি আদৌ সহজ নয়, বিশেষ করে এ-ধরনের কাজ এদেশে ইতিপূর্বে না হওয়ায় পূর্বের কোন অভিজ্ঞতার সাহায্যলাভের সুযোগ আমাদের ছিল না। সংগঠন থেকে শুরু করে কার্যপ্রণালী নির্ধারণ পর্যন্ত সব কিছুই আমাদের করতে হয়েছে।

পরবর্তী পাঁচ বছর বিভিন্ন রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে বত্রিশজন রিসার্চ ফেলো জীবনী রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। এঁরা সকলেই পরিশ্রম সহকারে পরম আগ্রহে এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ যাঁরা রিসার্চ ফেলোদের উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন, কাজ সংশোধন করেছেন তাঁদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সংগৃহীত উপাদান ফাইল এবং কার্ডে লিপিবদ্ধ হয়ে আমাদের ইনস্টিউটের গবেষণা কক্ষে সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থের প্রকাশ সম্পূর্ণ হলে সেগুলি গবেষকদের পড়তে দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, সংগৃহীত তথ্যের অতি অল্পই চরিত অভিধানের স্বল্প-পরিসরে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

পরের দুবছর অতিবাহিত হয়েছে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জীবনী রচনায়। সারা দেশে সাড়ে তিনশ লেখকের উপর এই লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রচনার আয়তন, লিখনভঙ্গী, তথ্যবিন্যাস, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে যাতে একটি সামঞ্জস্য থাকে সেজন্য একটি নির্দেশনামা লেখকদের কাছে পাঠানো হয়। তাঁরা সকলেই মনোনিবেশ সহকারে নিজদায়িত্ব পালন করেছেন। কেউ কেউ আবার উদ্যোগী হয়ে ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনবোধে বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করেছেন, রিসার্চ ফেলোদের সংগৃহীত তথ্য যাচাই করে দেখেছেন। মোট তিনশ পঞ্চাশ জন লেখকের মধ্যে প্রায় দুশ পঞ্চাশ জন হলেন ইতিহাসবিদ্ দেশের কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। সারা দেশের প্রায় সকল খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ্‌গণ আমাদের এই অভিধান-প্রণয়ন কাজে যুক্ত আছেন। তাঁদে অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভে আমরা গৌরবান্বিত। বাকী লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন বিভিন্ন বৃত্তির কৃতী মানুষ, যেমন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, রাজ্যপাল, হাইকোর্টের বিচারপতি, ভারতীয় দূত, দেশের রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সাংবাদিক, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিল্পপতি প্রভৃতি। এঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী ও লিখন বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

পুরো একটি বছর-নবম বর্ষ-অতিবাহিত হয়েছে, রচনাগুলির সম্পাদন কাজে। এ ধরনের গ্রন্থের সম্পাদন-কার্যটি অতীব দুরূহ এবং পরিশ্রমসাধ্য। নানা বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। সতর্ক থাকতে হয় যেমন, ঘটনা ও তারিখ মিলিয়ে দেখার ভাষা, রচনা-ভঙ্গী এবং তথ্য উপস্থাপন সংশোধন ও পরিমার্জন, আয়তন কাটছাঁট করা, প্রয়োজনবোধে গ্রন্থপঞ্জী মিলিয়ে দেখা ইত্যাদি। প্রত্যেকের লিখনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার দিকে যেমন লক্ষ্য রাখতে হয়েছে তেমনি লক্ষ্য রাখতে হয়েছে যাতে প্রতিটি রচনার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য থাকে। এ কারণে যে-সব লেখকের রচনার কিছু রদবদল করতে হয়েছে তাঁদের কাছে আমরা মার্জনাপ্রার্থী। আশা করি তাঁরা সম্পাদকের পক্ষে এহেন কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করতে পারবেন।

দশ বছরে আমাদের মোট ব্যয় হয়েছে আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। এর মধ্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা 2,19,000/- বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে টাকা 1,89,000/- এশিয়া ফাউণ্ডেশন থেকে টাকা 2,43,000/- এবং দান হিসেবে টাকা 11,000/- পেয়েছি। বাকী টাকা ইনস্টিটিউটের নিজস্ব তহবিল থেকে নেওয়া হয়েছে। যাঁরা আর্থিক সাহায্য দান করেছেন তাঁদের নাম অন্যত্র মুদ্রিত হল। এঁদের সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তাঁদের সহৃদয় আনুকূল্য বিনা এই গ্রন্থ প্রণয়ন কোনমতেই সম্ভব হত না।

উপরের বিবরণী থেকে একথা স্পষ্ট হবে যে জাতীয় চরিত অভিধানের মত বিশাল গ্রন্থ প্রণয়নে যা সময় লাগা উচিত আমরা ঠিক সেই সময় সীমার মধ্যেই কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। আরও একটি

কারণে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে এই ধরনের কাজে যে সময় ও যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার চেয়েও কম সময়ে এবং কম ব্যয়ে আমাদের কাজটি শেষ হয়েছে।

এই গ্রন্থের লক্ষ্য হল শুধুমাত্র ইতিহাসের পাঠক বা গবেষকদের নয় সাধারণ পাঠকের প্রয়োজন মেটানো ; এই প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রেখে লিখনভঙ্গী, তথ্য সমাবেশ এবং উপস্থাপনা ইত্যাদি স্থির করতে হয়েছে। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস, রাজনীতি এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতির কথা যাঁরা ভালভাবে জানতে চান তাঁদের কাছেই এটি কেবল আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে তা নয়। আমাদের লক্ষ্য হল এটিকে কিভাবে সাধারণ পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য ও সরস করে তোলা যায়। আমাদের বিশ্বাস বর্তমান প্রজন্মের প্রতিটি মানুষ, তিনি যে বৃত্তিতেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, এই গ্রন্থপাঠে কিভাবে বর্তমান ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে তার সম্যক পরিচয় জানতে পারবেন। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কার্যকলাপ এবং অবদানের তাৎপর্য জানা থাকলেই তবে দেশের চিত্রটি জানা যায়। কিভাবে এঁরা, যিনি যে বৃত্তিতেই থাকুন বা যে মতবাদ বা আদর্শই অনুসরণ করুন না কেন, ধীরে ধীরে নিজেদের দেশপ্রেম, পরিশ্রম ও ত্যাগের দ্বারা ধীরে ধীরে বর্তমান ভারতবর্ষ গড়ে তুলেছেন—যেন একটির পর একটি ইঁট গেঁথে ভারত-সৌধ নির্মাণ করা -এই কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

পৃথকভাবে স্বনির্বাচিত নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রে একটি মানুষ কি কাজ করেছেন তার বিবরণ নয়, কি ভেবে তিনি করেছেন এবং তাঁর মূল কর্মকাণ্ডের বাইরে জীবন ও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ধ্যান ধারণা কি ছিল, সম্ভবমত সে সব কথা ব্যক্ত করাই হল এই অভিধানের উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র ঘটনাপরম্পরার বিবরণ নয়, মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণরূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই অভিধান দুটি বিশেষ কারণে গবেষকদের কাছে উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। বর্তমানকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্দোলন এবং ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে এটি একটি প্রামাণ্য বই। এ ধরনের বইয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির একটি সাধারণ বিবরণ থাকে, সেই সঙ্গে কতকগুলি সাধারণ-ধরনের সিদ্ধান্তের কথা। এই সিদ্ধান্তগুলির সত্যাসত্য বিচার সম্ভব যদি পাঠকেরা সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি—যাঁরা উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এইসব আন্দোলনে প্রধান অংশ নিয়েছেন তাঁদের জীবনীগুলি পাঠ করেন। অন্যথায় যে কোন আন্দোলনের সাধারণ বিবরণ পাঠে জাতি বা দেশ সম্বন্ধে একটি ভাসা-ভাসা ধারণাই হবে। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে জীবনী গ্রন্থপাঠের উপযোগিতা কখনই অবহেলা করা চলে না। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থপাঠে গবেষকরা ভারতের ইতিহাসের বিশেষ কয়েকটি প্রবণতার কথা অনুধাবন করতে পারবেন এবং বর্তমান ভারতগঠনে যে শক্তি বা কারণগুলি প্রধান সে সবের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উনিশ শতকে সমাজের উন্নতি বিধানে নানা আন্দোলন যাঁরা প্রধান অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের জীবনী পাঠ করেই জানা যাবে পাশ্চাত্য প্রভাব কিংবা ভারতীয় চেতনার পুনরুত্থান কোনটি কি পরিমাণে এই উন্নতির জন্য দায়ী। একদিকে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার অন্যদিকে রাজনৈতিক উন্নতি এ দুয়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্কটিও অনুধাবন করা যায় জীবনী পাঠ করে। সমাজ বা দেশ গঠনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর, যাঁদের মতবাদ বিভিন্ন এবং কার্যপ্রণালীও এক নয়, ভূমিকা কি ছিল তাও সঠিক বুঝতে পারা যাবে। একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে নিছক একটিমাত্র কারণ—কোন একটি দল, মতবাদ বা কার্যপ্রণালী—দেশের উন্নতির মূল নয়। হিংসা বা অহিংসা নীতি, চরমপন্থী বা মধ্যপন্থী মতবাদ, সমাজ সংস্কার কিংবা গোঁড়ামি—এর কোন একটিকেই ভারতের উন্নতির মূল কারণ বলা যায় না। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের প্রজন্মের বিশেষভাবে জানা দরকার কিভাবে, কোন ধারা অনুসরণ করে এবং কোন কোন কাজের ফলে দেশের উন্নতি ঘটেছে। এবং এ ভালভাবে জানা থাকলে কোন একটি বিশেষ মতবাদ বা আদর্শ বা কার্যকলাপের ফলেই দেশ স্বাধীন হয়েছে, আধুনিক হয়েছে—এই মর্মে দেশবাসীর মনে যে একটি ধারণা জন্মানোর চেষ্টা চলেছে তার প্রতিরোধ করা সম্ভব। আমাদের কর্তব্য দেশের অতীতকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা এবং প্রতিটি মানুষকেই তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া।

দেশ-বিভাগ এবং স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশে নানা যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ধীরে ধীরে, কখনও বা অকস্মাৎ, পুরনো কালের নায়কেরা বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছেন। রঙ্গমঞ্চে এখন নূতন নায়কদের আনাগোনা, তাঁদের মনে নূতন ভাবনা-চিন্তা, কর্মসম্পাদনের নূতন পদ্ধতি।

বোধ করি এটা অবশ্যম্ভাবী এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের নূতন পরিস্থিতিতে পুরানো কর্মপ্রণালী প্রায়ই অনুসরণ করা চলে না। নূতন নেতা, নূতন চিন্তা এবং কর্মধারার প্রয়োজনের কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা বলে যদি আমরা পুরানো যুগের মানুষকে মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যেই একেবারে ভুলে যাই, তাঁদের অবদানকে উপেক্ষা করি তাহলে সেটা খুবই দুঃখের। আমাদের এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। স্বাধীনতোত্তর কালের মানুষের মন থেকে যে গতযুগের দেশসেবক, চিন্তা-নায়ক ও অন্যান্য গুণী মানুষের কথা দ্রুতগতিতে মুছে যাচ্ছে একথা অস্বীকার করা যায় না। সে স্মৃতি এখন ধূসর, ম্লান, কখনও বা একেবারে লুপ্ত। আশঙ্কা হয় আরও পঁচিশ বছর পরে অতি অল্প লোকই হয়তো ফাড়কে কিংবা ক্ষুদিরাম, মাদাম কামা কিংবা ভগৎ সিং, ফিরোজশা মেটা কিংবা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন কি স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা স্বামী দয়ানন্দর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে না। আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই অবমাননা এবং অকৃতজ্ঞতা অপনোদনের উদ্দেশ্যই এই জাতীয় চরিত অভিধান গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করা হয়। এবং সেটি স্বাধীনতালাভের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীর কাছে নিবেদন করা। আমাদের উদ্দেশ্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে পথিকৃতদের অবদানের কথা তুলে ধরা এবং তাঁদের স্মৃতি সজীব রাখা। যাঁদের সেবা, পরিশ্রম, আত্মত্যাগ বর্তমান ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে ভারত কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ—সেই সব মহাপ্রাণদের উদ্দেশে বর্তমান প্রজন্মের শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপ এই জাতীয় চরিত্র অভিধান গ্রন্থটি নিবেদিত হল।

পরিশেষে রিসার্চ ফেলো, সুপারভাইজার, এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং জীবনী লেখক—যাঁদের সমবেত সহায়তা এবং অকুণ্ঠ পরিশ্রমে এই বিশাল কাজটি সম্পন্ন হয়েছে তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গ্রন্থের যে সার্থকতা বা গৌরব সবই তাঁদের সহৃদয় সহায়তার জন্য, আর যা বিচ্যুতি বা ত্রুটি তার জন্য দায়ী আমি, সম্পাদন কাজে আমার ব্যর্থতা।

আশা করি ভবিষ্যতে ভারতের স্বাধীনতালাভের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে একজন যোগ্য সম্পাদকের নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় চরিত অভিধান রচিত হবে। অনাগতকালের সেই সম্পাদককে আমি অগ্রিম অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানাই।

30 জুন 1972

শিবপদ সেন

প্রকাশকের কথা

জাতীয় চরিতাভিধান-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল।

ইন্‌স্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ-এর উদ্যোগে ঐ সংস্থার তৎকালীন অধিকর্তা ডক্টর শিবপদ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় 1972 সালে Dictionary of National Biography নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, জাতীয় চরিতাভিধান তার বাংলা সংস্করণ। আক্ষরিক বাংলা তর্জমা না করে, বর্তমানে গ্রন্থটিতে ইংরেজিতে প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য আহৃত তথ্যসমুদয়, প্রয়োজনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বাংলা ভাষার সহযোগে উচ্চস্তরে বিদ্যাবিস্তার রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মূল প্রবর্তনা। স্বভাবত 1984 সালে ইনস্টিটিউটের বর্তমান অধিকর্তা অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় মহাশয় যখন জাতীয় চরিতাভিধান প্রকাশের প্রস্তাব দেন, পর্ষদ সানন্দে তা-গ্রহণ করে। ইংরেজিতে চার খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির বাংলা ভাষান্তরে কলেবর বৃদ্ধি পাবে, এই বিবেচনায় স্থির হয়, জাতীয় চরিতাভিধান পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। মূল ইংরেজি গ্রন্থটি 1800 সাল থেকে 1947 সাল পর্যন্ত কালসীমায় আবদ্ধ। আপাতত সময়ের এই সীমাটুকু মেনে নিয়ে জাতীয় চরিতাভিধান প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যতে ইন্‌স্টিটিউটের সহায়তায় পরবর্তীকালের ঘটনা এবং ব্যক্তিত্বের ইতিবৃত্ত পৃথক একটি খণ্ডে সংযোজন করা যেতে পারে।

অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়ের নেতৃত্বে ইন্‌স্টিটিউটের গবেষকগণ যে যত্ন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। এই সুযোগে তাঁদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। যদিও জানি, সারস্বত সমাজ গ্রন্থটিকে বরণ করলেই তাঁদের শ্রম যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে। এই ধরনের একটি মূল্যবান প্রকাশন-প্রকল্প রূপায়নের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে পর্ষদ কৃতার্থ। আশা করি, গ্রন্থটি বিদ্যার্থীসমাজের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হবে।

কলকাতা,
জুন, 1989

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ডি. এন. বি প্রজেক্টে আর্থিক অনুদানের জন্য আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি :

ভারত সরকার
অন্ধ্র প্রদেশ সরকার
আসাম সরকার
উত্তর প্রদেশ সরকার
উড়িষ্যা সরকার
কেরালা সরকার
গুজরাট সরকার
জম্মু এবং কাশ্মীর সরকার
তামিলনাড়ু সরকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পাঞ্জাব সরকার
বিহার সরকার
মধ্যপ্রদেশ সরকার
মহারাষ্ট্র সরকার
মহীশূর সরকার
মেঘালয় সরকার
রাজস্থান সরকার
হিমাচল প্রদেশ সরকার

ইণ্ডিয়ান ডাইস্টাফ্ ইণ্ডাস্ট্রিস্ লিমিটেড,
মফৎলাল হাউস, ব্যাক বে রিক্ল্যামেশন,
বোম্বাই-20

এশিয়া ফাউণ্ডেশন, নিউ দিল্লী

দি ডেকান হেরাল্ড,
দি প্রিন্টার্স (মাইশোর) প্রাঃ লিঃ,
বাঙ্গালোর

নিউ শোরক স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফেকচারিং কোং লিঃ,
মফৎলাল হাউস, ব্যাক বে রিক্ল্যামেশন,
বোম্বাই-20

মফৎলাল ফাইন স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফেকচারিং কোং লিঃ,
মফৎলাল হাউস, ব্যাক বে রিক্ল্যামেশন,
বোম্বাই-20

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড,
ব্যাক বে রিক্ল্যামেশন, বোম্বাই-20

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, প্রধান কার্যালয়,
মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই-1

স্ট্যাণ্ডার্ড মিলস্ কোং লিঃ,
মফৎলাল হাউস, ব্যাক বে রিক্ল্যামেশন,
বোম্বাই-20

আমাদের সদস্যবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের থেকে প্রাপ্ত আর্থিক অনুদানের জন্য আমরা তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষক, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, সম্পাদকীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও লেখকগণেয় সহৃদয় সহযোগিতা এবং অপরিসীম পরিশ্রমের জন্যই এই পরিকল্পনা রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্য অর্জনে অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীমতী সুব্রতা ঘোষ এবং শ্রীমতী মিনতি ভট্টাচার্যকে সমন্বয় সাধন ও সম্পাদনার কাজে এবং ডঃ সুকুমার ভট্টাচার্যকে প্রেসের কাজে সাহায্যের জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পরিকল্পনার সাফল্যের ক্ষেত্রে ডঃ ভি. জি হাটালকরের অমূল্য অবদানের জন্য আমরা তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, ছাপার কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য আমরা সরস্বতী প্রেস লিঃ-এর শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রিসার্চ সুপারভাইজার

ডঃ এইচ. কে. বরপূজারী,
ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক,
গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়,
গৌহাটী, আসাম।

ডঃ এম. এন. দাশ
ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক
উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়,
বাণী বিহার,
ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা।

ডঃ এস. গোপাল,
ডিরেক্টর, হিস্টোরিক্যাল ডিভিশন,
মিনিস্ট্রি অব্ এক্স্টারনাল অ্যাফেয়ার্স,
নিউ দিল্লী।

ডঃ কে. কে. পিল্লাই,
ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক,
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়,
দি মারিনা, মাদ্রাজ।

ডঃ জি. এম. মোরেস,
ইতিহাসের অধ্যাপক,
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়,
বোম্বাই-32

ডঃ পি. এস. মেহরা,
ইতিহাসের অধ্যাপক,
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়,
চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব।

ডঃ পি. কে. কে. মেনন,
ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক,
কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়,
ত্রিবান্দ্রাম, কেরালা।

ডঃ পি. সি. গুপ্ত,
ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলকাতা-32

ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ,
ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক,
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়,
দিল্লী-6

ডঃ ভি. এ. নারায়ণ,
ইতিহাস বিভাগের রিডার,
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়,
পাটনা, বিহার।

এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইসারি কমিটি

রিসার্চ স্কলারদের নামের তালিকা

শ্রী অমলেন্দু দে,
বাঘা যতীন কলোনি,
এস. পি. ডি ব্লক, পোঃ অঃ গড়িয়া,
জেলা ঃ 24 পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ।

(ডঃ) শ্রীমতী অমিয়া বরাট,
বেলমণ্টে,
6-3-597 এ, আনন্দনগর,
খৈরতাবাদ, হায়দ্রাবাদ-4,
অন্ধ্রপ্রদেশ।

শ্রী আর. নাগেশ্বর রাও,
পট্টিপাদু, ভায়া ঃ বিজয়ওয়াদা,
কৃষ্ণা জেলা, অন্ধ্রপ্রদেশ।

শ্রীমতী ইন্দু রাস্তোগী,
17, আশা মহল,
46, পেডার রোড,
বোম্বাই-26

শ্রী ইম্যানুয়েল ডিভিয়েন,
19, হ্যাডোস রোড, মাদ্রাজ-6

শ্রী এ. সি. ভুইঞা,
এইচ. সি. রোড,
উজান বাজার,
গৌহাটি-1, আসাম।

শ্রী এন. এম. কে. নায়ার,
কান্নিলাথু, কুরমপালা,
পোঃ অঃ পান্ডালাম, কেরালা।

শ্রী এন. ভেলাউধন নায়ার,
ইতিহাস বিভাগ,
ইউনিভার্সিটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ,
ত্রিবান্দ্রম-14,
কেরালা।

শ্রী এল. ডিসুজা,
দাস চাগাস্ সুজা,
(শ্রী) লভিনিও পেরতো-দা-ফণ্টে,
সানগোলডা, ভায়া ঃ সালিগাঁও,
গোয়া।

শ্রী এল. দিওয়ানী,
21/26, ওয়েস্ট প্যাটেল নগর,
নিউ দিল্লী-8

শ্রী এস. আর. মহাজন,
ই-1/121 লাজপত নগর,
নিউ দিল্লী-14

শ্রীমতী এস. এ. দেশপাণ্ডে,
বি-142/4, গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্টস্ কলোনি,
বান্দ্রা (ঈস্ট)
বোম্বাই-51

শ্রী এস. এ. মদন,
বিদ্যার্থী ভবন,
6, ত্রিভুবন রোড,
বোম্বাই-4

শ্রী এস. এস. মুখোপাধ্যায়,
11-বি রামমোহন বেরা লেন,
কলিকাতা-700046

শ্রী এস. ডি. গজরানি,
ব্লু বার্ড ড্রাই ক্লিনার্স,
লাহোরি গেট,
পাতিয়ালা, পাঞ্জাব।

শ্রী এস. ডি. গায়কোয়াড়,
ইতিহাস বিভাগ,
সিদ্ধার্থ বিহার,
ওয়াডালা,
বোম্বাই-31

শ্রী এস. পি. দে,
"কালিপদ ভবন",
কাছাড় স্কুল রোড,
শিলচর—2, আসাম।

ডঃ (শ্রীমতী) কুমুদ প্রসন্ন,
6, ডাগ্‌লিস্‌ হাউস, প্লট-11,
অশোক নগর সোসাইটি,
10, নর্থ সাউথ রোড,
ভিলে পার্লে (ওয়েস্ট),
বোম্বাই-56, এ. এস.।

শ্রী জে. সি. রথ,
টেক্সট্‌ বুক প্রেস কোয়ার্টার্স,,
কোয়ার্টার নং—ডি. এস.-2 আর. এ./138,
ইউনিট নং—9,
নিউ ক্যাপিটাল,
ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা।

শ্রী টি. আর. শারীণ,
এসিস্ট্যান্ট আর্কিভিস্ট্‌,
ন্যাশনাল আর্কাইভস্‌ অব ইণ্ডিয়া,
জনপথ, নিউ দিল্লী-1

শ্রী ডি. এ. দলভি,
নিয়ার টেম্বি মস্‌ক,
টেম্বি থানা,
থানা (সি. আর.)।

শ্রী ডি. এল. দত্ত,
নং—1009/সেক্‌টর 23-বি,
চণ্ডীগড়-2,
পাঞ্জাব।

শ্রী পি. এম. কেবলরমাণি,
দি সিন্ধি পঞ্চায়েৎ ফেডারেশন,
খোরশেদ বিল্ডিং, দ্বিতল,
স্যার ফিরোজশা মেহতা রোড,
ফোর্ট, বোম্বাই-1

শ্রী পি. ভি. তাহিলরমানি,
3, ঈশ্বর ভবন, "এ" রোড,
চার্চগেট,
বোম্বাই-20

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
34/7 বি., ডি. গুপ্ত লেন,
ত্রিতল,
কলিকাতা-700050

শ্রী বি. কেশবনারায়ণ,
হস্টেল নং—"এ", রুম নং—13,
ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস,
হায়দ্রাবাদ,
অন্ধ্রপ্রদেশ।

শ্রীমতী মনতোষ গুরদেব সিং,
জাজেস্‌ হাউস্‌ নং—25,
সেক্‌টর-4, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব।

শ্রীমতী মিনতি ভট্টাচার্য,
3/সি, সাতকড়ি মিত্র লেন,
কলিকাতা-54

ডঃ রামেশ্বর প্রসাদ,
ফ্ল্যাট নং—197/25 রাজেন্দ্রনগর,
পাটনা-16, বিহার।

শ্রী সি. বি. খেয়ারমোদয়,
147-এ হিন্দু কলোনী,
বোম্বাই-14

শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ,
13-জে, শাঁখারিপাড়া রোড,
কলিকাতা-700025

শ্রী সরোজিৎ দত্ত,
59-এ, সতীশ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-26

মূল লেখকদের নামের তালিকা

১ম খণ্ড (অ—ও)

শ্রী অখিলেশ মিশ্র,
(প্রাক্তন সম্পাদক, 'দৈনিক গণেশ,' কাণপুর),
5, গঙ্গা ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড,
তালকাটোরা রোড,
লক্ষ্মৌ-4, (উত্তর প্রদেশ)

ডঃ (শ্রীমতী) অপর্ণা বসু,
ইতিহাস বিভাগ,
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়,
ডি/1/53 সত্যমার্গ,
ডিপ্লোমেটিক এনক্লেভ,
নিউ দিল্লী-1

শ্রী অমলেন্দু দে,
বাঘা যতীন কলোনী,
এস. পি. ডিঃ ব্লক, পোঃ অঃ—গড়িয়া,
জেলা ঃ 24-পরগণা,
পশ্চিম বঙ্গ ।

ডঃ অম্বা প্রসাদ,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়,
দিল্লী-6

শ্রী অরুণ চন্দ্র গুহ,
(প্রাক্তন সাংসদ)
5নং গুরুদ্বারা রাকাবগঞ্জ রোড, নিউ দিল্লী-1

শ্রী অসীম কুমার দত্ত,
কলা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা-32

ডঃ আবদুস শুভান,
আরবী এবং ফার্সি বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা-12

শ্রী আর. এল. রাভল,
ইউনিভার্সিটি স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস,
গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়,
আমেদাবাদ, গুজরাট,

ডঃ আর. কে. ধারাইয়া,
ইতিহাস বিভাগ,
ইউনিভার্সিটি স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস,
গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়,
আমেদাবাদ-9, গুজরাট ।

শ্রী ই. ডিভিয়েন,
19, হ্যাডোস রোড,
মাদ্রাজ-6

শ্রীমতী ঈষিতা চট্টোপাধ্যায়,
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ,
সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়,
কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ ।

ডঃ এইচ. কে. শেরবানি,
বৃহৎ-ফিজা,
602, হিমায়ৎ নগর,
হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ ।

শ্রী এইচ. ভি. শ্রীনিবাসমূর্তি,
ইতিহাস বিভাগ, সেন্ট্রাল কলেজ,
বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়,
বাঙ্গালোর, মহীশূর ।

ডঃ এ. কৃষ্ণস্বামী,
(ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক,
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়),
নং 22, আমাইপাল্লাম,
আন্নামালাইনগর,
চিদাম্বরম, তামিলনাড়ু ।

ডঃ এ. চৌরিয়ান,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
উইলসন কলেজ, বোম্বাই ।

শ্রী এন. আর. পাঠক,
সম্পাদক, হিস্ট্রি অব্ ফ্রিডম মুভমেণ্ট ইউনিট,
মহারাষ্ট্র সরকার,
11-এ, নিউ ভাটওয়ারি, বোম্বাই-4

ডঃ এন. কে. সাহু,
ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান,
সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
সম্বলপুর, উড়িষ্যা ।

শ্রী এন. খেলচন্দ্র সিং,
গ্রন্থাগারিক,
মণিপুর সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী,
ইম্ফল, মণিপুর ।

ডঃ এন. সুব্রামনিয়ম,
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক,
মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়,
মাদুরাই, তামিলনাড়ু ।

শ্রী এ. পি. ইব্রাহিম কুঞ্জরু,
(প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়),
কালিকট, কেরালা ।

শ্রী এম. মাসানি (প্রাক্তন সাংসদ)
2, তুঘলক রোড,
নিউ দিল্লী-11

ডঃ এম. এ. আনসারি,
অধ্যাপক, ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিভাগ,
জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া,
জামিয়ানগর, নিউ দিল্লী-25

শ্রী এম. এস. আহলুওয়ালিয়া,
ইনস্টিটিউট অব্ হিস্ট্রি এণ্ড হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ,
পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়,
পাতিয়ালা, পাঞ্জাব ।

ডঃ এম. এস. জৈন,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়,
জয়পুর, রাজস্থান ।

ডঃ এম্. ভেঙ্কটরঙ্গাইয়া,
80, নেহরু নগর,
সেকেন্দ্রাবাদ-26, অন্ধ্রপ্রদেশ ।

ডঃ এম. রামা রাও,
(ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক,
এস. ভি. বিশ্ববিদ্যালয়,
আনন্দ নিলয়ম, তিরুপতি),
বি-1-12, পট্টভিপুরম,
গুণ্টুর-4, অন্ধ্রপ্রদেশ ।

শ্রী এম. রত্নস্বামী, এম. পি.,
119, সাউথ এভিনিউ,
নিউ দিল্লী-11

ডঃ এ. রামস্বামী,
অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান,
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়,
আন্নামালাই নগর,
তামিলনাড়ু ।

ডঃ এস. ইউ. কামাথ,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়,
বাঙ্গালোর, মহীশূর ।

শ্রী এস. এন. পদ্মনাভন,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজ,
তামবরম (ঈস্ট), মাদ্রাজ-59

ডঃ এস. এম. জিয়াউদ্দিন আলাভী,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়,
বার্চ হাউস,
কোলানগর,
আলিগড়, উত্তর প্রদেশ ।

ডঃ এস. কে বাজাজ,
ডিপার্টমেন্ট অব্ পাঞ্জাব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ,
পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়,
পাতিয়ালা, পাঞ্জাব।

শ্রী এস. কে. মুরানজন্,
৪, এ্যাশ্লে হাউস,
167-এ কোলাবা রোড,
বোম্বাই-5

শ্রী এন. কৃষ্ণস্বামী,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজ,
তামবরম, মাদ্রাজ-59।

শ্রী এস. ডি. গুরু,
সম্পাদক, স্টেট গেজেটিয়ারস,
34/14, সাউথ টি. টি. নগর,
ভুপাল, মধ্যপ্রদেশ।

ডঃ এস. নবি হাদি,
অধ্যাপক, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য,
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়,
আলিগড়, উত্তরপ্রদেশ।

ডঃ এস. সি. মিশ্র,
ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান,
এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা,
বরোদা-2, গুজরাট।

শ্রী ওয়াই. শ্রীরামমূর্তি,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়,
ওয়ালটেয়ার, অন্ধ্রপ্রদেশ।

শ্রী কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত,
অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও
সংস্কৃতি বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা-12

শ্রী কাঞ্চন চক্রবর্তী,
অধ্যাপক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ,
কলাভবন,
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রী কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য,
অনুশীলন ভবন,
32/8 চণ্ডী ঘোষ রোড,
কলিকাতা-40

শ্রী কিঝোদাথ বাসুদেবন নায়ার,
অরবিন্দ মন্দির,
ক্রাঙ্গানোর,
পোঃ অঃ ত্রিচুর, কেরালা।

শ্রী কে. আর. মালকানি,
সম্পাদক, দি মাদার ল্যাণ্ড,
রাণী ঝাঁসী মার্গ,
নিউ দিল্লী-55

ডঃ কেয়ামুদ্দিন আহমেদ্,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়,
পাটনা-5, বিহার।

শ্রী কে. এন. দত্ত,
(প্রাক্তন সম্পাদক, স্টেট গেজেটিয়ারস),
ল্যাণ্ড মার্ক,
নর্নগ্রিমবা রোড,
শিলং-3, মেঘালয়।

শ্রী কে. এল. শ্রীবাস্তব,
অধ্যক্ষ,
গভর্ণমেন্ট পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ,
পোঃ অঃ সেহোর, মধ্যপ্রদেশ।

ডঃ কে. কে. দত্ত,
(পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)
বোরিং ক্যানাল রোড,
পাটনা-1, বিহার।

ডঃ কে. কে. পিল্লাই
অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ,
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়,
দি ম্যারিনা, মাদ্রাজ-5

ডঃ কে. বীরথাপ্পা,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়,
সেণ্ট্রাল কলেজ,
বাঙ্গালোর, মহীশূর।

ডঃ কে. রাজাইয়ান,
অধ্যাপক, আধুনিক ইতিহাস বিভাগ,
মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়,
মাদুরাই-2, তামিলনাড়ু।

শ্রী কে. শাস্থানাম
58, ঈস্ট অভিরামপুরম স্ট্রীট,
মাদ্রাজ-4

ডঃ কে. সি. চৌধুরী,
অধ্যক্ষ,
মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কলেজ, কলিকাতা,
পি-112, লেক টাউন, ব্লক-এ,
কলিকাতা-55

ডঃ কৃপাল সিং,
ডিপার্টমেণ্ট অব্ পাঞ্জাব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ,
পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়,
পাতিয়ালা, পাঞ্জাব।

শ্রী ক্ষিতীশ রায়,
(প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন),
রতনপল্লী,
পোঃ অঃ শান্তিনিকেতন,
জেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।

ডঃ গণ্ডা সিং,
(ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক,
পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়, পাতিয়ালা),
লোয়ার মল,
পাতিয়ালা, পাঞ্জাব।

শ্রী গণেশ ঘোষ,
বিপ্লব তীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা,
চটুলা আর্ট স্টুডিও,
16/17, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-12

শ্রী গোপাল হালদার,
প্রাক্তন সম্পাদক, 'পরিচয়',
ব্লক—এইচ, ফ্লাট নং-19,
সি. আই. টি., ক্রিস্টোফার রোড, কলিকাতা-14

শ্রীমতী ছায়া ভট্টাচার্য,
এ/6, গভর্ণমেণ্ট হাউসিং এস্টেট,
নিউ সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-14

শ্রী জি. এল. মেহতা,
(আমেরিকাস্থ প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত),
5/সি জীবনজ্যোতি,
7, সেতলবাদ রোড,
বোম্বাই-6

ডঃ জি. এস. চাবড়া,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়,
জম্মু,
জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য।

ডঃ জি. এস. দীক্ষিত,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়,
ধারওয়ার, মহীশূর।

শ্রী জি. টি. পরাণ্ডে,
সম্পাদক, 'দি হিতবাদ',
ওয়ার্ধা রোড,
নাগপুর-1, মহারাষ্ট্র।

ডঃ জি. ডি. পারিখ,
(প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়,
গণেশ ভবন,
276 তেলাং রোড,
মাতুঙ্গা,
বোম্বাই-19

শ্রী জি. পি. শেখর,
সাহানা, ভক্তি বিলাস রোড,
তাজুথাকাড, ত্রিবান্দ্রাম-14,
কেরালা ।

শ্রী জি. ভি. কেটকার,
(প্রাক্তন সম্পাদক, "কেশরী" ও "মারাঠা"),
ডেকান কলেজ, পুণা, মহারাষ্ট্র ।

ডঃ জে. এস. গ্রেওয়াল,
ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান,
গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয়,
অমৃতসর, পাঞ্জাব ।

শ্রী টাটাপুরম সুকুমারন,
জনসংযোগ আধিকারিক,
টাটাপুরম,
কোচিন 682018,
কেরালা ।

ডঃ টি. কে. রবীন্দ্রন,
ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান,
কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়,
ত্রিবান্দ্রাম, কেরালা ।

ডঃ টি. পি. মীনাক্ষিসুন্দরম্,
(প্রাক্তন উপাচার্য, মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়),
মাদুরাই, তামিলনাড়ু ।

শ্রী টি. ভি. কৃষ্ণাণ,
সংবাদদাতা, "পেট্রিয়ট",
ত্রিবান্দ্রাম, কেরালা ।

শ্রী টি. ভি. পারভাতে,
গভর্ণমেণ্ট কোয়ার্টার্স,
পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, পুণা, মহারাষ্ট্র ।

শ্রী টি. সি. শঙ্কর মেনন,
(অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ),
"দেবী নিবাস",
থেবারা রোড, কোচিন-16, কেরালা ।

ডঃ ডি. অবস্তী
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়, পাতিয়ালা, পাঞ্জাব ।

ডঃ ডি. পি. বড়ুয়া
খারঘুলি, গৌহাটি-4, আসাম ।

ডঃ ডি. পি. সিংহ,
(ইতিহাস বিভাগের
প্রধান ও অধ্যাপক),
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজারামমোহনপুর,
জেলা— দার্জিলিঙ, পশ্চিমবঙ্গ ।

ডঃ ডি. বালাসুব্রামনিয়াম্,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়,
আন্নামালাইনগর, চিদাম্বরম, তামিলনাড়ু

ডঃ ডি. ভি. গুণ্ডাপ্পা
অধিকর্তা, গোখলে ইনস্টিটিউট অব্
পাবলিক এফেয়ার্স, বাসবন্তগুড়ি, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর ।

শ্রী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়,
171, সি. সি. ও. এস,
টালাপার্ক, কলিকাতা-2

ডঃ দশরথ শর্মা,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যোধপুর, রাজস্থান ।

শ্রী দেবব্রত দত্ত,
অধ্যক্ষ, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর, আসাম

শ্রী নলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
অনুশীলন ভবন,
32/8 চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা-40

ডঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায়,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-12

শ্রী নুরুউদ্দিন আহমদ,
দিল্লীর প্রাক্তন মেয়র,
10-এ আলিপুর রোড, দিল্লী-6

শ্রী পি. এন. দত্ত,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সেণ্ট এডমণ্ডস্ কলেজ,
শিলং, মেঘালয় ।

শ্রী পি. কোচুনি পাণিক্কর,
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কালাথিংকল হাউস,
পারুর, নিয়ার হস্পিটল,
ভায়া আলয়াওয়ে, কেরালা ।

শ্রী পি. কুঞ্জুকৃষ্ণ মেনন,
19/291, চালাপুরম,
কালিকট-2, কেরালা

শ্রী পি. কে. গোপালকৃষ্ণণ,
রিসার্চ অফিসার,
কেরালা হিস্ট্রি এসোসিয়েশন,
শ্রী ভেংকটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়,
তিরুপতি, অন্ধ্রপ্রদেশ

ডঃ পি. ঝাঁসী লক্ষ্মী,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়,
হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ,

শ্রীমতী প্যানুসি ছায়া ঘোষ,
অধ্যাপিকা, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
লোরেটো কলেজ, কলিকাতা,
59, পার্ক স্ট্রীট, পার্ক ম্যানসনস্, কলিকাতা-16

শ্রী পৃথ্বী সিং,
গণেশ ক্রীড মণ্ডল, মতিবাগ, ভাবনগর, গুজরাট ।

ডঃ ফৌজা সিং,
অধিকর্তা, ডিপার্টমেন্ট অব্
পাঞ্জাব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ,
পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়, পাতিয়ালা, পাঞ্জাব ।

ডঃ বখসিস্ সিং নিজ্জর,
ডিরেক্টর অব স্টেট আর্কাইভস্,
পাতিয়ালা, পাঞ্জাব ।

শ্রী বদরুদ্দিন তায়েবজী,
(জাপানে প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত),
লতিফিয়া, রোড-6, বানজারা হিল্স্,
হায়দ্রাবাদ-34, অন্ধ্রপ্রদেশ ।

শ্রী বলরাজ পুরী,
অধিকর্তা, ইনস্টিটিউট অব জম্মু এণ্ড্
কাশ্মীর এ্যাফেয়ার্স,
করণনগর, জম্মু এণ্ড কাশ্মীর স্টেট ।

ডঃ বি. কে. আপ্তে,
ইতিহাস বিভাগের প্রধান,
নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রাধা নিবাস,
ধরমপেথ, নাগপুর, মহারাষ্ট্র ।

ডঃ বিজিত দত্ত,
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ।

শ্রী বি. নরসিংহরাজন,
ইতিহাস বিভাগ, বিশপ হেবার কলেজ,
পুথুক, ত্রিচি-17,
তামিলনাড়ু ।

ডঃ বি. বি. মজুমদার,
বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কলেজ পরিদর্শক,
দরিয়াপুর, গোলা, পাটনা-4, বিহার ।

ডঃ (শ্রীমতী) বি. শালিনী দেবী,
ইতিহাস বিভাগ,
উইমেন্স্ খৃস্টান কলেজ,
মাদ্রাজ ।

ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ,
(ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য),
34, চাথাম লাইন্স্,
এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ ।

শ্রী বিষ্ণুপদ বেরা,
গ্রাম-কামরাঙ্গু,
পোঃ অঃ-ঝোরহাট, জেলা-হাওড়া।

ডঃ ভরত প্রসাদ মজুমদার,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, বিহার।

ডঃ ভবতোষ দত্ত,
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা-12

ডঃ ভবতোষ দত্ত (২)
(প্রাক্তন ডি. পি. আই. এবং
এডুকেশন সেক্রেটারী, পশ্চিম বঙ্গ),
1/1 কে যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-31

শ্রী ভি. এন. দত্ত,
ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও
অধ্যাপক, কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়,
কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা।

ডঃ ভি. এন. হরিরাও,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়,
তিরুপতি, অন্ধ্র প্রদেশ।

ডঃ ভি. এস. ভার্গব,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
গভর্ণমেণ্ট কলেজ,
আজমীর, রাজস্থান।

শ্রী ভি. কে. নরসিংহম,
সম্পাদক এক্সপ্রেস টাওয়ার,
'দি ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস',
নরিম্যান পয়েণ্ট, বোম্বাই-1

ডঃ ভি. জি. দিঘে,
(প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, হিস্ট্রি অব ফ্রিডম
মুভমেণ্ট ইউনিট, ভারত সরকার),
8, আনন্দ, ডি. এল. বৈদ্য রোড,
দাদার, বোম্বাই-28

ডঃ ভি. জি. হাটলকার
(কলাবিভাগের প্রাক্তন প্রধান,
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়),
16-বি, শ্রীটার রোড, বোম্বাই-7

ডঃ ভি. টি. গুণে,
অধিকর্তা, হিস্টোরিক্যাল আর্কাইভস্ অব গোয়া,
পানাজি, গোয়া।

ডঃ ভি. ডি. রাও,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
ফিস্ক বিশ্ববিদ্যালয়,
নর্সভিশ্ টেনেসি 37203, ইউ. এস. এ.

শ্রী ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত,
32, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড,
কলিকাতা-9

ডঃ ভি. যশোদা দেবী,
ইতিহাস বিভাগ,
এস. ভি. বিশ্ববিদ্যালয়, তিরুপতি,
246, জি. এন. এম স্ট্রীট,
তিরুপতি, অন্ধ্রপ্রদেশ।

ডঃ মালিক রাম বাভেজা,
সি-396, ডিফেন্স কলোনী,
নিউ দিল্লী-3

শ্রী মিল্টন সাংমা,
ইতিহাস বিভাগ,
ইউনিয়ন খ্রিস্টান কলেজ,
পোঃ অঃ বারাপানি, মেঘালয়।

শ্রী মিহির বসু,
বিপ্লব তীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা,
চাট্টাল আর্ট স্টুডিও,
16/17, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-12

ডঃ মুশিরুল হক,
ফেলো, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্
অ্যাডভান্স স্টাডিজ, রাষ্ট্রপতি নিবাস,
সিমলা-5, হিমাচল প্রদেশ।

শ্রী মেহের চাঁদ খান্না,
59, ফ্রেন্ডস্ কলোনী,
নিউ দিল্লী।

শ্রী যতীন্দ্র নাথ গোস্বামী,
জে. বি. কলেজ,
জোরহাট-1, আসাম।

শ্রী যশোবন্ত সিং খিচি,
ইতিহাস বিভাগ,
ডুংগর কলেজ,
বিকানীর, রাজস্থান।

শ্রী রতনমণি চট্টোপাধ্যায়,
শক্তি প্রেস,
27/3 বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-6

শ্রী রবীন্দ্র নাথ দাস,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
মৌলানা আজাদ কলেজ,
কলিকাতা-13

শ্রী রসময় সুর,
সেক্রেটারী,
পল্লী নিকেতন,
পোঃ অঃ—বাগু (ভায়া রাজারহাট),
জেলা—24 পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীমতী রাজেন্দ্র জিন্দল,
সমাজবিদ্যা বিভাগ,
ডুংগড় কলেজ,
বিকানীর, রাজস্থান।

শ্রী রাধোন এস. লিংডো,
স্পীকার,
মেঘালয় লেজিসলেচার,
শিলং, মেঘালয়।

শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী,
কলাক্ষেত্র,
তিরুভানমিয়ুর, মাদ্রাজ-41

শ্রী শচীন্দ্রলাল ঘোষ,
48, গ্রেটার কৈলাস,
নিউ দিল্লী-48

ডঃ শিশির কুমার মিত্র,
শ্রী অরবিন্দ আশ্রম,
পণ্ডিচেরী-2

শ্রীমতী শোভনা নন্দী,
এ/17, চিরন্তনী পার্ক,
পোঃ অঃ—বাঁশদ্রোণী,
জেলা—24 পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রী সত্যরঞ্জন ঘটক,
অনুশীলন ভবন,
32/8 চণ্ডী ঘোষ রোড,
কলিকাতা-40

ডঃ সফী আহমেদ্,
ইতিহাস বিভাগ,
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়,
আলিগড়, ইউ. পি।

শ্রী সি. বি. খৈরমোদয়,
147-এ, হিন্দু কলোনী,
বোম্বাই-14

ডঃ সুনীল সেন,
ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও রীডার,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা।

শ্রী সুভাষ চন্দ্র সরকার,
সম্পাদক,
'সার্চলাইট',
পাটনা, বিহার।

শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,
'দি স্টেটসম্যান',
স্টেটসম্যান হাউস,
কনট সার্কাস,
নিউ দিল্লী-1

লেখকদের প্রতি নির্দেশ

১। জীবনালেখ্যগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত বাক্যাবলী সমন্বিত এবং বর্ণনামূলক হবে। কিছুটা সংক্ষিপ্ত এবং সাহিত্যানুগ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। বন্ধনীর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর সাল সহ নেতাদের নামগুলি বড় হাতের অক্ষরে লিখতে হবে।

৩। চরিতাভিধানের যে নামটি Cross reference হিসাবে বর্ণিত হবে সেটি পৃষ্ঠার শুরুতেই উল্লিখিত থাকবে। পদবীর উল্লেখ থাকলে সেগুলিকে underline করা হবে।

৪। নিম্নলিখিত পর্যায়ে জীবনালেখ্যগুলি বিভক্ত—

ক) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচিতি।

জন্মের তারিখ এবং জন্মস্থান—পিতামাতা, আত্মীয় পরিজন, পারিবারিক পটভূমি, সামাজিক মানমর্যাদা, ধর্ম, জাতি প্রভৃতি ; আর্থিক অবস্থা, তারিখ, বিবাহের তারিখ, পত্নীর নাম, পত্নীর পারিবারিক পটভূমি।

খ) প্রথম জীবন।

শিক্ষা—ভ্রমণ—মন বা চরিত্রে কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার (ব্যক্তি বিশেষ, বই, সংস্থা প্রভৃতি)।

গ) কর্মজীবনের ইতিহাস।

বয়ঃসন্ধির পর থেকে মৃত্যুকাল (অথবা জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বর্তমান সময়) পর্যন্ত সমগ্র কর্ম-জীবনেতিহাসের অনুক্রমিক বর্ণনা দেওয়া হবে। কখন, কোন পদে আসীন ছিলেন তাও উল্লিখিত থাকবে। কারো জীবনেতিহাসে অপ্রিয় বিতর্কের উল্লেখ প্রয়োজনীয় হলে তা' এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

কোন লেখক বা কবির ক্ষেত্রে তাঁর মুখ্য রচনাগুলির উল্লেখ থাকবে।

ঘ) ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা বা মনোভাব—সমাজ সংস্কার, ধর্ম, শিক্ষা, জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক সমস্যা, প্রাদেশিকতাবাদ প্রভৃতি। চেহারা, পোশাক, ব্যবহার, এবং জীবনযাত্রা (যেমন অনাড়ম্বর, বিলাসী, শান্ত, বীরোচিত অথবা ভবঘুরে)।

ঙ) মূল্যায়ন।

তাঁর মান, সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষত জাতীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে একটি সমীক্ষা।

(বিঃ দ্রঃ— প্রত্যেক নেতার মধ্যে (ক) (খ) এবং (ঘ) পর্যায়ভুক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্যই থাকবে এমন আশা করা যায় না। তবে এই প্রকল্পের জন্য সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এই তিনটি পর্যায়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৫। প্রতিটি রচনাকে নির্দিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদে পরিবেশন করতে হবে।

৬। সম্পাদক মণ্ডলী প্রতিটি রচনার দৈর্ঘ্য মোটামুটি নির্দিষ্ট করে দেবেন। লেখকদের কাছে অনুরোধ নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত একশটি শব্দের অধিক যোগ না করেন।

৭। ৪ সংখ্যক নির্দেশে পর্যায়ানুযায়ী অনুচ্ছেদের যে সীমা উল্লেখ করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে লেখকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত থাকেন—

পর্যায় (ক) ও (খ) সমগ্র লেখার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
(গ) সংখ্যক পর্যায়ে থাকবে সমগ্র লেখার ৫০ শতাংশ।
(ঘ) ও (ঙ) সংখ্যক পর্যায়ে সমগ্র লেখার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে।

৮। লেখক প্রয়োজন বোধে, গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের বাইরে অপর যেসব প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যাবে অবশ্যই সে সব তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন।

৯। প্রত্যেক জীবনালেখ্যের শেষে নির্বাচিত তথ্যপঞ্জীর পরিচয় থাকবে। ব্যক্তিসূত্রে প্রাপ্ত উপাদানও উল্লিখিত থাকবে।

১০। পৃথকভাবে প্রতি পৃষ্ঠায় কোন পাদটীকা নির্দেশিত হবে না। প্রয়োজনীয় উল্লেখ্য সূত্র অথবা বিষয় মূল লেখার মধ্যেই বন্ধনীভুক্ত করা হবে।

উপকরণ সংগ্রহ বিধি

পরিবার পরিচিতি ও প্রথম জীবন—

(অ) **কাল সীমার উল্লেখ :-**

১। জীবনায়ন, জন্ম ও মৃত্যুকাল।

২। জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানের পরিচিতি।

(আ) **ভৌগোলিক বৃত্তান্ত :-**

১। জন্মস্থান।

২। ব্যক্তি বিশেষের কর্মক্ষেত্র।

(ই) **পরিবার পরিচিতি :-**

১। ব্যক্তিবিশেষের পারিবারিক নিকটজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :-

ক) পিতামাতা।

খ) নিকট আত্মীয়।

২। সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক পটভূমি :-

ক) জাতি/বর্ণ।

খ) পিতার পেশা।

গ) নিজ পরিবারের সামাজিক মান।

৩। পরিবারের মাধ্যমে অন্যান্য সংসর্গ (এমন কেউ যিনি তাঁর জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন)।

(ঈ) **শিক্ষা :-**

১। ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী।

২। আধুনিক।

(উ) **ব্যক্তিগত জীবন :-**

১। বিবাহ।

ক) পত্নীর নাম, পরিচিতি।

খ) বিবাহের তারিখ।

গ) অবিবাহিত অথবা একাধিক বিবাহ।

২। পরিবার বা পত্নী ব্যতীত অন্য কোন ঘনিষ্ঠ ব্যাগক্তত সম্পর্ক :-

ক) পুরুষ (শিক্ষক, কোন বীরোচিত ব্যক্তিত্ব, পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি)।

খ) নারী।

৩। জীবনধারা (অনাড়ম্বর, বিলাসী, শান্ত, বীরোচিত ইত্যাদি)।

৪। প্রভাব বিস্তার করেছিল এমন কোন ধর্মীয় বা অন্য কোন প্রকারে বই, মানুষ এবং সংসর্গ।

বিদেশী প্রভাব—

ক) বিদেশ ভ্রমণ।

খ) বিদেশী সংসর্গ বা বন্ধুত্ব।

গ) বিদেশী গ্রন্থপাঠ জনিত প্রভাব (লেখক এবং পঠিত গ্রন্থ)

পরিণত বয়সের মনোভাব এবং ভাবধারা—

(অ) **সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়ে :-**

১। জাতি, অস্পৃশ্যতা, বিধবা বিবাহ, নারীর মর্যাদা ইত্যাদি।

২। রক্ষণশীলতা, আধুনিকতা।

(আ) **ধর্ম বিষয়ে :-**

১। ধর্ম বিশ্বাস।

২। রক্ষণশীলতা, আধুনিকতা।

(ই) শিক্ষা বিষয়ে :-

১। "পশ্চিমী" শিক্ষা।

২। "জাতীয়" শিক্ষা।

৩। "বুনিয়াদী" অথচ প্রাথমিক শিক্ষা।

(ঈ) জাতীয়তাবাদ বিষয়ে :-

১। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে ভাবধারা।

২। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পন্থা (সাংবিধানিক, বিপ্লবাত্মক, সহিংস, অহিংস, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি)।

৩। প্রধানত : বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী (বিদেশবাসী ভারতীয়দের ব্যবহার) সম্বন্ধে মনোভাব।

(উ) আঞ্চলিকতাবাদ বিষয়ে :-

(ঊ) বৃটেন সম্বন্ধে :-

১। ভারতে বৃটিশ শাসকদের শাসন পরিচালনা ও মতামত বিষয়ে।

২। ইংলণ্ডের আদর্শে গঠিত সরকার।

৩। সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদী সূত্র।

(এ) অর্থনৈতিক বিষয়ে :-

১। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অভিযোগ (শুল্ক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সরকারী ব্যয়, সম্পদ লুণ্ঠন ইত্যাদি)।

২। শ্রমিক সমস্যা (কারখানা, আবাদ, কৃষিশ্রমিক এবং ভূমি-সংস্কার)।

৩। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি বিষয়ে ভাবধারা (কুটীর শিল্প)।

৪। বৃহত্তর অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাবধারা (আধুনিক শিল্প)।

সাধারণের সঙ্গে আচার-ব্যবহার এবং কর্মজীবন—

(অ) ব্যবহৃত সংযোগ ব্যবস্থা :-

১। সাংবাদিকতা।

২। জন-মঞ্চ।

৩। শিক্ষা।

৪। গ্রন্থরচনা।

৫। 'দল' সংসর্গ।

৬। অন্যান্য পন্থা।

(আ) পদাধিকার :-

১। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে।

২। জন-জীবনে।

৩। শিক্ষাজগতে।

৪। সরকারী ক্ষেত্রে।

৫। অর্জিত সম্মান এবং উপাধি।

(ই) কার্যকলাপ :-

১। সমাজ সংস্কার।

২। জাতীয়তাবাদী কর্মসূচী।

৩। শিক্ষাবিষয়ক কর্ম

৪। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আর্থিক অনুদান।

(ঈ) দলগত সদস্যপদ, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা অন্য যে কোন প্রকার (গুপ্ত সমিতি সহ)।

অনুবাদকারীদের নামের তালিকা

১ম খণ্ড (অ—ও)

নাম।	চরিতাবলীর ক্রমিক সংখ্যা (পৃষ্ঠা 43-48)
শ্রী অভীক লাহিড়ী	৩, ৪৬, ৪৮, ৬৫, ৭৮, ৮৭, ১২১, ১২৪, ১২৯, ১৩০, ২০৫, ২০৬, ২১৩, ২১৫, ২১৬।
শ্রী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯, ২৮, ৩০, ৩৪, ৪৩, ৪৪, ৫৮, ৬২, ৭০, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৩, ৯৮, ১০২, ১০৩, ১১৪, ১১৮, ১১৯, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৭১, ১৮৪, ১৮৮, ২১১, ২১৯।
শ্রী আনন্দ ভট্টাচার্য	৪, ১২, ৫৪, ৮৬, ৮৯, ৯৪, ৯৯, ১২৭।
শ্রীমতী ঈষিতা চট্টোপাধ্যায়	২।
শ্রীমতী কর্ণিকা সেন	২৪, ২১০।
শ্রীমতী কমলা সরকার	৯, ৩৫, ৫০, ১০৮।
শ্রী কুশলব্রত ঘোষ	৭।
শ্রীমতী গীতা ঘোষ	৮৫, ১৭৪।
শ্রী পার্থপ্রতিম বসু	৫, ৮০।
শ্রী বিষ্ণুপদ বেরা	২৫, ৫৫, ৮২, ১১৭. ১৬৮,
শ্রীমতী বেলা দে	১৩, ১৭, ২০, ২৬, ২৭, ৩৬, ৪২, ৪৭, ৫২, ৬৬, ৯৫, ১২৬, ১৪৬।
শ্রী রাজীবকান্তি শর্মাধিকারী	২৩, ২৯, ৩৩, ৪১, ৪৯, ১১৩, ১২০, ১২১, ১২৫, ১২৮, ১৩১, ১৩৪, ১৯৩, ১৯৯, ২০২, ২০৩, ২১২।
শ্রীমতী শুভ্রা চৌধুরী	১৫, ১৬, ৩১, ৩৭, ৪০, ৫৭, ৬৩, ৭২, ১৩৩, ১৬১, ১৮৫।
শ্রী সসীম কবিরাজ ঠাকুর	১৪৩, ১৫৫, ১৮২।
শ্রীমতী সারা সরকার	১, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৪, ২১, ৩২, ৩৯, ৪৫, ৫১, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৯৬, ১০০, ১১৬, ১২৩, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭৫, ১৮৩, ২১৭, ২২১।
শ্রী সুদীপ সেন	১৩৫, ১৭৭, ২০১, ২১৮, ২২০।
শ্রীমতী সুপ্রিয়া জানা	১৮, ২২, ৩৮, ৭১, ৭৩, ৯১, ৯২, ১০৪, ১১০, ১২২, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২০০ ২০৪, ২০৮, ২০৯, ২১৪।
শ্রীমতী সুস্মিতা দত্ত	৫৬, ৬২, ৬৪, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৫, ১৩২, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৫১, ১৫৩, ১৫৭, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৭২, ১৭৩, ২০৭।

চরিতাবলীর বর্ণানুক্রমিক তালিকা
১ম খণ্ড (অ—ও)

জাতীয় চরিতাভিধান

অ

অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬)
Akshay Kumar Datta (1820—1886)

অক্ষয় কুমার দত্ত 1820 সালের 15 জুলাই বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পীতাম্বর দত্ত খিদিরপুরের কুটঘাটের ক্যাশিয়ার ও ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরল ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অক্ষয় কুমারের মাতার নাম ছিল দয়াময়ী দেবী। পনের বছর বয়সে অক্ষয় কুমার শ্যামাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। বিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদেরই পৌত্র।

শৈশবে অক্ষয় কুমার গ্রামের পাঠশালায় গুরুচরণ সরকারের কাছে চার বছর লেখাপড়া শিখেছিলেন, এছাড়া ফার্সী শিখতেন মুন্সী আমিরুদ্দিনের কাছে, সংস্কৃত পড়তেন গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের টোলে। দশবছর বয়সে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় যান। প্রথমে তিনি মিঃ জে নামধারী এক ব্যক্তির কাছে ইংরাজি শিক্ষাগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পড়ানোর ধরন পছন্দ না হওয়ায় পরে মিশনারী পাদ্রীদের কাছে যান। মিশনারীদের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পাঠান। তখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ হার্ডম্যান জেফ্রয়। অক্ষয় কুমার বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কাছে গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান ও হিব্রু শেখেন। তাঁর মেধায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর শিক্ষক মিঃ জেফ্রয় তাঁকে ফিফ্‌থ ক্লাস থেকে ডবল প্রমোশন দিয়ে থার্ড ক্লাসে তুলে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে অক্ষয় কুমার বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে উপার্জনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করতে বাধ্য হন।

ছাত্রাবস্থাতেই অক্ষয় কুমার পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, সাধারণ বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। বিদ্যালয়ের পড়া ছাড়াও তিনি আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে বিভিন্ন বিষয় পড়তেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরিচয় হয় ও তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখতে শুরু করেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে লেখার জন্য উৎসাহ দিতেন এবং 1839 সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। অক্ষয় কুমার 'তত্ত্ব-বোধিনী সভার' একজন সভ্য হন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় তিনি পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল পড়াতেন। সেই সময় এই বিষয়গুলি পড়াবার মত উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক বাংলা ভাষায় ছিল না। এই অভাব দূর করার জন্য অক্ষয় কুমার পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল শেখার জন্য দুটি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন।

1842 সালে প্রসন্ন কুমার ঘোষের সহযোগিতায় তিনি 'বিদ্যাদর্শন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় চিন্তাভাবনা প্রকাশের উপযোগী করে তোলা। তিনি কিছুদিনের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার সহসচিব ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়িয়ায় স্থানান্তরিত করা হলে তিনি সেখানে গিয়ে পড়াতে অস্বীকার করেন। 1843 সালে তিনি নতুন প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হতে সম্মত হন। পাঁচজন সভ্য নিয়ে এই পত্রিকা পরিচালনা করার জন্য একটি সমিতি গঠন করা হয়। অক্ষয় কুমার দত্তও এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই সূত্রে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন। দীর্ঘ বারো বছর এই পত্রিকা সম্পাদনা করার পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন।

1843 সালে আরো অনেকের মত অক্ষয় কুমার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণে মনে হয় পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মধর্মে আস্থা হারিয়ে অজ্ঞাবাদী (agnostic) হয়ে যান। 1852 সালে কিছু লোকের সহায়তায় তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে হন তার সচিব। 1854 সালে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সভা' গঠিত হলে অক্ষয় কুমার হন এর যুগ্ম সচিব। এতে তিনি ছাড়া অন্যান্য উৎসাহী সভ্যদের মধ্যে ছিলেন—কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। এই সভা স্ত্রী শিক্ষা প্রসার, বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ নিরোধ ইত্যাদি সামাজিক সংস্কারমূলক কাজে মনোনিবেশ করে। 1855 সালে অক্ষয় কুমার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে মাসিক 25 টাকা বৃত্তি পেতেন। 1862 সালের পর তিনি নিজেই সেই বৃত্তি পরিত্যাগ করেন। জীবনের সায়াহ্ন কালে তিনি বালীতে আপন আবাসগৃহ নির্মাণ করেন এবং তার নাম দেন 'শোভনোদ্যান'।

বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় কুমারের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বেশ কিছু বিদগ্ধ রচনা লিখেছেন। তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' দুই খণ্ডে প্রকাশিত (1851, 1853), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দুই খণ্ডে প্রকাশিত (1870, 1883), 'পদার্থ বিদ্যা' (1856), 'ধর্মনীতি' (1856), এবং 'চারুপাঠ' তিন ভাগে প্রকাশিত (1853-1859) সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। যদিও 'বাহ্যবস্তু' এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' জর্জ কম্ব্ এবং উইলসন-এর রচনার অনুবাদ কিন্তু শেষোক্ত বইটিতে অক্ষয় কুমার অনেক নতুন মূল্যবান তথ্য ও পরিসংখ্যা যুক্ত করেছিলেন। বাংলায় বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনার উপযোগী নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করে অক্ষয় কুমার বাংলা ভাষায় নিজের অবদান রেখেছেন। সাধারণভাবে যুক্তিগ্রাহ্য গদ্য ভাষায় লিখলেও প্রয়োজনবোধে তিনি সাহিত্যিক ভাষাও ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উম্মোচন করে। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় নিয়মিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে তিনি বাঙ্গালীদের বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করে তোলেন। তাঁর এই উদ্যম ছিল বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার কাছে বহুলাংশে ঋণী।

ধর্ম সম্বন্ধে অক্ষয় কুমার যুক্তিবাদী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা বেদের অভ্রান্ততা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের মতকে খণ্ডন করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। দেবেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত অক্ষয় কুমারের যুক্তি সমর্থন করে তাঁর মতামত মেনে নেন। অক্ষয় কুমারের বিশ্বাস ছিল শুধু প্রার্থনাই যথেষ্ট নয়, ঈশ্বর লাভের জন্য উপযুক্ত সাধনা চাই। 'আত্মীয় সভায়' ধর্মের এই সব তত্ত্ব প্রায়ই আলোচনা করা হত। এই আলোচনা সভার বিশেষত্ব ছিল এই যে এখানে সদস্যদের মধ্যে ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নবীন বাংলার নতুন মানসিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল।

অক্ষয় কুমার খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার অভিযানের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন। মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লিখতে ও ভাষণ দিতে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে উৎসাহিত করেন। অক্ষয় কুমার সমাজ সংস্কারেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন। বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ ও মদ্যপানের তিনি বিরোধী ছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি তাঁর স্থাবর সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক দান করেন। শিক্ষাবিদ রূপে তাঁর নিজস্ব অভিমত ছিল এই যে মাতৃভাষা অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যম হবে। তিনি প্রাচীন পাঠক্রম বদলিয়ে যুগোপযোগী নতুন পাঠক্রম চালু করতে চেয়েছিলেন। তিনি তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারকে প্রত্যেক গ্রামে আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। গ্রামগুলিতে কৃষি ও কারিগরী বিদ্যা শেখার জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও তিনি সুপারিশ করেছিলেন। তিনি প্রতি গ্রামের জন্য একটি লাইব্রেরী ও অন্তত একটি বইয়ের দোকান চেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত তিনিও বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবী করেছিলেন। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। তিনি চার বৎসরের

প্রাথমিক শিক্ষা ও আট বা নয় বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষার পরেই তৃতীয় স্তরের উচ্চ শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন।

অক্ষয় কুমার উদ্ভিদ প্রেমিক ছিলেন। বালীতে তাঁর নিজের বাসভবনে দুর্লভ বৃক্ষচারার সংগ্রহ ছিল। বহু স্থান থেকে তিনি অর্কিড চারা সংগ্রহ করেছিলেন। উদ্ভিদের শরীর তত্ত্ব এবং ক্রিয়া পরিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন।

[মহেন্দ্রনাথ রায়— অক্ষয় কুমার দত্তর জীবন বৃত্তান্ত (1292 বঙ্গাব্দ) ; নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস—অক্ষয় চরিত (1294 বঙ্গাব্দ), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অক্ষয় কুমার দত্ত (সাহিত্য সাধক চরিতমালা) ; সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ; বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড 1963।]

(পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়) বিজিত কুমার দত্ত।

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১—১৯৩০)
Akshay Kumar Maitreya (1861—1930)

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তৎকালীন নদীয়া জেলার নগুয়াপাড়ার অধীনস্থ সিমলা গ্রামে 1861 সালের ১লা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশটি রোহিলাপটীর কুলীন হিসেবে পরিচিত। অক্ষয় কুমারের পিতা মথুরা নাথ মৈত্রেয় তৎকালীন নদীয়া (বর্তমানে কুষ্টিয়া, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) জেলার কুমারখালির ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মাতা সৌদামিনী দেবী। কুমারখালি গ্রামে অক্ষয় কুমারের শিক্ষারম্ভ হয় কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে। তাঁর স্কুলে ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ 1871 সালে উত্তর বাংলার রামপুর-বোয়ালিয়া স্কুলে। 1878 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দুই বৎসর পর রামপুর-বোয়ালিয়া কলেজের ছাত্র রূপে তিনি এফ. এ. পাশ করেন। এই রামপুর-বোয়ালিয়া স্কুল ও কলেজই বর্তমানের বিখ্যাত রাজশাহী স্কুল ও কলেজ। অক্ষয় কুমারের পিতা পরে সরকারী চাকুরীসূত্রে রাজশাহী-বাসী হয়েছিলেন এবং সেই সূত্রেই অক্ষয় কুমারের শিক্ষা জীবন কুমারখালি গ্রামের পর রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পনের ও এফ. এ. পরীক্ষায় কুড়ি টাকার বৃত্তি পেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসেবে 1883 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। 1885 সালে রাজশাহী কলেজ থেকে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ বছর থেকেই রাজশাহীতে ওকালতি আরম্ভ করেন। আমৃত্যু তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সঙ্গে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই হৃদয়কমল দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

বাল্যাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। বাল্যশিক্ষাগুরু কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা'র পরিচালনায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকালের রচনা প্রকাশিত হয় কুমারখালির 'গ্রামবার্তা' ও রাজশাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা'য়। বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাঁর যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগেও তিনি বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। কিন্তু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন ঐতিহাসিক রচনার জন্য। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইতিহাস লেখার পথপ্রদর্শক। 'সিরাজউদ্দৌলা' (1898) ও 'মীরকাশিম' (1906) নামক দুখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাংলার বিদ্বৎসমাজে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক রূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই গ্রন্থদুটিতে তিনি দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে ইংরেজগণ এই দুই ব্যক্তির চরিত্রে যে কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছেন তা ভ্রান্ত। তিনি প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারে যত্নবান হন এবং তাঁর গবেষণার ফলে সিরাজ ও মীরকাশিম সম্পর্কে তৎকালে প্রচলিত বহু ধারণা ও সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত 'সাধনা'য় অক্ষয় কুমারের 'সিরাজউদ্দৌলা'র প্রকাশ শুরু ও 'ভারতী'তে সমাপ্তি। সেই সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস চর্চা প্রসারের জন্য রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় 1899 সালে রাজশাহী থেকে 'ঐতিহাসিক চিত্র' ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা শুরু করেন। 1912 সালে 'গৌড়লেখমালা' (প্রথম স্তবক) গ্রন্থে বাংলার পালরাজাদের তাম্রশাসন ও শিলালিপি বাংলা অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। এর ফলে বাংলার ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার পথ সুগম হয়। এই গ্রন্থটি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শনও বটে। এছাড়াও অক্ষয় কুমার 'সমর সিংহ' (1883), 'সীতারাম রায়' (1898), 'ফিরিঙ্গী বণিক' (1922) ও 'অজ্ঞেয়বাদ' (সমালোচনা, 1928)—প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি 'প্রদীপ', 'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য',

'মানসী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'পৌণ্ড্রবর্ধন', 'রাণী ভবানী', 'বালি দ্বীপের হিন্দুরাজ্য' প্রভৃতি ও গৌড় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

1916 সালের 24 মার্চ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি হলে 'ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি' আহূত 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনী সত্য কিনা সেই সংক্রান্ত সভায় অক্ষয় কুমার তাঁর 'সিরাজউদ্দৌলা' গ্রন্থে উল্লিখিত প্রমাণাদি ব্যবহার করে এক ওজস্বিনী বক্তৃতায় এই কাহিনীকে মিথ্যা প্রমাণিত করেন। বহুদিন পর্যন্ত অন্ধকূপ হত্যা বিষয়ে তাঁর এই মতই সমীচীন বলে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য অতি আধুনিক কালে সমসাময়িক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান লেখকের বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে যে 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনী অতিরঞ্জন সত্ত্বেও ইংরেজ লেখকগণের সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত নয়।

1910 সালে দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎ কুমার রায় রাজশাহীতে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্য 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এই সমিতির কাজে শরৎ কুমারের প্রধান সহকারী এবং চিত্রশালার দ্রব্য সংগ্রহ ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতি হন। 1311 বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ-এর সভাপতি ও 1318 বঙ্গাব্দে বিশিষ্ট সদস্যপদে নির্বাচিত হন। 1915 সালে তিনি সরকার দ্বারা 'কৈসর-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক ও সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে পালরাজাগণের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ও স্বদেশানুরাগী ছিলেন। ক্রিকেট খেলা, শিল্পকলা ও রেশমশিল্প বিষয়েও তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। 1930 সালের 10 ফেব্রুয়ারী 70 বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

[ভারতকোষ (1ম খণ্ড) (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত) ; সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান (সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত) ; সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার) ; প্রজ্ঞাভারতী কর্তৃক প্রকাশিত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচিত 'ফিরিঙ্গী বণিক' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত সনৎ কুমার গুপ্ত লিখিত 'অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও বাংলা ইতিহাসের একদিক'।]

ঈষিতা চট্টোপাধ্যায়

অখণ্ডানন্দ ভিক্ষু (১৮৭৪—১৯৪২)
Akhandananda Bhikshu (1874—1942)

অখণ্ডানন্দ ভিক্ষুর (প্রকৃত নাম লাল্লুভাই থাক্কার) জন্ম গুজরাটের কয়রা জেলার বোরসাদে এক 'লোহানা' উচ্চবর্ণ পরিবারে। তাঁদের লোহালক্কড়, চীনামাটির বাসন ও খাদ্যশস্যের ব্যবসা ছিল। তাঁর পিতা জগজীবন থাক্কার এবং মাতা হরিবা। তিনি প্রথমে গ্রামের পাঠশালা ও পরে এক সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখলেও অব্যবহিত কাল পরেই বিদ্যালয় ছেড়ে পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগ দেন। তাঁর মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। তিনি প্রায়ই ধর্মসঙ্গীত-সভায় উপস্থিত থাকতেন এবং প্রায়শঃই বাড়িতে সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত মানুষদের আপ্যায়ন করতেন। মায়ের এই কার্যকলাপ শিশু সন্তানের ওপর নিশ্চিতভাবে গভীর ছাপ রেখেছিল। অখণ্ডানন্দ পরবর্তী জীবনে তুলসী দাস, নরসিং মেহতা ও মীরা বাঈর ভজন শুনে অবসর বিনোদন করতেন। 'যোগবাশিষ্ঠ' ও 'গীতা'র দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর 'একাদশ স্কন্ধ', 'অবধূত গীতা' এবং 'মহাকাব্যরত্নাবলী' ইত্যাদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সঙ্গেও সম্যক পরিচয় ছিল।

ভিক্ষু অখণ্ডানন্দ স্বামী রামতীর্থ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধাবান ছিলেন। শিক্ষাবিদ মোতি ভাই আমিন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন এবং পরবর্তী কালে তিনি অখণ্ডানন্দের প্রকাশিত রচনাবলী বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির জন্য কিনে তাঁর বক্তব্য প্রচারে সাহায্য করেন।

সাত কি আট বছর বয়সে কয়রা জেলার এক ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যা সদাবেনের সঙ্গে অখণ্ডানন্দের বিবাহ হয়। 1904 সালে তিনি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে আমেদাবাদে স্বামী শিবানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। এরপর তিনি হিমালয়ে হিন্দুদের পবিত্র ধর্মস্থানগুলি পরিদর্শন করেন এবং লক্ষ্ণৌতে স্বামী রামতীর্থের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করে স্বল্প সময়ের জন্য গুজরাটে ফিরে আসেন।

1907-1908 সালে অখণ্ডানন্দ বোম্বাইতে একটি বই কিনতে গিয়ে বইটির অত্যধিক মূল্য জেনে বিস্মিত হন। তারপর থেকেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ভাল বই সুলভ মূল্যে প্রকাশ করা যাতে সাহিত্যের ভাণ্ডার দরিদ্রদের কাছে উন্মুক্ত হতে পারে। যে প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়ে তোলেন তার নাম 'সস্তু সাহিত্য বর্ধক কার্যালয়'—যার অর্থ হল স্বল্পমূল্যে সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টার একটি প্রতিষ্ঠান। অখণ্ডানন্দ তাঁর অবশিষ্ট জীবন এই কাজেই নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর অক্লান্ত উৎসাহ ও নিষ্ঠায় এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রায় তিনশ বই প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই অর্থাৎ মাত্র 34 বৎসরের মধ্যেই সতেরো লক্ষ কপি বই বিক্রি হয়েছিল। সাধারণভাবে দেড় হাজার পৃষ্ঠার একটি বই-এর দাম ছিল দেড় টাকার মত। অখণ্ডানন্দ কেবল মাত্র গুজরাটী ভাষা জানতেন, সেহেতু তাঁর সব বই প্রকাশিত হয়েছিল মাতৃভাষা গুজরাটীতেই। 'সস্তু সাহিত্য' খুব শীঘ্রই গুজরাটে প্রতি ঘরে অত্যন্ত পরিচিত একটি শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। এই আন্দোলন গান্ধীজীর মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং যমুনালাল বাজাজ চেয়েছিলেন অখণ্ডানন্দ হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ কাজ করুন। কিন্তু হিন্দী ভাষায় উপযুক্ত পারদর্শিতা না থাকায় অখণ্ডানন্দ এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন নি।

অখণ্ডানন্দ সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারেও আগ্রহী ছিলেন এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও নারী-মুক্তির জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি বাল্য বিবাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মহৎ দাতা ছিলেন, একবার মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুরে হরিজন তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্মিত ধর্মশালাকে বৃহত্তর ও উন্নত করার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন।

স্বদেশীর গোঁড়া সমর্থক ভিক্ষু অখণ্ডানন্দ স্বদেশী সামগ্রী ব্যবহার করতেন এবং তাঁর সব বই-ই ছাপা হয়েছিল দেশী কাগজে। প্রথমদিকে তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে দর্শক রূপে উপস্থিত থাকতেন এবং দর্শকদের পশ্চাৎ সারির মধ্যে বসতেন। যখন পিছনে বসে কিছু শোনা অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন তিনি প্রতিনিধি রূপে অধিবেশনে যোগদান করেন। কিন্তু রাজনীতি কোন দিনই তাঁর মুখ্য আকর্ষণ ছিল না।

সুলভ প্রকাশনের মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার কাজেই অখণ্ডানন্দ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য সংকলনগুলি মূলতঃ ছিল ধর্মীয় বিষয়-কেন্দ্রিক, কিন্তু অন্যান্য জনশিক্ষামূলক বিষয় যেমন—পরিচ্ছন্নতা বা নারী ও শিশুদের সমস্যা সম্পর্কিত গ্রন্থও তাঁর সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর সংকলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চরিত্র গঠন। 'সস্তু সাহিত্য' পরিকল্পনার মাধ্যমে ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মভাবনা তিনি নামমাত্র মূল্যের বই-এর মাধ্যমে প্রকাশ করে তাকে সর্বজনের কাছে পেঁছে দেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রতিটি সাধারণ মানুষের মনে নিজের প্রতি ও নিজের সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের উপযোগী সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

[Sopan & Dave, Jyotindra,—Bhikshu Akhandanand : His Life & Work, Ahmedabad (1947), Guj.; Sadgat Swami Shri Akhandanandji na Patro, Ahmedabad (1947), Guj.; Ojha, Dhanavant,—Bhikshu Akandanand (A'bad, 1947), Guj.; Kumar, 1947 volume ; Akhandanand, Bhikshu,—Otpati, Sthiti ane Bhavishya.]

(কুমুদ প্রসন্ন) **অপর্ণা বসু**

অচ্যুত বলবন্ত কোলহাতকার (১৮৭৯—১৯৩১)
Achyut Balwant Kolhatkar (1879—1931)

1879 সালের 1 অগাস্ট মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার ওয়াই নামক স্থানে অচ্যুত বলবন্ত কোল-হাতকার (ঘনিষ্ঠদের মধ্যে 'সাহেব' নামে পরিচিত) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিতপাবন গোষ্ঠীর এক সুখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। ওয়াই স্থানটি সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান ও 'দাক্ষিণাত্যের বেনারস' নামে পরিচিত হয়েছিল। অচ্যুতের পিতামহ মহাদেও শাস্ত্রী কোলহাতকার ষড় দর্শনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন ও মধ্য বয়সে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করেন এবং কালক্রমে একজন শক্তিশালী মারাঠী লেখক ও অনুবাদক হয়ে ওঠেন। তাঁর বিশিষ্ট মারাঠী রচনার মধ্যে শেকস্‌পীয়ারের 'ওথেলো'র অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পিতা বামন রাও ছিলেন নাগপুরের সাব-জজ। তিনি ছিলেন প্রকৃতই একজন সমাজ সংস্কারক। তাঁর প্রথমা স্ত্রী কোলহাতকারের মাতা জানকীবাঈ-এর মৃত্যুর পর তিনি এক বিধবা

মহিলাকে বিবাহ করেন। এ সময় কোলহাতকারের বয়স মাত্র আড়াই বছর। তাঁর কাকা বলবন্ত রাও ও কাকীমা রক্ষাবাঈ অচ্যুতকে দত্তক সন্তান রূপে গ্রহণ করেন এবং এভাবেই তিনি অচ্যুত বলবন্ত কোলহাতকার নামে পরিচিতি লাভ করেন। অচ্যুতের পালক পিতা লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন এবং পুত্রকে তিনি সাংবাদিকতায় দীক্ষা দেন। এছাড়া তিনি সাঙ্গলি রাজ্যের এক সাব-জজও ছিলেন। এইভাবে কোলহাতকারেরা মহারাষ্ট্রের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির অনেক উপরের স্তরের মানুষ ছিলেন। কোলহাতকার বিবাহ করেছিলেন সাতারার আন্নাসাহেব দাণ্ডেকারের কন্যা অন্নপূর্ণাবাঈকে।

ওয়াই, সাতারা, পুণা ও বোম্বাইয়ে শিক্ষিত কোলহাতকার 1900 সালে স্নাতক ও 1904 সালে আইনে স্নাতক হন। সংস্কৃত, মারাঠী ও ইংরাজি সাহিত্যে জ্ঞানী কোলহাতকার সরকারী চাকুরী গ্রহণে তিন পুরুষের পারিবারিক প্রথা ভাঙ্গেন এবং তিলকের আদর্শের অনুগামী রূপে সাধারণের সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শৈশবে তিনি ধার্মিক ও আচারানুসারী ছিলেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ সমাজ সংস্কার ও উগ্রপন্থী রাজনৈতিক কার্যকলাপের এবং পরিশেষে ভারতের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমর্থক হয়ে ওঠেন। তিনি পশ্চিমী শিক্ষার ততটুকুই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন যা দেশপ্রেম ও আধুনিক জীবন যাত্রার বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করবে।

নাগপুরে থাকাকালীন যুবক কোলহাতকার 'দেশ সেবক' সাপ্তাহিকীতে নিজের পিতার আপোষপন্থী রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই পত্রিকায় প্ররোচনামূলক রচনা প্রকাশের জন্য তিনি আড়াই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। এর পরে তিনি কিছুকাল মাদ্রাজে আত্মগোপন করে থাকেন এবং ছদ্মনামের আড়ালে কয়েকটি মারাঠী পত্রিকায় বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন। 1912 সালে তিনি বোম্বাই আসেন এবং 'শ্রুতিবোধ' নামে ঋক্‌বেদের এক অনুবাদ শুরু করেন। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন ডি. এ. তুলজাপুরকার এবং আর. ডি. পটবর্ধন। তাঁরা 'উষা' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও চালাতেন। কিন্তু তাঁর সাংবাদিক জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য হল বন্ধ মারাঠী দৈনিক 'সন্দেশ' পুনরায় চালু করা। তাঁর জীবদ্দশাতেই অন্ততঃ ছয় বার এই পত্রিকাটি পুনরুজ্জীবিত হয়। 1914 সালে এই পত্রিকা চালু হয়। 1917 সালে এর ইংরাজি পরিপূরক রূপে আসে 'দি মেসেজ' পত্রিকা। 'দি মেসেজে'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন বি. এম. নিয়োগী যিনি পরে নাগপুর হাইকোর্টের বিচারপতি হন।

কোলহাতকার সাতাশটি দৈনিক ও সাপ্তাহিকী কাগজ খুলেছেন, বন্ধ করেছেন, ও তাতে কাজ করেছেন। তিনি বারটি নাটক ও সতেরোটি উপন্যাস লিখেছিলেন। তিনি বিদগ্ধ লেখক ছিলেন এবং নিজের রচনার কোন হিসেব রাখতেন না। কৌতুক এবং হাস্য বিদ্রূপাত্মক ও স্বচ্ছন্দ রচনার মাধ্যমে তিনি মারাঠী সাংবাদিকতার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন এবং সংবাদপত্রকে সাধারণের মনোরঞ্জন মাধ্যম এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, আন্তর্জাতিক ও আরো বহু প্রশ্নে সাধারণের শিক্ষা মাধ্যম করে তোলেন। গান্ধী অনুগামী কোলহাতকার একজন বিশিষ্ট কবিও ছিলেন এবং শেষ জীবনে তিনি তিনবার জেলে গিয়েছেন। বহুকাল পূর্বে আফ্রিকায় প্রবাসী তাঁর একমাত্র পুত্র কুসুমাকর পুণা বিশ্ব বিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে একটি বৃত্তির প্রচলন করেছেন।

[Vidyanidhi Siddheshwarshastri Chitrav—Arvacheena Charitrakosha, Poona, 1946 ; Shankar Ganesh Datar—Marathi Granth Soochi, Poona, 1961 ; Anant Hari Gadre—Achyutrao Kolhatkar Smarak Grantha, Bombay ; Ramchandra Govind Kanade—Marathi Niyatkalikacha Itihas, Bombay, 1938 ; Gangadhar Devrav Khanolkar—Arvacheena Marathi Wangmaya Sevak, Bombay, 1931 ; Balkrishna Sridhar Kolhatkar—Kolhatkar Kula Vrittanta, Poona, 1936 ; Chintaman Ganesh Kolhatkar—Bahuroopi, Bombay, 1957.]

(সি. বি. খেয়ারমোদয়) **টি. ভি. পারভাতে**

অচ্যুত সীতারাম পটবর্ধন (১৯০৫—১৯৭১)
Achyut Sitaram Patwardhan (1905– 1971)

অচ্যুত সীতারাম পটবর্ধন ওরফে ভাই অচ্যুত পটবর্ধন 1905 সালে 5 ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির সম্পূর্ণ নাম লেখার রীতির

বিশেষত্ব হল প্রথমে তাঁর নিজস্ব নাম পরে তাঁর পিতার নাম এবং সর্বশেষে তাঁর পরিবারের নাম বা পদবী লেখা, যেমন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। সাম্প্রতিক কালে অনেকে পিতার নাম ব্যতিরেকেই লিখতে শুরু করেন যেমন মধু লিমায়ে, বাল ঠাকারে এবং আরো অনেকে। অচ্যুত এই নতুন রীতিরই অনুগামী ছিলেন। ত্রিশ বছর আগে বামপন্থীদের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য 'ভাই' সম্বোধন প্রচলিত ছিল, যেমন ভাই ডাঙ্গে, ভাই রণদিভে ইত্যাদি। এইভাবে ভাই অচ্যুত পটবর্ধন নামটা ব্যবহার হতে শুরু হয়। সম্প্রতি এই 'ভাই' সম্বোধন প্রায়শই অপ্রচলিত।

অচ্যুতের পিতা হরি কেশব পটবর্ধন আহমদনগরে একজন বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ছয় পুত্রের মধ্যে অচ্যুত ছিলেন দ্বিতীয়। অচ্যুতের চার বৎসর বয়সে অবসর প্রাপ্ত সহ-শিক্ষা পরিদর্শক সীতারাম পটবর্ধন অচ্যুতকে পোষ্য রূপে গ্রহণ করেন। সীতারাম 1917 সালে মারা যাবার সময় অচ্যুতের জন্য প্রচুর সম্পত্তি রেখে যান। পটবর্ধনরা হলেন চিতপাবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতিভাবান গোষ্ঠী যাঁরা কোঙ্কন অঞ্চল থেকে মহারাষ্ট্রের প্রায় সব অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক ভদ্রলোক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিলেন।

আহমদনগরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে অচ্যুত বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন বেনারসের সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ থেকে। তাঁর বিষয় অর্থনীতিতে তিনি প্রথম শ্রেণী লাভ করেছিলেন। অচ্যুতের পিতা ও পালক পিতা দুজনেই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর জ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে ডঃ অ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত কলেজে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জি. এস. আরুন্ডেল, ডঃ অ্যানি বেসান্ত এবং অধ্যাপক তেলাঙ্-এর সান্নিধ্যে আসেন। তাঁদের প্রভাব তাঁকে অধ্যয়নশীল, চিন্তাবিদ ও সাধকভাবাপন্ন করে তোলে। সম্ভবতঃ এই প্রভাবেই তিনি সারাজীবন অকৃতদার রয়ে যান।

এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি 1932 সাল পর্যন্ত কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপনা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তিনবার ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণের সুযোগে বহু সমাজতান্ত্রিক নেতা ও বিদ্বজ্জনের সংস্পর্শে আসেন। তিনি কমিউনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন এবং 1932 সালে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এর পরবর্তী দশ বছরে তিনি বহুবার কারাবন্দী হয়েছিলেন।

সহকর্মী আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয় প্রকাশ নারায়ণ ও আরো অনেকের মত পটবর্ধনও কংগ্রেসকে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে চালিত করার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। 1934 সালে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা জেলের মধ্যেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের মধ্যে থেকে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া। 1936 সালে নেহেরু অচ্যুতকে কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিতে নিয়ে আসেন কিন্তু তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই পদত্যাগ করেন এবং তারপর থেকে কংগ্রেস কার্যকরী কমিটিতে যোগ দেবার জন্য নেহেরুর আমন্ত্রণকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। 1935 থেকে 1941 সালের মধ্যে তিনি যুব সম্প্রদায়কে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে 'শিবির' সংগঠিত করেন।

1942 সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তিনি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

1945-46 সালে তিনি আত্মগোপন করেন এবং গ্রেপ্তার এড়িয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিকল্প একটি সরকার গঠনের আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে সাতারা জেলায় পরিচালনা করেন। তারপর থেকে তিনি 'Satar-yacha Sinha' (সাতারার সিংহ) নামে পরিচিত হন। সন্ত্রাসবাদী কাজের মাধ্যমে এই বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের নাম ছিল 'পত্রি সরকার'। বিকল্প সরকারের কার্যকলাপের বিরোধী ও বাধাদানকারী সরকারী কর্মচারী এবং অন্যান্যরা যে কঠোর শাস্তি ভোগ করতো তাই ছিল 'পত্রি'। পত্রির ভয়াবহতা ও নির্মমতা বহু লোককেই অক্ষম ও পঙ্গু করে দিত। যে দলটি সরকারী দপ্তর, ট্রেন ও সরকারী অর্থভাণ্ডার লুঠ করত তাদের নেতা ছিল নানা পাতিল। এই বিকল্প সরকার এইভাবে লুঠের মাধ্যমে প্রায় লাখ টাকা সংগ্রহ করেছিল। এই দলের কিছু সদস্যের রাজনীতি বা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে কোনই সংশ্রব ছিল না। এই অন্দোলন গ্রামে ব্যাপক অনুপ্রবেশ করে এবং সেখানে সরকারী শাসন ব্যবস্থার কার্যতঃ অবসান ঘটায়।

এই আন্দোলনের কর্মীদের জামাকাপড় কেচে দিয়ে এবং তাঁদের খাবার রান্না করে দিয়ে অচ্যুত

ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের সেবা করেন। তাঁর সোস্যালিস্ট আদর্শের চেয়ে তাঁর বীরত্ব ও গোপন বিপ্লবী সংগঠন চালনার ক্ষমতা এবং পরিশেষে সাতারা জেলায় দু-বছরের জন্য বিকল্প সরকার গঠনের জন্য তিনি একজন জনপ্রিয় লোকনেতা হয়ে ওঠেন।

1934 সালের পর থেকে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বাৎসরিক অধিবেশন শুরু হয়। কিন্তু ক্রমশঃ অচ্যুত ও তাঁর সহকর্মীরা বুঝতে পারেন যে কংগ্রেসের ভিতরে থেকে সমাজতন্ত্রের ধারণার বিকাশ ঘটানো হবে একটি দুরূহ প্রচেষ্টা। 1947 সালে তাঁরা কংগ্রেসের বাইরে স্বতন্ত্র ভাবে সোস্যালিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া নামে একটি পৃথক দল গঠন করেন। 1950 সালে অচ্যুত রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে পুনরায় সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন এবং 1966 সাল পর্যন্ত সে কাজেই নিযুক্ত থাকেন। তারপর থেকে তিনি পুণাতে নিঃসঙ্গ অবসর জীবন যাপন করতে শুরু করেন। তিনি জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হওয়া বা চিঠিপত্রের যোগাযোগ বা পত্রালাপও পরিত্যাগ করেন। পটবর্ধন ভ্রাতারা সকলেই গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিলেন। অচ্যুত পোশাক পরিচ্ছদে ও আচার আচরণে ছিলেন সবসময়েই খুব সাদাসিধে। মারাঠী, হিন্দী ও ইংরাজি ভাষায় তাঁর বক্তৃতা ছিল খুবই আবেগধর্মী, সারবদ্ধ ও যুক্তিনির্ভর। তিনি সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটকে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তার একমাত্র পুস্তক 'The Communal Triangle of India' 1942 সালে অশোক মেহেতার সহযোগিতায় রচিত ও প্রকাশিত হয়।

[C.V. Bavadekar—Bharatneta Achyut Patwardhan, Bombay, 1948 ; S. R. Bivalkar— Nana Patil Charitra, Poona ; Vidyanidhi Siddheswarshastri Chitrav—Arvachin Charitra kosh, Poona, 1946 ; Acharya Narendra Deo—Socialism and the National Revolution, Bombay, 1946 ; P. P. Gokhale—Jagrit Satara, Satara, 1966 ; S. A. Joglekar, Y. G. Joshi and C. G. Karve (Eds.)—Maharashtra Parichaya, Poona, 1954 ; Ashok Mehta and Achyut Patwardhan— The Communal Triangle of India, Allahabad, 1942 ; Uttam Rao Patil and Abhasaheb Lad—Nana Patil, Aundh, 1947 ; Gajanan Kashinath Rayakar—Achyut Ani Aruna, Bombay ; Pandurang Shridhar Tillu—Sataracha Sinha ; Myron Weiner—Party Politics in India : The Development of Multi-Party System, Princeton, 1957 ; The Kesari (Marathi Weekly from Poona), 17 April 1917 ;

[1966 সালের নভেম্বর মাসে অচ্যুত পটবর্ধনের ভাই বাসুদেও হরি পটবর্ধনের সঙ্গে গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।]

(সি. বি. খেয়ারমোদয়) জি. ভি. কেটকার

অজয় ঘোষ (১৯০৯—১৯৬২)
Ajay Ghosh (1909—1962)

অজয় ঘোষ 1909 সালের 20 ফেব্রুয়ারী বাংলা-দেশে তাঁর মাতুলালয় মিহিজামে (অধুনা চিত্তরঞ্জন) জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ীর কাছেই প্রবহমানা অজয় নদীর নামানুসারে তাঁর নাম হয় 'অজয়'। তিনি তাঁর পিতা উত্তর প্রদেশের কানপুরের বিখ্যাত চিকিৎসক শচীন্দ্রনাথ ঘোষের তৃতীয় পুত্র সন্তান। তাঁর মাতার নাম সুধাংশুপ্রভা এবং তাঁরা তিন ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী। তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণায়। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নব-বিধান গোষ্ঠীর এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার।

কানপুরেই স্কুল ও কলেজের পড়াশুনা শেষ করে তিনি 1926 সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পড়াশুনা ও ফুটবল খেলা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি প্রাখর্য, বুদ্ধিমত্তা ও আগ্রহের পরিচয় দিয়েছিলেন।

1923 সালে তিনি প্রথম বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর প্রভাবে হিন্দুস্থান রিভোলিউ-শনারী অ্যাসোসিয়েশনে (পরে এর নামকরণ হয় হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন) যোগ দেন। এই সংঘ সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন। এদের প্রথম সারির নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতির সঙ্গেও অজয় পরিচিত হন। 1928 সালে লাহোরে স্ণ্ডার্স হত্যা এবং 1929 সালে সেণ্ট্রাল এ্যাসেম্বলীতে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় পুলিশ

এই দলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালায়। 1929 সালে অজয় ঘোষও গ্রেপ্তার হন এবং দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং ও অন্যান্যদের সঙ্গে একত্র অভিযুক্ত হন। জেলে বিচারাধীন থাকাকালীন তাঁরা বীরের মত দীর্ঘকালব্যাপী অনশন করে সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই মামলায় ভগৎ সিং ও অন্যান্যদের মৃত্যুদণ্ড হলেও উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে অজয় ঘোষ 1930 সালের অক্টোবর মাসে মুক্তি পান। 1929—30 সালে জেলে বন্দী অবস্থাতেই অজয় ঘোষ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং সোস্যালিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন। 1931 সালে মুক্তি পাবার পর তিনি দেখলেন তাঁর পুরনো দল ছত্রভঙ্গ এবং 1931 সালের মার্চ মাসে করাচী কংগ্রেসের প্রাক্কালে তাঁর সহকর্মীদের ফাঁসি হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে দায়বদ্ধ। কংগ্রেস সম্পর্কে এবার তিনি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হন। 'Bhagat Singh and His Comrades' বই-এ তিনি এই মনোভাব ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "কংগ্রেস নেতৃত্ব আমার বীতস্পৃহতাকে সম্পূর্ণ করে। সশস্ত্র বিপ্লব যদি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথ না হয় তাহলে বামপন্থী জাতীয়তাবাদও অপর কোন পথ প্রদর্শন করতে পারবে না"।

1931 সালে করাচীতে তিনি সুভাষচন্দ্র বসু, এম. এন. রায় ও মহারাষ্ট্রের কমিউনিস্ট নেতা শ্রীনিবাস সরদেশাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি লিখেছেন যে এই শেষোক্ত মানুষটি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। করাচী অধিবেশনের পর তিনি কানপুরের মজদুর সভার হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। অল্প কিছু সময়ের জন্য তিনি এম. এন. রায়ের দলেও যোগ দিয়েছিলেন। তিনি শীঘ্রই পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং সরদেশাইকে জেলে সঙ্গী রূপে পান। 1933 সালে মুক্তি পাবার পরই সরদেশাই আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য হন। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়াকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

1934 সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির এবং 1936 সালে এর পলিটব্যুরোর সভ্য হন। 1938 সালে তিনি পার্টির মুখপত্র 'দি ন্যাশনাল ফ্রণ্ট'-এর সম্পাদক মণ্ডলীতে যোগদান করেন। তাঁর সাবলীল লেখনী ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একজন সুদক্ষ সাংবাদিক এবং প্রচারবিদ্ রূপে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য অবিলম্বে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ফ্রণ্ট গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। দীর্ঘ কারাবাস ও প্রায়শই গোপন অনির্দিষ্ট জীবন তাঁর স্বাস্থ্যের উপর আঘাত হানে। 1941 সালে দেউলী ডিটেন্‌শান ক্যাম্পে অন্তরীণ থাকাকালীন তিনি যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হন এবং সরকার তাঁকে মুক্তি দেন। এরপরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন ও কিছুদিনের জন্য রাঁচীতে যান। এই সময়ে শারীরিক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রচুর পড়াশুনা করতেন এবং ভারতের জাতীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে লিখতেন।

1947 সালে ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার বিষয়ে সি. পি. আই. কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে যায়। ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনরায় নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের মত অজয় ঘোষও আত্মগোপন করেন ও পরে 1948 সাল থেকে 1949 সাল পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। 1950—51 সালে কমিউনিস্ট পার্টির নীতির পুনর্বিন্যাস করে এই আন্দোলনকে সাংবিধানিক ও আইনানুগ করার অন্যতম নেতা ছিলেন অজয় ঘোষ। 1951 সালে পার্টি কংগ্রেস তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত করে। 1962 সালের 11 জানুয়ারী হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী লুটু ঘোষ (যে মহিলাকে তিনি আত্মগোপন থাকাকালীন অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন) ও তাঁর অল্প বয়স্ক পুত্রকে রেখে যান। তাঁর বৃদ্ধা মাতা, এক ভ্রাতা ও এক ভগ্নীও তাঁর মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন।

দীর্ঘদেহী, দৃঢ় অথচ কৃশকায় অজয় ঘোষ একজন সরল স্বভাব, লাজুক ও অমায়িক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। একজন কমিউনিস্ট সাংবাদিক, রাজনৈতিক লেখক ও বুদ্ধিজীবী রূপে তিনি নিজের আদর্শের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে গেছেন। ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁর লেখনীর দখল ছিল। হিন্দী, উর্দু, বাংলা এই তিনটি ভাষাতেই তাঁর বাগ্মিতা ছিল। 1947 সাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদের বাস্তব রূপায়ণের প্রয়াসে

ব্রতী হয়েছিলেন এবং পরাধীন ভারতবর্ষে একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্ট গঠন করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি সোস্যালিজমের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। অবিভক্ত সি. পি. আই. দলের নেতাদের মধ্যে তিনি চীনা কমিউনিজমের প্রতি অবিশ্বাসী ও সোভিয়েত রাশিয়া প্রবর্তিত কমিউনিজমের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন।

(Ajay Ghosh—Articles and speeches, Publishing House for Oriental Literature, Moscow, 1962 ; Ajay Ghosh—The Communist Party of India in Struggle for Freedom and Democracy ; —Theories and Practice of the Socialist Party of India ; Some Questions of Party Policy, New Delhi, 1955 ; On the work of the Third Congress of the Communist Party of India, Madurai, New Delhi, 1954 ; Amritsar Congress of the Communist Party, New Delhi, 1958 ; হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ভারতের বিপ্লব কাহিনী (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ), কলকাতা, 1948 ; The New Age (Journal) ; অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন অজয় ঘোষের আত্মীয় শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশ ; প্রবন্ধ লেখকের নিজস্ব জ্ঞাতব্য তথ্য ।)

(পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়) গোপাল হালদার

অজিত প্রসাদ জৈন (১৯০২— ?)
Ajit Prasad Jain (1902— ?)

1902 সালে অজিত প্রসাদ জৈন মীরাটের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মৌ বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে তিনি অনার্স সহ স্নাতক হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি এল. এল. বি উপাধি লাভ করেন। 1926 সালে তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই অজিত প্রসাদ রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগদান করেন। 1930 সালে আইন অমান্য আন্দোলনে এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেস পরিচালিত সমস্ত আন্দোলনগুলিতেই তিনি অংশ নেন। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে শীঘ্রই তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি কংগ্রেসের উত্তরপ্রদেশ শাখার কার্যনির্বাহিক সমিতির একজন সদস্য হন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সচিবের দায়িত্ব লাভ করেন।

1937 সালে অজিত প্রসাদ জৈন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় নির্বাচিত হন এবং 1948 সাল পর্যন্ত এই সভার সদস্য থাকেন। 1937 সালে তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের সংসদীয় সচিব পদে নিযুক্ত হন এবং 1939 সালে মন্ত্রীসভা পদ ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত এই পদে থাকেন। দীর্ঘকাল তিনি অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। 1946 সালে তিনি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলী অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য হন এবং লোকসভারও সদস্য হন। 1951 সালে তিনি ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। 1954 সালের ডিসেম্বর থেকে 1959 সালের আগস্ট পর্যন্ত তিনি ছিলেন খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী। 1959 সালে এই পদে থাকাকালীন তিনি পদত্যাগ করেন।

1961 সালে তিনি উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 1956 সালের এপ্রিল থেকে 1966-র ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি কেরালার রাজ্যপাল ছিলেন। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভের জন্য প্রচার চালানর কারণে অজিত প্রসাদ রাজ্যপালের নিরপেক্ষ ভূমিকা সম্পর্কিত বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়েন। সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসার ইচ্ছা অজিত প্রসাদের ছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি রাজ্যপালের পদ ত্যাগ করেন। কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠীকে তিনি সমর্থন করতেন। এই গোষ্ঠীকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলার জন্য তিনি মোরারজী দেশাই-এর বিরোধী হন।

পরবর্তীকালে অজিত প্রসাদ রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। 1969 সালে কংগ্রেস বিভক্ত হলে সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন যদিও ইন্দিরা গান্ধীর গোষ্ঠীর প্রতি তিনি অনুগত ছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের আকর্ষণ কৃষি-বিষয়ে তিনি পুনরায় আগ্রহী হন এবং সেচ কমিশনের চেয়ার-ম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কমিশনের রিপোর্টটি একটি অসামান্য কীর্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

অজিত প্রসাদ জৈন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উত্তরপ্রদেশে জমিদারী বিলোপ সমিতি এবং আই. এ. এস. ও আই. পি. এস.

এর জন্য বিশেষ রিক্রুটমেণ্ট বোর্ডের সদস্য হন। উত্তরপ্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুলিশ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন অজিত প্রসাদ। তিনি উত্তরপ্রদেশে প্ল্যান প্রোজেক্ট্‌ অ্যাগ্রিকাল্‌চারাল্‌ টীমের নেতা ছিলেন।

সমসাময়িক বিষয়গুলির ওপর অসংখ্য রচনা ছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি হল ঃ 'U. P. Agrarian Laws', 'Rafi Ahmad Kidwai : Memoirs of His Life and Times', তিনি একজন বলিষ্ঠ লেখক ছিলেন।

[A. P. Jain—Rafi Ahmad Kidwai : A Memoir of His Life and Times, 1961 ; D. R. Toliwal—Bharatvarsh ki vibhutiyan, Nagpur, 1954 ; The Times of India Djrectory and Year Book (1963-64)]

কে. এল. শ্রীবাস্তব

অজিত সিং (সর্দার) (?—১৯৪৭)
Ajit Singh Sardar (?—1947)

সর্দার অজিত সিং পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার খাটকার কালান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু পরে তাঁরা পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলায় বান্‌গা গ্রামে চলে আসেন। তাঁর জন্মের সঠিক সাল তারিখ জানা যায় না। তিনি অর্জন সিং ও জয় কাউরের সন্তান এবং প্রখ্যাত পাঞ্জাবী শহীদ ভগৎ সিং-এর খুল্লতাত। তিনি জাঠ শিখ পরিবারভুক্ত ছিলেন। জলন্ধরের সাঁই দাস এ্যাংলো-স্যান্সক্রিট হাই স্কুলে তিনি শিক্ষা সম্পূর্ণ করে লাহোরের ডি. এ. ভি. কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পরে তিনি বেরিলীর আইন কলেজে যোগ দেন কিন্তু অসুস্থতার জন্য আইন শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি।

1907 সাল পর্যন্ত অজিত সিং রাজনীতির নেপথ্যে ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ভূমি রাজস্বের ও জলসেচ কর বাড়িয়ে দিলে ও নতুন ক্যানাল কলোনিস্‌ বিল প্রণয়ন করে দীর্ঘকাল ভারতীয় কৃষকরা যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছে তা থেকে তাদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করলে সর্দার অজিত সিং হঠাৎ পাদপ্রদীপের সামনে আসেন এবং লালা লাজপত রায় প্রমুখ নেতাদের সরকার-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। শৈশবে তিনি পিতার দেশপ্রেম ও বালগঙ্গাধর তিলকের ভাষণ ও রচনা দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। তিলকের বিখ্যাত ঘোষণা 'স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা অর্জন করবই'- অজিত সিং-এর কিশোর মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তী কালে লালা পিণ্ডি দাস, লাল চাঁদ ফালক এবং সুফি অম্বা প্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাঁকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর দুই ভাই কিষাণ সিং ও শরণ সিং বিপ্লবাত্মক কাজে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। মনে হয়, প্রথম জীবনেই কলকাতার চরমপন্থী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল এবং কিছু বাঙ্গালী নেতা প্রায়ই অজিত সিং-এর লাহোরের বাড়িতে আসতেন।

সর্দার অজিত সিং সুবক্তা ছিলেন। 1907 সালের 21 এপ্রিল তিনি রাওয়ালপিণ্ডির এক সভায় ব্রিটিশ সরকারের ভূমি রাজস্ব হার বৃদ্ধিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং কৃষকদের এই কর হ্রাস না হওয়া পর্যন্ত চাষ আবাদ বন্ধ রাখতে আহ্বান জানান। তাঁর ভাষণ এমনই উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে জনতা সরকারি বাড়িগুলিতে আগুন লাগাতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে ও লালা লাজপত রায়কে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে ছয় মাসের জন্য অন্তরীণ রাখেন। দ্বীপান্তর দণ্ড অজিত সিং-এর মনোবলকে এতটুকু ক্ষুন্ন করেনি। বরং তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে বিপ্লবাত্মক রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। সুফি অম্বা প্রসাদকে সম্পাদক করে তিনি 'পেশোয়া' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে এই পত্রিকা নিষিদ্ধ হলে সর্দার অজিত সিং 'ভারত মাতা', 'সহায়ক' ইত্যাদি অন্য নামের আড়ালে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলিও অব্যবহিত পরেই নিষিদ্ধ হয়। এই পুস্তিকাগুলি হল—Baghi Museah ; Muhabban—i—Watan ; Bandar Bant ; Ungli Pakarte Panja Pakara, Ghadar 1857, ইত্যাদি। অজিত সিং 'ভারতমাতা সোসাইটি' নামে একটি বিপ্লবী সমিতিও গঠন করেছিলেন। সৈয়দ হায়দার রিজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগেই ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল।

1908 সালে বিপিন চন্দ্র পালের কারামুক্তিতে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি লাহোরে একটি বিবৃতি দেন। এই জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সতর্ক করে দেন। কিন্তু সরকারের অসন্তোষ অগ্রাহ্য করে তিনি

সেই বছরের নভেম্বর মাসে ব্র্যাডল হলের ভাষণে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেন। সরকার তাঁর কার্যকলাপ বিপজ্জনক মনে করে অজিত সিং-কে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার বহু পূর্বেই তিনি পারস্যে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। সেখানে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ফার্সি ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পরে পারস্য থেকে তিনি রোমে চলে যান এবং সেখানকার একটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। রোম থেকে তিনি প্রথমে জেনেভা ও প্যারিসে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার রিও ডি জেনিওরোতে আসেন এবং সেখান থেকে সানফ্রান্সিসকোর 'গদর পার্টির' সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ইউরোপে ফিরে যান এবং ইটালিতে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করেন। ইটালির পতন হলে তিনি ইটালির জেলে বন্দী থাকেন। জার্মানীর পতন হলে তাঁকে জার্মান জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। যুদ্ধ শেষ হবার কিছু দিন পরে তিনি স্বদেশে ফিরে আসার অনুমতি পান। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই 1947 সালের 15 আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়। অন্তিম শয্যায় এই বীর বিপ্লবীর শেষ কথা কটি ছিল : "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কাজ সম্পূর্ণ, এবার আমি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি।"

রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্দার অজিত সিং বিপ্লববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল একমাত্র বিপ্লবের পথেই ভারতের স্বাধীনতা আসতে পারে। কংগ্রেস আন্দোলন তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি প্রায়ই বলতেন ; 'ভিক্ষা করে কেউ কিছু পায়না। নিজেদের সংঘবদ্ধ কর এবং যা প্রাপ্য তাকে জোর করে কেড়ে নাও।' ভারতের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করতেন। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি ভারতবাসীর নৈতিক অবনতির জন্য দায়ী বলে মনে করতেন। তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার, এবং নিরপেক্ষ। লালা লাজপত রায়ের মতে তিনি ছিলেন নাস্তিক।

[Gurmit Rahber and Krishen Chander Azad (Edited),—Shaheed-i-Azam Bhagat Singh aur Unka Khandan (in Urdu), Phagwara-1950 ; Chander Shekhar Shastri,—Bhartiya Antakwad Ka Itihas (in Hindi), Allahabad-1954 ; Satyapal and Probodh Chander.—Sixty Years of Congress : India Lost, India Regained, Lahore-1946 ; Rattan Lal Bansal, —Teen Krantikari Shaheed, Agra-1954 ; Specimens of Leaflets etc., relating to terrorist crimes and the eulogy of murder and murderers proscribed by local governments under Section 99-A, Criminal Procedure Code during 1931 ; Valentine Chirol,—Indian Unrest, 1910 , Lajpat Rai, —Arya Samraj : Michael O' Dwyer,—India As I Knew It (1885-1925), London-1925 ; R. C. Majumdar,—History of the Freedom Movement in India, Vol. II, Calcutta-1963 ; Interview with Nanak Chand Pandit, his class fellow in the college , Manuscript-loose papers found in the Punjab State Archives Patiala.]

(ডি. এল. দত্ত) ফৌজা সিং

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৯০—১৯৬৬)
Atulkrishna Ghosh (1890—1966)

1890 সালে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায় (অধুনা বাংলাদেশে) এতমামপুর জাদুবয়রা গ্রামে হিন্দু কায়স্থ মধ্যবিত্ত পরিবারে অতুলকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তারেশচন্দ্র ও মাতা বিনোদিনীর ছয়টি সন্তানের মধ্যে অগ্রজা ছিলেন কন্যা মেঘমালা। তিনি গণিতের খ্যাতনামা অধ্যাপক কে. পি. বসুর সহধর্মিনী ছিলেন। বাকী পাঁচটি ভাই-এর মধ্যে অতুলকৃষ্ণ ছিলেন চতুর্থ। সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরকৃষ্ণ অতুলকৃষ্ণের বৈপ্লবিক জীবনের যোগ্য সহকর্মীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান না হলেও তারেশচন্দ্র ও বিনোদিনীর পুত্রগণ পিতামাতার লক্ষ্যণীয় ঔদার্যগুণের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই অতুলকৃষ্ণকে পরবর্তী কালে যুগান্তর বৈপ্লবিক সংঘে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে সাহায্য করে। যতীন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়ের মত বিরল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রস্ফুটন ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর সাহায্য নিয়ে ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত এবং প্রভাবিত করে যতীন্দ্রনাথের জাতীয় বিদ্রোহ সংগঠন করার প্রচেষ্টা স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল।

যতীন্দ্রনাথ অতুলকৃষ্ণের গ্রামের কাছাকাছি কয়াতে বাস করতেন। নিকটবর্তী অঞ্চলের তরুণেরা তাঁর "মানুষ হও" আহ্বানে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও তারই গ্রামের প্রতিবেশী নলিনীকান্ত কর 1905 সালে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়েই তীব্রভাবে উদ্দীপ্ত হন এবং তৎক্ষণাৎ যতীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

অতুলকৃষ্ণ কলকাতা হিন্দু স্কুল থেকে এণ্ট্রাস (1909), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট (1911) এবং বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি. এস. সি. (1913) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বহরমপুর কলেজে প্রবেশ করার পর সেখানে দলকে আরও সংঘবদ্ধ করাই তাঁর কাজকর্মের লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় এবং এ কাজে তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থী থাকাকালীন তিনি 1915 সালের বিপ্লব অভিযানের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর কলেজ ও হস্টেল্ তখন বিপ্লবী সহকর্মীদের কেন্দ্র। এই উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে অতুলকৃষ্ণ আর পড়াশুনা শেষ করার উৎসাহ পেলেন না।

1906 সালে অতুলকৃষ্ণ 'অনুশীলন সমিতির' দেহচর্চা কেন্দ্রে যোগ দেন। এই কেন্দ্রই 'যুগান্তর' কর্মীদের বিপ্লবী দলের জন্য নতুন সভ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করতো। এখানে তিনি বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হন। যতীন্দ্রনাথ সে সময় আলিপুর বোমা মামলার পরিচালক পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেণ্ট সামসুল আলমকে হত্যা করার জন্য একজন দৃঢ়চেতা তরুণ বিপ্লবীর সন্ধানে ছিলেন। অতুলকৃষ্ণ যতীন্দ্রনাথের অনুগামী নাটোরের সতীশ সরকার বীরেন্দ্র নাথকে পুলিশ কর্মচারীটিকে চিনিয়ে দেন এবং বীরেন্দ্র নাথ অচিরেই কলকাতা হাই কোর্টের অভ্যন্তরে তাকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেন।

বীরেন্দ্র নাথ ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দেন। যতীন্দ্রনাথ সমেত ছেচল্লিশ জন ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। যতীন্দ্রনাথের মুক্তি লাভের পর অতুলকৃষ্ণ বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জার্মানীর সমরায়োজনের সংবাদ তাঁকে দেন। যতীন্দ্রনাথ এ ধরনের যে কোন পরিবেশের সুযোগ নিতে মনস্থ করেন। একটি সম্মিলিত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যতীন্দ্রনাথ অস্তিত্বরক্ষাকারী বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য অতুলকৃষ্ণকে নির্দেশ দেন। 1913 সালের দামোদর বন্যা ত্রাণ সংগঠন এমনই একটি সুযোগ এনে দেয়।

যুগান্তর দল সামগ্রিকভাবে যতীন্দ্রনাথকে তাঁদের সর্বাধিনায়ক মনোনীত করেন। দীর্ঘকাল ধরে বহু অর্থব্যয় ও বহু ঝুঁকি নিয়ে যে ঢাকা অনুশীলন গোষ্ঠীকে অতুলকৃষ্ণ সাহায্য করেছেন তাঁরা কিন্তু রক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণ করে পৃথক থাকেন। যাই হোক শচীন সান্যাল ও নগেন (গিরিজা) দত্তের মত এঁদের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কর্মী দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং অতুলকৃষ্ণের সাহায্যে পরিচিত হয়ে উত্তর ভারতে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে কাজ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় যখন আমেরিকা ও দূর প্রাচ্য হতে পাঞ্জাবী বিপ্লবীরা বাবা গুরুদিৎ সিং-এর নেতৃত্বে 'কোমাগাতা মারু' নামক একটি ভাড়া করা জাহাজে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বজবজে ব্রিটিশ সেনাদলের সঙ্গে সংঘর্ষে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন তখন সতীশ চক্রবর্তীর সহায়তায় অতুলকৃষ্ণ তাঁদের পাঞ্জাবে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেন। যখন পরিকল্পিত বিদ্রোহের জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন যতীন্দ্রনাথ বলপূর্বক অর্থের সংগ্রহ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ অনুমোদন করেন। গার্ডেনরিচের ট্যাক্সি ডাকাতি ও ইন্স্পেক্টর সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের হত্যার সাফল্যের পেছনে অতুলকৃষ্ণের সংকেত কাজ করেছিল।

সুন্দরবনে কিছু অস্ত্রভাণ্ডার রাখার পরিকল্পনা জার্মানীর ছিল এবং অতুলকৃষ্ণ নৌকা, রাইফেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে দিয়ে কিছু কর্মীকে সেখানে পাঠান। এই দলটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজনীয় সংকেত নিয়ে নির্দিষ্ট সময় পার করেও দিনের পর দিন অপেক্ষা করে। কিন্তু আমেরিকায় আত্মগোপনকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের কিছু চেকোশ্লোভাক বন্ধু তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সম্পূর্ণ গোপন পরিকল্পনাটি প্রকাশ হয়ে যায়। 'মাভেরিক' নামধারী ভাড়া করা জাহাজটি বিনা সমরোপকরণেই

সমুদ্রোপকূল ছেড়ে যায়। পুলিশ এবার অতি মাত্রায় সতর্ক হয়ে বিপ্লবীদের অনুসন্ধান শুরু করে। যতীন্দ্রনাথের গুপ্ত আবাসের সন্ধান মেলে। যতীন্দ্রনাথ তাঁর চার বিপ্লবী সহকর্মীর সঙ্গে বালেশ্বরে ব্রিটিশ সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করে মৃত্যু বরণ করেন।

1915 সালের প্রারম্ভে অতুলকৃষ্ণ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখার্জি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আত্মগোপন করেন এবং সাত বছর এভাবে কাটে। ফরাসী চন্দননগরে তিনি আশ্রয় পান। স্থানীয় পরিচিতেরা তাঁকে পূর্বাহ্ণেই প্রতিটি পুলিশী অভিযানের তথ্য সরবরাহ করতেন। এভাবেই তিনি নিজেকে ও নিজের সহকর্মীদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একবার তিনি অসুস্থ সহকর্মী চারু ঘোষকে নিজের কাঁধে বহন করে লাফিয়ে হাসপাতালের দেওয়াল পার হয়েছিলেন।

যুদ্ধশেষে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের ফেরারী আসামীদের বিরুদ্ধে শমন প্রত্যাহার করে নেবার বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির আলোচনা ফলপ্রসূ হয়। অতুলকৃষ্ণ কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে 1921 সালে আত্মপ্রকাশ করেন। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁর বৈপ্লবিক উত্তেজনায় এক বিরাট আঘাত হেনেছিল এবং তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে অপসৃত করেন। তবুও 1924 সালের জানুয়ারী মাসে যখন গোপীনাথ সাহা পুলিশ কমিশনার ভ্রমে আরনেষ্ট ডে-কে হত্যা করেন তখন 1818-র আইনের তৃতীয় ধারায় অতুলকৃষ্ণকে রাজবন্দী করা হয়। দু বছর পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর তিনি ব্যবসায়ে মন দেন এবং রাজনীতির সঙ্গে সকল সংশ্রব ত্যাগ করেন। 1926 সালে তিনি 24 পরগণার মজিলপুরের সুপরিচিত রক্ষিত পরিবারের কন্যা মেনকারাণীকে বিবাহ করেন, তাঁদের কোন সন্তান ছিল না। পরবর্তী জীবনে অতুলকৃষ্ণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। 1966 সালে তিনি প্রয়াত হন।

ঐকান্তিক উদার মতাবলম্বী অতুলকৃষ্ণ সব রকম জাতি ও ধর্মগত বিভেদকে ঘৃণা করতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার—তাঁর জীবনে এই দুটি আদর্শকেই তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মান জানিয়েছেন। শেষ জীবনে তিনি অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

(বিপ্লবী অতুলকৃষ্ণ ঘোষ— প্রকাশক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা, 1966 ; Sedition (Rowlatt) Committee Report, 1918) যাদুগোপাল মুখার্জি—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ; হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত—বিপ্লবী ভারতের কথা ; সুপ্রকাশ রায়— ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাস ; ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত— বিপ্লবের পদচিহ্ন।)

(পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়) **ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত**

অতুল চন্দ্র ঘোষ (১৮৮১-১৯৬১)
Atul Chandra Ghosh (1881-1961)

প্রখ্যাত কংগ্রেসী নেতা ও রাজনীতিবিদ অতুলচন্দ্র ঘোষের জন্ম 1881 সালের 2 মার্চ বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত হিন্দু কায়স্থ পরিবারে। তাঁর পিতা মাখনলাল ঘোষ শিক্ষক ছিলেন। অতি শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। প্রথমে তিনি তাঁর খুল্লতাত অযোধ্যার স্টেশনমাষ্টার হিতলালের কাছে মানুষ হন। পরে তাঁর মেসোমশায় যিনি পুরুলিয়াতে ওকালতি করতেন তিনি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্ধমানের মহারাজার হাইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স এবং বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে এফ্. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হন। 1904 সালে তিনি বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে অসফল হন। 1908 সালে সাতাশ বছর বয়সে তিনি পুরুলিয়া আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন এবং সেই বছরই পুরুলিয়া জেলা স্কুলের গ্রন্থাগারিক ও হিসাবরক্ষক অঘোরচন্দ্র রায়ের কন্যা লাবণ্যপ্রভাকে বিবাহ করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ ও চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

অতুলচন্দ্র 1921 সালে আইনব্যবসা পরিত্যাগ করে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরের দুই দশক তিনি বিশ্বস্তভাবে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কর্মসূচী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। বিহার প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সচিব (1921-35) ও সভাপতি (1935-47) রূপে তিনি মানভূম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর করেন। তিনি 1930 সালের ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে রাঁচীর টানা ভগতদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। 1930 সালের

10 এপ্রিল তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য গঠিত জেলা সত্যাগ্রহ সমিতির সচিব নিযুক্ত হন। নিষিদ্ধ লবণ জনসাধারণের কাছে বিক্রী করার সময় তিনি গ্রেপ্তার হন। পুনরায় 1932 সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য, 1942 সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করার জন্য এবং 1945 সালে 'জাতীয় সপ্তাহে' জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মানভূমে কংগ্রেসী সরকারের ভাষা সম্পর্কিত নীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে 1947 সালে তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন। সেই বছরই তিনি 'লোক সেবক সংঘ' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। প্রায় আট বছর তাঁর দল বিহার সরকারের শাসন, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। 1950 থেকে 1952 সালের মধ্যে অতুলচন্দ্র বহুবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। 1953 সাল থেকে লোক সেবক সংঘ টুসু গানের প্রচলন করেন। 'সার্চ-লাইটের' প্রাক্তন সম্পাদক মুরলী মনোহর প্রসাদের মতে 'এই গানগুলি বিহার, বিহার কংগ্রেস সরকার বিশেষতঃ জাতীয় ভাষা হিন্দীর বিরুদ্ধে উদ্ধৃত গালি-গালাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।' লোক সেবক সংঘ স্টেটস্ রিঅরগানাইজেশন কমিশনের (1953-55) কাছেও একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। নিরলস ও অধিক পরিশ্রমের ফলে অতুলচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং তাঁর মৃত্যুকে তরান্বিত করে। 1961 সালের 15 অক্টোবর তিনি তাঁর স্ত্রী দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে রেখে পরলোক গমন করেন।

সমগ্র পরিবারকে এক আদর্শ ও একই উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ হতে বিরল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অতুল-চন্দ্রের পরিবার একটা বিরল দৃষ্টান্ত ছিল। গান্ধীর মত অতুলচন্দ্রও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক কিশোরীলাল মসরুওয়ালা লিখেছেন অতুলচন্দ্র মানভূমের মানুষদের প্রাপ্য আদায় করার জন্য সংগ্রাম করে কোন সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আস্থাবান ছিলেন। 1948 সালের 19 সেপ্টেম্বর তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় লেখা একটি চিঠিতে এই আশা প্রকাশ করেন যে বাংলা ও বিহারের সীমান্ত বিরোধ পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়েই তার সমাধান খুঁজে পাবে। অতুলচন্দ্র সত্যাগ্রহ করেছিলেন শুধুমাত্র তখনই যখন দেখলেন বিহারের কংগ্রেসী সরকার সাধারণের উপর থেকে গমের শুল্ক প্রত্যাহার করতে অসম্মত হলেন ও রেশন ব্যবস্থা চালু করলেন। 1952 সালে নির্বাচনের পূর্বে তিনি প্রকাশ্যে লিখিত-ভাবে ঘোষণা করেন যে তাঁর দল গান্ধীজীর গণতন্ত্রের পরিকল্পনা, বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামে স্বায়ত্ত শাসন, পঞ্চায়েতী কাজ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কুটীর শিল্পের প্রসার এবং রাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি যেসব লক্ষ্য ছিল সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সর্বার্থক প্রয়াস করবে। মানভূমের জনসাধারণের তাঁর ওপর গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর জীবিতকালে লোক সেবক সংঘ বিহার ও পশ্চিমবাংলার বিধান-সভায় নির্বাচনে বহুকেন্দ্র থেকে জয়ী হয়।

[K. K. Dutta—History of the Freedom Movement in Bihar (3 volumes) ; প্রবাসী (বাংলা মাসিক পত্রিকা), বঙ্গাব্দ ১৩৫৫-৫৯ ; The Statesman, 16 October, 1961 ; লোক সেবক সংঘের সচিব অরুণ চন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণ]

(পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়) **ভকত প্রসাদ মজুমদার**

অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১—১৯৩৪)
Atul Prasad Sen (1871—1934)

1871 সালের 20 (মতান্তরে 25) অক্টোবর বাংলাদেশের অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার পঞ্চদরে মাতুলালয়ে। কবি ও দেশপ্রেমিক অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা রামপ্রসাদ সেন ঢাকার সুখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। মাতা হেমন্তশশী দেবী প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কালীনারায়ণ গুপ্তের কন্যা। কালী নারায়ণ একাধারে ধার্মিক, ভক্তিগীতির রচয়িতা ও সুকণ্ঠের অধিকারী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। অতুলপ্রসাদের পিতা যৌবনে কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। অতুলপ্রসাদ ঢাকা থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা ও কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যারিস্টারী পড়বার উদ্দেশ্যে ইংলন্ড যাত্রা করেন। 1895 সালে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কিছুদিন কলকাতা ও রংপুরে প্র্যাকটিশ করে শেষে লক্ষ্ণৌতে স্থায়ীভাবে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পরবর্তী-কালে অতুল প্রসাদ 1901 সালে ও 1930 সালে পুনরায় দুইবার বিলাত ভ্রমণ করেন। 1901 সালে স্যার কে. জি. গুপ্তের কন্যা হেমকুসুম দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

আউধ বার অ্যাসোসিয়েশন ও আউধ বার কাউন্সিলের নির্বাচিত সভাপতি অতুলপ্রসাদ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যে আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বিহারীলাল মিত্র, স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবী ও চারণ কবি রূপে অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল নেহেরু, মদন মোহন মালব্য, লাজপত রায়, তেজবাহাদুর সপ্রু, সি. ওয়াই. চিন্তামণি, মহাত্মা গান্ধী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ ভারত বিখ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের মধ্যে নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কলকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্তের (পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ) সান্নিধ্যে আসেন। অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার রূপে তিনি লর্ড এস. পি. সিংহের সঙ্গে কাজ করেন।

গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনে অতুলপ্রসাদ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও কুম্ভমেলার সময় তিনি ত্রাণকার্য্য সংগঠন করেন। শিক্ষাবিদের ভূমিকায় অতুলপ্রসাদ নিজগ্রামে ও লক্ষ্ণৌতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অতুলপ্রসাদ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 'সিটিং মেম্বার' রূপে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় বহু সংস্থা স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আহ্বায়ক ও লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রধান প্রচেষ্টক। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'এলাহাবাদ ল 'জার্নাল'-এর একাধারে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অতুলপ্রসাদ 'আউধ উইক্‌লি নোটস্' ও 'উত্তরা'র (বাংলা মাসিক পত্রিকা) মত উল্লেখযোগ্য প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখপত্রেরও সম্পাদক হয়েছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও অতুলপ্রসাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি মধ্যপন্থী কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই তাঁর কাম্য ছিল।

1905 সালে তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। 1905 সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বারানসী অধিবেশনে তিনি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সময় থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সকল অধিবেশনেই তিনি যোগদান করতে থাকেন। 1905 সালে তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখলের সংস্পর্শে আসেন এবং পরবর্তীকালে গোখলে প্রতিষ্ঠিত 'সারভেন্টস্ অফ ইন্ডিয়া' সোসাইটির সদস্য হন। উত্তরপ্রদেশের 'লিবারেল লীগেরও' তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 1923 সালে বারানসীতে প্রভিন্সিয়াল লিবারেল কনফারেন্স অতুলপ্রসাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙ্গালী জাতির কাছে অতুলপ্রসাদ বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকাররূপেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ অতুলপ্রসাদ বাংলাদেশের কিছু উৎকৃষ্ট ভক্তিগীতি ও দেশাত্মবোধক গানের রচয়িতা। এছাড়া বাংলা গানের ঐশ্বর্যময় জগতেও তিনি নিজস্ব অবদান রেখেছেন। অতুলপ্রসাদ প্রচলিত সুরের এক বিশেষ ঘরানা আজ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রামপ্রসাদী সঙ্গীতের মতই স্রষ্টার ঐতিহ্য বহন করে 'অতুলপ্রসাদী সঙ্গীত' রূপে সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাংলা কাব্যগীতের (সুরারোপিত কবিতা) মিলন সাধনই বাংলা সংস্কৃতিতে অতুলপ্রসাদের বিশিষ্ট অবদান। তাঁর কিছু গান ব্রহ্মসঙ্গীত সংগ্রহে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। সুগভীর বেদনা প্রকাশে, আধ্যাত্মিক আকুতিতে, বিরহ বেদনায় ও প্রকৃতি প্রেমে আপ্লুত অতুলপ্রসাদের কবিতা বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যপূর্ণ ভান্ডার রূপে বিবেচিত হবে। 'কয়েকটি গান' ও 'গীতিগুঞ্জ'-তে সংকলিত তাঁর কবিতা ও গান সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'কাকলী' গ্রন্থে নতুন করে স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হয়েছে।

অসাধারণ তীক্ষ্ণধী, শিল্প ও সঙ্গীতের ধারক ও বাহক, বিরল সৃজনীমূলক প্রতিভার অধিকারী, প্রতিভাবান, উদার মহত্ব ও ত্যাগের প্রতিভূ অতুলপ্রসাদ 1934 সালের 26 আগষ্ট পরলোকগমন করেন।

'আমাদের কথা'— কল্যাণী টাউন ক্লাব কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, (আগষ্ট—নভেম্বর 1966) ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত 'গীতিগুঞ্জ', কলিকাতা, 1356 সন (বাংলা) ; ভারতকোষ-1ম খণ্ড (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) ; 'অতুলপ্রসাদ সেন'—পুলিন বিহারী সেন, কলিকাতা ; 'অতুলপ্রসাদ'—মানসী মুখোপাধ্যায় ; 'আমারে এ আঁধারে'—কল্যাণ কুমার বসু, কলিকাতা, 1969 (অতুলপ্রসাদের জীবনী, তাঁর লেখা চিঠিপত্র ও অন্যান্য সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত)

(অমিয়া বরাট) ভবতোষ দত্ত

অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে (১৮৯১-১৯১০)
Ananta Lakshman Kanhere (1891-1910)

অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে 1910 সালে দেশের জন্য শহীদের মৃত্যু বরণ করলেও তিনি সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত অথবা স্বভাব-বিপ্লবী ছিলেন না। তরুণ স্কুলের ছাত্র রূপে তিনি তিলক, পরাঞ্জপে ও সাভারকারের উত্তপ্ত রচনাদির দ্বারা উজ্জীবিত হন এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আঘাত হানার কথা চিন্তা করেন।

চিতপাবন সম্প্রদায়ের কানহেরে ব্রাহ্মণরা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরি জেলার অধিবাসী ছিলেন। অনন্তের পিতা লক্ষ্মণ গোবিন্দ জীবিকার সন্ধানে ইন্দোর যান এবং অনন্তের শৈশব জীবন ইন্দোরেই কাটে। তাঁর দুই ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী ছিলেন। যাইহোক 1903 সালে অনন্ত তাঁর গৃহ ত্যাগ করে ঔরঙ্গাবাদে তাঁর মামা গোবিন্দ ভাস্কর বার্ভার কাছে যান বিশেষ করে ইংরেজী শেখার উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি দেহচর্চার অনুরাগী ছিলেন এবং স্থানীয় ব্যায়ামসমিতিতে তাঁর যাতায়াত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। 1885 সালে এর জন্মলগ্ন থেকেই ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভারতের শাসন ব্যবস্থায় বৃহত্তর অংশগ্রহণের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল যদিও সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তার কোন স্বীকৃতি ছিল না। সাধারণের মনে ক্রমশঃ এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আসছিল যে নিষ্ফল আবেদন নিবেদন অথবা ভিক্ষানীতির অনুসরণে দেশ কোনদিনই স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না, একমাত্র বৈপ্লবিক পথেই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। 'বিপ্লব' শব্দটির বিভিন্ন সংজ্ঞা ছিল। সাভারকার ও তাঁর অনুগামীগণ বিপ্লব বলতে চূড়ান্ত সন্ত্রাস-বাদকেই বুঝেছিলেন। তাঁদের প্রচার ছিল বিদ্রোহ এবং সংগ্রামই স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম।

1905 সালের বঙ্গবিভাগ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তকে ত্বরান্বিত করে এবং তরুণ ও যুবাগোষ্ঠী গুপ্ত সমিতি-গুলির মাধ্যমে নিজেদের সংঘটিত করতে শুরু করে। বিনায়ক সাভারকার ও গণেশ সাভারকার নাসিক শহরে 'অভিনব ভারত' নামে এ ধরনের একটি বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে তোলেন এবং বহু সদস্যকে আকৃষ্ট করেন। এরই একটি বিচ্ছিন্ন শাখারূপে কৃষ্ণ গণেশ কার্ভে 'মিত্র মেলা' সংস্থা গড়ে তোলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাভারকারেরা যতটা কথা বলেন কাজ ততটা করেন না।

সমগ্র মহারাষ্ট্রে 'অভিনব ভারত' বা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়ে; অস্ত্র সংগ্রহ, ব্রিটিশ সরকারী চাকুরিয়া, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন এবং সরকারী কাজকর্মের অবসান ঘটান ইত্যাদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ব্যায়াম সমিতি বা 'আখড়া' গুলিই ছিল রাজনৈতিক গুপ্ত প্রচারের কেন্দ্রস্থল এবং তরুণ কানহেরে এর প্রভাব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। কার্ভে গোষ্ঠীর অন্যতম গানু বৈদ্য কানহেরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন এবং তাঁকে গুপ্ত সমিতির কাজে দীক্ষিত করেন।

1909 সালে 'বাবা' ওরফে গণেশ সাভারকার রাজদ্রোহী রচনা মুদ্রিত করার অপরাধে আজীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হলে ক্রুদ্ধ বিপ্লবীরা সরকারকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। 1909 সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ এর প্রস্তুতি শুরু হয়। নাসিকের কালেক্টর জ্যাকসনকেই আক্রমণের লক্ষ্য করা করা হয়। জ্যাকসন ছিলেন প্রাচ্যবিদ্, গবেষক ও জনপ্রিয় সরকারী অফিসার। কিন্তু বিপ্লবীদের তখন ভালমন্দ বিচার করার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। তাঁদের কাছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মাত্রই ছিলেন বিদেশী শাসন ও যথেচ্ছাচারের প্রতীক। শুধু এ দিক দিয়েই জ্যাকসন বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধানতম বিরোধী শক্তি রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

অনন্ত কানহেরে স্বেচ্ছায় জেলা শাসককে হত্যা করার কাজে এগিয়ে এলে কার্ভে গোষ্ঠী সাভারকার সোসাইটির কাছ থেকে পিস্তল সংগ্রহ করেন এবং অনন্তকে দুটি পিস্তল দেওয়া হয়। 1909 সালের 21 ডিসেম্বর স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে এক মারাঠী নাটকের অভিনয় দেখতে জ্যাকসন আমন্ত্রিত হন। অনন্ত প্রবেশ পথে অপেক্ষা করছিলেন। জ্যাকসন প্রেক্ষা-গৃহে প্রবেশ করা মাত্র অনন্ত তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন। ঘটনাস্থলেই জ্যাকসনের মৃত্যু ঘটে। অনন্ত স্বেচ্ছায় ধরা দেন।

পুলিশি তৎপরতায় ও অনুসন্ধানে 'মিত্র মেলা' ও 'অভিনব ভারত সোসাইটি'র কার্যক্রম ও পরিকল্পনা উদ্ঘাটিত হয়। দুটি বিচার সংঘটিত হয়, একটিতে জ্যাকসনকে হত্যা করার অভিযোগে অনন্ত কানহেরে, কার্ভে ও দেশপাণ্ডের ফাঁসী হয়, অন্যটিতে রাজ-দ্রোহ ও রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র

সংগ্রহ করার জন্য সাতাশজন বিপ্লবী দণ্ডিত হন। এঁদের মধ্যে বিনায়ক সাভারকারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরই ছিল কঠোরতম দণ্ড।

1910 সালের 11 এপ্রিল অনন্ত কানহেরেকে থানা জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর মত তরুণ বিপ্লবীর পক্ষে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার ওপর সুস্পষ্ট কোন মতাদর্শ গড়ে তোলা সম্ভবপর ছিল না—তবু দেশকে ভালবেসে স্বাধীনতার বেদীমূলে তিনি স্বেচ্ছায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

[Material for a History of the Freedom Movement in India (Bombay Records) Vol. II, pp. 365, 540 ; Sedition Committee Report (1918) ; M. V. Bhat—Abhinav Bharat, 1950 ; V. S, Joshi—Mrityunjayache Atmayadna, 1951 ; Valentine Chirol—Indian Unrest.]

(সি. বি. খেয়ারমোদয়) ভি. জি. দিঘে

অনন্তলাল সিংহ (১৯০৩-১৯৭৯)
Anantalal Sinha (1903-1979)

অনন্তলাল সিংহ ১৯০৩ সনের (৩রা ডিসেম্বর) চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোলাপ সিংহ ছিলেন আইনজীবী। তাদের পৈতৃক বাসভূমি ছিল উত্তরপ্রদেশের আগ্রা অঞ্চলে। অনন্তলালের ঠাকুরদাদা বাংলায় এসেছিলেন খুবই যুবক বয়সে। তিনি চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

শৈশবাবস্থা থেকেই অনন্তলাল খেলাধূলায় খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং বহু খেলায় নিজের পারদর্শিতাও দেখিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে যখন তিনি নিতান্ত স্কুলের ছাত্র তখনই তিনি বৈপ্লবিক দলে যোগদান করেন এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক প্রবাদ পুরুষ সূর্য্য সেনের (মাষ্টারদা) সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে অনন্তলাল বৈপ্লবিক দলে যোগদান করে প্রতি কাজে ও আচরণে দেখিয়েছেন অদম্য সাহস, উদ্যমশীলতা এবং সংগঠন দক্ষতা। কোনও রকম সহযোগিতা ছাড়াই অতি সঙ্গোপনে অনন্তলাল বন্দুকের টোটা ও রিভলভারের কার্তুজ তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করেন। হাতে তৈরি বোমার জন্যেও তিনি এক বিশেষ ধরনের জ্বালানীর ব্যবহার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সেই সময়ে যে কোনও বিপ্লবী দলের কর্মীর পক্ষেই এই গুণটি ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়।

১৯২১ সনের গয়া কংগ্রেসে যখন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং স্কুল কলেজ প্রভৃতি বয়কটের আদেশ জারি করে সেই সময় অনন্তলালের নেতৃত্বে বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম জেলার মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কংগ্রেসে যোগদান করে। চট্টগ্রাম জেলায় এই ছিল প্রথম বিদ্যালয় বয়কটের ঘটনা।

এর অল্পকাল পরেই ১৯২২ সনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রশমিত হলে অনন্তলাল তাঁর দলের মধ্যে, ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমুচিত জবাব দেবার জন্য বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীর প্রসারের জন্য ভীষণ চাপের সৃষ্টি করেন। এর ফলে ঐ অঞ্চলে বহু ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

1923 সনের ডিসেম্বর মাসে অনন্তলাল সিংহের নেতৃত্বে এক দুর্দ্ধর্ষ বৈপ্লবিক দল Assam Bengal Railway Company তে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির অভিযান চালায়। বলা বাহুল্য লুণ্ঠিত সমস্ত অর্থই স্বাভাবিকভাবে দলীয় অস্ত্র সংগ্রহে ব্যয়িত হয়।

এই ঘটনায় স্থানীয় পুলিশের সন্দেহের দৃষ্টি পড়ে অনন্তলালের ওপরে। ফলে শহরের অনতিদূরে সুলুকবাহার নামক একটি নির্জন অঞ্চলে একটি সাধারণ ঘর ভাড়া করে সূর্য্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে বিপ্লবী দলের যুবকেরা বাস করতে শুরু করেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিশ এই বাড়ীটির সংবাদ সংগ্রহ করে এবং একদিন সশস্ত্র পুলিশ বাড়ীটি ঘেরাও করে। কিন্তু অকুতোভয় অনন্তলাল তাঁর সঙ্গীদের অসীম সাহসে উৎসাহিত করে পুলিশদলকে আক্রমণ করেন এবং পুলিশ ব্যূহ ভেদ করে কৃতিত্বের সঙ্গে কয়েক মাইল দূরে পার্বত্য এলাকায় পলায়ন করেন। পুলিশ পুনর্বার পাহাড় অঞ্চলটিতে ঘেরাও এবং আক্রমণ সত্ত্বেও এবারও পুলিশ বাহিনী অনন্তলালকে তাদের আয়ত্তে আনতে পারল না। অনন্তলাল তখন সন্দীপ হয়ে কলকাতায়।

কয়েকমাস পরে অনন্তলাল অকস্মাৎ কলকাতায় বাগবাজারের ফেরী ঘাটে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হলেন। যাই হোক অনন্তলাল অল্পদিনের মধ্যেই বিচারে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে গেলেন।

বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশে বিশেষভাবে এই বৈপ্লবিক দলগুলির হিংসাত্মক কার্যাবলীর তাড়নায়

একেবারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। 1924 সনের অক্টোবর মাসে তাই কোনরকম বিচার ছাড়াই সরকার যেখানে কোনরকম বিপ্লবের সন্দেহসূচক কিছু দেখা গেছে সেখানেই দলে দলে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী করেছে। অনন্তলাল এইবার দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন এবং আগামী চারটি বছরের জন্য কারারুদ্ধ হলেন।

1928 সনে অনন্তলাল মুক্তি পেলেন এবং নতুন-ভাবে তাঁর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অভিযান শুরু করলেন। প্রধানতঃ তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে বৈপ্লবিক সংস্থাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হলো। জেলার আনাচে-কানাচে সমস্ত জায়গায় শরীর গঠনের জন্য ব্যায়াম সমিতি তৈরী করা হলো। এই সংগঠন বা সমিতিগুলো থেকেই বাছা বাছা ভাল ছেলেদের পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচন করে বিপ্লবী দলে নিয়ে নেওয়া হত।

1929 সনে তাই চট্টগ্রাম জেলায় সর্বাপেক্ষা শক্তি-শালী বিপ্লবপন্থী যুবক ছাত্র ও নারী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। যুবছাত্র দলে এই সংস্থাগুলি প্রেরিত ছাত্ররা যোগদান করাতে চারিদিকে বিপ্লবের আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল। সংগঠন নৈপুণ্যে অনন্তলাল সিংহের দক্ষতা অনস্বীকার্য্য ও সর্বজনবিদিত। ঐ বছরই সূর্য্যসেনের নেতৃত্বে কংগ্রেস দলকেও শক্তিশালী করে পুনর্গঠন করা হয়।

চট্টগ্রামে দলের দিক থেকে যে সামরিক উত্থানের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল 1930 সালের 18ই এপ্রিলের আগে তার রূপায়ণ বাস্তবায়িত না হলেও প্রস্তুতি পর্বে অনন্তলালের দুর্দমনীয় আন্তরিকতা, অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সংগঠন শক্তি বৃটিশ শক্তিকে বারে বারে আঘাত হেনেছে যার তুলনা সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে বিরল। 18ই এপ্রিলের সশস্ত্র অভ্যুত্থান বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়।

বিরাট সৈন্যবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ছোট ছোট ভাগে সমস্ত চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ার দরুন অনন্ত-লাল সেখানে নিরাপত্তার অভাব দেখে অসম্ভব রকমের সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজের জীবনকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ছাড়িয়ে নেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। অবশেষে কলকাতা থেকে অনতিদূরে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে অনন্তলাল নিজের নিরাপত্তার আশ্রয়টুকু খুঁজে পেলেন।

1930 সনে জুনের প্রথম দিকে ঘোষণা করা হলো যে আগামী জুলাই মাসে চট্টগ্রামে ধৃত অনন্তলালের সহযোগী ত্রিশটি যুবকের বিচার শুরু হবে। অনন্ত-লাল জানতেন এ বিচার নিশ্চিত ফাঁসির রায় এবং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর পলায়নের বলি হবে এই ত্রিশটি প্রাণ। 28শে জুন তিনি স্বয়ং সিক্রেট পুলিশের কেন্দ্রীয় অফিসে ধরা দিলেন এবং তাঁকে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় কলকাতা পুলিশ চট্টগ্রামে প্রেরণ করল।

ঘটনার পরিণতি সম্বন্ধে বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনন্তলালের কোনপ্রকার ভাবাবেগ বা দুশ্চিন্তা ছিল না। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি নিজেই বন্দী অবস্থায় মামলা চালাতে শুরু করলেন।

স্বাভাবিকভাবে যা প্রাপ্য শাস্তি তা গ্রহণ করতে অনন্তলাল অস্বীকৃত হলেন।

অভিযুক্তদের বিচার চলাকালীনই, নিঃসন্দেহে অনন্তলালের উপদেশে জেলের প্রাচীরের পার্শ্বদেশে বিরাটভাবে এক বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। জেলের প্রহরী রক্ষক প্রভৃতি সকলের চোখে ধূলো দিয়ে অতি নিপুণভাবে এ কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করা হলেও বিপ্লবীরা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেলের প্রাচীর উড়িয়ে দিয়ে সমস্ত বিপ্লবীদের মুক্তি দান। অনন্তলালের উদ্দেশ্য ছিল ডিনা-মাইট ও হাতে তৈরী ''ল্যাণ্ড-মাইন'' দিয়ে সমস্ত জেল, পুলিশ পিকেট ইত্যাদি ধ্বংস করে দেওয়া।

অসম্ভব গঠন নৈপুণ্য, অতুলনীয় বুদ্ধি চাতুর্য্য বিপ্লবীদের ইতিহাসে অনন্তলালকে চিহ্নিত করেছে প্রথম সারির নেতা হিসাবে। ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম রিপাবলিকান আর্মি গঠনের অনন্তলালের কৃতিত্ব সর্বাধিক উল্লেখ্য। হিন্দু, মুসলীম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ঘরে ঘরে অনন্তলালের নাম সর্বসময় উচ্চারিত হতো। বহু গল্প, কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা কিছু ভিত্তি-হীন, কিছু বা অবিশ্বাস্য সদা সর্বদা সকলের মুখে অনন্তলালকে নিয়ে প্রচারিত হত।

1932 সনে বিচারে অনন্তলালকে যাবজ্জীবন আন্দামানে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

1946 সনের শেষার্ধে জেল থেকে তিনি মুক্তি পান।

চট্টগ্রাম উত্থানের বিষয় নিয়ে অনন্তলাল তিনখানা এবং মহাবিপ্লবী সূর্য্যসেন সম্পর্কে একখানি পুস্তক রচনা করেন। পাঠক সাধারণের কাছে বইগুলি অসাধারণ সমাদর লাভ করেছে।

স্বাধীনতার পরে অনন্তলাল সম্পূর্ণভাবে দেশের রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। একাধিক ব্যাঙ্ক ডাকাতির অভিযোগক্রমে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে কয়েক বছর (1969-77) জেলে বন্দী থাকেন। এই সময় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থতার কারণে মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে তিনি মুক্তিলাভ করলেও বিপ্লব সাধনায় উৎসর্গিত প্রাণ এই সাহসী নায়ক 1979 সালের 25 জানুয়ারী প্রাণ ত্যাগ করেন।

অনন্তলাল সমস্ত ভারতবাসীর কাছেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

[R, C: Mazumdar—History of the Freedom Movement in India Vol. III, Calcutta—1963 ; Anand Prasad Gupta—Chhattagram Vidroher Kahini, Calcutta—1948 ; Kamala Das Gupta—Swadhinata Sangrame Banglar Nari, Calcutta 1370 B. S. ; The Amrita Bazar Patrika, 20 April, 24-25 July 1930 and 4-5 Feb 1932 ; The Hindustan Standard, 7 June 1961 to 31 May 1962 ; The Basumati—(Bengali Weekly) 27 January 1966 to 23rd March 1967 (12th Magh 1373 B. S., 17 Agrahayan to 27 Chaitra 1373 B, S ; Personal Interview of the Research fellow with Anantalal Sinha in Sept. 1966 ; Personal knowledge of the contributor, a close associate of Anantalal Sinha.]

(অমিয়া বরাট) **গণেশ ঘোষ**

অনাথবন্ধু গুহ (১৮৪৭-১৯২৭)
Anathbandhu Guha (1847-1927)

অনাথবন্ধু গুহের জন্ম পূর্ববাংলার ময়মনসিংহের এক মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে। ময়মনসিংহ এবং কলকাতায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি.এ. ও বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আদালতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আইনজীবী রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি 'ভারত মিহির' নামে বাংলায় একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশ করার জন্য অবকাশ খুঁজে নিয়েছিলেন। অনাথবন্ধু একজন নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। অশ্বিনী কুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আব্দুল রসুল, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, আনন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি সমসাময়িক স্বদেশী নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশ অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত না হলে ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভবপর নয়। তবু তিনি অন্ধ ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি ইংরেজী সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার সমর্থক ছিলেন। তিনি চাইতেন যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংবিধান সম্মত ও অহিংস হোক।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অনাথবন্ধু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 1905 সালের 7 অগাস্ট বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জন করার যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল তাতে তাঁর সমর্থন ছিল। 1906 সালে আব্দুল রসুলের নেতৃত্বে বরিশালে যে প্রাদেশিক অধিবেশন সংঘটিত হয় তিনি তার অন্যতম প্রধান ছিলেন। এই অধিবেশন স্বদেশী আন্দোলনের সুতীব্র উম্মাদনাকে প্রকাশ করেছিল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ করে স্যার বি. ফুলারন-এর দেওয়া আদেশের প্রতিবাদে যে বিরাট মিছিল বার হয় অনাথবন্ধু তাতে যোগ দিয়েছিলেন। বরিশালে পুলিশের তদানীন্তন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ কেম্প-এর আদেশে পুলিশ এই মিছিলের ওপরে নির্মমভাবে লাঠি চালনা করে এবং মিছিলে অংশগ্রহণকারী অনেকেই আহত হন। অনাথবন্ধু নিজে অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। পরে তিনি অন্যদের সঙ্গে আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষা করেন এবং তাদের পুলিশ থানায় নিয়ে পুলিশের কাছেই পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ডায়েরী করেন। তাঁর বহু ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মত অনাথবন্ধু একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব ধ্যান ধারণা মত শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি তাঁর মাতৃভূমির সেবা করে গেছেন।

[যোগেশচন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলকাতা, 1367 বঙ্গাব্দ ; Surendranath Banerjea—A Nation in Making, 1925 ; Paramananda Dutt—Memoirs of Motilal Ghose, Calcutta, 1935 ; Haridas and Uma Mukherjee—India's Fight for Freedom, Calcutta, 1958 ; মাসিক বসুমতী, চৈত্র, 1357 বঙ্গাব্দ।]

(পি. এন. ব্যানার্জী) **কে. সি. চৌধুরী**

অনিল বরণ রায় (১৯০১-১৯৫২)
Anil Baran Ray (1901-1952)

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার বিয়ারা গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে 1901 সালে অনিল বরণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অরুণ চন্দ্র রায় ছিলেন সরকারী চাকুরে। অনিল বরণরা ছিলেন চার ভাই ও দুই বোন। ঢাকা স্কুলের কৃতী ছাত্র অনিল বরণ 1916 সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করে 1922 সালে তিনি ইংরেজীতে এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি আইন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। কিন্তু আদালতে যোগ দেবার যোগ্যতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত আইনকে পেশা হিসাবে তিনি নিতে পারেন নি। আইন ব্যবসায়ের পরিবর্তে তিনি দেশ ও সমাজ সেবামূলক কাজকর্মকে বেছে নিলেন তাঁর দায়িত্ব হিসেবে। রাজনৈতিক মন্ত্র ও আদর্শের দিক থেকে সমভাবাপন্ন লীলা নাগকে 1939 সালে অনিল বরণ বিবাহ করেন। জীবনের বিকাশকালে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী এবং উপনিষদের নানা শিক্ষা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের রচনা বিশদভাবে পড়ে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁর লেখাপড়ার বিষয় ছিল বিভিন্ন রকম : ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি।

বাল্যকাল থেকেই অনিল বরণের অন্তরে ছিল গভীর দেশভক্তি। একমাত্র বৈপ্লবিক পথই জাতীয় উন্নতি ঘটাতে পারে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। 'শ্রী সংঘ' (1921) নামে পরিচিত সংস্থা স্থাপনের তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। এই সংঘই পরে ঢাকা শহরে এক শক্তিশালী সংগঠন রূপে প্রচণ্ড খ্যাতি অর্জন করে। এই সংঘের মাধ্যমে বহু উঠ্তি রাজনৈতিক নেতা প্রশিক্ষণ লাভ করেন। 1925 সালে লীলা নাগ এই দলে যোগ দেন। 1928 সালে অনিল বরণ লীলা নাগ, ললিত বর্মণ, অনিল ঘোষ, রেবতী বর্মন এবং ডঃ শৈলেশ রায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে সোস্যালিষ্ট ডেমোক্র্যাটিক পার্টি স্থাপন করেন। কিন্তু 1930 সালে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ পুনরায় আরম্ভ হলে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীর মতই তাঁকে আটক থাকতে হয় প্রায় 1938 সাল পর্যন্ত। এই সময়ে বহু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মী মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ঐ একই সময়ে অনিল বরণ নিজেও মার্কসবাদ নিয়ে যথেষ্ট চর্চা করেন। কিন্তু মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে বিভিন্ন শক্তি সহযোগিতায় যে কোন সামাজিক বিবর্তন গতিশীলতা অর্জন করে। একজন সমাজবাদীরূপে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এই ভেবে যে সমাজতন্ত্রের সাথে জড়ত্ববাদের কোন ন্যায়গত বা আপাত সম্পর্ক নেই। বরং অনিল বরণের মতে জীবনের মধ্যে রয়েছে এক লক্ষ্যণীয় একতার ছন্দ যার প্রত্যেকটি অঙ্গই যান্ত্রিক কার্য প্রসূত। 1931 সালে কমিউনিষ্ট দলের সঙ্গে বোঝাপড়া এবং মত বিনিময়ের সময় অনিল বরণ এমনি ধরনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এই প্রথম তিনি আদর্শগত প্রতিরোধ তুলে ধরেন কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এবং মার্কসীয় শিক্ষার অসম্পূর্ণতার প্রতি তাঁর সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

1938 সালে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে অনিল বরণ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহকারী হয়ে ওঠেন। 1940 সালে ফরওয়ার্ড ব্লক দলে যোগ দেন তিনি। 1941 সালে সুভাষ বসু ভারত থেকে নিরুদ্দেশ হলে, অনিল বরণ এবং লীলা রায় ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্য সংগঠনের উদ্দেশ্যে সারা উত্তর ভারত সফর করেন। 1941 সালে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং 1946 সাল পর্যন্ত কারাগারে আটক থাকেন। মুক্তি লাভের পর ঢাকা, কলকাতা ও নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হলে অনিল বরণ ঐসব এলাকায় ত্রাণ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 1947 সালে ফরওয়ার্ড ব্লক ভারত বিভাগের বিরোধিতা করলে, অনিল বরণও পূর্ববঙ্গে অনুরূপ কারণে তীব্র জনমত গড়ে তোলেন ; ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক নির্যাতনের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সপক্ষে আন্দোলন চালান। পরে ফরওয়ার্ড ব্লক বিভক্ত হলে অনিল বরণ সুভাষবাদীদের সমর্থন করেন। 1952 সালে লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা আর বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। 1952 সালের 6 জানুয়ারী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে অনিল বরণ রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে সুনীল দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

অনিল বরণ রায়কে একাধারে রাজনীতিবিদ্, মনীষী এবং দার্শনিক বলে বর্ণনা করা হয়। তিনি সমাজতন্ত্রবাদের উপর প্রায়ই লিখতেন। তাঁর বাংলা

রচনার মধ্যে 'সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ'(1959), 'নেতাজীর জীবনবেদ', 'বিবাহ ও পরিবারের কর্মবিকাশ' এবং 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা আন্দোলন যুগের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতই অনিল বরণ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ঘোর বিরোধী। একমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতাই সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের অবসান ঘটাতে পারে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সেইজন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এক অবিভক্ত রাষ্ট্ররূপে। সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতার বিরোধী ছিলেন তিনি। সমাজতন্ত্রী হবার দরুন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রগতিশীল, অবশ্য সামাজিক হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকেও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। সমাজে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ় আর সেই কারণেই অনিল বরণের 'শ্রী সংঘে' বহু মহিলা কর্মী যোগ দেন। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের তিনি যেমন সমর্থক ছিলেন, তেমনি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বও তিনি অনুভব করেছিলেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর অবসর বিনোদনের শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি খুব ভালো গান গাইতে পারতেন ; তাঁর গাওয়া গান বহু জায়গায় যথেষ্ট প্রশংসাও লাভ করেছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভারতবর্ষে সমাজবাদ বিকাশে অনিল বরণের অবদান তাঁর সমকক্ষ নেতাদের মতই উল্লেখযোগ্য। একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে অনিল বরণ তাঁর যুক্তি সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্ত সমস্যা বিচার করতেন বলে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের থেকে তাঁকে পৃথক করা যায়। অনিল বরণ আদর্শগত বর্ণে রঞ্জিত করেন নরমপন্থী বামদলের কর্মসূচীকে।

[Sunil Das—Anil Roy ; Politician, Scholar and Philosopher (an article in the Praja Socialist Party Jubilee Conference Number, 1934-59) ; কমলা দাশগুপ্ত—স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী ; অনিল রায়—সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, কলকাতা, 1959 ;—নেতাজীর জীবনবেদ, কলকাতা ; ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়—সবার অলক্ষ্যে, কলকাতা, 1933 ; Benoy Kumar Sarkar—Political Philosophies Since 1905, Calcutta ; মৃত্যুঞ্জয়ী (মহাজাতি সদন কর্তৃক প্রকাশিত) কলকাতা, 1966 ; The Statesman, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং The Hindusthan Standard, 8 January 1952 ; অনিল বরণ রায়ের পত্নী লীলা রায়ের সহিত গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।]

নীলমণি মুখোপাধ্যায়

অনিল বরণ রায় (১৮৯০-১৯৭৪)
Anil Baran Ray (1890-1974)

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গুইর গ্রামে 1890 সালের 3 জুলাই অনিল বরণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কোন এক পূর্বপুরুষ বর্গীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে দুর্ধর্ষ বীরত্বের পরিচয় দিলে, বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁকে 'রায়' খেতাব দেন। পারিবারিক দুঃখদুর্দশার ফলে 1910 সালে স্নাতক হওয়ার পরই অনিল বরণের পিতামাতা এক ধনী পরিবারে তাঁর বিবাহ স্থির করেন। পরিবারের দিকে লক্ষ্য রেখে অনিল বরণ বিবাহে সম্মতি দেন। দর্শনশাস্ত্র ও ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করার পর, 1915 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে স্নাতক হন। কিন্তু যেদিন সিউড়ি আদালতে উকিল হিসেবে তাঁর নাম নথিভুক্ত করতে যাবেন, সেদিন তাঁর দেখা হল এক জ্যোতিষীর সঙ্গে। তাঁকে দেখে জ্যোতিষী বলেন, আইন আদালতের পেশা অনিল বরণের ভাগ্যে নেই, বরং নিঃস্বার্থ জনসেবাই হবে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শেষ পর্যন্ত ঘটলও তাই—অনিল বরণের আর আইন ব্যবসায়ে যোগ দেওয়া হল না। দর্শনশাস্ত্র নিয়ে প্রায় সাতবছর অধ্যাপনা করলেন তিনি—প্রথমে হেতমপুর কলেজে, পরে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান কলেজে।

গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নীতিগুলি অনিল বরণের মনে এক বিশেষ ছাপ ফেলে। 1921 সালে তিনি যেন দেশমাতৃকার কাছ থেকে শুনতে পান আত্মোৎসর্গের চরম আহ্বান। তাই অধ্যাপনা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস সংগঠনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

1923 সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপদেশে স্বরাজ্য দলে যোগ দেন অনিল বরণ। পরে বাঁকুড়া নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে' নির্বাচিত হন এব স্বল্প সময়েই দেশবন্ধুর অন্যতম নির্ভরযোগ্য সহযোগী হিসেবে বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে অগ্রস্থানীয় হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাঁকে

'সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যক্তি' রূপে চিহ্নিত করলে 1924 সালে 1818'র 'রেগুলেশন থ্রি' অনুযায়ী অনিল বরণ গ্রেপ্তার হন।

ইতিমধ্যে দেশপ্রেমিক ঋষি অরবিন্দের ভাবধারা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কারাগারে থাকাকালীন অরবিন্দের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি নিয়মিত সম্পর্ক রেখে চলতেন। 1926 সালে জুন মাসে মুক্তি পাওয়ার পর অরবিন্দের নির্দেশে অনিল বরণ পণ্ডিচেরী চলে যান। অনুগত শিষ্যের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে অরবিন্দ বলেন 'অনিল বরণ নিজের রাজনৈতিক মুকুট পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।' পণ্ডিচেরীতে চল্লিশ বছর শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে নিভৃত যোগাভ্যাস করার পর, 1966 সালে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ প্রচারে উদ্যোগী হন অনিল বরণ। অরবিন্দের ভাবধারায় গড়ে ওঠে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা। এক নতুন সংবিধানের সাহায্যে সমস্ত প্রদেশগুলি, এমন কি কাশ্মীরকে, স্বশাসনের অধিকার দিয়ে ভারতের ঐক্য পুনরায় স্থাপন করা ছিল অনিল বরণের উদ্দেশ্য। সামরিক দায়িত্ব, বৈদেশিক নীতি ও জনসংযোগের ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। তিনি সর্ব ধর্মের মৌলিকতা বজায় রেখে ধর্মানুরাগ, নৈতিকতা বোধ আর জনসেবা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আচার অনুষ্ঠান নিয়ে অকিঞ্চিৎকর দ্বন্দ্বের তীব্র নিন্দা করতেন তিনি। দারিদ্র্য দূর করা আর ধনবণ্টনের বৈষম্য কমানোও ছিল অনিল বরণের সংকল্প। ব্যক্তিগত মালিকানায় গড়ে ওঠা ব্যবসা বাণিজ্য সরকারের ক্ষমতায় রেখে দেশ সেবা করার সুযোগ করে দেবার কথা তিনি ভেবেছিলেন; অবশ্য সরকার কর্তৃক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাও ছিল অনিল বরণের পরিকল্পনার অন্যতম। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী সমন্বিত বিশ্ব-রাষ্ট্র পত্তন করা ছিল তাঁর আর একটি লক্ষ্য। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে ভারত উদ্যোগী হয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করুক এই ছিল তঁর অভিপ্রায়।

কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যেও ছিল অনিল বরণের সমান দক্ষতা। তিনি ছিলেন এক শক্তিশালী লেখক। বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী এই তিন ভাষায় অনেকগুলি বই রচনা করেছিলেন তিনি। বইগুলির মধ্যে 'Sri Aurobindo and the New Age', 'India's Mission in the World', 'Songs from the Soul' এবং 'Mother India'-র নাম উল্লেখযোগ্য। অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ শিষ্য অনিল বরণের লেখা 'Sri Aurobindo and the New Age' বইটিতে আমরা অরবিন্দের ধ্যান ধারণা, শিক্ষা দীক্ষার প্রকৃত ব্যাখ্যার পরিচয় পাই; যোগের লক্ষ্য ও প্রণালী, মানব-সেবার আদর্শ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের সমাবেশ রয়েছে বইটিতে। যাঁরা মনে করেন ধর্মই ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের মূল, তাদের কাছে India's Mission in the World এমন এক বলিষ্ঠ আহ্বান যা তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল করে দেয়। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের কথায় অনিল বরণের লেখাটি 'সরল ভাষায় ব্যক্ত এক গুরুত্বপূর্ণ সত্যের পরিচায়ক'। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা সম্বলিত অনিল বরণের লেখা 'গীতা'র ইংরেজী সংস্করণ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপোস পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দুর্লভ সম্মান লাভ করে। ফরাসী ভাষায়ও বইটির তর্জমা প্যারিস থেকে পর পর দশটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়। 198···অরবিন্দ শরণাগত এই মহাপ্রাণ পুরুষের লোকান্তর ঘটে।

[অনিল বরণ রায়—স্বরাজের পথে, কলকাতা, 1328 বঙ্গাব্দ;—পল্লী সংগঠন, কলকাতা;—জাতীয় শিক্ষা, কলকাতা, 1329 বঙ্গাব্দ; যোগেশ চন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলকাতা, 1367 বঙ্গাব্দ; Who's Who of Indian Writers (Published by the Sahitya Academy, New Delhi); The Amrita Bazar Patrika, 14 March 1924.]

রবীন্দ্রনাথ দাস

অনসূয়াবাঈ কালে (১৮৯৬-১৯৫৮)
Anasuyabai Kale (1896-1958)

1896 সালে বেলগাঁওয়ে এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে অনসূয়াবাঈ কালের জন্ম। তাঁর পিতা সদাশিব বি. ভাটে একজন আইনজীবী ছিলেন। মাতা গঙ্গুবাঈ ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয়া পত্নী। অনসূয়ার তিন ভ্রাতা ও তিন ভগ্নী ছিল। 1913 সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি প্রথম বৎসর পুনার ফার্গুসন কলেজ এবং দ্বিতীয় বৎসর বরোদা

কলেজের ছাত্রী ছিলেন। 1916 সালে পি. বি. কালে নামক এক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর তাঁর পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। স্বামী কালে ছিলেন ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক বিপত্নীক যুবক আর তখন অনসূয়ার বয়স ছিল কুড়ি।

1926 সাল থেকে তাঁরা নাগপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। 1928 সালে অনসূয়াবাঈ সি. পি. লেজিসলেটিভ কাউন্সিলর সদস্য এবং নারী কারাগারের পরিদর্শক মনোনীত হয়েছিলেন। পরের বৎসর তিনি ইন্টারন্যাশনাল হোয়াইটলি লেবার কমিশন-এর সঙ্গে সমগ্র মধ্য প্রদেশ সফর করেন এবং এই আন্তর্জাতিক সংস্থার তিনি সদস্য নিযুক্ত হন। 1930 সালে তিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদে ইস্তাফা দিয়ে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেন। চার মাসের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। 1932 সালে এক বছরের জন্য তিনি এ. আই. সি. সি.-র সদস্য হন। 1933 সালে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে মধ্য প্রদেশে সফর করে অস্পৃশ্যতা বিরোধী প্রচার চালান এবং জন সমাবেশে গান্ধীজির অতিপ্রিয় "বৈষ্ণব মনে" ভজনটি তিনি পরিবেশন করতেন। 1935 সালে তিনি "নাগপুর কংগ্রেস কমিটি"র সভাপতি হন এবং 1936 সালে মোহাপায় "মধ্যপ্রদেশ হরিজন সম্মেলনে"-র সভাপতিত্ব করেন।

1937 সালে অনসূয়াবাঈ নাগপুর থেকে সি. পি. এ্যান্ড বেবার লেজিসলেচার-এ নির্বাচিত হন এবং এর প্রথম অধিবেশনে "বন্দেমাতরম" গানটি করেন। তিনি ডেপুটি স্পীকার হিসাবেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর কিছু দিন পরে জাফর হুসেন নামক মধ্যপ্রদেশ সরকারের জনৈক শিক্ষা পরিদর্শক একটি তরুণীকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ হন। তখন কংগ্রেস সরকারের শাসন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও শরীফ নামক এক মুসলমান মন্ত্রী মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলোচনা ব্যতীতই জাফর হুসেনের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এই অবস্থায় অনসূয়াবাঈ-এর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হয়। কমিশনের সুপারিশ ক্রমে শেষ পর্যন্ত শরীফের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং 1938 সালে তিনি মন্ত্রীপদে ইস্তাফা দিতে বাধ্য হন। ঐ বছরই অনসূয়াবাঈ নাগপুর মহিলা সম্মেলনের জন্য সরকার থেকে একখণ্ড জমি পান এবং এর গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। 1942 সালে চিমুর এবং আস্তির আদিবাসী গোণ্ড উপজাতি সত্যাগ্রহের নেতৃত্বদানের জন্য সাতজন গোণ্ডকে সামরিক আইনানুযায়ী প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। অনসূয়াবাঈ তখন গান্ধীজি ও দিল্লীর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনলস উদ্যোগে ঐ সাতজন গোণ্ড নেতার প্রাণ রক্ষা পায়। তিনি বিচারাধীন কারারুদ্ধ সত্যাগ্রহীদের পরিবারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।

1937 সালে অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্সের নাগপুর অধিবেশনে অনসূয়াবাঈ মেয়েদের রাজনৈতিক তথা সামাজিক সমস্যা উত্থাপন করেন। 1947 সালে তিনি এই সংগঠনের সভাপতি হন। 1948 সালে গান্ধীজির হত্যাকাণ্ডের ফলে যে দাঙ্গা হয়—সেই দাঙ্গা পীড়িতদের জন্য তিনি সাহায্য ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। 1952 ও 1957 সালে তিনি লোকসভায় সদস্য নির্বাচিত হন। 1952 সালে তিনি কমলওয়েলথ কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্বের জন্য কানাডায় গিয়েছিলেন। তিনি সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের সমর্থক ও পৃথক বিদর্ভের বিরোধী ছিলেন।

1958 সালে অনসূয়া কালে স্বামী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন।

[P. B. Kale—Anasuyabai Ari Mi, Nagpur, 1962]

(সরোজ এ. দেশপাণ্ডে) **জি. ভি. কেটকার**

অন্নপূর্ণাইয়া মাদুরি (১৯০০-১৯৫৩)
Annapurnayya Maduri (1900-1953)

মাদুরি অন্নপূর্ণইয়ার জন্ম হয় 1900 সালে পূর্ব গোদাবরী জেলার পিথাপুরমে এক হিন্দুব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পিতা জয়রামাইয়া ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত এবং কৃষিজীবী এবং মায়ের নাম ছিল রাজাম্মা। 1919 সালে তিনি রামানাম্মাকে বিবাহ করেন। তাঁর পত্নীও রাজনীতিতে তাঁর সহকর্মিণী ছিলেন এবং 1932 সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজমুন্দ্রী, ভেলোর এবং কান্নানোর জেলে বসবাস করেন।

অন্নপূর্ণইয়া ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পিথাপুরম হাইস্কুলে এবং রাজামুন্দ্রীর সরকারী আর্মি কলেজে বি. এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি রাম্পা বিদ্রোহের নায়ক আল্লুরি সীতারামারাজুর একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর কার্যকলাপে ঐ নায়কের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 1920

থেকে 1953 সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছর অন্নপূর্ণাইয়া এক বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন যাপন করেন। 1920 সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং রাজামুন্দ্রীতে ডঃ ব্রহ্ম জোসিউলা সুব্রহ্মণ্যম ও ভেন্নেতি সত্যনারায়ণের সঙ্গে, অন্যান্য জায়গায় মোসালিকান্তি তিরুমালা রাও এবং আল্লুরি সত্যনারায়ণ রাজুর সঙ্গে নানা প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদনা করেন। সমুদ্রকূলবর্তী অন্ধের অনেক জেলায় তিনি ভ্রমণ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার করেন। 1940 সাল পর্যন্ত তিনি একজন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। একবার এ. আই. সি. সি.-র সদস্য হয়েছিলেন। 1929 সাল নাগাদ তিনি Independent Youth League-এ যোগ দিয়ে এর প্রথম সারির নেতা হিসেবে পরিগণিত হন। সেই বছরই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং দু বছরের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। 1932 সালে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং চার বছরের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। 1940 সালে তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। 1946 সালে কমিউনিষ্ট পার্টি ছেড়ে পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে আসেন। 1953 সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসেই ছিলেন।

অন্নপূর্ণাইয়া একজন প্রথিতযশা সাংবাদিকও ছিলেন। রাজামুন্দ্রীতে 1921 সালে 'কংগ্রেস' নামে তেলেগু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং 1932 সাল পর্যন্ত ছিলেন তাঁর সম্পাদক। পরবর্তীকালে 1936 সালে তিনি 'নবশক্তি' নামে আর একটি পত্রিকা বার করেন এবং তাঁর সম্পাদক হন। 'জয়ভারত' নামে তৃতীয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন 1948-49 সাল নাগাদ।

অন্নপূর্ণাইয়ার জীবন ছিল বর্ণময়, নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ, অনেক বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন উগ্রপন্থী, পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা এবং কমনওয়েলথের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্কচ্ছেদ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি অন্ধ্রপ্রদেশকে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ এবং বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা, হরিজনদের উন্নতি বিধান প্রভৃতি কাজে উৎসাহ দিতেন। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে তিনি ছিলেন আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী, তিনি স্থানীয় জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকাকালীন তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে উৎসাহিত করতেন। তিনি কৃষিশ্রমিকদের কুটির শিল্পেরও একজন প্রবক্তা ছিলেন। সাংবাদিকতা এবং জ্যোতিষবিদ্যা ছিল তাঁর প্রিয় শখ।

অন্নপূর্ণাইয়া ছিলেন উত্তর গোদাবরী জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিখ্যাত নেতা। তরুণ প্রজন্মের মনে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং দেশপ্রেম জাগ্রত করার ব্যাপারে অন্নপূর্ণাইয়ার বক্তৃতা এবং রচনাবলীর বিশেষ অবদান ছিল।

[Andhra Janata (a Telugu daily newspaper from Hyderabed) 27th May 1966 ; The Hindu (an English daily from Madras), 16th July 1929 ; Congress (a Telugu political magazine from Rajahmundry), 22nd May 1922 ; Freedom Struggle in Andhra Pradesh, Edited by M. Venkata Rangayya ; Personal interview with Annapurnayya's friend K. Linga Raju.]

এমঃ রামা রাও

অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ (১৮৮৭-১৯৫৭)
Anugraha Narayan Sinha (1887-1957)

অনুগ্রহ নারায়ণ, বিহারের গয়া জেলায়, ওরঙ্গাবাদ মহকুমার পয়নওয়ার গ্রামে 1887 সালের 18ই জুন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বেশ্বর দয়াল ছিলেন অভূতপূর্ব শারীরিক শক্তির অধিকারী এবং জেলার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা। মাত্র এগার বছর বয়সে অনুগ্রহ নারায়ণ গৌরবাসিনী দেবীকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন গয়া জেলার বিখ্যাত জমিদার রামকিষেন সিং এর কন্যা। গৌরবাসিনী দেবী মাত্র 35 বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

অনুগ্রহ নারায়ণের শিক্ষা দীক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশী অগ্রসর হতে পারেনি কারণ তাঁর পিতা আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। বছর তিনেক এর মতন অলস জীবন যাপন করে অনুগ্রহ নারায়ণ বাড়ী থেকে পালিয়ে ঔরঙ্গাবাদের মিডল স্কুলে ভর্ত্তি হন। 1908 সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম বিভাগে এণ্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জেলাবৃত্তিও লাভ করেন। পাটনা মহাবিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে তিনি বি. এ. পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি 1914 খৃীঃ ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। 1915 খৃীঃ আইন বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে তিনি ব্যাচিলর অফ ল উপাধি পান। পাটনা মহাবিদ্যালয়ের চাণক্য সোসাইটির তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক। 1915 সনে তিনি ভাগলপুরের টি. এন. বি. কলেজে যোগদান করেন। 1916 সনেই তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে পাটনা হাইকোর্টে যোগদান করেন। কিন্তু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হতেই তিনি গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে আইন ব্যবসাও পরিত্যাগ করেন।

অনুগ্রহ নারায়ণ শৈশবাবস্থা থেকে তাঁর মায়ের ব্যক্তিত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। গয়া জেলা স্কুলে থাকাকালীন বৈদ্যনাথ সিংহ নামে জনৈক প্রভাবশালী শিক্ষকের নজরে তিনি পড়েন। এই শিক্ষক তাঁকে গীতা সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান দান করেন। 1910 থেকে 1915 সন পর্যন্ত অনুগ্রহ নারায়ণ বিহারী ছাত্র সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন। এই সময়েই তিনি বিহারের প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ পান। 1906 সালে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে উঠে। 1917 সালে চম্পারণে গান্ধীজির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। আজীবন তিনি গান্ধীজির অনুসরণকারী ছিলেন।

স্বাধীনতার আন্দোলনে অনুগ্রহ নারায়ণ সক্রিয়-অংশগ্রহণ করেছিলেন। 1912 সনে পাটনা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। 1917 সালে চম্পারণে প্রায় ছ'মাস থেকে তিনি নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি ছিলেন 1920 সালে স্থাপিত বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ সম্পাদক। তিলক স্বরাজ ফান্ডের জন্য তিনি এই সময় চাঁদা তোলেন। 1921 ও পরে 1935 সালে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে তিনি দুইবার সচিব পদে নির্বাচিত হন। 1928-29 সালে তিনি বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি রাজ্য আইন-পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে বিহার প্রদেশের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সর্বাধিনায়ক বা Dictator মনোনীত হন। 1928 সালে তিনি পাটনায় অনুষ্ঠিত বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। 1935 সালে তিনি পাটনা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন। 1921 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিষয়নির্বাচনী সমিতির তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। 1930 সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1922 সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 1940 এ ও রামগড় অধিবেশনে এই পদটিতে তিনি আসীন ছিলেন। 1935 সালে তিনি কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিহারে সর্বভারতীয় গ্রাম্য শিল্প সমবায়ের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

অনুগ্রহ নারায়ণ বহু গুরুত্বপূর্ণ জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। 1921 সালে পাটনা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে তিনি উপাধ্যক্ষ ছিলেন। 1927 সালে গয়া জেলা বোর্ডের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে তিনি এই পদটি ছেড়ে দেন। 1925 সালে তিনি কাউনসিল অব স্টেটের কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হন। 1934 সালে বিহার বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর পুনর্বিন্যাসকল্পে বিহার সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটি নামে যে সংস্থা গঠিত হয়েছিল, অনুগ্রহ নারায়ণ তার সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। 1934 সালের নভেম্বর-এ তিনি পাটনা সাহাবাদ নির্বাচকমণ্ডলী থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। 1937 সালে কংগ্রেস দল যখন 1935-এ নূতন ভারতীয় আইনানুসারে মন্ত্রিসভা গঠন করেন অনুগ্রহ সিং তখন পি. ডব্লু. ডি., অর্থ, শ্রম, বাণিজ্য ও স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। 1946 সালে যখন বিহারে দ্বিতীয় কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হলো, তখন তিনি অর্থ, সরবরাহ, খাদ্য এবং শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী নির্বাচিত হন। 1957 সালে জুলাই মাসে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অর্থ দপ্তরের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

1933 সালে দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য তিনি সরকারী আদেশে প্রথম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময় তিনি পাটনায় একটি জনসভায় কংগ্রেসের নির্দেশিত স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করছিলেন। 15 মাসের জন্য কঠিন কারাদণ্ডে তাঁকে দণ্ডিত করা হয়। এরপর 1940 সনে নভেম্বর মাসে তিনি পাটনা শহরে বৃটিশ সরকারের সমালোচনার দায়ে আবার বন্দী হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি মুক্তি পান। 1942 সালে 11ই আগষ্ট তিনি পুনর্বার বন্দী হন এবং একেবারে যুদ্ধের অবসান পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন।

প্রথম জীবনে অনুগ্রহ নারায়ণ জাতপাতের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। এই কারণে 1919 সালে তিনি যখন জলপথে বার্মা যাত্রা করেন তখন তিনি জাহাজে

কোনওরকম খাদ্য গ্রহণ করেন নি। শেষের দিকে তিনি অবশ্য জাতিভেদ প্রথার অবসান ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন খুবই আগ্রহী হন। 1927-28 সনে তিনি সক্রিয়ভাবে বিহারে পর্দা প্রথা বিরোধিতার আন্দোলনে যোগদান করেন এবং নিজের স্ত্রীকে পর্দার বাইরে আনেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও শিক্ষিত ছিলেন। তিনি ধর্মের একসূত্রতা ও সাম্প্রদায়িক সহযোগিতায় খুবই বিশ্বাসী ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মতে হিংসার সমার্থক। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অর্থনৈতিক উন্নতিই দেশের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু। ভাষাভিত্তিক রাজ্য বিভাজনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কার্জনের 1905-এ বঙ্গভঙ্গ বাংলাকে যে দুর্বল করবারই অপচেষ্টা একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

শিক্ষা প্রসারে অনুগ্রহ নারায়ণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি শিক্ষক হিসাবে বিহার বিদ্যাপীঠে যোগদান করেছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদ বিরোধী এবং জনকল্যাণমূলক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিহার মন্ত্রীসভায় থাকাকালে তিনি তার অর্থনৈতিক ধারণাগুলিকে কার্যকরী করে তুলতে পারেন নি। বেশ কয়েকবছর ধরে তিনি পাটনা থেকে প্রকাশিত 'সার্চলাইট' নামক ইংরেজী পত্রিকার বোর্ড অফ ডিরেকটরস এর অন্যতম ছিলেন। কাগজে মাঝে মাঝেই তাঁর লেখা প্রকাশিত হত।

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সাদাসিধে অথচ সুরুচিসম্পন্ন—সকলের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন "সহজে প্রাপ্য অথচ বড় মানুষ"। রাজনীতিতেও তিনি ছিলেন অসাধারণ ভদ্র। 1957 সালে 5ই জুলাই তার মৃত্যু দিনটি ব্যাপকভাবে শোকদিবস হিসেবে পালিত হয়েছিল। বিহারের কিছু রাস্তা, কিছু মহাবিদ্যালয় ও পাটনার অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ইনষ্টিটিউট অফ সোস্যাল স্টাডিস যুগ যুগ ধরে তার স্মৃতি বহন করবে।

[Subhas Chandra Sarkar—A guide to the Communal Problem in Inaia ; Anugraha Narayan Sinha—Mere Sansmaran (in Hindi) ; Speeches of Anugraha Narayan Sinha 1939-40 ; Uma Sankar Hamari Rastriya Neta (in Hindi) ; K. K. Datta—History of the Freedom Movement in Bihar, Vols. I-III ; Report of the Indian National Congress, 1921; N. N. Mitra (Ed.)—; The Indian Annual Register, 1928—Vol. II and 1937—Vol. III ; The Searchlight 6 July 1957 ; The Indian Nation, 16 November 1935 and 10 April 1938.]

(রামেশ্বর প্রসাদ) **সুভাষ চন্দ্র সরকার**

অবদেশ প্রতাপ সিং (ক্যাপ্টেন) (১৮৮৮-১৯৬৭)
Awadesh Pratap Singh (Captain)
(1888-1967)

ইংরেজী 1888 সালের অক্টোবর মাসে মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলায় রামপুর বঘেলান গ্রামে অবদেশ প্রতাপ সিং জন্মগ্রহণ করেন। লালচন্দ্র শেখর সিং ছিলেন অবদেশের পিতা। গুজরাটের মধ্যে অন্যতম খ্যাত পূর্বপুরুষ চালুক্য রাজবংশের উত্তরসূরি ছিলেন লালচন্দ্রশেখর সিং। রেওয়া রাজ্যের সোহাগপুর পরগণায় তেণ্ডুল গ্রামে চালুক্যরা বসবাস শুরু করেন।

প্রাক্তন রেওয়া রাজ্যের ইতিহাসে দেখা যায় চালুক্যরা উচ্চ প্রতিষ্ঠিত পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রভুত ক্ষমতা ভোগ করেছে। একই সময়ে এদের দুই ভাই চেন সিং ও নাহার সিং রেওয়া রাজ্যের দেওয়ান ও সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। রেওয়া রাজ্যের পক্ষে এই পরিবারটি যখন সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করছে তখন এই পরিবারেরই অন্যান্য সদস্যরা সময় বিশেষে শাসকগোষ্ঠীর নীতিগত প্রশ্নে বিরোধিতা করতে ইতস্ততঃ করেনি।

1907 সালে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার কোলপুর গ্রামে উল্লেখযোগ্য গহরওয়ার ঠাকুর পরিবারে মহারাজ কুনোয়ারের সঙ্গে অবদেশ প্রতাপ সিং এর বিবাহ হয়। তাঁর একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। পুত্র গোবিন্দ নারায়ণ সিং পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দল গঠিত সরকারের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন (1967 ; 30 শে জুলাই)।

অবদেশ প্রতাপ রেওয়ার দরবার হাইস্কুলে প্রাথমিকভাবে শিক্ষালাভ করেন। পরে, যথাক্রমে কায়স্থ পাঠশালা কলেজ, মেয়ো সেণ্ট্রাল কলেজ, ইউয়িং খ্রীষ্টান কলেজ, এলাহাবাদের ইউনিভার্সিটি ল' কলেজ এবং সর্বশেষে আগ্রার সেণ্ট জনস কলেজে শিক্ষালাভ করেন। এই শিক্ষালাভের সময় তাঁকে বার বার নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরেই 1906 সালে তিনি রেওয়া রাজ্য

সৈন্য বিভাগে লেফটেন্যান্ট পদে যোগদান করেন। 1908 সালে সেনাপতির সহকারী পদে নিযুক্ত হন। 1911 সালে ক্যাপ্টেন এবং 1913 সালে মেজরের পদলাভ করেন। কিন্তু তিনি মেজরের পদ থেকে কর্মে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় কলেজে যোগদান করেন।

যৌবনের প্রথম দিনগুলিতে অবদেশ প্রতাপ সিংয়ের অন্তরে যে বিপ্লবের আগুন প্রজ্বলিত হয়েছিল জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তা নির্বাপিত হয়নি। সৈন্য বিভাগে থাকাকালীনই তিনি বৈপ্লবিক আদর্শ-বাদীদের সংস্পর্শে আসেন। 1907 সালে তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন এবং 1913 সাল পর্যন্ত তিনি এই দলের সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর সঙ্গলাভ করেন এবং কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পড়েন। বৃটিশ সরকার তাঁর দণ্ডের ব্যবস্থা করলে রেওয়ার মহারাজা বেঙ্কটরমনের হস্তক্ষেপে অবদেশ প্রতাপ রক্ষা পান।

সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন অবদেশ প্রায় প্রতি-দিনই বালগঙ্গাধর তিলকের কাছে যেতেন। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য উদয়পুরের মহা-রানার নেতৃত্বে তিনি মহারাজা বেঙ্কটরমন সিংয়ের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিদ্রোহে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র. তৈরীর নক্সা ও চিত্র যেগুলো রেওয়ায় গোপনে তৈরী করা হত তা অবদেশের মারফৎ তিলকের কাছে পাঠান হত। একটি অস্ত্র তৈরীর কারখানা স্থাপন করার কাজও শুরু করা হয় কিন্তু কিছু মূল্যবান তথ্যাদি বৃটিশ সরকারের হস্তগত হয়। পরবর্তীকালে মহারাজার মৃত্যুতে বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত বিদ্রোহও স্তিমিত হয়ে আসে।

অবদেশ প্রতাপ সিং কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শকে আপন করে নিলেন। নিজের গ্রামে এবং 1921 সালে মৌগঞ্জে খদ্দর তৈরির ব্যবস্থা করলেন। সৈন্য বিভাগে থাকাকালীন জমিদারদের সংগঠনে তিনি সাহায্যের জন্য যোগদান করেন। সেইসময় বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর কাছে এক স্মারকলিপিতে জমিদারদের দাবী আদায় ছাড়াও সীমিত পঞ্চায়েত নির্বাচিত সভা, বনে পশুচারণ অধিকার, ভূমিরাজস্বের মূল্যহ্রাস প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষ দাবী করা হয়। এই ঘটনা জনগণের মনে এক বিশেষ চেতনার সৃষ্টি করে। ক্যাপ্টেন সাহেব পরবর্তীকালে বলতেন যে, জমিদাররের মধ্যে দৃঢ়তা না যোগালে বা তাদের দলে না আনলে কখনই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে না।

তিনি 1921 সালে অসহযোগ আন্দোলনে, 1931 এ আইন অমান্য ও 1942 সালে ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং দীর্ঘ চার বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন। 1932 সালে তাঁকে দুর্গের বন্ধঘরে আটক রাখা হয়, যা আদৌ মানুষ থাকার উপযুক্ত স্থান নয়। ঐ বন্ধ দুর্গে যখন তাঁর অন্যতম সহযোগী বন্দী অসুস্থ হয়ে পড়েন, প্রতিবাদস্বরূপ ক্যাপ্টেন সাহেব সেখানে অনশন শুরু করেন। তখন বৃটিশ উচ্চপদস্থ চিকিৎসকদের পরামর্শে বন্দীদের মাধোগর দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও দেওয়া হয়। পরে 1942 এর অগাস্ট আন্দোলনের সময় আন্দোলন-কারী ছাত্রদের ওপরে অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি আঠারো দিন অনশন করেন।

রেওয়া জেলার ইতিহাসে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ-জনসভা সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। অবদেশের ডাকে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় বারো থেকে পনেরো হাজার মানুষ এসে যোগদান করেছিল। অবদেশের এই নতুন কার্যক্রমের জন্য বৃটিশ সরকার আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনা সৈন্য বিভাগে ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং পদস্থ কর্মচারীদের লাল বনসাতি সিং, লাল সঙ্কর্ষণ সিং, দাঁদন সাহেব, রাজভান সিং তিওয়ারি পদত্যাগ করেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের উপক্রম দেখে কর্তৃপক্ষ অবদেশকে এক মাসের মধ্যেই কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন। 1931 সালের কংগ্রেস অধিবেশনে আজমীরের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যোগদান করেন ও বাঘেলখণ্ড জেলা কমিটির প্রতিষ্ঠা করেন। 1932 থেকে 1935 পর্যন্ত তিনি এই কমিটির সভাপতি এবং 1935 থেকে 1936 সাল পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। 1932 থেকে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন, এবং 1934 সাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যও ছিলেন। আবার ঐ একই বছরে তিনি কংগ্রেসের সংবিধান গঠন কমিটির সদস্যও নির্বা-চিত হন। সেই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন গান্ধীজি। সর্বভারতীয় কংগ্রেস ট্রাইব্যুনালের (1935) পাঁচজন সদস্যের তিনি অন্যতম একজন ছিলেন। আবার সর্ব-ভারতের কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। 1937 সালে মহাকোশল কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও নির্বাচিত হন। 1937 এর পর থেকে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে কংগ্রেসের পক্ষে যা কাজ হয়েছে

সমস্ত কিছুরই নেতৃত্ব দিয়েছেন অবদেশ প্রতাপ সিং। 1946 থেকে 1950 সাল পর্যন্ত অবদেশ প্রতাপ সিং সংবিধান সভার সদস্য ছিলেন। ভারতের অস্থায়ী আইনসভার সদস্যও ছিলেন। রাজ্যমন্ত্রী পরিষদের সাথে সংযুক্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির এবং তথ্য বেতার ও প্রতিরক্ষা বিভাগেরও সদস্য ছিলেন। তিনি বিন্ধ্য-প্রদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবার কৃতিত্ব অর্জন করে-ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন চাকুরীর সময়সীমা, বা পূর্ণতাকাল, সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা, জনগণের সর্বত্র যাবার অধিকার প্রভৃতি কাজ-গুলি সম্পন্ন করেন। 1954 সালে তিনি পুনরায় রাজ্যসভার সদস্য পদে নির্বাচিত হন এবং 1960 সাল পর্যন্ত এই সভার সদস্য ছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি সম-সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও লেখালিখি করেছেন। তাঁর লেখার বিষয় থাকত সাধারণত প্রাচীন ভারতের সামরিক সংগঠন, দারিদ্র্য, বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা, শিক্ষা, কালিদাস, রাজনৈতিক সমস্যাবলী প্রভৃতি। অন্যদিকে অবদেশ প্রতাপ ছিলেন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব এবং ধর্ম চর্চায় তিনি জীবনের অনেক সময় ব্যয় করেছেন। অবসর বিনোদন করতেন ভগবৎগীতা ও রামায়ণ পাঠে।

1908 সালে তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করেন। সৈন্যবাহিনীতে থাকা-কালীন ঝাড়ুদার প্রভৃতি অধস্তন কর্মীদের নিয়ে একটি মিলিত ভোজসভার আয়োজন করেন। অবদেশের জীবনের আর একটি উল্লেখ্য ঘটনা 1920 সালে পুত্র-গোবিন্দ নারায়ণের জন্মোপলক্ষে পরিবারের সকলের এমন কি পিতার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাড়ির দুটি মন্দির হরিজনদের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দেন।

মার্কসীয় সাহিত্যও তিনি পড়েছিলেন। মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ ও অর্থনৈতিক চিন্তায় ঐতিহাসিক মূল্যায়নের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল। মার্কসের সাহিত্য পাঠ করেও ধর্মে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে অসীম আনুগত্য থেকে তাঁর মন বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়নি। কেননা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে বৈপ্লবিক পরিবর্তনবাদের মধ্যে কোন বিরুদ্ধ সংঘাত হতে পারে এরকম ধারণা তাঁর মনে স্থান পায়নি। সুদীর্ঘ জীবন কংগ্রেসে অতিবাহিত করে এবং অহিংসা আন্দোলনের পথিক হয়েও জীবনের সন্ধ্যাকাশে আবার নতুন করে বিপ্লবের বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে।

1962 সাল থেকে তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে হতাশা ও দুঃখের আভাস পাওয়া যায়। কংগ্রেসের অধঃপতন লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু নেতাদের সমাবেশে কংগ্রেসের ভরাডুবি তথা ভারতবর্ষের পতন তাঁর মনকে অস্বাভাবিক বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই মোহমুক্ত দেশপ্রেমিক আক্ষেপ করে বলেন যে, যখন আমি কালোবাজারী ও অন্যান্য দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের কংগ্রেসে যোগ দিয়ে স্বাধীনতার ফলভোগ করতে দেখি তখন আমার রক্ত ফুটতে থাকে। আমি বৃদ্ধ আমার শরীরে আর শক্তি নেই নয়ত আমি কংগ্রেস ছেড়ে কম্যুনিস্ট বা সমপর্যায়ের কোন দলে যোগ দিতাম। 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদী' না হয়ে ভারতবর্ষকে সমাজবাদী গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর করা উচিত। ক্যাপ্টেন সাহেব শিক্ষার প্রসারের দিকে অনেক বেশী যত্নবান ছিলেন। তাঁর মাত্র এক বছরের শাসনকালে তিনি বিন্ধ্যাচলে প্রায় সাতশ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রেওয়া অঞ্চলে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা দান করেন। মৃত্যুর পর তাঁর নামেই বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়।

ক্যাপ্টেন আকৃতিতে খর্বাকৃতি হলেও স্বাস্থ্যবান ছিলেন। বাঘেলখণ্ডের অভিজাত ও বিত্তবান পরি-বারের সন্তান হয়েও তিনি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। একটি ধুতি, কোর্তা ও একটি জ্যাকেট এই সাধারণ পোষাকই তিনি ব্যবহার করতেন। উপরে ওঠার আগে নীচে নেমে সমতা ফিরিয়ে আনতে হবে একথা তিনি বিশ্বাসের পাশাপাশি পালনও করতেন।

অদম্য সাহস ও বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতার বলে তিনি তার প্রতিজ্ঞায় সর্বদাই স্থির থাকতেন। ন্যায় ও নিষ্ঠার প্রতি ছিলেন অবিচল। আপোষ তিনি কোনদিন করেন নি। তাঁর বাকপটুতা ছিল তীব্র, তিনি কখনই কারো এমনকি দলীয় নেতাদেরও মন জোগানো কথা বলতেন না। উদাহরণস্বরূপ, 1938 সালে পার্টিকে প্রজা-মণ্ডল বলা হবে, না, কংগ্রেস বলা হবে এই সমস্যার বিবাদে তিনি সর্দার প্যাটেলের মুখোমুখি হয়েছিলেন। দারিদ্র্য ও পরদুঃখে তিনি সর্বদাই অশ্রু বিসর্জন করতেন।

এই অকল্পনীয় স্বাধীনতার যোদ্ধাটির জীবনদীপ 1967 র 6ই জুন নির্বাপিত হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মধ্যপ্রদেশে বিন্ধ্যপর্বত ও মহাকোশল অঞ্চলে অবদেশ প্রতাপ সিং অন্যতম প্রধান জননায়ক। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তাঁর অসীম প্রচেষ্টা ও দুরন্ত উদ্যম বাঘেলখণ্ডের সাধারণ মানুষকেও স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ও সতেজ রেখেছিল।

[Who's who in Rajyasabha, 1958, New Delhi ; Seth Govind Das—Atma Nireekshna, Vol. II, Delhi, 1958 ; Personal Interview of the contrubutor with Thakar Govind Narain Singh, son of Captain Awadesh Pratap Singh, in Aprll, 1971]

এস ডি গুরু

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)
Abanindranath Tagore (1871-1951)

কলকাতায় জোড়াসাঁকোর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রাসাদে অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁর মাতা সৌদামিনী দেবী অতিশয় ব্যক্তিত্বসম্পন্না গৃহিণী ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের অগ্রজ দুই ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর কনিষ্ঠা দুই ভগ্নী সুনয়নী ও বিনয়িনী। অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁদের মধ্যে প্রশংসনীয় বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মনোভাব ছিল। 1889 সালে অবনীন্দ্রনাথ রাজা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পরিবারের কন্যা সুহাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

পারিবারিক শিল্পচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথের কালে। তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রতিকৃতি অংকনে দক্ষ ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের পিতা সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। জলরঙা ছবি আঁকা ও স্থাপত্য বিষয়ে বিভিন্ন নকশা তৈরী করা ছিল তাঁর অবসরকালীন নেশা। সমগ্র পরিবারই সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং এতে নিয়মিত সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু ভৃত্য নিয়ন্ত্রিত কঠোর শৃংখলাবদ্ধ বাল্য জীবনে অবনীন্দ্রনাথ পরিবারের এই সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা লাভের সুযোগ পাননি। দাসদাসীর নিয়ন্ত্রণ শিশু অবনীন্দ্রনাথকে সংবেদনশীল ও অন্তর্মুখী করে তুলেছিল।

এই অন্তর্মুখীনতাই অবনীন্দ্রনাথকে নীরব ভাবুক ও সংবেদনশীল দ্রষ্টায় পরিণত হতে সাহায্য করে। জগতের অতি তুচ্ছ সাধারণ বস্তুও তাঁর কাছে অপরিসীম বিস্ময় ও আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে। সূর্যালোকিত প্রাচীন অট্টালিকা, জ্যোৎস্না-স্নাত বারান্দা, লণ্ঠনের স্তিমিত আলোছায়ায় কর্মরতা পদ্মাদাসী—বালক অবনীন্দ্রনাথের কল্পনায় অসাধারণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, পুরাতন অব্যবহার্য জিনিষপত্রে ঠাসা গুদামঘরও তাঁর কাছে এক রূপকথার বিচিত্র জগৎ। তাঁর ছোট পিসীমার নানা বিচিত্র লোকচিত্র দিয়ে সাজানো ঘর অবনীন্দ্রনাথের শৈশব কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে। পরবর্তীকালের 'চাপদানী'তে কাটানো দিনগুলিও ছিল অবনীন্দ্রনাথের স্বপ্নচারিতার উৎস। বিচিত্র পশুপাখীর সংগ্রহ, কারুকার্যময় কাঠের আসবাবপত্র, গালিচার ও পর্দার সূক্ষ্ম নকশা, বিভিন্ন রকমের ফুলদানি ও পুতুলের সমাবেশ, গঙ্গার ঘাটে ব্যস্ত মুখরতা ও অলস নির্জনতা—এ সবই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা ও কল্পনা-প্রবণতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিদ্যালয়ের চিরাচরিত অংকন শিক্ষা ছাড়াও তাঁর নিজস্ব অংকনশৈলীতে তিনি তাঁর পিতার অংকিত স্কেচ গুলিও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ময়দার মণ্ড দিয়ে মডেল তৈরী করতেন। কিছুদিন সূচীশিল্প নকশা নিয়েও কাজ করেছিলেন। নয় বছর বয়সে তিনি কাকার কাছ থেকে তাঁর আঁকা স্কেচের জন্য একটি ড্রইং-স্লেট উপহার পান। সংস্কৃত কলেজে তাঁর সতীর্থ অনুকুল চট্টোপাধ্যায়ের (1881-90) কাছ থেকে অবনীন্দ্রনাথ কিছু পেন্সিলের স্কেচের কাজ শিখেছিলেন।

তবে নিয়মনিষ্ঠ রীতি-অনুযায়ী প্যাস্টেল, জলরঙ ও প্রতিকৃতি শিক্ষা তাঁর শুরু হয় ইতালীয় শিক্ষক সিনর গিলহার্ডি-র কাছে। ইংরেজ চিত্রকর চার্লস পামারের স্টুডিওতেও তিনি কিছুদিন তেল রঙের ব্যবহার ও প্রতিকৃতি অংকন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। এই সময় মুল রাধাকৃষ্ণের সচিত্র ছবিটি অবনীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে। আবার এই সময়েই লক্ষ্ণৌ কালামচিত্র সংগ্রহ ও কয়েকটি মধ্যযুগীয় আইরীশ রঙীন চিত্র তাঁর হাতে আসে। এই নিদর্শনগুলির অংকন রীতির সাদৃশ্য, রঙের ঔজ্জ্বল্য, অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে গঠনমূলক শৈলী তাঁর কাছে এক বিরাট আবিষ্কার রূপে প্রতিভাত হয় এবং তিনি এই অলংকরণধর্মী শিল্পধারাকে অনুসরণ করে কয়েকটি চিত্র অংকনে উদ্যোগী হন। এরই ফলশ্রুতি রূপে 1895 সালে অংকিত হয় অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কৃষ্ণ-লীলা চিত্রগুচ্ছ যাতে শিল্পী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প রীতির এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

যদিও ইতিপূর্বে অবনীন্দ্রনাথ নিজের 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুল' ও রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'তে কিছু অলংকরণের কাজ করেছিলেন (1892-94), তবু

'কৃষ্ণলীলা'কেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিল্প প্রচেষ্টা বলা যায়। এই কৃষ্ণলীলা চিত্রগুচ্ছের মধ্যেই তৎকালীন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল ভাবীকালের এক মৌলিক ও ক্ষমতাবান শিল্পীকে আবিষ্কার করেন। হ্যাভেল তাঁকে আর্ট স্কুলের সহ-অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন 1898 সালে। এতদিন এই পদটি শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। হ্যাভেলের নির্দেশনায় তিনি মুঘল ও রাজপুত শিল্পধারা গভীরভাবে অনুধাবন করেন। অব্যবহিত পরেই তাঁর অঙ্কন শৈলী ও পদ্ধতির মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। 'ঋতুসংহার' 'বুদ্ধ-সুজাতা' ও 'বজ্র-মুকুট' চিত্রগুলি এই পরিবর্তিত অঙ্কনশৈলীর নিদর্শন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্দিকে ইন্দো-জাপান সাংস্কৃতিক সহযোগিতার পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ জাপানী শিল্পী তাইকওয়ানের কাছে জাপানী চিত্রকলা শেখার সুযোগ পান। তিনি তাঁর সহজাত নৈপুণ্যে যথারীতি বিদেশী অঙ্কন ধারাকে অতি শীঘ্রই আত্মস্থ করে এক সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ রচনা করলেন যার প্রতিফলন ঘটেছে 'ভারত মাতা' (1902) চিত্রে। দীর্ঘ অভ্যস্ত অলঙ্করণের বাহুল্য বর্জনে এবং স্থান ও পরিসরের সংযোজনে ও উৎকর্ষতায় অবনীন্দ্রনাথের 'ওমর খৈয়ম' চিত্রকলাগুলি (1906—1908) জাপানী শিল্পরীতির আত্মকরণের সফলতম দৃষ্টান্ত রূপে বিবেচিত হবে।

এই সময়েই অবনীন্দ্রনাথ শিল্পজগতে এক নতুন জাতীয় ভাষা সৃষ্টি ও অবলুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সৌন্দর্যচেতনা পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকৃতির স্বীকৃতিই হ্যাভেল, ভগিনী নিবেদিতা, স্যার জন উড্রফ্ ও অন্যান্যদের 1907 সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ অঙ্কনরীতিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা। 1911 সালে দিল্লী-দরবারে অবনীন্দ্রনাথ সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনে সঙ্গীত, নাটক ও স্বদেশী মেলার মাধ্যমে প্রকাশিত সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক দিকটির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। কিন্তু বিদেশী পণ্য ধ্বংস করার মত চরমপন্থার তিনি সমর্থক ছিলেন না। তাঁর জাতীয়তাবাদের আদর্শ কোন বিশেষ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সৃষ্টির জগতে তিনি নিজেকে কখনও শুধুমাত্র ভারতীয় বলে গর্ব অনুভব করেন নি। বরং সৃষ্টিকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যে তিনি পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকেই কিছু শিক্ষা গ্রহণ ও আত্মকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের মতে অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন নি। অন্য সব কিছুর মতই তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব ছিল। এজন্যই তাঁকে জননেতার ভূমিকায় কখনও দেখা যায়নি।

অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সেই-সময় এক যথার্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু মনীষীর সঙ্গেই তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নতুন চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদানে ঠাকুর বাড়ী তখন এক মহামিলন ক্ষেত্র। 1912 সালে এখানেই 'বিচিত্র সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিবেশে জাতীয় শিল্প চেতনার উন্মেষ ঘটানোই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব জাতীয় শিল্প সংগ্রহ থেকে উপাদান নিয়েই শিল্পী কুমারস্বামী এঁকেছেন তাঁর বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান ড্রইংস'।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের আঁকা ছবিগুলি ও তাঁর ছাত্রদের আঁকা কিছু ছবির প্রদর্শনী হয় 1913 সালে প্যারিস ও লণ্ডনে এবং 1919 সালে টোকিওতে। তবে বিশের দশকেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভার বহুমুখী ধারা ও পদ্ধতির পূর্ণ স্ফুরণ ঘটে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুশিল্প বিভাগের বাণীশ্বরী অধ্যাপকরূপে তিনি যে বক্তৃতা দেন ভাবের সহজ প্রকাশে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয়ে ও শিল্পের প্রগাঢ় জ্ঞানে সেটি একটি বিরল ভাষণ। শিল্প জগৎ নিয়ে লেখা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ 'বাংলার ব্রত', 'ভারত শিল্পে মূর্তি', 'ভারত শিল্প', বা 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ'—এগুলিও তাঁর গভীরতা, বিদগ্ধতা ও সাবলীলতার স্বাক্ষর রেখেছে।

তিরিশের দশকে পরিণত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ রূপ, রঙ ও রেখার অপূর্ব সমন্বয়ে হয়ে উঠলেন শিল্পের যাদুকর। তাঁর সৃষ্টি এ সময় বিগত দিনের কল্পনার আতিশয্যকে ছেড়ে অনেকাংশে বাস্তবমুখী হয়েছে। 'মাস্কস্' এবং 'স্টিল—লাইফস্' পর্যায়ের ছবিগুলিতে এই ধারার প্রকাশ ঘটেছে। তবে 'কাটুম-কুটুম' পর্যায়ের শিল্পকৃতি ও পুতুলগুলিই এই নতুন শিল্পরীতির চূড়ান্ত পরিণত নিদর্শন।

1942 সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর আচার্য পদ অলঙ্কৃত করেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত বিশ্বভারতী তাঁর শৈশব স্মৃতিকে জাগিয়ে তুললো। এ সময়ের লেখা 'আপন কথা', 'ঘরোয়া',

'পথে বিপথে' এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থগুলিতে তিনি তাঁর শৈশব জীবন ও কালকে অম্লান করে রেখেছেন। সেই সঙ্গে এগুলি তৎকালীন সমাজ-জীবন চিত্রের এক প্রামাণিক দলিল।

শিল্পীরূপে অবনীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বিশ্বের দরবারে ভারতের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় শিল্পী যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

শিক্ষাবিদরূপে অবনীন্দ্রনাথ একান্তভাবে ব্যক্তির একটি নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিমায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও শিল্পকৃতিকে সমর্থন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাগুরুর কর্তব্য হল সহজ পরিবেশ সৃষ্টি যার মধ্যে শিক্ষার্থীর স্বকীয়তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটতে পারে। সম্ভবতঃ এই কারণেই তাঁর ছাত্র নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সুরেন গাঙ্গুলি, ক্ষিতীন মজুমদার ও অন্যান্যরা পরবর্তীকালে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পকলার সুযোগ্য ধারক ও বাহকরূপে সুপরিচিত হন। অন্যদিকে এই খোলামেলা শিক্ষা পদ্ধতির জন্য অবনীন্দ্রনাথ সাধারণ মাপের শিক্ষার্থীর জন্য কোন নির্দিষ্ট শিল্পরীতির প্রবর্তন করে যেতে পারেন নি।

সাহিত্যরচনা ক্ষেত্রেও অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এক বিরল প্রতিভাধর শিল্পী। শব্দ রচনা করে তিনি ছবি এঁকেছেন। তাঁর অসাধারণ সূক্ষ্ম রচনায় কল্পনার জগৎ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিসুলভ ভাবাবেগ ও শিল্পীজনোচিত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর রচনাকে কালোত্তীর্ণ করেছে। শিশু সাহিত্যের জন্য তিনি এক বিরাট ভাণ্ডার রেখে গেছেন।

তবু এই বিরল প্রতিভাধর মানুষটিই আমাদের যুগের একমাত্র ব্যক্তি যাঁর যথার্থ মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গেই এদেশে আধুনিক শিল্প যুগের সূচনা হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়া আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত মর্যাদার আসন লাভ করতে পারতো না। এইখানেই অবনীন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব এবং কালজয়ী ঐতিহাসিক ভূমিকা।

অবনীন্দ্রনাথের রচিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে স্বল্প কয়েকটির উল্লেখ করা গেল। যেমন—'শকুন্তলা' (আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস, কলকাতা), 1895; 'ক্ষীরের পুতুল' ('আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস, কলকাতা), 1896; 'রাজকাহিনী', প্রথম খণ্ড (হিতবাদী লাইব্রেরী), 1909; 'ভারতশিল্প' (হিতবাদী লাইব্রেরী), 1909; 'ভূতপত্রীর দেশ' (ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস), 1915; 'নালক' (ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস), 1916; 'পথে বিপথে' (গুরুদাস চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড সন্স), 1919; 'বাংলার ব্রত' (ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস), 1919; 'খাজাঞ্চির খাতা' (ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস), 1921; 'চিত্রাক্ষর' (ব্যক্তিগত প্রকাশনী), 1929; 'রাজকাহিনী' দ্বিতীয় খণ্ড (গ্রন্থ বিহার), 1931; 'বুড়ো আংলা' (এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স), 1941; 'ঘরোয়া, (বিশ্বভারতী), 1941; 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), 1941; 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (বিশ্ব-ভারতী), 1944; 'আপন কথা' (সিগনেট প্রেস), 1946; 'সহজ চিত্রশিক্ষা' (বিশ্ব-ভারতী), 1946; 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ', (বিশ্ব-ভারতী), 1947; 'ভারত শিল্পে মূর্তি' (বিশ্ব-ভারতী), 1947; 'মাসী' (বিশ্ব-ভারতী), 1954; 'একে তিন তিনে এক' (এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স), 1954; 'শিল্পায়ন' (সিগনেট প্রেস), 1955; 'মারুতির পুঁথি (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ), 1956; 'রঙ-বেরঙ' (অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির), 1958; 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ), 1959; 'অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন' (অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির), 1960। (বিদেশী ভাষায় ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত অবনীন্দ্রনাথের গ্রন্থ তালিকাঃ গোল্ডেন জুবিলী নাম্বারঃ জার্ণাল অফ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টঃ 1961)।

[Jaya Appaswamy — Abanindranath Tagore and the Art of His Times, Lalit kala; 1968; Hiranmoy Banerjee—The House of The Tagores, Calcutta, 1965; Govind Chandra Rai—Abanindranath Tagore, Calcutta, 1933; G. Venkatachalam—Contemporary Indian Painters, Nalanda Publications, Bombay; Centenary of the Government College of Art and Craft, Calcutta, 1864-1964, 1967 সালে প্রকাশিত; Journal of the Indian Society of Oriental Art, Golden Jubilee Number, Calcutta, 1961; Benode Behari

Mukherjee—Abanindranath and His Tradition, Lalit Kala Contemporary, Vol. I, June 1962 ; Suresh Chandra Banerjee—Abanindranath Tagore : The Man And His Art, in the Modern Review, Vol. XXI, No. 5, May 1922 ; Mukul Dey—Life Story of Abanindranath Tagore, in the Modern Review, February 1935 ; Mohanlal Ganguli—The Universal in Everyday Objects as Seen by Abanindranath, in the Modern Review, February 1942 ; E. B. Havell—The New Indian School of Painting, The Studio, London, 1908 ; Madsen Juel—Abanindranath Tagore, the Rupam, Nos. 19 and 20, July—Dec. 1924 ; কানাই সামন্ত—চিত্রদর্শন, বিদ্যোদয়, কলকাতা, 1960 ; অশোক মিত্র—ভারতের চিত্রকলা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, 1960 ; The Visva-Bharati Quarterly, Abanindranath Special Number, Vol. VIII, Parts I & II, May-Oct. 1942 ; বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, 1372 বঙ্গাব্দ ; Rabindranath Tagore : A Centenary Volume (1861-1961), Sahitya Akademi কর্তৃক প্রকাশিত, 1961 ; ভারত-কোষ, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, 1963 ; সবিতা (বাংলা মাসিক পত্রিকা), ভাদ্র 1372 বঙ্গাব্দ ; Hundred Years of the University of Calcutta, Vol. I, 1956 ; The Hindusthan Standard, 6 December 1951.]

অমিয়া বরাট **কাঞ্চন চক্রবর্তী**

অবন্তিকাবাঈ গোখলে (১৮৮২-১৯৪৯)

Avantika Bai Gokhale (1882-1949)

1882 সালের 17 সেপ্টেম্বর তাসগাঁও এ (প্রাচীন সাতারা জেলা) চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে অবন্তিকাবাঈ গোখলের জন্ম হয়। বিষ্ণুপান্থ যোশী ছিলেন তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন সত্যভামাবাঈ। তাঁর কোন নিকট আত্মীয় ছিল না। 1891 সাল পর্যন্ত তিনি ইন্দোরে তাঁর পিতামাতার সঙ্গে বাস করতেন। সেখানে তাঁর পিতা রেলওয়ে বিভাগের এক সামান্য কর্মচারী ছিলেন। তাঁর পিতামাতা এত গোঁড়া ছিলেন যে তাঁকে কোনরকম লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাবেন নি। 1891 সালে তাঁদেরই প্রতিবেশী অপর এক রেল কর্মচারী নাগপুরের গোপালরাও গোখলের পুত্র বাবনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর অবন্তিকাবাঈর স্বামী 1895 সালে লণ্ডন ও চীনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত ঘরে বসেই তাঁকে লেখাপড়া শেখান। অতঃপর তাঁর শ্বশুরের উৎসাহে তিনি 1901 সালে ধাত্রী বিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা প্রাপ্তি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, মারাঠী ও ইংরাজী কবিতা, নাটক, উপন্যাস, জীবনচরিত প্রভৃতি পড়ার ফলে তাঁর মনের দিগন্ত আরও ব্যাপ্তি লাভ করে। 1898 ও 1903 সালে মেশিন চালানো কালীন পর পর দুটি দুর্ঘটনায় তাঁর স্বামী হাতের আঙ্গুলগুলি হারান। এই দুর্ঘটনার পর 1904 সালে বোম্বাইতে পত্নীর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন। অবন্তিকাবাঈ তখন সেখানেই ধাত্রীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। একমাত্র তিনিই উপার্জনক্ষম থাকায় তাঁরা জীবনে সন্তানলাভের চেষ্টা না করাই স্থির করেন।

1904 থেকে 1922 সাল তিনি ধাত্রী হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 1913 সালে তিনি প্রখ্যাত সমাজ সেবকদের তত্ত্বাবধানে শ্রমিকাঞ্চলে কাজ করার জন্য সোস্যাল সার্ভিস লীগে যোগদান করেন। 1913 সালে তিনি ইচালকরাঞ্জের রানীর সঙ্গে লণ্ডন যাত্রা করেন। সেখানে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, সরোজিনী নাইডু ও লণ্ডনের বিশিষ্ট সমাজসেবকদের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি কয়েকটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং ডাক্তারি ক্ষেত্রে কার্যকরী বহু বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

গোখলে দম্পতি 1916 সালে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সময় প্রথম গান্ধীজির সঙ্গে মিলিত হন। তিনি তাঁদের সবরমতী আশ্রম দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। আশ্রম দর্শনের পর তাঁরা গান্ধীজিকে অনুসরণ করবেন বলে স্থির করেন। 1917 সালের প্রথমার্ধে গান্ধীজি পরিচালিত চম্পারন (বিহার) সত্যাগ্রহে অবন্তিকাবাঈ যোগদান করেন। গান্ধীজির তত্ত্বাবধানে তিনি গ্রামাঞ্চলে স্বাক্ষরতা, সুনীতি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করতেন।

চম্পারনে থাকাকালীন তিনি মারাঠীতে গান্ধীজির জীবনচরিত 'মহাত্মা গান্ধী য়ানচেন চরিত্র' রচনা করেন। লোকমান্য তিলকের মুখবন্ধসহ এটি 1918 সালের জুন মাসে বোম্বাই-এ প্রকাশিত হয়। এটিই গান্ধীজির প্রথম জীবনচরিত।

1918 সালের 27শে নভেম্বর অবন্তিকাবাঈ বোম্বাই-এ হিন্দু মহিলা সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটানা আটত্রিশ বছর এর সভাপতিত্ব করেন। এখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে বহু নারী সেলাই, সূচী শিল্প, তাঁত বুনন শিক্ষা করেন। 1926 সাল থেকে কয়েক বছরের জন্য বোম্বাই মিউনিসিপ্যালীটির সদস্যরূপে মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কর্মব্যবস্থা ও কর্মীদের অবস্থার উন্নতির জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পুরসভা থেকে কেবল যা দক্ষিণা পেতেন সবই তিনি দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহে দান করে দিতেন।

1920 থেকে 1946 সাল পর্যন্ত তিনি জাতির উন্নতিকল্পে কংগ্রেস কর্তৃক অবলম্বিত যাবতীয় কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বেশ কয়েকবার কারারুদ্ধও হন। 1920 থেকে 1946 সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর তিনি গান্ধীজিকে তাঁর জন্মদিনে স্বহস্তে তৈরী এক জোড়া খাদির ধুতি উপহার দিতেন। 1932 সাল থেকে তিনি হরিজনদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন।

তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে জীবন যাপন করতেন এবং সর্বদা খাদিবস্ত্র পরিধান করতেন। তিনি ইন্দু নামে এক সারস্বত বালিকাকে নিজ কন্যারূপে দত্তক নেন এবং তাকে ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেন। 1940 সালে তিনি এই বালিকার বিবাহের জন্য ব্যাঙ্কে পাঁচ হাজার টাকা মজুত রাখেন।

অবন্তিকাবাঈ'র সবিশেষ প্রচেষ্টাতেই বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্রের নারী সমাজ জাতীয় ও সামাজিক কর্মসূচী সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। 1930 সালে বোম্বাইতে "দেশসেবিকা দল" এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। তাঁর সংগঠিত "হিন্দ মহিলা সমাজ" এর মাধ্যমে তিনি নারীদের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় এবং জাতীয় কর্মোদ্দীপনার প্রসার ঘটান।

[Kanitkar, R. P. Chitramaya Jagat, May 1949 ; Tiwari, Vinayak, Adarsh Hind Mahila, Gokhale Avantikabai —Mahatma Gandhi Yanchen Charitra Vishesha Parichaya, Lekha Va Vyakhyanen, Bombay. 1918.]

সি. বি. খৈরমোদেয়

অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৭৪-১৯৩৮)

Abinash Chandra Chakravarty (1874-1938)

অবিনাশ চন্দ্রের জন্ম কলকাতায় 1874 সালের জুন মাসে। তাঁর পৈতৃক নিবাস উত্তর বঙ্গের পাবনা জেলার ভরুঙ্গা গ্রামে। তাঁর পিতা মাধব চন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন একজন সাব-জজ। অবিনাশ চন্দ্র কলকাতার হিন্দু স্কুলে পড়াশুনা করেন এবং এই স্কুল থেকেই 1891 সালে এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1894 সালে এফ. এ., 1896 সালে বি. এ., 1898 সালে এম. এ., এবং 1899 সালে তিনি ল' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1900 সালে তদানীন্তন সরকার তাঁকে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত করেন।

অবিনাশ চন্দ্র তরুণ বয়সে বাংলা ভাষায় 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' রচয়িতা রজনীকান্ত গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রমেশ চক্রবর্তী এবং অপরাপর জাতীয়তাবাদী লেখকদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর পিতৃদেব এঁদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন এবং এঁরা প্রায়ই তাঁদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতেন। তাঁদের আলোচনার প্রভাবে তিনি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় দীক্ষিত হন। 1805-06 সাল থেকে স্বদেশী আন্দোলনের এবং পরবর্তীকালের বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। এই সময় তিনি হুগলীতে চাকুরীরত ছিলেন। এখানে তিনি ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পান শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও অন্নদা কবিরাজ মহাশয়কে। ক্রমশঃ তিনি অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব) এবং পি. মিত্রের সাহচর্য লাভ করেন। উত্তর বঙ্গে বিশেষ করে পাবনা এবং রাজশাহীতে বিপ্লবী দল সংগঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কলকাতার অনুশীলন সমিতি, মাণিকতলার দল এবং আত্মোন্নতি দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এদের কার্যাবলীর জন্য তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন। 1908 সালে মাণিকতলা বাগানে তল্লাশী হলে এবং আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ, বারীণ এবং

অন্যান্যরা ধৃত হলে এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে অবিনাশ চাকুরীচ্যুত হলেন। এসময় তিনি ছিলেন নারায়ণগঞ্জের মুন্সেফ। অবিনাশ কলকাতায় ফিরে আসেন এবং হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

বিপ্লবাত্মক কাজে অধিকাংশ সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখার জন্য অবিনাশ পেশাগত দিকে বিশেষ মনোযোগী হতে পারেন নি। তাঁর পিতা তাঁর জন্য প্রায় আশি হাজার টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর বঙ্গ ও কলকাতার বিপ্লবী সংগঠনগুলির জন্য এই টাকার অধিকাংশই তিনি ব্যয় করেন। যতীন ব্যানার্জী, বারীণ ঘোষ, ইন্দিরা নন্দী, বিপিন গাঙ্গুলী প্রমুখের মত সক্রিয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত হবার পর তিনি বিপ্লবাত্মক কাজকর্মে অধিকতর মনোযোগ দেন। এই সময় তিনি কার্তিক দত্তের ছাত্রভাণ্ডার দল, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, কিরণ মুখার্জী এবং অন্যান্যদের সংস্পর্শে আসেন। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দে মাতরম্ এবং নবশক্তি নামধেয় এই সময়কার বিপ্লবীদলগুলির মুখপত্রসমূহের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

অরবিন্দ এবং অন্যান্যরা কারান্তরীন হলে বিপ্লবীদলের যোগসূত্রগুলি ছিন্ন হতে বসেছিল। এই সংকটকালে অবিনাশ চন্দ্র দলের পুনর্গঠনের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন এবং হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে একত্রিত হবার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

1913 সালের দামোদরের ভয়াবহ বন্যায় তিনি উত্তর বঙ্গের বিপ্লবীদের নিয়ে মহাজন সেবা সমিতি নামে একটি ত্রাণ-সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির মাধ্যমে তিনি অবিনাশ রায় সহ উত্তর বঙ্গের অন্যান্য কর্মীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট প্রবর্তিত হওয়ার পর তিনি ধরা পড়েন এবং একটি গ্রামে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। কিন্তু 1916 সালে তাঁকে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হয়। 1818 সালের রেগুলেশনের তিন নম্বর ধারা অনুসারে পরে তাঁকে হাজারীবাগ জেলে রাখা হয়। কারামুক্তি লাভের পর, অপর এক বন্দী প্রভাস দে-র সহযোগে তিনি মহাজন ব্যাংক নামে একটি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। অধিকন্তু তাঁকে এজন্য ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনালে তাঁকে একজন কর-নির্ধারক রূপে নিযুক্ত করেন। এর ফলে তাঁর কিছু আর্থিক সুরাহা হয়। তিনি গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংসার পথকে মেনে নিতে পারেন নি এবং 1921 সালের পর রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন।

তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। কলকাতার ভাড়া করা একটি বাড়ীতে 1938 সালের জুন মাসে তাঁর জীবনান্ত হয়। তাঁর জীবনের শেষ কটি বছর তাঁকে কঠোর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

নির্মল চরিত্র ও অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী অবিনাশ চন্দ্র ছিলেন জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তিনি ছিলেন সেই সব বিরলদৃষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম, যাঁরা নিজেদের লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে ভালবাসতেন। বিপ্লবাত্মক ক্রিয়া কর্মে অবদান ও নিষ্ঠায় সে যুগে আর কোন রাজনৈতিক কর্মী তাঁর থেকে এগিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। অন্যান্য সব বিপ্লবীদের মতই সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী ; বর্ণ বা জাতিগত বিদ্বেষ তিনি পোষণ করতেন না। স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক বিষয় সমূহের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর জীবনে যাঁরা সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁরা হলেন তাঁর পিতৃদেব এবং রজনী গুপ্ত ও যোগেন বিদ্যাভূষণ।

[Jadugopal Mukherjee—Biplabi Jibaner Smriti, Calcutta, 1363 B. S. ; Girija Shankar Roy Chowdhury—Sri Aurobindo O Banglay Swadeshi Yuga, Calcutta, 1956 ; Bhupendra Nath Datta—Bharater Dwitiya Swadhinata Sangram, Calcutta ; Hemchandra Das Kanungo—Banglay Biplabi Prachesta, Calcutta ; R. C. Majumdar—History of the Freedom Movement in India, Vol. II, Calcutta, 1963 ; Information supplied by Kalipada Bagchi, Bhupendra Kumar Datta and Jogen De Sarkar ; Personal knowledge of the contributor.]

অরুণ চন্দ্র গুহ

অভয়ংকর মোরেশ্বর বাসুদেও (১৮৮৬-১৯৩৫)

Abhyankar Moreshwar Vasudeo
(1886-1935)

1886 সালের 29 আগস্ট ওয়ার্ধা জেলার ধানোডি গ্রামে মোরেশ্বরের জন্ম হয়। তাঁর পিতা বাসু দেওরাও নামান্তরে দাদা সাহেব একজন ধনী মালগুজার ছিলেন। তাঁর মাতাও ধনী পরিবারের কন্যা ছিলেন। ধনীর সন্তান মোরেশ্বরপন্ত্ আজীবন ঐশ্বর্যের মধ্যে অতিবাহিত করেন। তাঁর দুই ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী ছিলেন।

বালক মোরেশ্বর ধানোডি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ভাণ্ডারায় মিডল স্কুলে ভর্তি হন। 1898 সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য নাগপুরে যান। একবার ব্যর্থ হবার পর 1901 সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ও মরিস কলেজে ভর্তি হন। কলেজের প্রথম বর্ষের বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পেরে 1906 সালে তিনি ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলাত যান। 1909 সালে তিনি ব্যারিস্টার হয়ে ভারতে ফিরে আসেন।

1905 সালে তিনি ওয়ার্ধার একজন খ্যাতনামা আইনজীবীর কন্যা রমাবাঈকে বিবাহ করেন। তাঁর তিন কন্যা ও দুই পুত্র।

ইংলণ্ডে অভয়ংকর দাদা সাহেব খাপার্দে, বিপিন চন্দ্র পাল ও লালা লাজপত রায় এর সংস্পর্শে আসেন। নাগপুরে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন। রাজনীতির প্রতি তাঁর তীব্র আগ্রহ তাঁকে দাদাসাহেব উধোজি ও ডঃ মুনজের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। তবে লোকমান্য তিলককেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরু বলে মানতেন। তিনি তিলকের হোম রুল আন্দোলনের সপক্ষে প্রচার চালাবার জন্য তাঁর সঙ্গে সমগ্র বেরার ও মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ করেন।

অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনে অভয়ংকর 1919 সালের সংস্কারগুলি গ্রহণের সপক্ষে গান্ধীজীর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা আদালত বয়কট করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি স্পষ্টতই বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ হওয়া উচিত নয়। 1922 সালের গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের পর তিনি স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ মিছিল পরিচালনা করেন। 1930-32 সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং গ্রেপ্তারবরণ করেন।

1922 সালে অভয়ংকর একটি সমাজ সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান মনে করে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। কিন্তু 1927 সালে এটি যখন ক্রমশঃ রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হতে থাকে তখন তিনি এই দল ত্যাগ করেন।

অভয়ংকর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণা করতেন কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবিত অভয়ংকরের সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। জাতিভেদ প্রথা ও সনাতন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। সমাজে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার দাবীর তিনি ছিলেন প্রবক্তা। তিনি হরিজন সেবামণ্ডলের প্রধান ছিলেন। কংগ্রেস দলেও তিনি উচ্চপদে আসীন ছিলেন।

প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারে, দীর্ঘ অবয়বে, বীরোচিত তেজস্বিতায় ও দেশপ্রেমে তিনি সত্যই ছিলেন পুরুষ সিংহ, 'নরকেশরী'।

[Nana Abhyankar : Vasishtuche Pani, arthat Narakesari : Narakesari M. V. Abhyankar, Bar-at-law, Yanche Charitra (Marathi) Nagpur, 1965.]

(এম. এ. দেসপাণ্ডে) **বি. কে. আপ্তে**

অভেদানন্দ স্বামী (১৮৬৬-১৯৩৯)

Abhedananda Swami (1866-1939)

1866 সালে 2 অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দ কলকাতার আহিরীটোলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকালে তিনি কালিপ্রসাদ নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন, তাঁর পিতা রসিকলাল চন্দ ঐ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি দর্শন ও ধর্মের সমস্যাবলী নিয়ে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন এবং সত্যের অন্বেষণ এবং বিজ্ঞান এবং দর্শনের সমন্বয়সাধনের তাগিদে বহু দুঃখ ও শ্রম স্বীকার করেছিলেন। ভারতীয় সাধকদের প্রদর্শিত পথেই তিনি ইন্দ্রিয় সংযম ও একাগ্রতা অনুশীলন করতেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মত সমস্যাগুলিকে তীক্ষ্ন চিন্তা ও বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করার জন্যও তিনি গভীর নিষ্ঠাসহকারে পড়া-

শূনা করতেন। মনের অস্থিরতায় একদিন হঠাৎ, বলতে গেলে এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে, বেশ কয়েকমাইল দূরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মহাসাধক রামকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হলেন।

তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত শুরু করেন এবং অবশেষে নির্দ্বিধায় তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে তাঁরই উপদেশ ও নির্দেশ-এ তিনি পরম সত্যকে উপলব্ধি করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন "তুমি পূর্ব জীবনে এক বিরাট যোগী ছিলে।" স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী অভেদানন্দের দক্ষতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, বিচার ক্ষমতা ও সহৃদয়তা বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিলেন। শীঘ্রই তাঁদের সখ্যতা অধ্যাত্ম আলোর প্রাণবন্ত সূর্যের ন্যায় বিকশিত হয়েছিল এবং আধুনিক জগতের ধর্মীয় চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি লাভের পরে তাঁর ভক্ত শিষ্যরা ব্যক্তিগত সাধন প্রচেষ্টায় নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েন। স্বামী অভেদানন্দও (দীক্ষার পরে তিনি এই নামে পরিচিত হয়েছিলেন) একাকী নগ্ন পদে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করে এবং জনহীন প্রান্তর, মরু ও পর্বতের পাদদেশকে নিদ্রার আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ করে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন। সদ্‌গুরুর আশীর্বাদপুষ্ট শিষ্যসম্প্রদায়কে এভাবেই পূর্ণতার পথে পদক্ষেপ করতে হয়েছিল।

দশ বছর পরিব্রাজক রূপে ভ্রমণ এবং বহু সময় হিমালয়ের কোলে গভীর ধ্যানমগ্ন থাকার পর 1896 সালে তিনি লণ্ডন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত একটি বার্তা পান তাঁর লণ্ডনস্থিত কেন্দ্রের পরিচালন ভার গ্রহণের জন্য। এক বছর পরে লণ্ডনে তাঁর কাজ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হলে বিবেকানন্দ তাঁকে নিউ ইয়র্ক যেতে ও সেখানে বেদান্ত সোসাইটি সেণ্টার সংগঠিত করতে অনুরোধ জানান।

এরপর থেকে প্রাণবন্ত ও উদ্যমশীল স্বামীজীর কোন বিশ্রাম ছিল না। তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, নিজের বক্তৃতার সম্পাদনা করেছেন, যোগের ক্লাস নিয়েছেন এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বিভেদের মধ্যে ঐক্য এবং প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। তিনি তাঁর কেন্দ্র ও আশ্রমগুলিকে এমন স্বনির্ভর করে তুলেছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক পরিদর্শনে গিয়ে বলেছিলেন, 'তিনবার আমি নিউইয়র্কের দ্বারে এসে করাঘাত করেছি কিন্তু কোন সাড়া পাই নি। তুমি এখানে স্থায়ী সদর কার্যালয় স্থাপন করতে পেরেছ দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই বারই প্রথম আমি নিউইয়র্কে নিজেদের ঘর খুঁজে পেলাম।'

স্বামী অভেদানন্দ পশ্চিমের জনগণকে খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করার নির্দেশ দেন নি, বরং জাগতিক দুঃখের প্রতিরোধে বেদান্তের কঠোর শৃঙ্খলা ও আশ্বাসবাণী এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তাঁদের ধর্মমতে প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রধানতঃ চরিত্র গঠনের উপরেই অধিক জোর দিয়েছিলেন। মানব-জাতির সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজা করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

তিনি ব্যাপকভাবে কানাডা, আলাস্কা, মেক্সিকো, জাপান, হংকং, ক্যানটন, ম্যানিলা, হনলুলু এবং তিব্বত প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। সর্বত্রই তাঁর বেদান্ত ও ভারতীয় দর্শনের উপর বক্তৃতা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং সুগভীর ছাপ রেখেছে।

1921 সালে সুসংগঠিত আশ্রম এবং কেন্দ্রসমূহের ভার উপযুক্ত হাতে ন্যস্ত করে চির উদ্যমী স্বামীজী স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন করে বাংলা ও বিহারে বহু মঠ ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করলেন। 1939 সালের 8 সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতার রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মহাসমাধি লাভ করেন। ভারতীয় মৌলিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে জনশিক্ষার প্রসার তিনি চেয়েছিলেন।

তিনি লামা ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দুদর্শন এবং জাপান ও চীনের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে অসংখ্য রচনাও লিখেছিলেন। তিনি তাঁর 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপ্‌ল' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরবর্তীকালে যা আরবের যাযাবর সম্প্রদায়ের মাধ্যমে গ্রীসে এবং রোমে প্রচার লাভ করে তার সম্পূর্ণ ইতি-হাস বিধৃত করেছেন। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির ক্রমানু-সারে তিনি ধর্মের শ্রেণী বিভাগ করেন। তিনি প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ করে জোর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এর উপরেই ভারতের অখণ্ডতা নির্ভর করবে।

স্বামী অভেদানন্দ কর্মকেই মানুষের জন্ম ও ভাগ্য বৈষম্যের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য কারণ বলে সমর্থন করেছেন। তিনি সরলভাবেই বলতেন 'প্রেমই অদ্বৈতের অভিব্যক্তি। ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই একমাত্র পথ এবং শেষ অবলম্বন'। সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব সুস্থ ও সুন্দর প্রথার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। তিনি কখনও

অস্পৃশ্যতা প্রথাকে সমর্থন করেন নি।

বস্তুতঃ স্বামী অভেদানন্দ সার্থকভাবে জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে দেশ সেবা করেছেন। যথার্থই তিনি আধুনিক ভারত রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম।

[Swami Saradananda (Translated into English by Swami Jagadananda),— 'Sri Ramakrishna, the Great Master' (Madras, 1958); Burke, Marie Louise—'Swami Vivekananda in America' (Calcutta, 1958); 'The Cultural Heritage of India' Vol. III (Calcutta, 1937); Majumdar, R. C.— History of the Freedom Movement in India', Vol. I (Calcutta, 1957); Smt. Savitribai Khanolkar—'Bhavan's Journal' Vol. XXI, No. 6, 1974]

মানিক লাল গুপ্ত

অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার (১৯০২-)
Amarnath Vidyalankar (1902-)

1902 সালে 8 ডিসেম্বর বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সারগোদা জেলার ভেরা নামক স্থানে অমরনাথের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন হিন্দু ক্ষত্রী পরিবারভুক্ত। তাঁর শ্রেণীর নাম ছিল চান্দোক।

মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে গুরুকুল কাঙরী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। বাইশ বছর পর্যন্ত গুরুকুলে কাটিয়ে তিনি 1925 সালে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থাতেই 1921 সাল থেকে তিনি দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' তিনি ছিলেন নিয়মিত পাঠক। কৈশোরে লালা লাজপত রায়ের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন এবং অমরনাথ সারভেণ্টস্ অফ দি পিপল্ সোসাইটির আজীবন সদস্য হন। এই সোসাইটি প্রথমে তাঁকে ন্যাশনাল কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করে।

তাঁকে লালা লাজপত রায়ের সেক্রেটারী রূপে কাজ করতে এবং তাঁর লেখাপড়ার কাজে সাহায্য করতে পাঠান হয়। 1928 সালের নভেম্বর মাসে লালাজী মারা যান। পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন সোসাইটির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং তিনি 'পাঞ্জাব কেশরী' নামে একটি হিন্দী সাপ্তাহিক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। অমরনাথকে এই পত্রিকা সম্পাদনার ভার দেওয়া হয়।

1930 সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় 'পাঞ্জাব কেশরী'র প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয় এবং অমরনাথ দুবছর কারারুদ্ধ থাকেন। তিনি জেলে থাকাকালীন তাঁর মাতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। 1942 সালে বিদ্যালঙ্কার পুনর্বার যখন জেলে তখন তাঁর পিতা মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে দেখতে পাননি।

লালা লাজপত রায়ের জীবিত কালেই অমরনাথকে হিসার জেলায় দুর্ভিক্ষের ত্রাণকার্য পরিচালনা করতে পাঠান হয়। 1934-35 সালে এই জেলা পুনরায় দুর্ভিক্ষ কবলিত হয় এবং পিপল্ সোসাইটি অমরনাথকে ত্রাণকার্যে পাঠান। প্রায় নয় মাস হিসারকে তাঁর প্রধান কেন্দ্র করে হরদেব সহায় ও ঠাকুর দাস ভার্গবের সহযোগিতায় তিনি সমগ্র জেলায় দুর্ভিক্ষত্রাণ সংগঠন গড়ে তোলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত দূরতম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিও তিনি পরিভ্রমণ করেন।

এই সময়ে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পাঞ্জাব শাখা সংগঠিত হয়। বিদ্যালঙ্কার অমৃতসরের কল কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন কাজ শুরু করেন। অমৃতসরে শ্রমিকদের তখনও পর্যন্ত কোনও সুসংবদ্ধ সংগঠন ছিল না।

সারভেণ্টস্ অফ দি পিপল্ সোসাইটির তিনজন সদস্য, বিদ্যালঙ্কার স্বয়ং এবং মোহন লাল ও অধ্যক্ষ ছবিল দাস সক্রিয়ভাবে সমগ্র পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ বিদ্যালয় স্থাপনে সক্রিয় হন। অধ্যাপক ব্রিজ নারায়ণ তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। সমগ্র দেশ তখন ত্রিশ দশকের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত।

কিষাণ আন্দোলনের শরিক হয়ে বিদ্যালঙ্কার বন্দী হন ও 1941 সালের শেষের দিকে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু 1942 সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হলে তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন এবং 1946 সাল পর্যন্ত তিনি জেলে বন্দী ছিলেন।

1946 সালের সাধারণ নির্বাচনে বিদ্যালঙ্কার কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করেন। এ বছরই তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মনোনীত হন। এ সময় তিনি সারভেণ্টস্ অফ দি পিপল্ সোসাইটিতে তাঁর বিশ বৎসরের সদস্য জীবন পূর্ণ করেন কিন্তু তাঁর সদস্য পত্রের নবীকরণ করেন নি।

1947 সালের অগাস্ট মাসে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং বিদ্যালঙ্কার উদ্বাস্তু ও ছিন্নমূল মানুষদের সমস্যার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এক বছরের বেশী সময় তিনি অমৃতসরে ছিলেন। সেখানে সীমান্তের ওপার থেকে আসা উৎখাত মানুষদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি দিবারাত্রি কাজ করেছেন।

1948 সালের অক্টোবরে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অফিসে স্থায়ী সম্পাদকের পদে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। প্রায় এক বছর তিনি সেই পদে আসীন ছিলেন।

1949 সালের সেপ্টেম্বরে পুরানো পাঞ্জাব বিধান সভায় শ্রমিকের জন্য সংরক্ষিত একটি বিশেষ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়। যেহেতু তিনি অমৃতসরে সুখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন, সেজন্য তাঁকেই এই পদের যোগ্য প্রার্থী রূপে মনোনীত করা হয়। গুরুবক্স সিং ধীলনকে তিনি বিপুল ভোটে পরাজিত করে আসনটি দখল করেন।

পাঞ্জাব বিধান সভায় নির্বাচিত হয়ে তিনি এ. আই. সি. সি. র সম্পাদকের পদটিতে ইস্তফা দেন। 1952 সালে নতুন সংবিধান রচিত হলে তিনি জলন্ধর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও আসনটি দখল করেন। এম. পি. পদের সময়কাল শেষ হবার আগেই পেপসু ও পাঞ্জাবের সংযুক্তিকরণ ঘটায় তাঁকে সর্দার প্রতাপ সিং কাইরণের নেতৃত্বে গঠিত পাঞ্জাব মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে অনুরোধ করা হয়। 1956 সালের নভেম্বর মাসে তিনি শ্রমিক ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী রূপে এই মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। এর পূর্বে 1954 সালে তিনি আই. এন. টি. ইউ. সির ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি রূপে চীনে যান। প্রায় দেড় মাসাধিক কাল তাঁরা সমগ্র চীন পরিদর্শন করেন। 1957 সালে জগধু কেন্দ্র থেকে পুনরায় পাঞ্জাব বিধান সভায় নির্বাচিত হন এবং মন্ত্রীসভায় শ্রম, শিক্ষা ও ভাষা দপ্তরটি লাভ করেন।

1957 সালের মে মাসে জেনেভায় ইণ্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। সে বছরই যুগোশ্লাভিয়ায় শুভেচ্ছা সফরে তিনি ভারতের প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র ছিলেন। 1961 সালে তিনি পুনরায় আফগানিস্তানে শুভেচ্ছা সফরে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং সেখানে তিন সপ্তাহ ছিলেন।

পাঞ্জাবের মন্ত্রী সভায় তিনি পাঁচ বছর কাটান। এর পরে নতুনদের সুবিধা দেবার জন্য তিনি পার্লামেণ্টে ফিরে যাওয়া মনস্থ করেন। 1962 সালে তিনি হোশিয়ারপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভার নির্বাচনে জয়ী হন এবং পুরো সময়ই পার্লামেণ্টের সদস্য থাকেন।

তাঁর পার্লামেণ্টারী কার্যকালে তিনি নিম্নলিখিত পদগুলি অধিকার করেছেন ঃ—পাবলিক অ্যাকাউণ্টস্ কমিটির সদস্য, এস্টিমেটস্ কমিটির সদস্য, কমিটি টু ইনভেস্টিগেট কণ্ডিশন ইন দি ইনফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রি-বিদ্যালঙ্কার কমিটির চেয়ারম্যান, দি স্টাডি টীম টু সাজেস্ট অ্যাডমিনিসট্রেটিভ রিফর্মস ইন দি ডিপার্টমেণ্ট অফ দি ডাইরেক্টর-জেনারেল অফ সাপ্লাই অ্যাণ্ড ডিসপোসালের চেয়ারম্যান, দি ওয়েজ বোর্ড ফর নন-জার্নালিস্ট এমপ্লয়িজ অফ দি নিউজ-পেপারস্ এর সদস্য ইত্যাদি।

1967 সালে চণ্ডীগর কেন্দ্র থেকে তিনি লোকসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কিন্তু সেবার জনসংঘের প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন।

এখন পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস ফোরাম ফর সোসালিস্ট অ্যাকসনের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক।

তাঁর সাহিত্য কীর্তির মধ্যে 'পাঞ্জাব কেশরী' (1930-33), 'আজ কি দুনিয়া', 'আজ কা মানব সানোয়ার', 'মানব সংঘর্ষ' এবং 'ভারত কা ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত বইগুলিই পাঞ্জাব এবং রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক রূপে গৃহীত হয়েছে। তাঁর ইংরেজী রচনার মধ্যে আছে ঃ 'Man—Through the Evolutionary Process,' 'University Education', Social Education in India', এবং 'Miscellaneous Lectures and Writings on Educational Topics.'

[Who's who File in the Panjab State Archives, Patiala ; Directory and Year Book (The Hindustan Times), 1961-62 ; অমরনাথ বিদ্যালঙ্কারের সহিত গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।]

(ডি. এল. দত্ত) বখসিস সিং নিজ্জর

অমর সিং (১৮১২ (?) -১৮৬০)

Amar Singh (1812 (?) -1860)

অমর সিংহ ছিলেন পরমার রাজপুত শাখার অন্তর্ভুক্ত একটি অভিজাত পরিবারের বংশোদ্ভূত। এই শাখাটি উজ্জয়িনী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে বিহারে এসে বসবাস স্থাপন করে। সাহাবাদ জেলায় আঞ্চলিকভাবে তারা উজ্জয়িনীর রাজপুত বলে পরিচিত। এই পরিবারের জগদীশপুর শাখাটিতে অমর সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সাহাবজাদা সিং এর কনিষ্ঠ পুত্র ও কুনওয়ার সিং-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তার জন্মের সঠিক তারিখ না পাওয়া গেলেও 1857 খৃষ্টাব্দে তিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের যুবক ছিলেন বলে জানা যায়। পড়াশোনায় তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে হিন্দীতে অনূদিত তার পারিবারিক ঐতিহাসিক 'উদয়ন্ত প্রকাশ' পুস্তকটি তিনি সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ করেছিলেন।

গদিতে আরোহণ করে কুনওয়ার সিং তার তিন ভ্রাতা দয়াল সিং, রাজপতি সিং ও অমর সিংকে তাদের নিজস্ব খরচাপাতির জন্য কিছু জমি আলাদাভাবে দান করেন। এইসব জমি বাবদ সরকারের ভূমি রাজস্ব জমা দেওয়ার দায়িত্ব কার—এ নিয়ে বাদ বিসম্বাদ এমন কি মামলা মোকর্দমাও চলেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়। ভাইরা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কুনওয়ার সিং-এর প্রতি তাদের আস্থা ছিল অবিচল। সিপাহী যুদ্ধের আগেই দুই ভাই-এর মৃত্যু হয়, অমর সিং সিপাহী অভ্যুত্থানের সময় অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহযোগিতা করেন।

প্রথম জীবনে অমর সিং দ্বিতীয় ভ্রাতা দয়াল সিংহের সঙ্গে দলিপপুরে বসবাস করতেন। পরে তিনি সাহাবাদ জেলায় মাতাহীতে বাসস্থান পরিবর্তন করে সেখানেই আজীবন বসবাস করেন। তার স্ত্রী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। অমর সিং 1860 সনের 5ই ফেব্রুয়ারী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

কুনওয়ার সিং-এর মত অমর সিং-এর জীবনেও নাটকীয় মুহূর্ত ছিল যখন তিনি 1857 সনের জুলাই মাসে দানাপুর রেজিমেণ্ট বিদ্রোহে যোগদান করেন। প্রথমদিকে বিদ্রোহে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অমর সিং কিছু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। 1857-এর আগাস্ট মাসে কুনওয়ার সিং যখন বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রসারের জন্য বিহার ত্যাগ করেন তখন অমর সিং কুইমুর পাহাড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সরকারী শক্তির বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলেন। তাঁর যুদ্ধ পদ্ধতি সরকারকে বিশেষভাবে বিচলিত করে তোলে। তাদের আশঙ্কা ছিল "যদি অমর সিংকে সাসারাম পর্যন্ত এইভাবে যুদ্ধ চালাতে দেওয়া হয় তাহলে আরা অঞ্চলে আকস্মিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে।...যদি আরা অঞ্চল হাতছাড়া হয় তাহলে পাটনার বড় অংশ চলে যাবে এবং গয়া জেলা ছাড়তে হবে।"

1858 সালের এপ্রিল মাসে কুনওয়ার সিং-এর মৃত্যুর পর অমর সিং বিহারের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর যোগ্য সহচর হরেকৃষ্ণ সিং-এর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। পরবর্তী তিনটি মাস লুগার্ড-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারী ফৌজের সঙ্গে তিনি পর পর কয়েকটি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সরকারী ফৌজের আক্রমণে তাঁর বাসভবনটি ধ্বংস হয়। তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনি জগদীশপুরের বিরাট ঘন জঙ্গলটিকে এক দুর্ভেদ্য আশ্রয় রূপে গড়ে তোলেন। এখানে রসদ মজুত রাখার সুব্যবস্থা ছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দারা নিয়মিতভাবে রসদ যোগদানের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। বিহারের যে সকল অঞ্চল তাঁর দখলে ছিল সেখানে তিনি একটি স্ব-উদ্ভাবিত শাসন ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন। আঞ্চলিক কমিশনার এক প্রতিবেদনে জানান অমর সিং আমাদের সরকারী নিয়মকানুন অনুকরণ করে বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করছেন, তাঁরা আমাদের রাজস্ব ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছেন। তার চাইতেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এই যে কমিশনার জানতে পেরেছেন যে জনৈক ব্যবসায়ীকে হত্যার অপরাধে অমর সিং তার বাহিনীর একজন জওয়ানকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছেন। যে ঘটনা প্রমাণ করছে যে বিদ্রোহীরা ন্যায়পরায়ণ এবং আইনানুগ নীতি অনুসরণ করে অপরাধীদের শাস্তিবিধানে কুণ্ঠিত নয়—জনগণের মধ্যে তারা এই ধারণাটি সৃষ্টি করতে চাইছে।

1858 সনে অক্টোবর মাসে ইংরেজ সেনাপতি ডগলাসের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী অমর সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করে। অমর সিং-এর সৈন্যবাহিনীতে চার হাজার সিপাহী এবং পাঁচশত অশ্বারোহী ছিল। সংখ্যাগুরু শত্রু বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী পালামৌ অঞ্চলে আশ্রয় নেন। এক বৎসর পরে অমর সিং

নেপালের তরাই অঞ্চলে নানা সাহেবের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। 1859 সনের ডিসেম্বর মাসে জঙ্গবাহাদুরের সৈন্যবাহিনীর কাছে তিনি ধরা পড়েন। গোরক্ষপুর জেলে তাঁকে বন্দী করা হয়। ভবিষ্যতে যাতে একটি দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরা যায় সেজন্য সরকার অমর সিংকে তাঁর নিজের জেলায় বিচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু অমর সিং 1860 সনের 5ই ফেব্রুয়ারী অসুস্থাবস্থায় জেলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

একজন নিপুণ যোদ্ধা, সব অস্ত্র পরিচালনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। তাছাড়া তিনি ছিলেন অপরিসীম শারীরিক বল এবং সুন্দর অবয়বের অধিকারী। তাঁর নাকের ডানদিকে একটি তিল ছিল। ভাইয়ের মতন শিকারেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। গভীর ধর্মানুরাগ ছিল তাঁর চরিত্রের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রতি রাত্রে তাঁর সামনে মহাভারত পাঠ করা হত। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি পুরী, রামেশ্বরম, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, চিত্রকূট, কাঠমাণ্ডু প্রভৃতি বহু তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শন করেছিলেন।

[Munshi Vinayak Prasad—Tawarikh-i-Vijainiya 1898 ; K. K. Dutta, Biography of Kunwar Singh and Amar Singh, Patna 1957.]

রামেশ্বর প্রসাদ **কালী কিংকর দত্ত**

অমরাবতী শেষাইয়া শাস্ত্রী (স্যার), (১৮২৮-১৯০৩)
Amaravati Sashiah Sastri (1828-1903)

1828 সালের 22 আগষ্ট এক বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অমরাবতী শেষাইয়া শাস্ত্রী। তাঁর জন্মস্থান অমরাবতী অগ্রহারম। এটি অবস্থিত ছিল তাঞ্জোর জেলায় কাবেরীর উল্টো মুখে ভেত্তার নদীর তীরে। তাঁর পিতামহ ছিলেন পুনা দরবারে পেশোয়া কর্তৃক সম্মানিত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিত। শেষাইয়ার পিতা ছিলেন গ্রামের পুরোহিত। শেষাইয়া পিতামাতার পঞ্চম (মতান্তরে ষষ্ঠ) সন্তান। আট বৎসর বয়সে তার উপনয়নের পরেই পিতৃব্য গোপাল আইয়ার (ইনি ছিলেন অলংকার ব্যবসায়ী) শেষাইয়াকে মাদ্রাজে নিয়ে আসেন। এখানেই শুরু হয় তাঁর শিক্ষা জীবন। প্রথমে তিনি জনৈক গৃহশিক্ষকের কাছে তামিল ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। এর পর তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। এখানে একজন পর্তুগীজ ছিলেন তাঁর শিক্ষাদাতা। 1837 থেকে তিন বছরের জন্য তিনি ফ্রী-চার্চ মিশন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। এখানে তাঁকে একটি বাইবেলের কপি দেওয়া হয়। পরবর্তী জীবনে শেষাইয়ার মতে এই বইটি তাঁর চিন্তাধারা ও আচরণকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ কয়েকটি হিন্দু শিক্ষার্থীকে খৃীষ্টধর্মে দীক্ষিত করায় অভিভাবকের নির্দেশে শেষাইয়া এই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে প্রিপেরেটরী স্কুল নামে একটি নতুন বিদ্যালয়ে যোগ দেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁরা যশস্বী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রঙ্গাচার্লু, স্যার টি মাধব রাও প্রমুখরা। এই বিদ্যালয়ে শেষাইয়া ই. বি. পাওয়েল নামক এক প্রবীণ শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই শেষাইয়া ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করেন ; পড়াশুনা ছাড়া খেলাধুলায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। সুন্দর হস্তাক্ষর, তামিল এবং ইংরেজি ভাষায় উৎকর্ষ এবং অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য শেষাইয়া বহু পুরস্কার লাভ করেন। এই সব পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পঞ্চাইয়াপ্পার অনুবাদ পুরস্কার, ভার্নাকুলার পুরস্কার, এলফিনস্টোন পুরস্কার এবং গভর্ণর কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার।

বালক বয়সে শেষাইয়া ছিলেন তোতলা কিন্তু বহু ধৈর্য্য ধরে অবিরাম কথার পর কথা বলে ও নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে এই প্রতিবন্ধকতা তিনি দূর করতে পেরেছিলেন। তার অধ্যবসায় ও সাফল্য প্রাচীন গ্রীসের বাগ্মী-প্রধান ডিমস্থিনিস্-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

পচাইয়াপ্পা মুদালিয়র প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট থেকে নিয়মিতভাবে যে সকল দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের মাসিক বৃত্তি দেওয়া হত, শেষাইয়া তাদের অন্যতম ছিলেন। এ ছাড়া এই ট্রাস্ট থেকেই একটি ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে পুরস্কার স্বরূপ কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন (1846)। পচাইয়াপ্পা মুদালিয়রের উপর রচিত এই প্রবন্ধটি Madras Crescent পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই বছরেই মাদ্রাজের তৎকালীন গভর্ণর Tweeddale এই মেধাবী শিক্ষার্থীকে একটি পরিবারে গৃহ শিক্ষকরূপে নিয়মিত ভাবে মাসিক 25্ টাকা হারে অর্থ উপার্জনের

সুযোগ করে দেন। এই সময় পিতৃব্যের মৃত্যু হওয়ায় সংসার পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া তাঁর উপায়ান্তর ছিল না। মৃত্যু শয্যায় পিতৃব্য তাঁকে এই বলে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন—"বৎস, সর্বদা সৎ আচরণ কর। ভগবান তোমার সহায় হবেন।"

1848 সালে শেষাইয়া কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক স্তরে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে পুরস্কার হিসাবে তিনি পেলেন পান্নাখচিত একটি আংটি। এর কিছুদিন আগে তিনি পিতৃব্য বন্ধু রামস্বামী আইয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

শেষাইয়ার কর্মজীবন শুরু হয় 1848 সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই সময়ে তিনি মাসিক 25⁄ টাকা বেতনে বোর্ড অব রেভিনিউর অধীনে কেরানীর পদ লাভ করেন। এখানে প্রশাসন সম্পর্কে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন পরবর্তী জীবনে তা তাকে প্রভূত পরিমাণে উন্নতি লাভে সহায়তা করেছিল। বোর্ডের কাজকর্ম তদারকির জন্য স্যার ওয়াল্টার ইলিয়টের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠিত হলে তার সঙ্গী হিসাবে শেষাইয়া বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। উড়িষ্যা পর্যন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল দুই বছর ধরে সফর করে শেষাইয়া রাজস্ব সংগ্রহ এবং এই সম্পর্কিত প্রশাসনিক নীতি সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চার করেন।

কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কাজ দেখিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি লাভের ফলে তাদের নির্দেশে শেষাইয়া 1851 সালের মে মাসে মসুলিপত্তনের তহশীলদার নিযুক্ত হন। এই নূতন দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মসুলিপত্তনে লোকগণনার প্রচলন (1852)। ব্রিটিশ ভারতে এটিই লোকগণনার প্রথম দৃষ্টান্ত। 1854 সালে শেষাইয়া নায়েব-সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হলেন। এক বছর পর তিনি মসুলিপত্তনের প্রধান সেরেস্তাদার নিযুক্ত হলেন।

1860 সালে যখন জি. এন. টেলারের অধীনে ইনাম কমিশন গঠিত হয় তখন শেষাইয়া টেলারের বিশেষ সহকারী পদে নিযুক্ত হয়ে প্রধান দপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁর অধীনে করনিকের সংখ্যা ছিল 250। বিভিন্ন ইনামদারদের দাবী দাওয়া নিষ্পত্তি করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আড়াই লক্ষ দলিল পরীক্ষা করেন। 1866 সালে তিনি নিজের জেলা তাঞ্জোরের ডেপুটি কালেকটার নিযুক্ত হন। শেষাইয়া নূতন কাজকর্ম সম্পর্কে জেলা কালেকটার মরিসের উক্তি—"শেষাইয়া নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী একজন প্রথম শ্রেণীর অফিসার।" পূর্বে এখানে যে সব বিশৃঙ্খলা ছিল তা দূর করে ইনি গোটা বিভাগের কার্য পরিচালনায় সংহতি এবং নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করেছেন। এই সময় শেষাইয়া তাঞ্জোর মিউনিসিপ্যালীটির সহকারী সভাপতি মনোনীত হন। তাঁর উদ্যোগে নগরশাসন ব্যবস্থায়, বিশেষতঃ জল সরবরাহ, রাস্তাঘাটের উন্নয়নে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। 1868 সালে শেষাইয়া মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হন। পরের বছর তিনি লাভ করেন মাদ্রাজে বোর্ড অব রেভিনিউর প্রধান সেরেস্তাদারের পদ। এরপর তাঁর যোগ্যতার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি তিনি পেলেন যখন তাঁর বন্ধু এবং স্কুল সহপাঠী স্যার টি মাধব রাও-এর জায়গায় 1872 সালে তেনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হন।

দেওয়ান হিসাবে শেষাইয়া অসামান্য সাফল্য প্রদর্শন করেন। রাজ্য প্রশাসন খুব মিতব্যয়িতার সঙ্গে পরিচালনা করে তিনি রাজ্যের আয় ঘাটতির পরিবর্তে উদ্বৃত্তে পরিণত করেছিলেন। আমলারা যাতে সৎ এবং নিপুণ হতে পারে সেজন্য তিনি তাদের মাহিনার হার বৃদ্ধি করেন। পুরনো পদ্ধতিতে সরকারী কাজকর্ম চলতো তালপাতায় লেখা দলিলপত্রের সাহায্যে, তিনি তালপাতার পরিবর্তে কাগজের ব্যবহার প্রচলন করেন। লবণ বিভাগের শুল্ক আদায় ব্যবস্থায় যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল তাও তিনি দূর করেন। পরীক্ষামূলকভাবে তিনি রাজ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর উদ্যোগে বহু জনহিতকর কাজ শুরু হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উরকাবল্লী বাঁধ, ত্রিবান্দ্রাম শহরের শ্রীবৃদ্ধি, পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত পদ্মতীর্থম-এর সংস্কার। মূল মন্দিরের অলঙ্করণ বৃদ্ধি, শুচীন্দ্র মন্দিরের শীর্ষদেশের সংস্কার, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, শিক্ষামূলক এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য সরকারী অনুদান ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং ত্রিবান্দ্রাম কলেজের নূতন ভবন নির্মাণ। এছাড়া 1876-77 সালের দুর্ভিক্ষের সময় রাজধানীতে খাদ্যের সন্ধানে আগন্তুক হাজার হাজার ক্ষুধার্ত নরনারীর জন্য তিনি খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এরপর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পরেও 1877 সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ত্রিচির Mansion House Famine Relief Committee-র সহ-সভাপতি এবং সম্পাদকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। 1878 সালে ইংরেজি নববর্ষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ

তাঁকে Companion of the Star of India (C. S. I.) উপাধিতে সম্মানিত এবং মাদ্রাজ বিধান পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করেন।

1878 সালের আগস্ট মাস মাদ্রাজ সরকারের অনুরোধক্রমে শেষাইয়া পুদুকোট্টা রাজ্যের দেওয়ান পদ গ্রহণে সম্মত হন। পরবর্তী ষোল বৎসর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1886 থেকে 1894 সালের মধ্যবর্তী আট বৎসরে তিনি Regent-Dewan হিসাবে রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন ছিলেন।

শেষাইয়া যখন পুদুকোট্টার দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেন তখন রাজ্যের অর্থভাণ্ডার ছিল শূন্যগর্ভ। একদিকে ভূমি সংস্কার দ্বারা প্রজাদের স্বত্বাধিকার স্বীকার এবং অপরদিকে জলসেচের সুবন্দোবস্ত করে জমির জরিপের মাধ্যমে খাজনার হার ধার্য করে তিনি রাজস্ব বাবদ প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন এবং সেই সঙ্গে কৃষিরও উন্নতি সাধন করেন। 1883-84 সালের মধ্যে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার এত আমূল পরিবর্তন হল যে "আক্ষরিক অর্থে কোষাগারে সঞ্চিত অর্থ রাখার মতো যথেষ্ট জায়গার অভাব দেখা দিল"। 1878 সালে বার্ষিক ভূমি রাজস্বের পরিমান ছিল 2·3 লাখ টাকা, 1894 সালে তার পরিমাণ দাঁড়াল 6 লাখ টাকা।

ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত আইনের অনুসরণে শেষাইয়া পুদুকোট্টা রাজ্যের আইনের সংস্কার করে তা বিধিবদ্ধ করেন। তাঁর কাজের পর্যালোচনা করে মাদ্রাজের গভর্ণর Wenlock রাজ্যের যুবরাজকে লেখেন, "সমস্ত দিকেই উন্নতির লক্ষণ সুপরিস্ফুট, প্রশাসন যন্ত্রের প্রত্যেকটি শাখায় যথাযথ সংস্কার সাধিত হয়েছে। রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা চমৎকার এবং রাজধানীতে আধুনিক স্থাপত্য কীর্তির সমাবেশ ঘটেছে।"

1879 সালে শেষাইয়া ভাইসরয়ের কাউন্সিলে মাদ্রাজের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন লাভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে সরকার তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। রাজস্ব বিভাগে তাঁর পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হত। স্বায়ত্ত শাসন বিভাগেও তাঁর মতামতকে মূল্যবান নির্দেশক বলে গণ্য হত। 1884 সালে তাঁর কার্যকাল উত্তীর্ণ হলে বড় লাট রিপন তাঁর পুনর্মনোনয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু শেষাইয়া এই প্রস্তাবে রাজী হন নি।

1882 সালে শেষাইয়ার স্ত্রী পরলোক গমন করেন। এঁদের কোন সন্তানাদি না থাকায় এঁরা এ. সুব্রাম্মনিয়া শাস্ত্রীকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর এবং পুদুকোট্টার দেওয়ান হিসাবে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন। অল্প বয়সেই তিনি বড় ভাইদের হারিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের স্ত্রীপুত্র পরিজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীদের বিবাহের দায়িত্ব পালনেও তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি কুম্ভকোনমে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

শেষাইয়া ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তীর্থ দর্শনের জন্য তিনি বারাণসী, তিরুপতি এবং রামেশ্বর গিয়েছিলেন এবং শেষোক্ত স্থানে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের পক্ষে যা অবশ্য পালনীয় সেই সব ধর্মীয় আচার বিধি তিনি পালন করেছিলেন।

যদিও কয়েকটি বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী কমিটির সামনে সাক্ষ্য দানের জন্য মাদ্রাজ সরকার তাঁকে বিলেতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সমুদ্র যাত্রা হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ—এই কারণে তিনি সম্মত হন নি। তিনি একবার তাঁর কোন বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "আচার বিচার হচ্ছে আমাদের কাছে ভগবৎ সমান। পুরোনো রাস্তায় চলতে ভাল। যতক্ষণ না এর চাইতে ভাল কিছু প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে।" তবু তিনি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে আটকানোর আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন যে কলিযুগে পরিবর্তন ঘটাই অবশ্যম্ভাবী।

শেষাইয়া ব্রিটিশ সরকারের অধীন পঁচিশ বছর কাজ করেও নিজস্ব স্বাধীন বিচার বিবেচনার ক্ষমতা হারাননি। তিনি ইলবার্ট বিলকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল অসাধারণ। তিনি আলংকারিক, মার্জিত এবং বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলতে পারতেন যা Sir Charles Aitchison এর মতো সরকারী কর্তাব্যক্তিও প্রশংসা করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। মসুলীপত্তনে থাকাকালীন সন্ধ্যাবেলায় সংস্কৃত বই পড়ে শোনাবার জন্য তিনি এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি দেড় হাজার সংস্কৃত গ্রন্থের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা তৈরি করেছিলেন। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ডঃ বার্ণেল এই তালিকাটি সযত্নে ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড শেষাইয়াকে K. C. S. I. উপাধিতে ভূষিত করেন। এর কিছুদিন পরেই 1903 সালের 29 অক্টোবর ইনি পরলোক গমন করেন। তাঁর কাছে লেখা একটা চিঠিতে Grant Duff লেখেন: ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলে যে সব স্মরণীয় কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের মধ্যে আপনি আমার মনে সব চাইতে বেশী রেখাপাত করেছেন''।

[B V K Aiyer—Sir A. Sashiah Sastry : An Indian Statesman, Madras, 1902 ; G. A. Natesan (Ed.) . Indian Statesman, Madras, 1927].

(ইম্যানুয়েল ডিভিয়েন) এস. ইউ. কামাথ

অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৫৭)

Amarendra Nath Chattopadhyay (1880-1957)

হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় অন্যতম প্রাচীন, সংস্কৃতিবান ও সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে 1880 সালের 1 জুলাই অমরেন্দ্র নাথ জন্ম গ্রহণ করেন। কলকাতার বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে যে ছাত্ররা প্রথম স্নাতক হন তাঁদের অন্যতম ছিলেন তাঁর পিতা উপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধায়। পরে তিনি পেশা পরিবর্তন করেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রূপে অবসর নেন। অমরেন্দ্র নাথের মাতা সরলা দেবী উত্তরপাড়ার সুখ্যাত বাচস্পতি পরিবারের (পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় এই পরিবারেরই উত্তর পুরুষ) কন্যা। উপেন্দ্র নাথের চার পুত্র ও কন্যার মধ্যে অমরেন্দ্র নাথই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। অমরেন্দ্র নাথের পিতা মাতা উভয়েই অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, সংস্কৃতিবান ও স্বাদেশিক ছিলেন। 1905 সালের মার্চ মাসে অমরেন্দ্র নাথ কমলবাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর শ্বশুর প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা বারাকপুর থেকে বিহারের মুঙ্গের জেলায় চলে আসেন। প্রিয়নাথ ছিলেন প্রথমে দারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের চীফ্ ম্যানেজার। পরে তিনি দারভাঙ্গা মহারাজার উপদেষ্টা রূপে কাজ করেন। অমরেন্দ্র নাথ তিন পুত্র লাভ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দেবব্রত 1930 সালে অকালে প্রয়াত হন।

অমরেন্দ্র নাথের প্রাথমিক শিক্ষা হয় ভাগলপুরের বিদ্যালয়ে এবং উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে তিনি এণ্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতার ডাফ্ কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হন এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুবছর আইন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু রাজনৈতিক কাজকর্মের চাপে শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেন নি।

1903 সালে ডাফ্ কলেজে ছাত্রাবস্থায় অমরেন্দ্র নাথ উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল ও ক্ষীরোদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এই যোগাযোগ তাঁর পরবর্তী জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোকে জাতীয়তা-বোধের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি যখন বৈপ্লবিক জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে উন্মুখ ঠিক সেই সময়ই 1906 সালে তিনি শ্রী অরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন। অরবিন্দের চিন্তাধারা তাঁর মানসিকতা ও চরিত্রের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী তিনি অনুমোদন করেন এবং কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট পার্টির প্রার্থীরূপে বর্ধমান ডিভিশন থেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হন। গান্ধীর অহিংসবাদকে তিনি গণ-আন্দোলনের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু গান্ধী তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। বারীন্দ্র নাথ ও যতীন্দ্র নাথের সান্নিধ্যও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দিক নির্ণয়ে সহায়তা করেছিল। তাঁর অন্যান্য কনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, সুরেশ চন্দ্র দাশ, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, সতীশ চন্দ্র দাশ, ক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, সুভাষ চন্দ্র বসু ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। অন্যদিকে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথেরও একজন অনুরাগী ছিলেন।

একজন অত্যুগ্র দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী রূপে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কঠোর সমালোচক ছিলেন যার ফলে তাঁকে বহু ঝড়ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথম দিকে তিনি বৈপ্লবিক পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গ বিক্ষোভের সময় তিনি জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এর মধ্যে তিনি কলকাতা, চন্দননগর, হুগলী ও নদীয়া অঞ্চলে যাতায়াত করেছিলেন। 1903-04 সালে তিনি বালীর 'শক্তি সমিতি'র সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি উত্তরপাড়ায় 'শিল্প সমিতি' স্থাপন করেন। জাতীয়তাবাদী কর্মীদের জন্য এই সমিতিটি কারু, তাঁত প্রভৃতির শিল্পকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছিল। তাঁর

পিতার অর্থ সাহায্যে তিনি বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামেও অনুরূপ একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে তিনি নদীয়ার পোড়াগাছায় কাজ করেন এবং প্রখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে সাহায্য করেন। পুলিশ রিপোর্টে তাঁর দল 'মিশরি বাবুর দল' আখ্যা লাভ করেছিল কারণ তিনি রাজা পিয়ারী মোহনের পুত্র অরবিন্দ-শিষ্য মিশরি বাবুর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করতেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে মিশরি বাবু প্রদত্ত তিনশত টাকা ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর মজফ্ফরপুর অভিযানে যাতায়াতে ব্যয়িত হয়।

1908 সালে তিনি বৌবাজারে একটি 'শ্রমজীবী সমবায়' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানটি কলেজস্ট্রীট-হ্যারিসন রোড সংযোগস্থলে স্থানান্তরিত হয়। প্রকাশ্যে এটি ছিল দেশীয় সামগ্রীর কেন্দ্র। কিন্তু কার্যতঃ এটি ছিল বিপ্লবীদের গোপন যোগাযোগ ক্ষেত্র। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে অমরেন্দ্র নাথের সহকর্মীরা ধৃত হলেও অমরেন্দ্র নাথ অব্যাহতি পান। কিন্তু পরে 1915 সালে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত 'জার্মান ষড়যন্ত্রে'র কথা প্রকাশ পেলে অমরেন্দ্র নাথ 1915—1921 সাল পর্যন্ত আত্মগোপন করেন। 1921 সালে তিনি প্রকাশ্যে আসেন। 1926 সালে তিনি সুরেশ চন্দ্র মজুমদার ও সুরেশ চন্দ্র দাশ-এর সহযোগিতায় 'কংগ্রেস কর্মী সংঘ' স্থাপন করেন। এই সংঘটির উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের স্বার্থে বিপ্লবীদের একত্রিত করা। 1929 সালে তিনি হুগলী পৌরসভার নির্বাচন কেন্দ্র থেকে আইনসভায় নির্বাচিত হন কিন্তু 1930 সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য এই আসনটি পরিত্যাগ করেন। 1930 সালে তিনি গ্রেফতার হন এবং 1930-31 সালে তাঁকে দমদম স্পেশ্যাল জেলে বন্দী রাখা হয়। 1935 সালে তিনি পণ্ডিত মালব্য প্রতিষ্ঠিত 'কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টি'তে যোগদান করেন। 1939 সালে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তিনি কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের একজন অ্যাসেসর রূপে কাজ করেন। 1937 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তিনি এম. এন. রায়কে তাঁর র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন। কিন্তু তিনি নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি বা র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দেন নি।

অমরেন্দ্র নাথ ছিলেন একজন প্রগতিশীল নেতা। তিনি সংবিধানানুগ ছিলেন না এবং পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার জন্য তিনি বিপ্লবাত্মক পথকেই শ্রেয় মনে করতেন। মনে প্রাণে স্বদেশী হয়েও তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার বিরোধিতা করেন নি এবং প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের ব্যস্ততায় সমাজ সংস্কারের দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি। যদিও সামাজিক ক্ষতগুলি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। নিজে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী তিনি অনুমোদন করেন নি। কারণ তিনি জানতেন সাম্প্রদায়িকতা পরিণামে জাতীয়তাবাদকেই হত্যা করবে। অনুরূপভাবে তিনি আঞ্চলিকতাবাদেরও বিরোধিতা করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং আধুনিক শিল্পকারখানা স্থাপনের প্রয়োজনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনই দেশের জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণ। শ্রমিকদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 'শ্রমজীবী সমবায়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের কতটা সাহায্য করতে পেরেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কিন্তু এই সমবায়টি অনেক নিপীড়িত রাজনৈতিক কর্মীর উপকার সাধন করেছিল। এছাড়া তিনি 1922 সালে উত্তরপাড়ায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এটি পরে উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ নামে বিপ্লবীদের গোপনকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। 1923 সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তিনি উত্তরপাড়ায় আরো একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেটি কালক্রমে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং অমরেন্দ্র নাথের মৃত্যুর পরে 'অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ' নামে পরিচিত হয়।

অমরেন্দ্র নাথ পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন না, কিন্তু বাংলা মাসিক পত্রিকা 'মাসিক বসুমতী'তে তাঁর বেশ কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া দু-বছর তিনি বাংলা সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিনে'র সম্পাদনা করেছেন। 'বংশ পরিচয়' এবং 'What Next' নামক দুখানি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। 'যুগান্তর', 'বন্দে মাতরম', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' ইত্যাদি উগ্র স্বদেশী পত্রিকাগুলির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। 'বিজলী' ও 'আত্মশক্তি' পত্রিকা দুটিকেও তিনি সাহায্য করেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও অমরেন্দ্র নাথ মূলতঃ ছিলেন

একজন রাজনীতিবিদ। তাঁর পরিবারের বৈবাহিক জীবন ছিল সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতাসংগ্রামের আদর্শে উৎসর্গীকৃত।

[Information supplied by Satyabrata Chattopadhya, son of Amarendranath; Personal interview with Bhupendra Kumar Dutta and Samar Chattopadhyay, nephew of Amarendranath, Jadugopal Mukherjee—Biplabi Jibaner Smriti, Calcutta 1363 B. S.; Hamendranath Das Gupta—'Bharater Biplab Kahini, Parts II & III, Calcutta, 1948, Pravat Kumar Mukhopadhyay—Bharate Jatiya Andolan, Calcutta, 1925; Jibani Abhidhan, edited by Sudhir Chandra Sarkar; Masik Basumati, Kartick and Chaitra, 1357 B. S.]

পি. এন. ব্যানার্জী — প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিয় কুমার দাস (১৮৯৫— ?)

Omeo Kumar Das (1895— ?)

সহজ, সরল, অসাধারণবিবর্জিত, অমায়িক ও প্রত্যুৎপন্নমতি আসামের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী অমিয় কুমার দাসের জন্ম 1895 সালে তেজপুরের এক ব্রাহ্ম পরিবারে। তাঁর পিতা উপেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং তাঁর মাতা সরলা দেবী ছিলেন শিক্ষিতা ও ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা। সেই যুগে যখন আসামের মহিলা সমাজ অতি মাত্রায় রক্ষণশীল সেই সময় সরলা দেবী কলকাতার বেথুন কলেজে পড়বার জন্য গৌহাটির সাহায্যে কলকাতা যাত্রা করেন। বাল্য জীবনে অমিয় কুমার তেজপুর শহরের বাঙালী সমাজসেবী কমলা কান্ত ভট্টাচার্য্য এবং স্বামীর উকিল মহেন্দ্র কুমার দাসের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁরা দু-জনেই তাঁকে জীবনের উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত করেন।

1912 সালে তেজপুর হাইস্কুল থেকে অমিয় কুমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজের পড়াশুনো তিনি কলকাতাতেই সমাপ্ত করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর তিনি আইন কলেজে যোগদান করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আইন কলেজ পরিত্যাগ করে তেজপুরে ফিরে আসেন। সেখানে তেজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রূপে তিনি অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করেন। ভারতের রাজনীতির প্রাক্-গান্ধী-যুগে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে একমাত্র রক্তাক্ত বিপ্লবের পথেই দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব। গান্ধীর প্রভাবে ক্রমশঃ তিনি সহিংস বিপ্লবের চিন্তা থেকে সরে আসেন। তখন থেকেই তিনি একজন পুরোদস্তুর গান্ধী-বাদী এবং গান্ধী ও গান্ধীবাদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অটুট রয়ে গেছে।

1930 সালে তিনি আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সচিব এবং গৌহাটি জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি খুবই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতঃ আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির গ্রেপ্তারের পরে তিনিই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই আন্দোলন চলাকালীন তিনি দু'বার কারাবরণ করেন, প্রত্যেকটিরই মেয়াদকাল ছিল সাড়ে সাত মাস। 1941 সালে একক সত্যাগ্রহে অংশ নেবার জন্য তাঁকে নয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। পরে তাঁকে আইন ও নিরাপত্তা কারণে আটক রাখা হয়।

1936-37 সালে কংগ্রেস নির্বাচন কমিটির তিনি ছিলেন সচিব এবং 1937 সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিজয়লাভে তাঁর ভূমিকার যথেষ্ট অবদান ছিল। 1939 সালে তিনি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব কমিশনার নির্বাচিত হন। 1946 সালে তিনি আসাম বিধানসভায় পুনর্নির্বাচিত এবং কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে নির্বাচিত হন। 1947 সাল থেকে দু'বার তিনি মন্ত্রী ছিলেন। 1947 সাল থেকে 1952 সাল পর্যন্ত তিনি সরবরাহ, খাদ্য ও শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন এবং 1952 থেকে 1957 সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন শ্রম, শিক্ষা এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 1949 সালে তিনি জেনেভাতে ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে নেতৃত্ব দেন।

রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যেও তিনি বেশ কিছু সাংবাদিকতার কাজও করেছেন। বিভিন্ন সময় তিনি কলকাতার 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 'ফরওয়ার্ড' এবং 'লিবার্টি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দুটি অসমীয়া পত্রিকা 'অসমীয়া' ও 'বাহি'র তিনি ছিলেন সম্পাদক। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল গান্ধীজীর মতাদর্শ প্রচার এবং আসামের স্থানীয় সমস্যা, যেমন ভূমি সমস্যা এবং চা বাগানগুলিতে শ্রমিক সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

অখিল কুমার দাস [illegible]

[illegible] 'India's Public Debt', [illegible] 'Wagner Sodha'।

[illegible] 1931 [illegible] 1943 [illegible] 1950 [illegible]

1942 সালে অখিল কুমার [illegible] 1941 [illegible]

[illegible]

[Who's Who, 1956 (First edn.), Assam Legislative Assembly, Assembly Secretariat, Shillong; G. D. Binani and T.V. Rama Rao—India at a Glance (Orient Longmans Limited); শ্রী অখিল কুমার দাস, [illegible]]

এম. বি. দে [illegible]

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (ডঃ) (১৮৯৮-১৯৭৭)

Amulyadhan Mukhopadhyaya (Dr.) (1898-1977)

[illegible] 1898 সালে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। [illegible]

[illegible] (1911-14) [illegible] 1912 থেকে 1917 [illegible] 1940 [illegible]

পেলেন না। এই অবস্থায় 1818 সালের 'রেগুলেশন থি্' ধারায় অমূল্যধনকে রাজবন্দী রূপে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। তাঁর বন্দী জীবন অতিবাহিত হয় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল ও আলিপুর প্রেসিডেন্সি সেন্ট্রাল জেলে। বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন তাঁর মাতা পরলোক গমন করেন। 1918 সালের নভেম্বর মাসে মহাযুদ্ধের অবসানে শান্তি চুক্তি হবার পর অমূল্যধনকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু 'ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে'র নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন গ্রামে আটক রাখা হয়। 1919 সালের শেষের দিকে তিনি অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই সময়ে শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মানসিক দিক থেকে অমূল্যধন কিন্তু আরো সবল হয়ে ওঠেন। অনেক কষ্টে সরকারের বাধা নিষেধ অতিক্রম করে তিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে পুনরায় যোগদান করেন। আরো কিছুদিন পর চব্বিশ পরগণা জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন এবং লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

1920 সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নির্দেশে একদল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে অমূল্যধন যোগ দেন। এই অধিবেশনেই অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পর থেকে মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন।

অমূল্যধন ছিলেন এক নীরব সমাজ সেবক। তাঁর কাজকর্মও ছিল বিভিন্নমুখী। চব্বিশ পরগণা জেলায় তাঁর নিজের গ্রাম সাইবানে এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তিনি গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ও কুটীর শিল্পের প্রচলন ছাড়াও তিনি গ্রামের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে তাকিয়ে নানারকম সেবামূলক কাজকর্ম আরম্ভ করেন।

প্রায় ছয় বছর অমূল্যধন বারাসত লোক্যাল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন, চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ডের সভ্য ছিলেন প্রায় বার বছর, এছাড়া তিনি কয়েক মাস এর সভাপতিও ছিলেন। চব্বিশ পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডের প্রথম বেসরকারী সদস্য ছিলেন ডাঃ মুখোপাধ্যায়। গ্রাম সম্মেলন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন তিনি একাদিক্রমে প্রায় বার বছর।

1923 সালে ডাক্তারির শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, প্রায় এক বছর স্বর্গত ইউ. এন. ব্রহ্মচারীর অধীনে সন্নিযুক্ত চিকিৎসক অথবা হাউস ফিজিশিয়ানের কাজ করেন অমূল্যধন। তিনি বাংলা সরকারের দেওয়া চাকুরী প্রত্যাখান করে ব্যক্তিগত ভাবে ডাক্তারী আরম্ভ করেন কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে। বিনা পারিশ্রমিকে অথবা নামমাত্র পারিশ্রমিক নিয়ে তিনি বহু দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করেন। ক্রমশঃ তাঁর পসার বৃদ্ধি পায়। শীঘ্রই তিনি প্রথম বেসরকারী চিকিৎসা বিদ্যাবিষয়ক বিদ্যালয় ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রায় সাতাশ বছর তিনি সেখানে কাজ করেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যে বাইশ জন চিকিৎসক 1928 সালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন অমূল্যধন ছিলেন তাদের অন্যতম। দুবার তিনি আই. এম. এ.-র. বাংলাদেশের সম্মেলন পৌরোহিত্য করেন। গ্রীসের এথেন্সে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড মেডিকেল কনফারেন্সে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন, ইউরোপের বহু দেশও ভ্রমণ করেন এই সূত্রে। অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল লাইসেন্সিয়েট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে 1940 সালে আহূত বোম্বাই এবং পরের বছর আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল কনফারেন্সে অমূল্যধন সভাপতিত্ব করেন। ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলের শারীর বিদ্যার অধ্যাপকরূপে তিনি ছিলেন সুপরিচিত, দেশে চিকিৎসা বিদ্যায় সমতা রক্ষা করার অভিপ্রায়ে ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলের সঙ্গে ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট অফ ক্যালকাটা একত্র করে 1949 সালে তিনি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। 1930 সাল থেকে প্রায় পঁচিশ বছর তিনি চিকিৎসা পেশার প্রতিনিধিত্ব করেন বেঙ্গল কাউন্সিল অফ মেডিকেল রেজিস্ট্রেশনে।

চিকিৎসকের চিকিৎসাবিদ্যার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করার জন্য অমূল্যধন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন, 'চিকিৎসা জগৎ' নামে পরিচিত এই পত্রিকাটি 1928 সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন থেকে গ্রামঅঞ্চলের বহু বাংলা জানা চিকিৎসকদের স্ব স্ব পেশায় নানাভাবে সাহায্য করে এই পত্রিকাটি।

প্রায় পাঁচ বছর ধরে All India Medical Licentiates' Association-এর মুখপত্র Indian Medical Journal এবং Journal of the Indian Medical Association নামে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত দুটি পত্রিকার তিনি সম্পাদনা করেন। এছাড়া

Your Health নামে আই. এম. এ.-র সাধারণ পত্রিকাটি প্রকাশন এবং তার সম্পাদনা কয়েক বছর তিনি করেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কাজকর্ম ছিল বিভিন্ন ধরনের, জনসমাজকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য করার ইচ্ছায় নানা ক্ষেত্রে নানা কাজের মাধ্যমে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। তাঁর যশের প্রতিষ্ঠাও ঘটে বহু ক্ষেত্রে।

[Green Book of the Central Intelligence Agency at 13 Lord Sinha Road, Calcutta-16 ; Souvenir of the Silver Jubilee Session of All India Medical Conference (1948), Calcutta ; Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly (1952-57) ; Journal of India Medical Association (October 1950—December 1954) ; Presidential addresses at All India Medical Conferences, Bombay, 1949, Ahmedabad, 1941.]

ছায়া ভট্টাচার্য

অমৃত কাউর (রাজকুমারী) (১৮৮৯-১৯৬৪)
Amrit Kaur (Rajkumari) (1889-1964)

রাজকুমারী অমৃত কাউর 1889 সালের 2 ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাপুরতলা রাজ্যের আহ্লুওয়ালিয়া রাজপরিবারভুক্ত এবং রাজা স্যার হরনাম সিং-এর কন্যা ছিলেন। অমৃত কাউর তাঁর পিতার আটটি সন্তানের মধ্যে একমাত্র কন্যা। তাঁর পিতা খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পাঞ্জাব সরকার তাঁকে অযোধ্যা এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন। কাপুরতলার চেয়ে অযোধ্যার মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি।

রাজকুমারী জন্ম সূত্রে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর শৈশব শিক্ষা শুরু হয় ইংলণ্ডে। তিনি ডরসেটশায়ারের শেরবোর্ণ স্কুল ফর গার্লস ও পরে লণ্ডনের একটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বেশি সময় তিনি খেলাধুলায় অতিবাহিত করেন। তিনি ভাল টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন এবং বহুবার টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। রাজকুমারী ছিলেন অবিবাহিতা।

রাজকুমারী অমৃত কাউর তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন পিতার উত্তরাধিকারিণী রূপে। তাঁর পিতা একজন ধর্মভীরু ও সৎ খ্রীষ্টান ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে রাজা স্যার হরনাম সিং-এর বন্ধুত্ব ছিল। অমৃত কাউর বলেছেন তাঁর মনে ভারতকে বিদেশী শাসনমুক্ত দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর পিতাই প্রজ্বলিত করেছিলেন। ক্রমে অমৃত কাউর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে আসেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আজীবন অনুগামী শিষ্যা রূপে পরিচিত হন।

অমৃত কাউর রাজনীতি ও সমাজকল্যাণে বিশেষত নারী কল্যাণে সমভাবে উৎসাহী ছিলেন। 1930 সালে তিনি অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্সের সেক্রেটারি হন। 1931 থেকে 1933 সাল পর্যন্ত তিনি উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট হন। 1932 সালে তিনি লোথিয়ান কমিটির সামনে ভারতীয় ভোটাধিকার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। পরে তিনি উইমেনস্ অরগানাইজেশনের একজন সদস্যারূপে ভারতীয় সংবিধান সংস্কারের জন্য পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে ভারতীয় সংবিধান সংস্কার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। 1938 সালে তিনি অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট হন। ষোল বছর তিনি মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারিরূপে কাজ করেন। শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টামণ্ডলীতে তিনি প্রথম মহিলা সদস্যা নির্বাচিত হন। কিন্তু 1942 সালে তিনি পদত্যাগ করেন। হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘেরও তিনি সদস্যা ছিলেন। ইউনেস্কোর দুইটি অধিবেশনে—লণ্ডনে (1945) ও প্যারিসে (1946) তিনি ভারতের প্রতিনিধি দলের অন্যতমা ছিলেন। অল ইণ্ডিয়া স্পিনারস্ অ্যাসোসিয়েশনের ট্রাস্টী বোর্ডের তিনি একজন সভ্যা ছিলেন। 1947 সালে স্বাধীনতার পরে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

গান্ধীজির অনুপ্রেরণায় অমৃত কাউর কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং আজীবন পার্টির কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অমৃত কাউর গান্ধীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তিনি লবণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বোম্বাইতে গ্রেপ্তার হন। পরে কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড ঘোষিত হলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কংগ্রেস আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি বান্নুতে যান। 1937 সালের 16 জুলাই তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 1942 সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তিনি বহু

মিছিলে নেতৃত্ব করেন। সিমলায় মিছিলকারীদের উপর পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালনা করে। পরে তিনি কালকাতে গ্রেপ্তার হন।

রাজনীতির চেয়ে সমাজসেবাতেই অমৃত কাউর বেশি উৎসাহী ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি নারী কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে ভারতীয় মহিলা সমাজে প্রচলিত যাবতীয় কুপ্রথা-বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা ও নিরক্ষরতা ইত্যাদি দূর করার জন্য অতিবাহিত করেছেন। পর্দাপ্রথা ও বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'পর্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহ বিলুপ্ত হলে শুধু যে ভারতের অসংখ্য মহিলাদের স্বাস্থ্যই ভাল হবে তা নয় স্ত্রী শিক্ষার প্রসারেরও দুটি বড় বাধা অপসারিত হবে। বলা বাহুল্য, হিন্দু সমাজে বিধবাদের স্থান, বিবাহ সম্পর্কিত আইনগুলি এবং মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলিরও যুগান্তকারী পরিবর্তন হওয়া দরকার।' রাজকুমারী বাল্যবিবাহকে সমাজে মহিলাদের যথার্থ স্থান লাভের পথে একটি প্রধান বাধা মনে করতেন। তিনি বলেছেন, 'বাল্যবিবাহ প্রথা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণ শক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। মেয়েরা নিজেদের শৈশব পার না হতেই মা হয়। আর ঐ সব শিশুজননীদের সন্তানরা বেশির ভাগই ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থ হয়।'

নারী শিক্ষার তিনি অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। একটি মহিলা সমিতির অধিবেশনে তিনি বলেছেন, 'শিক্ষা সংস্কার ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের অস্তিত্বের শুরু থেকেই স্বাধীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের কথা বলে এসেছি। তাঁর মতে, 'যতদিন না আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে,—সার্বজনীন স্বাধীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলিত হচ্ছে, উপযুক্ত মহিলা দ্বারা পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে ততদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।' তিনি মনে করতেন বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাই ভারতবর্ষের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

রাজকুমারী হরিজন সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যও সচেষ্ট ছিলেন। হরিজনদের প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ করে লিখেছেন, 'আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা এই যে যারা আমাদের সেবায় নিযুক্ত অধিকাংশ শহরেই তাদের অত্যন্ত ঘৃণ্য অবস্থায় বাস করতে হয়, যদি আদৌ তাদের থাকার জায়গাকে বাসগৃহ বলা যায়।'

রাজকুমারী অমৃত কাউর রাজপরিবারের গৌরব ও ঐতিহ্য জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী এবং অহিংসার পূজারী ছিলেন না, আমাদের বহু সামাজিক কুপ্রথা তাঁর চেষ্টাতেই অপসৃত হয়েছিল।

[India at a Glance—1953 ; G. A. Natesan (Ed.),—Indian Christians (Madras) ; Manmohan Kaur,—Role of Women in the Freedom Movement, 1857 to 1947 (unpublished thesis, Punjab University) ; Arunam and Sheel,—Personalities, Northern India volume, Delhi—1951-52 ; Amrit Kaur,—Challenge to Women (Allahabad —1946) ; Amrit Kaur,—To Women ; Eleanor Morton,—Women Behind Mahatma Gandhi (London—1954) ; Asrar Ahmed Azad,—Siasi Maloomat (in Urdu), Delhi—1951 ; Asia's Who's Who (Third edition).]

ডি. এল. দত্ত **এস. এস. আহ্লুওয়ালিয়া**

অমৃত লাল নাগর (১৯১৬—)

Amrit Lal Nagar (1916—)

লক্ষ্ণৌয়ের এক সাধারণ শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে 1916 খ্রীষ্টাব্দের 17 আগষ্ট অমৃতলাল নাগর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজা রাম নাগর পোষ্টমাস্টার জেনারেল-এর অফিসে করণিকের পদে কাজ করতেন। তাঁর পিতার আর্থিক অসঙ্গতি এবং আঠারো বৎসর বয়সে তাঁর নিজের বিবাহ হওয়ার ফলে ইন্টারমিডিয়েট মান-এর বেশী তাঁর পড়াশুনা এগোয়নি। কিন্তু অল্প বয়সেই অর্থাৎ 1928 সাল থেকেই তিনি ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন। এরই মধ্যে তিনি রাম বিলাস শর্মা, ভগবতী চরণ বর্মা, যশপাল এবং সুমিত্রা নন্দন পন্থের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 1935 সালের মধ্যেই তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ হিন্দী লেখক হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলি মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন অবলম্বন করে রচিত এবং এই রচনাগুলিতে ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের প্রভাব লক্ষিত হয়। সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য যথা বাংলা, মারাঠী, হিন্দী, এবং গুজরাটী রচনাও তাঁকে প্রভাবিত করে।

অমৃত লাল-এর একটি নিজস্ব জীবন দর্শন ছিল এবং তাঁর রচনায় তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মতে অত্যুৎসাহী সমাজ সংস্কারক কিংবা কট্টর প্রশাসক কারো পক্ষেই পতিতাবৃত্তি রোধ করা দুষ্কর। গান্ধীজির মত তিনিও এই মত পোষণ করতেন যে পতিতারা নিজেরাই নীতিবোধ এবং নিয়ম শৃঙ্খলার সাহায্যে তাদের মন ও চিন্তাধারাকে বিশোধিত করুক এবং তারা তাদের শক্তিকে দেশের কাজে নিয়োজিত করুক। স্ত্রী জাতির প্রতি মন্দ এবং রূঢ় ব্যবহারই তাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ বলে তিনি নির্দেশ করেছেন। সমাজ সংস্কারের অন্যতম প্রবক্তারূপে গরীব এবং অনাথ ছেলেমেয়েরা যাতে বিদ্যালয়ে গিয়ে নিয়মিত শিক্ষালাভ করতে পারে এজন্য তাদের উৎসাহিত করতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মতে একটি অনুকূল নৈতিক পরিবেশই সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করতে সক্ষম। সরকারী সাহায্য বা সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে জনমানবকে প্রাক্তন সমাজ সংস্কারকদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারলেও দুর্নীতির উৎসমূলে কুঠারাঘাত সম্ভব। নাৎসি বা কম্যুনিষ্টদের নিষ্ঠুর এবং হিংসা কণ্টকিত পদ্ধতি থেকে গান্ধী প্রদর্শিত পথই তাঁর কাছে অপেক্ষাকৃত কার্যকরী বলে মনে হয়েছিল। নাগর কখনো মেনে নিতে পারেন নি যে সমাজের উচ্চস্তরের কিছু লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহু সংখ্যক মানুষ নিষ্ঠুর নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করবে। আর্তমানুষের প্রতি তিনি ছিলেন সংবেদনশীল এবং এ বিষয়ে উগ্রজাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদের মোহ তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের কুফল তিনি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেছিলেন। যে পদ্ধতিতে তারা অবদমিত জাতিসমূহকে নিপীড়ন করত তার তিনি তীব্র নিন্দা করেছিলেন। বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রভাবিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তিনি এমন এক সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন যে সরকার শোষকবৃন্দের হাত থেকে দৈন্যপীড়িত শ্রমজীবীদের শৃঙ্খল মোচন করবে। তিনি মনে করতেন ভারতের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই সর্বপ্রকারের দুর্নীতির অবসান ঘটাতে পারে। গ্রামীণ উন্নয়নে গান্ধী প্রদর্শিত অর্থনৈতিক কর্মসূচীর তিনি সমর্থক ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এও মনে করতেন যে যত দিন না পুঁজিবাদকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হচ্ছে ততদিন শ্রমিক অসন্তোষ দূর করা যাবে না।

তাঁর এই চিন্তাধারা নিহিত আছে তাঁর উপন্যাস এবং গল্পগুলিতে। তাঁর প্রণীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হল বর্তিকা (1935), 'কালাপুরোহিত' (1937), 'অবশেষ' (1940), 'নবাবী মসনদ' (1940), 'তুলারাম শাস্ত্রী' (1941), 'মহাকাল' (1947), 'গদর কে ফুল' 'বুন্দ অওর সমুদ্র' ইত্যাদি। যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেননি, তবুও তাঁর রচনাগুলি জাতীয় ভাবাদর্শের প্রচারকার্যে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি তাঁর রচনায় নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এজন্য তিনি হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

[The Contemporary Indian Literature, July 1963 issue ; The Dharma Yug, 2 August 1964 ; Namvar Singh—Adhunik Sahitya Ki Privritiyan ; Amrit Lal Nagar —Yuh Kothi Walleyn ; —Atom Bomb ;— Nawabi Masnad.]

এল দেওয়ানি **রাজেন্দ্র জিন্দল**

অমৃতলাল বিঠলদাস ঠক্কর (ঠক্কর বাপা)
(১৮৬৯—১৯৬১)

Amritlal Vithaldas Thakkar (Thakkar Bapa)
(1869—1961)

অমৃতলাল (পরবর্তীকালে ঠক্কর বাপা নামে পরিচিত) সৌরাষ্ট্রের ভাবনগরে 1869 সালে 29 নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিঠলদাস ঠক্করের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি লোহানা (গোঘারি) নামে এক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বিঠলদাসের বিবাহ হয় মুলিবাঈ-এর সঙ্গে। তাঁর সন্তানরা ছিলেন এক কন্যা জাবিবেন এবং ছয় পুত্র, পরমানন্দ, অমৃতলাল, মগনলাল, মণিলাল, কেশবলাল এবং নারায়ণজী। বিঠলদাস একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সামান্য পারিশ্রমিকে কর্মরত ছিলেন।

এগার কি বার বছর বয়সে অমৃতলাল জিভকোরবাঈকে বিবাহ করেন। 1909 সালে জিভকোরবাঈ-এর মৃত্যু হয়। এক কি দুই বছর পরে অমৃতলাল দিওয়ালীবেনকে বিবাহ করেন। তিনিও বিবাহের দু বছর পরে মারা যান।

অমৃতলাল ভাবনগর এবং ধোলেরাতে তাঁর প্রাথমিক

শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি ভাবনগরে অ্যাংলো-ভার্ণ-কুলার স্কুল এবং পরে আলফ্রেড হাই স্কুল-এ শিক্ষালাভ করেন। 1886 সালে সমস্ত ভাবনগর রাজ্যের মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং যশবন্ত্সিংজী বৃত্তি পান। অমৃতলাল পুণার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগদান করেন 1887 সালে এবং 1890 সালে তিনি এল. সি. ই. (লাইসেন্সিয়েট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং) পাঠক্রম সম্পূর্ণ করেন।

অমৃতলালের পিতা, দৃঢ় চরিত্রের মানুষ, বিঠলদাস ভাবনগরে নিজের সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য একটি হোস্টেল চালাতেন। 1900 সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের দুস্থ মানুষদের জন্য ত্রাণ কার্য সংগঠিত করেছিলেন। ঠক্কর বাপার কাছে তাঁর পিতাই ছিলেন প্রথম গুরু। তাঁর মাতা মুলিবাঈ ছিলেন একজন সহৃদয়া নারী যিনি তাঁর দরিদ্র প্রতিবেশীদের সাহায্য করার জন্য সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

1890 থেকে 1900 সাল পর্যন্ত কাথিয়াবাড় রাজ্যে তিনি বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

1900 সালে তিন বছরের জন্য উগান্ডা রেলওয়েতে কাজ করার উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ব আফ্রিকায় গমন করেন। পূর্ব আফ্রিকা থেকে ফিরে আসার পর তিনি সাঙ্গলি রাজ্যে চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার রূপে যোগদান করেন। সেখানে তিনি গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং ধোন্দো কেশব কার্ভের সান্নিধ্যে আসেন। ঠক্কর বাপার চারজন গুরুর মধ্যে কার্ভে ছিলেন একজন।

একবছর পরে তিনি সাঙ্গলির কাজ পরিত্যাগ করে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিতে যোগ দেন। বোম্বাই-এর শহরতলী কুরলাতে তাঁর কর্মস্থল ছিল। এখানেই তিনি প্রায় দুই তিন শত অস্পৃশ্যজনের সংস্পর্শে আসেন। নিপীড়িত শ্রেণীর জন্য গঠিত মিশন-এর রামজী সিন্ধের সাহায্যে তিনি কুরলার অন্ত্যজ জমাদার-দের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় খোলেন। ঠক্কর বাপার কাছে সিন্ধে ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় গুরু।

সারভেন্টস্ অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি-র জি. কে. দেওধরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জমাদারদের ঋণ-মুক্ত করার চেষ্টা করেন। এবার দেওধর হলেন তাঁর তৃতীয় গুরু। (ইতিমধ্যেই তিনি ডি. কে. কার্ভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁকে তিনি চতুর্থ গুরু রূপে জানতেন।)

1913 সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন এবং 1914 সালের 6 ফেব্রুয়ারী তিনি সারভেন্টস্ অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি-তে যোগদান করেন। এর অব্যবহিত পরেই দ্রুত তিনি উত্তরপ্রদেশের গোকুল এবং মথুরাতে দুর্ভিক্ষের জন্য ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন।

এই সময়ে বোম্বাই-তে গোখলের মাধ্যমে ঠক্কর বাপা গান্ধীজির সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর থেকে দুজনের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 1915-16 সালে ঠক্কর বাপা বোম্বাই-তে জমাদারদের জন্য সমবায় সমিতি সংগঠিত করেন, আমেদাবাদে শ্রমিকদের সন্তান-দের জন্য বিদ্যালয়ের প্রচলন করেন এবং কচ্ছে দুর্ভি-ক্ষের জন্য ত্রাণ কার্য সংগঠিত করেন।

1917 সালে তিনি দেওধর এবং যোশীর সঙ্গে গুজরাটে কয়রা জেলায় রাজস্ব অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। 1918 সালে বোম্বাই বিধানসভায় আনীত আবশ্যকীয় শিক্ষা বিল-এর জন্য তিনি গুজরাট এবং কাথিয়াবাড় সফর করে তথ্য সংগ্রহ করেন।

1918-19 সালে জামসেদপুরের টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানীর শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁর সাহায্য প্রসারিত হয়। এছাড়াও গুজরাটে পঞ্চমহল জেলায় তিনি দুর্ভিক্ষের ত্রাণ কাজ সংগঠিত করেন। এখানে তিনি স্বয়ং ভীলদের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলার নিদর্শন এবং তাদের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেন।

1920 সালে ঠক্কর বাপা দুর্ভিক্ষ পীড়িত উড়িষ্যা-তে যান। এ ব্যাপারে তাঁর কার্যকলাপ উড়িষ্যাতে প্রথম বহির্জীবনের সূচনা করে। 1921 সালে তিনি কাথিয়াবাড়ে খাদির কাজ সংগঠিত করেন।

1922 সালে পঞ্চমহলের ভীলেরা পুনরায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। ঠক্কর বাপা তাদের সাহায্য করার প্রচেষ্টায় 1923 সালে ভীল সেবা মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন।

1926 সালে ভাবনগর স্টেট সাবজেক্ট্স্ কন-ফারেন্স-এ সভাপতিত্ব করেন এবং 1928 সালে পোর-বন্দরে কাথিয়াবাড় স্টেট্স পিপল্স কনফারেন্স-এ সভাপতিত্ব করেন। 1929 সালে তিনি পাতিয়ালার রাজার বিরুদ্ধে গঠিত অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান রূপে কাজ করেন।

1930 সালের আইন অমান্য আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে আমেদাবাদের নিকটবর্তী শহর মেহমাদা-বাদে মদ্যপান বিরোধী পিকেটিং করতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু চল্লিশদিন পরেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

1932 সালে গান্ধীজির ঐতিহাসিক আমৃত্যু অনশনের সময় ঠক্কর বাপা পুণা চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় অনন্য ভূমিকা পালন করেন। গান্ধীজির অনুরোধে ঠক্কর বাপা হরিজন সেবক সংঘের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এক বছরেরও কম সময়ে তিনি হরিজন সেবক সংঘের বাইশটি প্রাদেশিক শাখা এবং একশ আটাত্তরটি জেলা কেন্দ্র সংগঠিত করেন। 1933-34 সালে গান্ধীজির সঙ্গে তিনি হরিজন এলাকা ভ্রমণে সঙ্গী হন এবং নয় মাসে 12,504 মাইল ভ্রমণ করেন। 1934 থেকে 1937 সাল তিনি হরিজন উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজে নিমগ্ন থাকেন।

1938 থেকে 1942 সাল পর্যন্ত তিনি সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং বেরার, উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই ইত্যাদি প্রাদেশিক সরকারের অধীনে উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীদের জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে কাজ করেছেন।

1943—44 সালে তিনি উড়িষ্যা ও বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে, যেমন মাদ্রাজ এবং বিজাপুরে ত্রাণ কার্য সংগঠিত করেন।

1944 সালে তিনি কস্তুরবা গান্ধী জাতীয় স্মারক সংগ্রহ সংগঠিত করেন এবং এর-ও পরে ট্রাস্টের সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেই বছরই সেন্ট্রাল প্রভিন্স-এর ম্যান্ডোলো তিনি গোন্দ সেবক সংঘের (বর্তমান নাম 'বনবাসী সেবা মণ্ডল') প্রতিষ্ঠা করেন।

1945 সালে তিনি মহাদেব দেশাই স্মরণ সংগ্রহের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ ছাড়াও 1946 সালে রাঁচীতে আদিমজাতি মণ্ডলের তিনি সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হন এর সভাপতি।

1946 সালের অক্টোবর থেকে 1947 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি নোয়াখালি এবং পূর্ব বাংলার অন্যান্য জেলায় গান্ধীজির সঙ্গে দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষদের মধ্যে থেকেছেন।

স্বাধীনতার পরে তিনি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে নির্বাচিত হন। 1947 সালে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলী দ্বারা গঠিত বহির্ভূক্ত ও আংশিক বহির্ভুক্ত এলাকাগুলির (আসাম বাদে) সাব-কমিটির তিনি চেয়ারম্যান এবং আসামের জন্য গঠিত সাব-কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। এছাড়াও গান্ধী জাতীয় স্মরণ সংগ্রহের অছি পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন। 1949 সালের 29 নভেম্বর তাঁর আশী বৎসর পূর্তিতে দিল্লীতে এক বিরাট জনসভায় তাঁকে একটি বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপক গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। এই জনসভায় পৌরোহিত্য করেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল।

19 জানুয়ারী 1961 সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি আমাদের সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর সমস্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন।

ঠক্কর বাপা খুব সাধারণ জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর চাহিদা ছিল স্বল্প। কাজই তাঁর ছিল জীবনের একমাত্র বিনোদন।

তাঁর দৃঢ় সংকল্প ছিল অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটুক; ভারতের বিভিন্ন স্থানের আদিবাসীরা সভ্য সমাজের ফল ভোগ করুক।

তাঁর কাছে মানবতার সেবা এবং ঈশ্বর সেবা ছিল সমার্থক। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের দুর্ভিক্ষনীতি, উপজাতি উন্নয়নে অবহেলা এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রতি দমননীতির তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন।

শ্রমিক সমস্যা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একান্তভাবেই মানবিক।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে খাদি উৎপাদন এবং কুটীরশিল্প গ্রামের দরিদ্র জনগণের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হতে পারে।

ঠক্কর বাপা ছিলেন একজন কর্মী মানুষ। দি সারভেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া, দি হরিজন এবং দি হিন্দুস্থান টাইমস্-এ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর লেখা, তাঁর ডায়েরীর পাতা, ভারতবর্ষে আদিম উপজাতি সমস্যার উপর তাঁর কালে স্মরণিকা বক্তৃতা (1941) এবং তাঁর বই 'Tribes of India' (1950) প্রভৃতি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে তাঁর অন্তঃকরণ ছিল ভালবাসায় পরিপূর্ণ এবং গভীর পাণ্ডিত্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতেন।

সারভেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি-র একজন অনুগত সদস্য রূপে তিনি তার সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলতেন এবং গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক পথে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। পিয়ারীলালের ভাষায়ঃ গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের যে স্বাধীনতার সংগ্রাম, সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত অংশের কাছে তার প্রাপ্তি কি হবে সেটাই তিনি বিশেষ করে বুঝতে চাইতেন, কারণ তিনি বুঝতেন যে সমাজের সেই দীনতম ও অপহৃত অংশের লাভালাভকে বাদ দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন হবে একটি মিথ্যা প্রাপ্তি। গান্ধীজি একবার বলেছিলেন যে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বাপার নিঃস্বার্থ সেবাকার্যের সমতুল্য কাজ করা। অবহেলিত জনগণের তিনি যথার্থই পিতা 'বাপা' ছিলেন।

[Shah, Kantilal—Thakkar Bapa (1955) ; Meghani, Zaverchand—Thakkar Bapa (1929) ; Shri Thakkar Bapa Commemoration Volume (1949) ; Oza, Dhanvant—Thakkar Bapa (1960) ; The Servants of India Society's Journal ; The Navjivan Files (a Gujarati Weekly) ; The Harijan Files (an English Weekly) ; Thakkar, Amritlal—Tribes of India (1906) ;— The Problems of Aborigines in India (Poona, 1941) ; Elwin, Verrier—In the Deserted villages of Gujarat.]

কুমুদ প্রসন্ন আর. এল. রাভাল

অমৃতলাল হাজরা (১৮৮৬-১৯৬৩)

Amritalal Hazra (1886-1963)

1886 সালে (ফাল্গুন মাস, 1292 বঙ্গাব্দ) ঢাকার শ্রীনগর পুলিশ থানার দোগাচি মৌজাতে অমৃতলাল হাজরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কালীচরণ হাজরা। কার্জন-পরিকল্পিত বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে অমৃতলাল ঢাকার অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। অসি ও লাঠি চালনায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে তিনি অনুশীলন সমিতির এক প্রভাবশালী সদস্য হয়ে ওঠেন। সৌভাগ্যক্রমে পুলিন বিহারী দাস হন তাঁর পথনির্দেশক। এঁর কাছে তিনি শুধুমাত্র অসি, ছোরা ও লাঠি খেলাই শিক্ষা করেননি, রাজনীতির প্রথম পাঠও নিয়েছেন। পুলিন বিহারীর কর্তব্যজ্ঞান, আত্মোৎসর্গের আদর্শ এবং যে কোন বিপদ সম্মুখীন হবার মত মানসিক প্রস্তুতি ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য তাঁর উপর অমৃতলালের অগাধ আস্থা ছিল।

অনুশীলন সমিতির কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার জন্য শীঘ্রই তিনি গৃহত্যাগ করলেন। সমিতির নির্দেশে ঢাকা শহরের চক বাজারে তিনি একটি ছোট সরাইখানা খোলেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যেতো সেখানে কাটারি, কোদাল, ছুরি ও অনুরূপ বস্তু তৈরী এবং সারানো হতো। কিন্তু তাঁর প্রকৃত কাজ ছিল ভাঙ্গা ও অকেজো রিভলবার ও পিস্তলগুলি সারিয়ে তোলা। এইভাবে আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহারযোগ্য করার কাজে তিনি প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

অনুশীলন সমিতির নির্দেশে 1908 সালের জুন মাসে সংঘটিত বিখ্যাত বাহরা গ্রাম ডাকাতিতে অমৃতলাল অন্যতম নেতা ছিলেন। অমৃতলাল একটি নৌকায় আরোহণ করে তার ছাউনির ভিতর থেকে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে শুরু করেন। তাঁর দেহের উপরিভাগ খোলা ছিল—গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তাঁদের পশ্চাদ্ধাবণকারী গ্রামবাসীরা হতচকিত হয়ে যান ; তাঁরা ভাবলেন ডাকাতদলে অন্ততঃ একজন ফিরিঙ্গী (ইউরোপীয়ান) আছে।

সমিতিতে অমৃতলালের গুপ্তনাম ছিল শশাঙ্ক। ঢাকা অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে শশাঙ্ক (অমৃতলাল) ঢাকা ত্যাগ করেন। দলের আরো কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে অমৃতলাল কলকাতায় 49 কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সমিতির নতুন শাখায় আত্মগোপন করেন। অনুশীলন সমিতির নেতা পি. মিত্রের মৃত্যুর পরে মাখনলাল সেনও কলকাতায় চলে আসেন। সমিতি এর পরে কলকাতা কেন্দ্র থেকেই কাজকর্ম চালায়।

শশাঙ্ক (অমৃতলাল) এখন সমিতির প্রসার ও নতুন সদস্য সংগ্রহ করার কাজে সম্পূর্ণ মগ্ন হলেন। স্বল্প সময়েই তিনি সমিতির অন্যতম প্রধান প্রেরণারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তরুণরা স্বভাবতঃই এই অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষটির মধুর স্বভাবের প্রতি আকৃষ্ট হত। আচার্য মতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ প্রমুখ তৎকালীন খ্যাতনামা বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন। আচার্য মতিলাল রায়ের নেতৃত্বে 'চন্দননগর দল' ও 'অনুশীলন সমিতির' সংযোগ ঘটানোর কাজে শশাঙ্কের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মতিলাল রায় ও রাসবিহারী বসু সে সময় প্রায়ই সমিতির রাজাবাজার কেন্দ্র ও বাদুড়বাগানের বাসায় আসতেন। এসব স্থানে বিপ্লবীদের গোপন অধিবেশন হত। বিখ্যাত বিপ্লবী শচীন্দ্র নাথ সান্যাল বেনারস থেকে এসে রাজাবাজারে শশাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। শশাঙ্ক শচীন্দ্রকে চন্দননগরে রাসবিহারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

1913 সালে কুখ্যাত মিস্টার গর্ডনকে হত্যার উদ্দেশ্যে মৌলভীবাজারে একটি বোমা ফাটে এবং এই ঘটনার সূত্রে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়। শশাঙ্কের রাজাবাজারের বাসায়

তল্লাসী চলে এবং প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈরীর মালমসলা আটক করা হয়। সেগুলি দিল্লী, মৌলভীবাজার, লাহোর, ভদ্রেশ্বর ও ময়মনসিংহে পুলিশ যেসব বোমা তৈরীর মালমসলা উদ্ধার করেছিল তার অনুরূপ ছিল। একটি সাংকেতিক চিঠিতে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদ্বয় আউধ বেহারী ও আমিরচাঁদের নাম পাওয়া যায়। শশাঙ্ককে গ্রেপ্তার করার পরে বিখ্যাত রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। এই মামলার সূত্রে আরো কয়েকজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি। শশাঙ্ক (অমৃতলাল) পনের বছর মেয়াদের জন্য নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন।

মুক্তিলাভের পরে অমৃতলাল হাজরা নারায়ণগঞ্জ ফ্যাক্টরীতে (ঢাকার সন্নিকট) একটি চাকুরী পান। তিনি হাজরা ক্লাব নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন! সেখানে তরুণদের অসি, ছোরা এবং লাঠিখেলা শেখান হত।

1963 সালে 1 জানুয়ারী আটাত্তর বছর বয়সে নারায়ণগঞ্জে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অনুশীলন সমিতির পতাকাতলে যে দেশপ্রেমিকরা সংগ্রাম করেছেন তাঁদের সেই জ্যোতির্মণ্ডলে অমৃতলাল হাজরার নাম গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।

[R. C. Majumdar—History of the Freedom Movement in India, Vol. II; প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—ভারতে জাতীয় আন্দোলন, কলকাতা, 1925; সুপ্রকাশ রায়—ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস; অনুশীলন ভবনে রক্ষিত কাগজপত্র; লেখকের ব্যক্তিগত জ্ঞাতব্য তথ্যাদি।]

সত্যরঞ্জন ঘটক

অমৃতলাল সরকার (১৮৮৯-১৯৭১)
Amritlal Sarkar (1889-1971)

1889 সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার নাগরপারা গ্রামে অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মানিক চন্দ্র সরকার।

শৈশবকাল থেকেই অমৃতলাল ছিলেন প্রশংসনীয় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। খেলাধুলা ও শরীর চচার প্রতি তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখিত 'দেশের কথা' এবং রাজপুত বীরগাঁথা ও অনুরূপ অন্যান্য দেশাত্মমূলক গ্রন্থ গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। এই বইগুলি তরুণ অমৃতলালের মনে বিশেষ রেখাপাত করে এবং তাঁর স্বাদেশিকতা বোধের উন্মেষ ঘটায়।

মানিকগঞ্জ হাই ইংলিশ স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন তিনি অনুশীলন সমিতির অন্যতম সংগঠক তারক গাঙ্গুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কৈশোরেই তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তরবারি, লাঠি, ছোরা প্রভৃতি চালনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং বেশ কয়েকটি গুপ্ত অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তখন তিনি মাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। অচিরেই তিনি অনুশীলন সমিতির গুপ্ত অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ কাজ পান।

সমিতির এক সদস্য যোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী মৌলভীবাজারে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। তাঁর দুই সহযোগী অমৃতলাল ও তারাপ্রসাদ বাউল বোমায় আহত হলেও উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে পলায়ন করতে সমর্থ হন। অমৃতলাল ছিলেন, কুখ্যাত পুলিশ অফিসার বসন্ত চ্যাটার্জীর হত্যার পরিকল্পনার অন্যতম উপদেষ্টা। আরো বেশ কয়েকটি বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। গোপন পুলিশ রিপোর্ট থেকে কয়েকটি লাইন অমৃতলাল সম্পর্কে এখানে লিখলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "শ্রী অমৃতলাল সরকার, ওরফে পরেশ, ওরফে মহলানবীশ, ওরফে নবিয়া, ওরফে জেনারেল, মানিক চন্দ্র সরকারের পুত্র, বয়স আনুমানিক 34, 1916 সালের জুলাই মাসে, তাঁর গ্রেপ্তার হবার পূর্বে বেশ কিছুকাল যাবৎ ফেরারী ছিলেন এবং অনুশীলন সমিতির অন্যতম বিপজ্জনক নেতারূপে বিবেচিত হতেন। অবশেষে 1917 সালে 12 জানুয়ারী 1818 আইনের তৃতীয় ধারানুসারে তাঁকে কারায়ত্ত করা হয়।"

তৃতীয় ধারানুসারে তাঁকে বহু বৎসর আলিপুর, রাজশাহী, বাঁকুড়া এবং ফতেগর জেলে বন্দী করে রাখা হয়। 1921 সালে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তারপরেই তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু 1818 আইনের তৃতীয় ধারায় 1923 সালে তিনি পুনরায় ধৃত হন। এই সময় সাড়ে চার বৎসর কাল তিনি কাম্রানোর জেলে বন্দী থাকেন। এরপর তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে নোয়াখালি জেলার হাতিয়াতে অন্তরীণ রাখা হয়, এবং সেখান থেকে পরে তাঁকে তাঁর গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়।

পরাধীন দেশের শৃংখল মোচনে যেসব নিবেদিত-প্রাণ, অসম সাহসী, খরবুদ্ধিসম্পন্ন বিপ্লবীরা আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে গেছেন, অমৃতলাল সরকার ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির নেতা। তিনি ছিলেন সংগ্রামের প্রতীক। তাঁর সংগ্রাম ছিল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিরামহীন। জেলের ভেতরে কি বাইরে তিনি ছিলেন সর্বদাই সংগঠনের নিয়মনিষ্ঠ সৈনিক। সংস্থার প্রতিটি কার্যই তিনি আনুগত্যের সঙ্গে বিশ্বস্ত ভাবে সম্পাদন করেছেন। চারিত্রিক দৃঢ়তায় এবং আদর্শের প্রতি আস্থায় তিনি ছিলেন এক বিরল সংগ্রামী।

ব্রিটিশ জেলে তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী রবীন্দ্রমোহন সেন, ভূপতি মজুমদার, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, অমর চ্যাটার্জী, নরেন্দ্র মোহন সেন ও অন্যান্যরা।

শেষবার জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আর নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করেন নি। জেলে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসা শুরু করে বহু গরীব মানুষের আরোগ্যলাভে সহায়তা করেন।

2 এপ্রিল, 1971 সালে 82 বৎসরের পরিণত বার্ধক্যে তিনি প্রয়াত হন। তার বহু পূর্বেই তাঁর স্ত্রী লোকান্তরিতা হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিনটি পুত্র রেখে যান।

[Amrita Lal Sarkar—Raktadiner Smriti ; The Green Book of Bengal Revolutionaries (1905-29) maintained by the D. I. G., I.B., West Bengal ; Records in the National Archives, New Delhi ; Personal Knowlage of the Contributor.]

সত্যরঞ্জন ঘটক

অমৃতলাল শেঠ (১৮৯১-১৯৫৪)

Amritlal Seth (1891-1954)

সৌরাষ্ট্র প্রদেশের লিম্বডিতে 1891 সালের 25 অগাষ্ট এক মধ্যবিত্ত শ্বেতাম্বর জৈন পরিবারে অমৃতলালের জন্ম হয়। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় লিম্বডি ও সুরেন্দ্র নগরে। সৌরাষ্ট্রের একটি রাজ্যের দেওয়ানের শিক্ষিতা কন্যা রুক্মিণীবেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় 1911 সালে।

অমৃতলালকে জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রথম অনুপ্রেরণা দেন তাঁর শিক্ষাগুরু পপৎলাল চুদ্গার। অন্যানরা ছিলেন মানসুখলাল রাভজীভাই এবং ইন্দুলাল যাগ্নিক। এ ভাবেই অমৃতলাল মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে আসেন।

1921 সালে লিম্বডি রাজ্যের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে অমৃতলালের কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। কিন্তু এক ক্ষুদ্র রাজ্যের সংকীর্ণতার মধ্যে জীবন তাঁর কাছে বড় বেশী বৈচিত্র্যহীন হয়ে ওঠে এবং তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী পরিত্যাগ করে সাংবাদিক জীবন গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। তিনি অনুভব করেন যে এভাবেই সাধারণের দুর্গতির কথা উদ্ঘাটিত করে নিজেকে জনসেবার কাজে নিযুক্ত করতে পারবেন। 1921 সালের অক্টোবর মাসে তিনি 'সৌরাষ্ট্র' নামে একটি সাপ্তাহিকী রানপুর থেকে প্রকাশ করেন। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত গুজরাটী দৈনিক 'জন্মভূমি' প্রকাশ করার মত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত প্রায় দশ বছর তিনি 'সৌরাষ্ট্র' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। আত্মপ্রকাশের বৃহত্তর ক্ষেত্রের সন্ধানে 1931 সালে তিনি মারাঠী ভাষায় দৈনিক পত্রিকা 'লোকমান্য' এবং ইংরেজী ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্র 'সান'-এর প্রকাশনা শুরু করেন। আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে 'সান' পত্রিকাটি অচিরেই বন্ধ হয় কিন্তু 'লোকমান্য' 1959-60 সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। শেঠ নিজে আর্থিক অসুবিধার মধ্যেও বিশাল পরিকল্পনার কাজ নিয়েছেন। এভাবেই 1937-38 সালে 'অখন্ড ভারত' এবং 1942 সালে 'নূতন ভারত' ইত্যাদি গুজরাটী দৈনিক পত্রিকাগুলির আবির্ভাব ঘটে। দুটি পত্রিকাই বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র পরিচালনায় নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে অমৃতলাল ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির অসুবিধার কথা বুঝতে পারেন। এই উপলব্ধি থেকেই ইন্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজস্ নিউজপেপারস্ অ্যাসোসিয়েশনের সূচনা হয় এবং তিনি 1945 সালে এই সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই বছরেই তিনি অল ইন্ডিয়া নিউজপেপারস্ এডিটরস্ কনফারেন্সের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে এবং প্রভিন্সিয়াল প্রেস অ্যাড্ভাইসরি কমিটিতে নির্বাচিত হন।

অমৃতলাল শেঠের কাছে সাংবাদিকতা শুধুমাত্র একটি উপজীবিকা নয়, তিনি একে জাতীয় আন্দোলনের বিস্তারের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন। 1921 সালের কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে তিনি প্রতিনিধিত্ব

করেছেন। অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছেন এবং বারদোলি সত্যাগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির তিনি সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন।

কাথিয়াবাড় রাজ্যে সে সময় যে কোন রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকায় এই রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানার বাইরেই অমৃতলাল নিজের কর্মক্ষেত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন। তবু জন্মভূমির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল এবং কাথিয়াবাড়ের জাগরণ যে ঘটনাপ্রবাহে আসন্ন একথা জেনে তিনি রাজ্যের মুক্তি আন্দোলনের জন্য কঠোর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। অখণ্ড গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে তাঁর বিশ্বাস এবং প্রাক্তন সৌরাষ্ট্র রাজ্যে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অবসানে অভিলাষী করে তুলেছিল। দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলির জনসাধারণের কথা তুলে ধরার জন্য তিনি 1931 সালে লণ্ডনে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে যান। সেই বছরই তিনি ইস্ট আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে জুনাগর প্রদেশের একত্রীকরণ ঘটার পূর্বে 1947 সালে আর্জি হুকুমৎ প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন।

তাঁর চিন্তাদর্শ গঠনে অন্যান্য প্রভাবের সঙ্গে সাংবাদিকরূপে তাঁর বিস্তৃত ভ্রমণের অভিজ্ঞতারও ভূমিকা ছিল। গান্ধীজির অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হয়েও তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন না। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে একমত না হলেও, তাঁদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর জাপান ভ্রমণ তাঁকে ভারতীয় কৃষি এবং কুটীরশিল্প সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি এই সম্বন্ধে গুজরাটী ভাষায় একটি বইও লেখেন। তিনি সমাজ সংস্কারক ছিলেন এবং হিন্দু সমাজে মহিলাদের ও অধঃপতিত শ্রেণীর সম্মানজনক আসন রক্ষা করতে চেয়েছেন। নিজের মেয়েদের শিক্ষিত করে এবং বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তিনি বহু বাল্য বিবাহ রোধ করেন। তিনি অস্পৃশ্যদের নিজের অফিসে নিয়োগ করেছিলেন।

সাংবাদিকতা এবং জাতীয় আন্দোলন উভয় ক্ষেত্রে অমৃতলাল এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন পথ প্রদর্শক। 1954 সালে তিনি প্রয়াত হন।

[The Saurashtra Files, 1921-31 ; An article in the Gujarati monthly, the Jeevan Madhavi ; The Janmabhoomi, 9 June 1934, 9 June 1954 and Rajat Jayanti Issue, 1959 ; The Nootan Gujarat, 12 August 1942 ; Interviws of the Research Fellow with Amrit Lal Seth's eldest daughter Labhubehn Mehta and his son-in-law, Sopan.]

কুমুদ প্রসন্ন **এস্. পি মিশ্র**

অম্বাদাস গোপাল পুণ্টামবেকার
(ওরফে নাথু কাকা) (১৮৭০-১৯৪৭)

Ambadas Gopal Puntambekar
(1870-1947)

নাথুকাকা এক নিম্ন মধ্যবিত্ত চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা ম্যাট্রিকুলেশন মান অতিক্রম করেনি।

1895 থেকে 1898 খৃঃ পর্যন্ত তিনি বোম্বাইয়ে জি. আই. পি. রেলওয়েতে করণিক হিসাবে কাজ করেন। তিনি অতঃপর বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিতে যোগ দেন এবং 1931 খৃঃ অবসর গ্রহণ করেন।

নাথুকাকা প্রধানতঃ একজন সমাজ সেবক ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তিনি আগ্রহী ছিলেন না যদিও কংগ্রেস ভাবাদর্শের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।

তিনি মুম্বাই গ্রন্থ সংগ্রহশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং 1898 থেকে 1934 খৃঃ পর্যন্ত এর সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমানে এই সংগ্রহশালা প্রায় এক কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী।

বোম্বাইতে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে গঠিত "ব্রাহ্মণ সভার" তিনি অন্যতম সংগঠক ছিলেন। 1888 খৃঃ শুভারম্ভকাল থেকে 1934 খৃঃ পর্যন্ত তিনি এই সভার অন্যতম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং 1934 খৃঃ তিনি এই সভার আজীবন সদস্যরূপে বৃত হন। এই সময়াভ্যন্তরে নাথু কাকা "ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী সহায়ক মণ্ডল", "ব্রাহ্মণ গণনা সমিতি" "ব্রাহ্মণ একীকরণ সংস্থা" এবং ব্রাহ্মণ মহিলাদের জন্যে একটি প্রসূতিসদন প্রভৃতি সংস্থা নির্মাণের কাজে প্রবৃত্ত হন। তবে এইসব সংস্থাগুলিকে সম্মিলিতভাবেই "ব্রাহ্মণ সভা" বলা হত।

এই দুটি প্রতিষ্ঠানে তাঁর যোগাযোগ দীর্ঘকালীন তাঁকে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিতি লাভের সুযোগ দেয়। তার প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসাবে সংস্থা দুটি তাকে সম্মান দক্ষিণা ও মানপত্র প্রদান করে।

1896 সালে যখন বোম্বাই-এ "প্লেগ" রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তখন ডঃ ভালচন্দ্র ভাটাভাদেকর ও তাঁর সহযোগীরা "হিন্দু প্লেগ হাসপাতাল" প্রতিষ্ঠা করেন। নাথু কাকা এই হাসপাতালের সাহায্যকল্পে যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে এক "স্বেচ্ছাসেবক সমিতি" গঠন করেন। তিনি এর ব্যয় নির্বাহের জন্য সাত হাজার টাকাও সংগ্রহ করেন। রোগ প্রশমনে তাঁর এই স্বার্থ-হীন সেবা কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকারী মেডিকেল অফিসারগণ তাঁকে একটি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। অনুরূপভাবে 1918 খৃঃ বোম্বাই-এ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটলে তিনি রোগীদের সেবার জন্য "স্বয়ংসেবক সংগঠন" গঠন করেন এবং এই সংগঠনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন।

প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও প্রধানতঃ নাথু কাকাই 1928 খৃঃ ব্রাহ্মণ সভায় গণপতি মূর্তির সামনে অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত ছাত্রসমূহকে এক সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজন করার অনুমতি দেন।

যদিও তিনি প্রাচীনপন্থী পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছিলেন কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে ধীরে ধীরে নাথু কাকার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়।

তিনি সামাজিক ও অন্যান্য কর্মসমুদয়ের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।

তাঁর জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ছিল। তিনি 1947 খৃঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

[V. R. Gulvane—Brahman Sabhechi Geli Sath Varshen. Bombay, 1949 ; Suvarna Mahotsave (1949) of the Mumbai Marathi Grantha Sangrahalaya ; The Lokmanya (Bombay) of 3 September 1934 ; The Prabhat (Bombay) of 3rd September 1934 ; The Navakal (Bombay) of 4 September 1934 ; The Kundali Varnan (Poona) of 18 March 1936 ; The Kesari (Poona) of 10 January 1941 ; The Loksatta (Bombay) of 27 March 1955.]

(সি: বি: খৈরমোদয়) এন. আর. পাঠক

অম্বা প্রসাদ (সুফী) (১৮৫৮-১৯১৫)

Amba Prasad (Sufi) (1858-1915)

সুফী অম্বা প্রসাদ 1858 সালে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1915 সালে ইরাণে নির্বাসিত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। তিনি মোরাদাবাদে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পরে তিনি আইন পড়ার জন্য জলন্ধরে যান।

অম্বা প্রসাদ বালগঙ্গাধর তিলকের অনুগামী ছিলেন এবং সর্দার অজিত সিং-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি সর্দার স্বরণ সিং, লালা লাজপত ফালক, জিয়াউল হক, বেহেড়ার অমরদাস, হাফিজাবাদের দীননাথ, কসুরের ধনপত রাই, পিণ্ডি-দাস ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রমুখ নেতাদের সংস্পর্শে আসেন।

1893 সালে একজন সাংবাদিকরূপে তাঁর রাজ-নৈতিক জীবন শুরু হয়। তখনই তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত Jami-ul-Ulm নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। তিনি 'হিন্দুস্থান' পত্রিকারও সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং গুজরানওয়ালার 'ইণ্ডিয়া' ও পেশোয়ারের 'ইন-কিলাব' পত্রিকাতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। তিনি পরিশ্রমী লেখক ছিলেন। সংবাদপত্রের রচনা ছাড়াও তিনি 'An Example of European Civilisation', 'Baghi Masih', 'Translation of an Article by Amir Ali', 'Lectures of Tilak', 'Bagawat' (Rebellion)' প্রভৃতি বহু পুস্তিকা রচনা করেছেন।

সুফী অম্বা প্রসাদ ছিলেন মনেপ্রাণে স্বদেশী। তিনি স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করেছেন এবং ভারতীয়দের একজাতি বোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। 1897 সালে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করার জন্য গ্রেপ্তার হন এবং এই প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারে তাঁর আঠারো মাসের কারাদণ্ড হয়। এর পর থেকে ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ সব সময়েই তাঁর ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

তিনি ভারতমাতা আন্দোলন, ভারতমাতা বুক এজেন্সী ও তিলক আশ্রম পরিচালনায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং রাজনীতি সচেতন সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

সর্দার অজিত সিং-এর সহযোগিতায় তিনিও প্রচার করতেন যে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের হত্যা করাই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায়। লাহোরের ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'যদিও অম্বা প্রসাদের নাম লাহোর গোষ্ঠী প্রকাশিত পত্রিকাগুলিতে খুব কমই পাওয়া যায় তবু তিনিই এই পত্রিকাগুলির প্রকাশ্য না হলেও অন্যতম নেপথ্য লেখক। এখন পর্যন্ত এই দলের তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি এবং মুখ্য পরিচালক।'

পাঞ্জাব সরকারের বহুবিধ পীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুফী অম্বা প্রসাদ পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে 'ভারতমাতা সোসাইটি'র আন্দোলন পরিচালনা করেন।

তিনি হায়দ্রাবাদের নিজামেরও সংস্পর্শে আসেন কিন্তু নিজামের বদান্যতার উপর নির্ভর করে জীবন যাপনের প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেন নি। মাসিক এক হাজার টাকায় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তির প্রস্তাব তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে স্বেচ্ছায় মাত্র ষাট টাকা বেতনে 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার চাকুরি গ্রহণ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেপালী জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য তিনি 1907 সালে নেপালে যান এবং সেখানে নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে পরিচিত হন। জঙ্গ বাহাদুর তাঁর সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁকে পরামর্শ দেন যে তাঁর মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির স্থান ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে নয়।

রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি আধুনিক ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নির্বিচার ব্যাপক প্রয়োগের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সামাজিক সংস্কারের সমস্যা নিয়ে তিনি অনেক লিখেছেন। তাঁর মত ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের পক্ষে উপযোগী নয়।

ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক নীতির তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন: 'অসহায়তার দিক দিয়ে একমাত্র ইহুদীদের সঙ্গেই ভারতীয়দের তুলনা করা চলে যাদের কোন কিছুই সরকারী করের আওতার বাইরে নেই।' এদেশে ব্রিটিশ ও তার সরকারী আমলাতন্ত্রেরও কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের যদি কখনও দুঃখের দিন আসে তবে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অফিসারদের। স্বেচ্ছাচারী আমলাদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিতে পারে। ভারতে প্রত্যেকটি ইংরেজই এ দেশীয়দের সঙ্গে তার সম্পর্কে একজন সার্বভৌম রাজা। ইংলণ্ডের জনগণ এদেশের মানুষদের চিরকাল দাসত্বে রাখতে চায়।'

অম্বা প্রসাদ বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা যা মানুষকে বলার ও লেখার স্বাধীনতা দিয়েছে তার প্রশংসা করলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সুস্পষ্ট ভাবে সমালোচনা করেছেন এবং ভারতকে বৃটিশ অধিকার থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। বিপ্লবাত্মক আদর্শ প্রচার করার জন্য তিনি প্রকাশ্য মঞ্চগুলি থেকে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিতেন। 1908 সালের 9 মার্চ তিনি পাঞ্জাবে এক উদ্দীপিত ভাষণ দিয়ে বীর পাঞ্জাবীদের পাঞ্জাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য দীর্ঘকাল অন্তরীণ বিপিন চন্দ্র পালকে কারামুক্তি উপলক্ষে এক উপযুক্ত সম্বর্ধনা জানাতে অনুপ্রাণিত করেন।

1897 থেকে 1907 সালের মধ্যে তাঁর লেখা ও ভাষণ ও উগ্র রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য তিনি আট বছরেরও বেশি সময় নানা ধরনের কারাদণ্ড ভোগ করেন।

সুফী অম্বা প্রসাদ ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। 1908 সালে তিনি ইরাণে যান ও ইরাণী বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে তিনি ইরাণীদের বৃটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং সাধারণের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর সংস্কারক ও বিপ্লবীসুলভ উদার, প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক মতাদর্শের জন্য তিনি ইরাণীদের মধ্যে 'আকা সুফী' নামে পরিচিত হন।

সুফী অম্বা প্রসাদ ইরাণে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সেখানেই অবশিষ্ট জীবন কাটান। তিনি 'Malib-bani-Watan' নামে একটি বই লেখেন, এতে তিনি ইরাণী বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। চিরজীবন তিনি একটি বৈচিত্র্যময় জীবন কাটিয়েছেন। তিনি একহাতেই যুদ্ধ করে গেছেন—শৈশব থেকেই তাঁর একটি হাত, বাঁম হাত ছিল। চিরজীবন তিনি বামপন্থী ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি এক পা সরে আসেননি—কখনও বিপ্লবের পতাকা এতটুকু নত করেন নি। ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিচল থেকে 1915 সালের 21 ফেব্রুয়ারী সুদূর ইরাণের নির্বাসনে তাঁর মৃত্যু হয়।

[Trimurti—Azadi Ke Shaheed (Hindi), Kanpur, 1939 ; Nav Bharat Times (Hindi),

Delhi, issue of 21 Dec. 1963 ; The Chand, Allahabad, Nov. 1928 ; Reports of the Director of Criminal Intelligence ; Ajit Singh,—Autobiography (mss) ; Report on Native Newspapers U.P., 1897, 1898, 1899 ; N. A. I. Home Pol., October 1909, No. 145-153 A, No. 154-56 A, and May 1907, No. 45 B ; Summary of the books written by Amba Prashad as reported by Government officials.]

(এস. আর. মহাজন) বাবা পৃথ্বী সিং আজাদ

অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী (১৮৮৫-১৯৬৭)
Ambika Giri Roy Choudhory (1885-1967)

আসামের কামরূপ জেলার অন্তর্গত বরপেটা মহকুমার রায়পাড়া গ্রামে 1885 সালে এক কায়স্থ পরিবারে কৃষ্ণরাম রায় চৌধুরীর পুত্র অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরীর জন্ম হয়। তাঁর মাতা দেবকীসুন্দরী ছিলেন শ্রী সুন্দরদিয়া সত্রের প্রধান সীতারাম অধিকারীর কন্যা ; শ্রী মাধব দেব এবং শ্রী রাম চরণ ঠাকুর নামে আসামের দুই ধর্মীয় নেতার সঙ্গে সীতারাম অধিকারীর ছিল দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা।

1905 সালে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অম্বিকাগিরির লেখাপড়া গৌহাটি গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে থাকাকালীন সমাপ্ত হয়। 1907 থেকে 1914 সাল বরপেটায় থাকার সময় সমাজসেবামূলক কাজকর্মে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকতা বোঝানর জন্য একদল যুবককে নিয়ে অম্বিকাগিরি নর্দমা সাফাই অভিযানে নেমে পড়েন। বলতে গেলে প্রায় সারাজীবন ধরেই তিনি সমাজ সংস্কারের ব্রত পালনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আফিং খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করা, দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করা এবং দুঃস্থ ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ায় সচেষ্ট হন অম্বিকাগিরি।

আসামকে পুনরুজ্জীবিত করতে গিয়ে রায় চৌধুরী সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন। কিছুকাল তিনি ডিব্রুগড় থেকে প্রকাশিত ''আসাম বান্ধব'' নামক সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 1918 সালে গৌহাটিতে এসে অসমীয়া ভাষায় 'চেতনা' নামে একটি মাসিক কাগজ সম্পাদনা করেন। 1935 সালের পর কয়েক বছর তিনি 'ডেকা আসান' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। আসামবাসীদের জাতীয়তা বোধ জাগাতে সাংবাদিক হিসেবে অম্বিকাগিরির অবদান সাধারণ মূল্যায়নের অনেক ঊর্ধ্বে। 1946 সালে এলাহাবাদে আয়োজিত পঞ্চম অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপার এডিটরস্ কনফারেন্স-এ তিনি আসামের প্রতিনিধিত্ব করেন। আসামের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি যখন কোন প্রদেশের সংবাদপত্রই তেমন দৃষ্টি দেয়নি তখন অম্বিকাগিরি তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে সমগ্র সম্মেলনকে আসামের অবস্থা এবং সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট করেন। এ বিষয় নিয়ে তিনি সম্মেলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপনে উদ্যোগী হলে শেষ পর্যন্ত বহু প্রভাবশালী প্রতিনিধি তাঁকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে অতঃপর আসাম সম্পর্কে তারা নিঃস্পৃহ থাকবেন না, এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে অম্বিকাগিরি প্রস্তাব উত্থাপনে বিরত থাকেন।

রায় চৌধুরীর ক্রিয়াকলাপ কেবল সমাজসেবা বা রাজনৈতিক কাজকর্মেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বরপেটায় সনাতন সঙ্গীত সমাজ এবং ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ছোটখাট ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তুলতে তাঁর দেশবাসীকে তিনি প্রভূত সাহায্য করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে খুব স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল একটি রাসায়নিক কারখানা।

আসামে বহিরাগতদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সংখ্যালঘু অসমীয়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে—এমনি ধরনের আশঙ্কায় ভীত ছিলেন রায় চৌধরী। অসমীয়দের ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি 'আসাম সংগঠন সভা' এবং 'আসাম জাতীয় মহাসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এমন কি, অসমীয়া ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সংঘবদ্ধ অভিযান চালনা করেন। অনেকে ব্যাপারটি সুনজরে না দেখলেও অম্বিকাগিরি এই বিশেষ ক্ষেত্রে ছিলেন অনড়, অটল।

আসামকে ভালবাসলেও ভারতবর্ষের প্রতি অম্বিকাগিরির ভালবাসা কোন অংশে কম ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে 1921 সালে তিনি বন্দী অবস্থায় চরম নির্যাতন সহ্য করেন। 1923 সালে 'শতধর' বই লেখার জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। বলতে গেলে 'শতধর' বইটিই প্রথম আসামী বই যা বিদেশী সরকারের হাতে দণ্ডযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। প্রথম

জীবনে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনৈতিক বিকাশ তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। মহাত্মা গান্ধীর সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি তাঁর রাজনৈতিক দার্শনিকতার চেয়ে রায় চৌধুরীকে বেশী মুগ্ধ করেছিল।

রায় চৌধুরী একই সঙ্গে শক্তিশালী লেখকও ছিলেন। নাটক, সাহিত্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গান ও কবিতা লিখতেন। দেশভক্তিই ছিল তার সমস্ত রচনার প্রেরণার উৎস। কারাগারে থাকাকালীন রচিত কিছু গান ডঃ বাণী কান্ত কাকতি অনুবাদ করেন 'Songs of the Cell' নামাঙ্কে। জন সম্মেলনে নিজের লেখা কবিতা পড়তে এবং গান গাইতে ভালবাসতেন অম্বিকাগিরি। 1926 সালে কংগ্রেসের পাণ্ডু অধিবেশনে তিনি দুটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

বিশ্রাম শব্দটি রায় চৌধুরীর জীবনে অজানা ছিল বললেই চলে। তাঁর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি এক মহৎ সংস্কারকের উৎসাহ উদ্দীপনা। জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি সযত্নে তাঁর দেশের জন্য কাজ করে গেছেন।

নলবাড়ীর কালী চরণ চৌধুরীর কন্যা কৌশল্যা দেবীর সঙ্গে অম্বিকাগিরির বিবাহ হয়। বয়সের দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে কনিষ্ঠ হলেও পত্নী হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন কৌশল্যা। তাঁদের কন্যা এস. রায় চৌধুরী হলেন আসামের প্রথম মহিলা যিনি আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন।

1967 সালের 2রা জানুয়ারি অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর দেশবাসী তাঁকে আদর করে নাম দিয়েছিল 'আসাম কেশরী' অর্থাৎ আসামের সিংহ।

[T. C. Das—Ambikagiri Aru Tewar Jeevan Darsan ; A. C. Hazarika—Asam Sahitya Sabhar Bhasonawali Part II. ; Benudhar Sharma—Congressor Kachioli Roadot ; Dinabandhu Talukdar—Assam Kesari Ambikagiri ; Ambikagiri Roy Choudhury—Songs of the Cell ; Deka Dekerir Dev ; —The Final Goal of Man ;—Sadiniya Navayug, 10 November 1965.]

এ. সি. ভূঞা

দেবব্রত দত্ত

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী (১৮৯২—১৯৬২)

Ambica Chakravarty (1892—1962)

1892 খৃীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে বসবাসকারী একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে অম্বিকা চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। পরে এই ব্রাহ্মণ পরিবারটি চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। অম্বিকা এই জেলার মাটিতেই বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর পিতা নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। রীতিসিদ্ধ কোন শিক্ষালাভ তাঁর হয়নি। অধিকাংশ সময় তিনি চট্টগ্রামেই বাস করতেন।

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী অতি অল্প বয়সে কংগ্রেসী নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রভাবাধীনে আসেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ও ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। পরে তিনি সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী আন্দোলনে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দের রচনা এবং ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর জীবন তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং তিনি জীবনকে স্বদেশের অধীনতা মোচন-এর কাজে নিয়োজিত করতে মনস্থ করেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার এবং শেষ জীবন অবধি একজন অক্লান্ত রাজনৈতিক কর্মী।

জোয়ারের জলের মত স্বদেশী আন্দোলন যখন বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন ছেলেমানুষ অম্বিকা বিভিন্ন সভা সমিতি ও বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেন। 1911-12 খৃীষ্টাব্দে তিনি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সান্নিধ্যে আসেন এবং কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। যতীন্দ্রমোহনের একজন অনুগত কর্মী রূপে তিনি চাঁদপুর কুলি ধর্মঘট এবং 1921-22 খৃীষ্টাব্দের আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটে যোগদান করেন। এই সময়ে সূর্যসেনের সঙ্গে অম্বিকার পরিচয় হয়, সূর্যসেনও এ সময়ে কংগ্রেসীদের আন্দোলনে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। তাঁর জীবনের দিক পরিবর্তন হয় এ সময়। অম্বিকা বিপ্লববাদে দীক্ষিত হন এবং অচিরে চট্টগ্রাম দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গেও তিনি তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেননি, তিনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির একজন সহ-সভাপতি এবং এ. আই. সি. সি.-র একজন সভ্যরূপে মনোনীত হয়েছিলেন।

একজন বিপ্লববাদী রূপে তিনি কর্মী বাছাই করে তাঁদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন, অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করতেন এবং তহবিল গঠনের জন্য ডাকাতিতেও অংশ গ্রহণ করতেন। 1924 খৃীষ্টাব্দে তাঁকে বন্দী করা হয় এবং চার বৎসর কাল তিনি রাজবন্দীরূপে কারান্ত-

রালে জীবন যাপন করেন। 1928 খ্রীষ্টাব্দে কারা মুক্তি লাভ-এর পর তিনি কংগ্রেস দলের হয়ে পুনরায় কাজ শুরু করেন এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর অনুগামী হন। তাঁর বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের পক্ষে কংগ্রেস ছিল এক আবরণ স্বরূপ। বস্তুত তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনার মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলেন।

সূর্য সেন এবং নির্মল সেন-এর সহযোগিতায় তিনি চট্টগ্রামকে মুক্ত করার এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করেন। 1930 খ্রীষ্টাব্দের 18 এপ্রিল তিনি অভি-যানকারী দলটির নেতৃত্ব দেন এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস অধিকার করেন। অপর একটি দল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। তাঁর সঙ্গীদের মুখে অস্ত্রাগারে টোটা নেই শুনে তিনি নিরাশ হন। এই সন্ধিক্ষণে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ে যাত্রা করেন, এই স্থানটি বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম এবং যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে এইরূপ মনস্থ করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনাটিকেও কার্যক্ষেত্রে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিপ্লবীদের ধরার জন্য 22 এপ্রিল এক দুর্ধর্ষ সশস্ত্র দল জালালাবাদে পাঠানো হয়। তাঁর সঙ্গীদের সহযোগে জালালাবাদে তিনি প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন, সহসা একটি বুলেট তাঁকে বিদ্ধ করে। তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য তাঁর সঙ্গীরা যখন পাহাড় ছেড়ে পলায়ন করে তিনি তখন তাঁদের সঙ্গ নিতে পারেন নি। তবুও তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। সাংঘাতিকরূপে আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় অতিক্রম করে একটি গ্রামে আশ্রয় নেন, গ্রামবাসী চাষীরা তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন। তিনি আত্মগোপন করে থাকেন, কিন্তু 1930 খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি ধৃত হন। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামান জেলে পাঠানো হয়।

আন্দামানে অন্তরীন থাকাকালীন তাঁর জীবনে দ্বিতীয়বার দিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময়ে তিনি মার্কসীয় সাহিত্যগুলি পড়েন, সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপ থেকে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন এবং সাম্য-বাদের প্রতি অনুরক্ত হন। 1946 খ্রীষ্টব্দে মুক্তি লাভ করে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। আমৃত্যুকাল তিনি এই দলের সদস্য ছিলেন। অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ইতিমধ্যেই একজন প্রবাদ পুরুষ রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে ও অন্যান্য জেলা-গুলি পর্যটন করেন এবং সর্বত্রই জনসাধারণের বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন। 1948 খ্রীষ্টাব্দে কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে তিনি আত্মগোপন করেন, কিন্তু 1949 খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে বন্দী করা হয়। 1951 খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভের পর তাঁকে কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শাখার সমিতিতে সভ্যরূপে নির্বাচিত করা হয়। দেশবিভাগের পর শরণার্থীরা কলিকাতায় আসা শুরু করলে তিনি তাঁদের মধ্যে কাজ শুরু করেন এবং তাঁদের পুনর্বাসনের দাবী নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কম্যুনিস্ট প্রার্থীরূপে 1952 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন। 1957 খ্রীষ্টাব্দে তিনি 24-পরগণার হাবরা আসনের জন্য একজন প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু তরুণ কংগ্রেসপ্রার্থী তরুণকান্তি ঘোষের নিকট পরাজিত হন। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও তিনি শরণার্থী-দের মধ্যে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। 1962 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি গাড়ীর ধাক্কায় আহত হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাহসী এবং জেদী, তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অম্বিকা একজন বিপ্লবী ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে তিনি বিপ্লবী দলে এসেছিলেন এবং একজন পেশাদারী রাজনৈতিক কর্মী রূপে তাঁর জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। যদিও তিনি ভাল বাগ্মী ছিলেন না, প্রখর বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি ছিলেন না তবুও তিনি জনসাধারণের মধ্যে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন এবং এই কাজের মাধ্যমেই তিনি তাঁদের সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছেন।

[Ananta Singh—Chattogram Yubo Vidroha, Vol. I. 1969 : Ananda Gupta—Chattogram Biplaber Kahini, Calcutta, 1948 ; Amrita Bazar Patrika, 3, 14 January 1933, 8 March 1962 ; Statesman, 7 march 1962 ; Swadhinata, 7 March 1962.]

অমিয়া বরাট সুনীল সেন

অম্বিকা চরণ মজুমদার (১৮৫০-১৯২২)

Ambica Charan Majumdar (1850-1922)

1850 সালে পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার সন্দিয়া গ্রামে অম্বিকাচরণ জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা রাধামাধব মজুমদার ছিলেন জমিদার। সে

দিক দিয়ে অম্বিকাচরণ অভিজাত ছিলেন। 1869 সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় আসেন। এখানে 1875 সালে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউটে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ পান এবং রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। শুরু হয় অম্বিকাচরণের রাজনৈতিক জীবন। 1875 সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ. ও 1878 সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর মাতা সুভদ্রা দেবী অম্বিকাচরণকে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগদান না করে ফরিদপুরেই আইন ব্যবসায় ও গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়াস করতে বলেন। 1906 সালে তাঁর স্ত্রী বিনোদিনী দেবী মারা যান। শান্ত এবং উদারপন্থী অম্বিকাচরণ নারী জাগরণ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ফরিদপুরে বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করেন।

1886 সালে তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন কিন্তু 1899 সালে যখন তিনি বর্ধমানে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স-এর সভাপতিত্ব করেন তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলার নেতৃত্ব দান করেন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা রূপে স্বীকৃত হন। 1905 সালে অম্বিকাচরণ মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে একীভূত হয়ে বঙ্গবিভাজন, লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা সংগঠন করেন। 1905 সালের 7 অগাস্ট কলকাতার টাউন হলে বিশাল জনসভায় তিনি বক্তৃতা দেন। তাঁর এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ বঙ্গবিভাগ যদি সরকারের একটি অসংশোধনীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় তবে তার বিরুদ্ধে ভারতের অস্থিরতাও হবে তেমনই একটি অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য ঘটনা এবং লর্ড মর্লে ও ভারত সরকারকে বিবেচনা করতে হবে যে কোন সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে তাঁরা এ সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

1908 সালে তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস—এর মাদ্রাজ অধিবেশনে বহু প্রত্যাশিত রিফর্ম স্কীমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 1910 সালে কলকাতায় তিনি পুনরায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স-এর সভাপতিত্ব করেন। 1915 সালে তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত তথ্য সংকলন করে "Indian National Evolution" নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 1916 সালে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণ সার্থকতা আসে যখন তিনি লক্ষ্মৌতে একত্রিশতম কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ "স্বায়ত্তশাসন, স্বশাসন বা স্বরাজ—যে কোন নামেই একে অভিহিত করা যায়··· এটি একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার। ভারত অতি অবশ্যই পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি পাবে এবং স্বশাসিত রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে।" 1917 সালে তিনি ঢাকা বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু 1918 সালে "লিবারেল ফেডারেশন" গঠনে সাহায্য করে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অম্বিকাচরণ ছিলেন গোখলে ও স্যার হেনরী কটন-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সাংবিধানিক আন্দোলনের অনুবর্তী অম্বিকাচরণ শেষপর্যন্ত মধ্যপন্থী মতাবলম্বী রাজনীতিকই ছিলেন। বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। তৎকালীন বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জন উড্‌বার্ণ অম্বিকাচরণকে "The Grand Oldman of Faridpur" বলে অভিহিত করতেন। বাগ্মী ও আইনজ্ঞ অম্বিকাচরণ ভারতের সাংবিধানিক প্রগতির অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অম্বিকাচরণকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করে বলেছেন ঃ "বৌদ্ধিক প্রাখর্য্যে, বাগ্মীতার অসামান্যতায় এবং মাতৃভূমির প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও নিবিড় ভক্তিতে তিনি বাংলার নেতৃত্বে প্রথম শ্রেণীর আসন পাবার অধিকারী।" তাঁর মৃত্যুর পরে "দি বেঙ্গল" পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে লেখে ঃ "তিনি বাংলার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন। তাঁর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির বহু বিশিষ্ট গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিল।"

[Ambica Charan Majumdar—Indian National Evolution : A Brief Survey of Origin and progress of the Indian National Congress, Calcutta, 1915 ; নৃপেন্দ্র চন্দ্র গোস্বামী—অম্বিকা চরণ মজুমদার, কলিকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ; Surendra Nath Banerjea—A Nation in Making, Calcutta, 1963 ; Jagesh

Chandra Bagal—History of the Indian Association (1876-1951), Calcutta, 1953 ; Indian Association Jubilee Souvenir (1876-1952), Calcutta, 1952 ; R. C. Majumdar —History of the Freedom Movement, Vol. II, Calcutta, 1963 ; M. Bagchi,—Rashtraguru Surendranath, Calcutta, 1963, The Modern Review, February 1923 ; The Calcutta Gazette, 18 December 1917 and 9 January 1918 ; The Amrita Bazar Patrika 14, 27, 28 December 1916 and 30 December 1922 ; The Bengalee, 13 May 1899, 18 September 1910, 16 December 1916 and 30 December 1922 ; The Advance, 29 December, 1930 ; Bharatvarsha, Poush 1337 B. S. ; Faridpur Hitaishini, 22 Falgun, 1329, B.S.]

(অমিয়া বরাট) প্যানসি ছায়া ঘোষ

অম্বিকা প্রসাদ বাজপাই (১৮৮০—১৯৬৮)

Ambika Prasad Bajpai (1880—1968)

উত্তর প্রদেশের পুরণো কানপুর শহরে 1880 সালে 30 ডিসেম্বর অম্বিকা প্রসাদ বাজপাই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহর অধীনে এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1857-র বিদ্রোহের পর পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলে অম্বিকা প্রসাদের পিতা কন্দরপুর নারায়ণ কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে তিনি নুনের আড়তদার ও ঠিকাদার রূপে কাজ শুরু করেন। কানপুরে অম্বিকা প্রসাদ এক মৌলভীর কাছে ফার্সী এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। 1900 সালে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি তিনবার বিবাহ করেছিলেন—প্রতিবারই তাঁর পূর্বতনা স্ত্রী লোকান্তরিতা হবার পরে।

বাজপাই অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবের মানুষ ছিলেন। এমনকি কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতেও ভোজ-সভায় অংশগ্রহণ করতেন না। পোশাক পরিচ্ছদ এবং আচার আচরণে তিনি খুব সাধারণ ছিলেন এবং এই সাধারণত্ব তিনি বরাবর রক্ষা করে গেছেন। চা বা কফি কোনটাই তিনি পান করতেন না। সেই সময় বাংলার বিভাজন নিয়ে দেশের লোকেরা গভীরভাবে উদ্বেলিত। দেশের আবহাওয়ায় তখন সশস্ত্র সংগ্রামের উম্মাদনা, তরুণ অম্বিকা সমকালীন দেশ প্রেমিকদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতেন। এই সময় তাঁর এক আত্মীয় তাঁকে দুটি বই পড়তে দেন। তার একটি দাদাভাই নওরোজি লিখিত 'আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া', অন্যটি উইলিয়াম ডিগবি লিখিত 'প্রসপরাস ইণ্ডিয়া'। এ দুটি বই পড়ে তিনি বৃটেন কর্তৃক ভারতের শোষনের কথা জানতে পারেন। এছাড়াও তিনি পড়লেন রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের 'ইন্দো-এরিয়ান' এবং লোকমান্য তিলকের 'আর্কটিক হোম ইন দি বেদস'। তিনি প্রায়শই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের হোম রুল আন্দোলন, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন।

স্বল্পকালের জন্য তিনি কলকাতায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে করণিকের চাকরি করেন। এরপর 1905 সালে সহযোগী সম্পাদক হিসেবে তিনি 'হিন্দী বঙ্গবাসী'তে (কলকাতা) যোগদান করেন। 1907 সালের মধ্যে তিনি নিজেকে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি তাঁর নিজস্ব মাসিক হিন্দী পত্রিকা 'নৃসিংহ' প্রকাশ এবং সম্পাদনা শুরু করেন। কাগজটি চলেছিল মাত্র এক বছর। তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলিতে তিনি ব্রিটিশের 'বিভাজন ও শাসন' নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সর্বদাই সাবধান করতেন। তিনি বলতেন যে স্বরাজ্য অর্থ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ এবং নিমজ্জিত জনসাধারণের উন্নতি সাধন। আপোষপন্থী মনোভাব এবং অহিংস পথকে তিনি সর্বদাই ভর্ৎসনা করতেন। লালা লাজপত রায়, লোকমান্য তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন তাঁর আদর্শ। তিনি মনে করতেন যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে স্ব-রাজ্যের প্রকৃত অর্থ নমনীয়ভাবে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

বাজপাই গ্রামগুলির জন্য পঞ্চায়েত শাসনের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন এবং একথাও বলেছিলেন যে কংগ্রেস 1917 সালের অধিবেশনে পঞ্চায়েতের উপর তার আস্থা পুনর্জ্ঞাপন করেনি। তার কারণ তাতে আইন ব্যবসায়ী সদস্যদের স্বচ্ছল অর্থাগম বিঘ্নিত হত। যখন তাঁকে 'নৃসিংহ' কাগজ বন্ধ করে দিতে হল, তখন তিন বছরের জন্য তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে (কলকাতা) হিন্দীর অধ্যাপকের চাকরি নেন। 1911 সালে তিনি 'ভারত মিত্র'র সম্পাদক হন। সাপ্তাহিকী

থেকে সেটি ক্রমে দৈনিক কাগজে পরিণত হয়। 1919 সালে সেটি পরিত্যাগ করে তিনি 'স্বতন্ত্র ভারত' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 1941 সালে অবসর গ্রহণের কাল পর্যন্ত তিনি সেটি সম্পাদনা করেন।

বাজপাই একজন অনুগত কর্মী হিসেবে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং তার ফলে কারাবরণও করেন, যদিও তিনি অহিংস পথে বিশ্বাসী ছিলেন না। গান্ধীজী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহারকে তিনি পছন্দ করেন নি। মুক্তি লাভের পর তিনি সাংবাদিকতার কাজে লিপ্ত ছিলেন। 1941 সালে অবসর গ্রহণের সময় তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক জনসভায় তাঁকে 14,000 টাকা উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়।

তাঁর প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে রয়েছে, 'হিন্দু রাজ্য শাস্ত্র', 'হিন্দী পর ফার্সী কা প্রভাব', 'চীন আউর ভারত', 'সমাচার পত্র কা ইতিহাস' এবং 'আমেরিকা আউর আমেরিকান'।

তাঁর খ্যাতি মূলতঃ হিন্দী সাংবাদিকতার জগতে প্রথম পথ প্রদর্শক রূপে। যদিও হিন্দী সংবাদপত্রের প্রচলন বহু পূর্বেই তবু হিন্দী সংবাদপত্রের রচনার মান উন্নত হওয়ার পিছনে কৃতিত্ব সবটাই তাঁর প্রাপ্য। বিষয়বস্তুতে উপস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে তিনি হিন্দী সাংবাদিকতার আধুনিকীকরণ করেছিলেন।

[Personal interview with Pt. Ambika Prasad Bajpai at Agra ; Interview with P. K. Bajpai, Narendra Bajpai and R. Bajpai, sons of Pt. Ambika Prasad Bajpai ; Nrisimha, 1908, Vol. I (Monthly Hindi magazine published from Calcutta) ; Hindi Bangvasi (Calcutta) Files ; Bharat Mitra Files ; Swatantra Bharat Files ; Hindu Rajya Shastra (Hindi)—By A. P. Bajpai ; Hindi par Pharsi ka Prabhav (Hindi)—By A. P. Bajpai ; Cheen Aur Bharat (Hindi)—By A. P. Bajpai ; Samachar Patron ka Itihas (in Hindi)—By A. P. Bajpai ; America aur American (in Hindi)—By A. P. Bajpai.]

(এল. দেওয়ানি) দশরথ শর্মা

অযোধ্যা নাথ পণ্ডিত (১৮৪০-১৮৯২)
Ajodhya Nath Pandit (1840-1892)

উত্তর প্রদেশের এক মহান জাতীয়তাবাদী নেতা অযোধ্যা নাথ পণ্ডিত 1840 সালের 8 এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আগ্রায় বসবাসকারী এক উচ্চ বংশীয় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত কেদার নাথ প্রথমে পাঞ্জাবের ঝজ্জরের নবাবের দেওয়ান ছিলেন ও পরে তিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। অযোধ্যা নাথ অল্প বয়সেই যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখান এবং উত্তর ভারতের উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের চিরাচরিত প্রথানুসারে আরবী এবং ফার্সীতে শিক্ষালাভের পর আগ্রা কলেজে ইংরেজী শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে তিনি শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 1860-61 সালের সরকারী রিপোর্টে বলা হয় তিনি একজন "বুদ্ধিমান এবং প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ছাত্র" এবং তাঁর ইতিহাস ও দর্শনের উত্তরপত্র "অসাধারণ তীক্ষ্ণতা এবং চিন্তাশীলতার" স্বাক্ষর বহন করে। তিনি আইনের পাঠ গ্রহণ করেন এবং আগ্রাতে 1862 সালে একজন ব্যবহারজীবী রূপে নাম নথিভুক্ত হয়। আইনজীবী রূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি ও অর্থের অধিকারী হন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি সমকালীন রাজনীতিতে যোগদান করেন।

পণ্ডিত অযোধ্যা নাথের তিন পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বনামধন্য উদারনৈতিক নেতা পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুঞ্জরু। পণ্ডিত অযোধ্যা নাথ আধুনিক শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং আগ্রায় ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল এবং কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। তৎকালীন বিদ্বান সমাজের অগ্রদূত কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। 1886 থেকে 1890 সাল পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিধান পরিষদের তিনি ছিলেন সরকার মনোনীত সদস্য। তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের যৌথ সচিব পদে বহু দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন।

1869 সালে তিনি যখন আগ্রা কলেজে আইনের অধ্যাপক মনোনীত হন তখন সেই পদের সঙ্গে তাঁর আইন পেশার সমন্বয় ঘটান সম্ভব হয়েছিল। আইন জ্ঞান; অপরাধ বিজ্ঞান শাখায় তাঁর ব্যুৎপত্তি এবং তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচার-

পতিও স্বীকার করেছিলেন। পণ্ডিতের প্রয়াণে তিনি বলেছিলেন, "আমি একথা স্বীকার করি যে প্রায়শই আমি আকস্মিক এবং কঠিন ও জরুরী অবস্থায় তাঁর আইনের জ্ঞান, তাঁর মনের সূক্ষ্ম গভীরতা ও যুক্তি প্রবণতায় অভিভূত হয়েছি।" শিক্ষাজগতেও তাঁর কাজ অনুরূপ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেও তিনি বৌদ্ধিক সত্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যা খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যাঁর জন্য যে কোন জাতি ও দেশ গর্ব-বোধ করতে পারে।

তবে রাজনীতির ক্ষেত্রেই তিনি সর্বোত্তম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 1888 সালে সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনকে সফল করে তুলেছিল তাঁর যে অসম-সাহসিকতা ও অনুরাগ তাকে বাদ দিয়েও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর তীব্র জাতীয়তাবাদ, অবাধ ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও জনস্বার্থে স্বচ্ছ এবং যুক্তিপূর্ণ ধ্যান ধারণা পোষণের জন্য। প্রশাসনিক ব্যবস্থার একজন তীব্র সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মতামত ও বিচার সর্বদাই ছিল সম্রাজ্ঞীর প্রতি আনুগত্য মণ্ডিত। সে যুগের ধারানুসারে ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা এবং গণ-তন্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। অনুরূপভাবে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ, জনস্বার্থ ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আনীত ডাফরিনের আনুগত্যহীনতার অভিযোগকে অযোধ্যা নাথ তীব্র ভাষায় খণ্ডন করেন এবং বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন—"আমি দৃঢ় আস্থার সঙ্গে জানাচ্ছি—আমার দেশবাসীর চেয়ে বেশী অনুগত লোক পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই দুর্লভ। আমরা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথাই ভাবি—অথচ আমাদের আনুগত্য-হীনতার দায়ে দায়ী করা হয়। প্রকৃতই কি আমরা আনুগত্যহীন?"

ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা ছিল অত্যন্ত তীব্র এবং স্পষ্ট। তাঁর প্রদেশ এলাহা-বাদে স্থানীয় অফিসারদের কংগ্রেস অধিবেশনকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টার তিনি তীব্র নিন্দা করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর শ্লেষোক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর ভাষণের শুরুতে তিনি বলেন: "একটি মহান জাতি, একটি সর্বাগ্রগণ্য জাতি যারা এদেশে প্রথম স্বাধীন প্রতিষ্ঠান চালু করে, যাদের কাছে আমরা প্রথম শিখি যে প্রজা-সাধারণের মঙ্গলের জন্যই শাসককুলের সৃষ্টি এবং প্রজারা শুধুমাত্র শাসকের আমোদের উপকরণ নয়, একটি মহৎ জাতি যারা স্বাধীনতার সঙ্গে ন্যায় বিচারকে যুক্ত করেছে, তারা কখনই অধস্তন কর্মচারীদের এ ধরনের অসাংবিধানিক ও অন্যায্য কাজকর্ম চালাতে অনুমতি দিতে পারে না,"—এর পর তিনি সমগ্র প্রদেশে জেলা অফিসারদের ভীতি প্রদর্শনের কাহিনী বিস্তৃত বর্ণনা করেন।

অনুরূপ সুরে সরকারী প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ করতে না দেবার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। "ব্রিটিশ সরকার অত্যন্তই সদাশয় সরকার," এই মন্তব্যের পরে তিনি যোগ করেন "যদি ব্রিটিশ সরকারে সমালোচনার একটু স্থান থাকত, জনগণ সম্পর্কে যদি তারা অতটা সন্দিহান না হত এবং কিছু ব্যয় সংকোচন করত তাহলে এটি আরো ভাল সরকার হত।...সে জন্যই আমরা দেশের সরকারী প্রশাসনের উন্নতি ঘটাতে চাই তার সঙ্গে আমাদের সেরা লোকদের সংশ্লিষ্ট করিয়ে, যাঁরা সত্যই আমাদের শ্রেষ্ঠ শাসকদের চেয়ে বেশী বোঝেন কিভাবে এবং কোথায় জুতোর মধ্যে কাঁটা বিঁধছে।" সমভাবে দেশের আইন ব্যবস্থার ওপর সেক্রেটারী অফ স্টেটের অধিকার এবং সিমলায় সাময়িক সরকার চলাকালীন বিধান পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর প্রদেশে দু বছর আইন সভার অধিবেশন আহ্বান করা হয়নি সেদিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কাউন্সিল সরকারকে প্রহসন বলে অভিহিত করেন। লবণ কর প্রত্যাহারের জন্য তিনি দাবী জানান; কারণ তাঁর মতে এই কর লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত জনগণের উপর এক বিশাল ভারস্বরূপ, এবং এই কর ধার্য করা হয়েছে রাষ্ট্রের তহবিল পূর্ণ করার জন্য 'মানবিকতা বোধকে সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে'। সমাজের ক্রমবর্ধমান পানাভ্যাস যা দরিদ্রের জীবনের পক্ষে ভয়াবহ ছিল তিনি তা বন্ধ করতে আগ্রহী হন এবং স্থানীয়ভাবে জনমত সৃষ্টি করেন। কিন্তু সরকার জনমতের প্রতি কর্ণপাত করেন নি। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত বলেন, "তাঁরা অর্থকে (আবগারী শুল্ক) আঁকড়ে ধরে থাকবেন, অন্যায় ও দুঃখ থেকে পাওয়া ফল ভোগ করবেন, কিন্তু ন্যায় বা নীতির দিকে যাবেন না। আমি বিশ্বাস করি ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের শাসকরা ভাল লোক, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে তাঁদের না আছে বিবেকবোধ না আছে ধর্ম, অর্থ উপার্জনের যত পথ আছে সেগুলিই তাঁদের শাস্ত্র এবং এই অর্থের যেভাবেই সেটা সংগৃহীত হোক

না কেন তার ব্যাপক অপব্যয় করাই হচ্ছে তাঁদের পরম তৃপ্তি"।

[Interview with Pandit H. N. Kunzru (1964) ; Eminent Indians (Madras, Ganesh & Co.) ; Representative Indians—by G. Parameswaran Pillai ; Indian National Congress Proceedings, 1888, 1889, 1890, 1891.]

বিশ্বেশ্বর প্রসাদ

অর্জুনলাল শেঠি (১৮৮০-১৯৪১)
Arjunlal Sethi (1880-1941)

1880 সালে 9 সেপ্টেম্বর জয়পুরের সম্ভ্রান্ত খাণ্ডেলওয়াল জৈন পরিবারে অর্জুনলাল শেঠি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জওহরলাল শেঠি ছিলেন জয়পুর শহরের বিশিষ্ট নাগরিক। 1904 সালে অর্জুনলালের সঙ্গে সুশীলা দেবীর বিবাহ হয়।

জয়পুরের মহারাজা কলেজে তিনি পড়াশুনা করেন। 1902 সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। সংস্কৃত, আরবীক এবং ফার্সিভাষায় তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অর্জুনলাল যৌবনে ভগবদ্গীতা, জৈনধর্মশাস্ত্র এবং কোরান সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়ন করেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও আগ্রহী ছিলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন।

যৌবনে তিনি লোকমান্য তিলক ও চিত্তরঞ্জন দাশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 1907 সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। অধিবেশন থেকে ফিরে তিনি কোটার ঠাকুর কেশরী সিং বারাত ও লালা হনওয়ান্ত সহায়ের সাহায্যে জয়পুরে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর অসাধারণ সাহস ও নির্ভীকতাবলে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করেন। লোকেরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম করত। 1928 সাল পর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেসের মধ্যে একটি বিশেষ শক্তি হিসেবে ধরা হত। শিক্ষাব্রতী ও সমাজসংস্কারকরূপে অর্জুনলাল তাঁর জীবন শুরু করেন। তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও দর্শনকে বর্জন করে প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছেন। এইজন্য তিনি জয়পুর রাজ্যের মহারাজার প্রস্তাবিত দেওয়ান পদে যোগ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

অর্জুনলাল সবরকমের পুরাতন প্রথা ও কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন তাই তিনি একসময় গান্ধীজীর সামনে মাথা নত করতে অস্বীকৃত হন। এই চিন্তাধারা থেকেই তিনি তাঁর কন্যার অন্য সম্প্রদায়ে বিবাহ দেন। 1925 সালে কানপুর কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি মণ্ডপের সামনে ধর্ণা দেন। হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন করেন। তিনি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন। কিন্তু কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন পদ থেকে সরে এলেও তিনি মনে প্রাণে একজন জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন।

তাঁর সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব তিনি 1907 সালে জয়পুরে জৈন বর্দ্ধমান বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টির মূলমন্ত্র হিসেবে তিনি ছাত্রদের কাছে তুলে ধরেছিলেন জাতীয়তাবাদ। 'নিমাজ হত্যাকাণ্ডের' পরিকল্পনা এই প্রতিষ্ঠান থেকেই হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা এখানে আসত। মির্জাপুরের জনৈক বিষাণদত্ত ছাত্রদের কাছে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও রাজনৈতিক ডাকাতির প্রসঙ্গে সমর্থনমূলক ভাষণ দিতেন। পরবর্তীকালে যে সব জাতীয়তাবাদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও লাজপত রায় গড়ে তোলেন বর্দ্ধমান বিদ্যালয়কে এই সকল বিদ্যালয়ের পূর্বসূরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। জৈন সমাজের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার করাই ছিল তাঁর বিশেষ লক্ষ্য।

একজন শক্তিশালী লেখক এবং বাগ্মী হিসেবেও শেঠির সবিশেষ পরিচয় ছিল। গদ্য ও পদ্য দুই ধারাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শূদ্র মুক্তি, স্ত্রীমুক্তি, এবং মহেন্দ্রকুমার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এই তিনটি বই উল্লেখযোগ্য। তাঁর গভীর আগ্রহ ও বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি 'পণ্ডিতজী' বলেই পরিচিত ছিলেন।

বিংশ শতকের বিশ দশকে তিনি ছিলেন বিবেকবান কর্মযোগী। গভীর পুত্রশোকও বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করা থেকে তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি। 1922-23 সালে তিনি আজমীর-মারওয়ারা প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস দলের

ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে দলের তত্ত্বাবধান করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনেও তাঁকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। 1914 থেকে '20 এই ছ'বছর কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য জনগণের মনে তিনি বীরের আসন লাভ করেন, সেইজন্য জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর টুপি'টি দেড়হাজার টাকায় নীলাম করা হয়েছিল।

সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তিনি নব্যভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগানোর ব্যাপারেই ব্যয়িত করেছেন। বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ ছিল। বোমার সাহায্যে হার্ডিঞ্জের প্রাণনাশের পরিকল্পনাতেও তিনি অনেকখানি যুক্ত ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষভাগে তাঁর সবিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয় এবং নিজেকে বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে খাজা মৈনুদ্দিন চিশ্তির দরগায় পড়ে থাকেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পরে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

[Hari Prasad Agarwala-Rajasthani Azadi Ke Dewane ; Manmatha Nath Gupta— Bharat Men Sashastra Kranti Chesta Ka Romanch Kari Itihas ; Arjun Lal Sethi's article in the Rajputana Mail 3 March, 1935 ; —His numeraous literary works ; Rajendra Prasad—Autobioghaphy, Pattabhi Sitaramayya—History of the Indian National Congress ; Proceedings of the Indian National Congress ; Home Department Files in the National Archives of India ; Personal Interview of the Research Fellow with Bhanwar Lal Saraf of Jodhpur, a close Associate of Arjun Lal Sethi]

(এল দেওয়ানি) **ভি. এস. ভার্গভ**

অর্জুন সিং গারগাজে (১৯১১—১৯৬৩)
Arjun Singh Gargage (1911—1963)

অর্জুন সিং গারগাজে 1911 সালে অমৃতসরের কাছে তারন তারান নামে এক প্রসিদ্ধ শিখ ধর্মস্থানে, এক ছুতোর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তাঁরা জাতিতে ছিলেন রামগরিয়া। তাঁদের পরিবারের আটজনের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর বড় ভাই ধরম সিং-এর নাম জানা যায়।

অর্জুন সিং বিদ্যালয় ছাড়ার পর পাঁচ বছর পড়াশুনা করেন নি। তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 1926 সালে। পরে 1932 সালে পাঞ্জাবী ভাষায় তিনি (গিয়ানী) স্নাতক হন। তিনি পাঞ্জাবী, উর্দু, ইংরেজি এবং হিন্দী ভাষা ভাল জানতেন। 1944 সালের এপ্রিল মাসে তাঁর সঙ্গে শকুন্তলা দেবীর বিবাহ হয়। তিনি সংসারে বেশি সময় দিতে পারতেন না সেজন্য তাঁর স্ত্রী 1948 সালে তাঁকে ছেড়ে চলে যান এবং তাঁরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু টিক্‌কারাম সুখানকে বিবাহ করেন।

জীবনের শুরু থেকেই তাঁর অনুভূতিশীল সত্তা বিভিন্ন প্রভাব আত্মস্থ করে। 'গুরুবাণী' এবং 'গুরু-গ্রন্থ সাহিব' ছাড়াও শিখজাতির ইতিহাস নিয়ে তিনি গভীর পড়াশুনা করেন এবং এই পড়াশুনা তাঁকে একজন জাতীয়তাবাদী ও নিবেদিতপ্রাণ স্বাধীনতা সংগ্রামী হতে উদ্বুদ্ধ করে। খড়ক সিং, রনধীর সিং ও জওহরলাল নেহেরুর আদর্শ তাঁর ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কার্ল মার্কসের ভাবধারা ও ফরাসী বিপ্লবও তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কোন ধর্মেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু কোন ধর্মমত বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে তিনি নিন্দা করেন নি।

অসীম সাহসী এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা অর্জুন সিং অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু একজন কর্মী রূপে এবং জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত সমস্ত আন্দোলনেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী অর্জুন সিং 1947 সালে কংগ্রেস ছেড়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। প্রথম দিকে তিনি ইণ্ডিয়ান সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিকান পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ভগৎ সিং-এর দলের হয়ে কিছু কাজকর্মও করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৈপ্লবিক এবং তিনি তাঁর মতামত প্রচার করেন 'কীর্তি-আকবর', 'জঙ্গী আজাদী' এবং 'নয়া জমানা' এই তিনটি পত্রিকা ও তাঁর লেখা পাঞ্জাবী ভাষায় দু বই 'Shaheed' এবং 'Do Par-chat Turna Par Turna Matak De Nal' এর মাধ্যমে। তিনি আমৃত্যু 'নয়া জমানার' সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেক কবিতাও লিখেছিলেন। কবিতাগুলিতে তিনি

ভারতীয় চাষীদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। ব্রিটিশ সরকারের তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন, কিন্তু ইংরেজদের কখনো ব্যক্তিগতভাবে ঘৃণা করতেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে তিনবার,—1933, 1937, এবং 1939 সালে তিনি কারাবরণ করেন।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে শিক্ষাবিস্তারের কাজে উৎসর্গ করেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল অশিক্ষিত নিরক্ষর জনগণ কখনোই জাতীয়তাবাদের মর্ম অনুধাবন করতে পারবে না। পাঞ্জাবের বিভিন্ন গ্রামে তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কোন বিশেষ জাত, সম্প্রদায় বা আঞ্চলিকতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

তিনি কুটির শিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর কবিতা ও সম্পাদকীয় রচনাদির মাধ্যমে একে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করতেন। আধুনিক শিল্পোন্নতিকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু একজন কমিউনিস্ট মতাদর্শীরূপে ভারতীয় প্রাথমিক শিল্পের জাতীয়করণ এবং ব্যাংক, বৈদেশিক ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের জাতীয়করণের জন্য অধিকতর আগ্রহী ছিলেন।

অর্জুন সিং জনসমাবেশে ভাষণ দিতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি তাঁর সমস্যাগুলি সহ-কর্মীদের মোহন সিং যশ, গুরুচরণ সিং সৈনস্রা এবং ভাই সন্তোষ সিং সঙ্গে আলোচনা করা পছন্দ করতেন। মদ্যপানে নিরাসক্ত অর্জুন সিং অত্যন্ত মিশুকে ও অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। 1963 সালে 10 জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

[Files of the Nawan Zamana (Jullundur), specially the issues of 8, 11, 17 and 31 March 1963, 11 March 1964, 1965, 1966, 1967 ; S. Gurcharan Singh Sainsra —Desh Bhakat Hall, Jullundur ; Personal interview with Arjun Singh's wife Shakuntala at Karnal ; Arjun Singh's own publications.]

এস. কে. বাজাজ

এস, ডি. গজরানী

অরবিন্দ (শ্রী) (১৮৭২-১৯৫০)

Aurobindo (Sri) (1872-1950)

1872 সালের 15 অগাষ্ট কলকাতায় শ্রী অরবিন্দের জন্ম হয়। তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ (1845-1893) হুগলী জেলার কোন্নগরের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের সন্তান। কৃষ্ণধন ভারতে জাতীয়তা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতা দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি স্কটল্যান্ডের এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বাংলাদেশের নানা জায়গায় চীফ্ মেডিক্যাল অফিসার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিশেষ কার্যদক্ষ ও প্রতিভাবান ছিলেন। কৃষ্ণধন মনেপ্রাণে পাশ্চাত্য ভাবধারানুরাগী ছিলেন; এবং তাঁর তিন পুত্রকে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করে তুলতে মনস্থ করেন। এই কারণে মাত্র সাত বছরের শিশু অরবিন্দ, তাঁর দুই ভ্রাতা বিনয় ভূষণ ও মনোমোহন পিতার সঙ্গে ইংলণ্ডে যান।

লণ্ডনে অরবিন্দ তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন একটি ইংরেজ পরিবারে। লণ্ডনের সেণ্ট পলস স্কুলে বিদ্যার্থী রূপে যোগ দেবার পূর্বেই তিনি ভাল ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন এবং নিজের আগ্রহে শেকস্পীয়ার এবং অন্যান্য রোম্যাণ্টিক কবিদের রচনা পাঠ করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। সেখানে গ্রীক ও ল্যাটিনে তিনি যে নম্বর পেয়েছিলেন ইতিপূর্বে কোন পরীক্ষার্থী তা পাননি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি ক্ল্যাসিকাল ট্রাইপস্ (পার্ট ওয়ান) পরীক্ষা উচ্চ প্রথম শ্রেণী নিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং সমস্ত ক্ল্যাসিকস্ পুরস্কার পান। গ্যেটে, দান্তে এবং ক্যালডেরনের মৌলিক রচনা পাঠ করার জন্য তিনি ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ও স্প্যানিশ ভাষা শিখেছিলেন। মাত্র এগার বছর বয়সে তিনি গ্রীক, লাটিন ও ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। পরে তিনি বাংলা সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী হন।

এগার এবং চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি অনুভব করেন যে ভবিষ্যতের যাবতীয় জাগতিক কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা থাকবে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্ডিয়ান মজলিসের কর্ণধাররূপে তিনি বিপ্লবাত্মক ভাষণ দিতেন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা জানাতেন। আই. সি. এস. পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করে তিনি বিদেশী ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী করতে অস্বীকার করেন। 1893 সালে তিনি বরোদা স্টেট সার্ভিসে চাকুরী নিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

বরোদাতে তিনি প্রথমে রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন। পরে তিনি স্টেট কলেজে ইংরেজি ও

ফরাসী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ তিনি সহকারী অধ্যক্ষ ও পরে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ওঁর চোখে একটা অলৌকিক জ্যোতি দেখতে পেতেন। বরোদাতে অরবিন্দ যে তের বছর কাটিয়েছিলেন তা ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের প্রস্তুতিকাল। এ সময় তিনি সংস্কৃত, মারাঠী, গুজরাটী ও কথ্য বাংলা শেখেন; প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য উপনিষদ ও সংস্কৃত সাহিত্য পড়েন এবং ইংরেজি ভাষায় কাব্য, নাটক ও রচনাদি লেখেন।

1893 সালে বোম্বাইর 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও গৃহীত পন্থার ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করে প্রবন্ধাদি লেখার সঙ্গে ভারতে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি সারা ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন ও বোম্বাই ও কলকাতায় বিপ্লবীদের সংগঠন স্থাপনে উদ্যোগী হন। 1902 সালে কলকাতায় গুপ্ত সংস্থাটি তাঁর নির্দেশে কাজ শুরু করে। সেই বছরে ভগিনী নিবেদিতা এই কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং 1910 সাল পর্যন্ত তিনি অরবিন্দের সহকর্মী ছিলেন।

1901 সালে ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীকে (1888-1918) অরবিন্দ হিন্দু মতে বিবাহ করেন। 1905 সালে তাঁর স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি তাঁর নিজস্ব অনুভূতির খানিকটা প্রকাশ করেছিলেন, যা তিনি বিশ্বাস করতেন তা হল ভারতের মুক্তি আসবে জ্ঞানভিত্তিক অধ্যাত্মবাদ ও ব্রহ্ম তেজের মাধ্যমে এবং এই বিশেষত্বগুলি তাঁর নিজের ছিল বলেই তিনি জানতেন। অরবিন্দ বাংলাদেশ ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে চলে যাবার পর মৃণালিনী দেবী অবশিষ্ট জীবন স্বামীর অধ্যাত্মজীবন ধ্যান করে অতিবাহিত করেন।

1905 সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে অরবিন্দের নেতৃত্বের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কলকাতায় তখনকার জাতীয় কলেজের (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যক্ষরূপে যোগদান করেন।

অরবিন্দ বিপ্লবীদের এই আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে নিজেদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতে বলেন। তিনি বিপ্লবীদের পরিকল্পনা রচনা করতে এবং তাদের সংগঠিত করতে নির্দেশ দিতেন। এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত বাংলা পত্রিকা 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয় ও তিনি নিজে বিপিন চন্দ্র পালের ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্'-এ যোগ দেন। এই দুটি দেশাত্মবোধক পত্রিকা তাঁর দেশপ্রেম এবং ভারতের মহান ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত তাঁর উচ্চ ধারণা দেশবাসীর কাছে পেঁছে দেয়। 'বন্দেমাতরম্' The Doctrine of Passive Resistance' নামে একটি প্রবন্ধে তিনি 'বয়কট' ও 'স্বদেশী আন্দোলন' কিভাবে রূপায়িত হবে তা নিয়ে লেখেন। 1906 সালে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্‌কালে তিনিই প্রথম প্রকাশ্যে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন এবং বালগঙ্গাধর তিলকের সহযোগিতায় ন্যাশনালিস্ট পার্টি সংগঠন করেন।

1907 সালের প্রথমদিকে অরবিন্দ তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্রকে তাঁদের মানিকতলার বাগানে বিপ্লবীদের একটি সমিতি স্থাপন করতে বলেন। সেই বছরেই তিনি সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন। কিন্তু ন্যাশনালিষ্ট নেতারা তাঁদের প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় সেই অধিবেশন ছত্রভঙ্গ করে দেন। কংগ্রেসের আপোষপন্থী নেতাদের ব্যর্থতা চরমপন্থী নেতাদের অভ্যুত্থান সূচনা করে।

1907 সালের আগষ্ট মাসে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' কাগজে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের জন্য গ্রেপ্তার হন। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা সফলকাম হয়নি। কারণ তিনি যে এই পত্রিকার সম্পাদক তাঁর কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি। অরবিন্দের গ্রেপ্তার এবং সেই সঙ্গে তাঁর দ্ব্যর্থহীন, বলিষ্ঠ মনোভাবে প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই বিখ্যাত কবিতাটি লেখেন। 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'

অরবিন্দ স্বরাজ চেয়েছিলেন। তার পিছনে ছিল তাঁর বিশ্বাস যেঃ 'ভবিষ্যতে মানবজাতির অগ্রগতি শুধুমাত্র আপাতদৃষ্ট বা বাহ্যিক হলে তা অপ্রতুল হবে। আত্মিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বাধীন এশিয়ায় এক স্বাধীন ভারতবর্ষের নেতৃত্ব প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণার্থেই স্বাধীনতালিপ্সা আকাঙ্ক্ষিত···ভারতকে স্বরাজ পেতে হবে শুধু তাঁর নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বা সুখ ভোগের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর হয়ে বেঁচে থাকার জন্য···এবং সমগ্র মানবজাতির আত্মিক ও নৈতিক প্রগতির জন্য'।

শ্রী অরবিন্দ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে 1902 সাল থেকে 1910 সাল এই আট বছর মাত্র যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে প্রথমার্ধ কেটেছিল গোপন সাংগঠনিক প্রস্তুতির কাজে, 1906 থেকে 1910 শেষের চার বছর তিনি প্রকাশ্যে সক্রিয় হন। পট্টাভি সীতারামাইয়া তাঁর "হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' গ্রন্থে লিখেছেন এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই 'অরবিন্দ

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা তাঁর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন'।

1908 সালের মে মাসে অরবিন্দ আরো আটত্রিশ জন বিপ্লবীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় এক বছর কাল জেলে বিচারাধীন থাকেন। পরে তিনি মুক্তি পান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই মামলা তাঁর পক্ষে পরিচালনা করেন। এই মামলা সারা ভারতবর্ষে প্রবল আলোড়ন এনেছিল। অরবিন্দের পক্ষে দেশবন্ধু আদালতে তাঁর সওয়ালের উপসংহারে ভবিষ্যৎবাণী করেন যে অরবিন্দ ভবিষ্যতে দেশপ্রেমিক কবি, ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্‌গাতা এবং মানব প্রেমিক রূপে প্রতিভাত হবেন এবং তাঁর বাণী ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে দূর-দূরান্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে।

কারাগারেই অরবিন্দের আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং সর্বত্র কৃষ্ণদর্শন হয়। ঈশ্বর সাক্ষাতে তিনি জানতে পারেন যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতি তাঁর যে বিশাল দায়িত্ব আছে তা পালন করার জন্য তিনিও শীঘ্রই মুক্তি পাবেন।

অরবিন্দ 1904 সাল থেকে যোগ অভ্যাস শুরু করেন। 1907 সালে মহারাষ্ট্রীয় যোগী লেলের নির্দেশমত ধ্যান করার সময় তিনি ব্রহ্ম এবং পূর্ণ মানসিক নির্বাণ উপলব্ধি করেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন ব্রহ্মোপলব্ধি হবার পর তিনি যা কিছু করেছেন বা বলেছেন সবই দৈব প্রেরণা থেকে। তাঁর সফল ক্রিয়াকলাপের পিছনে ছিল দৈবী নির্দেশ।

1909 সালের মে মাসে মুক্তি পাবার পর অরবিন্দ দুটি নতুন সাপ্তাহিকী 'কর্মযোগী' (ইংরেজী) ও 'ধর্ম' (বাংলা) তে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ লিখে পুনরায় কাজ শুরু করেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারা পূর্বের মতই চলতে লাগল। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল লক্ষণীয়। কারামুক্তির অব্যবহিত পরেই উত্তর পাড়াতে তিনি যে স্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক তিনি হুগলীতে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স আহ্বান করেন এবং 1909 সালের 31 জুলাই 'কর্মযোগী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'An open letter to my countrymen' এই খোলা চিঠিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মসূচী পুনরায় আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পুনরায় তাঁকে কারারুদ্ধ করতে চান।

1910 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক সন্ধ্যায় তিনি 'কর্মযোগী'র অফিসে (4, শ্যামপুকুর লেন) খবর পান যে আগামী কালই তাঁর অফিস তল্লাশী হবে ও তিনিও গ্রেপ্তার হবেন। অনির্দেশ্য কোন সত্তার নির্দেশে অরবিন্দ তৎক্ষণাৎ মনস্থির করেন এবং একটি দেশী নৌকায় করে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে চলে যান। চন্দননগরে কয়েকদিন থাকার পর তিনি ছদ্মনামে জল পথে পণ্ডিচেরী রওনা হন এবং 1910 সালের 4 এপ্রিল তিনি পণ্ডিচেরী পেঁছান। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু অরবিন্দ পণ্ডিচেরী ত্যাগ করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। এরপরেও ব্রিটিশ সরকার বহুদিন অরবিন্দ ও পণ্ডিচেরীতে তাঁর সঙ্গে যোগদানকারী বিপ্লবীদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন।

পণ্ডিচেরীতে আসার পর শ্রী অরবিন্দের জীবনে আমূল পরিবর্তন হয়। রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি সাহিত্য ও দর্শন চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এই কাজে তিনি পল রিশার ও তাঁর স্ত্রীর (পরবর্তীকালে 'মাদার' নামে খ্যাত) সাহায্য লাভ করেন। এই ফরাসী দম্পতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে পণ্ডিচেরী আসেন।

1914 সালে আগষ্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অরবিন্দ পল ও মাদাম রিশারের সহযোগিতায় 'আর্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাতে অরবিন্দ মানবাত্মার উত্তরণ, মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ, সমগ্র মানবজাতির ঐক্য, কবিতার ক্রমবিকাশ ও তার ভবিষ্যৎ, বেদ, উপনিষদ ও গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, ভারতের সভ্যতার ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লেখেন। প্রবন্ধগুলি পরে সংকলিত হয়ে The Life Divine, The Synthesis of Yoga, The Human Cycle, The Ideal of Human Unity, The Future Poetry, 'On the Veda', The Upanishads, Essays on the Gita এবং The Foundations of Indian Culture প্রভৃতি পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়। একাদিক্রমে ছয় বছর প্রকাশিত হবার পর 1921 সালে 'আর্য' বন্ধ হয়ে যায়। সাহিত্যে অরবিন্দের মহত্তম সৃষ্টি তাঁর রচিত আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বলিত মহাকাব্য 'সাবিত্রী' 23,813 লাইন অমিত্রাক্ষরে ইংরেজীতে দীর্ঘতম এই কাব্যটিকে স্যার হার্বার্ট রিড বলেছেন যে কোন সাহিত্যের মানদণ্ডে মহত্তর সৃষ্টি, বিখ্যাত মার্কিন

সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সমালোচক আর. এফ. পিপার বলেছেন এই কাব্য সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিফলিত করেছে। 'Savitri' ছাড়াও তাঁর আরো কিছু সাহিত্য-কৃতি আছে তার মধ্যে কিছু নাটক, আরো প্রায় পঞ্চাশটি প্রকাশিত গ্রন্থে তাঁর রচনা, ভাষণ, চিঠিপত্র, অনুবাদ এবং বেদ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা বিধৃত আছে।

1926 সালে অরবিন্দ নির্জনবাস গ্রহণ করেন এবং 1950 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর নির্জনতা রক্ষা করেন। 1928 সালে তিনি একবার তাঁর নির্জনতা পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ দেখে বলেছিলেন, 'একমাত্র আপনার কাছ থেকেই নির্দেশ আসুক আমরা তা পালন করার জন্য অপেক্ষা করছি। সময়ান্তরে বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা দেশের এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে উপদেশ নেবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছেন, অনেকে তাঁকে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতেন। অরবিন্দ দ্বিতীয় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেন যে তাঁর মত ও পথ অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তির কাছেই গৃহীত হবে, অন্যান্যদের কাছে এটি হবে দুর্বোধ্য এবং বহু সংখ্যক লোকের কাছে এটি প্রগতির বিকল্প এবং ক্ষমার্হরূপে প্রতিভাত হবে। অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না।

অরবিন্দ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ দিয়ে বুঝতেন যে মানবিক যাবতীয় সমস্যা এমনকি বিশ্বভ্রাতৃত্ব সমস্যাও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মীমাংসিত হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন একটি গভীর আত্মিক পরিবর্তন। মানুষ তার সীমিত মনোরাজ্যের ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্র বিশ্বচরাচরের গতি ও সামঞ্জস্যের নীতির সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য দৈবনির্দিষ্ট। এমন কি সমাজ সংস্কারের জন্যও তিনি কোন আইন বা বাধ্যতামূলক চাপ পছন্দ করতেন না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যখন আন্তঃ বর্ণ বিবাহ আইনসম্মত করার প্রচেষ্টা হয় তখন তিনি বলেন যে কোন সংশোধন যদি তাকে ফলপ্রসূ ও অর্থপূর্ণ করতে হয় তবে তা হবে একান্তই ভিতরের তাগিদ। তিনি বলেছিলেন হিন্দু-মুসুলমান মৈত্রী সমস্যার সমাধান আসবে রাজনৈতিক আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে নয় বরং হৃদয় ও মনের গভীরতম আকুতিই এই মিলন ঘটাতে পারে।

যোগসাধনার অধিকাংশ পন্থাই মানবাত্মাকে পার্থিব লোক থেকে অপার্থিব লোকে নিয়ে যায় এবং জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু অরবিন্দ যে যোগসাধনার কথা বলেছেন তাতে ঐশী শক্তির সঙ্গে একাত্ম মানুষ তার জ্ঞান, আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে জাগতিক জীবনকে ঐশ্বর্যবান করতে পুনরায় ফিরে আসে এবং তার দেহ মন জীবনকে অমৃতে উত্তীর্ণ করে। এক কথায় মানুষের সার্বিক উত্তরণেই অরবিন্দের যোগকল্পের গতিময়তা। যে বৃহত্তর শক্তি এই উত্তরণ ঘটাতে পারে তাই হল অরবিন্দের ভাষায় মানস-অগোচর 'অতি মানস'। এর প্রকাশ ঘটলে মানুষ তার ক্ষুদ্র প্রাণীত্ব থেকে বৃহত্তর মানবত্ব লাভ করে। তখনই আসে 'সত্যদ্রষ্টা, 'অতিমানবে'র প্রজন্ম।

অরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রম একটি পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান নয়। তাঁর নৈকট্যে তাঁরই নির্দেশমত যোগ অভ্যাস করার জন্যে যেসব শিষ্যরা আসতেন তাঁদের নিয়েই এই আশ্রম গড়ে ওঠে। 1926 সালে যখন অরবিন্দ শ্রীমার ওপরে আশ্রমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব-ভার ছেড়ে দিয়ে নির্জনবাস গ্রহণ করেন তখনই এই আশ্রম একটি নির্দিষ্ট আকার পায়। তখন থেকেই এটি বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। আজ এটি ভারতের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দেড় সহস্র নরনারী ও শিশুকে নিয়ে গড়ে ওঠা একটি আন্ত-র্জাতিক মানব সংস্থা। এই আশ্রমের বহুবিধ কার্যা-বলীর মধ্যে উল্লেখ্য শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন, শ্রী অরবিন্দ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ এডুকেশন তাদের পথিকৃতের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

শ্রী অরবিন্দের পাঁচটি স্বপ্ন ছিল—প্রথমটি হল এক স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারত। 1947 সালের 15 অগাস্ট তাঁর জন্মদিনে ভারত যখন স্বাধীন হল তখন তিনি তাকে একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল দৈবনির্দেশে যে কাজ নিয়ে তিনি তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন এ যেন তার দৈবনির্দেশের ফলশ্রুতি। তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন ছিল সমগ্র এশিয়ার মুক্তি এবং নবজাগরণ। তৃতীয় স্বপ্নটি হল ক্রমবিকাশের পরিণামে মানুষের উচ্চতর ও বৃহত্তর জাগতিক চেতনার জগতে উত্তরণ। তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর এই স্বপ্নগুলি সার্থকতার দ্বারে উপনীত বা সাফল্যের পথে প্রবাহিত হবে।

1950 সালের 5 ডিসেম্বর শ্রী অরবিন্দ মহাসমাধি লাভ করেন। কিন্তু যে কাজের তিনি সূচনা করে

গিয়েছেন সে কাজ মাদারের নির্দেশনায় বেগবান ও প্রবাহিত।

[Sri Aurobindo : Sri Aurobindo on Himself and on the Mother ; Bankim-Tilak-Dayananda ; The Renaissance in India ; A System of National Education ; Speeches ; Sri Aurobindo and His Ashram ; A. B. Purani : Life of Sri Aurobindo ; Sisirkumar Mitra : Resurgent India ; The Liberator ; K. R. Srinivasa Iyengar : Sri Aurobindo ; Haridas Mukherji & Uma Mukherji : Bande Mataram and India Nationalism ; Sri Aurobindo's Political Thought ; Karan Singh : The Prophet of Indian Nationalism ; Dinendrakumar Roy : Arabinda Prasanga (Bengali) ; Promodekumar Sen : Sri Aurobindo—Jiban-o-Yoga (Bengali) ; Sri Aurobindo : Karakahini (Bengali).]

শিশির কুমার মিত্র

অরুগাণ্টি ভেঙ্কট সুব্বাইয়া (১৮৮২- ?)

Oruganti Venkata Subbaiah (1882- ?)

অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার কাভালির এক বিত্তশালী পরিবারে 1882 সালে অরুগাণ্টি ভেঙ্কট সুব্বাইয়ার জন্ম। তাঁর বাবা লক্ষ্মী নারায়ণাপপা এবং মা কামাক্ষাম্মা ঐতিহ্যশালী হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের বংশোদ্ভূত ছিলেন। 13 বছর বয়সে ভেঙ্কট সুব্বাইয়ার বিবাহ হয়েছিল মহালক্ষ্মম্মার সঙ্গে।

ভেঙ্কট সুব্বাইয়ার প্রাথমিক পড়াশুনা অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত নেলোর হাইস্কুলে। তিনি 1897 সালে মাদ্রাজের হিন্দু হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে তিনি মাদ্রাজে খ্রীষ্টান কলেজ থেকে 1900 সালে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই কলেজেই তিনি স্নাতক স্তরের পড়াশুনো করলেও শেষ পর্যন্ত কলেজে তিনি বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন রাজামহেন্দ্রী-র গভর্ণমেণ্ট থার্ডস কলেজ থেকে। 1904 সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন। 1904-1905 সালে তিনি মাদ্রাজ 'ল' কলেজ-এ আইন নিয়ে পড়াশুনো করে কাভালিতে 1905 সাল থেকে আইনজীবি হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ছাত্র জীবনে জন-স্টুয়ার্ট মিল, এডমাণ্ট বার্ক এবং ইমারসনের রচনাবলী, ভেঙ্কট সুব্বাইয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। হিন্দু দর্শনে তাঁর গভীর বিশ্বাস থাকলেও জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট আধুনিক। তাঁর বিশ্বাস ছিল—পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করার ফলেই ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনাচিন্তার প্রসার এবং জাতীয়তাবাদের উন্মেষ সম্ভব হয়েছিল।

মাদ্রাজে অ্যানি বেসান্ত ও বোম্বাই-এ বাল গঙ্গাধর তিলক যে হোমরুল লীগ আন্দোলন করেছিলেন ভেঙ্কট সুব্বাইয়া তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি নিজেও হোমরুল লীগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হোমরুল লীগের নেলোর জেলার সম্পাদক হলেন ভেঙ্কট সুব্বাইয়া। পরবর্তীকালে তিনি সত্যাগ্রহের আবেদনে সাড়া দিয়ে 1919 সালে আইন ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। তাঁকে দোষী সাব্যস্ত হয়ে এক বছর টানা জেলও খাটতে হল। তৎকালীন প্রকাশন পাণ্ডুলু, কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া, বেজাওয়াদ গোপালারেড্ডী এবং ভাগে ডান্নেলাকাণ্টি রাঘবাইয়া প্রমুখ সত্যাগ্রহী নেতাদের তিনি ঘনিষ্ট সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী হরিজন উন্নতিকল্পে আন্দোলন করেছিলেন—সেই আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন ভেঙ্কটসুব্বাইয়া। 1910-এ কাভালিতে তিনি স্থাপন করলেন এক হরিজন বিদ্যালয়, দীর্ঘ পাঁচ বছর সেখানে তিনি হরিজন বালকদের পড়াশুনো শিখিয়েছিলেন। নেলোর জেলায় হরিজনদের তিনিই ছিলেন সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী।

ভেঙ্কট সুব্বাইয়া লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রায় 300 অনুগামী নিয়ে তিনি নেলোর জেলার গোগুলাপল্লী এবং তুম্মালাপেণ্টায় প্রচলিত আইন ভেঙ্গে লবণ তৈরী শুরু করলেন। এই কারণে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে ছয় মাসের জন্য জেলে পাঠানো হয়েছিল। 1941-এ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলাকালীন তাঁকে আবার ছয়মাস কারাবরণ করতে হয়েছিল।

ভেঙ্কট সুব্বাইয়া একজন গোঁড়া কংগ্রেসী ছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। তারপর থেকে 1947 পর্যন্ত সংগঠনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। রাজ্য

কংগ্রেস কমিটির তিনি ছিলেন আজীবন সদস্য। 1918 তে তিনি এ. আই. সি. সি.-রও সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। 1921 সালে তিনি নেলোর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

1935 সালে ভারত শাসন সম্পর্কিত আইন পাশ হয়ে যাবার পর যখন রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন তিনি নেলোর কেন্দ্র থেকে মাদ্রাজ বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন (1936)। রাজাগোপালাচারীর মন্ত্রীসভা চলাকালীন তিনি বিধানসভায় একজন স্পষ্ট বক্তা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

ভেঙ্কটসুব্বাইয়া-র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পর্যাপ্ত শিক্ষা ছাড়া আমাদের দেশে স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি কখনোই ভালভাবে চলতে পারে না। তিনি 1911 সালে নেলোরে 'জর্জ করোনেশন স্কুল' স্থাপন করেছিলেন—পরে 'বিবেকানন্দ বিদ্যালয়', এই নামে পরিচিত এই শিক্ষাকেন্দ্রটির তিনি 1922 পর্যন্ত ছিলেন পরিচালক। তিনি এছাড়া অন্ধ্রদেশীয় বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন—সেখানে হাতের কাজ শেখানো হত। তিনি 'তিলক জাতীয় বিদ্যালয়ম' নামে আরও একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন—এই বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী (1921)। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও এই স্কুলে চরকা কাটা এবং তাঁত চালানো শেখানো হত। নেলোরের কস্তুরী দেবী বিদ্যালয়ম স্থাপনের মূলেও ছিল তাঁর সক্রিয় সাহায্য।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও ভেঙ্কটসুব্বাইয়ার অবদান ছিল অসাধারণ। হরিজন উন্নয়নের আন্দোলন ছাড়াও তিনি বিধবাদের পুনঃবিবাহের স্বপক্ষে ছিলেন। 1914-তে নেলোরে তিনি নিজ উদ্যোগে এক বিধবা মহিলার পুনঃবিবাহের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর নিজের পরিবারেই পুত্র ভেঙ্কটেশ্বরের এক বিধবা কন্যার পরিগ্রহের মাধ্যমে অনুকরণযোগ্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন (1934)। ভেঙ্কটেশ্বর শর্মার এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাসিনাধুনি নাগেশ্বর রাও পান্তুলুর মাদ্রাজের বাড়িতে।

ভেঙ্কটসুব্বাইয়ার স্থান সেইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সারিতে—যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন—অথচ বিনিময়ে কিছুই চান নি। তিনি দেশের কাজের জন্য আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিলেন ও তার সমস্ত সম্পত্তি দেশের কাজেই উৎসর্গ করেছিলেন। ব্রিটিশদের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার সংগ্রামে তার পত্নী ও সন্তান সন্ততিরাও সামিল হয়ে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিলেন। সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার মত উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মন তাঁর ছিল। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের একজন উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এটাও ঠিক যে—রাজনীতির ক্ষেত্রের তুলনায় সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য।

[Who's who in Madras Legislature (1936-1937) ; A Kaleswara Rao—Na Jeevitha Katha (In Telugu) ; personal interview of the Reserch Fellow with Oruganti Venkata Subbiah.]

আর. নাগেশ্বর রাও **ওয়াই শ্রীরামমূর্তি**

অরুণ কুমার চন্দ (১৮৯৯—১৯৪৭)

Arun Kumar Chanda (1899—1947)

1899 সালের 17 ফেব্রুয়ারী আসামের অন্তর্ভুক্ত শিলচরে অরুণ কুমার চন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কামিনী কুমার চন্দ-এর তিনি দ্বিতীয় পুত্র। আইনজীবি কামিনী কুমার সে সময় আদালতে পশার জমিয়েছেন এবং যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন। ইনি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন, ফলে গোঁড়ামিমুক্ত আবহাওয়ায় তাঁর ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে ওঠেন।

1927 সালে অরুণ কুমার শিলচরের প্রসিদ্ধ আইনজীবী মহেশচন্দ্র দত্ত-এর কনিষ্ঠা কন্যা জ্যোৎস্নাকে বিবাহ করেন। এই মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 1957 থেকে 1961 সাল পর্যন্ত তিনি আসাম বিধান সভার সদস্যা ছিলেন এবং 1962 সাল থেকে তিনি ছিলেন লোকসভার সদস্যা।

অরুণ কুমারের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় শিলচরের গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে। এই স্কুল থেকেই তিনি 1915 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে একাধিকবার কলেজ পরিবর্তন করতে হয়। তিনি শ্রীহট্টের মুরারি চাঁদ কলেজ, হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস ও কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশুনা করেন। কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি ইউনিভার্সিটি

ট্রেনিং বিভাগের সভ্য ছিলেন। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত হন এবং অবিনাশচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। 1927 সালে তিনি এল. এল. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। 1929 সালে লিংকনস্ ইন্ থেকে তিনি ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1930-31 সালে কিছুকাল তিনি সিঙ্গাপুরে আইনজীবী রূপে কাজ করেন কিন্তু তাঁর পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি শিলচরে ফিরে আসেন। অসুস্থ পিতার সান্নিধ্যে থাকার জন্য তিনি এই ছোট শহরটিকেই তাঁর কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেন। তিনি শ্রীহট্ট এবং কাছাড়ে আইনজীবীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম ক্রমশঃই বেশী করে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট করতে থাকে।

দেশের রাজনীতিতে তাঁর পিতা একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। অরুণ কুমার পিতার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অল্প বয়সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে আগ্রহী হন। 1921 সালে তিনি স্বল্পস্থায়ী শিলচরের ন্যাশনাল স্কুলে এবং কলকাতার ন্যাশনাল কলেজে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকরূপে কাজ করেন। এর কিছু পরে তিনি চিত্তরঞ্জন দাসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করার সময় তিনি ব্রিটিশ লেবার পার্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং ঐ দলের হয়ে নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বাংলা এবং ইংরেজী দুটি ভাষাতেই চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতেন।

গঠন মূলক কাজের ক্ষেত্রে অরুণ কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল 1935 সালে শিলচরে গুরুচরণ কলেজের স্থাপনা। তিনি ছিলেন এই কলেজটির অবৈতনিক অধ্যক্ষ। বহু বৎসর তিনি এই কলেজটিতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। ছাত্রদের তিনি ছিলেন এক মহাপ্রাণ ও প্রকৃত বন্ধু। 1931 সালে সার্বজনীন দুর্গাপূজায় অস্পৃশ্যদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত পরিকল্পনার তিনি ছিলেন অন্যতম সমর্থক। এই পূজায় জাতপাত নির্বিশেষে একত্র ভোজনেরও আয়োজন করা হয়। অরুণ কুমার কর্মী সংঘের কাজকর্মের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন এবং কাছার ডিস্ট্রিক্ট পোস্টাল এ্যাণ্ড রেলওয়ে মেইল সার্ভিস ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে অরুণ কুমার ট্রেড ইউনিয়নের কার্যাবলীতে আগ্রহী হন। বার বছর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে 1945 সালে এই কর্মীসংঘের সারা ভারত সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই সংঘটি ছিল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেদের। কিন্তু শীঘ্রই চা বাগানের কর্মীদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁর অনুরোধে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সরকার এক অনুসন্ধানী সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির পরামর্শক্রমে চা বাগানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি ডিগবয়ের আসাম অয়েল কোম্পানীর আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রভিন্সিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তিনি প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

অরুণ কুমার কাছাড়ে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সংগঠনকে পুনর্জীবন দান করেন। তিনি কংগ্রেসের মতাদর্শকে জেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পেঁাছে দেন, এর ফলে জনসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। 1937 সাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি তিনি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। এই বৎসর তিনি আসাম লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হন এবং সেখানে অতি অল্পকালের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কংগ্রেস অ্যাসেম্বলি পার্টির সহকারী নেতারূপে নির্বাচিত হন এবং 1938 সালে প্রদেশে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। 1937 থেকে 1942 সালের মধ্যে তাঁর সুদক্ষ পরিচালনা ও নিজস্ব রচনার মাধ্যমে তিনি শিলচরের বাংলা সাপ্তাহিক 'সপ্তক'কে জনমত প্রকাশের এক শক্তিশালী মুখপত্র হিসাবে পরিণত করেন।

1941 সালের জানুয়ারি মাসে সমর প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করায় তিনি এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 1942 সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় পুনরায় তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে বন্দী করা হয়। কারামুক্তির পরও 1945 সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাঁকে আসামে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। 1945 সালের অক্টোবর মাসে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন। কিন্তু এর কিছুকাল পরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর 1947 সালের 26 এপ্রিল কলকাতায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অরুণ কুমার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর বিশদ অধ্যয়ন এবং পরিহাসপ্রিয় স্বভাবগুণে তিনি বিদ্বজ্জনের আলোচনা সভা বা অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের সমাবেশ যে কোনও জায়গায়ই

হোক নিজেকে সভার আকর্ষণের কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতেন।

[Ananda Bazar Patrika, 2 February, 1936 ; Amrita Bazar Patrika, 2, 4, 7 and 9 Februry 1936; Prabasi, Falgun, 1342 BS, Centenary Souvenir of Silchar Government High School, 1964, Hate Khari, Bengali Magazine of Dinanath Nabakishore Balika Vidyalaya, 1959, Presidency College Register, Calcutta, 1927 ; Srihatta Pratibha—by Narendra Kumar Gupta Chaudhury, Sylhet, 1961 ; Letters preserved in his home at Silchar ; unpublished reminiscences by his eldest daughter ; information supplied to the Research Fellow by Shri Rukmini Kumar Das, a close associate of Kamini Kumar Chanda].

(এম. পি. দে.) অসীম কুমার দত্ত

অর্ণ চন্দ্র গ্হ (১৮৯২—১৯৮৩)
Arun Chandra Guha (1892-1983)

কৈলাস চন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবীর পুত্র অর্ণ চন্দ্র গ্হ 1892 সালের 14 মে বরিশাল শহরে (অধুনা বাংলাদেশ) এক সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন অকৃতদার ছিলেন। ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করে অর্ণ চন্দ্র আইন অধ্যয়নের জন্য কলকাতায় আসেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আইন কলেজে যোগ দেন নি ; পরিবর্তে বৈপ্লবিক কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

প্রথম যৌবনে অর্ণ চন্দ্র তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনায় সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত), অশ্বিনী কুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও কালীশ বিদ্যারত্নের চরিত্র ও কর্মোদ্যম দ্বারা প্রভাবিত হন। বরিশাল কালেক্টরেটের করণিক—তাঁর পিতা কৈলাশ চন্দ্র, তাঁকে টডের Annals and Antiquities of Rajasthan-এর বাংলা অনুবাদ পড়তে উৎসাহিত করেন। অর্ণ চন্দ্রের পিতা মাতা প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁদের নৈতিক চরিত্রের উচ্চমান অর্ণ চন্দ্রের শিশুমনে বিশেষ রেখাপাত করেছিল।

অর্ণ চন্দ্রের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর বিনয় এবং আদর্শবাদী নিষ্ঠা। সে সময়কার নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি ব্রহ্মচর্য ও অন্যান্য নির্ধারিত ধর্মীয় বিধান ও অনুষ্ঠান পালন করতে শিখেছিলেন। প্রজ্ঞানানন্দের শিক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দের রচনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি তাঁর ধর্মচেতনা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সাহায্য করে। গীতায় প্রচারিত 'নিষ্কাম কর্মের' আদর্শ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরে তাঁর জীবনে আসে 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' (সাপ্তাহিক) ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী পত্র পত্রিকার প্রভাব। বঙ্কিমের রচনা—বিশেষতঃ 'আনন্দমঠ', রমেশ চন্দ্র দত্তের উপন্যাস, সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', দুর্গাদাস লাহিড়ির 'স্বাধীনতার ইতিহাস' ও অন্যান্য স্বাদেশিক চেতনাসম্পন্ন সাহিত্য কীর্তিগুলিও তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

1906 সাল থেকেই অর্ণ চন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক সংঘে কাজ করেন এবং 1910 সালে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে 'যুগান্তর' দলের বরিশাল শাখায় যোগ দেন। 1914 সালের শেষ থেকে বরিশালে থাকার সময়েই তিনি ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র বিষয়ে জানতে পারেন। 1915 সালে তিনি আত্মগোপন করেন। কিন্তু 1916 সালের জুলাই মাসে তিনি ধরা পড়েন এবং 1818-র তিন আইন অনুসারে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। 1920 সালের জুন মাসে মুক্তি লাভ করে তিনি সরস্বতী লাইব্রেরী চালু করেন। 1920 সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির কার্যালয়ে তিনি যোগ দেন। এই অধিবেশনে 'যুগান্তর' দলের কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে অর্ণ চন্দ্র মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করেন ও প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দেন। তাঁর উদ্যোগে সরস্বতী লাইব্রেরী স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশেষতঃ অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার পুস্তিকার প্রধান প্রকাশন-কেন্দ্র হয়ে ওঠে। অর্ণ চন্দ্র স্বয়ং কয়েকটি পুস্তিকা ও প্রচারপত্র লেখেন। 1923 সালে তিনি শ্রী সরস্বতী প্রেস স্থাপন করেন। এটি আজ ভারতের অন্যতম প্রধান মুদ্রণকেন্দ্র। এই বৎসরেই তিনি 'সারথি' নামে

একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। 1924 সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং 1818-র তিন আইন অনুযায়ী তাঁকে রাজবন্দী করে রাখা হয়। বঙ্গোপসাগরের সন্দ্বীপ দ্বীপে তিনি অন্তরীণ থাকেন। 1928 সালের অক্টোবর মাসে মুক্তিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বাংলা থেকে বহিস্কৃত করা হয়; কয়েকমাস পরে এই আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

এর পর তিনি প্রকাশ করেন একটি রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা'। এই পত্রিকাটির মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ও তার জন্য বৈপ্লবিক প্রস্তুতির প্রয়োজনের কথা প্রচার করা হতো। 1928 সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের পক্ষে সরকারী প্রস্তাব কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি অনুমোদন করে। 'যুগান্তর' দলের ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত ও হরিকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে অরুণ চন্দ্র কংগ্রেস প্রতিনিধিদের নিকট হতে পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপক্ষে সমর্থন সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। যখন গান্ধী, মতিলাল ও অন্যান্যদের সমর্থন পুষ্ট সরকারী প্রস্তাবটি মাত্র চারশ পঞ্চাশটি অধিক ভোটে গৃহীত হয় তখন 'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রস্তাবের প্রবক্তাগণ এটিকে তাঁদের এক বিরাট সাফল্য বলে দাবী করেন। বিশেষতঃ প্রকাশ্য অধিবেশনে যখন গান্ধী এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁর দাবীগুলি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত না হলে পরবর্তী অধিবেশনে গান্ধী স্বয়ং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করবেন তখন তাঁদের দাবী বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

বিপ্লবী সংগঠনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও অরুণ চন্দ্র একজন সক্রিয় কংগ্রেস কর্মীরূপে পরিচিত ছিলেন। 1930 সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানের অব্যবহিত পরেই অরুণ চন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং 1818 সালের তিন আইন অনুসারে তাঁকে রাজবন্দী করা হয়। এ সময় তিনি প্রায় সাড়ে আট বছর আটক থাকেন। 1938 সালে মুক্তি লাভের পর অরুণ চন্দ্র বাংলা কংগ্রেসের পুনর্গঠনের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ অমান্য করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই সময়টি ছিল কং-গ্রেসের বিরুদ্ধে সুভাষ চন্দ্র বসুর বিদ্রোহের কাল। নতুন কংগ্রেস কমিটি গঠিত হলে অরুণ চন্দ্র গুহ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সচিব এবং তাঁর অধীনে অপর দুজন সহকারী সচিব নির্বাচিত হন। 1941 সালের মে মাসে একক সত্যাগ্রহ পরিচালনার সময় অরুণ চন্দ্র পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং বিনা বিচারে আটক থাকেন। 1946 সালের জুন মাসে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং সেই বছরেই ভারতের গণ পরিষদ (কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলিতে) সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি তিন-বার (1952, 1957 এবং 1962) লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। 1953 থেকে 1957 সাল পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের অর্থ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। 1950 সালে এস্টিমেটস্ কমিটি গঠনের সময় থেকে 1953 সালে সরকারে যোগ দেবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এর সদস্য ছিলেন। পরে তিনি পাবলিক অ্যাকাউণ্টস্ কমিটির এবং 1962 থেকে 1963 সাল পর্যন্ত পুনরায় এস্টিমেটস্ কমিটির সদস্য হন। তিনি চার বছর এই কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন।

অরুণ চন্দ্র শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত 'দেশ পরিচয়', 'বিজয়ী প্রাচ্য' ও 'বিদ্রোহী প্রাচ্য' গ্রন্থগুলি ব্রিটিশ শাসকরা বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলির উপাদান ইতিহাস, পুরাণ, ছোট গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় থেকে সংগৃহীত হয়েছে। 1972 সালে প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'First spark ot Revolution' 1900 থেকে 1920 সাল পর্যন্ত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস বিধৃত করেছে। পার্লামেণ্টে আসার সময় থেকেই তিনি ভারতের বিভিন্ন পত্রিকা ও দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে নিয়মিত লিখেছেন। লেখক ও সংগঠক উভয়রূপেই বিভিন্ন সময়ে তিনি 'সারথি', 'স্বাধীনতা', 'ফরওয়ার্ড' ও 'মন্দিরা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন।

অরুণ চন্দ্র বরাবরই তাঁর দেশবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করেছেন। 1952 সালে তিনি 'প্রজ্ঞানানন্দ জনসেবা সংঘ' নামে একটি বিধিভুক্ত সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই সংস্থাকে তিনি প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দান করেছেন এবং এটি পশ্চিম বাংলার তিনটি বিভিন্ন গ্রামীণ কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। তিনি বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের প্রতি সম গুরুত্ব আরোপ করে দ্রুত শিল্পায়ণে বিশ্বাসী ছিলেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্নীতি অপ-সারণের আদর্শে তিনি গভীর আস্থাবান ছিলেন। জাতিভেদ প্রথা রোধ, অস্পৃশ্যতা অপসারণ, নারী-জাতির জাগরণ এবং সর্বস্তরের মানুষের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ছিল তাঁর প্রার্থিত লক্ষ্য।

[Amalendu Dasgupta—Buxa Camp, Calcutta, 1361 B. S. ; Bhupendra Kumar Datta—Biplaber Padachinha, Calcutta, 1954 ; Who is Who, 1964-65 ; Prabhat Kumar Mukhopadhyaya—Bharate Jatiya Andolan, Calcutta, 1965 ; The Amrita Bazar Patrika, Independence Number, 1947 ; Arun Chandra Guha—First Spark of Revolution, Calcutta, 1972 ; Personal knowledge and discussion of the contributor with A. C. Guha.]

(অমিয়া বরাট) শচীন্দ্র লাল ঘোষ

অরুণা আসফ আলী (১৯০৯—)
Aruna Asaf Ali (1909—)

প্রথম জীবনে জাতীয়তাবাদী ও পরবর্তী কালে 'সোসালিস্ট' নেতা অরুণা আসফ আলির জন্ম 1909 সালে পূর্ব বাংলা থেকে আগত কলকাতার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। উত্তর প্রদেশের নৈনিতালের এক হোটেল মালিকের কন্যা অরুণা গাঙ্গুলী নৈনিতালের স্কুলে পড়াশুনা করেন ; নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নিতেন। রাজনীতিতে তাঁর কোন উৎসাহ ছিল না। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি দিল্লীবাসী কংগ্রেস নেতা ও প্রখ্যাত আইনজীবী আসফ আলির বাক্‌দত্তা হন। তাঁদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল প্রায় বিশ বছর। অরুণার পিতার প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও 1928 সালে তাঁদের বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনে তাঁরা সুখী হন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ক্রমশঃ অনুকূল হয়ে আসে। তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। অরুণা তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা ভ্রমণ করেন, ইউনেস্কোর ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে মেক্সিকো গমন করেন এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিও সফর করেন।

আসফ আলির সঙ্গে বিবাহের ফলে অরুণার জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় স্বামীর মাধ্যমে তিনিও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন, কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী ও মৌলানা আজাদের সংস্পর্শে আসেন এবং কংগ্রেসের সভাসমিতিগুলিতে যোগদান করেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন এবং রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতাদের প্রভাবে আসেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকলেও রাজনীতি, অর্থনীতি ও কার্ল মার্কসের লেখা নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন। কালক্রমে তিনি একজন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠেন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালাবার পক্ষপাতী হন। 1930 সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। 1941 সালে গান্ধীজি ভারতে ব্রিটিশের সমরায়োজনের প্রতিবাদে একক সত্যাগ্রহ শুরু করলে তিনি পুনরায় কারাবরণ করেন।

1942 সালের আগস্ট বিপ্লবের সময় তাঁর জীবনের গতি দ্বিতীয়বার পরিবর্তিত হয়। কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারে সারা ভারতবর্ষে যে বিক্ষোভের ঢেউ উঠেছিল তার ডাকে সাড়া দিয়ে অরুণা আসফ আলি তাঁর কয়েকজন সোস্যালিস্ট বন্ধুদের নিয়ে আন্দোলনকে সক্রিয় রাখার জন্য একটি গোপন বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেন এবং আত্মগোপন করেন। তিনি কলকাতা, বোম্বাই ও দিল্লী বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং 1943 সালে আগস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর ছত্রভঙ্গ বিপ্লবীদের একত্র করার চেষ্টা করেন। 1946 সালে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের সমালোচনা শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেন, "রাজনৈতিক কুট সংবিধানগত সীমারেখা ছেড়ে অরুণা বরং হিন্দু মুসলমানকে হানাহানি ছাড়িয়ে এক প্রাচীরের কাছে একত্র করুক।" আবুল কালাম আজাদকে লেখা একটি চিঠিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে অরুণা এবং পটবর্ধন বলেন, "আমরা আমাদের যেসব সহকর্মী কারারুদ্ধ হননি তাঁদের সঙ্গে একত্র হয়ে এমন একটি সংস্থা গঠন করেছিলাম যা হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী এবং অন্যরা যাঁরা কারা-প্রাচীরের বাইরে আছেন তাঁদের 1942 সালের 8 অগাস্টের সংকল্পকে কার্যে পরিণত করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে।"

1946 সালে আত্মপ্রকাশ করার পর স্বমহিমায় সুখ্যাত অরুণা আসফ আলী 1947 সালে দিল্লী প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তাঁর আপোষহীন মনোভাবের জন্য স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ

হয়। এমন কি তাঁর স্বামীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখা দেয়। 1946 সালে তিনি সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। দু বছর পরে তিনি এই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে লেফ্‌ট সোস্যালিষ্ট গ্রুপ গঠন করেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। 1955 সালে এই দল কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে মিশে যায়। অরুণা আসফ আলি কমিউনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির সভ্য হন ও অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি হন। 1958 সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি পরিত্যাগ করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। 1964 সালে জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুদিনে তিনি কংগ্রেসে ফিরে আসেন কিন্তু রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই সক্রিয় ছিলেন। 1958 সালে তিনি জনসংঘের প্রতিনিধিকে পরাজিত করে দিল্লীর প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন এবং 1959 সালে দ্বিতীয়বার কার্যভারগ্রহণ করে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটি, অল ইণ্ডিয়া পীস কাউন্সিল ও ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান উইমেন-এর সভ্যা থেকেছেন। তিনি 'Link' এবং 'Patriot'—এই দুটি নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত বামপন্থী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে তিনি বরাবরই ভারতের সোস্যালিষ্ট আন্দোলনের গতি প্রকৃতিতে আগ্রহ নিয়েছেন কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি আর উৎসাহী নন।

অরুণা আসফ আলি ভারতের বিগত যুগের নিঃস্বার্থ অনুভূতিশীল, আবেগপ্রবণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, প্রগতিপন্থী দেশপ্রেমিকদের একজন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগদীপ্ত যুগ শেষ হবার পরে বাস্তবে যে রাজনৈতিক সত্যতা প্রতিফলিত হয়েছিল তার সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। অবশেষে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু একজন অনুরাগী সোস্যালিষ্ট রূপেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

[B. Pattabhi Sitaramayya,—History of the Indian National Congress, Vol. II ; Bijan Mitra and Phani Chakravarty (Ed.), —Rebel India ; Gene D. Overstreet and M. Windmiller,—Communism in India, Bombay, 1960 ; J. K. Khanna,—Life Sketch, of Mrs. Asaf Ali ; L. P. Sinha,—The Left Wing in India, 1965.]

(মনতোষ সিং) সুনীল সেন

অশোক মেহতা (১৯১১—১৯৮৪)

Ashok Mehta (1911—1984)

1911 সালে 24 অক্টোবর সৌরাষ্ট্রের ভাবনগরে অশোক মেহতা জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের শিক্ষা শেষ করেই মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। এর পর থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক তরঙ্গের সঙ্গে আবর্তিত হয়ে তাঁকে আবশ্যিক ভাবে জেলে বন্দী হতে হয়েছে। কৈশোরেই এক অস্থির ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি স্বদেশ ও সোস্যালিজমের প্রতি উৎসর্গীকৃত এক একক, আজীবন অকৃতদার জীবন বেছে নিয়েছিলেন। অশোক মেহতা বোম্বাই-র স্কটিশ মিশনারী উইলসন কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে কিছুকাল ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ ইকনমিকস্‌-এ কাজ করেন ; কিন্তু 1932 সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে অশোক মেহতা এ কাজ ছেড়ে দেন।

অশোক মেহতার পিতা রণজিৎরাম ভি. মেহতা ও মাতা শান্তি গৌরী ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। অশোকের দুটি বোন ছিল—অরুণা এবং উর্বশী।

প্রথম জীবনে মানসিকতার দিক থেকে অশোক মেহতা ছিলেন সম্পূর্ণ প্রাচীনপন্থী ভারতীয়। স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর পরে অশোক মেহতা প্রথম ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ায় সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতের মতামত প্রচার করতে যান। রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা অভিনিবেশ সহকারে বিদ্যাচর্চা করেন এবং জ্ঞানের ভিত্তিকে প্রশস্ততর করতে ক্লান্তিবোধ করেন না অশোক মেহতা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। একদিকে যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সর্বোপরি গান্ধীজি তাঁকে অনুপ্রাণিত করতেন তেমনি অন্যদিকে পরবর্তী জীবনে তিনি হ্যারল্ড লাস্কি ও কার্ল মার্কসের জীবনবাদের একজন উৎসাহী অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গীর এই ভারসাম্যের ফলে

সম্ভবতঃ তিনি ব্যক্তিকে ব্যক্তিরূপেই মর্যাদা দিতে শিখেছিলেন এবং গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সাম্যে বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

জেলে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অচ্যুত পটবর্ধনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পরবর্তী জীবনেও অক্ষুন্ন ছিল। তাঁদের সহযোগিতায় 1934 সালে তিনি ইণ্ডিয়ান সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠন করেন। এ সময় তাঁর মাত্র তেইশ বছর বয়স এবং তখনকার বেগবান সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনোত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে খুব অল্পসংখ্যক লোকই চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। 1934 থেকে 1939 সাল পর্যন্ত তিনি 'কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট উইকলি' পত্রিকাটি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন এবং জাতীয় কর্মসমিতির সদস্যরূপে ও প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির অধিকর্তারূপে 1934 থেকে 1963 সালের মধ্যে বহু বিরুদ্ধতার মধ্যেও সোস্যালিজমের গতিকে অক্ষুন্ন রাখেন। কালচক্রে অনেক নেতাই ক্লান্তি বোধ করেছেন বা মোহমুক্ত হয়েছেন কিন্তু অশোক মেহতা ভারতের সোস্যালিজমের ইতিহাসে চিরদিনই দেদীপ্যমান থেকেছেন। উত্তরসূরীরা তাঁকে স্মরণ করবে কেবলমাত্র একজন সার্থক রাজনৈতিক নেতা বা দলনেতা রূপেই নয়—তিনি পরিচিত হবেন সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যরূপে যিনি ভারতীয় সোস্যালিজমের উদ্‌গাতা ও অনুপ্রেরণ দাতা ছিলেন এবং ভারতীয় সোস্যালিজমের গঠনের প্রথম পর্বে ছিলেন এর অতন্দ্র ও সতর্ক প্রহরী।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান ছিল। হিন্দ্‌ মজদুর সভার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সচিব রূপে তিনি ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন কার্যাবলীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কৃষক সম্প্রদায়কে তিনি উপেক্ষা করেন নি। এমন কি স্বাধীনতা লাভের পরেও গুজরাটে কৃষক আন্দোলনে সামিল হওয়াতে অশোক মেহতা এক বৎসরের জন্য কারাবরণ করেন।

তাঁর গ্রন্থাদি ও প্রকাশনার বিষয়, তাঁর অধীনে এনকোয়ারি কমিটি ও ডেলিগেশনগুলি তাঁর গভীর অধ্যয়নের স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর অধীত বিষয়ের মধ্যে পড়ে মজুরি, মুনাফার ভাগাভাগি, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির নিকট শস্যের আমদানি-রপ্তানি, পরিকল্পিত অর্থনীতি, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, 1857 সালের বিদ্রোহ প্রভৃতি। সভাপতি বা সহ-সভাপতি, চেয়ারম্যান অথবা সদস্য রূপে তিনি বহু অর্থনৈতিক গবেষণা, বহির্বিশ্ব ঘটনাবলী বা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

স্বাধীনতোত্তর উত্তাল রাজনীতিতেও মেহতার অবদান কম ছিল না। লোকসভায় তিনি দুবার নির্বাচিত হন এবং এখানে তিনি তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যুক্তিবাদ এবং তথ্যসমৃদ্ধ উচ্চমানের বক্তৃতাবলীর জন্য যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন। অল্প সময়ের জন্য তিনি প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদে বৃত হন।

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও অশোক মেহতা ইতিহাসে সফল জননেতার আসন লাভ করেন নি। তার কারণ তিনি একান্ত ভাবে গ্রন্থমুখী ছিলেন এবং ভারতীয় রাজনীতির নানা ধরনের পালাবদলের পটভূমিকায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন নি। যে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদে তাঁর সমসাময়িকরা যেভাবে যে কোন গোষ্ঠীর কাছে সমর্থক বা সহযোগিতার হাত বাড়াতে ইতস্ততঃ করেন নি তাঁর মধ্যে সেরকম কোন সুবিধাবাদী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেনি। এছাড়া জওহরলাল নেহেরু সোস্যালিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করায় ও প্রজা সোস্যালিষ্ট দলের মধ্যে ভাঙ্গনের ফলে অশোক মেহতা ও তাঁর সহযোগীদের জন্য অবশিষ্ট আর কিছুই ছিল না যা নিয়ে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র বা ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারেন। যদিও রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ ও সর্বহারাদের বিশ্বস্ত মুখপাত্র ছিলেন তবু তাঁর মানসিকতা ও ব্যক্তিগত রুচির দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় রাজনীতির ক্ষেত্রের চেয়ে অধ্যাপনার জগতেই তিনি বিশেষ উপযুক্ত হতেন।

[Ashok Mehta—Communal Triangle In India (1942);—Who owns India? (1950);—Democratic Socialism (1951);—The Political Mind of India (1952); Socialism and Peasantry (1953);—Politics of Planned Economy (1953);—Studies in Asian Socialism (1956); Biographical note supplied by the Planning Commission Office; Personal Interview of the Research Fellow with Ashok Mehta; Personal knowledge of the contributor.]

(কুমুদ প্রসন্ন) এস. কে. মুরানজন

অশ্বিনী কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩)

Aswini Kumar Datta (1856-1923)

বরিশাল জেলার অন্তর্গত পাটুয়াখালি মহকুমার লাউলকালে গ্রামে 1856 সালের 15 জানুয়ারী অশ্বিনী কুমার দত্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ব্রজমোহন দত্ত প্রথম জীবনে মুন্সেফ ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন ও পরে জেলা জজ হন। মাতা প্রসন্নময়ী দেবী ধর্মপরায়ণা ও অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মহিলা ছিলেন। অশ্বিনী কুমার তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে স্বাধীনতার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দুই-ই লাভ করেছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি বরিশালের বাটাজোর গ্রামের পাঠশালায় যোগ দেন। 1870 সালে তিনি রংপুর থেকে এণ্ট্রান্স ও পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এলাহাবাদ যান ও সেখান থেকে 1877 সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাংলাদেশে ফিরে এসে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে 1878 সালে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেখান থেকেই 1879 সালে এম. এ. ও 1880 সালে বি. এল. পাশ করেন। 1878 সালের এপ্রিল মাসে তিনি চন্দ্রকুমার রায়ের কন্যা সরলাবালাকে বিবাহ করেন।

1878 সালে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা বৃত্তি নিয়ে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরের বছর শ্রীরামপুরের কাছে ছাতরার স্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে যোগ দেন। 1880 সালে তিনি বরিশাল আদালতে আইনজীবী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর আইন ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে কিন্তু এ পেশায় তাঁর আগ্রহ না থাকায় তিনি ওকালতি ছেড়ে দেন। বিপিনচন্দ্র পালের মত তিনিও ধনীর সন্তান ছিলেন। জীবিকা অর্জনের কোন বাধ্যতামূলক প্রয়োজন তাঁর ছিল না। নিঃসন্তান অশ্বিনী কুমার বরিশাল জেলার সব ছাত্রছাত্রীকে সন্তানতুল্য দেখতেন এবং তাদের শিক্ষার জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করেছিলেন। 1884 সালের 27 জুন তিনি তাঁর পিতার নামে ব্রজমোহন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পাঁচ বছর পরে ব্রজমোহন কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। অশ্বিনী কুমার সতের বছর এই কলেজে ইংরেজীর অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন। 1898 সালে এই কলেজে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং একই সময়ে এখানে আইন শিক্ষা ও বি. এল. পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। অশ্বিনী কুমারের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ও যত্নে এই দুটি বিদ্যালয়ই আদর্শশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এই বিদ্যালয়গুলির নীতি ছিল, 'সত্য, প্রেম এবং পবিত্রতা'। ছাত্রদের এই নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করা হত। অশ্বিনী কুমার এই উদ্দেশ্যে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে 'ব্যাণ্ড অফ মার্সি', 'ব্যাণ্ড অফ ইউনিটি', 'ব্যাণ্ড অফ হোপ' এবং 'লিটল্ ব্রাদার্স অফ দ্য পুওর' নামে অনেকগুলি ছোট ছোট সংঘ গঠন করেছিলেন। কলেজটিরও সেই যুগে খুব প্রশংসা হয়েছিল। অশ্বিনীকুমার স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভার উদ্যোগেই 1887 সালে একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়।

রাজনীতির প্রতি অশ্বিনী কুমারের বরাবর উৎসাহ ছিল। 1880 সালে তিনি প্রথমে শ্রীরামপুর ও পরে বরিশালে একটি পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। 1886 সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তিনি তার একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। 1887 সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আইনসভার সংস্কারের জন্য বিবৃতি দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম জীবনেই যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণের সংযোগের জন্য চেষ্টা করে-ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। 1897 সালে মাদ্রাজের অধিবেশনে তিনি হাউস অফ কমনস্-এর কাছে আইনসভার সংস্কারের জন্য আবেদন পত্রের খসড়া পেশ করেন। কংগ্রেসের অমরাবতী অধি-বেশনে তিনি এই বলে অন্যান্যদের সতর্ক করে দেন যে কংগ্রেস যদি গ্রামের মানুষদের কাছে তার আদর্শ যথাযথ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয় তবে অচিরেই এই অধি-বেশন তিনদিনের প্রহসনে পরিণত হবে। 1898 সালে ডি. ই. ওয়াচা, মদন মোহন মালব্য, সুব্রমনিয়াম আইয়ার, আর. এল. মুধোলকার এবং কংগ্রেসের প্রাক্তন ও তৎকালীন সভাপতিদ্বয় প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে একত্র হয়ে তিনি কংগ্রেসের জন্য নতুন সংবিধান রচনার ভারপ্রাপ্ত হন। 1899 সালে এই সংবিধান গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে নরমপন্থী থেকে চরমপন্থী বিপ্লবীতে রূপান্তরিত করে। 1906 সালে তিনি শিবাজী উৎসবের সভাপতিত্ব করেন। বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর 'স্পিরিট অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশ-

নালিজম্'-এ লিখেছেন যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় অশ্বিনী কুমারের কথাই বরিশালের জনসাধারণের কাছে বেদবাক্য ছিল।

1907 সালে 3 জুলাই পূর্ববাংলা এবং আসাম সরকার তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বহিস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার তাতে রাজী হননি। 1908 সালের 10 ডিসেম্বর বাংলাদেশের শাসন কর্তৃপক্ষ যখন পুনরায় সেই প্রস্তাব করেন তখন অশ্বিনী কুমার বহিস্কৃত হন। অশ্বিনী কুমারকে লক্ষ্মৌ জেলে বন্দী করে রাখা হয়। তিনি জেলে থাকার সময় গুরুমুখী ভাষা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শেখেন ও শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব অধ্যয়ন করেন, 1910 সালে 9 ফেব্রুয়ারী তিনি মুক্তি পান।

বরিশালের উন্নয়নের জন্য অশ্বিনী কুমারের আন্তরিক আগ্রহ ছিল। 1885 সালে বরিশাল পৌরসভা গঠিত হলে তিনি তার কমিশনার নিযুক্ত হন এবং 1897 সালে এর চেয়ারম্যান হন। প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় 1887 সালে বরিশালে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। 1906 সালে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য ত্রাণকার্য সংগঠন করেন এবং 1919 সালে ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করেন। 1913 সালে তিনি ঢাকায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স-এ সভাপতি নির্বাচিত হন। 1921 সালে বরিশালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে তিনি অভ্যর্থনা কমিটির প্রধান হন। চা বাগানের কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বাংলা ও আসামে রেল ও স্টীমারের ধর্মঘটকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার মুকুটহীন রাজা। তিনি মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত আইনসভা বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং এজন্য মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

অশ্বিনী কুমার অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। 1886 সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি পালি ভাষায় লেখা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, গীতা, বাইবেল, গ্রন্থ সাহেব শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তেন। অস্পৃশ্যতা, পতিতাবৃত্তি ও মদ্যপান নিরোধের জন্য তিনি প্রয়াস করেছিলেন। কুটীর শিল্পের উন্নয়নের জন্যও তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিল যদিও তিনি আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রসারের বিরোধী ছিলেন না।

অশ্বিনী কুমার বহু সংখ্যক স্বাদেশিক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সেগুলি 'ভারত গীত' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ' এবং 'প্রেম' বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ, তাঁর 'ভক্তিযোগ' প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে হাজার হাজার দেশপ্রাণ তরুণ তরুণীর মনকে প্রভাবিত করেছিল।

[S. C. Gupta—Aswini Kumar Datta ; S. C. Ray—Aswini Kumar Datta ; B. B. Majumdar—Congress and Congress men in the Pre-Gandhian period ; R.C. Majumdar—History of the Freedom Movement in India, vols. I and II ; Aswini Kumar Datta's own writings ; Bipin Chandra Pal—Memoirs of my life and Times.]

সুজাতা ঘোষ — **বি. বি. মজুমদার**

আ

আই. কে. কুমারণ (১৯০৩—?)

I. K. Kumaran (1903—?)

ভারতে ফরাসী উপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামের অন্যতম আই. কে. কুমারণ মাহে অঞ্চলে মিয়া বর্ণের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন।

তেলিচেরীর এক কলেজে কুমারণ ইণ্টারমিডিয়েট অবধি পড়াশুনা করেন। কুমারণ ফরাসী উপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামী হিসাবেই শুধু পরিচিত ছিলেন না ; ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূলে ছিল মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, ডঃ এম. কে. মেনন এবং কে. আই. দামোদরনের শিক্ষা ও আদর্শের প্রভাব।

ফরাসী ভারত, বিশেষতঃ মাহের জাতীয়তাবাদী

নেতা হিসাবে কুমারণ সাধারণের কাছে পরিচিত। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন মাহে ইউথলীগের সভাপতি (1937), মাহের মহাজন সভার সদস্য (1938-58), কুরুমব্রানদ কংগ্রেস কমিটির সদস্য (1944), ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য (1930 থেকে) মাহের অ্যাড-মিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের আহ্বায়ক (1948) কেরালা ভূদান সমিতির সদস্য, পণ্ডিচেরী অ্যাসেম্বলির নির্দলীর সদস্য ইত্যাদি।

1930 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের পরও বেশ কিছুকাল তিনি স্কুলের শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন। 1933 সালে তিনি যুব দলের (Youth Party) সদস্য হিসাবে মাহের মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ফ্রাংকো-হিন্দু দলের প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। 1937 সাল থেকে যুবলীগের (Youth League) সভাপতি হিসাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি জনসাধারণের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসী হন। মহাজনসভার সভাপতি থাকাকালীন তেলিচেরীতে যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি মাহের জনসাধারণের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নের সপক্ষে সকল সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। সরকার বিরোধী রাজনৈতিক প্রচারে অংশ গ্রহণের জন্য পাঁচ মাসের জন্য তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন (1938)। কারামুক্তির পর তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন (1940-সালে)। এ সময়ে তাঁর আসল কাজ ছিল কোট্টায়ম ও ব্রিটিশ ভারতের কয়েকটি তালুকে কংগ্রেসের কাজকে সংগঠিত করা। 1942 সালে তিনি আবার দুবছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর কুমারণ কুরুমব্রানদ ও মাহের কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবাব্রতী দলের পুনর্বিন্যাসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 1946 সালে পণ্ডিচেরীর অ্যাসেম্বলী কংগ্রেস পার্টি তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয়। 1948 সালের অক্টোবর মাসে মাহের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি অপরাধী আমলাদের শাস্তিবিধান করেন এবং 1948-50 সাল এই দুটি বছর তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি পর্ব সংগঠন করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে 20 বছরের কারাদণ্ডের আদেশ জারি করেন। কুমারণের নির্দেশেই মাহের অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা কঠোরতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছিল। 1954 সালের জুলাই মাস থেকে ফরাসীদের বিতাড়ন আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর নির্দেশে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ফরাসীদের অধিকার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছুকাল রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে সর্বোদয়ের কাজে যোগ দেন। 1964 সালে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হলেও 1969 সালে নির্দল প্রার্থী হিসেবে তিনি জয়লাভ করেন।

স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনই ছিল কুমারণের একমাত্র লক্ষ্য। উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদকল্পে নিয়মতান্ত্রিক পন্থাকে অনুসরণ ও সমর্থন করলেও প্রয়োজনার্থে কুমারণ হিংসাত্মক কার্যাবলীর অবলম্বনের বিরোধিতা করেন নি। ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতির তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতভূমিকে রক্ষা করার জন্য কুমারণ যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার সঙ্গে অল্প কয়েকজনের ভূমিকার তুলনা করা যেতে পারে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনে অত্যাচারী ফরাসী আমলাদের বন্দী করে ফরাসী শাসনযন্ত্রকে দুর্বল করে তিনি যেভাবে সাময়িকভাবে হলেও মাহের স্বাধীনতার দাবিকে তুলে ধরেন তা নিঃসন্দেহে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনুপ্রেরণাদায়ক অধ্যায়। গান্ধীজির শিষ্য হিসাবে স্বাধীনতার কৃতিত্ব অর্জন করার পর মাহের জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি তাঁর জীবনের শেষ কটি বছর উৎসর্গ করেন।

[The Hindu Files, 1948-54 ; The Jeunese Files, 1945-49 ; The Liberation Files, 1949-50 ; Personal interview of the Research Fellow with I. K. Kumaran in December 1967]

ইম্যানুয়েল ডিভিয়েন

আইয়ানকালি (১৮৬৩—১৯৪১)
Aiyankali (1863—1941)

কেরলে সমাজ সংস্কারমূলক কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ সুপরিচিত হরিজন নেতা আইয়ানকালির জন্ম 1863 সালে।

আইয়ানকালির যৌবনে কেরালার সমাজ ছিল নানা বৈষম্যে ভরা। কিছু সুবিধাভোগী মানুষ নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উপর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাভাবে নির্যাতন করতেন। বর্ণ-ভিত্তিক বিভেদ ছিল এই সামাজিক বৈষম্যের ভিত্তি।

উচ্চবর্ণের মানুষ নীচবর্ণের মানুষকে যেভাবে অস্পৃশ্য জ্ঞান করত, বা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করত তা দেখে আইয়ানকালির মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ জন্মে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং নায়ার শ্রেণীভুক্ত লোকেরা রাস্তায় চলাচলের সময় 'যাও যাও' বলে নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের সরে যাওয়ার জন্য সতর্ক করে দিত। আইয়ানকালি নিজে তথাকথিত হীন সম্প্রদায় 'পুলয়স' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন ত্রিশ তখন থেকেই আইয়ানকালি এইসব কু-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার অর্জন করাই ছিল তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। তিনি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের সংগঠিত করে নিষিদ্ধ এলাকার উপর দিয়ে যাতায়াত শুরু করেন। এর ফলে উচ্চ শ্রেণী ও পুলয়স সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু সংঘর্ষ হয়। এইসব সংঘর্ষই পরবর্তীকালে হরিজন সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ ভাবে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব গ্রহণ করতে সাহায্য করে। আইয়ানকালি তাদের নেতা ছিলেন।

যখন রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার অর্জনের চেষ্টা সফল হল তখন আইয়ানকালি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হলেন। তিনি হরিজন সম্প্রদায়ের নেতা নির্বাচিত হলেন।

1910 সালে আইয়ানকালি ত্রিবাঙ্কুর 'শ্রীমূলম' প্রজা সভায় সদস্য মনোনীত হন। একাদিক্রমে পঁচিশ বছর তিনি এই সভার সদস্য ছিলেন। এই সময় তিনি হরিজনদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। রাস্তায় চলাফেরার স্বাধীনতা অর্জনের পর আইয়ানকালির পরবর্তী দাবি ছিল—সাধারণের বিদ্যালয়ে যেখানে হরিজন বালক বালিকাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, সেখানে তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়া। সে সময়ে শিক্ষা শুধুমাত্র উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ বিষয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে দলের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তব্য জানান এবং অবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফলে সরকার হরিজন বালক বালিকাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি করবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে বাধ্য হন। বর্ণ হিন্দুরা অবশ্য এর বিরুদ্ধে ছিলেন। বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর জন্য আইয়ানকালি নিজে হরিজন ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন।

নীচবর্ণের লোকেরা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং তাদের এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা ছিল আইয়ানকালির পরবর্তী লক্ষ্য। 1905 সালে তিনি 'সাধুজন পরিপালন সংযম্' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হরিজন সম্প্রদায়কে তাদের মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। মহাত্মা গান্ধী যখন কেরালা পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন আইয়ানকালি তাঁর জন্মস্থানে হরিজনদের সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই সভায় তাঁর ভাষণের সময় মহাত্মা আইয়ানকালিকে 'পুলয়সদের রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

আইয়ানকালি ত্রিবান্দ্রমের নিকট ভেঙ্গানুরে 1863 সালে 2 সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আইয়ান ও মাতা মালা। মালয়ালম সম্বন্ধে তাঁর মাত্র প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। 1888 সালের মার্চ মাসে তিনি চেল্লাম্মাকে বিবাহ করেছিলেন।

1941 সালের 18 জুন এই মহান সমাজ সংস্কারক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ত্রিবান্দ্রমে আইয়ানকালির একটি প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

[Mahacharitha Samgraha Sagaram (A biographical dictionary) by pollippatt kunjukrishnan—National Book Stall, Kottayam ; Commemoration Volume—Kerala History Association. (Regd.), Cochin ; Epic of Travancore—Mahadeva Desai ; Mahacharithamala, Vol. 51 ; D. C. Book, Kottayam ; Viswa Vijnana Kosham (Malayalam Encyclopaedia) Vol. I, National Book Stall, Kottayam.]

টাটাপুরম সুকুমারণ

আইয়াঙ্কি ভেঙ্কটরামনাইয়া (১৮৯০—?)

Ayyanki Venkataramanayya (1890—?)

আইয়াঙ্কি ভেঙ্কটরামনাইয়া 1890 সালের 7 আগষ্ট পূর্ব গোদাবরী জেলার কোনাকুডুরুতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভেকটরত্নম্, মাতা মানগাম্মা। তাঁরা ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। পরিবারটির আদি পুরুষরা ছিলেন কৃষ্ণা জেলার আইয়াঙ্কি গ্রামের করণম্-এ। ভেঙ্কটরত্নম পি. ডবলিউ. ডি'তে চাকরি করতেন। ভেঙ্কটরামনাইয়া দুবার বিবাহ করেছিলেন—একবার 1906 সালে আর একবার 1919 সালে। তিন পুত্রের জননী তাঁর প্রথমা স্ত্রী শেষাম্মা 1919 সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী মহালক্ষ্মী নিঃসন্তান অবস্থায় 1925 সালে মারা যান।

ভেঙ্কটরামনাইয়া মাত্র নবম পাঠ্যক্রম অবধি পড়াশুনা করলেও তিনি বেদ এবং পুরাণের গাথাগুলি সম্যকভাবে জানতেন। 1907 সালে যখন বঙ্গবিভাগ ও বিপিন চন্দ্র পালের ভাষণের অনুপ্রেরণায় অন্ধ্রপ্রদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার আসে তখন ভেঙ্কটরামনাইয়া আন্দোলনের পুরোধা—কে. সীতারাম রাও, এ. নারায়ণ রাও এবং বি. নারায়ণ রাও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পশ্চিম গোদাবরী জেলার পেনুগোণ্ডায় এঁদের যাত্রাপথে তিনি সহযাত্রী ছিলেন। এই সময় তাঁদের উপদেশ মত ভারতীয় রাজনীতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করেন। অন্ধ্ররত্ন ডি. গোপাল কৃষ্ণাইয়া, এম. কৃষ্ণ রাও, ডঃ পট্টাভি সীতারামাইয়া এবং এ. কালেশ্বর রাও প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং এঁদের নেতৃত্বে গোষ্ঠী, 'রামদাণ্ডু', 'অন্ধ্র সোদর সমিতি' ও গোপাল কৃষ্ণাইয়ার 'সাধনা' কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী এবং গ্রন্থাগার প্রসার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ভেঙ্কটরামনাইয়া অন্ধ্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক এবং স্কাউট কমিশনাররূপে নানাবিধ জনসেবামূলক কাজও করেছিলেন, ব্রিটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন ও আমেরিকা লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি সংস্থার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ইনগারসলের ভাষণ, টলস্টয়ের জীবনী, মার্ৎসিনির রচনা এবং সাভারকারের 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার অফ ইনডিপেনডেন্স' গ্রন্থ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

1918 সাল থেকে 'হোম রুল' আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণা এবং গুণ্টুর জেলায় ডঃ এ্যানি বেসান্তের সভাপতিত্বে তিনি হোম রুল লীগ কর্মীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন এবং ডঃ বেসান্ত সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়ার' প্রচার প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করেন।

1922 সাল থেকে ভেঙ্কটরামনাইয়া ছিলেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের একজন সদস্য। এই সময় থেকে তিনি নিয়মিতভাবে খাদিবস্ত্র ব্যবহার করতেন। কংগ্রেসের কলকাতা, লাহোর, বেলগাঁও, কাকিনাড়া এবং মাদ্রাজ অধিবেশনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্যরূপে এবং চার বছর (1920-23) কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে তিনি কাজ করেছেন। মাসুলিপটমের কাছে চিন্নাপুরমে ডঃ পট্টাভি পরিচালিত লবণ-সত্যাগ্রহ শিবিরে অংশগ্রহণ করে তিনি নিষিদ্ধ লবণ সংগ্রহ করেন এবং বিজয়ওয়াড়ার কাছে গান্ধী পার্কে বিক্রয় করেন। ভেঙ্কটরামনাইয়া দশ বছর অন্ধ্রপ্রদেশের এ্যাসোসিয়েশন অফ কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্কাসের কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে কাজ করেছেন।

সাংবাদিকরূপে ভেঙ্কটরামনাইয়া 'অন্ধ্রভারতী' নামে একটি মাসিক তেলেগু সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। এবং তিন বছর (1910-12) এটি সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া দশ বছর (1914-24) তিনি 'গ্রন্থালয় সর্বস্বামু' নামে একটি গ্রন্থাগার সংক্রান্ত পুস্তিকা, পাঁচ বছর (1925-30) 'ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী জার্নাল' (ইংরেজী) এবং এক বছরের জন্য (1934) তেলেগু ভাষায় 'কোরাদা' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। গ্রন্থাগার, প্রকৃতিবাদ, লোকশিক্ষা, অধ্যাত্মবাদ, সহযোগিতা এবং অন্ধ্রের স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি বিষয়ে জনমতের সমর্থন লাভের জন্য তিনি অন্ধ্রদেশের জনসাধারণের কাছে বহু ভাষণের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন।

1911 সালে ভেঙ্কটরামনাইয়া বিজয়ওয়াড়াতে রামমোহন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং পনের বছর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। বরোদায় লাইব্রেরী আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করে তিনি বরোদা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দৃষ্টান্তে রামমোহন লাইব্রেরীর পক্ষে ব্যবহারযোগ্য একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন এবং শিশুদের জন্যও একটি বিশেষ বিভাগ চালু করেন। শেষোক্ত বিভাগটি পাঁচ বছর ভালভাবে কাজ করেছিল। 1914 সালে ভেঙ্কটরামনাইয়া অন্ধ্রপ্রদেশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন এবং পঁচিশ বছর

(1914-39) তিনি এর সম্পাদক ছিলেন। এরপর তিনি নির্বাচিত হলেন এর সহ-সভাপতি। 1921 সালের প্রথম দিকে তিনি গ্রাম স্তরে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা কেন্দ্রের সূচনা করেন। তিনি ছিলেন সাউথ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক।

ভেঙ্কটরামনাইয়া 'ইণ্ডিয়ান ন্যাচারোপ্যাথ' নামে তেলেগু ভাষায় একটি চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকা এবং তেলেগু ভাষায় 'অন্ধ্র সহকরমু' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 1921 এবং 1928 সালে তিনি 'অন্ধ্র পত্রিকা' (মাদ্রাজ) এবং মাদ্রাজের ইংরাজি দৈনিক পত্রিকাগুলিতে সাপ্তাহিক 'স্কাউট কলম' প্রকাশ করেন।

সর্বোদয় পার্টি এবং অন্ধ্র প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস এ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য ছিলেন ভেঙ্কটরামনাইয়া। আলামুরে (পূর্ব গোদাবরী জেলা) এবং মদুগুলায় রামদন্দু রাজনৈতিক সম্মেলনে (1923) তিনি গোপালকৃষ্ণাইয়ার সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 1914 সালে বেজাওয়াদার দ্বিতীয় অন্ধ্র মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সচিব, এছাড়া ইনি ছিলেন গুড-উইল মিশন ফর অন্ধ্র প্রভিন্সের সদস্য (1915), বেজাওয়াদার বিশেষ অন্ধ্র মহাসভার সম্পাদক (1917), অন্ধ্রপ্রদেশ স্বেচ্ছাসেবক সমিতির নেতা (1923-28), কাকিনাড়ায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত (1923) এবং অন্ধ্র সহকার সম্মেলনমুর সহকারী সম্পাদক (দু বছর)। 1928 সালে ভেঙ্কটরামনাইয়া বিজয়ওয়াদাতে গান্ধী-কো-অপারেটিভ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (1928) এবং শ্রীরাম কো-অপারেটিভ বিল্ডিং সোসাইটি গঠন করেন এবং এই দুই সংগঠনেরই তিনি ছিলেন প্রথম সভাপতি। দশ বছর তিনি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার ছিলেন।

কাকিনাড়ায় অন্ধ্র লাইব্রেরী কনফারেন্সের ষোড়শ অধিবেশনে (1934) ভেঙ্কটরামনাইয়া 'গ্রন্থালয়োধারক' খেতাব এবং উপাচার্য জয়পুরের মহারাজা সাহিত্য সম্রাট শ্রী বিক্রমদেব বর্মার সভাপতিত্বে বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত অন্ধ্রভারতী তীর্থ রিসার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে 'গ্রন্থালয়শাস্ত্রবিশারদ' উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হন।

ভেঙ্কটরামনাইয়া বন্যা প্লাবিত কোল্লেরুলেক অঞ্চলে (কৃষ্ণা জেলার কৈকালুর তালুক) কাজ করার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছিলেন এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের চাল এবং জামাকাপড় সংগ্রহ করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। 1916-17 সালে কৃষ্ণা বন্যা প্লাবিত হলে তিনি ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

1918-21 এই তিন বছরের বেশি ভেঙ্কটরামনাইয়া ডঃ বেসান্তের অধীনে ইণ্ডিয়ান বয় স্কাউটস্ এ্যাসোসিয়েশনের প্রাদেশিক স্কাউট কমিশনার ছিলেন। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশে কুড়িটি স্কাউট মাস্টারস্ ট্রেনিং ক্যাম্প পরিচালনা করেছিলেন। প্রথম সর্বভারতীয় স্কাউট দলের সমাবেশও (1920) মহানন্দীতে তাঁর পরিচালনাধীনে সংঘটিত হয়েছিল। 1923 সালে কাকিনাড়ায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তিনি ছিলেন সহ-পরিচালক এবং সেখানে প্রথম সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। 1923-24 সালে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির স্বেচ্ছাসেবক দলের উপসমিতির তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। 1923 সালে তিনি বিশেষ অন্ধ্র মহাসভার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালক এবং পাঁচ বছর বেজাওয়াদার অন্নদান সমাজমের সম্পাদক ছিলেন। 1952 সালে তিনি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল সোস্যাল সার্ভিস কনফারেন্সের প্রতিনিধিরূপে অংশগ্রহণ করেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ভেঙ্কটরামনাইয়া 1945 সালে বেজওয়াদাতে প্রথম অন্ধ্ররাষ্ট্র আয়ুর্বেদ কংগ্রেসের সম্বর্ধনা কমিটির সভাপতিরূপে প্রাকৃতিক চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সাদৃশ্য সম্পর্কিত তাঁর দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল জানিয়ে এক উদ্দীপ্ত ভাষণ দেন।

ভেঙ্কটরামনাইয়া প্রাচীন প্রথায় সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ধর্মের প্রয়োজন আছে এবং আধুনিকতা অবশ্যই প্রাচীন রক্ষণশীলতার ওপর নির্ভরশীল হবে। তিনি নারী এবং পুরুষের সমমর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কল্পনায় ছিল অর্ধনারীশ্বর যাঁকে শিবও বলা যায়, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রাচ্যের প্রয়োজন মত পরিবর্তিত করে নিতে হবে। এই এই ছিল তার সুস্পষ্ট অভিমত। তিনি বলতেন, বুনিয়াদী শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিকতা ও এক পৃথিবী আদর্শের প্রতি কোন বিরূপতা পোষণ না করেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে হবে। তিনি অনুভব করেছিলেন দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেই আঞ্চলিকতা বোধ সঞ্চার করা সম্ভব। ভেঙ্কটরামনাইয়া সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং অন্ধ্র রাজ্য গঠন আন্দোলনে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার

করে গিয়েছেন। তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে অসহযোগে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে দেশকে শোষণ করে নিঃশেষ করে ফেলেছে। তিনি বলতেন প্রত্যেক নাগরিক তার নিজ কর্মক্ষেত্রে দেশ সেবায় উৎসর্গীকৃত একজন কর্মী। অলসতাকে কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না—দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই ছিল তাঁর সতর্কবাণী।

চার বছর কোনডাপাল্লের টয় মেকার্স কো-অপারেটিভ সমিতির সভাপতি থাকাকালে ভেঙ্কটরামনাইয়া কুটীর শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধের সময় যখন কাগজ দুষ্প্রাপ্য হল তখন তিনি চার বছর হাতে তৈরী কাগজের একটি উৎপাদন যন্ত্র চালু রেখেছিলেন। দৈনিক পাঁচ চৌবাচ্চা কাগজ তৈরি করা ছিল এটির উৎপাদন ক্ষমতা। 1920-52 বত্রিশ বছর তিনি অন্ধ্র গ্রন্থালয় প্রিণ্টিং প্রেসটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

ভেঙ্কটরামনাইয়ার চেহারা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তাঁর জীবনযাত্রা প্রণালীও ছিল অনুকরণযোগ্য।

1907 সালে বঙ্গভঙ্গ বিক্ষোভ চলাকালে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি নানাভাবে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিপিন চন্দ্র পাল অন্ধ্রপ্রদেশে পদার্পণ করার সময় তিনি জাতীয় আন্দোলনে প্রথম যোগ দেন। তারপর থেকে দীর্ঘকাল ধরে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই কর্মী পুরুষটি জাতীয়তাবাদী কাজকর্মের মাধ্যমে দেশসেবার ক্ষেত্রে স্থাপন করে গিয়েছেন এক অনুকরণযোগ্য আদর্শ।

[C. Appa Rao—Ayyanki Venkataramanayya : A brief biography ; The Saraswati Samrajyamu (1960), A Telugu Literary annual (Ed. K. Narashima Rao), Personal interview of the research Fellow with Venkataramanayya ; his personal knowledge about him.]

(আর. নাগেশ্বর রাও) ভি. যশোদা দেবী

আইয়াদেবরা কালেশ্বর রাও- (১৮৮১-১৯৬২)

Ayyadevara Kaleswara Rao (1881-1962)

বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার নন্দীগ্রামে, নিয়োগী নামে এক উপ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে আইয়াদেবরা কালেশ্বর রাও-এর জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি মসলিপত্তনম্-এর নোবল্ কলেজে যোগ দেন, সেখানে বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা এবং সমাজ সংস্কারক আর. ভেঙ্কটরত্নম্ নাইডুর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হন কালেশ্বর। অনাচারমুক্ত হিন্দুধর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং নারী মুক্তি, তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া, বর্ণ বিদ্বেষ এবং অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য তিনি যে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেন তার মূলে রয়েছে নাইডুর অনুপ্রেরণা।

1903-5 সালে মাদ্রাজে আইন পড়ার সময় কালেশ্বর 'মুলক' বা র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির প্রতি আসক্ত হন। 1905 সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বহু সভাসম্মেলনে যোগ দেন। 1905 সালে তিনি বিজয়ওয়াদা আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং তাঁর পসার বেশ ভালই জমে ওঠে, 1920 সাল পর্যন্ত তিনি এই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। এই বছরই গান্ধীজির আহ্বানে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

1907 সালে বিপিন চন্দ্র পালের সফরের ফলে স্বরাজ, স্বদেশী, বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং জাতীয় শিক্ষার আদর্শ অন্ধ্রপ্রদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে কালেশ্বর রাও 1905 থেকে 1920 সাল পর্যন্ত দেশহিতকর এই সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তিনি মিসেস্ বেসান্তের হোমরুল লীগে যোগ দেন। 1920 সালে গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি মাদ্রাজে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রার্থী তালিকা থেকে নাম প্রত্যাহার করেন এবং গান্ধীজীর অনুগত শিষ্যের মত দেশের মুক্তি সংগ্রামে এবং গঠনমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

1922 সালে কালেশ্বর রাও বিজয়ওয়াদা মিউনিসিপ্যালিটিতে কর বন্ধ আন্দোলন শুরু করেন। এর ফলে তিনি এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 1925 সালে তিনি বিজয়ওয়াদা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পাঁচ বছর এই পদে আসীন থেকে দফতরের কর্মচারীদের মধ্যে খাদিবস্ত্র পরিধান আবশ্যিক করেন। সরকারের আপত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি মিউনিসিপ্যাল

বিদ্যালয়গুলিতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, চরকায় সুতা কাটা এবং হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক করেন। 1926 থেকে 1930 সাল মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য থাকাকালীন তিনি মুক্তি সংগ্রামীদের নানারকম সুযোগ সুবিধা দেন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করার দরুন 1930 সালে তিনি গ্রেপ্তার হন, দু বছর পরে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কালেশ্বরের ভূমিকার জন্য 1940 সালে তাঁকে আবার কারাদন্ড দেওয়া হয়, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তাঁকে 1942 থেকে 44 সাল অবধি অবৈধভাবে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

1937 থেকে 1939 সালে যখন মাদ্রাজে প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়, কালেশ্বর তখন দলের মুখ্য সচেতক নিযুক্ত হন। 1946 সালে কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় এলে তাঁকে প্রভূত দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হলে তিনি বিধান সভার স্পিকার হন। 1956 থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (1962) তিনি ঐ পদে আসীন থাকেন। স্পিকার হিসেবে তিনি তাঁর নিরপেক্ষতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

স্বতন্ত্র অন্ধ্র আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন কালেশ্বর রাও। তিনি শুধুমাত্র অন্ধ্র সম্মেলনগুলির পৌরোহিত্যই করেননি 'বিশাল অন্ধ্র' গঠনে অন্ধ্র এবং তেলেঙ্গানা প্রদেশ একত্রীকরণ-পরিকল্পনারও তিনি ছিলেন দৃঢ় সমর্থক।

বহুগুণের অধিকারী আইয়াদেবরা কালেশ্বর রাও নানাধরনের কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তেলেগুভাষার এক স্বতঃস্ফূর্ত বক্তা ছিলেন তিনি। এছাড়া শক্তিশালী লেখকরূপেও তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি 'বিজ্ঞান চন্দ্রিকা মন্ডলী' নামক প্রকাশন সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই সংস্থাটি তেলেগু ভাষায় আধুনিক জ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রকাশ করে। এছাড়া কালেশ্বর রাও নিজেও বই লেখেন।

কয়েকটি বই লেখা হয়েছিল যখন তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। এইসব বই-এর বিষয়বস্তু ছিল ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী এবং বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস। হিন্দু এবং মুসলমান এই দু'সম্প্রদায়ের পন্ডিত ব্যক্তিদের একত্রিত করে ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে এই বই রচনা করার উদ্দেশ্যে কালেশ্বর রাও পরবর্তীকালে তেলেগু এবং উর্দু একাডেমী স্থাপন করেন। এছাড়া তেলেগু ভাষায় শিল্প ও আইনের বহু শব্দের উপর একটি অভিধান রচনার উদ্দেশ্যে নিজের সভাপতিত্বে তিনি একটি সমিতি গঠন করেন। এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়েছিল। তাঁর 'আত্মজীবনী' একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ।

বহুক্ষেত্রে অপ্রিয়ভাজন হলেও কালেশ্বর সহজ সরল কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বও ছিল সকলের প্রিয়।

[Kaleswara Rao, A.—Najeevita Kadha : Navyamdharam (in Telugu) 1959 (An au'obiography) ; China Raghupati Rao, K.—Jateeya Nayakulu (National Leaders), Rajahmandry, 1946.]

এম্. ভেঙ্কটরঙ্গাইয়া

আকবর হায়দারী (স্যার) (১৮৬৯-১৯৪২)
Akbar Hydari (Sir) (1869-1942)

আকবর হায়দারীর জন্ম 1869 সালের 8 নভেম্বর। তিনি একজন খ্যাতনামা প্রশাসক, শিক্ষা-ব্রতী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা এবং তাঁর সময়কার বিখ্যাত অর্থমন্ত্রীদের অন্যতম। তাঁর পূর্বপুরুষেরা আরব দেশ থেকে এসেছিলেন। তাঁর পিতা নজরালী হায়দার আলী ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকবার সেই দেশ ভ্রমণ করেন। আকবর স্বভাবতই তাঁর পিতার কাছ থেকে অর্থনৈতিক বিষয়ে অসাধারণ বিশ্লেষণাত্মক বিচারবুদ্ধি লাভ করেছিলেন। বয়সের তুলনায় তিনি একটু বেশি পরিণত ছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রি-কুলেশান পরীক্ষা পাশ করেন ; ঐচ্ছিক বিষয় ছিল ল্যাটিন। সতের বছর বয়সে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। মাত্র আঠার বছর বয়সে তিনি ভারত সরকারের অর্থ বিভাগে চাকুরির জন্য প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় বসেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সরকারী দপ্তরের অর্থ বিভাগে যোগদান করেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল যথাক্রমে নাগপুর, লাহোর, কল-কাতা, এলাহাবাদ, এবং মাদ্রাজ। পদোন্নতির ফলে 1905 সালের অক্টোবর মাসে তিনি হায়দ্রাবাদে নিজামের রাজ্যে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হিসাবে

যোগদান করেন। হায়দ্রাবাদই তাঁর পরবর্তী জীবনের কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। মাঝে মাত্র দু'বার অল্পকালের জন্য তিনি অন্যত্র ছিলেন— বোম্বাইয়ের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (1920 সালের ফেব্রুয়ারী-1921 সালের জুন), মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে নতুন দিল্লীতে ভাইসরয়ের একসিকিউটিভ কাউন্সিলে তথ্য ও বেতার বিভাগের সদস্য। 1930 সালে তিনি হায়দ্রাবাদের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

1993 সালে হাজি নাজমুদ্দিনের কন্যা আমেনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁরা দুজনেই ছিলেন বোম্বাই-র বিখ্যাত তায়াবজী পরিবারের সন্তান। তাঁর স্ত্রী ছিলেন স্বামীর নিরলস কাজের নিত্যসঙ্গী এবং তিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবীরূপে পরিচিত ছিলেন।

হায়দ্রাবাদে কর্মজীবনে আকবর হায়দারী ধাপে ধাপে 1907 সালে ফিনান্স সেক্রেটারি থেকে 1937 সালে একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতির পদে উন্নীত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র চাকুরিগত কর্তব্য নিয়েই নয় জাতিগঠনের নানা কাজেও তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হত। প্রায়ই তাঁকে দক্ষিণ ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন (South India Mahomedan Education Conference) এবং সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন (All India Mahomedan Education Conference)-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হতো। আলিগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং বহু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হতেন। 1928 সালে তিনি নাইট এবং প্রিভি কাউন্সিলার হন, 1930 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ সিভিল ল' উপাধি দেন।

আকবর হায়দারীর আসল কার্যকলাপ ছিল প্রশাসনকেন্দ্রিক। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন না বটে কিন্তু তিনি ছিলেন উদার পন্থী জাতীয়তাবাদী এবং অনেক সময়ই তিনি তাঁর রাজ-নৈতিক মতামত ব্যক্ত করতেন। 1917 সালে কল-কাতায় এডুকেশনাল কনফারেন্সে হিন্দু মুসলমান ঐক্যসম্পর্কিত লক্ষ্ণৌ প্রস্তাবকে (ডিসেম্বর 1916) তিনি এই বলে স্বাগত জানান যে এর দ্বারা দুটি সম্প্র-দায়ের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় হবে এবং এর পারস্পরিক সহযোগিতা সামগ্রিকভাবে দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের এই বিরাট উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়তর করে তোলা অপেক্ষা মহত্তর কোন লক্ষ্য ভারতবাসীর কাছে আর কিছু হতে পারে বলে আমি মনে করি না।" সেই অনুষ্ঠানেই তিনি দাদাভাই নওরোজীকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বর্ণনা করেন, "যে জাতীয়তাবাদ প্রকৃত অর্থে ঘৃণা নয়, ভালবাসা, সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ সংকীর্ণতা নয়, বিশ্বজীবন সহানু-ভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত।" এমন একটি সজীব সক্রিয় যুক্তরাজ্যের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন যেখানে হিন্দু মুসলিম, পার্শী খৃষ্টান নিজেদের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও বিকশিত করার জন্য পরস্পরকে ভাই হিসেবে স্বীকৃতি দান করবে। আট বছর পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি ওই একই বিষয়ের উপর বিশদভাবে বলেন, "একমাত্র এক জাতি হিসেবেই আজকে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। সেই ঐক্য ছাড়া স্বরাজ শুধুমাত্র একটা ফাঁকাবুলি হিসাবেই রয়ে যাবে এবং যদি তা অর্জনও করা যায় তাহলে তা হবে একটি অভিশাপ ও বিপদ স্বরূপ।" 1933 সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে তিনি আদর্শ ভারতীয় ইউনিয়নকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করেন যে গাছের শাখা প্রশাখা হল ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি এবং ভারতের রাজ্যগুলি যারা একই শিকড় থেকে প্রাণ আহরণ করেছে। তিনি এভাবে রাজ্যগুলির বিচ্ছিন্নতার বিপক্ষে ছিলেন এমনকি সেটি বৃহত্তম রাজ্য হলেও এবং পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন যে এমন এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়া উচিত যা প্রদেশ এবং রাজ্যগুলি দ্বারা পরিপুষ্ট হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য আকবর হায়দারী ভারতীয় ইতিহাসের পুনঃমূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই উদ্দেশ্যে 1940 সালে তিনি একটি কমিটি গঠন করেন। তার সভাপতি হিসাবে তিনি বলেন যে, "ভারতীয় ইতিহাসের মূল ঘটনা কি কি বিশেষ প্রয়োজনে সংঘটিত হয়েছে সেটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। সব সময়েই একটা একতাবোধ পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একে অপরকে সাহায্য করার প্রবণতা ভারতবর্ষের ইতিহাস জুড়েই রয়েছে, এ ব্যাপারটা টিকে থেকেছে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপাতঃ বিভেদ সত্ত্বেও"। কিন্তু

তিনি বড় লাটের একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হবার পর তাঁকে ওই পরিকল্পনাটি পরিত্যাগ করতে হয়।

হায়দারীর আর একটি প্রিয় বিষয় ছিল শিক্ষার মাধ্যম। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র মাতৃভাষাই শিক্ষার প্রকৃত বাহন হতে পারে। এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি উর্দুকে শিক্ষাদানের মাধ্যম করে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি ইংরেজী ভাষাকে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন এবং সেই সঙ্গে তেলুগু, মারাঠী এবং কানাড়া ভাষা শেখার এবং এসব সাহিত্যে গবেষণার জন্যেও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যায় উর্দু ভাষার দৈন্য আকবর হায়দারী পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রতিকারের জন্য তিনি হায়দ্রাবাদ সরকারকে পরামর্শ দেন অনুবাদ এবং সংকলনের জন্য একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে যাতে উর্দুতে প্রয়োজনীয় পাঠ্য এবং প্রাসঙ্গিক বই রচিত হতে পারে।

কি ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের পক্ষে উপযোগী হবে সে বিষয়ে হায়দারীর কিছু নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। 1925 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে তিনি বলেন, "ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা বস্তুত আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই আরও ফলপ্রসূ হতে পারে যদি তাকে দেশের বর্তমান চাহিদার উপযোগী করে তোলা যায়। একদল কেরানীর চেয়ে সেখানে প্রয়োজন তালিম প্রাপ্ত কৃষিবিদ, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, উৎপাদক, শিল্পী, কারিগর, কামার, তাঁতী অর্থাৎ কেরানী ছাড়া সব কিছু।"

অর্থদপ্তরের ব্যাপারেই আকবর হায়দারীর পারদর্শিতা সবচেয়ে বেশি লক্ষিত হয় এবং এই ব্যাপারে যাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না তাঁদের কাছ থেকেও তিনি লাভ করেছিলেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন। 1921 সালে স্যার রবার্ট গ্লাসীর হাত থেকে অর্থদপ্তরের ভার নেন হায়দারী। অর্থমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্তির অব্যবহিত পর থেকেই তিনি এক বিরাট সংস্কারের সূচনা করেন যাকে বলা যায় ত্রিবর্ষ চুক্তি দ্বারা অর্থদপ্তরের বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যেকটি খরচ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে তিন বছরের জন্য অনুদান ঠিক করা হল। অন্যদিকে প্রায়শই ঘটতে পারে যেমন দুর্ভিক্ষ ও ধার শোধ করার জন্য বিশেষভাবে টাকা রাখা হত। জমা এবং খরচের হিসাব খুব সুন্দরভাবে ঠিক রাখা হতো এবং ঘাটতি বাজেট খুবই সতর্কতার সঙ্গে এড়ানো হতো। এই পদ্ধতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে করের হার খুব কম রাখা হতো। অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি এত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যে আকবর হায়দারী ইংরেজ কোম্পানীর কাছ থেকে নিজামের 'গ্যারাণ্টিড স্টেট রেলওয়ে' 1930-এর এপ্রিলে কিনে নেন এবং এর ফলে রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যায়।

আকবর হায়দারী ছিলেন খর্বাকৃতি, স্থূল, তীক্ষ্ন দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে তিনি ঘরোয়া ভাবে মিশতে পারতেন। কিন্তু নীতিগত প্রশ্নে তিনি ছিলেন কট্টরপন্থী। অথচ জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যখন কথা বলতেন তখন কিন্তু সবকিছু মেনে নিতেন। বাড়িতে তিনি খুব সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন—এমন কি তিনি যখন নিজের দপ্তরে বসে কাজ করতেন তখনও; কিন্তু সে রকম কোনো অনুষ্ঠান হলে তিনি নিয়মিত ভাবে খাঁটি ইউরোপীয় পোশাক পরতেন। তাঁর গৃহের পরিবেশটি ছিল আনন্দস্থল। অবসর সময় উর্দু, ফার্সি এবং ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি শুনতে পছন্দ করতেন।

একদিকে তিনি যেমন কট্টর মুসলিম ছিলেন এবং কখনও উপাসনা বাদ দিতেন না, অপরদিকে তিনি যে শুধুমাত্র অপরাপর ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন তাই নয়, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি ছিলেন সমানভাবে সহানুভূতিশীল। তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন মুসলমান, হিন্দু, খৃস্টান, আস্তিক এবং নাস্তিকেরাও।

অর্থদপ্তরের মত একটি নিতান্তই বস্তুবাদী বিভাগের প্রধান হয়েও এবং রাষ্ট্রের দৈনন্দিন ব্যাপারে নিয়োজিত থেকেও তিনি সময় করে শিল্পতত্ত্বের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে সযত্নে লালন করেছেন। তাঁর বাড়ি 'দিলখুসায়' ভারতীয় চিত্রকলার মধ্য ও আধুনিক যুগের এক বিরাট ভাণ্ডার ছিল। তিনি তাঁর পদাধিকারকে ব্যবহার করে অজন্তার প্রাচীন চিত্রগুলি খুঁজে বের করে পুনরুদ্ধার করে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তিনি রাজ্যে একটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সৃষ্টি করে ভবিষ্যতের গবেষক এবং ঐতিহাসিকদের ধন্যবাদ অর্জন করেছিলেন।

[Hydar's Speeches and Addresses ; Papers relating to the Foundation of the Osmania University, 1917-18 ; Natesan :

—Eminent Mussalmans, Madras, 1926 ; R. Venkoba Rao :—Ministers of Indian States, Trichinopoly, 1928 ; K. Mudiraj :—Pictorial Hyderabad, Vol. II, Hyderabad, 1934 ; Sir Akbar Hydari, Kt., Secunderabad, 1934 ; Ali Akbar :—Education under Asaf Jah VII, Hyderabad, 1937 ; Hyderabad State : Leading Officials, Nobles and Personages, Hyderabad, 1937 ; Obituary Notices in Islamic Culture, Hyderabad, April 1942 ; Kesava Iyengar :—Review of Hyderabad Finance, Hyderabad, 1951; Kesava Iyengar :—Hyderabad Railway Purchase, Hyderabad ; Sherwani :—Osmania University, First Phase, Yazdani Commemoration Volume, 1963.]

এইচ. কে. শেরবানি

আগা খান (তৃতীয়) (১৮৭৭-১৯৫৭)
Aga Khan (1877-1957)

1877 সালে 2 নভেম্বর আগা সুলতান মহম্মদ শাহ করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলি শাহ ইসমাইলদের সাতচল্লিশতম ইমাম ছিলেন। তাঁর পিতামহ মহম্মদ হাসান (ছেচল্লিশতম ইমাম) ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। পারস্যের শাহ তাঁকে 'আগা খান' এই উপাধিতে ভূষিত করেন। পারস্যের শাহ-র মৃত্যুর পর তিনি পারস্য ত্যাগ করে সিন্ধুতে আসেন ও সেখানেই বসবাস করতে মনস্থ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বোম্বাইয়ে চলে যান। ইংরেজ শাসককুলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং সিন্ধু দেশে ইংরেজ-আধিপত্য বিস্তারে তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। 1881 সালে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র আলি শাহ ইমাম হন। কিন্তু মাত্র চার বছর পরেই আলি শাহর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আগা খান (তৃতীয়) মাত্র আট বছর বয়সে ইমামপদে অধিষ্ঠিত হন। পরিণত বয়সে আগা খান পর পর চারবার বিবাহ করেন। তাঁর দুই পত্নী ফরাসী দেশীয় ও অপর একজন ইতালীয়। পূর্বতন পত্নীর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তিনি পুনর্বার বিবাহ করেন। আগা খানের দুই পুত্র আলি খান এবং সদরুদ্দীন খান (চতুর্থ আগা খান)।

প্রথম জীবনে ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে আগা খান তাঁর মাতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। ইংরেজ শিক্ষকের কাছে বাড়িতেই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করেন। তিনি আরবী, ফার্সি, ইংরেজি এবং ফরাসী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। কিশোর বয়সেই তিনি ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানে তিনি মহারানী ভিক্‌টোরিয়ার আতিথ্য লাভ করেন। দেশের রাজনীতি ও তৎকালীন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কিশোর আগা খানের সম্যক ধারণা দেখে মহারানী মুগ্ধ হন। ইংল্যাণ্ডের সমাজ ও জীবনধারা আগা খানকে বিশেষ প্রভাবিত করে। লণ্ডন থেকে তিনি প্যারিসে যান। প্রমোদ নগরী প্যারিস দেখে তিনি মোহিত হন। এরপর কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি বার্লিনে যান। উদ্দেশ্য ছিল জার্মান অধিকৃত পূর্ব আফ্রিকায় তাঁর অনুগামীদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করা। তিনি তুর্কীর সুলতান আবদুল হামিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং পৃথিবীব্যাপী সকল মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়তর করতে আহ্বান জানান। তাঁর ইউরোপ পরিভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন, তাঁর অনুগামীদের কল্যাণ সাধন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা।

নিষ্ঠা ও চাতুর্যের সঙ্গে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুর সকল কর্তব্য সম্পাদন করতেন। ফলে অতি অল্প বয়সেই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মগুরুর পদাধিকারী হয়েই সন্তুষ্ট হওয়ার মত মানসিকতা বা শিক্ষা তাঁর ছিল না। শীঘ্রই তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশেষতঃ মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন আগা খান। অল্‌ ইণ্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্সের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন (সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি 1903)। স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রতিষ্ঠিত এম. এ. ও. কলেজ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল এবং এই কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার কাজে যাঁরা আগ্রহী ছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। 1920-30 সাল পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1935 সাল থেকে পুনরায় আরও কিছুকালের জন্য ঐ পদে নিযুক্ত হন। আগা খান মুসলিম লীগের সকল কার্যকলাপে বিশেষ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং

1907 থেকে 1914 সাল পর্যন্ত লীগের সভাপতি। 1906 সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত করার দাবী নিয়ে তাঁরই নেতৃত্বে এক মুসলমান প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়। প্রস্তাবিত মর্লে-মিণ্টো সংস্কার আইনে এই প্রথার প্রবর্তন করার জন্য এই প্রতিনিধিদল দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী জানায়।

1918 সালে আগা খান 'ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন ও সমস্যার সমাধান কল্পে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি ভারতবর্ষের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর অভিমতে বিশেষরূপে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার একজন রাজনৈতিক নেতা, কূটনীতিবিদ্ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা রূপে আগা খানের মমতা, প্রতিপত্তি ও গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হন। সুতরাং এরপর খুব স্বাভাবিক কারণেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে প্রেরণ করতেন ব্রিটিশ এবং মুসলিম দেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য। সুচতুর কূটনীতির সাহায্যে তিনি এই সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতেন। 1931-32 সালে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই বৈঠকে তিনি মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জাতিসংঘে প্রেরিত সরকারী ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন আগা খান (1932, 1934, 1935 এবং 1936)। 1937 সালে তিনি জাতিসংঘের প্রথম ভারতীয় সভাপতি হন। 1934 সালে তিনি আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন এবং 1937 সালে প্রিভি কাউন্সিলাররূপে মনোনীত হন। ইংল্যাণ্ডের রাজা তাঁকে কে. সি. আই. ই. (1898), জি. সি. আই. ই. (1902) এবং জি. সি. এস. আই. (1911) উপাধিতে সম্মানিত করেন। 1916 সালে রাজা পঞ্চম জর্জ তাঁকে এগারটি তোপ-ধ্বনির অভিবাদন গ্রহণ করার সম্মান প্রদান করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির একজন প্রথম শ্রেণীর দেশীয় রাজার পর্যায়েও তাঁকে উন্নীত করা হয়।

উল্লিখিত এই সকল ঘটনাবলী আগা খানের বর্ণাঢ্য বহুবিধ কর্মধারায় মণ্ডিত জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশমাত্র। ইংল্যাণ্ডে বা ইউরোপে থাকা-কালীন তিনি পাশ্চাত্যের সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতেন। এখানেই তিনি ঘোড়দৌড়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং এটি ক্রমশঃ তাঁর একটি প্রধান নেশায় পরিণত হয়। প্রচুর অর্থ, শক্তি ও সময় তিনি এই ঘোড়দৌড়ের জন্য ব্যয় করেন ও বহু পুরস্কার অর্জন করেন। ক্রমশ অন্যান্য ইউ-রোপীয় খেলাধুলার প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন। গল্‌ফ খেলায় তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। ভারতে ক্রিকেট ও হকি খেলা প্রচলনের তিনিই প্রবর্তক। 'আগা খান হকি টুর্নামেণ্ট' তাঁর স্মরণেই প্রচলিত হয়।

তৃতীয় আগা খানের ব্যক্তিত্বে ধর্মীয় গুরু, কূট-নীতিবিদ ও ক্রীড়াবিদদের দুর্লভ গুণের একত্র সমাবেশ ঘটে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা ধর্মনিরপেক্ষতা ও মধ্যপন্থার সমর্থক ছিলেন। তাঁর এই সমন্বয় সাধনের দর্শন তাঁকে একজন আদর্শ কূট-নীতিবিদ ও শান্তিস্থাপকে পরিণত করে। স্বদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি খ্যাতিমান পুরুষ। তবে আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এর কারণ সম্ভবতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও রাজ পরিবারের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতি। এই কারণে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মনে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল—এতে বিস্ময়বোধের কারণ নেই।

আগা খানের ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গেলে আপাত বিরোধী সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। একদিকে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ধভক্ত। অপরদিকে ছিলেন সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের শুভাকাঙ্ক্ষী যারা অধিকাংশই ব্রিটিশ অপশাসনের সমালোচনায় মুখর। আভিজাত্যপূর্ণ ও বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, অথচ তিনি গোঁড়া মতাবলম্বী ইসমাইলিদের ধর্মগুরু, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্। কিন্তু স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন ও কোনরূপ রাজ-নৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে একে-বারেই অক্ষম ছিলেন।

[Jackson Stanley : The Aga Khan (London, 1952) ; Ikbal Ali Shah : The

Prince Aga Khan (London, 1933); Ikbal Ali Shah : The Controlling Minds of Asia (London, 1937); Greenwall, H. J. : His Highness Aga Khan Iman of Ismailis (London, 1952); William, L. F. R. : Great Men of India (1940); Aga Khan : Memoirs (London, 1954); Aga Khan : India in Transition (Bombay, 1918.)]

(কুমুদ প্রসন্ন) এস. এম. জিয়াউদ্দিন আলভি

আচার্য প্যারিমোহন (১৮৫২-১৮৮১)

Acharya Pyarimohan (1852-1881)

1852 সালে 5 আগষ্ট উড়িষ্যার কটক জেলার অন্তর্গত কুয়ানপাল গ্রামে প্যারিমোহন আচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভুবনমোহন আচার্য কটক শহরে ওকালতি করতেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর চার পুত্র। জ্যেষ্ঠ প্যারিমোহন। দ্বিতীয় পুত্র দ্বারিকানাথ মোক্তার ও তৃতীয় পুত্র চন্দ্রমোহন ডাক্তার হন। চতুর্থ পুত্র কালীচরণকে তাহার মাতুল দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

গ্রামের পাঠশালায় প্যারিমোহনের প্রাথমিক শিক্ষা-পর্ব শুরু হয়। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে বার বছর বয়সে তিনি কটক জিলা স্কুলে ভর্তি হন। 1870 সালে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বছরই কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজে ভর্তি হন। লেখা-পড়ায় প্যারিমোহনের বিশেষ মনোযোগ ছিল না। অধিকাংশ সময় তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল উড়িষ্যার নিপীড়িত মানুষদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার আদায় করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'উৎকল পুত্র' নামে একটি দ্বিপাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন প্যারিমোহন মাত্র এফ. এ. ক্লাসের ছাত্র। জন-সাধারণের দাক্ষিণ্যে প্রকাশিত এই পত্রিকা তাঁর যৌবনোচিত তেজ ও তীব্র স্বাদেশিকতার মুখপাত্রে পরিণত হয়। ওড়িয়া জনগণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অবজ্ঞা ও ঘৃণার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। সরকারের শাসনতান্ত্রিক নীতির অতি প্রকট অন্যায় ও অবিচারের দিকগুলিকে জনসমক্ষে তিনি তুলে ধরেন। 'উৎকল-পুত্র'-তে প্রকাশিত কিছু অপ্রিয় সত্য তৎকালীন কটকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিরাগ উৎপাদন করে এবং তিনি প্যারিমোহনকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করার জন্য অধ্যক্ষকে বলেন। অধ্যক্ষ প্যারিমোহনকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন। কিন্তু তেজস্বী যুবক প্যারিমোহন অস্বীকৃত হলে 1871 সালে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।

প্যারিমোহন আচার্য দু'বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁর প্রথমা পত্নী বিবাহের অল্প কয়েক বছর পরেই দেহত্যাগ করেন। তারপর তিনি চন্দ্রমোহিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র যতীন্দ্রমোহন। প্যারিমোহনের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অধিক আর কিছু তথ্য পাওয়া যায় না।

কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর প্যারিমোহন সমাজে-কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হল, কটকে ছেলেমেয়েদের জন্য যথার্থ শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে তাঁর পরিচিত বন্ধু বান্ধব সকলেই অবাস্তব পরিকল্পনা বলে সাব্যস্ত করেন। কিন্তু প্যারিমোহন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং অবশেষে 1875 সালে বিদ্যালয় স্থাপন করতে সক্ষম হন। এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে প্যারিমোহন একাডেমি নামে পরিচিত এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ প্যারিমোহনের মহান আদর্শ ও কর্তব্যকর্মে অনুপ্রাণিত হয়।

প্যারিমোহনের প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস। সেই সময়ে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি একনিষ্ঠ ভাবে উড়িষ্যার ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। 1875 সালে তিনি এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। চার বছর পর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। 'উৎকল ইতিহাস' নামে এই মূল্যবান গ্রন্থটি ওড়িয়া ভাষায় রচিত এবং এই প্রথম উড়িষ্যার ইতিহাস ওড়িয়া ভাষায় রচিত হল।

ভক্ত কবি মধুসূদন রাও এবং পণ্ডিত গোবিন্দ রথের সঙ্গে প্যারিমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্যারিমোহনের সমাজ-কল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের কাজে উভয়েই বিশেষ সহযোগিতা করেন। ভক্ত কবি মধুসূদনের প্রভাবে প্যারিমোহন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। সকল ধর্মের সারতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। মধুসূদন এবং প্যারিমোহন উভয়েই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কঠোর ব্রহ্মবাদী ছিলেন।

1870 সালে কটকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে প্যারিমোহন 'ব্রহ্মোপাসনা সমাজ' স্থাপন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'একমেবাদ্বিতীয়ম' অনন্ত শক্তিধর ব্রহ্মের উপাসনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের সেতুবন্ধন করা।

1881 সালের 28 ডিসেম্বর ভক্তকবি মধুসূদনের ক্রোড়ে প্যারিমোহনের অকাল মৃত্যু ঘটে। তিনি ছিলেন যথার্থই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলাই ছিল তাঁর বিশেষ লক্ষ্য। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে লোভনীয় চাকুরি দিতে বিশেষ আগ্রহী ছিল। প্যারিমোহনের তেজস্বিতা ও স্বাদেশিকতাকে দমন করার জন্যই ইংরেজ সরকারের এই সহৃদয় প্রয়াস। তাঁকে সর্বপ্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুকাল পর তাঁকে উচ্চতর সিভিলিয়ান কর্মচারীরূপে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তেজস্বী দেশপ্রেমিক বিদেশী সরকারের কোনরূপ আনুকুল্য গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারকে জানালেন 'আপনারা যদি আমাকে ভাইসরয়ের পদও প্রদান করেন, তাহলেও জেনে রাখুন, আমি নির্দ্বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করবো'।

প্যারিমোহন বাংলা, ওড়িয়া ও ইংরেজি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং অত্যন্ত সহজেই মানুষকে তাঁর মত ও আদর্শ অনুযায়ী প্রভাবিত করতে পারতেন। বন্ধুবর্গের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা দিলে তাঁর স্বভাবসুলভ ন্যায়পরায়ণতা এবং যুক্তির সাহায্যে তিনি অতি সহজেই তার মীমাংসা করতে সক্ষম হতেন। ডোমপাড়া ও উড়িষ্যার দুইজন ভূম্যধিকারীর মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদের মীমাংসা করেন প্যারিমোহন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর মতে, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির উপরই দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে। প্যারিমোহনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দেশের জনগণকে প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্যারিমোহন জাতীয় শিক্ষাকে সর্বনিম্নস্তরে, গ্রাম গঞ্জ থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। হতাশা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে তাদের মুক্ত করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে প্যারিমোহন নিজের সকল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হন নি। তবে, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং তা অর্জন করার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত—এই সত্য প্যারিমোহন দেশের জনসাধারণকে উপলব্ধি করানোর কাজে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

[Life of Pyarimohan Acharya,—By Bimal Charan Roy Choudhuri ; Pyarimohan Academy,—By Kalandi Charan Panigrahi ; Pyari Mohan,—By Laxmi Narayan Sahoo ; Bhakta Kavi Madhusudan,—By Kalandi Charan Panigrahi ; Madhusudan Granthavali.]

(জে. সি. রথ) এন. কে. সাহু

আজমল খান (হাকিম) (১৮৬৩—১৯২৭)

Ajmal Khan (Hakim) (1863—1927)

আজমল খানের পূর্বপুরুষেরা বাবরের সঙ্গে ভারতে আগমন করে এদেশে বসতি স্থাপন করেন। আকবরের রাজত্বকালে খান পরিবার চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেন। হাকিম মুহম্মদ ওয়াসিল খান নামে আজমল খানের এক পূর্বপুরুষ প্রথম আওরঙ্গজেবের রাজসভায় রাজবৈদ্যরূপে নিযুক্ত হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। তারপর থেকে এই পরিবারের একজন না একজন নিয়মিতভাবে মুঘল রাজসভায় রাজবৈদ্যের পদ বংশানুক্রমিকরূপে অধিকার করেছেন। এই বিশিষ্ট ও সম্মানিত পরিবারে 1863 সালে (হিজরি 1248) দিল্লীতে আজমল খান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাকিম গুলাম মাহমুদ খান।

তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী আজমল খান সর্বপ্রথম মুখে মুখে কোরাণ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইসলামিক শাস্ত্রগুলি ও বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি স্ব স্ব ক্ষেত্রে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অবশ্য তাঁকে কোন স্বতন্ত্র শিক্ষকের দ্বারস্থ হতে হয়নি। কারণ তাঁর নিজ গৃহই ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি চিকিৎসা বিদ্যালয়। উনিশ শতকে অভিজাত মুসলমান পরিবারের সন্তানকে সরকারী ইংরেজি বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করার রেওয়াজ ছিল না। এই কারণে প্রথম জীবনে আজমল খান ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হননি।

পরবর্তীকালে, সব দেশের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার পর আজমল খান স্বীয় প্রচেষ্টায় ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেন।

দেশীয় রাজ্য রামপুরের রাজপরিবারের সঙ্গে চিকিৎসাসূত্রে আজমল খানের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পারিবারিক পেশাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হাকিম আজমল খান রামপুরের নবাবের প্রধান চিকিৎসকরূপে 1892 সালে নিযুক্ত হন। 1902 সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হাকিম আজমল খান রাজনীতিতে জড়িত এ তথ্য জেনেও নবাব 1902 সালের পরেও তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। রামপুরে থাকাকালীন হাকিম আজমল খান স্যার সৈয়দ আহমেদের শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং আলিগড় কলেজের অন্যতম ট্রাস্টী রূপে নিযুক্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আলিগড় কলেজ কর্তৃপক্ষ এই আন্দোলন অনুমোদনে অসম্মত হওয়ায় আজমল খান প্রতিবাদে এই পদ ত্যাগ করেন।

ত্রিশের কোঠায় পা দিয়ে আজমল খান রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ও এই সম্পর্কে তাঁদের পারিবারিক উর্দু সাপ্তাহিকী 'আকমল-উল-আখবর'-এ ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। 1865 থেকে 1870 সালের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বিশ শতকের সূচনা পর্যন্ত প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। হাকিম আজমল খানের পরিবারে বিশ শতকের সূচনা এক নতুন যুগের সূত্রপাত করে। আজমল খানের পূর্বে তাঁর পরিবারের কেউ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। হাকিম আজমল খানই এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জাতীয় রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে আজমল খান মুসলিম রাজনীতিতেই অধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই প্রারম্ভিক কর্মপ্রবাহ তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রশিক্ষণ মাত্র।

1906 সালে সিমলায় বড়লাটের নিকট মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি পেশ করেন, আজমল খান সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হন। 1906 সালে ঢাকাতে একটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যে মুসলমান জনসমাবেশ হয়েছিল, তিনি এতেও অংশ গ্রহণ করেন। যাঁরা এই প্রস্তাব জনসভায় সমর্থন করেছিলেন, আজমল খান তাঁদের অন্যতম। ফলে মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়েও আজমল খান তাঁর নিজস্ব পেশাগত শাস্ত্র অবহেলা করেননি। তিব্ব-ই-য়ুনানি বা দেশীয় ভেষজ প্রণালীর উন্নতি ও প্রসারের জন্য তিনি চেষ্টা করেন। আধুনিক গবেষণা পদ্ধতির সাহায্যে শতাধিক বৎসরের পুরাতন জীর্ণ দেশীয় ভেষজ শাস্ত্রকে আধুনিক করে তুলতে তিনি উৎসুক ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদের পারিবারিক তিব্বিয়া বিদ্যালয়কে (দিল্লী) তিব্বিয়া মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। তিনি একটি গবেষণা বিভাগ ও ধাত্রী প্রশিক্ষণের বিভাগ এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় ও লেখায় উচ্চ বংশোদ্ভূত মহিলাদের ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা করতে আহ্বান জানান। তাঁর এই বিশিষ্ট কার্যাবলীর জন্য সরকার 1907 সালে 'হাজিক্-উল্-মুল্‌ক্' উপাধিতে তাঁকে সম্মানিত করেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আজমল খানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাঁর আনুগত্য ভিত্তিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়। 1910 সালে ভারত সরকার হাকিম এবং বৈদ্যদের পেশাগত স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হাকিম আজমল খান এই প্রস্তাবের মধ্যে সরকারের দুরভিসন্ধির সন্ধান পান। তিনি উপলব্ধি করলেন যে সরকার ভারতীয় ভেষজ প্রণালীকে এই উপায়ে দুর্বল করতে চান। 'হাকিম' এবং 'বৈদ্য'দের সংঘবদ্ধ করে তিনি এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এই সময়ে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের রণ-দামামা বেজে ওঠে। ইটালি ত্রিপলি আক্রমণ করে। ব্রিটিশ সরকার উদাসীন মনোভাব প্রকাশ করে। ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিশ্ব মুসলিম শক্তিকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'ইসলামের শত্রু'কে বিনষ্ট করতে এগিয়ে এলেন। আজমল খান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল, তখন পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতি শান্তই ছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক অংশগ্রহণ করলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলি প্রমুখ বহু মুসলমান নেতা কারাবরণ করেন। হাকিম আজমল খান অন্যান্য অনেক ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ন্যায়

তখন পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। কিন্তু একযোগে মুসলমান নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হলে তিনি সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন।

1917 সালে হাকিম আজমল খান গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে 'অনুগত' আজমল খান 'বিদ্রোহী' আজমল খানে রূপান্তরিত হন। 1920 সালে তিনি তাঁর সরকারী খেতাব হাজিক্‌-উল-মুল্‌ক্‌ ত্যাগ করেন। পরিবর্তে দেশের জনগণ তাঁকে 'মসিহ্‌-উল-মুল্‌ক্‌' এই উপাধিতে সম্মানিত করে। 1918 সালে জাতীয় কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে নিযুক্ত হন। 1921 সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কারারুদ্ধ হলে, তাঁর স্থলে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে আজমল খানকে অধিবেশনের প্রারম্ভে নির্বাচিত করা হয়।

1920 সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত নীতি উপেক্ষা করে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ও অধ্যাপক জাতীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের আহ্বানে, ধর্মঘট করেন। এই সময়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নামে একটি নতুন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং হাকিম আজমল খান প্রতিষ্ঠানের প্রথম আচার্য হন। প্রথম কয়েক বৎসর জামিয়া প্রতিষ্ঠান আলিগড়েই অবস্থিত ছিল। কিন্তু পরে উপলব্ধি করা গেল যে, বিরাট মহীরুহের নীচে ছোট চারাগাছ কখনই বড় হতে পারে না। হয় প্রতিষ্ঠানটিকে স্থানান্তরিত করতে হবে নয়ত বন্ধ করে দিতে হবে। হাকিম আজমল খানের সনির্বন্ধ অনুরোধে জামিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় আজমল খান প্রভূত সাহায্য করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অনুদান ব্যতীত প্রতিষ্ঠানটিকে কখনই স্থাপন এবং যথাযথ লালন করা সম্ভব হত না, কারণ তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ নেতাই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

1904 সালে হাকিম আজমল খানের হৃদরোগের সূত্রপাত হয় এবং চিকিৎসকগণ তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের শুষ্ক আবহাওয়ায় কিছুকাল বাস করতে পরামর্শ দেন। 1911 সালে তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইংলণ্ডে যান। সেখানে তিনি অনেকগুলি বিখ্যাত হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং রাজনীতির ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বহু গণ্যমান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। 1925 সালে পুনরায় তিনি স্বাস্থ্যের কারণে বিদেশে যান এবং এইটিই তাঁর শেষ বিদেশ যাত্রা। এবার তিনি ফ্রান্সে যান এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করার সুযোগ পান। কিন্তু এইবার তিনি আর ইংলণ্ডে যান নি, কারণ সেখানে গেলে প্রতিনিয়তই তাঁর মনে পড়বে যে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা। এই দেশভ্রমণ তাঁর রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপের বিশেষ সহায়ক হয়। কিন্তু তাঁর দুর্বল রোগাক্রান্ত হৃদ্‌পিণ্ড কিছুমাত্র সুস্থ বা সবল হল না। অবশেষে 1927 সালে 29 ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়।

[Eminent Mussalmans—G. A. Natesan & Co., Madras ; Bharatvarsh Ki Vibhutiyan (in Hindi) ; A History of the Congress, Vol. I—by Pattabhi Sitaramayya ; Young India—1925 Volume (April 1925) ; Congress Presidential Address—G. A. Natesan & Co., Madras ; Indian National Congress, 1918, 1921 and 1928 Sessions Procdgs ; Home Deptt. (Political) Govt. of India F. No, 501, 1922 ; The Indian Annual Register, 1922, Vol. II ; Indian National Congress : A Comprehensive Bibliography—by Jagdish Sharma.]

(এল. দিওয়ানি) **মুশিরুল হক্‌**

আজ্‌হার মাজ্‌হার আলী (১৮৯৫ ?)

Azhar Mazhar Ali (1895— ?)

মাজ্‌হার আলী আজ্‌হার জন্মগ্রহণ করেন 1895 সালে। জন্মস্থান পূর্ব পাঞ্জাবে বাটালা জেলার গুরুদাসপুর। তিনি জন্মগ্রহণ করেন বারামুলার বিখ্যাত ওয়াহাব পারা পরিবারে। শিক্ষাগত এবং সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যাপারে এই পরিবারের বিশেষ দান ছিল। তাঁর বাবা আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন একজন সিয়া মুসলমান। সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের উপর তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। তিনি নানাভাবে পুত্র মাজহারের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন।

মাজহার আলী 1915 সালে লাহোরের গভর্ণমেণ্ট কলেজ থেকে স্নাতক হন এবং সেখানকার 'ল' কলেজ থেকে 1917 সালে এল. এল. বি. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন।

1918 সালে মাজহার আলী লাহোরে একজন আইনজীবী হিসেবে তাঁর জীবন শুরু করেন। কিন্তু 1919 সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে তিনি অন্তরীন হন। 1920 সালে আবার দেড় বছরের জন্য তাঁর জেল হয়। 1929 সালে তিনি খেলাফত সংগঠন ছেড়ে আহরার দল গঠন করতে সাহায্য করেন। এর প্রথম অধিবেশনটি কংগ্রেস মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে মাজহার আলী এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং পরে সভাপতি হন।

1931 সালে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় যখন আহরার পার্টি কাশ্মীর রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার দাবীকে সমর্থন করে কাশ্মীর আন্দোলন শুরু করেন এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের বিরোধিতা করেন। 1935 সালে শহীদগঞ্জ গুরুদ্বারার ঘটনার সময় তিনি মুসলমান-শিখ ঐক্যের ও সম্প্রীতির জন্য চেষ্টা করেন, সাম্প্রদায়িকতা দমনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্যর্থতার জন্য সরকারী নীতির সমালোচনা করেন এবং এইভাবে সমস্ত প্রগতিশীল জনগণের সমর্থন আদায় করেন।

1924 থেকে 1926 এবং 1934 থেকে 1946 সাল পর্যন্ত মাজহার আলী ছিলেন পাঞ্জাব আইন সভার সদস্য। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির একজন সদস্য হিসেবে এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং সবশুদ্ধ ছয় বছর জেলে অতিবাহিত করেন।

1946 সালে তিনি আহরার পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন এবং সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। কিন্তু 1946 সালের নির্বাচনে হেরে যান এবং 1947 সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর তিনি সেখানে চলে যান। অতঃপর তিনি রাজনীতি পরিত্যাগ করে লাহোর হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং সেখানেই তিনি বসবাস করতে থাকেন।

তিনি অসাধারণ বক্তা, কবি ও লেখক ছিলেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলি বেশীর ভাগই উর্দুতে রচিত। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল Shia's Twarikh-i-Masjid Sahid Ganj এবং 'Development of our Communal Settlement. শেষোক্ত রচনায় তাঁর উদারনৈতিক ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে। একজন গোঁড়া সিয়া পন্থী হিসেবে মাজহার আলী সিয়া-সুন্নী বিতর্কে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির সমর্থক। বিশেষতঃ পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নতির জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন এবং শিক্ষক সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তিনি পাঞ্জাবের শিল্প বিকাশ, কৃষি এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহীত ছিলেন। তিনি সরকারের করনীতি এবং আবগারী নীতির বিরোধিতা করেন এবং মদ্যপান নিবারণ সমর্থন করেন।

মাজহার ছিলেন একজন প্রথিতযশা জাতীয়তাবাদী। তিনি 1919 সালের দ্বৈত শাসনকে সমালোচনা করেছিলেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব সমস্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের অধিকারে হস্তান্তরিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। জিন্নার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক সত্ত্বেও তিনি তাঁকে 'কায়েদ-ই-আজম' না বলে 'কাফির-ই-আজম' অথবা সবচেয়ে বড় ধর্মত্যাগী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

[Punjab Legislative Council Debates, 1925-1936 ; Azim-ul-Rahman,—Rais-ul-Ahrar ; Soorush Kashmir,—Atta-ullah Shah Bukhari ; Chaudhri Khaliquzzaman,—Pathway to Pakistan ; Biographical Encyclopedia of Pakistan.]

জি. এস. চাবড়া

আজিমুল্লাহ্‌ খান (? —১৮৫৯)
Azimullah Khan (? —1859)

1857 সালের বিদ্রোহের এক উল্লেখযোগ্য নায়ক আজিমুল্লাহ্‌ খানের জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। কথিত আছে 1837-38-এর দুর্ভিক্ষের সময় আজিমুল্লাহ্‌ খান এবং তাঁর মাতাকে উদ্ধার করে এক মুসলিম অনাথ আশ্রমে আনা হয়। আজিমুল্লাহ্‌ খান সেখানেই থাকতেন এবং তাঁর মাতা

আয়ার কাজ করে দিন যাপন করতেন। কানপুরের এক সরকারী বিদ্যালয়ে আজিমুল্লাহ্ ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা শেখেন।

1854 সালে ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি নানা সাহেবের অবসর বৃত্তি সম্পর্কে তদ্বির তদারক করেন। তিনি প্রায় বছর দুয়েক সেখানেই থাকেন। ইংলণ্ড থেকে ফেরার পথে ফ্রান্স এবং সেবাস্টোপল সফর করে ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেন।

কানপুরে 1857-র বিদ্রোহে আজিমুল্লাহ্ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিছুকাল তিনি নানা সাহেবের ব্যক্তিগত সচিবরূপে কাজকর্ম করেন। নানা সাহেব এবং আজিমুল্লাহ্র বাসনা ছিল হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় সম্মিলিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হোক। উত্তর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বহু অঞ্চল সফর করে আজিমুল্লাহ্ বিদ্রোহের প্রস্তুতিকার্য অতি গোপনে সমাধা করেন। সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে চিঠিপত্র লিখে, আসন্ন রক্তপাতের নিদর্শন স্বরূপ লাল পদ্ম ও হাতে গড়া রুটি গ্রামে গ্রামে পল্টনে পল্টনে পাঠানো হয়। এক সক্রিয় সংগঠকের দায়িত্ব গ্রহণ করে আজিমুল্লাহ্ সমগ্র বিদ্রোহ পরিচালনা করেন।

দোহারা চেহারার, গাঢ় জলপাই ফলের মতো গায়ের রং, যুবক আজিমুল্লাহ্ পূর্বদেশীয় মণিমুক্তা-খচিত পোষাক পরতেন। ইংরেজ মহিলা সমাজে তাঁর সুমধুর ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি আকর্ষণ ও সম্মানের পাত্র বলে গণ্য হতেন। অবশ্য তাঁর নিষ্ঠাপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায় বহু ক্ষেত্রে—উদাহরণ স্বরূপ রাসেলের সাথে তাঁর কথোপকথন উল্লেখ করা যায়—"প্রাচ্যের মহিলাদের মত নারীকে নিয়ম শৃংখলার মধ্যে রাখলে পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের পতন ডেকে আনে, ঠিক সেইরূপ তারাও তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।" তিনি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সমর্থক ছিলেন বলে, হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের একত্রে আহার-বিহার, মেলামেশা পছন্দ করতেন।

বিঠুর নামক এক স্থানে পাওয়া আজিমুল্লাহ্ খানের বিভিন্ন চিঠিপত্র "Stories of an Indian Prince" নামাংকে প্রকাশিত হয়েছে। নানা সাহেব ও বাজি রাও-এর রাজসভা সম্পর্কে তাঁর লেখা দিনপঞ্জী থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। তবে বইটির সার্থকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কানপুর হত্যাকাণ্ডেই বা আজিমুল্লাহ্ কতখানি জড়িত ছিলেন সে বিষয়েও যথেষ্ট মতানৈক্য দেখা যায়।

ব্রিটিশ বিরোধী আলিমুল্লাহ্, ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করেন। তুরস্কের সুলতানকে তিনি যেমন সাহায্য করতে অনুরোধ জানান, তেমনি মিশরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করেন সহযোগিতার উদ্দেশ্যে।

মহাবিদ্রোহ বিফল হলে তাঁর মনিব নানাসাহেবের সঙ্গে আজিমুল্লাহ্ নেপালে পলায়ন করেন। সেখানেই অসুস্থ হয়ে তিনি মারা যান।

একাধারে দক্ষ সংগঠক, পারদর্শী কর্ণধার এবং সৎ স্বাধীনতা সংগ্রামী, আজিমুল্লাহ্ খান দৃঢ়ভাবে হিন্দু মুসলমান একতায় বিশ্বাস করতেন এবং ব্রিটিশ দাসত্ব শৃংখল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে তিনি সক্রিয়ভাবে প্রয়াসী ছিলেন। মনিবের একান্ত অনুগত কর্মচারী ও দেশপ্রেমিক রূপে আজিমুল্লাহ্ খান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

[G. W. Forrest—Selections from the Letters, Despatches and other State Papers, preserved in the Military. Dept. of the Govt. of India ; W. H. Russell—My Diary India, Vol. I ; Earl Roberts—Forty-one Years in India ; P. C. Gupta—Nana Sahib and the Rising at Cawnpore ; Anand Swarup Misra—Nana Saheb Peshwa ; Motilal Bhargava—Nana Saheb (Hindi) ; Freedom Struggle in U. P., Vols. I & II (Publications Bureau, Information Department, U. P.) ; V. D. Savarkar—Indian War of Independence : 1857 ; John William Kaye—A History of the Sepoy War in India : 1857-58,]

(মনতোষ সিং) **কে. এল. শ্রীবাস্তব**

আতমবাপু শর্মা, বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত-রাজা

(১৮৮৯-১৯৬৩)

Atombapu Sharma Vidyaratna, Pandit Raja (1889-1963)

পণ্ডিত-রাজা আতমবাপু শর্মা বিদ্যারত্ন গবেষণা শিরোমণি, 1889 সালের 31 জানুয়ারী ইম্ফলের

(মণিপুর) সাগোলবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফুরেইলাতপম নিকুঞ্জবিহারী অথবা তোলেন শর্মা এবং মালতী দেবীর একমাত্র পুত্র। তাঁর পিতার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন জ্যোতিষীরূপেও সুপরিচিত। বাৎস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল পরিবারটি। নাম্বুলমাপানের শিজাগুরু-মায়ুমমধু শর্মার কন্যা ভাগ্যবতী দেবীর সঙ্গে পণ্ডিত রাজার বিবাহ হয়েছিল। তাঁর দুই পুত্র দেব কিশোর শর্মা এবং বাসুদেব শর্মা এবং তিন কন্যা পদ্মাবতী দেবী, সোনাতম্বী দেবী, ধন্যাবতী দেবী।

গৃহেই পণ্ডিতরাজার শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয়েছিল। তাঁর পিতা তাঁকে সংস্কৃত ব্যাকরণ, ছন্দ, স্মৃতি, অলংকার, জ্যোতিষ (জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষী বিদ্যা দুইই), কাব্য এবং হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর অস্বাভাবিক মেধা দেখে পণ্ডিত লইমায়ুম নতুনেশ্বর শর্মা মহারাজার 'ব্রহ্মসভার' ব্যবস্থাকারী, পণ্ডিত রাজার শিক্ষক তাঁকে অত্যন্ত অল্প বয়সেই 'বিদ্যারত্ন' উপাধি প্রদান করেন। এই উপাধি মহারাজাও পরে অনুমোদন করেন এবং তারপর থেকে 'বিদ্যারত্ন' নামেই তিনি জনপ্রিয় হন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি ব্রহ্মপুর সংস্কৃত টোলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন এবং পঁচিশ বছর বয়সে হয়েছিলেন জনস্টোন ইংলিশ হাইস্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক।

পণ্ডিত-রাজার বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ হয়েছিল হাওড়ার পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ীর কাছে। তারপর থেকেই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বেদ এবং মণিপুরী পৌরাণিক কাহিনী এবং পুরনো মণিপুরী ভাষায় লিখিত বিশ্বাস ও সংস্কার সম্পর্কে পড়াশোনা করতে থাকেন। 1920 সালে তিনি লিখলেন 'মণিপুর পুরাবৃত্তম্' অথবা মণিপুরের প্রাচীনকাল। মাননীয় মহারাজা স্যার চুড়াচাঁদ সিং ভারতবর্ষের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাঁকে দাক্ষিণাত্যে এবং ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। এই সময় পণ্ডিতরাজা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হরেই মায়ে' রচনা করেন যা তাঁকে ইউরোপে পর্যন্ত পরিচিতি এনে দিয়েছিল। 1947 সালে 'মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ' তাঁকে 'গবেষণা শিরোমণি' খেতাব প্রদান করেন। সেই বছরই কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে তাঁকে 'পণ্ডিতরাজা' উপাধি দেওয়া হয়। 1951 সালে পণ্ডিতরাজা 'ভারতীয় সংস্কৃত সঙ্গমের' সদস্য হলেন। 1956 সালে মণিপুরী নৃত্যে যোগ্যতা সম্পন্ন শিল্পীদের নির্বাচনের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তিনি তার অন্যতম সদস্য হয়েছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের বিশেষ নামজাদা সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্কৃত কমিশনের সুপারিশক্রমে নামমাত্র অর্থ সহ সম্মান সূচক সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়ে থাকে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি 1959 সালে যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্ডিতরাজাকে সংস্কৃতের জন্য 'সার্টিফিকেট অব অনার' প্রদান করেন। 1960 সালে তিনি 'মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের' সভাপতি হন এবং পরপর দুবার তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। 'সম্মানজনক গবেষক পণ্ডিত' বলে ঘোষিত হওয়ার পর তিনি 'জওহরলাল নেহরু ড্যান্স একাডেমি'-র সঙ্গে যুক্ত হন। 1963 সালে তিনি 'সংঘ-বেদ-আশ্রম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 1963 সালে পণ্ডিত-রাজাকে ভারত সরকারের 'সঙ্গীত নাটক একাডেমি' পুরস্কার প্রদান করা হয়। 1963 সালের 2 সেপ্টেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে পুরস্কারটি মরণোত্তর হয়ে যায়।

ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, হিন্দুশাস্ত্র এবং পুরাণ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন প্রায় একশ-র বেশি বই। তাঁর মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে আছে 'মণিপুর পুরাবৃত্তম্', 'হরেই মায়ে', 'প্রত্নউকাস-দ্য এর্নসিয়েণ্ট হোম অফ দ্য এরিয়ানস্', 'পাখাম্বা', 'মেইটেই কিরতান', 'সংকীর্তন মহাজন' ইত্যাদি। ধারা বিবরণী এবং অনুবাদের মধ্যে আছে 'শ্রী মদ্ভগবৎপুরাণ' (অন্বয়ানুবাদ এণ্ড ব্যাখ্যা ইন মণিপুরি), 'ঋক্ বেদ সংহিতা' (১ম খণ্ড), 'গীত-গোবিন্দ অব জয়দেব', 'সারস্বত ব্যাকরণ', 'গীতা', 'চৈতন্যচরিতামৃত' ইত্যাদি।

এছাড়াও পণ্ডিত-রাজা ছিলেন অভিজ্ঞ সাংবাদিক, সমাজ সংস্কারক এবং রাজনীতিবিদ। 1930 সালে পণ্ডিত রাজা চুড়াচাঁদ ছাপাখানা (যা ছিল মণিপুরের প্রথম ব্যক্তিগত ছাপাখানা) স্থাপন এবং প্রথম মণিপুরী দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন ('দৈনিক মণিপুর' 1933)। তাছাড়া তাঁর উদ্যোগ এবং সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আর একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্র 'ললিত মঞ্জুরী পত্রিকা'। 1938 সালে পণ্ডিতরাজা কাছাড়ে (আসাম) গিয়ে হাজার হাজার তপশিলী জাতিকে বর্ণ হিন্দু রূপে স্বীকৃতি দান করেন।

পণ্ডিতরাজা ছিলেন মণিপুর রাজ্য কংগ্রেস গঠনের একজন সক্রিয় কর্মী। কংগ্রেসের প্রথম বৃহৎ অধিবেশন হয়েছিল তাঁর প্রাঙ্গণে এবং বহুদিন ধরে ঐ

সংগঠনের মূল কার্যালয় অবস্থিত ছিল তাঁর গৃহে।

পণ্ডিতরাজা ছিলেন সুস্বাস্থ্য এবং উজ্জ্বল গাত্র বর্ণের অধিকারী। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন, তিনি সর্বদা সাধারণ পোষাক পরিধান করতেন। সাহস এবং স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত। খুব কম মানুষই তাঁকে যুক্তিতে পরাভূত করতে পেরেছিলেন এবং এ কাজে তার প্রধান সহায় ছিল তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। তাঁর সবরকম পুস্তক পাঠে বিশেষ আগ্রহ ছিল। হুঁকো তাঁর প্রিয় ছিল এবং ধূমপান করতে করতে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চালিয়ে যেতেন।

বস্তুতঃ পণ্ডিতরাজা মণিপুরের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির একজন দিক্‌পাল ছিলেন। একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু হিসেবে তিনি মণিপুরী সংস্কৃতির সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের সম্পর্ককে তুলে ধরেছিলেন। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে Present Day Rishi এবং Agasthya in Eastern India আখ্যা দিয়েছিলেন।

[S. K. Chatterjee—Religious and Cultural Integration of India: Atombapu Sarma of Manipur.]

এন. খেলচন্দ্র সিং

আতাউল্লাহ্ শাহ বোখারী (১৮৯১-১৯৬৭)
Ataullah Shah Bokhari (1891-1967)

আতাউল্লাহ্ শাহ বোখারী বিহারের পাটনা শহরে 1891 সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জিয়াউদ্দীন আহমেদ সৈয়দ আহমেদ ইন্দারোবীর কন্যা সৈয়াদা ফত্মা ইন্দারোবীকে বিবাহ করেছিলেন। আতাউল্লাহ্ শাহের শৈশবস্থাতেই তাঁর মা মারা যান। তাঁর বাবা তখন পুনরায় বিবাহ করেন। তবে শিশু আতাউল্লাহ্ শাহ প্রধানতঃ মানুষ হয়েছিলেন তাঁর মাতামহ এবং মাতামহীর কাছে। তাঁর পূর্বপুরুষরা বোখারা থেকে কাশ্মীর এবং পরে সেখান থেকে পাটনা এবং তার পরে গুজরাটে (পাকিস্তান) চলে আসেন। বোখারী মুসলমান আতাউল্লাহ্ শাহ-র পারিবারিক অবস্থা ছিল মধ্যবিত্ত মানের। তাঁর বাবা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আতাউল্লাহ্ শাহ একবারই বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের চারটি সন্তান হয়েছিল।

আতাউল্লাহ্ শাহ কখনো আধুনিক স্কুল কলেজে পড়েন নি। তাঁর মাতামহী ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি সনাতন প্রথাতে বাড়িতেই শিক্ষালাভ করেছিলেন, উর্দু শিখেছিলেন মাতামহের কাছে আর মাতামহীর কাছে ফার্সী এবং আরবী। এঁদের মৃত্যুর পর আতাউল্লাহ্ অমৃতসরে এসে ধর্ম শিক্ষা লাভ করেন যথাক্রমে মৌলানা নূর আহমেদ, মৌলানা গুলাম মুস্তাফা কাসিম এবং হজরত মুফ্‌তি মহম্মদ হুসন-এর কাছে। শা আজিম আবাদি আতাউল্লাহ্‌র উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁর কাছে আতাউল্লাহ্ উর্দু কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ভারতের বহু জায়গা ভ্রমণ করেন, কিন্তু কখনও বিদেশে যান নি। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডঃ আনসারী, মৌলানা শোকত আলি এবং অন্যান্য আরও খ্যাতনামা নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

আতাউল্লাহ্ শাহ অমৃতসরের এক ছোট মসজিদ-এ ধর্মপ্রচারক হিসেবে জীবন শুরু করেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি কোরান শিক্ষা দেন। 1921 সালে তিনি জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। যখন মৌলানা শোকত আলি পাঞ্জাব খেলাফৎ কমিটিকে বে-আইনী ঘোষণা করে ভেঙ্গে দিলেন, তখন আতাউল্লাহ্ শাহ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহায়তায় 'মজলিস-ই-আহরার ইসলাম হিন্দ' পার্টি গড়ে তুললেন এবং ঐ পার্টির প্রথম সভাপতি হলেন। 'শেদগঞ্জ গুরুদুয়ার' মামলায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা এবং 'রঙ্গোলা রসুল' (মুহম্মদের জীবনী)-এর প্রকাশক রাজ পালের হত্যার অভিযোগে আতাউল্লাহ্ শাহ 1927 সালে এক বছরের জন্য কারাবন্দী হলেন। 1930 সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে তিনি আগষ্ট মাসে বাঙ্গলার দিনাজপুরে গ্রেপ্তার হলেন এবং ছয় মাসের জন্য তাঁর জেল হল। মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে মুক্তি আন্দোলনে যোগদানের জন্য আবার দুবছরের জেল হল এবং 1932 সালে তিনি মুক্তি পেলেন। কায়াদিয়ান-বিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন। এবং আবার গুলাম আহমদ কায়াদিয়ানের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে 1939 সালে তিনি পাঞ্জাবে সৈন্যদলে প্রবেশেচ্ছুদের নেওয়ার

বিপক্ষে আন্দোলন করেন এবং পাঞ্জাব সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ড দিল। দেশ-ভাগের পর 1947 সালে তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং সেখানে একাত্তর বছর বয়সে 1967 সালের 21 আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

সমাজ সংস্কারক হিসেবে আতাউল্লাহ শাহর নাম মুসলমান সমাজে এবং পাঞ্জাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও, উল্লেখযোগ্য। মুসলমান পীর ও ধর্মযাজকদের সৃষ্ট মুসলমান সমাজের অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার নির্মূল করবার জন্য তিনি লড়াই করেছিলেন। বিশেষতঃ অস্পৃশ্যতা এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে মুসলমানদের নিস্পৃহ মনোভাবের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু মহাজন (শাহুকর)দের হাত থেকে মুসলমানদের মুক্ত করে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। এই শাহুকররা তখন গ্রামের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো। তিনি বিধবা বিবাহ ও নারীর সমানাধিকারের পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তার আতাউল্লাহ্ শাহর সাফল্যগুলির মধ্যে অন্যতম। আহরার পার্টির সভাপতি হিসেবে তিনি অনেকগুলির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে কোরানের ভিত্তিতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হত। তিনি চিরকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষাই মুসলমানদের পশ্চাদ্‌বর্তিতার প্রধান কারণ। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদেরও ইংরেজী স্কুলে পাঠান নি। গোঁড়া মুসলমান আতাউল্লাহ্ শাহ সব সময়েই হিন্দু ও আহমেদীয় মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এমন কি 1935 সালে তিনি আহমেদীয় বিরোধী প্রচার সংগঠিত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি পরিচিত ছিলেন একজন মুসলমান ধর্মপ্রচারক হিসেবে কারণ কোরানের নির্দেশ তিনি সব সময়েই মেনে চলতেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আতাউল্লাহ্ শাহ অহিংসা এবং সাংবিধানিক উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে ছিলেন। একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা হিসেবে তিনি মুসলীম লীগের 'পাকিস্তান' গড়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। বিদেশী শাসকদের বিদূরিত করে ঐক্যবদ্ধ ভারত করার জন্য তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য এবং গান্ধীজীর দূত হিসাবে আতাউল্লাহ্ শাহ সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে সমস্ত ভারতীয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়োজনের কথা বিশেষভাবে প্রচার করেছেন। কিন্তু বলা যায় আতাউল্লাহ্ শাহর রাজনীতিকের চেয়ে ধর্মীয় নেতার ভূমিকাই বড় ছিল। তাঁর জীবনের একমাত্র প্রধান লক্ষ্য ছিল তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মঙ্গল এবং উন্নতিসাধন করা। তিনি মুসলমানদের জন্য বিশেষ অধিকারের দাবী জানিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আতাউল্লাহ্ শাহর একমাত্র অবদান—অহিংস ও সাংবিধানিক উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ। মুসলমানদের প্রতি গভীর সহানুভূতি থাকলেও তিনি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যা ঐ সময়ে অত্যন্ত জরুরী ছিল।

[Aziz-ul-Rehman Ludhianvi—Rais-ul Ahar (A biography of Maulana Habib-ul-Rehman), (Urdu) Delhi, 1961 ; Sorush Kashmiri—Ataullah Shah Bokhari (Urdu), Lahore, 1954 ; Nagoosh—Personality Number, Lahore, 1956, Edited by Muhammad Tufail ; Nagoosh—Autobiographical Number, Lahore, 1964, Edited by Muhammad Tufail ; Chaudhri Khaliquzzaman—Pathway to Pakistan, Lahore, 1962. Proceedings of the Home Political Department (1930-1936) ; The Times of India Files, 1940-46.]

টি. আর. সারীন **ডি. অবস্তী**

আত্তাবরা বালকৃষ্ণ শেট্টি (১৮৮২-১৯৬০)

Attavara Balakrishna Shetty (1882-1960)

মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণ কানাড়া জেলায়, ম্যাঙ্গালোরের নিকটবর্তী অত্তাভরে আত্তাবরা বালকৃষ্ণ শেট্টির জন্ম হয়। তিনি ছিলেন হিন্দু 'বাণ্ট' শ্রেণীভুক্ত। বাণ্ট বা নদভরেরা ছিল একটি কৃষি-নির্ভর সম্প্রদায় এবং দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ও গ্রামীণ নেতারূপে তাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

শেট্টি ছিলেন ধনী জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর মাতুল রামাইয়া পুঞ্জা ছিলেন তাঁদের সমাজের প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র। পুঞ্জা পরবর্তীকালে দক্ষিণ কানাড়া জেলার জেলা-জজ রূপে

প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শেট্টির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সীতারাম শেট্টি ছিলেন ঐ সমাজের প্রথম স্নাতক। তাঁর অনগ্রসর কৃষিজীবী সমাজে ইংরেজী শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি প্রারম্ভিক চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ম্যাঙ্গালোরে বাণ্ট শ্রেণীর জন্য বাণ্ট ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। এই সময়ে সীতারামের অকাল মৃত্যু (সম্ভবতঃ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে) ঘটে এবং আত্তাবরা বালকৃষ্ণও শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়াশুনায় ছেদ টানেন। এই সময় ম্যাঙ্গালোর কানাড়া হাইস্কুল থেকে এস. এস. এল. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেণ্ট এলয়সিয়াস কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ছিলেন। শীঘ্রই তিনি নিজেকে সমাজ সেবায় উৎসর্গ করেন এবং তাঁর প্রয়াত ভ্রাতার অসম্পূর্ণ কার্যগুলিতে হাত দেন এবং জেলায় বাণ্ট ছাত্রাবাসের আরও অনেক শাখা স্থাপন করেন।

1921 সালে তিনি ম্যাঙ্গালোর থেকে 'নবযুগ' নামে একটি কানাড়া সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন এবং 1932 সাল পর্যন্ত এটি সম্পাদনা করেন। (উদিপি এখন পর্যন্ত এই পত্রিকাটির প্রকাশনা করছেন)। জ্ঞানের প্রতিটি ধারার প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন এবং একটি বৃহৎ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর আকর্ষণ ছিল। তিনি ছিলেন অতীন্দ্রিয় লোকে বিশ্বাসী। জেলার সকল উচ্চবিদ্যালয় গুলিতে চরিত্র গঠনের ওপর তিনি ভাষণ দেন। এমনকি 1928 সালে অর্থাৎ এই শতাব্দীর বিশ দশকেই তিনি পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং তিনি কিছু প্রচার পুস্তিকা নব-বিবাহিতদের উপহার দেন। স্কাউট আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সম্ভবত 1932-35 সালে তিনি স্কাউটের জেলা কমিশনার ছিলেন।

কর্কলা তালুকের মরকত গুট্টু পরিবারের কন্যা কল্যাণীকে 1913 সালে তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁর দুটি পুত্র ও কন্যা সন্তান হয়। তাঁর প্রথম পুত্র শৈশবে মারা যায়, দ্বিতীয় পুত্র ডক্টর দয়ানন্দ শেট্টি বর্তমানে হুবলীতে কর্ণাটক মেডিকেল কলেজের রেডিও-লজি বিভাগের অধ্যাপক।

1926 সালে শেট্টি মাদ্রাজ আইনসভার সদস্য হন। 1938 সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। মূলতঃ তিনি ছিলেন ইউনাইটেড ন্যাশনালিষ্ট পার্টির সদস্য। 1937 সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। জাস্টিস্ পার্টির প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, যদিও তিনি এ দলের আনুষ্ঠানিক সদস্য ছিলেন না। ইংরেজী শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তিনি আশীর্বাদ স্বরূপ বলে মনে করতেন এবং ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণ্ট সম্প্রদায়ের উত্থানের সোপান বিবেচনা করতেন। ফ্ল্যাগ সত্যাগ্রহের সমালোচনা করে তিনি 'নবযুগে' সম্পাদকীয় লেখেন। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক কংগ্রেসী যুবক কে. কে. শেট্টি 'নবযুগে'র সহ-সম্পাদক নিযুক্ত এন এবং 'নবযুগ' পত্রিকায় সম্পাদকের হয়ে সম্পাদকীয় লেখবার সুযোগে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদককের ধীরে ধীরে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি প্রকাশ্য সহানুভূতিশীল করে তোলেন। জাস্টিস্ পার্টির মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী প্রধানের সক্রিয়তাও সম্ভবতঃ তাঁর এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। শেট্টি সাংবিধানিক পদ্ধতি ও ব্রিটিশ রাজ্যের সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। শাসন খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের তিনি ছিলেন এক কঠোর সমালোচক।

জেলার সমস্ত প্রকাশ্য আন্দোলনে তিনি সর্বদাই একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং ডিস্ট্রিক্ট লোকাল বোর্ডের তিনি সভাপতি (1932-35) নির্বাচিত হন। বিজয়া ব্যাংক লিমিটেডের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা - চেয়ারম্যান। হরিজন সেবক সংঘের সভাপতি ও ম্যাঙ্গালোরের অনগ্রসর শ্রেণীর মিশনের সহ-সভাপতি রূপে তিনি অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ ও হরিজনদের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছেন।

মাদ্রাজে 1937 সালে রাজাজীর মন্ত্রিসভায় তিনি পার্লামেণ্টারী সচিবের পদে নিযুক্ত হন। 1941 সালে তিনি একক সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন এবং ভেলোরে জেলে নয় মাস বন্দী থাকেন। 1946 সালে মাদ্রাজ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে তিনি 1947-1956 সালের মধ্যে মাদ্রাজ জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন। মহীশূর রাজ্যেও 1 নভেম্বর 1956 সালে নতুন মহীশূর রাজ্য গঠিত হলে তিনি নিজলিঙ্গাপ্পা মন্ত্রী-সভায় জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী হন। 1957 সালে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি এবং সে বছরই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

1960 সালের 12 জানুয়ারী তিনি স্ত্রী, বিবাহিত কন্যাদ্বয় ও একমাত্র পুত্রকে রেখে পরলোকগমন করেন।

[Material collected from : K. K. Shetty (former Chairman of the Mysore State Legislative Council, a close associate of

A. B. Shetty and a former Assistant Editor of the Navayuga), K. Honnayya Shetty (the present Editor of the Navayuga) and K. B. Shetty (a relation of A. B. Shetty) at Mangalore ; Obituary note published in the Navayuga, dated 14 January 1960.]

ইমানুয়েল ডিভিয়েন **এস. ইউ. কামাথ**

আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪-১৯৩৫)

Ananda Chandra Roy (1844-1935)

1844 সালে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় এক ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারে আনন্দচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গৌরসুন্দর রায় একজন সৎ, ধার্মিক ও উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। যাই হোক তাঁর জেষ্ঠপুত্র গোবিন্দচন্দ্র রায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে তিনি পুত্রকে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। গৌরসুন্দর মিঃ জেঃ পি ওয়াইজ্ নামক ঢাকার একজন জমিদার ও নীলকর সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। আনন্দচন্দ্র পিতার অনেক সদ্গুণের অধিকারী হয়েছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে আনন্দচন্দ্র ঢাকা বারে আইনজীবীরূপে যোগদান করেন এবং অচিরেই ঢাকার একজন অগ্রণী আইনজীবীরূপে খ্যাতিলাভ করেন। আইনব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আনন্দচন্দ্র সক্রিয় রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলেন এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মতিলাল ঘোষ এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ তৎকালীন জাতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

আনন্দচন্দ্র একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। 1878 সালে যখন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয় তখন আনন্দচন্দ্র প্রকাশ্যে তাঁর নিন্দা করেন। বঙ্গ বিভাজনেরও তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদে ঢাকায় জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গণে আহূত এক বৃহৎ জনসভায় আনন্দচন্দ্র পৌরোহিত্য করেন। সে সময় আনন্দচন্দ্র ঢাকা বারের মুখপাত্র থাকায় তাঁর প্রতিবাদ ও সমালোচনাসূচক ভাষণ সমবেত সমাবেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ; সেখানে তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, আবদুল হালিম গাজনাভী, হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র ও আরো অনেকে। 1906 সালের 14 ও 15 এপ্রিল বরিশালে প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়ার পরেই স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আনন্দচন্দ্র এই আন্দোলনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই স্মরণীয় কনফারেন্স-এ যোগ দিতে শুধু বরিশাল জেলা থেকে নয় কলকাতা ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বহু ব্যক্তি উপস্থিত হন। বরিশালের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্যার বি. ফুলারটন বিশেষ আইন জারি করে প্রকাশ্যে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু 1906 সালের 14 এপ্রিল আনন্দচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিসহ শোভাযাত্রা বার করেন। ডেপুটি সুপারিন-টেনডেণ্ট মি. কেম্পের নির্দেশে পুলিশবাহিনী শোভা-যাত্রীদের উপর আক্রমণ চালায় ও অনেককে আহত করে। এই ঘটনা স্বদেশী আন্দোলনে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে ও আন্দোলন নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। আনন্দচন্দ্রের মহান্ অবদান তখন থেকেই বিপুল ও সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। জনসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ আনন্দচন্দ্রের দেহাবসান ঘটে 1935 সালে।

[Joges Chandra Bagal—Muktir Sandhane Bharat, Calcutta, 1337 Bs ; S. N. Banerjea—A Nation in Making, 1925 ; Paramananda Dutt—Memoirs of Motilal Ghose, Calcutta, 1935 ; Haridas and Uma Mukherjee—India's Fight For Freedom, Calcutta, 1958 ; Sahitya Sadhak Charitmala, No. 42, Bangiya Sahitya Parishad Calcutta 1959.]

কে- সি. চৌধুরী

আনন্দ চার্লু পানাম্বাক্কাম (১৮৪৩—১৯০৮)

Ananda Charlu Panambakkam (1843-1908)

1843 সালের আগস্ট মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর

জেলার অন্তর্গত কদমঞ্চ গ্রামের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে আনন্দ চালর্ৄ পানাম্বাক্কাম জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের আদি বাসস্থান তামিলনাড়ুর চিংগলপেট জেলার পানাম্বাক্কাম গ্রামে। তাঁর পিতা শ্রীনিবাস চালর্ৄ চিত্তুরের জেলা আদালতে সেরেস্তাদারের চাকুরি গ্রহণ করেন এবং পানাম্বাক্কাম গ্রাম ত্যাগ করেন। স্বল্প আয়ে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করেও শ্রীনিবাস পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আনন্দ চালর্ৄ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ছাত্রাবস্থায় আনন্দ চালর্ৄ ইংরেজি, সংস্কৃত এবং তেলেগু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর 1865 থেকে 1869 সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজের পচাইয়াপ্পার উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। সুতরাং তিনি প্রাইভেট-এ আইন পড়তে শুরু করেন এবং বি. এল. পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করেন। তাঁর বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নিয়ে একটি চমকপ্রদ কাহিনী আছে। আইন পরীক্ষায় আনন্দ চালর্ৄ একমাত্র রচনা-পত্রটি ব্যতীত সবগুলি পত্রেই অত্যন্ত কম নম্বর পান। কিন্তু তাঁর রচনা-পত্রটি এত উচ্চমানের হয় যে, জাস্টিস হ্যালোওয়ে অভিভূত হয়ে অন্যান্য পরীক্ষকদের একরূপ বাধ্য করেন তাঁকে উত্তীর্ণ প্রার্থীরূপে মনোনীত করতে। এইরূপে 1869 সালে তিনি বি. এল. উপাধি অর্জন করেন।

মাদ্রাজের বিখ্যাত আইনজীবী কর্ভলি ভেঙ্কটপতির অধীনে তিনি শিক্ষানবিসরূপে কাজ শুরু করেন এবং 1869 সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আইনজীবী রূপে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়। জীবনের প্রথম মামলায় তাঁকে বিখ্যাত জে. ডি. ম্যায়নের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। জে. ডি. ম্যায়নে ছিলেন হিন্দু আইন সম্পর্কে প্রামাণিক জ্ঞানের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আনন্দ চালর্ৄ মামলায় জয়লাভ করেন এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন। আইনজ্ঞরূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করেন এবং হাইকোর্টের আদিম-বিভাগের (অরিজিন্যাল সাইড) ব্যবহারজীবীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

আইন ব্যবসায়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তিনি দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'হাউ টু রিফর্ম আওয়ার কোর্টস' (1882) এবং 'দি ম্যাড্রাস লিগ্যাল প্রোফেশন ঃ হাউ টু রিফর্ম ইট' (1883)। 1899 সালে তাঁর কক্ষেই মাদ্রাজ এডভোকেট্স্ অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয়।

সমসাময়িক অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীদের মতো আনন্দ চালর্ৄ রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষ আগ্রহান্বিত হন এবং নানাভাবে তাঁর এই আগ্রহ ও কৌতূহল ব্যক্ত হয়। তিনি নিয়মিতভাবে 'নেটিভ পাবলিক ওপিনিয়ন' এবং 'ম্যাড্রাসি' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। 1878 সালে তিনি জি. সুব্রাহ্মণ আইয়ার ও এম. বীররাঘবাচারিয়ারকে 'হিন্দু' পত্রিকার প্রকাশনার ব্যাপারে সহায়তা করেন। প্রায়ই এই পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। এইভাবে আনন্দ চালর্ৄ তৎকালীন সমাজে দেশের বিভিন্ন বিষয়ে জনমত গঠন করতে বিশেষ সহায়তা করেন।

আনন্দ চালর্ৄ শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। সেযুগে লাউড-স্পীকারের প্রচলন ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আনন্দ চালর্ৄ বিপুল জনসমাবেশে অনায়াসেই ভাষণ দিতে পারতেন। মাদ্রাজের অধিকাংশ জনসমাবেশেই বিশেষতঃ সরকারী নীতির বিরুদ্ধে আহূত সমাবেশে তিনি অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন ও বক্তৃতা দিতেন।

একজন দক্ষ সংগঠকরূপেও তাঁর সুনাম ছিল। 1884 সালে তিনি Triplicane Literary Society গঠন করে। তিনি এই সমিতির সভাপতিনির্বাচিত হন। জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারে এই সমিতির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর চার বছর পূর্বে তিনি ম্যাড্রাস নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন পুনরুজ্জীবিত করেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারিরূপে প্রভূত কর্ম সম্পাদন করেন। 1884 সালে তিনি কতিপয় রাজনৈতিক কর্মীকে একত্র এবং সংগঠিত করে ম্যাড্রাস মহাজন সভা স্থাপন করেন। অনেকদিন পর্যন্ত এই সভা জনমতের মুখপাত্ররূপে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি এই সভার সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। আনন্দ চালর্ৄ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সকল সমিতি কলকাতা ও বোম্বাইতে স্থাপিত রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরই অনুরূপ। তিনি বিভিন্ন জেলায় এই সভার শাখা স্থাপন করেন এবং মহাজন সভার সঙ্গে সংযুক্ত করেন। 1884 সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এই সভার প্রথম অধিবেশনে আনন্দ চালর্ৄ দেশের বহুবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত ও সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করেন।

আনন্দ চালর্ুর এই প্রকার জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য তাঁকে মাদ্রাজ পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত করা

হয়। 1885-1899 সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

1885 সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে বাহাত্তরজন প্রতিনিধি যোগদান করেন, আনন্দ চার্লু তাঁদের অন্যতম। তারপর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই তিনি যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের সভা সমিতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতায় কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা অর্জন করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই 1891 সালে নাগপুর অধিবেশনে তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচিত করা হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি যাঁরা ভারতকে এক জাতিরূপে গণ্য করেন না তাঁদের সমালোচনা করেন। আইন পরিষদের গঠন প্রণালীকে আরও বেশিমাত্রায় প্রতিনিধিমূলক করা এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে জাতিগত বৈষম্যমূলক নীতি প্রত্যাহার করে সকল ভারতীয়দের নিয়োগ করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতেও সরকারকেও অনুরোধ জানানো হয়। 1891 সালে তিনি কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক কমিটির সদস্য এবং পরের বছর কমিটির সেক্রেটারিরূপে নির্বাচিত হন। এই সময় বিভিন্ন দাবী নিয়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে যাঁরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন সেই প্রতিনিধিদলে আনন্দ চার্লু মনোনীত হন। সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েই তাঁকে একজন সর্বভারতীয় শ্রদ্ধেয় নেতারূপে গণ্য করতেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' ও 'সি. আই. ই.' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আনন্দ চার্লুর রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল বহুমুখী। 1883 সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি বড়লাটের নিকট ম্যাড্রাস মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এই বিল তখন বড়লাটের সম্মতির জন্য অপেক্ষমান ছিল। 1884 সালে তিনি মাদ্রাজ মহাজন সভার প্রতিনিধিরূপে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেন। তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষা একযোগে ভারতে ও ইংলণ্ডে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেন এবং সরকারী চাকুরিতে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রভাব তখন কেবলমাত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তার বিলুপ্তিসাধনের জন্যও তিনি সরকারকে অনুরোধ জানান। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানান।

1895 সালে তিনি ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত হন এবং আট বছর ঐ পদে বহাল ছিলেন। নির্ভীকতা ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি স্বদেশবাসীর পক্ষ সমর্থন করে ভাষণ দিতেন, বাজেট-আলোচনায় যোগ দিতেন এবং সরকারী কার্যের সমালোচনা করে স্মরণীয় ভাষণ দিতেন, সুতীবস্ত্রের উপর আমদানি করের বিলুপ্তিসাধন ও ফৌজদারী আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনের (এর দ্বারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অধিকারী হন) তীব্র প্রতিবাদ জানান।

তিনি সর্বদাই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন পরিচালিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। 1907-08 সালে তিনি অবশ্যই কংগ্রেসের মধ্যপন্থাবলম্বী সদস্যদের মধ্যে গণ্য হতেন। নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত কংগ্রেসের পরিস্থিতির কিছু মাত্র পরিবর্তন সাধন করার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আনন্দ চার্লু সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে ছিলেন গোঁড়া মতাবলম্বী। তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির মানুষ। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তেলুগু সাহিত্য তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পিতার তেলুগু সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ পুত্র শ্রী নিবাস চার্লুর উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। শ্রী নিবাস চার্লু অন্যতম তেলুগু লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

[Congress Presidential Addresses, 1885-1910, First Series, Published by G. A. Natesan and Co., Madras ; The Hindu, 30 November 1908 ; The Freedom Struggle in Andhra Pradesh, Volume I, Edited by Prof. M. Venkatarangaiya (Andhra— 1965).]

আর. নাগেশ্বর রাও **এম. ভেঙ্কটরঙ্গাইয়া**

আনন্দ মোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬)

Ananda Mohan Bose (1847-1906)

ভারতের প্রথম 'র‍্যাংলার', ব্রাহ্মসমাজের নেতা, শিক্ষাবিদ্ ও সমাজ-সংস্কারক আনন্দমোহন বসু 1847 সালে 23 সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার (পূর্ব বাংলা) জয়সিদ্ধি গ্রামে এক উচ্চ মধ্যবিত্ত

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যজীবনে আনন্দমোহন তাঁর মাতা উমা কিশোরী দেবীর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন। উমা কিশোরী একসঙ্গে ছিলেন বুদ্ধিমত্তা ও দয়ার্দ্রতার আধার। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সাধুসন্তদের প্রতি উমা কিশোরী দেবীর শ্রদ্ধা সেকালের গ্রামীণ হিন্দু মহিলাদের মধ্যে বিরল ও অসাধারণ ছিল। বালক আনন্দমোহন মায়ের কাছ থেকে সকল ধর্মই যে মূলতঃ এক—এই শিক্ষা লাভ করেন। নিজে লেখাপড়া না শিখেও উমা কিশোরী দেবী তাঁর সন্তানদের সম্ভবপর সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করাতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই কারণেই তিনি সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করেন এবং আনন্দমোহন ময়মনসিংহ শহরে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। বাল্যকাল হতেই আনন্দমোহন মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত হন, বিভিন্ন পরীক্ষায় উপর্যুপরি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 1870 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হন। পুরস্কারের অর্থের সাহায্যে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে উচ্চ গণিত বিভাগে ভর্তি হন। কেম্ব্রিজের পরীক্ষায় তিনি প্রথম ভারতীয় 'র‍্যাংলার' হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং 1874 সালে ব্যারিস্টার হবার যোগ্যতা অর্জন করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তন করে আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে একযোগে সমাজ সংস্কারমূলক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অন্যান্য সহকর্মী ও সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত, দুর্গামোহন সেন ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য। এইভাবে বিভিন্ন আগ্রহ ও বিভিন্ন রুচির সঙ্গে আনন্দমোহন নিজেকে একীভূত করেছিলেন। এই সময়েই তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনেরও সংস্পর্শে আসেন। উভয়ের প্রতিই তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল।

1871 সালে ইংলন্ডে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় থেকেই আনন্দমোহনের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। 1874 সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর থেকে 1905 সালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত উভয়ে সকল রাজ-নৈতিক কার্যকলাপে একযোগে অংশগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় পরামর্শদাতার সহযোগিতায় ও স্বীয় সাংগঠনিক নিপুণতায় আনন্দমোহন কতিপয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্থাপিত সংস্থাগুলির মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঃ দি ক্যালকাটা স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন 1875 ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন 1876। দি ক্যালকাটা স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ছাত্রদের গঠনমূলক রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা হয়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা-রূপে ভারতীয়দের অধিকার ও দাবী নিয়ে সংবিধানা-নুগ আন্দোলন শুরু করে। 1883 সালে এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিরূপে প্রথম জাতীয় অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশনই ছিল পরবর্তীকালের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (1885) অগ্রদূত।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই আনন্দ-মোহন এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং 1898 সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে তিনি সভাপতিরূপে মনোনীত হন। দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশপ্রীতির যে মহান আদর্শ গ্রহণের জন্য দেশ-বাসীকে তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে আহ্বান জানান তাঁর পূর্বে অপর কোন সভাপতির ভাষণে অনুরূপ একনিষ্ঠ ও আন্তরিক স্বদেশপ্রীতির প্রকাশ ঘটেনি।

শিক্ষাক্ষেত্রেও আনন্দমোহনের অবদান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1879 খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতার সিটি কলেজ স্থাপন করেন। গণশিক্ষা ও নারীশিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক আনন্দমোহন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন 1877 সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' রূপে। অসুস্থ ও অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রধানতঃ আনন্দ-মোহনের নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকট অফ ইনকরপোরেশনকে সংশোধন করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র পরীক্ষাগ্রহণের কেন্দ্র হতে যথার্থ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে স্মরণ করে 1882 সালে আনন্দমোহনকে এডুকেশন কমিশনে সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বঙ্গীয় আইন পরিষদে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।

সমাজ সংস্কারকরূপে আনন্দমোহন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নারীজাতির মর্যাদা রক্ষা, অশিক্ষিত জনগণের অবস্থার উন্নতিসাধন, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম অবদান অদ্যাবধি মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। সাধুর ন্যায় সরল, অনাড়ম্বর ও সংযত ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। সামাজিক মেলামেশায় তিনি ছিলেন অতিশয় অমায়িক এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিতেও

সমান উদার। অতীব পবিত্র, সৎ ও শুদ্ধাচারী ব্যক্তিরূপে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর মার্জিত পরিচালনায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (যার যুক্ত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি স্বয়ং (1874), উপাসনা মন্দির ও ধর্মসভাতেই শুধুমাত্র রূপান্তরিত হয়নি, ক্রমশঃ শিক্ষাপ্রসার ও সামাজিক উন্নতি সাধনের কেন্দ্ররূপেও পরিণত হয়।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আনন্দমোহন মধ্যপন্থী ও সংবিধানের প্রতি অনুগত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন প্রগতিশীল এবং ব্যাপকতর কারিগরী শিক্ষা ও শিল্প-প্রসারের অন্যতম প্রথম সমর্থক।

আইনশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানী, বিখ্যাত ব্যবহার-জীবী আনন্দমোহন দেশমাতৃকার সেবার জন্যই এই বৃত্তিকে বরণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে দেশের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, অবসর ও স্বাধীনতা একমাত্র আইনজীবী রূপেই অর্জন করা সম্ভব। বাগ্মীরূপে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পরেই ছিল তাঁর স্থান। তবে, বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণে ও সংকল্পের একনিষ্ঠতায় তিনি সুরেন্দ্রনাথের চেয়েও নিপুণ বক্তা ছিলেন।

1905 সালের 16 অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতায় আহূত এক জনসভায় আনন্দমোহন যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, অতুলনীয় সেই বক্তৃতার জন্য দেশবাসী বিশেষ ভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। সেদিন বক্তৃতায় তিনি যে কথা বলেছিলেন, 1947 সালে সরকারী আদেশে দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে সেকথা ভাগ্যের করুণ পরিহাস বলে প্রতীয়মান হবে। রোগ-শয্যা থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপনের জন্য আহূত সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য। সেই সভাকে আনন্দমোহন 'এক মহান ও ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান' রূপে বর্ণনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে ঃ 'এই ঘটনা বাংলার ইতিহাসে চির-স্মরণীয় ও যুগান্তকারী ঘটনারূপে চিহ্নিত হবে।' তিনি আরও বলেন যে 'এই ফেডারেশন হল, যার ভিত্তিপ্রস্তর আজ স্থাপিত হচ্ছে শুধুমাত্র দেশের মাটিতে নয়, আমাদের বেদনাহত চিত্তে, এই স্মৃতি সৌধ আমাদের উত্তরসূরির কাছে একতারই প্রতীক-রূপে প্রতিভাত হবে।'

তাঁর জীবনের এই স্মরণীয় ঘটনার পরই আনন্দ-মোহন মাত্র ঊনষাট বছর বয়সে 1906 সালের 20 আগস্ট কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

[J. C. Bagal—Bharater Mukti Sandhani ;—Unabinsha Satabdir Bangla ; G. Natesan & Co—Indian Nation Builders ; H. P. Sarkar—Life of Ananda Mohan Bose ; S. N. Banerjea—A Nation in Making ; Sibnath Sastri—Ramtanu Lahiri o Tatkalin Banga Samaj ; Bangiya Sahitya Parisad (ed.)—Bharat Kosha ; Nababanhisikha, 1877 ; Sadharani, 1875 ; Amrita Bazar Patrika, 1875.]

সুজাতা ঘোষ **ক্ষিতীশ রায়**

আনন্দ রাজ সুরানা (১৮৯১—?)
Ananda Raj Surana (1891—?)

আনন্দ রাজ সুরানা 28 সেপ্টেম্বর 1891 সালে যোধপুরে এক মধ্যবিত্ত জৈন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা শেঠ চাঁদমল সুরানা এবং মা আনন্দ রাজ সুরানা বাঈ দুজনেই ধর্মপ্রাণা এবং দীন দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন। যোধপুরের সাধারণ দোকান-দার হলেও মাড়বারে জনগণের প্রতি তাঁর স্নেহভালবাসার জন্য 'কাকা' অথবা আঙ্কল হিসেবে অধিক পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে 1924 সালে তিনি নাসিরা-বাদ এবং অন্যান্য জবাই কেন্দ্রে যাতে গরু এবং স্ত্রী জাতীয় পশু পাঠানো বন্ধ হয় সেজন্যে সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য তিনি ধর্ণা দেন। এর ফলে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। গরু এবং অন্যান্য পশুদের জন্য সরকারী নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করে জনগণের জন্য তিনি সংগঠিত বাহিনী নিয়ে এক অবরোধ অভিযান চালান। এছাড়া জনগণের মনে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগানোর উদ্দেশ্যেও তিনি মাড়বার হিতকারী সভা নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

আনন্দ রাজ সুরানা তিনবার বিবাহ করেছিলেন। বিয়ের অল্প দিন পরেই প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার পাণি গ্রহণ করেন, তিনিও অল্পকাল রোগ-ভোগ করায় মারা যান। সুরানা 1935 সালে তৃতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁর তৃতীয় এবং বর্তমান স্ত্রীর নাম সন্তোষ সুরানা। তিনি কাবুল সরকারের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান ইঞ্জিনীয়ার প্রয়াত আত্মা রাম বেদীর

কন্যা। যোধপুর বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে আনন্দ রাজ মাত্র তৃতীয় স্টান্ডার্ড পর্যন্ত পড়েছিলেন । এবং হিন্দীতে বেশ ভাল এবং কাজ চালিয়ে নেবার মত ইংরেজীতেও জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জৈনধর্মের যত হিন্দী বই পেয়েছিলেন সমস্তই পড়েছিলেন এবং তার ফলে নিজের ধর্মের প্রতি তাঁর উৎসাহের পরিমাণ অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

যোধপুরে থাকাকালীন তিনি রাজস্থানের প্রখ্যাত নেতা পণ্ডিত জয়নারায়ণ ব্যাস এবং বনওয়ার লাল সরাফের রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রচারের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সুরানা 1909 সালে বিকানীরে রেল দপ্তরে একজন সিগন্যালম্যান হিসেবে মাসিক বার টাকা বেতনে যোগদান করেন এবং সেখানে ক্রমে মাসিক পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে প্রধান বুকিং ক্লার্কের পদে উন্নীত হন। 1923 সালে রাজনৈতিক কার্যকলাপে আরও সময় ব্যয় করার জন্য তিনি কর্ম থেকে ইস্তফা দেন। জাতীয়তাবাদী মত পোষণ করার জন্য এবং কংগ্রেস মনো ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে বিকানীরের বাইরে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে এই বৎসরের শেষাশেষি মহামান্য মহারাজা গঙ্গা সিং এর আদেশে তিনি বিকানীর থেকে নির্বাসিত হন।

বিকানীর থেকে বহিস্কৃত হবার পর সুরানা যোধপুরে ফিরে যান এবং তাঁর বাবা শেঠ চাঁদমলের সঙ্গে হাত মেলান। ইতিমধ্যেই চাঁদমল যোধপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য মাড়বারের অধিবাসীদের সংগঠিত করে তুলেছিলেন। কিন্তু আন্দোলনটি পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করার আগেই যোধপুর সরকার আঘাত হানেন, এর ফলে শেঠ চাঁদমল সুরানা অন্য দুজন সহকর্মীর সঙ্গে যোধপুর থেকে নির্বাসিত হন এবং আনন্দ রাজ এবং তাঁর ছজন রাজনৈতিক সঙ্গী জয় নারায়ণ ব্যাস সহ 'ভবঘুরে' হিসাবে ঘোষিত হন।

পুলিশের দশ নম্বর রেজিষ্টারে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হল এবং তারা পুলিশ কর্তৃক নানাভাবে নাজেহাল হতে লাগলেন।

সুরানার এই দুর্দশাগ্রস্ত দুর্বল অবস্থার দরুন তাঁর বন্ধু ভীনাসরের কানী রাম ভান্ডিয়া তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে তিন লাখ টাকা দিলেন কোন ব্যবসায় শুরু করার জন্য। এই সাহায্য মূলধন করে তিনি 1924 সালে দিল্লীতে 'ইন্দো ইউরোপীয় মেশিনারী মার্ট' নামে এক ব্যবসায়ী সংস্থা গঠন করেন। এবং এই ব্যবসা থেকে লাখ লাখ টাকা উপার্জনের পর 1945 সালে তিনি তাঁর ভাইপোর হাতে অবশেষে সেটিকে হস্তান্তরিত করলেন। ছাপাখানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে 1926 সালে মাত্র তিন হাজার টাকার মূলধন সম্বল করে তিনি 'ইন্দো ইউরোপ ট্রেডিং কোম্পানী' নামে আরও একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শুরু করলেন। এই কোম্পানীটি বর্তমানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে, সুরানা এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেকটর। এই ব্যবসায়টি এখন রমরমা অবস্থায় চলছে।

দিল্লীতে তাঁর ব্যবসা থাকা সত্ত্বেও যোধপুর ছিল সুরানার রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু, সেখানে প্রায়শই তিনি যাতায়াত করতেন। 1929 সালে ব্যাস এবং বনোয়ার লাল সরাফের সঙ্গে তিনি বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার হলেন। 124 (ক) ধারা অনুযায়ী বিশেষ প্রহসনের পর প্রত্যেককে পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। জেলে তাঁদের সঙ্গে ফৌজদারী আইনে অভিযুক্ত অপরাধীদের থেকেও খারাপ ব্যবহার করা হতো, বন্দীদের পোশাক পরতে বাধ্য করা হতো এবং সময়ে সময়ে নির্জন সেলে অন্তরীণ থাকতে হত। 1931 সালে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে তাঁরা মুক্তি পেয়ে যান।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে সুরানা যোধপুর থেকে বিতাড়িত হয়ে দিল্লীতে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করলেন এবং 'স্টেট পিপলস কংগ্রেস' এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। চাঁদনী চকে তাঁর অফিসটিই হল 'স্টেট পিপলস কনফারেন্সের' বেসরকারী অফিস। সেখানে তৎকালীন ভারতীয় সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতারা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সভাসমিতি এবং বিধিবহির্ভূত আলোচনার জন্য মিলিত হতেন।

তারপর এল 1942-এর ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন', জাতীয়তাবাদী নেতাদের ব্যাপক গ্রেপ্তার এবং দেশজুড়ে জনগণের অভ্যুত্থান। সুরানার গৃহ হয়ে উঠল দিল্লীর রাজনৈতিক বিখ্যাত কর্মীদের মিলন স্থল এবং যুগল কিশোর খান্না এবং অন্যান্য খ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী নেতারা ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর কুঠি এবং অফিসে পুলিশ হানা দেয়, সুরানা দিল্লীর বাইরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। বহিষ্কার সম্পর্কে এমন একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয় যাতে তাঁকে সামন্ত রাজ্যগুলিতেও গ্রেপ্তার করা যায়। পুলিশের থাবা

এড়ানোর জন্য গোপন আস্তানায় গাজিয়াবাদ, মীরাট, আজমীর, উদয়পুর, রায়পুর প্রভৃতি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সুরানা আত্মগোপন করে থাকতে লাগলেন।

1945-এ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর তিনি দিল্লীতে ফিরে এসে পুনরায় কংগ্রেসের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। 1952 নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন লাভ করে দিল্লীর রাজ্য বিধানসভার একটি আসনে জয়লাভ করেন। 1957 সাল পর্যন্ত এম. এল. এ.-র দায়িত্ব তিনি পালন করেন ভালোভাবে।

1960 সালে তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে অবসর গ্রহণ করেন এবং তারপর থেকে তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে রাজনীতির ক্ষেত্রটি ক্রমশই ক্ষমতালোভী বিবেকহীন লোকদের আখড়া হয়ে উঠছে। তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে অহিংসা, নিরামিষ ভোজনের সপক্ষে আন্দোলন, বিশ্বশান্তি এবং অন্যান্য মানবতাবাদী কার্যকলাপের প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। মহান জৈন ধর্মগুরু (মহাত্মা) মুনিশ্রী সুশীল কুমারজীকে তিনি পরমহংস গুরু হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর নির্দেশনায় জনহিতকর কাজ কর্ম নিয়ে মেতে উঠলেন। মহাত্মা মুনি শ্রীর নেতৃত্বে 1960 এবং 1965 সালে যে দুটি বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলন হয়েছিল তাতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ-গ্রহণ এবং অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তিনি 1966-67 সালের গো-হত্যা নিবারণ সমিতি সমর্থন করে-ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি ভারত গো-সেবক সমাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

সুরানা অতীতে ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বর্তমানে তিনি মানুষের দুঃখ দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রামী। তিনি দরিদ্র এবং অভাবী মানুষদের সাহায্য করার জন্যে "সুরানা বিশ্ববন্ধুত্ব ট্রাষ্ট" নামে একটি ট্রাষ্ট গঠন করেন। এই ট্রাষ্ট তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অহিংসা ও নিরামিষ ভোজনের পক্ষে বাণী প্রচার করত এবং এছাড়া অনাথ বিধবা ও গরীবদের জামাকাপড়, খাদ্য, ওষুধ এবং পড়াশোনার জন্য বৃত্তি দিত। তিনি দেশের বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনকে লাখ লাখ টাকা দান করেছেন।

খুব সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত তিনি জৈন-ধর্মের গভীর অনুরাগী। প্রাতঃকালে উঠে স্নানের পর তিনি প্রায় একঘণ্টা সময় ব্যয় করেন তাঁর 'সামায়িক' অথবা জৈন উপাসনায় এবং সূর্যাস্তের পর ধর্মীয় শাস্ত্রে সেরকম নির্দেশ আছে, কোনোরকম খাদ্য বস্তু গ্রহণ করা তো দূরের কথা তিনি ঠোঁট দিয়ে জল-স্পর্শও করেন না। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন সহৃদয়। তিনি অফিস যাওয়া আসার পথে বাসের জন্য অপেক্ষমান যাত্রীদের নিজের গাড়ীতে তুলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতেন। তিনি নিয়মিতভাবে খাদি পরিধান করেন। গান্ধী টুপি, ঝোলা এবং ধুতি তাঁর নিয়মিত পোষাক। তিনি হরিজন উন্নয়নের এবং বিধবা বিবাহের সমর্থক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অহিংসা নীতিতে অবিচল থাকতে পারলেই পৃথিবীর মুক্তি সম্ভব। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্য-জাতির সেবার মাধ্যমে প্রার্থনা করা। গুরু মহাত্মা মুনিজির আশীর্বাদ পুষ্ট অহিংসা গবেষণা সংস্থা এবং অহিংসা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

[The Weekly Citizens' Gazette, Delhi, dated 25 February 1968 ; The Praja Sewak (Hindi weekly), Jodhpur, dated 2 November 1966, 1 February 1967, 1 February 1968 ; The Tarun Jain (Hindi Weekly), Jodhpur, dated 1 March 1965 ; The Angar (Hindi weekly), Patna, dated 21 October 1967 ; Farewell addresses presented to Shri Surana ; The Veer Rajasthan (Hindi Weekly) Beawar, dated 3 November 1966.]

এল. দেওয়ানি **যশবন্ত সিং খিচি**

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-১৮৫৯)

Anandaram Dhekial Phukan (1829-1859)

"অসমীয়া গদ্যের জনক" আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন বহু বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী এবং একজন প্রখ্যাত লেখক। 1829 সালের 24 সেপ্টেম্বর তিনি গৌহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হোলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন একজন এ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি মার্জিত রুচিসম্পন্না মহিন্দ্রা

দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি গৌহাটি শুল্ক বিভাগের কর্মী পশুপতি ফুকনের কন্যা ছিলেন।

গৌহাটির ইংলিশ স্কুলে আনন্দরাম প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য খ্যাত ছিলেন। 1841 সালে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেখানে পড়াশুনা সমাপ্ত করা সম্ভব না হওয়ায় 1844 সালে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তবে কলকাতায় থাকাকালীন তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল, সীতানাথ ঘোষ এবং রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বাংলার প্রখ্যাত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর জীবনে এঁদের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে। তাঁর প্রগতিশীল ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পশ্চাতে নব যুগের আলোকধারা স্বরূপ এই সব ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শজনিত অমূল্য অবদান বড় কম নয়।

শিবসাগর থেকে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত "অরুণোদয়" নামক মাসিক পত্রিকায় মাত্র আঠার বছর বয়সে আনন্দরাম ঢেকিয়াল "ইংরাজ জাতির বিবরণ" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে পশ্চিমী নীতিতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা আধুনিক মানের বিজ্ঞানসম্মত করে তুলে, পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে ইংরেজদেরও অতিক্রম করে যাবার জন্য তাঁর দেশের জনসাধারণকে উদ্যোগী হবার আবেদন জানান। তিনি মনে করতেন এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা আসাম তার প্রতিবেশী রাজ্য উন্নততর বাংলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। বৃটিশ শাসনের প্রতি তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি এর ত্রুটিগুলিও উপলব্ধি করতে পারতেন এবং সদর আদালতের বিচারপতি A. J. M. Moffat Mills এর নিকট এই মর্মে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছিলেন। এই স্মারকপত্রে তিনি "Observations on the Administration of the Province of Assam" নাম দিয়ে তাতে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার ত্রুটি ও ব্যর্থতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ এবং এ বিষয়ে নিজের মতামত জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

বিদ্রোহপূর্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের প্রকৃত প্রতিভূ আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রাথমিকভাবে অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যে এক নূতন সত্তা ও শক্তি জাগ্রত করেছিলেন। তাঁরই অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে বিদ্যালয়, আদালত প্রভৃতি স্থানে বাংলা ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষা অসমীয়া ভাষার ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। "অরুণোদয়ে" প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি আসামের উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতি তাঁর ঘনিষ্ঠ মনোযোগ এবং তাঁর উচ্চাদর্শ ও দেশপ্রেমের সাক্ষ্য বহন করে।

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন শান্ত, অমায়িক এবং মিতাচারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কারুর বিরুদ্ধে তিনি মনে কোন বিদ্বেষ বা বিরূপতা পোষণ করতেন না। ধর্মগতভাবে রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও অন্য ধর্মের মূল সত্যোপলব্ধিকে গ্রহণ করতে তাঁর কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। 1859 সালের 18 জুন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিরল প্রতিভাধর আনন্দরাম স্বল্পায়ু হওয়াতে অল্পকালই মাতৃভূমির সেবা করতে পেরেছিলেন।

[Baruah, Gunaviram—Anandaram Dhekial Phukan Jibon Charitra, 1915; Barpujari, H. K.—Assam in the Days of the Company; Bhattacharjee, Jotindramohan—Holiram Dhekial Phukan Rachita Assam Buranji, Preface; Dhekial Phukan, Anandaram—A few remarks on the Assamese Language, 1855; Gohain Barua, Padmanath—Jibani-Sangrah; Goswami, Jatindranath—Anandaram Dhekial Phukan Satabarshiki Sowarini (Assam Sahitya Sabha); Goswami, H. C.—Asomiya Sahityar Chaneki, Vol. III, Pt. I; Mills, A. J. M.—Report on Assam, Calcutta, 1854; Neog, Maheswar—Asomiya Bhasha: Anandaram Dhekial Phukan Rachita (Assam Sahitya Sabha); Neog, Dimbeswar—New Light on History of Asomiya Literature; Asamer Naba Jagaraner Bhagirath Monisi Anandaram Dhekial Phukanar Mritu Satabarshiki, in Yugantar, Asar, 1366 B. S. (1959).]

(এ. সি. ভূঞা) কে. এন. দত্ত

আনন্দরাম বড়ুয়া (১৮৫০-১৮৮৯)

Barooah Anundoram (1850-1889)

উত্তর গুয়াহাটির রাজা দুয়ারে 1950 সালের মে মাসে গঙ্গারাম বড়ুয়া ও তাঁর প্রথমা স্ত্রী দুর্লভেশ্বরীর তৃতীয় পুত্র আনন্দরামের জন্ম হয়। বংশের পূর্বপুরুষ মানিক চন্দ্র সুখাম্ফা নামে অহোম রাজার (1552-1603) মাজিন্দার বড়ুয়া (মুখ্য সচিব) ছিলেন। গঙ্গারাম বড়ুয়াই অহোম্ রাজাদের শেষ মাজিন্দার বড়ুয়া। সংস্কৃতে পণ্ডিত, গঙ্গারাম ব্রিটিশ সরকারের এক সদর আমিন (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) পদে নিযুক্ত হন। তাঁর দুই পত্নীর মধ্যে, আনন্দরামের মাতা দুর্লভেশ্বরী উত্তর আসামের দোয়েরা পরিবারেব কন্যা।

অকৃতদার আনন্দরাম নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত সাহিত্যের সেবা করেন। গ্রন্থগারই তাঁর জীবনসঙ্গী ছিল।

সংস্কৃতের প্রাথমিক পাঠ আনন্দরাম গৃহেই লাভ করেন। মাত্র 14 বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ 'অমরকোষ' কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন বলে শোনা যায়। 1864 সালে গুয়াহাটি থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আসেন কলেজে পড়াশোনা করার জন্য। 1866 সালে প্রথম শ্রেণীতে ষষ্ঠ স্থান ও ডাফ বৃত্তি লাভ করে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই প্রশংসনীয় ফলের জন্য তাঁকে বিলাতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য স্টেট স্কলারশিপ এবং গিলক্রিসট্ স্কলারশিপে মনোনয়ন করা হয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে, 1871 সালে গণিতে সকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মিডল টেম্পলে আইন পড়ার সময় 1872 সালে ব্যারিস্টারীও পাশ করেন।

কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি যেমন গুরুদাস ব্যানার্জী (পরে যিনি 'স্যর' উপাধি পান) এবং মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সংস্পর্শে এসে সংস্কৃত ও গণিত শাস্ত্রে উৎসাহিত বোধ করেন। বিলাতে থাকার সময় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ফ্রেডরিক ম্যাকস্মুলারের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার স্যর তারকনাথ পালিত ও বোম্বাইয়ের প্রথম আই. সি. এস. শ্রীপাদ বালাজি ঠাকুরের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

1872 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করার পর আসামের শিবসাগর জেলার অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। অবিভক্ত বাঙ্গার বহু জেলায় কাজ করেন এবং পরে রাণীগঞ্জ ও কোটোওয়ারার এস্. ডি. ও. পদ লাভ করেছিলেন। 1881 সালে দীর্ঘ অবকাশ নিয়ে বিলেতে পাড়ি দেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। 1883 সালে পুনরায় ভারতে ফিরে এসে প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরে যশোরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। 1884 সালে নোয়াখালির ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কাজ করার পর, 1885 ও 1886 সালে ত্রিপুরা ও বগুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করেন।

জীবনে অত্যধিক পরিশ্রম ও পড়াশোনা ক্রমান্বয়ে তাঁর স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে ওঠে, তাই 1889 সালের জানুয়ারী মাসে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন। শারীরিক অবস্থার ক্রমশই অবনতি হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত জীবনের শীর্ষে থাকতে থাকতেই সেই বছরের 19 জানুয়ারী তাঁর প্রিয় বন্ধু স্যর তারকনাথ পালিতের কলকাতার আবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত আনন্দরাম সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করে মূল্যবান ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিলেন, এবং 39 বছরের স্বল্প জীবনে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে প্রায় 12 টি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে 'A Practical Sanskrit—English Dictionary' Vol. I, (1877), Vol. II (1878), Vol. III (1880) Bhababhuti's Mahabircharitam' (টীকা সমেত সংস্কৃত থেকে ইংরেজী ভাষার অভিধান) (1877), 'Bhababhuti and his place in Sanskrit Literature', রামজীবনের একটি কালানুক্রমিক বিবরণী (1878), 'A Comprehensive Grammar of the Sanskrit Language ; Vol. X Prosody (1882), Vol. III এবং বামণ সূত্র-বৃত্তি, ভাগবতালঙ্কার, সরস্বতী কান্থাভরণ (1883) উল্লেখযোগ্য।

শৈশব থেকেই মানুষের সাহচর্যের চেয়ে বইয়ের সঙ্গ আনন্দরামের কাছে ছিল প্রিয়তর। এক নীরব কর্মী, বিনয়ী, পণ্ডিত এবং নিজের মতামতে স্বাধীনচেতা, তাঁর পাণ্ডিত্যের গুণে, শাসন দক্ষতায় এবং স্বমর্যাদা রক্ষার সত্তা-বোধ শক্তি দিয়ে তিনি তাঁর আই. সি. এসের চাকুরী ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সহকর্মীদের মধ্যে এক সম্মানীয় স্হান লাভ করেছিলেন। তিনিই আসামের প্রথম সিভিলিয়ান।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা ছিল আনন্দরাম বড়ুয়ার আজীবনের অনুরাগ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

শিক্ষার সংমিশ্রণ তাঁর রচনাকে করে তুলেছিল অতি উজ্জবল। মূলত মাত্র 12 বছরের মধ্যে তাঁর বিশাল রচনা সম্ভার নিঃসন্দেহে উত্তরপুরুষের কাছে এক উৎসাহের ভাণ্ডার হয়ে থাকবে।

[S. K. Bhuyan—Anundoram Borooah ; P. N. Gohain Borooah (ed.)—Jeevani Sangrah.]

যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী

আনন্দ (স্বামী) (১৮৮৭—?)

Anand (Swami) (1887—?)

1887 সালে কাথিয়াবাড়ের লিম্বাডির নিকট একটি গ্রামে স্বামী আনন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জুনাগড় রাজ্যের একজন শিক্ষক ছিলেন। যখন তাঁর দশ বছর বয়স সেই সময় কয়েকজন সাধু তাঁকে অপহরণ করে তাঁকে শেষ পর্যন্ত হিমালয়ে নিয়ে যান। তখন তাঁর নাম ছিল হিম্মতলাল। 1901 সাল থেকে 1905 পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কেন্দ্রে পড়াশুনা করেছেন এবং এই সময় তিনি নিজেকে রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের একজন সাধু বলে মনে করতেন।

1907 সাল নাগাদ বাঙ্গালী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে এবং এই সময় থেকেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। উগ্রপন্থীদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের ফলে তিনি মারাঠী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং কিছু দিনের জন্য তিনি পুনা থেকে প্রকাশিত "তরুণ হিন্দু" নামক একটি মারাঠী সাপ্তাহিকী পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজেও সাহায্য করেন। শীঘ্রই তিলকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি তিলকের বিখ্যাত পত্রিকা "কেশরী" তে কাজ শুরু করেন। সেই সময় তিনি মহারাষ্ট্রের নানা অঞ্চল ভ্রমণ করে সেখানকার অধিবাসীদের কাছে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন।

1917 সালের শেষার্ধে আমেদাবাদে স্বামী আনন্দ গান্ধীজির সঙ্গে মিলিত হন এবং পরবর্তী দুবছর পুনা এবং সবরমতীর মধ্যে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। 1918 সালে গান্ধীজি "নবজীবন" এবং তার অল্প কিছুদিন পরে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বামী আনন্দের উপর প্রকাশনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন প্রেস ম্যানেজার এবং সেই সঙ্গে একাধারে সম্পাদক, মুদ্রক (কমপোজার), প্রুফ সংশোধক এমন কি পিয়ন পর্যন্ত। 1920 সালে তিনি মহাবালেশ্বরের কাছাকাছি এক জায়গায় তিলক ও গান্ধীর এক সাক্ষাতের আয়োজন করেছিলেন। সেই বছরে তিলক পরলোক-গমন করেন এবং স্বামী আনন্দ সর্বান্তঃকরণে গান্ধী শিবিরে যোগদান করেন। তিনি মহাদেব দেশাই, নরহরি পারেখ, কিশোরীলাল মশরুওয়ালা এবং গান্ধীজির অন্যান্য শিষ্যদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী ছিলেন। 1918 থেকে 1928 সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সবরমতী আশ্রম আয়োজিত সর্বপ্রকার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। 1928 সালে বরদোলি সত্যাগ্রহের সময় তিনি সর্দার প্যাটেলের সহকারী ও সচিবরূপে কাজ করেছিলেন। 1930 সালে স্বামী আনন্দ ভিলে-পার্লের (বোম্বাই) শিবির থেকে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। তিন বছর পর মুক্তি লাভ করে তিনি থানায় একটি গান্ধী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মহাদেব দেশাই-এর অগ্রজ ছোটুভাই দেশাই-এর সঙ্গে একযোগে তিনি ঐ জেলার আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করেন। 1945 থেকে 1947 সাল পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ গুজরাটের বোরদি ও ভাপি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কাজ করেন। 1947 সালে শিয়ালকোট ও হরিদ্বারে তাঁকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকাজে লিপ্ত দেখা যায়।

স্বাধীনতার পর স্বামী আনন্দ হিমালয়ে চলে যান। তিনি আলমোড়া জেলার কৌশানিতে তাঁর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। 1957 সালে তিনি ডাহানু-র নিকট কোসবাদ-এ নেমে আসেন এবং ঐ অঞ্চলে গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত হন।

স্বামী আনন্দ একজন বিশিষ্ট গুজরাতী লেখক-রূপে সুপরিচিত। ভাবপ্রকাশের স্পষ্টতা ও ভাষার সারল্য তাঁর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য। তিনি নানা বিষয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর "কুলকথাও" গ্রন্থটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বোম্বাইতে আগত কিছু ভাটিয়া পরিবারের জীবনেতিহাস। তিনি ইংরেজি ও গুজরাতী ভাষায় প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করেছিলেন। হিমালয়ের প্রতি গভীর ভালবাসা তাঁকে মানস সরোবর ও কৈলাস পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল। অনুবাদক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল অপরিসীম এবং কথ্য গুজরাতীতে তিনি বাইবেল অনুবাদ করেন। তিনি 'ঈশভাষ্য উপনিষদ'ও গুজরাতীতে অনুবাদ করেন।

1909 সাল থেকে 1912 সালের মধ্যে অল্প কিছু দিনের জন্য তিনি অ্যানি বেসান্ত পরিচালিত একটি বিদ্যালয় এবং আলমোড়ার একটি কলেজে ধর্মীয় শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষকতার এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে শিক্ষকবৃত্তির অনুশীলন করতেন।

সমাজের প্রতি আনন্দ স্বামীর সবচেয়ে বড় অবদান এই যে সাধু হওয়া সত্ত্বেও তিনি শুধু সাধু সুলভ লোক সম্পর্ক বর্জিত আধ্যাত্মিকতার দুর্গেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি—বিগত অর্ধশত শতাব্দীকাল তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে সক্রিয়ভাবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। বিহারে ভূমিকম্পের সময় তিনি পীড়িত জনগনের ত্রাণ কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি গুজরাতের বন্যাত্রাণ এবং দেশ বিভাগের পর পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকার্যে লিপ্ত ছিলেন ও হরিজনদের মন্দির প্রবেশ আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দান করেন। বিপ্লবী হিসাবে তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও গান্ধীজীর সংস্পর্শে তিনি অহিংসাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। পার্থিব নানা কাজে জড়িত থাকলেও স্বামী আনন্দ ছিলেন নিস্পৃহ এবং সেবাব্রতী।

[Interviews with Swami Anand (1966, Feb. ; Dec., '67 ; & Jan., '68) ; Files of Samskriti, a Gujarati monthly published from Ahmedabad, 1950 onwards ; Bhatt, Nanabhai,—Pathari Man Padya Padya (Gujarati) ; Kalelkar, Kaka,—Kalelkar na Lekho (Ahmedabad : 1924 : Gujarati) ; Himalaya no Pravas (A'bad : Gujarati) ; Issues of Samarpana, a fortnightly published by the Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay ; Issues of Milap, a Gujarati monthly digest published from Bhavnagar ; Anand Swami,—Kulakathao (1967 : Gujarati : A'bad) ; Manavata na Veri (1966 : Guj : A'bad) ; Anant Kala (1967 ; Guj : A'bad) ; Navatan Darshan ; Baraf Raste Badrinath ; Asia nan Bhraman ane Samshodhan, 2 pts. (Guj : 1964-65 : A'bad) ; Across Gangotri Glaciers (Bombay : 1961) ; A letter from Shri Bhaidas Parikh of Bal Govind Prakashan, A'bad (21.12.67).]

অপর্ণা বসু

আনাপ্পরামবিল যোশেফ জন (১৮৯৩-১৯৫৭)

Anapparambil Joseph John (1893-1957)

এ. জে. জন 1893 সালের 18 জুলাই ত্রিবাংকুর রাজ্যের থালাওলাপারাম্বুয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা যোশেফ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। মা মেরীর পিতৃগৃহ ছিল পাশাপাশি অবস্থিত ভাদায়ার গ্রামে। তাঁরা দুভাই ও দুবোন। তাঁর বাবা ও মা দুজনের পরিবারই ছিল সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত সিরীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের।

জন কৈনাত্তির সচ্ছল অবস্থাপন্ন ইপেন দেবাসিয়ার কন্যা মেরীকে বিবাহ করেন। তাঁদের কোনও সন্তানাদি ছিল না।

থালাওলাপারাম্বুয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে জন ভাইকম-এর সরকারী হাইস্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি ত্রিচিনোপল্লীর সেণ্ট যোসেফ কলেজ থেকে স্নাতক হন এবং তারপর মাদ্রাজের লায়োলা কলেজে পড়াশোনা করতে থাকেন। সেখান থেকে তিনি বি. এল. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি ত্রিবান্দ্রমে আইনব্যবসা শুরু করেন।

বাড়ির ধর্মীয় পরিবেশ খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর মা বাবার আনুগত্য, বাইবেলের শিক্ষা, জেসুইট ধর্মযাজকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং উদারনৈতিক শিক্ষা দীক্ষা তাঁর চরিত্রের মূল্যবান উপাদানগুলি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

জন যখন আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত সেই 1920 সাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি জনজীবনের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সাধারণের জন্য তার সমস্ত কাজকর্ম ত্রিবাংকুর রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শুধুমাত্র শেষ বছরটিতেই জনসেবামূলক তাঁর কাজের পরিধি প্রসার লাভ করেছিল ত্রিবাংকুরের বাইরে।

1920 সাল থেকে 1948 সাল পর্যন্ত তিনি ত্রিবাংকুরের সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। 1920-23 সালে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সামাজিক অধিকার লাভের যে

আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দান করেছিলেন। হিন্দু সাধারণের মন্দিরগুলির পরিচালন ব্যবস্থা তিনি রাজস্ব বিভাগের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে মন্দিরগুলি জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি ছিলেন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনেরও মুখ্য প্রবক্তা।

1932-34 সালের মদ্যপান নিরোধক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন জন। 1934 সালে এই আন্দোলনের সমর্থনে ত্রিবাংকুর মহারাজের যে প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন জন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁদের দাবি ছিল রাজ্য বিধানসভায় ও শাসন-ব্যবস্থার চাকুরিতে সব শ্রেণীর জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সহ প্রয়োজনীয় আইনের সংস্কার।

ত্রিবাংকুর রাজ্য কংগ্রেসের 1938-48 তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-নেতা, যতদিন রাজ্য কংগ্রেসের অস্তিত্ব ছিল ততদিন তিনি এর কোষাধ্যক্ষ এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। দায়িত্বশীল সরকার গড়ে তোলাই ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। একবার সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁকে কারাগারেও থাকতে হয়েছিল। 1940 সালে দেওয়ান সি. পি. রামস্বামী আয়ারের প্রস্তাবিত স্বাধীন ত্রিবাংকুর রাজ্য গঠনের পরিকল্পনার তিনি বিরোধিতা করেছিলেন।

1937-40 এবং 1948-49 তিনি ত্রিবাঙ্কুর আইনসভার সদস্য ছিলেন। মহারাজা কর্তৃক গঠিত সংস্কার কমিটিরও তিনি ছিলেন সদস্য। দায়িত্বশীল সরকার গড়ে ওঠার পর জন রাজ্য বিধানসভায় প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 1948 সালে তিনি রাজ্য গণ-পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন। 1949-55 সাল পর্যন্ত একটানা তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। 1952-54 সালে ত্রিবাংকুর কোচিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদ তিনি অলংকৃত করেছিলেন।

1956 সালে জনকে মাদ্রাজের রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়। 1957 সালের 1 অক্টোবর কর্মরত অবস্থায় তাঁর অবসরহীন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সাধারণ জাঁকজমকহীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত জন ছিলেন ভদ্র এবং ন্যায়পরায়ণ। সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি তাঁর মনোভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি প্রগতিশীল মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, বৈপ্লবিক ধারায় নয়। তিনি পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা করতেন। তিনি স্কুল জাতীয়করণের বিরোধী ছিলেন এবং প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করার সমর্থক ছিলেন।

তিনি কুটির শিল্পে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু সেইসঙ্গে আধুনিক বৃহদাকার শিল্পের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতেন। ভূমিসংক্রান্ত আইনের পুনর্বিন্যাস সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ ছিল।

জন শক্তিশালী বক্তা অথবা লেখক ছিলেন না। কম কথার মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর বক্তব্য ছিল যুক্তিপূর্ণ। এইজন্য তা শ্রোতাদের বিশ্বাস উৎপাদন করত। তাঁর সহজাত সরলতা, আত্মসংযম, যুক্তিশীলতা, খৃষ্টধর্মানুরাগ এবং একনিষ্ঠ সততা তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

ত্রিবাংকুর রাজ্য কংগ্রেস 1948 সালে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত ত্রিবাংকুরের বাইরে জনগণের সঙ্গে জনের খুব কমই যোগাযোগ ছিল। এই কারণে তিনি সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হননি।

[A. J. Moideen Kunj and P. A. Abdul Rahman Kutty (Eds.)—Kottayam District Directory, Alwaye, 1963 ; E. M. Kovoor —T. M. Varghese (a biography in Malayalam), Kottayam, 1965 ; The Malayala Manorama (Kottayam) Files (1957-63) ; The Kerala Sabdam (Malayalam weekly from Quilon) Files (1965-66) ; The Malayalam Rajyam (daily Quilon). 2 October 1957 ; The Kerala Kaumudi (daily, Travandrum), 27 September 1966 ; Personal interviews of the Research Fellow with C. Narayan Pillai (a co-worker in the Travancore State Congress movement) A. J. George (a nephew of A. J. John) and Vaikom Shamsudeen, Chief Organiser, Bharat Sevak Samaj, Thalayolaparambu, Vaikom.]

এন. এম. কে. নায়ার — পি. কে. পানিক্কর

আন্নাদানাপ্পা দোদ্দামেতি (১৯০৮–১৯৭২)

Annadanappa Doddameti (1908-1972)

1908 সালের 16 মার্চ আন্নাদানাপ্পা দোদ্দামেতি ধারওয়ার জেলার রোন তুলকের অন্তর্ভুক্ত

জককালি নামে একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জ্ঞানাপ্পা দোদ্দামেতি ছিলেন একজন জমিদার। তাঁর মা বাস্বাম্মা। 1925 সালে আন্নদানাপ্পা একসাথে দুটি বালিকার পানিগ্রহণ করেন এবং 1930 সালে তার আবার বিবাহ হয়। তাঁর দুজন স্ত্রী জীবিত আছেন। আর আছে ছয় কন্যা এবং তিন পুত্র।

1925 সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। এই কারণে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের পর তিনি আর তাঁর পড়াশুনা চালাতে পারেন নি।

1930 সালের 13 এপ্রিল তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং বিদেশী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলে খদ্দর পরতে শুরু করেন। ডাণ্ডি সত্যাগ্রহের সময় গান্ধীজির আহ্বানে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গদাগ-এ ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। এখানে তিনি জনসভা ডাকতেন, ভাষণ দিতেন এবং জনসাধারণকে দলে দলে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাতেন। 1931 সালে তিনি জওহরলালকে তার বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানালেন এবং এর ফলে পুলিশ তার বাড়ি তল্লাশি করে তাঁর রাইফেল নিয়ে চলে যায়।

1930 সালে তিনি কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সর্বাধিনায়ক হলেন। 1933 সালের জানুয়ারি মাসে যখন আঙ্কোলাতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় তখন পুলিশের হাতে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলেও কিছু কিছু অঞ্চলে তাঁর চলাফেরা কাজকর্ম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কয়েকদিন পরেই তিনি আবার বন্দী হলেন এবং বিচারে তাঁর দু হাজার টাকা জরিমানা ও এক বছরের জন্য জেল হল। তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জরিমানার টাকা আদায় করা হলো।

জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি ধারওয়ারে হরিজনদের আন্দোলনে যোগ দেন এবং হরিজন সেবক সংঘের সভাপতি হন। 1934 সালে গান্ধীজি যখন ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন তিনি তখন তাঁকে তাঁর গ্রামে আমন্ত্রণ জানান। এই উপলক্ষ্যে হরিজনদের উন্নতিসাধনের জন্য দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হল এবং হরিজনদের ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল পত্র নষ্ট করে ফেলা হল।

1937 সালে কংগ্রেস দল যখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তখন তিনি উত্তর ধারওয়ার কেন্দ্র থেকে বোম্বাই বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হলেন। বিধানসভার সদস্য হয়ে তিনিই সর্বপ্রথম কানাড়া ভাষায় সেই কক্ষে বক্তব্য রাখলেন। 1940 সালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ শুরু করেন এবং এক বছরের জন্য কারারুদ্ধ হলেন। তখন তাঁর মা মৃত্যু শয্যায়। সরকার তাঁকে শর্তাধীনে মুক্তি দিতে চাইলেন কিন্তু তিনি এই শর্তে রাজী হলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তাঁর মা বন্দী জীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। গান্ধীজি তাঁকে এবং তাঁর মাকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখেছিলেন; সেই চিঠি সংরক্ষিত আছে গান্ধীমণ্ডপে। মুক্তিলাভের এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর মার মৃত্যু হয়।

1942 সালের আগস্ট মাসে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং দুবছর নয় মাসের জন্য তাকে বন্দী জীবন যাপন করতে হয়। তাঁকে বেলগাঁও সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছিল এবং তাঁর মেয়ের বিয়েতেও তাঁকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। 1947 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচনে তিনি বোম্বাই বিধানসভায় পুনঃনির্বাচিত হন। কর্ণাটকের সংযুক্তির জন্য তিনি একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করলে বিধানসভায় সেটি অনুমোদন লাভ করে। কর্ণাটকের গঠনের জন্য তিনি তাঁর বিক্ষোভ চালাতেই থাকেন এমনকি 1954 সালে বোম্বাই পরিষদের সদস্যপদ থেকেও তিনি ইস্তফা দেন। 1956 সালে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন করা হলে তিনি মহীশুর পরিষদের সদস্য হন। সেই সময় থেকেই তিনি মহীশুর রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে কর্ণাটক করার জন্য দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করে চলেছিলেন। 1962 এবং 1967 সালে তিনি মহীশুর পরিষদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন।

1932 সাল থেকে 1948 পর্যন্ত তিনি জমাখণ্ডি স্টেট পিপলস কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই রাজ্যটি ভারতীয় যুক্ত রাজ্যের অঙ্গীভূত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হরিজন সেবক সংঘেরও সভাপতি ছিলেন।

1968 সালে তিনি বীরেন্দ্র পাতিল মন্ত্রী সভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। তাঁকে ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প এবং পেনশন প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মন্ত্রী থাকাকালে তিনি জলসেচের সুবন্দোবস্ত এবং অন্যান্য কয়েকটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে কৃষিজীবিদের প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন।

1972 সালের 21 ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

[G. S. Halappa—History of the Freedom Movement in Karnataka, Mysore, 1964 ; Personal interviews of the contributor with Anandanappa Doddameti.]

কে. বীরথাপ্পা

আন্নাবাবাজী লাঠটে (? —১৯৫০)

Anna Babaji Latthe (? —1950)

মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত অব্রাহ্মণ নেতা আন্না বাবাজী লাঠটের জন্ম তারিখ সঠিক জানা যায়নি। মহারাষ্ট্রের কুরুন্দাবাদের এক সমৃদ্ধ মারাঠী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বাবাজী লাঠটে ছিলেন এক ধনী ব্যবসায়ী। আন্না বাবাজী লাঠটে দুবার বিবাহ করেছিলেন। 1914 সালে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

লাঠটের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল তাঁর জন্মস্থান কুরুন্দাবাদে এবং মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করেছিলেন সাংলি এবং মিরাজে ; পরে পড়াশুনা করেছিলেন কোলহাপুরের রাজারাম কলেজ এবং পুনার ডেকান কলেজে। সাহিত্যে স্নাতক হওয়ার পর 1918 সালে বোম্বাই সরকারী আইন কলেজ থেকেই তিনি আইনের ডিগ্রী অর্জন করেন।

যৌবনে তিনি জাস্টিস রাণাডে এবং আগারকরের রচনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিছু দিনের জন্যে তিনি কোলহাপুরের রাজারাম কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন এবং তারপর কোলহাপুরের মহারাজার আইন সংক্রান্ত উপদেষ্টা ও দেওয়ান হয়েছিলেন। জৈনধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সত্যশোধক সমাজের কাজকর্মে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। মহারাষ্ট্রে নারী জাতির মুক্তি আন্দোলনকেও তিনি সমর্থন করতেন।

কোলহাপুরে মহারাজ শাহু ছত্রপতির প্রভাবে তিনি খুব প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি মহারাজের শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কার্যকলাপ সমর্থন করতেন। তিনি পাশ্চাত্যের উদার শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে এ ধরনের শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গীকে উদারপন্থী করে তুলতে পারে। তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাইতেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একথাও বিশ্বাস করতেন যে যতদিন হিন্দুরা তাদের জঘন্য বর্ণভেদ প্রথাকে দূরে সরিয়ে দিতে না পারে ততদিন প্রকৃত স্বাধীনতা কখনই সম্ভব হবে না। তিনি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করতেন এবং আশা পোষণ করতেন যে উদার এবং মুক্ত সমাজ সৃষ্টি সক্ষম হলে ভারতীয়রাও রাজনৈতিক অভীষ্ট লক্ষ্যে পেঁছতে পারবে।

কোলহাপুর রাজ্যের আইন উপদেষ্টা হিসেবে তিনি গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী ভারতীয় শাসকদের বিশেষ মর্যাদার জন্য সওয়াল করেন। একজন সাবলীল লেখক হিসেবে তিনি 'প্রগতি' নামে একটি সাপ্তাহিকী পরিচালনা করতেন। এই পত্রিকাটি অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের সুযোগে একান্তভাবে নিয়োজিত ছিল। শাহু মহারাজের মৃত্যুর পর তিনি দুখণ্ডে মহারাজের জীবনী প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি 'The Problems of Indian States' নামে একটি বইও লিখেছিলেন। লাঠটে ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ জৈন, 'An Introduction to Jainism' বইখানিরও তিনি রচয়িতা। তিনি মারাঠী ভাষায়ও দুটি বই লিখেছিলেন, একটির বিষয়বস্তু ছিল পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যটির ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির উত্থান।

বোম্বাই প্রদেশে, ভারতীয় ইউনিয়নে, কোলহাপুরে জনসাধারণের উন্নয়নপন্থী প্রতিটি কার্যের রূপায়ণে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিশ দশকের এক সময় তিনি কেন্দ্রীয় বিধানসভার সদস্য ছিলেন। ভারতবর্ষ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের (Provincial Autonomy) অধিকার লাভ করার পর প্রথমবারের নির্বাচনে বোম্বাই বিধানসভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করে সদস্য নির্বাচিত হন।

1935 সালের আইন অনুসারে গঠিত প্রথম বোম্বাই প্রাদেশিক সরকারের তিনি ছিলেন অর্থমন্ত্রী। ক্ষমতালাভের পরেই পল্লী অঞ্চলের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করেন এবং পরিষদের মাধ্যমে ঋণ মকুব এবং কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেন। কোলহাপুরের

দেওয়ানর্পে তিনি 'দক্ষিণী রাজ্য গ্রুলির প্রজা পরিষদ' এবং রাজ্য জনপ্রতিনিধি সম্মেলনে, সভাপতিত্ব করেছিলেন।

1942-এর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে' তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি। এই কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর আধিপত্য হারিয়ে ছিলেন। অবশ্য যদিও শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় অভিজ্ঞতা এবং আইন সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান থাকার জন্য 1946 সালে তিনি গণপরিষদের (Constituent Assembly) কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় 1950 সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

অনুন্নত সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ অধিকার অর্জনের জন্য তিনি যে সংগ্রাম চালনা করেছিলেন সেজন্য দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করবে।

[Anna Babaji Latthe's numerous publications, information supplied by his son —B. A. Latthe.]

সরোজ এ. দেশপান্ডে **ভি. ভি. রাও**

আবদ্রের রহমান, ম্রহম্মদ (স্যার) (১৮৮৮-১৯৬২)
Abdur Rahman Muhammad (Sir) (1888-1962)

আবদ্রের রহমান দিল্লীর এক সম্ভ্রান্তশালী পরিবারে 1888 সালের 5 অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর সেন্ট স্টিফেনস্ কলেজে তিনি পড়াশ্রনা করেন। সেখান থেকে 1907 সালে কলাবিদ্যায় স্নাতক হন। তারপর তিনি লাহোর যান এবং 1910 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. বি. পরীক্ষা পাশ করেন। 1905 সালে তিনি বিবাহ করেন, স্ত্রীর নাম জামিয়া-উন্নিসা-বেগম।

1910 সালে লাহোর হাইকোর্টে একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শ্ররু হয় এবং খ্রব শীঘ্রই আইন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি দিল্লীতে কর্মস্থল পরিবর্তন করেন। সেখানেই শ্ররু হয় তাঁর জনসেবামূলক জীবন। 1924 সালে তিনি দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট হন, 1928 সাল পর্যন্ত এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদে থাকার সময় তাঁর ক্ষমতা অন্যযায়ী তিনি শ্ব্রধ্ব মাত্র পৌরসভার প্রশাসনের উন্নতির জন্যই অনেককিছু করেননি, পৌর অধিবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা হ্রাস করার জন্যও তিনি চেষ্টা করেন। সরকার তাঁকে 'খান বাহাদ্রর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর আসল উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দ্র ছিল শিক্ষাক্ষেত্র। 1927 থেকে 1934 সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যক্ষ, 1930 থেকে 1934 সাল পর্যন্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। 1931 থেকে 1934 এর মধ্যে তাঁর সমাবর্তন উৎসবের ভাষণগ্রুলির মধ্যেই শিক্ষাসম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। কলাবিদ্যার উপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে বাঁধাধরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার তিনি বিরোধী ছিলেন এবং প্রয়োগমুখী শিক্ষার, বিশেষতঃ ফলিত বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধাগ্রুলির জন্য বিশেষ তালিমের প্রয়োজনীয়তা তিনি অন্যভব করতেন। দেশের শিল্পবিকাশের জন্য এর প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অত্যন্ত আবশ্যিক বলে মনে করতেন। একমাত্র তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্ররানো আমলের বড়লাটের গৃহে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 1934 সালের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সংশয়াতীত মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং বিকেন্দ্রিত ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করার প্রথম পরিকল্পনার উল্লেখ করেন।

আবদ্রের রহমানের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ছিল একজন আলোকপ্রাপ্ত নরমপন্থীর দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত। তিনি নিজেকে কখনোই সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে যেখানে তিনি যুবকদের বলেছেন নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, শিল্পের বিকাশ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসার ঘটাতে।

1937 সালে তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। 1943 সালে লাহোরে স্থানান্তরিত হয়ে তিনি পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিয্রক্ত হন। একই সঙ্গে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও নির্বাচিত হন এবং 1947 সাল পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশ বিভাগের পরেও তিনি একই সঙ্গে পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই দুই পদেই বহাল থাকেন। 1950 সালে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রীয়

কোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। 1947 সালে দেশ বিভাগের আগে প্যালেস্টাইনের ওপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ কমিটিতে তিনি ভারতের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন এবং সেখানে প্যালেস্টাইনের ভাগাভাগির ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সুপারিশের বিরুদ্ধে নিজ মত ব্যক্ত করেন। সংখ্যালঘিষ্ঠদের তরফের রিপোর্ট তিনিই প্রস্তুত করেন।

আবদুর রহমান শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্য অনেক দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন সেইজাতের আলোকপ্রাপ্ত নরমপন্থী ভারতীয় যিনি সক্রিয় রাজনীতি পরিহার করে দেশের মঙ্গলের জন্য গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। 1962 সালে তিনি পরলোক গমন করে।

[Proceedings, Foreign and Political Department, 1928-1936 ; Barque's Pakistan Trade Directory and Who is Who 1954: Editor A. M. Barque (Lahore 1954); Pakistan Year Book and Who is Who 1951 (Lahore 1951—Urdu) ; Delhi University Convocation Addresses—1930-1934 ; Indian Year Book, 1937-1938 (Calcutta 1938)]

(টি. আর. শারীণ) বর্থসিম্ সিং নিঝ্ঝর

আবদুর রহিম (স্যার) (১৮৬৭-১৯৪৭)
Abdur Rahim (Sir) (1867-1947)

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় 1867 সালে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আবদুর রহিমের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মৌলবী আবদুর রাবের মেদিনীপুর জেলায় জমিদারি ছিল, তাঁর পিতামহ ছিলেন একজন ডেপুটি কালেকটর। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ মেদিনীপুর জেলার গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলে। তিনি অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং মিড্ল টেম্পল থেকে 1890 সালে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আবদুর রহিম তাঁর জীবিকার্জন শুরু করেন 1890 সালে কলিকাতা হাইকোর্টে একজন আইনজীবী রূপে। পরে তিনি ডেপুটি লিগ্যাল রিমেম্ব্রানসারের পদে উন্নীত হন। 1907 সালে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আইনে টেগোর ল লেকচারার রূপে আবদুর রহিম নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি আইন বিষয়ক লেখালেখি বিষয়ে কাজ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বিশেষতঃ তাঁর লেখা একটি বইয়ে তিনি মুসলমান ও অমুসলমান জাতি ও দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্বের উপর মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। 1908 সালে তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি পক্ষপাতশূন্য ও ঐতিহ্যের সফল ধারাবাহক বিচারপতিরূপে খ্যাতি লাভ করেন। আইনকানুনের সীমারেখার বাইরেও, বিশেষ করে শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি দীর্ঘদিন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। আবদুর রহিম শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন তা হল সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসার।

রয়্যাল কমিশন অব পাবলিক সার্ভিসের একজন সদস্য রূপে 1913-15 সালে আবদুর রহিম উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের সপক্ষে একাগ্রভাবে ওকালতি করেছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, যাতে ভারতে ও ইংলণ্ডে একই সঙ্গে হয় তার জন্য এবং আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি জোরালো প্রতিবাদ গড়ে তোলেন।

স্যার আবদুর রহিম গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে তিনি ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে জোরালো ভাবে স্বীয়মত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি সেখানে বলেন—"আমরা যা চাই বা যার উপর জোর দিতে চাই তা হল ভারতে এমন এক সরকার থাকা উচিত যা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন স্বায়ত্ত শাসিত উপনিবেশের চাইতে নিকৃষ্টতর নয়"।

স্যার আবদুর রহিম ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন। 1932 সালে কেন্দ্রীয় বিধানসভায় ব্রিটিশ সরকারের জারি করা অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন —"কোন সন্দেহ নেই যে ওদের হাতেই যাবতীয় ক্ষমতা, তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষটাকেই ধ্বংস করে ফেলতে পারে। কিন্তু এটাও ঠিক ভারতবর্ষ ধ্বংস হলে তার সঙ্গে ইংলণ্ডও ধ্বংস হবে"।

একজন বাস্তববাদী কূটনীতিক রূপে স্যার আবদুর রহিম উপলব্ধি করেন যে ভারতবর্ষের মূল সমস্যা কখনই সাম্প্রদায়িকতা নয়, বরং দারিদ্র্য ও অশিক্ষাতেই

ভারতের মূল বিপদ নিহিত। সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে একদিন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে যখন সাম্প্রদায়িকতাকে পেছনে ঠেলে জাতীয়তাবাদই মুখ্য বিষয় হয়ে উঠবে"।

আবদুর রহিম 1920 সাল পর্যন্ত মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন, তারপর তিনি বাংলার গভর্নরের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন। 1927-এ বরিশালে গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত গভর্নরের আদেশের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি সেই পদ থেকে ইস্তফা দেন। 1931 সালে তিনি নির্দল প্রার্থীরূপে কেন্দ্রীয় বিধান সভায় অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন এবং দীর্ঘ একদশক, 1936 থেকে 1945, তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন। জনসেবার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়। 25 বছর ধরে তিনি লড়াই চালিয়েছিলেন। ভারতীয়দের প্রাপ্তব্য অধিকার রক্ষার স্বার্থে, যদিও মূলত তিনি একজন জাতীয়তাবাদী, তবু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার আদায়ের জন্য তিনি আলাদা তাগিদ অনুভব করতেন। 1906 সালের মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্যার আবদুর রহিম ছিলেন এক প্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক। তদানীন্তন ভাইসরয় মিণ্টোর কাছে যে প্রতিনিধিদল মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে আসন সংরক্ষণের জন্য সিমলায় দরবার করতে গিয়েছিলেন তিনি সেই প্রতিনিধিদলের অন্যতম ছিলেন। যে স্মারকলিপি ভাইসরয়ের কাছে পেশ করা হয়েছিল, তাকে বলা হয়ে থাকে—"ভারতের মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সর্বোত্তম স্মারকলিপি।" এ লিপি স্যার রহিমের নেতৃত্বেই রচিত হয়েছিল। মুসলিম লীগের 1925 সালে যে অধিবেশন হয়, স্যার আবদুর রহিম ছিলেন সেই অধিবেশনের সভাপতি।

যদিও তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের গৃহীত নীতিগুলির সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত ছিলেন না, কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে পাকিস্তানের যে দাবী মুসলীম লীগ উত্থাপন করেছিল তাকেও তিনি সমর্থন করেন নি। 1947 সালে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে-ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে যে গোষ্ঠী বিভাগের কথা বলা হয়েছে, সেখানে কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রধান বিষয়গুলিতে সমঝোতায় আসতে সমর্থ হবে। যাই হোক, 1947-এ পাকিস্তানেই অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কারমুক্ত, উদার নেতাদের অন্যতম রূপে স্যার আবদুর রহিম স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ভারতীয়দের জীবনের বিভিন্ন দিক শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির উন্নতিসাধনের জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

[Who is Who in India, 1940-41 ; India and Pakistan Year Book, 1948 ; Ramgopal—Indian Muslims, Bombay 1959 ; Indian Judges, Madras 1933 ; Eminent Musalmans, Madras 1934 ; Proceedings of the Indian Legislative Assembly, 1931-45 ; Proceedings of the Bengal Legislative Council, 1920-28 ; Proceedings Home and Foreign Political departs 1908-27 ; S. M. Akram—Modern Muslim India and the birth of Pakistan (Lahore, 1951) ; Akhtar Husain—History of Muslim League (Urdu), Bombay, 1941 ; Indian Annual Register 1945-47]

(টি. আর. শারীণ) কৃপাল সিং

আবদুর রহিম, হাফিজ (১৮৫৪-১৯২৬)
Abdur Rahim, Hafiz (1854-1926)

হাফিজ আবদুর রহিম আজমগড় জেলার কাসবা নেগোর পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত সাধক হজরৎ মখদুম শাহ নাসিরুল হকের বংশধর। তিনি ছিলেন মুন্সিফ মৌলভী সাখাওয়াৎ আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র।

তাঁর জন্ম 1854 সালের 25 জুন জৌনপুর জেলার (উত্তর প্রদেশ) খেতা সরাইতে। জৌনপুর ও মির্জাপুরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন এলাহাবাদের মৌলভী আমজাদ আলী এবং চিরিয়া কোর্টের মৌলভী মহম্মদ ফারুকের মত বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিরা। শিক্ষা সমাপন করে তিনি মোক্তারি পরীক্ষা পাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জৌনপুরে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুকাল পরে তাঁর কর্মস্থল স্থানান্তরিত করেন আলিগড়ে।

আলিগড়েই হাফিজ সাহেব উকিল হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের

মতাদর্শের দ্বারা তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে 1887 সালেই তিনি কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য হন এবং আমৃত্যু এই সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। 1910 সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্থ প্রাদেশিক সম্মেলনের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পরে আগ্রাতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেরও একই পদে বৃত হন। 1920 সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি আইন-বৃত্তি পরিত্যাগ করেন।

হাফিজ সাহেব ছিলেন নির্ভীক, সাহসী এবং নীতিগত বিষয়ে আপসের বিরোধী ছিলেন। সহিষ্ণুতা, ধৈর্য এবং সমবেদনায় পরিপূর্ণ এই মানুষটি জাতি-ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে দেশবাসীর জন্য পোষণ করতেন অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তিনি শান্ত এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। এমন কি তাঁর শত্রুরাও তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর প্রশংসা করত। সারা জীবন তিনি জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য লড়াই করে গিয়েছেন। অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা, ভারতীয় ভাষার জনপ্রিয়করণ এবং সরকারী নীতি নির্ধারণ বিষয়ে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতেন। মুসলমানদের বিশেষ অধিকারের তিনি কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ প্রণয়ন বিদেশী শাসকশ্রেণীর চক্রান্ত। তাঁর এই মতামতের জন্যই তিনি জোতদার-জমিদার, আমলা এবং তাঁর কিছু স্বধর্মাবলম্বীদেরও অপছন্দের পাত্র ছিলেন। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের যে পদ্ধতিকে তিনি সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করতেন তা থেকে তিনি এক চুলও কখনও সরে আসতেন না।

[Mohd. Badruddin Alvi : Kashf al-Niqab (Allahabad 1938) ; Hafiz Abdur Rahim : Presidential Address at the Fourth Provincial Conference hold at Benares in Moulana Azad Library, Aligarh Muslim University.]

এস. এম. জিয়াউদ্দিন আলভি

আবদুর রসুল (মৌলভী) (১৮৭২-১৯১৭)
Abdur Rasul (Maulvi) (1872-1917)

1872 সালের এপ্রিল মাসে ত্রিপুরার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মৌলভী আবদুর রসুলের জন্ম হয়। তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেছিলেন ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) কিশোরগঞ্জের শান্ত, মনোরম পরিবেশে। 1888 সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 1889 সালে আবদুর রসুল ইংলণ্ডে যান। 1892 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা (এণ্ট্রাস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1896 সালে তিনি বি. এ. এবং তার দুবছর পরে এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। মিডল্ টেম্পল্'স ইন্ থেকে তিনি ব্যারিস্টারী পড়ার ছাড়পত্র পান। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. সি. এল. ডিগ্রীও লাভ করেন। তিনি ইংলণ্ডে সর্বসমেত নয় বছর বসবাস করেছিলেন, সেই সময় তিনি একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের একটি কন্যা হয়। দেশে ফিরে তিনি সাফল্যের সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাংলাদেশে এক বিশাল রাজনৈতিক উত্থান পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সমস্ত দেশপ্রেমিকের মন ও হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। অতিশয় অনুভূতিসম্পন্ন আবদুর রসুল পশ্চিমী জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূলস্রোতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে তখন ছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দ-মোহন এবং স্যার গুরুদাসের মত উদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। অনতিবিলম্বেই তিনি স্বদেশী আন্দোলনে প্রথম সারির নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরোত্তর অগ্রগতির সামনে ব্রিটিশ শাসকেরা বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করেছিল দুটি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিরোধের বীজ বপন করতে। বিদেশী শাসকদের এই 'বিভেদ এবং শাসনের' নীতি হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মারাত্মক পরস্পর ধ্বংসকারী বিভেদ এবং সংঘর্ষের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যের উপর এই আঘাত আবদুর খানের অন্তরের স্বদেশী চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাই জাতীয় সংহতির জন্য তিনি ঐকান্তিকভাবে একদিকে তাঁর স্বধর্মীদের এবং

অপরদিকে স্বদেশবাসী হিন্দুদের প্রভাবিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে পূর্ববঙ্গের এক বিশাল সংখ্যক মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিলেন। মৌলভীর রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং সদ্ভাব স্থাপন। সমসাময়িক যুগের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার দাবী তাঁর কণ্ঠে সর্বাধিক মাত্রায় উচ্চারিত হত। এ বিষয়ে মৌলভীর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য যা ইংরেজ শাসকদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দূরদর্শী নেতা আবদুর রসুল জাতীয় আন্দোলনে শিক্ষার ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল শিক্ষা এই রকম হওয়া উচিত যাতে ছাত্ররা প্রকৃতই মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে। 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং 1913 থেকে 1916 সাল পর্যন্ত এই সংস্থার সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। বিশেষতঃ বাংলাদেশে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের একটি ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। 1906 সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে মৌলভী আবদুর রসুল সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে তিনি সভাপতি রূপে স্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের দমনমূলক নীতির ফলে পুলিশের হামলায় সেই সম্মেলন ভেঙ্গে গিয়েছিল।

মৌলভী 'হোম রুল' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সব সময় হোমরুলের একটি পদক তাঁর ঘড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখতেন। তিনি ঐ পদকটির সঙ্গে ভাবাবেগে এতই একাত্মবোধ করতেন যে তাঁর ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পর যেন ঐ পদকটিও তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে কবরস্থ হয়।

মৌলভী আবদুর রসুল মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে 1917 সালে পরলোকগমন করেন।

[Dhirendra Chandra Majumdar—Bharater Swaraj Sadhak, Part I ; The Indian Nation Builders, Part I, Madras.]

এ. শুভান

এস. মুখোপাধ্যায়

আবদুল আজিজ মিঞা (১৮৮১- ?)

Abdul Aziz, Mian (1881- ?)

মিঞা আবদুল আজিজ লাহোরে 1881 সালের জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন। লাহোরের প্রথিতযশা উলেমা শেখ মহম্মদ গউসের তিনি ছিলেন চতুর্থ সন্তান। ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি এক মৌলভীর কাছে শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন এবং পরে লাহোরের এক স্কুলে ভর্তি হন। 13 বছর বয়সে তিনি এণ্ট্রাস পরীক্ষা পাশ করেন এবং 1899 সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমস্ত কৃতী ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. পাশ করেন। 1901 সালে লাহোরের গভর্ণমেণ্ট কলেজ থেকে তিনি এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

সামাজিক জীবনে মিঞা আবদুল আজিজ পাঞ্জাবে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লাহোরের ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপক হিসাবে তিনি তাঁর জীবন শুরু করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই 1903 সালে তিনি পাঞ্জাব সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। বিভিন্ন ভাবে তিনি পাঞ্জাব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে অবশেষে 1936 সালে ফিনান্সিয়াল অফিসার হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন সরকারের অধীনে চাকরি করলেও মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী। এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে আইনসভায় প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতা থেকে। বেশ কয়েক বছর তিনি আইন সভায় মনোনীত সদস্য ছিলেন। মুসলীম লীগের একজন বিখ্যাত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অবসর গ্রহণের পর তিনি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য কাজ করে গেছেন। সরকারী কাজে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ যথাক্রমে তিনি 1917 সালে খান সাহেব, 1925 সালে খান বাহাদুর এবং 1930 সালে অর্ডার অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার খেতাব লাভ করেন।

1926 সালে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে তিনি ব্যাপক পরিভ্রমণ করেন এবং 1930 সালে গোল টেবিল বৈঠক চলাকালীন তিনি আবার ইংলণ্ড যান। একজন উদার নৈতিক মানুষ হিসাবে আজিজ তাঁর বিভিন্ন ভাষণে বিধবাবিবাহ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও, তিনি সবরকম গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাবাদ থেকে মুক্ত ছিলেন।

তাঁর কাছে ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার—জনজীবনের ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনার কোন প্রয়োজন নেই—এ কথাই তিনি মনে করতেন। ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট ছিলেন, বিশেষ করে তিনি চাইতেন যে গ্রামবাসীদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাগুলি আরও বেশী করে দেওয়া হোক।

1936 থেকে 1947 সাল এই পর্যায়টিই ছিল জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদানের কাল। 1936-এ সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পরই তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আরও বেশি করে উৎসাহ দেখাতে থাকেন।

1947 সালে দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত তিনি লীগের একজন গণ্যমান্য সদস্য ছিলেন। তিনি চাইতেন যে স্বাধীনতা আন্দোলন সাংবিধানিক পথেই পরিচালিত হোক। তিনি যে কোনো রকম হিংসাত্মক এবং বৈপ্লবিক কর্মধারার বিরোধী ছিলেন। ভারতীয় কৃষকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল গভীর এবং তাদের সমস্যা তিনি সব সময়ই তুলে ধরেছেন। আইনসভায় তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতেন এই বলে যে "তাঁরা (কৃষকেরা) যে সত্যিই কতটা মহান সেটা উপলব্ধি করবার জন্য তাদের সঙ্গে বসবাস করতে হবে, তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে হবে।" "যেটা আসলে ঘটেছে সেটা হচ্ছে যে এক জটিল সামাজিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থার ফলে, কৃষকেরা এক ধরনের বাধ্যতামূলক অবস্থায় এবং কিছু প্রচলিত প্রথায় আবদ্ধ হয়েছে—যেখান থেকে বার হয়ে আসা খুব কঠিন। তাকে তাঁর বুদ্ধির বিকাশের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। জনমত গড়তে সাহায্য করেন যে সমস্ত নেতা তারাও সামাজিক ব্যাপারে যাতে কৃষকের উন্নতিসাধন করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে কোনো সুযোগই দেন না।"

মিঞা আবদুল আজিজ তাঁর প্রদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন। 1946-47-এর সংকটময় বৎসরে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন যাতে কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে আপোষ রক্ষা হয়। তিনি মুসলিম লীগকে অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে বলেন এবং আন্তরিকভাবে কাজ করতে বলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বিফলে যায়। পাঞ্জাবের মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং আলোকপ্রাপ্ত ধারার প্রতিনিধিত্ব করতেন তিনি। তিনি সংকীর্ণতাবাদ এবং বিভেদের আগা গোড়াই বিরোধিতা করে এসেছেন। কিন্তু ঘটনাবলী তাঁর সমস্ত হিসেব বানচাল করে দেয় এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস এক নতুন দিকে মোড় নেয়।

[Foreign & Political Department Proceedings, 1917-35 ; Proceedings of the Central Legislative Assembly, 1927-31, 1933-35 ; Panjab Legislative Council Debates, 1935 ; Indian Annual Register (N. N. Mitra), 1935-47 ; Indian Who's Who, 1937-38 ; Falak-O-Pima (A Collection of Essays in Urdu), by Mian Abdul Aziz, Lahore, 1934.]

টি. আর. সারীণ বখসিস্ সিং নিজ্জর

আবদুল করিম খান সাহেব (সঙ্গীতরত্ন)

(১৮৭২-১৯৩৭)

Abdul Karim Khan Sahib (1872-1937)

হরিয়ানায় অবস্থিত কুরুক্ষেত্রের নিকট কিরানা নামে একটি ছোট্ট শহরে 1872 সালের 11 নভেম্বর আবদুল করিম খান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সঙ্গীতের যে পদ্ধতি বা ঘরাণা তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন তা তাঁর জন্মস্থানের নামানুসারেই কিরানা নামে চিহ্নিত হয়েছিল।

আবদুল করিম বাল্যকালে তাঁর পিতা কালে খান ও কাকা আবদুল্লা খানের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন।

তৎকালে প্রতি শুক্রবারে যে সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীত হত তা 'জুম্মা মাইফিল' নামে অভিহিত ছিল। আবদুল করিম মীরাটে ঐরূপ কোন এক শুক্রবারের সঙ্গীতের আসরে নিজেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর এক দূর সম্পর্কের কাকা হায়দর বকস্ ঐ সমবেত সঙ্গীতে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে আবদুল করিমকে দশেরা উৎসবের সময় মহীশূরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

মহীশূরের তৎকালীন রাজা চামারাজ উদিয়ার তাঁর সঙ্গীত শ্রবণে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াও প্রশংসার নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে একটি সোনার ব্রেসলেট উপহার দিয়েছিলেন।

তিনি ওয়াদ্ধানের কাথিয়াবাড়, লিমডি, রাজকোট

পরিভ্রমণ করে জুনাগড়ে আসেন। সেখানকার নবাব তাঁকে সভাগায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। জুনাগড়ে এক বছর অবস্থান করবার পর 1894 সালে তিনি জাবারা, ইন্দোর ও দিয়াজ ঘুরে বরোদায় এসে উপস্থিত হন। সয়াজিরাও তাঁর নৈশ ভ্রমণ কালে একদা সঙ্গীতজ্ঞ আল্লারাখীবাই এর বাসভবনের নিকট এলে একটি সুললিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হন। পরে তিনি যখন জানতে পারেন যে এই কণ্ঠস্বর আবদুল করিমের তখন তিনি তাঁকে তাঁর দরবারে সঙ্গীতানুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। খান সাহেবের সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে তাঁর সভাগায়ক নিযুক্ত করেন।

দুই তিন বছর পর 1898 সালে খান সাহেব বোম্বাই ও মীরাজের উদ্দেশ্যে বরোদা ত্যাগ করেন। সেখান থেকে তিনি হুবলি এবং ধারোয়ার গিয়েছিলেন ও তাঁর ভাই আবদুল হক্-এর সঙ্গে বসবাস করেছিলেন। দুই ভাই প্রায়শঃই যুগ্মভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শাশ্বত সুরের অন্বেষণে সঙ্গীত-তীর্থ পরিক্রমায় খান সাহেব ছিলেন নিরলস যাত্রী।

তিনি আরও একবার মহীশুরের দরবারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তৎকালীন রাজা কৃষ্ণরাজ উদিয়ার তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও সংগীতের মনোমুগ্ধকর পদ্ধতিতে অভিভূত হয়ে তাঁকে 1500 টাকা উপহার দিয়েছিলেন, যদিও পারিশ্রমিক ধার্য হয়েছিল মাত্র 500 টাকা।

মহীশুর ভ্রমণকালে সুন্দর আয়ারশাস্ত্রী, পথস্বামী পিল্লাই, গোবিন্দস্বামী পিল্লাই এবং বরদাচার্য প্রভৃতি যশস্বী সংগীতজ্ঞগণের সমাবেশে প্রধান সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত বীণা সেসন্না খান সাহেবকে তাঁর বিভিন্ন স্বরের উপর আধিপত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'সংগীতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

1913 সালে খান সাহেব পুণাতে আর্যসংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়টি ছিল গুরুকুল আদর্শে প্রতিষ্ঠিত একটি অনুপম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ওস্তাদ শুধুমাত্র সংগীত শিক্ষাদানই করতেন না গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সহায়তাও করতেন এবং তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তাঁদেরকে বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাতেন।

1917 সালে বোম্বাই-এ এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শাখা উদ্বোধন হয়েছিল কিন্তু মাত্র দুই তিন বছর কোনমতে চলেছিল। বাধ্য হয়ে যখন বিদ্যালয় বন্ধ করতে দিতে হয়েছিল তখন খান সাহেব মীরাজে গিয়ে নিজের বাড়ী তৈরী করে বসবাস শুরু করেছিলেন।

যশ ও প্রচুর পরিমাণে প্রশংসার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও খান সাহেব সর্বদা সাধু বা পুরাকালের ঋষিদের মত পরিমিত জীবন যাপন করতেন।

খান সাহেব যদিও নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং পীর সৈয়দ সামনা মীরার ভক্ত ছিলেন, তথাপি কবীরের মত তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিও সমান শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও হিন্দু পূর্বপুরুষ গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের সভাগায়ক নায়ক ধন্দুর জন্য তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করতেন।

খান সাহেব সম্ভবতঃ প্রথম উত্তর ভারতীয় সংগীতজ্ঞ যিনি কর্ণাটক রাগসকল অধিগত করেছিলেন এবং বহু রাগ হিন্দুস্থানী সংগীতে মিশ্রণ করেছিলেন। 'খরহরপ্রিয়া', 'শাবেরী', 'হামসন্ধানি', 'থাভোজী' প্রভৃতি তাঁর গানের রেকর্ড এবং তাঁর গানের স্বরগমের কায়দা কর্ণাটক সংগীতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রমাণ। সম্ভবতঃ ঐ সময়ের অন্য কোন শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক সংগীতের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য এতটা করেননি।

খান সাহেবের সংগীতের প্রধান গুণ ছিল আবেগের চরমোৎকর্ষতা। আর এই কারণেই বোধ হয় তাঁর শাস্ত্রীয় সংগীত কি উত্তর কি দক্ষিণ সর্বত্রই শ্রোতাদিগকে অভিভূত করতে সক্ষম হয়েছে। দক্ষিণের বহু যুবক-যুবতী যারা হিন্দুস্থানী সংগীত চর্চা করত তারা খান সাহেবের সংগীতের যাদুতে মুগ্ধ হত।

এই জাতীয় বিখ্যাত গায়ক হওয়া সত্ত্বেও বীন, সারেংগী, জলতরংগ ও তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উপরও আবদুল করিম খানের বিস্ময়কর দক্ষতা ছিল।

যদিও মীরাজ খান সাহেবের কর্মকেন্দ্র ছিল, তথাপি সংগীত উপলক্ষে তিনি সমগ্র দেশে তাঁর কার্যধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে তিনি শ্রী অরবিন্দের নিকট হতে পণ্ডিচেরী যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি একটি স্টেশনে নেমে পড়েন এবং সেখানে বিশ্রামাগারেই 1937 সালের 27 অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

সুমিষ্ট স্বরের অধিকারী শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ খান সাহেবের সংগীত সর্বদাই এক মহোত্তম ভাবরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করত। মানুষের মনে সান্ত্বনা দেওয়ার মত তাঁর বিশেষ অধিগত স্বর এবং গানের প্রশান্ত ভঙ্গিমা শুধু গায়ককে নয় শ্রোতাসাধারণকেও বিহ্বলাবিষ্টতায় ভুলিয়ে রাখত।

খান সাহেবের বিশিষ্ট ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সাওয়াই গন্ধর্ব এবং স্‌রেশবাব্‌ ছিলেন অন্যতম। এ'দের পরেই দ্‌ই বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গাঙ্গ্‌বাঈ হাঙ্গল এবং হীরাবাঈ বাদোদেকারের নাম করতে হয়। খান সাহেব প্রবর্তিত কিরানা পদ্ধতির ধারা আজও বহমান। ভীমসেন যোশী, প্রভা আত্রে, মানিক ভার্মা প্রম্‌খ নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাখ্যাতারা এখনও তাঁদের সঙ্গীতে এই রীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে চলেছেন।

[Great Masters of Hindustani Music by Sushila Mirra ; Life Sketch (Marathi) by Pandit Balkrishnabra Kapileshwari ; Saptaswarashri (Marathi) by Gopal Krishna Bhaba ; English rendering of the entry in Marathi by Shri Dallopant Deshpande.]

ভি. জি. হটলকার

আবদ্‌ল কাদির (স্যার) (১৮৭৪-১৯৫০)
Abdul Qadir (Sir) (1874-1950)

আবদ্‌ল কাদিরের জন্ম 1874 সালে কাস্‌রে, মৃত্যু পশ্চিম পাঞ্জাবে (পাকিস্তান) 1950 সালের ফেব্র্‌য়ারী মাসে। তাঁর পরিবার মোটাম্‌টি অবস্থাপন্ন ছিল। তাঁর পিতার নাম শেখ ফতেহ্‌ উদ্দীন। লাহোরের ফোরমান ক্রিশ্চয়ান কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হন এবং পরবর্তীকালে আইনবিদ্‌ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য বিলেতে যান (1904-07)। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন এবং সাহিত্যের প্রতি অন্‌রাগ এবং র্‌চি থাকার জন্য সেখানকার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে লাহোরের ব্যবহারজীবী শেখ মহম্মদ উমরের কন্যা মহম্মদ উমরকে তিনি বিবাহ করেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি আইনকে ব্‌ত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং 1912-20 সালে লায়ালপ্‌র এর পাবলিক প্রসিকিউটর, 1930-34 সালে পাঞ্জাবে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ভাওয়ালপ্‌র রাজ্যে 1940-43 সাল পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয্‌ক্ত ছিলেন। তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা বিষয়ে। 1898 সাল থেকে পাঞ্জাবের সাংস্কৃতিক জগতে তিনি এক গ্‌র্‌ত্বপ্‌র্ণ ভ্‌মিকা পালন করেছেন। সেই বছরই উর্দ্‌ পত্রিকা "মাখজান" সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের একটি মিলন মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছিল এবং পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের আত্ম-প্রকাশের লালনস্থল ছিল। "ম্‌সলমান ব্‌দ্ধিজীবীদের উপর প্রভাবের দিক বিচার করলে সৈয়দ আহমেদ খানের তবজীব-উল-আখলক এর পরেই ছিল "মাখজান"-এর স্থান। প্রথমদিকে আবদ্‌ল কাদির কিছুকাল সমাজ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে পরিচালিত একটি সাপ্তাহিক "পাঞ্জাব অবজারভার"-এর সম্পাদনা করতেন। ভারতবর্ষের এবং বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি এক সফলকাম সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। "মাখজান"-এ প্রায়শই তিনি বিদেশী লেখক এবং তাঁদের প্রকাশিত বই সম্বন্ধে লিখতেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাগ্‌লির মধ্যে "The New School of Urdu Literature", "মখোম-ই-খিলা ফৎ" (উর্দ্‌), "Famous Urdu Poets and Writers", (লাহোর 1947) প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

শিক্ষার ব্যাপারে আবদ্‌ল কাদির খ্‌বই উৎসাহী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাম্‌লক ক্রিয়াকলাপ "আঞ্জ্‌মান-ই-হিমায়ত-ই-ইসলাম" কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছিল। কয়েক বছর তিনি এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন। আঞ্জ্‌মানের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় তিনি সযত্নে লক্ষ্য বা পরিচালনা করতেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে সকলের জন্য স্‌যোগের প্রসার হয়, বিশেষ করে ম্‌সলমানদের জন্য সেই উদ্দেশ্যে তিনি চেষ্টা করে গেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। 1925-26 সাল নাগাদ পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন শিক্ষার সংস্কার এবং বিস্তার সাধনের জন্য তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। আবদ্‌ল কাদিরের রাজনৈতিক জীবন শ্‌র্‌ হয় বেশ দেরী করে যখন 1924 সালে পাঞ্জাব লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তিনি নির্বাচিত হন। প্রথম দিকে তিনি ইউনিয়নিস্ট পার্টির একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন, পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি ম্‌সলিম লীগে যোগদান করেন এবং 1926 সালে তার সভাপতি হন, কিন্তু তিনি আদৌ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। দেশ বিভাগের প্‌র্বের দিনগ্‌লিতে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী জনসভা

গুলিতে প্রায়শই তিনি সভাপতিত্ব করতেন। একজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি আসলে নরমপন্থী দলভুক্ত ছিলেন। 1925 সালে প্রথম তিনি পাঞ্জাব লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে সভাপতি নির্বাচিত হন। কয়েকমাস পরেই পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হবার পর নীতিগত বিরোধিতার কারণে তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। 1927 সালে প্রাদেশিক সরকারের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। 1934-37 সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের সেক্রেটারী অব্ স্টেটের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং 1939 সালে অল্প সময়ের জন্য গভর্ণর জেনারেলের এক্-সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবেও নিযুক্ত হন।

পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং পাকিস্তান দাবীর প্রতি তাঁর সমর্থন সত্ত্বেও আবদুল কাদির একজন সংস্কৃতিবান্ মানুষ হিসাবে, উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ হিসাবে, যিনি শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কারে আগ্রহশীল সেইরকম একজন মানুষ হিসাবে পাঞ্জাবের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

[A History of Freedom Movement in Pakistan, Vol. III Pt.-2, Karachi (1963); Who was Who, 1951-60, London (1961); The Hindustan Review, February, 1950; Intabhah-i-Mabhzan (Urdu) Lahore (N. D.); Punjab Legislative Council Debates, Vols. VII to XI, 1924-1928; S. C. Chakravarti (ed.)—The Father of Modern India, Commemoration Volume, Calcutta (1935); Azim Husain—Fazl-i-Husain, Longmans (1946); The India Office and Burma Office List, 1945; Times of India Directory and Who is Who; Abdul Qadir —Famous Urdu Poets and Writers, Lahore (1947).]

এস. আর. মহাজন বখশিস্ সিং নিজ্জর

আবদুল কায়ীইউম আনসারী, (১৯০৫ - ?)

Abdul Quaiyyum Ansari, (1905 - ?)

আবদুল কায়ীইউম আনসারি বিহারের সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত দেহরি গ্রামে 1905 সালের 1 জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল হক। ধর্ম বিশ্বাস-এ তিনি ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ মোমিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। পরিবারটির আদি নিবাস ছিল গাজীপুরে (উত্তরপ্রদেশ), কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁরা ব্যবসায়ের জন্য দেহরিতে চলে আসেন। আবদুল কায়ীইউমের মাতামহ, মৌলভী আবদুল্লা ছিলেন একজন শ্রদ্ধেয় এবং বিখ্যাত আলিম্।

আবদুল কায়ীইউম প্রাথমিক শিক্ষা পান দেহরি এবং সাসারাম হাইস্কুলে। স্বল্পকালের জন্য তিনি আলীগড়, এলাহাবাদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। কিন্তু রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার ফলে তাঁর লেখাপড়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। 1932 সালে তিনি সিরাজগঞ্জের (বাংলাদেশের পাবনা জেলা) আসমা বেগমকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁদের দুটি পুত্র এবং দুটি কন্যা রয়েছে।

1918—1920 সাল নাগাদ খিলাফৎ এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় আবদুল কায়ীইউমের রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলকে তিনি যোগ্যতা সহকারে সেবা করেন। 1930-31 সালে তিনি ছিলেন সাহাবাদ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। 1959-1963 পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যও ছিলেন তিনি। একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী হিসেবে তিনি সর্বদাই বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক ঝোঁকগুলির বিরোধিতা করেছেন।

বিধায়ক এবং মন্ত্রী হিসাবে আবদুল কায়ীইউমের এক দীর্ঘ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন ছিল। 1946 সালের নির্বাচনে এবং 1952, 1962 এবং 1967 সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি বিহার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। 1946-52,1955-57 এবং 1962-67 পর্যন্ত তিনি মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। ভারতের সংবিধান সভায় (Constituent Assembly) তিনি ছিলেন বিহার বিধানসভা থেকে মনোনীত কংগ্রেস সদস্য এবং মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু এবং উপজাতি অঞ্চলের উপর উপদেষ্টা কমিটিতেও তিনি কাজ করেছেন। 1953-55 সালে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অনুন্নত শ্রেণীদের

জন্য গঠিত কমিশনেরও তিনি ছিলেন একজন সদস্য। 1970-এর মার্চ মাসে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

আবদুল কায়ীইউমের প্রধান কাজ হল অর্থনৈতিক-ভাবে এবং সামাজিক ভাবে পশ্চাদপদ ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষত মোমিনদের সংগঠিত এবং উন্নতিসাধন করা। এই কাজটি চল্লিশের দশকের প্রথমে কিছুটা রাজনৈতিক রূপ নেয় যখন ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে তিনি কংগ্রেস-লীগ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কাজের সামাজিক এবং শিক্ষাগত মূল্য ছিল অনেক। মোমিনদের শিক্ষার জন্য সরকারের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য আদায় করে এবং তাঁদের মূল পেশা তাঁত বোনাকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত করে, (এখানে সরকার আর্থিক সাহায্য করেছেন) মোমিন সম্মেলন—আবদুল কায়ী-ইউমের নেতৃত্বে খুবই মূল্যবান কাজ করে চলেছেন। এই সম্মেলনের তিনি হচ্ছেন প্রধান পথ নির্দেশক ও অনুপ্রেরক। 1958 সাল থেকে তিনি এর সভাপতি পদে বৃত আছেন।

এছাড়াও আবদুল কায়ীইউম বিভিন্ন সভা-সমিতির সংগে যুক্ত 1938 থেকে 1947 বিহার প্রাদেশিক জামিয়াতুল মোমিনিন এবং সর্বভারতীয় মোমিন তালিমি (শিক্ষাগত) তহবিলের সভাপতি, এবং সর্বভারতীয় অনুন্নত শ্রেণীর সংঘের সহ-সভাপতি (1954) ছিলেন। 1959-62 পর্যন্ত তিনি ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি ছিলেন এবং 1961-তে সুইজারল্যাণ্ডে লুসার্ন-এ অনুষ্ঠিত 21তম আন্তর্জাতিক সমবায় সম্মেলনে তিনি জাতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে ছিলেন।

আবদুল কায়ীইউমের সাহিত্য প্রীতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। তরুণ বয়সে বিভিন্ন পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ এবং গজল লেখা ছাড়াও 1924-1927 পর্যন্ত 'আল-ইস্‌লাহ' নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক সম্পাদনা করতেন। 1952-54 সাল পর্যন্ত 'তজ্‌হিব' নামক মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করেছেন। অঞ্জুমান-ই-তারাক্‌কি-ই উর্দুর (উর্দু ভাষা চর্চা এবং উন্নতি-সাধনের জন্য গঠিত একটি সংগঠন) কার্যকলাপের সঙ্গেও প্রাদেশিক এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে তাঁর সংযোগ ছিল। 1940 থেকে 1951-এর মধ্যে তিনি ছিলেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ফেলো এবং 1951-52 পর্যন্ত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য।

অন্যান্য অনেক অসহযোগীদের মত আবদুল কায়ীইউম প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রচণ্ড নিন্দা করতেন যা শত শত গোলামখানার সৃষ্টি করেছে এবং মানুষকে গোলাম বানানোর জন্যই যার জন্ম এবং তার বদলে বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যক্রমকে সমর্থন জানিয়েছিলেন যা একজন তরুণকে দেশের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। 1961 সালে আবদুল কায়ীইউম রাশিয়া এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ এবং মিশর সফর করেন। গড়পড়তা উচ্চতাসম্পন্ন চশমা পরিহিত আবদুল কায়ীইউম সাধারণ ভারতীয় পদ্ধতিতে পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন এবং ভারতীয় রীতিনীতি মেনে চলতেন।

[Sada-i-Hind, Urdu Weekly, Patna, Abdul Qaiyyum Ansari Number, July, 1966 : it contains several biographical sketches and impressions of Abdul Qaiyyum Ansari by his friends and contemporaries ; Datta, K. K.—History of Freedom Movement in Bihar, Vol. III, Patna, 1957 ; Hindustan Year Book, 1963 ; India Who is Who (1969), ed. by S. Satyajit, Infa Publications, Delhi ; A short biographical account, yet unpublished, has been prepared by Dr. H. N. Ansari, son of A. Q. Ansari.]

(রামেশ্বর প্রসাদ) কেয়ামউদ্দিন আহমেদ

আবদুল গণি দার (১৯০৭— ?)

Abdul Ghani Dar (1907 — ?)

পাঞ্জাবের অমৃতসরে 1907 সালের 14 অক্টোবর আবদুল গণি দার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জীবন দার এবং মাতা মুক্তার বেগামের ছয়টি পুত্র। তাঁরা হলেন, মহম্মদ ইয়ামিন, মহম্মদ ইব্রাহিম, গুলাম কাদির, গুলাম মহীউদ্দীন, ইউসুফ দার এবং আবদুল দার। আবদুল গণি দারের শেখ হুসেনুদ্দীন নামে এক আত্মীয় ভ্রাতা ছিলেন। আবদুল গণির পিতা ত্রিশ-বৎসরকাল পাঞ্জাবের গভর্ণরের পিওনের কাজ করেন। জাতিতে আবদুল গণি 'দার' ছিলেন।

1937 সালে তিনি অমৃতসরের মিয়া শামসুদ্দীনের কন্যা জুবেদা খাতুনকে বিবাহ করেন।

আবদুল গণি অমৃতসরের কাত্রা খাজানায় আরবী, ফার্সী এবং কোরান-ই-মজিদে প্রাথমিক বিদ্যা লাভ করেন। 1925 সালে অমৃতসরের ইসলামিয়া স্কুলে ভর্তি হয়ে 1925 সালে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়ে তিনি পড়াশুনা ছেড়ে দেন। তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেন নি। যে কয়জনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আবদুল গণির মনে ও চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাঁরা হলেন, মুন্সী আহমদ দীন, সৈয়দ আতাউল্লা শাহ বোখারী, ডাঃ সত্যপাল, ডঃ সৈফুদ্দীন কিচ্‌লু এবং কেদারনাথ সায়গল। প্রথম জীবন থেকেই অমৃতসর স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, বাল ভারত সভা, এবং নবজীবন সভা ইত্যাদির সঙ্গে আগ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় আবদুল গণি দার 1921 সাল থেকেই খাদি প্রচারের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। 1924 সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি অমৃতসর কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। 1928 সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি পাঞ্জাব থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। ষোল বৎসর যাবৎ আবদুল গণি দার লুধিয়ানা সিটি ও লুধিয়ানা কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। 1928 সাল থেকে তিনি পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য ছিলেন। 1930 সালে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য, 1931 এবং 32 সালে ইংরেজ-বিরোধী বক্তৃতা দেবার জন্য এবং 1942 সালে কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেবার জন্য তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন। 1944 সালে তিনি পাঞ্জাবে কংগ্রেস ওয়ার্কার্স অ্যাসেম্বলি স্থাপন করেন। 1932 থেকে 1947 সাল পর্যন্ত আবদুল গণি সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন।

এ পর্যন্ত পাঞ্জাবের কংগ্রেস পার্টির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কিন্তু 1953 সালে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বতন্ত্র দলে (Independent Party) যোগ দেন। 1971 সালে তিনি লোক-সভার সদস্য নির্বাচিত হন। উর্দু দৈনিক 'বন্দে-মাতরমে' আবদুল গণি তাঁর সময়কার রাজনৈতিক ঘটনার উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 1947 সালের আগে তাঁর কয়েকটি উর্দু পুস্তকও প্রকাশিত হয়। এগুলি হল, 'তিরঙ্গা', (Tiranga), শহীদ যামিন দার (Shaheed Yamin Dar), 'ইক্তসাদি উলঝানে' (Iqtsadi-Uljhane) এবং 'কংগ্রেস খাতরেমে (Congress Khatre mein)

আবদুল গণির জীবন যাত্রা অত্যন্ত সরল। ইনি জাতিভেদপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতার বিরোধী। বিধবা-বিবাহ এবং স্ত্রীজাতির সমান পদমর্যাদায় তিনি আগ্রহী ছিলেন। হরিজনদের উন্নতিকল্পে ইনি কাজ করেছেন এবং নবজাগরণ ও ঐক্যবোধের জন্য তাদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। 1924 সালে অমৃত-সরে 'সুইপারস ইউনিয়ন' (Sweepers Union) এইরকম একটি সংঘ। ধর্মতঃ মুসলমান হলেও আবদুল গণি অত্যন্ত উদারমনা ছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদ এবং মানুষের কল্যাণকারী ধর্মে বিশ্বাসী। তাঁর কাছে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা তিনি সমর্থন করেন এবং চান যে এই শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হোক। ইনি বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা-ব্যবসা জাতীয়তাবাদী হবে যা স্বদেশকে ভালবাসতে শেখাবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ইনি কঠোর সমালোচক। আবদুল গণির মতে এই শিক্ষা জাতীয়তা বোধ এবং নীতিবোধ নষ্ট করে। তাঁর বক্তব্য "ভারতীয়েরা নিজেদের শাসনব্যবস্থা নিজেরাই চালাবে এবং সম-মর্য্যাদা লাভ করবে।" তাঁর চোখে সব হিন্দু এবং মুসলমান প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ ভারতীয় এবং তাদের সকলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এক। গান্ধীজির অহিংস নীতি তিনি সমর্থন করেন। বৃটিশদের অতিরিক্ত কর আদায়, ভূমিসংস্কার না করা, সুচিন্তিতভাবে গ্রামীণ অবস্থার উন্নতি না করা. শিল্পোন্নয়ন না করা ইত্যাদির কঠোর সমালোচনার মধ্যে আমরা আবদুল গণির অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় পাই। ইনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, কেবল মাত্র বৃহৎ শিল্প স্থাপন, ভূমি সংস্কার এবং কৃষির উন্নতির মধ্য দিয়েই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। আবদুল গণি যে কোন প্রকারের প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সর্বভারতীয়।

গুণগত এবং প্রতিষ্ঠাগত বিচারে আবদুল গণি দার একজন স্বদেশ-প্রেমিক। সর্বদাই তিনি স্বদেশ সম্বন্ধে সচেতনতা জাগাবার চেষ্টা করেছেন। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এ কথা প্রমাণ করে যে তিনি স্বাধীন ভারতে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন দেখতে চান যাতে দেশপ্রেম জাগরিত হয়।

[Personal interview of the Research Fellow with Abdul Ghani Dar]

(ডি. এল. দত্ত) ডি. অবন্তী

আবদ্‌ুল গফ্‌ফর খান (১৮৯০-১৯৮৮)

Abdul Ghaffar Khan (1890-1988)

ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার জেলার অন্তর্গত চারসাদ্দা তহশিল-এ অবস্থিত উত্তামানজাই গ্রামে মহম্মাদজাই নামক পাঠান উপজাতির এক পরিবারে আবদ্‌ুল গফ্‌ফর খান জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানটি এখন পাকিস্তানের (পশ্চিম) অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতা খান সাহেব বাহরাম খান গ্রামের প্রধান ছিলেন। চরিত্রের মহানুভবতা ও সততার জন্য তিনি স্থানীয় জনগণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। অক্ষর পরিচয় না থাকলেও তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই প্রখর সাধারণ জ্ঞান এবং ধর্মীয় মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। বাস্তব জগত অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জগতেই তাঁরা বেশী বিচরণ করতেন। 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের নানাভাবে সাহায্য করার মূল্য স্বরূপ বাহরামখান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শুধু প্রশংসাই লাভ করেন নি তাঁকে একটি বড় জায়গীরও দান করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপে তাঁর মনে তাঁদের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হয়। রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ফলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। 1925 সালে 95 বছর বয়সে তিনি মারা যান।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, 1890 সালে উত্তামানজাই গ্রামে আবদ্‌ুল গফ্‌ফর খান জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর একমাত্র ভাই ডাঃ খান সাহেব তাঁর থেকে প্রায় সাত বছরের বড় ছিলেন। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর আবদ্‌ুল গফ্‌ফর খান দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁর তিনটি পুত্র এবং একটি কন্যা। সাহসিকতা ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের জন্য তিনি স্থানীয় জনসাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মুসলীম ধর্মের অনুগামী হিসাবে তাঁর নিজস্ব ধর্মের প্রতি স্বভাবতঃই প্রচণ্ড বিশ্বাস, কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতিও তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলতেন, "সংখ্যা গণনার মাধ্যমে ধর্মের মূল্য নিরূপণ করা যায় না।" তিনি আরও বলেন, "জীবন যদি ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত না হয় তাহলে সে ধর্ম অর্থহীন আচরণ মাত্র।" তাঁর মতে ইসলাম সৎ আচরণ, বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতীক। কোরাণের এই সব নীতি যদি কোন মুসলমান মেনে না চলেন তাহলে তিনি প্রকৃত ইসলামধর্মী বলে গণ্য হতে পারেন না। এক এবং অদ্বিতীয় ভগবানে বিশ্বাস এবং সদাচারণ এদুটি হল ইসলামের মূল শিক্ষা। তাঁর বক্তব্য-সকল ধর্মীয় শাস্ত্রে একথা উল্লিখিত আছে যে জনশিক্ষার জন্য ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। তিনি একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে "মূল বিষয়ে হিন্দু, ইসলাম খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই—বিরোধ যা কিছু তা ব্যাখ্যার খুঁটিনাটি নিয়ে।" হিন্দুদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, "তাঁরা যদি মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী হয়, আমরা তবে কি? সমাধিক্ষেত্রে আরাধনা কি? হিন্দুরাও এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী।" ইসলাম ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী আবদ্‌ুল গফ্‌ফর খান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গান্ধীজী বলেন, "এক বছরেরও বেশী সময় তিনি আমার সঙ্গে থাকতেন। তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে শরীর অসুস্থ না থাকলে তিনি কখনই নমাজ পড়া এবং রমজানের উপবাস থেকে বিরত থাকতেন না। কিন্তু ইসলামের প্রতি আনুগত্য তাঁকে অন্য ধর্মের প্রতি কোনোরকমেই অসহিষ্ণু করে তোলে নি।" অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর উদারনৈতিক মনোভাবের দিকে লক্ষ্য করে কোনো কোনো গোঁড়া সমালোচক তাঁকে হিন্দু বলে অভিহিত করেছেন।

আবদ্‌ুল গফ্‌ফর খান তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা প্রথমে বাড়ীতে এবং পরে এক মৌলবী পরিচালিত মক্তবে লাভ করেন। মৌলবীর কাছ থেকে তিনি কিছু কিছু ধর্মীয় প্রণালী আয়ত্ত করেন। এর পর তিনি পেশোয়ারের মিশন হাইস্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং সেখান থেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় উর্দু শিক্ষার জন্য তাঁকে আলিগড়ে পাঠানো হয়। তিনি মৌলানা জাফর আলি খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত দৈনিক "Zaminder" ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'আল হিলাল' পাঠ করতেন। এই সকল পত্রিকা পাঠের ফলে তাঁর মনে রাজনৈতিক বিষয়ে যে জ্ঞানের সঞ্চার হয় তার ভিত্তিতে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। পরবর্তীকালে

উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠাবার এক পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু তা বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হয়নি। তিনি তাঁর স্কুলের অধ্যক্ষ Rev. Wigram-এর খৃষ্টীয় চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়ায়, ঐ আদর্শে তিনি সেই অঞ্চলের জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ অবশ্য তাঁর মনে সঞ্চারিত করেছিলেন তুরঙ্গজাই-এর হাজী। ইনি ছিলেন জাতীয় শিক্ষার অগ্রদূত। গান্ধীজীর জীবনী ও কার্যাবলীও তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গান্ধীজীর আদর্শে তিনি নিজের জীবন ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। জওহরলাল নেহর্, মৌলানা আব্‌ল কালাম আজাদ ও অন্যান্য প্রথম সারির জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ঘটায় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাদর্শের ওপর তাঁদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

1911 সালে আলিগড় থেকে ফিরে আসার পর তুরঙ্গজাই-এর হাজীর সাহায্যে ঐ প্রদেশের অধিবাসীদের জন্য একটা জাতীয় স্কুল গড়ে তোলার বিষয়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায় রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে। এই বিক্ষোভ চলাকালীন তিনি প্রথম তাঁর গ্রামে রাউলাট আইনের বির্দ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এর জন্য অবশ্য সরকারী আদেশে কিছ্দিনের জন্য তিনি কারার্দ্ধ হন। 1920 সালে ম্ক্তিলাভের পর কংগ্রেসের নাগপ্রর অধিবেশনে যোগদানের পর খিলাফৎ আন্দোলনে তিনি এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। 1920 সালে তিনি উত্তমানজাই-এ একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সরকারী পক্ষ থেকে তাঁর বির্দ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে তিনি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তুলছেন এবং এই কারণে তাঁকে Frontier Crimes Regulation অন্যায়ী আবার গ্রেপ্তার করা হয়। 1924 সালে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

1930 সালে অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার দর্ন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলে প্রেরণ করা হয়। সীমান্ত কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়। পাঞ্জাবে জেলে থাকাকালীন তিনি হিন্দ্ ও শিখ বন্ধ্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলতেন। ম্ক্তি পাবার পর গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে লক্ষ্য করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 45 তম অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের কঠোর মনোভাব গ্রহণের জন্য জাতীয় নেতাদের উদ্দেশ্য করে তিনি এক আবেগময় বক্তৃতা দেন। এছাড়া 1931 সালে 25 জ্ন কস্তুরবা গান্ধীর সভাপতিত্বে বরদৌলিতে যে অধিবেশন হয় তাতেও তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। আত্মত্যাগ ও সফল নেতৃত্বের জন্য তাঁকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে মনোনীত করার কথা বলা হলে তিনি তা প্রত্যাখান করে বলেন, "আমি সৈনিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি, সেভাবেই আমি মরতে চাই (I am a born soldier and I shall die as one)"। একটানা দীর্ঘকাল তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। 1920-47 সাল পর্যন্ত আবদ্ল গফ্ফর খান জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত সকল আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এর জন্য অবশ্য তাঁকে জীবনের অনেকটা সময় জেলে কাটাতে হয়।

আবদ্ল গফ্ফর খান কেবলমাত্র সীমান্ত অঞ্চলের একজন প্রথম সারির নেতা হিসাবেই পরিচিত ছিলেন না, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর একটা বিশেষ গ্র্ত্ব ছিল। যদিও ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করেন, কিন্তু পাঠানদের দাবীও বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দেশের প্র্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি ম্সলীম লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা ও নির্বাচক মণ্ডলীর কঠোর সমালোচক ছিলেন। গান্ধীজীর অন্গামী হিসাবে কংগ্রেসের নীতি ও কার্যক্রমে তাঁর প্র্ণ বিশ্বাস ও সমর্থন ছিল। 1939 সালে য্দ্ধের প্রতি ভারত সরকারের ভূমিকা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের মতবিরোধের দর্ন সাময়িকভাবে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন, কিন্তু আবার 1940 সালে কংগ্রেসে যোগ দেন।

1946-57 সালে ভারত-ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যখন মীমাংসা স্ত্রের সন্ধানে উভয় পক্ষে আলাপ আলোচনা চলছিল তখন আবদ্ল গফ্ফর খান অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ভারত বিভাগ পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। বিশেষ করে কংগ্রেস যখন এই বিভাগের পরিকল্পনাকে মেনে নিল তখন সেটা ছিল তাঁর কাছে চরম দুঃখ ও হতাশার ম্হ্র্ত। তিনি ও তাঁর পাঠান অন্গামীরা কিভাবে ও কোন পথে এগোতে চায়, তা তিনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় স্স্পষ্টভাবে বলেন। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী নেতারা তাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন।

ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের জন্মের পর তিনি পাখতুনিস্তান গঠনের জন্য যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন সেজন্য পাকিস্তান সরকার তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে। শেষ কারাগার জীবনের আগে তিনি বেশ কিছুকাল সামরিক একনায়কতন্ত্র চলাকালীন আফগানিস্তানে বন্দী হয়েছিলেন।

আবদুল গফফুর খান অহিংস পদ্ধতি ও মতের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। এটা তাঁর কাছে একটি গভীর বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে জনসাধারণ অন্য কিছুর থেকে অহিংস পদ্ধতিকেই চায়। এই কারণে তিনি তাঁর অনুচরদের বলতেন যে প্ররোচনা সত্ত্বেও তারা যেন কোনো অবস্থাতেই অহিংসার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়।

জাতীয় শিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক হওয়ায় নিজের গ্রাম ছাড়াও প্রদেশের সর্বত্র অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয়ের তিনি পত্তন করেছিলেন।

সমাজ সংস্কারমূলক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার এবং আধুনিক। সঙ্গে সঙ্গে দুর্দশাপীড়িত দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতির দিকেও তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। গান্ধীজীর আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। স্ত্রী জাতির মুক্তির জন্য তাঁদের শিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এছাড়া তিনি প্রাদেশিকতারও ঘোর বিরোধী ছিলেন।

ব্রিটিশদের প্রতি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি একথা বলেন যে খুব সামান্যই তিনি তাঁদের বিশ্বাস করেন। ব্রিটিশদের প্রতি তাঁর তেমন কোন ঘৃণাসূচক মনোভাব না থাকলেও তাঁর প্রদেশে অত্যাচার ও হত্যার বন্যা ঘটানোয় তিনি তাঁদের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন।

আবদুল গফফুর খানের চরকার প্রতি বিশ্বাস থাকায় গ্রামীণ শিল্পের উন্নতিকে তিনি বিশেষভাবে স্বাগত জানান।

সভাসমিতির মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করতেন। অবশ্য সংবাদপত্র ও বেতারের প্রয়োজনকেও তিনি একেবারে অস্বীকার করেননি। যদিও তাঁর প্রচেষ্টায় 1928 সালে 'পাখতুন নামে এক পত্রিকা বার করা সম্ভবপর হয়, কিন্তু 1930 সালে তাঁকে বন্দী করার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য কয়েক বছর পরে (1938—এপ্রিল) এই পত্রিকা 'Das Roza' নামে প্রকাশিত হলেও এর প্রকাশনা পুনরায় 1941 সালে বন্ধ হয়ে যায়। 1945 সালের প্রারম্ভে এই পত্রিকার পুনঃ প্রকাশনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তাও দু বছর পরে আর প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি।

নিজের বৈপ্লবিক ও সমাজ-সংস্কারমূলক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গফফুর খান 'খুদাই খিদমৎগার' নামে একটা প্রতিষ্ঠানের পত্তন ঘটান। যদিও প্রথমদিকে এর লক্ষ্য সমাজ-সংস্কারের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এর কার্যপ্রণালী ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই প্রতিষ্ঠান এর ফলে অল্প কিছুকালের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

পাঠান অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা আনয়নের জন্য যদি একজনকে কৃতিত্ব দিতে হয়, তিনি ছিলেন আবদুল গফফুর খান। যদিও তাঁর একজন সহকারী এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন, কিন্তু আবদুল গফফুরের ভূমিকা ছিল বিশেষ সক্রিয়। তাঁর এই ত্যাগ ও বহুমুখী কর্মের জন্য তাঁকে 'Fakher-e-Afghan' অর্থাৎ 'জনগণের গৌরব' মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। আবার মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক থাকায় তাঁকে 'সীমান্ত গান্ধী'ও বলা হত। নেতৃত্ব দেবার মত বিশেষ ক্ষমতা থাকার জন্য তাঁকে 'Bacha Khan' বলেও ডাকা হত। অবশ্য অনেকে তাঁকে 'বাদশা খান' নামে চেনে।

আবদুল গফফুর খান ছিলেন এক বিশেষ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দীর্ঘাকৃতি ও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও তাঁর মধ্যে সরলতার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়।

আবদুল গফফুর খান 1988 সালে 20 জানুয়ারী পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন।

[Mahadev Desai—Two servants of God, Delhi 1935 ; D. G. Tendulkar—Mahatma (in eight volumes) Bombay 1952 ; Faragh Bukhari—Bacha Khan (in Urdu) Lahore ; 1957 ; D. R. Tollwal—Bharatvarsh Ki Vihhutian (in Hindi), Nagpur, 1954 ; Report of the 45th Session of the Indian National Congress held at Karachi in 1931 ; The Young India (Ahmedabad) File, 1931 ; Jagdish Sharan Sharma, Indian National Congress ; A

Descriptive Bibliography, Delhi, 1958; Personal knowledge of the contributor.]

(ডি. এল. দত্ত) মেহের চাঁদ খান্না

আবদ্দল বারী (?—১৯৪৭)
Abdul Bari (?—1947)

আবদ্দল বারীর জন্ম সাহাবাদ জেলার কয়-লোয়ার-এ। তাঁর পিতা কুরবান আলি ছিলেন একজন প্দলিশ ইন্সপেক্টর। স্দন্নী ম্দসলমান ধর্মমতে বিশ্বাসী গোঁড়া "মালিক" বংশ গোষ্ঠীতে তাঁর জন্ম। "মালিক" বংশগোষ্ঠী দাবী করে, তাঁরা চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিহারের স্দবেদার-মালিক ইব্রাহিম বাইয়্দর বংশধর।

আবদ্দল বারী পাটনার টি. কে. ঘোষ অ্যাকাডেমির ছাত্র ছিলেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1919 সালে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তার পরেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় তাঁকে আইন পড়া স্থগিত রাখতে হয়।

তাঁর বিবাহ হয় কয়লোয়ার জেলারই জ্দলাইখা খাত্দনের সঙ্গে। তাঁদের দ্দই প্দত্র ও তিন কন্যা ছিল।

আবদ্দল বারীর রাজনৈতিক জীবনের শ্দর্দ খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বিহার প্রভিন্সিয়াল খিলাফৎ কমিটির তিনি য্দগ্ম সম্পাদক ছিলেন। 1921 সালে কিছ্দদিন তিনি বিহার বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনাও করেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা হলেও তিনি বিধানসভায় অংশগ্রহণ কর্ম-স্দচীর সমর্থক ছিলেন। 1923 সালে তিনি স্বরাজ্য পার্টির বিহার শাখার সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং জওহরলাল নেহর্দ ও স্দভাষচন্দ্র বস্দ প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের সদস্য হন।

আবদ্দল বারী বিহার বিধান পরিষদে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু 1930 সালে কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন। 1937 সালে তিনি প্দনর্নির্বাচিত হয়ে বিধানসভার ডেপ্দটি স্পীকার মনোনীত হন। বিহার সত্যাগ্রহ কমিটির তিনি একজন সদস্য ছিলেন এবং বিহার 'সেবাদল' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সংগঠকদের একজন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য 1932 সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে কারার্দদ্ধ করা হয়।

1931 সালে বিহার সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনের প্রধান অন্দপ্রেরণাস্বর্দপ ছিলেন আবদ্দল বারী। তিনি সোস্যালিস্ট পার্টির অর্গানাইজিং কমিটির সভাপতিও নিয্দক্ত হন। 1934 সালে পাটনায় যে সারা ভারত সমাজতন্ত্রী সম্মেলন হয়, তার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন তিনি। 1937 সালে মাসরাকে (সরণ জেলা) যে বিহার প্রভিন্সিয়াল করফারেন্স এবং 1941 সালে সাহাবাদ ছাত্র সম্মেলন হয় সেখানেও আবদ্দল বারী সভাপতিত্ব করেন। 1946 সালে বিহার প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিয্দক্ত হন। 1945 সালে যখন গান্ধীজী বিহারে দাঙ্গা অধ্দ্যষিত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সফর করেন তখন আবদ্দল বারী গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন।

আবদ্দল বারীর প্রধান অবদান হল শ্রমিক সং-গঠনের ক্ষেত্রে এবং এই শ্রমিক আন্দোলনকে ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম করায়। 1929-এ তীব্র অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে টাটা-র শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ জমে উঠতে থাকে। টিনপ্লেট কোম্পানিতে দীর্ঘদিন ব্যাপী এক শ্রমিক ধর্মঘটের স্দচনা হয়। এই সংকটকালে আবদ্দল বারী শ্রমিক নেতার্দপে আত্মপ্রকাশ করেন। 1936 সালে তিনি গঠন করলেন টাটা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বিহার এবং উড়িষ্যার আরও প্রায় পঞ্চাশটি শ্রমিক ইউনিয়নের তিনি সভাপতি ছিলেন। 1936 সালের পর থেকেই দক্ষিণ বিহারের কয়লা, লোহা ও অভ্রখনি অঞ্চলে আবদ্দল বারী হলেন এক জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা। তিনি শ্রমিক-দের মৌলিক অধিকারগ্দলির—যেমন সংঘবদ্ধ হবার অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং শ্রমিকদের জন্য উচ্চতর বেতন ও ভাতা তিনি আদায় করেছিলেন। তিনি জানতেন যে ভারতের খেটে খাওয়া মেহনতী মান্দষরা প্দরোপ্দরি তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। এর জন্য তিনি 1937 এর কংগ্রেস মন্ত্রীসভার সমালোচনা করেছেন এই বলে যে—কংগ্রেস শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে যদিও এ বিষয়ে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

শ্রমিক ইউনিয়নগ্দলিকে পিতৃস্দলভ শাসনে তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে র্দঢ়, স্বৈরতান্ত্রিক হলেও—মালিকপক্ষের সঙ্গে আলাপ

আলোচনায় কখনোই তিনি শ্রমিক পক্ষের পরাজয় হতে দেন নি। যদিও নিজের কর্তৃত্বের কোন বিরোধিতা তিনি মেনে চলেননি তবু তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ। যদিও পরে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থী মতবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের জন্য তাঁর নেতৃত্বের ক্ষেত্র অনেকটাই সরে গিয়েছিল, তবুও তিনি সকল রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত শ্রমিকের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা ও সততার জন্য।

তিনি শ্রমিকদের নিজস্ব একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহও করেন। তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। প্রথম জীবনে তিনি মতিলাল নেহরু প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী দৈনিক "দি ইণ্ডিপেনডেণ্ট" পত্রিকার সম্পাদক গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন।

আবদুল বারীর আর একটি রাজনৈতিক অনন্যতা হল—বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতি তাঁর সচেতনতা। 1937 সালে বিহার প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির আকাশে ফের মেঘ জমছে। সভাপতির ভাষণে তিনি প্রাচ্য দেশগুলিতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির "দখল প্রভুত্ব ও শোষণের" কথা উল্লেখ করে বলেন, লীগ অব্ নেশন্স এই শোষণের প্রতিকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। নিজের দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে সংঘাত ও ধ্বংসই ধনবাদী দেশগুলির নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে প্রাচ্যের জন্য আশার আলো নিয়ে আসবে।

আবদুল বারী ভূমি বণ্টন নীতি সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং কৃষকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য বিহার কংগ্রেস যে ভূমিবণ্টন সংক্রান্ত অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করে—সেই কমিটিতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। শাহাবাদে কৃষকদের জলকর সংক্রান্ত দাবী দাওয়ার সপক্ষে তিনি ওকালতি করেন। তিনি শিল্পায়ন ও কৃষি পদ্ধতির আধুনিকীকরণের উপর জোর দিয়েছিলেন। সাসারামে 1932 সালে তিনি গ্রামীণ শিল্প সংস্থার একটি শাখা স্থাপন করেন।

প্রচলিত শিখা পদ্ধতি যা যুবকদের রক্ষণশীলতা ও আত্মপরায়ণতার দিকে ঠেলে দেয়, আবদুল বারী তার কঠোর সমালোচক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন যে, 'জাতীয় শিক্ষা' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তিনি তাকে সমর্থন করেছিলেন।

আবদুল বারী মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন এবং তিনি সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের কংগ্রেসের নেতৃত্বে সামগ্রিক জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য বক্তব্য রেখেছিলেন।

দীর্ঘ, কৃশ, শ্মশ্রুমণ্ডিত আবদুল বারী ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনযাত্রা, পোশাক, আচরণ খুব সাধারণ আটপৌরে ছিল। 1947 সালের 28 মার্চ অত্যন্ত দুঃখজনক এক ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ধানবাদ থেকে গাড়িতে পাটনা আসার সময় খুশরুপুরে চোরাচালান বিরোধী পুলিশ তাঁর গাড়ি থামায়। কিছু ভুল বোঝাবুঝির ফলে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হওয়ায়, একজন শান্ত্রী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং তাঁর মৃত্যু হয়।

[Datta, K. K.,—History of Freedom Movement in Bihar, Vols. I-III, Patna, 1957 ;—Non-Cooperation and Khilafat Movement in Bihar and Orissa ; Ghosh, M.,—Our Struggle (A History of the Trade Union Movement in Tisco Industries in Jamshedpur), Calcutta, 1957 ; Prasad, Rajendra—Mahatma Gandhi and Bihar ; The Searchlight (English Daily, Patna), 22 January, 23 April 1930, and 13 April 1947 ; The Indian Nation (English Daily, Patna), 18 May, 9 November 1934, 11 July 1937, 27 May 1938, 13 April 1947 and 9 November 1964 ; also the Contributor's interview with Shri Kedar Das, a close associate of Abdul Bari.]

(রামেশ্বর প্রসাদ) কেয়ামুদ্দিন আহমেদ

আবদুল বারী (মৌলানা) মুহম্মদ (১৮৭৮-১৯২৬)

Abdul Bari (Maulana) Muhammad (1878-1926)

মৌলানা আবদুল বারীর জন্ম 1878 লক্ষ্ণৌতে। তিনি ছিলেন মৌলানা আবদুল বাহারের পুত্র। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা পয়গম্বর মহম্মদের বংশোদ্ভূত বলে দাবী করতেন। তাঁর পিতাও পরিচিত ছিলেন পীর হিসেবে (ধর্মীয় এবং অধ্যাত্মবাদী মুসলমানদের

সম্বন্ধে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধি)। তিনি যাবতীয় শিক্ষাই লাভ করেন মৌলভী এবং মৌলানাদের কাছে এবং ইসলামিক শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং তাঁর সুযোগ কখনও তিনি নেননি। তাঁর এই ঘৃণা এতদূর অবধি পেঁছেছিল যে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভারতের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার মূল হিসাবে দায়ী করতেন, যদিও জীবনের শেষ ভাগে তিনি তাঁর সন্তানদের এবং নিকট আত্মীয়দের পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের সুযোগের জন্য আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন।

তিনি দু'বার বিবাহ করেছিলেন। পিতার মত তিনিও পীর হিসাবেই পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর বিশাল সংখ্যক অনুগামীও ছিল। তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান-এর জীবন যাপন করতেন এবং আজমীরে 'উরসে' নিয়মিত যোগদান করতেন। 1918 সালের পর তিনি মক্কায় যান। তিনি এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে পশ্চিম এশিয়াতে মুসলমানদের দারিদ্র্যের কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ প্রশাসন এবং তার প্রভাব।

জামাত-উলেমা-ই-হিন্দ্-এর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি। 1912-13 সালে বল্কান যুদ্ধে আহত মুসলমানদের সাহায্য পাঠানোর একটি প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। 1914-র মে মাসে প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান-ই-খুদ্দম-ই কাবা নামে একটি পুরোপুরি ধর্মীয় সংস্থাকে তিনি সংগঠিত করেন যাতে কাবার পবিত্রতাকে সংরক্ষিত করা যায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় জায়গা যাতে ব্রিটিশের হাতে ধ্বংস না হয়। আঞ্জুমান আরও নানাভাবে সাধারণ মুসলমানদের উন্নততর পর্যায়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছিল। বিনামূল্যে ইসলামিক শিক্ষা দেবার জন্য লক্ষ্মৌতে ফিরিঙ্গি মহলে তিনি মাদ্রাসা-ই নিজামিঞা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লেখার মাধ্যম হিসেবে তিনি উর্দু এবং আরবীক ব্যবহার করতেন এবং উর্দুতে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ পত্রে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন।

একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা সবদাই প্রচার করেছেন এবং হিন্দু-মুসলমান বিরোধ অবসানের জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। 1913 সালে কানপুরে একটি মসজিদকে কেন্দ্র করে বিরোধ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পর্ককে সাংঘাতিক চিড় ধরিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে ঘটনাটির সমাধানের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। সে ব্যাপারে তিনি স্বয়ং গভর্ণর-জেনারেলকে চিঠি লিখেছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তিনি মুসলমানদের ব্রিটিশদের বিজয়োৎসব পালন করতে বারণ করে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। খিলাফৎ আন্দোলনে তাঁর পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থী প্রতিনিধিদলের তিনি ছিলেন সদস্য। তিনি রাওলাট আইনের বিরোধী ছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অহিংস আন্দোলনের তিনি ছিলেন সর্বাত্মক সমর্থক।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একজন কঠোর সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর মৌলানা আবদুল বারীর প্রভাব ছিল অপরিমেয়। এই কারণেই তিনি গ্রেপ্তারের হাত থেকে বেঁচে যান।

[Personal papers of Maulana Abdul Bari available at Feringhi Mahal, Lucknow ; Roznama Ukhoowat—March 14, 16 and April 19, 20, 1919 (An Urdu Daily, Lucknow) ; Pamphlet in Urdu issued by the Anjuman Halal-i-Ahmar (1912-13) available at Feringhi Mahal, Lucknow ; Tamam Izlah Oudh Ke Liye, Jashan Sulah Ke Mutalliq Hidayat (An Urdu Pamphlet available at Feringhi Mahal, Lucknow) ; Jamiat Ulema Kiya Hay, Parts I & II—by Maulana Mohammad Miyan (in Urdu) ; The Story of My Experiments with Truth—by M. K. Gandhi ; The Indian Annual Register (N. N. Mitra), 1920 and 1924 ; Personal interview with Maulana Mohammad Reza Ansari, nephew of Maulana Abdul Bari, at Feringhi Mahal, Lucknow.]

এল. দেওয়ানী **এম. এস. জৈন**

আবদ্‌ল মজিদ খনাজা (১৮৮৫-১৯৬২)
Abdul Majid Khwaja (1885-1962)

1885 সালে আলিগড়ের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে খাজা আবদ্‌ল মজিদ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ জেলায় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে তাঁর বাবা খনাজা মহম্মদ ইউস্‌ফের সঙ্গে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রথাগত পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করলেও পরবর্তীকালে আবদ্‌ল মজিদ আলিগড়ের এম. এ. ও কলেজে যোগদান করেন। অবশ্য আরও পরে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কেম্‌ব্রিজ যান। সেখানে জওহরলাল নেহর্‌ ছিলেন তাঁর সহপাঠী।

আবদ্‌ল মজিদ খাঁন আলিগড়ের নবাব সালিমউল্লা খাঁনের নাতনীকে বিবাহ করেন। আইনজীবী র্‌পে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগ দেন। এখানেই একটি বাড়ি তৈরি করে তিনি তাঁর বসবাস শ্‌র্‌ করেন। তিনি তাঁর পৈত্রিক বাসভূমি আলিগড়ে ফিরে আসেন এবং সেখানকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। 1962 সালের 2 রা ডিসেম্বর তিনি মারা যান।

1920 সালে তিনি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্ব্‌দ্ধ জামাত-ই-উলেমা হিন্দের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে গড়ে তোলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি। এই বছরেই য্‌ক্ত প্রদেশের খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি সক্রিয় ভাবে য্‌ক্ত হন। ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবাসীর দাবি জানানোর জন্য খিলাফৎ প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন।

সমসাময়িক জননেতাদের মধ্যে জওহরলাল নেহর্‌ ও আহম্মদ খাঁন শেরওয়ানীর সঙ্গে পরে ঘনিষ্ঠাতা ছিল সর্বাধিক। এছাড়া হালিম আজমল খাঁন, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, ডঃ ম্‌খতার আহম্মদ আনসারি, ডঃ সৈয়দ আহম্মদ, মৌলানা আবদ্‌ল কালাম আজাদ, ডঃ জাকির হ্‌সেন প্রম্‌খ নেতাদের সঙ্গে পরিচয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে খিলাফৎ আন্দোলন ও কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভাবধারার য্‌গ্ম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি তাঁর মতামত সভা-সমিতির মাধ্যমে প্রচার করতেন।

সমসাময়িক য্‌গের অনেকের মতো গান্ধীর অহিংস সংগ্রাম, সরল জীবন যাপন পদ্ধতি তাঁর চিন্তাধারা এবং কার্যাবলীকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। গান্ধীজির প্রতি তিনি পোষণ করতেন অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

আবদ্‌ল মজিদ খাঁন হিন্দ্‌-ম্‌সলমান ঐক্যে দ্‌ঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অন্‌শাসন তিনি প্‌রোমাত্রায় মেনে চলতেন। রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দ্‌ ম্‌সলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকুক—এ কথা বিশ্বাস করতেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামের মতাদর্শকে তিনি কোন ভাবেই ক্ষ্‌ণ্ণ হতে দিতেন না। তিনি মনে করতেন আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে একজন ম্‌সলমানের উচিত ইসলামের নীতিকে অন্‌সরণ করা। 1940 সালে দিল্লীতে আহ্‌ত ম্‌সলিম ইনডিপেনডেণ্ট সম্মেলনে ভারতের স্বাধীনতার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ম্‌সলমানদের সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় অধিকার বজায় রাখার জন্য তিনি ম্‌সলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নি। তিনি শ্‌ধ্‌ ছিলেন ম্‌সলমানদের জন্য কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতির পক্ষে। কিন্তু স্বতন্ত্র পাকিস্তান গঠনের প্রতি যে তিনি বির্‌প মনোভাব পোষণ করতেন একথাও তাঁর উক্তির ও রচনার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। তিনি বলতেন পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা এতই অবাস্তব এবং অসার এর সমর্থনে আমি একটি কথাও বলতে চাই না। পাকিস্তান গঠনের পরেও এ নিয়ে কোন মন্তব্য করতে তিনি অস্বীকৃত হন।

আবদ্‌ল মজিদ তাঁর স্বধর্মাবলম্বীদের তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার পরামর্শ অবশ্যই দিতেন। তিনি মনে করেন যে ম্‌সলমানরা যখন তাঁদের হীনমন্যতা ত্যাগ করে একত্র ও সংঘবদ্ধ-ভাবে কাজ করবে তখন প্‌থিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে তাদের বঞ্চিত করতে পারে। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার ওপর তিনি "Communalism in India, its origin and growth" নামে একটা বই রচনা করেন।

আবদ্‌ল মজিদ মনে করতেন ভারতবর্ষের অর্থ-নৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর বিশেষ নির্ভরশীল। তাঁর মতে, "জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না। তাঁর বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের অব্যবস্থা দ্‌র করার জন্য প্রয়োজন হিন্দ্‌ ও ম্‌সলমানদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।

এছাড়া তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্‌দ্ধির জন্য কুটির শিল্পের উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন। অন্যান্যদের মত, অর্থনৈতিক বিকাশে তিনি বাস্তব দ্‌ষ্টিভঙ্গীর গ্‌র্‌ত্ব অন্‌ভব করেন। তাঁর এও

বিশ্বাস ছিল যে যতদিন না মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাঁদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করবে ততদিন পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে না।

ঘটনাক্রমে তিনি একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। প্রথম থেকেই জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার কার্যক্রমের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ডাঃ এম. এ. আনসারির মৃত্যুর পর 1936 থেকে 1962 সাল পর্যন্ত তিনি জামিয়ার আচার্য পদে বহাল ছিলেন।

খাজা আবদ্দল মজিদ পেশার দিক থেকে ব্যবহারজীবী, রুচির দিক থেকে রাজনীতিক ও ঘটনাচক্রে শিক্ষাবিদ এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

[(Jamia (in Urdu) ; January 1963 ; M. H. Abbas—All About the Khilafat ; Jawaharlal Nehru—Autobiography ; Jag Parvesh Chander—India Steps Forward ; The Story of Cabinet Mission in India ; The Indian Annual Register, 1920-23, 1930, 1940)].

এল. দেওয়ানি **এম. এ. আনসারি**

আবদ্দল রহমান সাহেব (মূহম্মদ) (১৮৯৮-১৯৪৫)
Abdul Rehiman Saheb, Muhammad
(1898-1945)

মূহম্মদ আবদ্দল রহমান সাহেবের জন্মকাল 1898। বাবা ছিলেন পন্নাক্কাচলের আবদ্দল রহমান সাহেব এবং মা আইসুম্মা ছিলেন কারুক্কাপদমের মেয়ে। দুজনেই ছিলেন কেরালার ক্রাঙ্গানোরের (কোদুনগাল্লুর) নিকটবর্তী আঝিকোদের অবস্থাপন্ন মুসলিম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই এবং তিন বোন।

মোপলা মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। ধর্মীয় আচার আচরণসমূহ তিনি কঠোর ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন জমিদার এবং ধর্মীয় নেতা। 1926 সালের মে মাসে তিনি ক্রাঙ্গানোরের অন্তর্গত এরিয়াডের একটি অভিজাত মুসলমান পরিবারের কন্যা মুনজী বিভাথুকে বিবাহ করেন। 1929 সালে এপ্রিল মাসে তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়। নিঃসন্তান আবদ্দল রহমান আর দারপরিগ্রহ করেন নি।

গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি ক্রাঙ্গানোরের সরকারী উচ্চ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরে তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর আর্কট প্রদেশের ভানিয়ামবাদীর মাদ্রাসা ইসলামিয়াতে ভর্তি হন। কিন্তু হঠাৎ তা ছেড়ে দিয়ে তিনি কালিকটের বাসেল জার্মান মিশন কলেজে যোগদান করেন। সেখানে অল্পকাল থাকার পর মাদ্রাজের মহমেডান কলেজে যোগদান করেন। এই কলেজ থেকে কলাবিদ্যায় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. (অনার্স) ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু শীঘ্রই মাদ্রাজ ছেড়ে আলিগড়ে জাতীয় মুসলিম কলেজে (জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া) যোগদান করেন। 1921 সালে গান্ধীজি এবং মওলানা মহম্মদ আলীর ডাকে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে খিলাফৎ এবং কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি মালাবার রওনা হয়ে যান।

মওলানা ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা তাঁর রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবান্বিত করেন। কালিকটের কেরালা খিলাফৎ কমিটির তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। 1921 সালে মোপলা বিদ্রোহের সময় তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর সম্প্রদায়ের সদস্যদের তিনি সব সময়ই হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখতে চেয়েছেন। যখন তিনি অন্যান্য কাজের সঙ্গে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সেই সময় অর্থাৎ 1922 সালের 21 অক্টোবর 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে মার্শাল ল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী অভিযুক্ত হন। ভেলোর সেণ্ট্রাল জেলে তিনি দু বছর কারান্তরালে ছিলেন। মেয়াদ শেষ হবার পর তিনি "মোপলা নিপীড়ন আইন" (Mopla Outrages Act) এবং অভ্যন্তরীণ প্রবসন আইন (Inland Emigration Act)-এর বিরোধিতা করে সাহসের সঙ্গে লড়াই করেন। 1928 সালে 12 অক্টোবর থেকে প্রকাশিত মালয়ালাম ভাষায় ত্রি-সাপ্তাহিক "আল আমিন"-এর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। 1930 সালে 25 জুন থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা সঞ্চারের জন্য এটি একটি দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। তাঁর সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ সদস্যই কংগ্রেসের জাতীয়

কার্যাবলীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। সরকারী নিপীড়নের নীতি সহ্য করতে না পেরে 1939-এর 29 সেপ্টেম্বর থেকে "আল আমিন" প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

1930 সালে যখন কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করা স্থির করেন তখন মালাবারের ম্সলমানদের এক প্রভাবশালী অংশ সরকার কর্তৃক সমর্থিত হয়ে আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করে এবং সমস্ত মালাবার জ্ড়ে কংগ্রেসের সভাসম্হে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আবদ্ল রহমান এবং মৌলভী সইদ এই সময় এগিয়ে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের প্রতিরোধ করেন এবং সমগ্র ম্সলিম সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহবান জানান। এই আবেদনে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়।

কালিকটের সম্দ্র উপকূলে উচ্চপদস্থ প্লিশ অফিসারদের দ্বারা নৃশংসভাবে আক্রান্ত হবার পর 1930-এর 12 মে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ন-মাস অন্তরীণ থাকেন। জেল থেকে ম্ক্তি লাভের পর তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদী কাজকর্ম চালিয়ে যান। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং বাগ্মীতা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বিশেষত তর্ণ প্রজন্ম এবং ছাত্রদেরকে।

ক্রমশ তিনি কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তার নেতৃপদে আসীন হন। 1939 সালে কেরালা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তিনি সভাপতি হন এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। কংগ্রেসের ত্রিপ্রী অধিবেশনের পরে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং কেরালা ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সভাপতি নির্বাচিত হন 1939 সালেই। 1940 সালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ভেলোর সেন্ট্রাল জেলে 1945 সালে 4 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আটক থাকেন। 1932-34 সালে তিনি কালিকটের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্য হন এবং 1932 সাল নাগাদ মালাবার প্রাদেশিক বোর্ডেরও সদস্য হন। 1937-এ তিনি মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

1945 সালে বন্দী দশা থেকে ম্ক্তি লাভের পর তিনি সমগ্র মালাবার জ্ড়ে কংগ্রেস প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু কর্মরত অবস্থায় 1945 সালের 22 ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে মালাবারে কংগ্রেস আন্দোলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একজন ধর্মনিষ্ঠ ম্সলমান হয়েও তিনি হরিজনদের এবং মন্দির প্রবেশাধিকার আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। একজন প্রকৃত ম্সলমান হিসেবে তিনি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের দ্র্বলতা দ্র করতে সচেষ্ট ছিলেন। মক্কায় তিনি একবার তীর্থ করতে যান। 1938 সালের সিংহল ভ্রমণ করতে গিয়ে ভারত এবং সিংহলের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য আবেদন করেন। জাতীয় শিক্ষার প্রসারের উপর তিনি গ্র্ত্ব আরোপ করতেন এবং অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতাকে দেশের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে মনে করতেন।

তিনি ছিলেন এক স্বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্র্ষ। উত্তর ভারত-এর ম্সলমানদের মত তিনি পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন সাহসী; প্রকৃতিগতভাবে অস্থির হলেও ম্লতঃ বিপ্লবী। মালাবারের ম্সলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ মান্ষের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকে তিনি তর্ণ প্রজন্মের নিকট বীরর্পে প্রতিভাত হন। দেশের জন্য তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের (মোপলা) নিকট তিনি ছিলেন শক্তির আধার।

[V. S. Keraayan—The Heroic Son of Kerala) K. P. Kesava Menon—Kazhinha Kalanagal ; personal knowledge of the Contributor).

কিঝোডাথ বাস্দেবন নায়ার

আবদ্ল লতিফ (নবাব) (১৮২৮-১৮৯৩)

Abdul Latif (Nawab) (1828-1893)

আবদ্ল লতিফ 1828 সালে প্র্ব বঙ্গের (অধ্না বাংলাদেশ) ফরিদপ্র জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির ম্হম্মদ একদিকে সদর দেওয়ানী আদালতের এক বিশিষ্ট আইনজীবী এবং অপর দিকে সে য্গের সফল সাহিত্যিকদের অন্যতম ছিলেন। 1836 সালে প্রকাশিত ফার্সী ভাষায় লিখিত "Jami-ul-Tawarik" (জামি-উল-তারিখ) বা পৃথিবীর ইতিহাসের (Universl History) রচয়িতা ছিলেন তিনি। আবদ্ল লতিফ অল্প বয়সেই কলকাতায় চলে আসেন এবং কলকাতা

মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেই সময় থেকেই মাদ্রাসাতে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল। আবদুল লতিফ ইংরাজি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করে সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি মাদ্রাসাতেই অল্পকাল শিক্ষকতা করেন।

1849 সালে আবদুল লতিফ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পদে আসীন হন এবং ক্রমে এই বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আরোহণ করেন। তিনি কিছুকাল কলকাতার "Presidency Magistrate-এর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের সরকারী কর্মজীবনে তিনি সর্বস্তরের জনগণের অকৃত্রিম ভালবাসা এবং উষ্ণ সৌহার্দ অর্জন করেছিলেন। 1863 সালে লর্ড এলগিন তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Fellow' নিযুক্ত করেন। এই সূত্রেই তিনি সর্বপ্রথম বৃহত্তর জন সমাজের কাছে পরিচয় লাভের সুযোগ পান। 1877 সালে লর্ড লিটন তাঁকে 'খান বাহাদুর' ও 1880 সালে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিন বৎসর পর তিনি লর্ড রিপন কর্তৃক 'Order of the Companion of the Indian Empire' সম্মানে ভূষিত হন। বিভিন্ন সময়ে তিনি "Justice of Peace", "Municipal Commissioner এবং বঙ্গদেশের Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন। 1893 সালের 10 জুলাই নবাবের মৃত্যু হয়।

নবাব আবদুল লতিফের সাধারণ ভারতীয় জনগণের জন্য এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে যে অমূল্য অবদান ছিল তা তাঁকে অবিস্মরণীয়তা দান করেছে। "Mohamedan Literary Society"র প্রতিষ্ঠাতা তথা সম্পাদক হিসাবে তিনি এই 'Society'-র মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজে নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষালাভের ফলে মুসলমান সম্প্রদায় যেন সমসাময়িক ইউরোপীয় ও স্বদেশবাসী হিন্দুদের সংস্কৃতি সম্পন্ন জীবনধারার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে এবং তাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে। প্রায় সর্ব ব্যাপারেই মুসলমান সম্প্রদায় নবাবের পরামর্শ গ্রহণ করত এবং তাঁর উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনত। কলকাতা মাদ্রাসায় "Anglo-Persian" (ইঙ্গ-পারসিক) বিভাগের উদ্বোধনে নবাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার আরবী শিক্ষা বিভাগটিও নবাবের চেষ্টাক্রমেই স্থাপিত হয়। তাঁর লেখা "A Short Account of my Public Life" 1885 সালে প্রকাশিত হয়। বাংলার লেফটেনেণ্ট গভর্ণর Sir J. P. Grant-এর অনুরোধে তিনি তাঁর অপর দুই গ্রন্থ "A Paper on Mohamedan Education in Bengal"—(1868) এবং "A Minute on the Hooghly Madrasah" (1877) রচনা করেন।

নবাবের অপর যে অবদানটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে সেটি হলো হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস—দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সৌভ্রাত্র ক্ষুণ্ণ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সেই সময়ে মুসলমান নেতাদের মধ্যে নবাবের চেয়ে হিন্দুদের অধিকতর সুহৃদ আর কেউ ছিলেন না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতাবোধ জাগ্রত করার কাজে তিনিই সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছিলেন।

অনন্যসাধারণ চারিত্রিক গুণাবলী ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বদান ও সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী নবাব সরকার তথা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের বিশ্বাসভাজন নেতা হয়ে উঠেছিলেন। "সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁর কণ্ঠে যে বাণীই ধ্বনিত হত সকলেই তা মনোযোগ সহকারে শুনত এবং পালন করত।"

[(Nawab Abdul Latif—A Short Account of my Public Life, Calcutla, 1885 ; F. B, Bradley-Birt-Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century, Calcutta, 1910 ; C. E. Buckland-Bengal under Lt. Governors, Calcutta, 1905 ; Claude Campbell-Glimpses of Bengal, Calcutta, 1908 ; W. W. Hunter-Mussalmans of Bengal, Calcutta, 1872 ; Sir Richard Temple-India, 1880)]

(পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়) আবদুস শুভান

আবদুল লতিফ ফারুকী (১৮৯৩— ?)

Abdul Latif Farookhi (1893— ?)

1893 সালের 15 মার্চ আবদুল লতিফ ফারুকী মাদ্রাজে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নবাব আবদুল

ওয়াহাব খান বাহাদুর ছিলেন আর্কটের নবাবের পৌত্র এবং মাতা ছিলেন পৌত্রী। তিনি এক ধনী সুন্নী মুসলমান পরিবারের সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে তিনি গৃহেই শিক্ষকের নিকট উর্দু, আরবী এবং ফার্সি পড়েন। 1923 সালে তিনি কর্ণাটকের চতুর্থ রাজার কন্যা এবং মহামান্য নবাব অজিমৎ উন্নিসা বেগমের পৌত্রী হিদায়ৎ উন্নিস বেগমের পাণি গ্রহণ করেন। 1939 সালে তিনি দ্বিতীয়বার আর্কটের দ্বিতীয় রাজার পৌত্র নবাব সালাউদ্দিন খান বাহাদুরের কন্যা আমাথুল বসির মুবারকউন্নিসা বেগমকে বিবাহ করেন।

কিশোরাবস্থায় St. Thome High School এ তিনি ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত Father Hylegus'র সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি তাঁর পিতৃব্য কবি মৌলানা নবাব তাজুমল হুজাবির খান বাহাদুর ও সামসুল উলেমা মৌলামা আবদুল রহিম শাহ শাতির দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে তিনি আলি ভ্রাতৃগণ এবং এস. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া কোরাণ এবং ম্যাকলের রচনাসমূহ তাঁর মনে ছাপ ফেলেছিল।

1921 সালে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক এবং অহিংস নীতির প্রবক্তা ছিলেন। অসহযোগ এবং খিলাফৎ আন্দোলনেরও তিনি সমর্থক ছিলেন। অবশ্য বিদ্যালয় ও কলেজ বর্জন করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। 1926 সালে স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দানের পূর্বে তিনি মুসলিম লীগের সদস্য এবং জামায়েত উল-আলেমের সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। পরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলেও বহু বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের মতানৈক্য ঘটত। 1947 থেকে 1952 সাল পর্যন্ত তিনি ডেমেক্র্যাটিক পার্টির সদস্য ছিলেন।

আবদুল লতিফ 1921 সালে খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে সভা সম্মেলন ধর্মঘট ইত্যাদির আয়োজন করেন। তিনি কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হয়েছিলেন এবং নবাব পরিবারের বংশধর হিসাবে যে রাজনৈতিক ভাতা পেতেন তাও প্রায় এক দশককাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

1927 সালের মার্চ, এপ্রিল মাসের কোন এক সময় দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম নেতৃ সম্মেলনে (Conference of Muslim Leaders) যুক্ত নির্বাচক মণ্ডলী গঠনের প্রশ্নে মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটে। 1926 সালে স্বরাজ্য দলে সহকারী সদস্য হিসাদে তিনি যোগদান করেন। ঐ বছরেই নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে তিনি Central Legislative Assembly তে নির্বাচিত হন।

Madras Presidency Muslim Conference এর সচিব হিসাবে 1929 সালের নভেম্বর মাসে তিনি বলেন "দেশের এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মাদ্রাজ প্রদেশের মুসলমানদের কর্তব্য প্রদেশ নির্বিশেষে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও জাতীয় অধিকার রক্ষার যথাবিহিত উপায় নির্দ্ধারণ করা। ...সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুসলমানরা যাতে ভারতের রাজনীতিতে মর্যাদার সঙ্গে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করাই আমাদের লক্ষ্য।"

1930 সালে Central Legislative Assembly-তে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন— "দেশের সব রাজনৈতিক দলেরই প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত"। তিনি এই সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে Simon Commission-এর সুপারিশ ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক নয়। তাঁর মনে হয়েছিল যে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবিগুলিকে অবহেলা করা হয়েছে এবং শুধু মাত্র আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বারা (Civil Disobedience Movement) ভারতের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়। সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের জেহাদ ঘোষণাকে তিনি বিবেচনাহীন কার্য বলে অভিহিত করেছিলেন।

আবদুল লতিফ ফারুকী বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যথাক্রমে মাদ্রাজের "জমিয়ৎ আহরর" ও 1921 সালে "জমিয়ৎ উলেমার" সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। তিনি 1923 ও 1929 সালে Town Congress Committee, Madras Presidency Muslim Conference-এর সম্পাদক ও Andhra Provincial Congress Committee-র যুগ্ম সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন (1923)। 1944 সাল থেকে 1947 সাল পর্যন্ত তিনি Madras Provincial League-এর সচিব ছিলেন। 1947 সালে Madras Legislative Council-এ নির্বাচিত হয়েছিলেন। 1947-48 সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হয়েছিলেন। 1922 সাল থেকেই তিনি "Azad Hind" এর সম্পাদক ছিলেন। নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সরকারী আদেশে এই পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া

হয়েছিল ; 1943 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত তিনি ইংরাজি, তামিল ও উর্দুতে প্রকাশিত 'মুসলিম' নামক পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন। 1945 সাল থেকে তিনি উর্দুতে "মুসলমান" পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আবদুল লতিফ ফারুকী ছিলেন একজন অনাড়ম্বর, ধর্মপ্রাণ, রক্ষণশীল মুসলমান। পশ্চিমী শিক্ষা পদ্ধতির সমর্থক হিসাবে তিনি গান্ধীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় সরকারের নির্যাতন নীতির নিন্দা করলেও স্বাধীনোত্তর কালে ব্রিটিশদের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে সহযোগিতার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন, নারীদের অবস্থার উন্নতি সাধনেও তিনি ছিলেন আগ্রহী। কিছু কিছু বিষয়ে রক্ষণশীলতা থাকা সত্ত্বেও আবদুল লতিফ ফারুকী মোটামুটি প্রতিবাদী ও প্রাদেশিকতা বিরোধী ছিলেন।

[The Hindu files (Specially of November 30, 1929). The Mail files ; The Azad Hind files ; Madras Legislative Directory, 1950 ; Proceedings, Madras Legislative Council, 1947-52 ; Proceedings of the Central Legistative Assembly, 1926-30 ; Personal Interview by the Research fellow (June 10, 1967).]

(ইম্যানুয়েল ডিভিয়েণ) এস্. কৃষ্ণস্বামী

আবদুল হায়ি, মিঞা (১৮৮৯-১৯৪৬)
Abdul Haye, Mian (1889-1946)

মিঞা আবদুল হায়ির জন্ম 1889 সালের ডিসেম্বর মাসে, মৃত্যু 20 ডিসেম্বর, 1946। লুধিয়ানার একটি খ্যাতনামা এবং ধনী আওয়ান পরিবারে তাঁর জন্ম। সামরিক ঐতিহ্যের জন্য এই পরিবারের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আবদুল হায়ি 1908 সালে লাহোরের ফোরমান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রী এবং 1910 সালে লাহোরের আইন কলেজ থেকে ল' ডিগ্রী লাভ করেন।

মিঞা আবদুল হায়ি 1910 সালে একজন আইনজীবী হিসাবে তাঁর জীবন শুরু করেন। লুধিয়ানা মিউনিসিপ্যালিটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হন। 1923 সালে তিনিই প্রথম বেসরকারীভাবে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। লুধিয়ানা মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 1933 সাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। এই বৎসর তিনি তাঁর বাসস্থান লুধিয়ানা থেকে লাহোরে স্থানান্তরিত করেন। 1919 সাল থেকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁর জীবন শুরু হয়। তিনি লুধিয়ানার রাওলাট বিল-বিরোধী সম্মেলনগুলিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। খিলাফত আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্য সরবরাহ করে সরকারকে সাহায্য করে ইতিপূর্বে তিনি যে এম. বি. ই. খেতাব পেয়েছিলেন 1921 সালে তিনি তা সরকারকে ফিরিয়ে দেন। দুই বৎসর পর উদারপন্থী দলের প্রার্থী হিসাবে 1923 সালে পূর্ব পাঞ্জাব মুসলমান কেন্দ্র থেকে তিনি সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন। 1926 সালে তিনি সেই কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় নির্বাচিত হন। বিধান সভায় একজন স্পষ্টভাষী জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি স্বাক্ষর রেখেছিলেন এবং সেই সময়কার বড় রাজনৈতিক নেতা যথা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং মহম্মদ আলি জিন্না-র দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত হন। 1933-এ লুধিয়ানা থেকে লাহোরে স্থান পরিবর্তনের পর, তিনি পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পাঞ্জাবের রাজনীতিতেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং 1937-এ পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষামন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। 1946 সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আবার সৈন্য সরবরাহ এবং যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে সরকারকে সাহায্য করেন।

তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মিঞা আবদুল হায়ি একজন উদারনৈতিক এবং প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন নেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেন। যদিও একটি গোঁড়া মুসলমান পরিবারের সন্তানরূপে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন তবু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার মনোভাবের পরিচয় বহন করে। সমাজ-সংস্কার এবং হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা তিনি সর্বদাই প্রচার করতেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা সম্পর্কে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন। সমাজ-সংস্কারের নামে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন

সংশোধনের যে কোন প্রচেষ্টার তিনি তীব্র বিরোধিতা করতেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান বোধ হয় সর্বাধিক। ইসলামিয়া স্কুল, লুধিয়ানা ইসলামিয়া কলেজ, লাহোর আঞ্জুমান তারিখ্ই-ই তালিক, অমৃতসর ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে তিনি শিক্ষার সংস্কার এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়তামুখী করার ইচ্ছাও পোষণ করতেন।

প্রথমদিকে মিঞা আবদুল হায়ি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য কাজ করেছিলেন এবং ব্রিটিশের জোয়াল থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি পাক এটা চাইতেন। পরে তার মতামত পরিবর্তিত হয়। 1942 সাল নাগাদ তিনি বুঝতে পারলেন যে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে কোনরকম বোঝাপড়া সম্ভব নয় এবং এর একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান হচ্ছে ভারত বিভাগ। তিনি পাকিস্তান দাবীর একজন একনিষ্ঠ প্রচারক হয়ে উঠলেন এবং 1946-এ মুসলমান লীগ প্রস্তাবিত প্রত্যক্ষ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানান।

[Indian Legislative Assembly Debates, 1924-26, 1929, 1930 ; Punjab Legislative Assembly, Debates, 1937 ; Home Political F. No. 66/1924 ; Indian Annual Register (N. N. Mitra), 1937, 1946 ; Punjab's Who's Who.]

(টি. আর. সারীন) **বখসিস সিং নিজ্জর**

আবদুল হামিদ খান (১৮৯৬-১৯৬৬)

Abdul Hameed Khan (1896-1966)

1896 সালে মাদ্রাজে আবদুল হামিদ খাঁন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন আফগানিস্তান থেকে। তাঁর বাবা ধাধাখাঁন মাদ্রাজের একজন ধনী ব্যবসায়ী ও মানবসেবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আবদুল হামিদের মাতামহ মাদ্রাজের রাজ্যপালের এ. ডি. সি. ছিলেন। যদিও এই পরিবারটি এসেছিলেন আফগানিস্তান থেকে কিন্তু মাদ্রাজে তাঁরা বংশ পরম্পরায় বহুদিন ধরে বাস করছিলেন। তাঁরা গোঁড়া সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের বেশ উচুঁতে তাঁদের স্থান ছিল। 1927 সালে আবদুল হামিদ জীনৎ উন্নিসাকে বিবাহ করেন। 1935 সালে তিনি আবার রহিম খাতুন নামে আর একটি মহিলার পাণি গ্রহণ করেন।

হামিদ ওয়েসলি মিশন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কলেজ শিক্ষা লাভ করেন মাদ্রাজ খৃীষ্টান কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে (1916-20)। তাঁর পারিবারিক পরিচয় এবং পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষা তাঁকে একজন প্রখ্যাত ভাষাবিদে পরিণত করেছিল। তিনি উর্দু, ফার্সি, আরবী, ইংরাজী এবং তামিল জানতেন। প্রথম জীবনে মাদ্রাজ খৃীষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হগ ও বিখ্যাত দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণনের চিন্তাদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবন গান্ধীজী, রাজাজী ও সরোজিনী নাইডু দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

হামিদ খাঁনের বহু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রথমে কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসেন। খিলাফৎ আন্দোলনের সূচনাকালে তিনিই প্রথম মাদ্রাজে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। 1921 সালে কংগ্রেস যখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের নীতি অনুসরণ করতে উদ্যত হয় তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে তাঁর দলের মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রবল বিশ্বাস থাকায় চিত্তরঞ্জন দাস পরিচালিত স্বরাজ্য দলে তিনি যোগ দেন। এই স্বরাজ্য দলের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবার জন্য তিনি টি প্রকাশন এর সঙ্গে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে বার হন। পরে যখন তাঁর দল সংবিধান স্বীকৃত সংস্থাগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তখন তিনি রাজ্য কর্পোরেশনে নির্বাচিত হন। রাজ্য কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত হবার পর তিনি মনে করতেন যে পৌর শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানো উচিত নয়। 1935 সালে মাদ্রাজের মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হবার পর সেখানকার নাগরিকদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তিনি বিশেষভাবে নজর দেন। এছাড়া কর্পোরেশনের আর্থিক এবং কর ধার্য সমিতির সভাপতি হিসাবেও তিনি তাঁর যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

1927 সালে মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য হিসাবে তিনি নির্বাচিত হন। 1935 সালে আইন চালু হবার পর 1937 সাল নাগাদ আর একবার তিনি বিধানসভার

সদস্য পদ লাভ করেছিলেন। কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ থাকলেও মুসলিম লীগের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল এবং 1925 থেকে 1940 সাল পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ছিলেন। 1937 সালে মাদ্রাজে মুসলিম লীগ বিধান মণ্ডলের নেতা হিসাবেও তিনি মনোনীত হন। জাতীয়তাবাদী আধুনিক মনোভাবাপন্ন অনেক মুসলমান সদস্যের মত তিনিও নিজেকে কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে লীগের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত হন। অবশ্য স্বাধীনতা লাভের পর রাজাজীর নেতৃত্বে যখন মাদ্রাজ মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন তিনি আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন।

1938 সালে আর্কটের যুবরাজের দেওয়ান হিসাবে আব্দুল হামিদ মনোনীত হন এবং 1966 সালের 14 ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সেই পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আবদুল হামিদ জাতীয়তাবাদের গোঁড়া সমর্থক হলেও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না। ভারতের জন্য ব্রিটিশ সংসদীয় পদ্ধতি পছন্দ করলেও তিনি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণকে সর্বদা অপছন্দ করতেন। সামাজিকভাবে আবদুল হামিদ খাঁন কিছু কিছু আধুনিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বর্ণ বিদ্বেষ প্রথা ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির বিরোধী ছিলেন। নারীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহকে তিনি সমর্থন করতেন কিন্তু নারী পুরুষের একসঙ্গে শিক্ষার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে শিক্ষাবিদ। পাশ্চাত্য উদারনৈতিক শিক্ষা-ধারার অন্যতম সমর্থক হলেও তিনি মনে করতেন জাতীয় শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা যার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশের ওসমানিয়া কলেজের সভাপতির পদ ছাড়াও তিনি আন্নামালাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সিন-ডিকেটের সদস্যও ছিলেন। মাদ্রাজের হিন্দী প্রচার সভারও তিনি অন্যতম সমর্থক ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। মাদ্রাজের মুসলীম প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ ছিল। মাদ্রাজের 'আঞ্জুমানে'রও তিনি সভাপতি ছিলেন।

বক্তা ও লেখক হিসাবেও তাঁর জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়। তিনি 'ডেকান টাইমস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ডঃ অ্যানি বেসান্তের উপর তিনি একটি ছোট জীবনী চিত্রও প্রকাশ করে-ছিলেন। খেলাধুলার প্রতিও গভীর আগ্রহ থাকায় তাঁর চেষ্টায় মাদ্রাজের ক্রিকেট প্যাভেলিয়ানের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়েছিল। আবদুল হামিদ খাঁন ছিলেন এমন একজন মুসলমান যিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় না হলেও এদেশকেই সর্বস্ব দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

[S. M. Fossil—The Islamic South : Who's who in Madras, 1934 ; The Hindu Files ; Proceedings of the Madras Legis-lature, 1926-40 ; Personal interview of the Research Fellow with Abdul Hameed Khan]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) **এস. এন. পদ্মনাভন**

আবদুল হালিম গজনভী (স্যার) (১৮৭৬-১৯৫৩)

Abdul Halim Ghaznavi (Sir) (1876-1953)

আবদুল হালিম গজনভী 1876 সালের 11ই নভেম্বর পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) ময়মন-সিংহ জেলার টাঙ্গাইলে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার এবং ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর পরি-বারের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল হাকিম খান গজনভী। 1896 সালে আবদুল হালিম মারিয়াম খাতুনকে বিবাহ করেন। নিঃসন্তান খাতুন অল্পকালের মধ্যেই মারা যান।

জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি টাঙ্গাইলে থাকতেন—সেখানেই 1953 সালের 18 জুন তাঁর দেহান্ত ঘটে। তিনি ছিলেন প্রথম সিটি কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবদুল হালিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ শিষ্য। আবদুল হালিম ঐ সময়ের বিখ্যাত জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের ধারক ও বাহক আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হুসেন, ইসমাইল চৌধুরী, আনন্দ চন্দ্র রায়, অশ্বিনী কুমার দত্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, ভূপেন্দ্র নাথ বসু, মতিলাল ঘোষ, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ছিল তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা হয়ে আবদুল হালিম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগদান করেন ও 1905 সালে সরকারী নির্যাতন নীতির বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করেন। 1905-06 সালে কার্জন-পরিকল্পিত বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষেও তাঁর তীব্র আন্দোলন সমস্ত হিন্দু-মুসলমানকে 'একজাতি, একপ্রাণ, একতা' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। ঢাকায় জগন্নাথ কলেজের ক্যাম্পাসে 1905 সালের 27 আগষ্ট তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমাবেশে যোগদান করেন। 16ই অক্টোবর কলকাতায় সেই একই সমাবেশে, একই উদ্দেশ্যে পুনরায় আবদুল হালিম যোগ দেন। একই দিনে তিনি কলকাতার আপার সার্কুলার রোডের ফেডারেশন হলটির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উৎসবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই হলটিকে চিহ্নিত করা হলো হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীকরূপে। 1906 সালের 14 এবং 15 এপ্রিল বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ-দান করে তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য দেশবাসীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আবদুল রসুল। শারীরিক প্রতি-বন্ধকতার জন্য আবদুল রসুল ভাষণ দিতে না পারায় তাঁর ভাষণটি পড়ে শোনালেন আবদুল হালিম গজনভী। এই সময়কার বরিশালের এক ঐতিহাসিক মিছিলেও তিনি যোগদান করলেন। সরকার বল-প্রয়োগে এই মিছিল ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

স্বদেশী পণ্য সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্য তিনি কলকাতার বৌবাজার ও লালবাজার স্ট্রীটের মোড়ে 'দি ইউনাইটেড বেঙ্গল স্টোরস্' স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক দিক থেকে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের জন্য এই ক্ষতি তাঁর অন্তরে আনন্দের শিহরণ জাগায়।

1907 সালে তিনি জাতীয় মহাসভার সুরাট অধিবেশনে যোগ দেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা চরমপন্থী এবং নরমপন্থী নামে পরিচিত দুটি স্বতন্ত্র দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে গজনভী পরবর্তী জীবনে উদারপন্থী রাজনীতির সমর্থকরূপে আত্মপরিচয় দেন। যদিও তিনি বেঙ্গল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন এবং 1929 সালে কানপুর অনুষ্ঠিত মুসলিম কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন তবুও তিনি কোনদিন মুসলিম লীগে যোগ দেননি।

1926 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান লেজি-সলেটিভ অ্যাসেম্বলীর সদস্য হিসেবে তিনি হাউসের বহু বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পর পর তিনটি গোল টেবিল বৈঠকেই আবদুল হালিম যোগদান করেন।

কোনও দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত না বলে আবদুল হালিম সরকার কর্তৃক বহু সংস্থায় নিয়োজিত হন। 'বার্মা সেপারেশন কমিটি' (1930,) 'ফ্রাঞ্চাইস কমিটি' (1930), 'মাইনরিটিস কমিটি' (1930-32), 'ফেডারেল ফাইনান্স কমিটি' (1933), 'কনসালটেটিভ কমিটি' (1933), 'রেলওয়ে স্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটি' (1927-32), 'রেলওয়ে অ্যাডভাইসারি কমিটি' (1927-32), 'পাবলিক অ্যাকাউণ্টস্ কমিটি' (1933), 'জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি' (1933) এবং 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কমিটি' (1933) প্রভৃতিতে তিনি সদস্য হিসেবে যোগ দেন। 1933 সালে তিনি ওয়ার্ল্ড ইকনমিক কনফারেন্সে অ্যাড্‌ভাইসারি বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন।

1934-35 সালে তিনি কলকাতার 'শেরিফ' নিযুক্ত হন। পঞ্চম জর্জের পঁচিশ বছর রাজত্ব কালের পূর্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী উৎসব পালনের জন্য যে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কমিটি গঠিত হয় তিনি তার সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। 1935 সালে তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেওয়া হয়।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য এবং সিটি কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্যও ছিলেন তিনি। 1948 সালে তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয় থেকে দুটি রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

আবদুল হালিম কলকাতার একজন উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ীও ছিলেন। 1939-40 সালে তিনি মুসলিম চেম্বার অফ কমার্স ও 1945-46 সালে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি কয়েকটি কোম্পানীর অধিকর্তা ছিলেন। বেশ কয়েক বছর তিনি ইণ্ডিয়া স্টীম শিপ কোম্পানীর চেয়ারম্যান-রূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং ভারতে শিপবিল্ডিং ইণ্ডাস্ট্রির উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

উদারপন্থী মনোভাবাপন্ন আবদুল হালিম মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদ ছিলেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে তিনি সব সময়েই নিজেকে দূরে

রাখতেন। তিনি ব্যবসায় ও রাজনীতিকে একত্র করে দেশের সেবা করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা সর্ব সাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত হবে। স্বদেশপ্রেমী, শিল্পপতি এবং শিক্ষাব্রতী আবদ্‌ল হালিম ছিলেন আন্তরিকভাবে দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক।

[Haridas and Uma Mukherjee—India's Fight for Freedom, Calcutta, 1958 ; B. B. Majumdar—Indian Political Associations and Reform of Legislature (1818-1917), Calcutta, 1965 ; Abdul Hayat—Musalmans of Bengal, Calcutta, 1966 ; Priyanath Guha—Yajna Banga Ba Barisal Pradeshik Samitir Itihas (in Bengali), Calcutta, 1314 B. S. ; The Indian Yearbook (1939-40), Bombay, 1940 ; Proceedings of the City College Council (unpublished), 1945-49 and 29 June 1953 ; The Statesman, The Amrita Bazar Patrika, The Hindusthan Standard—20 June 1953 ; Information supplied by Syeda Motahera, Banoo, Poetess, who Knew Abdul Halim Ghaznavi well.

অমলেন্দ্‌ দে

আবদ্‌ল্লাহ্‌ ব্যারেলভী সৈয়দ (১৮৯১-১৯৪৯)
Abdullah Brelvi, Syed (1891-1949)

1891 সালের 18 সেপ্টেম্বর সৈয়দ আবদ্‌ল্লা ব্যারেলভী বোম্বাইতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল উত্তর প্রদেশের বেরিলীতে। বোম্বাইয়ের আঞ্জ্‌মান-ই-ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শ্‌র্‌ হয়। পরে তিনি এলফিনস্টোন কলেজে যোগদান করেন ও 1911 সালে ঐ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। মহাদেব দেশাই ও বৈকুণ্ঠ এল. মেহতা নামে তাঁর দ্‌ই সহপাঠীর সঙ্গে কলেজে থাকাকালীন গভীর বন্ধ্‌ত্ব গড়ে ওঠে এবং এই বন্ধ্‌ত্ব আজীবন অক্ষ্‌ন্ন ছিল। মহাদেব দেশাই গান্ধীজির ব্যক্তিগত সচিব হন ও বৈকুণ্ঠ এল. মেহতা বোম্বাইয়ের অর্থমন্ত্রী ও খাদি ও কুটির শিল্প কমিশনের চেয়ারম্যান হন। এই দ্‌ই বন্ধ্‌ পরবর্তীকালে স্বনামখ্যাত হন।

সাংবাদিকতায় ব্যারেলভীর আগ্রহ দেখা যায় এবং 'টাইমস্‌ অব ইণ্ডিয়া' কাগজে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর এই আগ্রহ দেখে ভি. এল. মেহতার পিতা লাল্‌ভাই সমালদাস স্যার ফিরোজশা মেহতার সঙ্গে ব্যারেলভীর পরিচয় করিয়ে দেন। তখন ব্যারেলভীর একজন সদ্য বি. এল. পাশ করা য্‌বক। মেহতার পিতা স্যার ফিরোজশা মেহতাকে অন্‌রোধ করেন ব্যারেলভীকে একটি উপয্‌ক্ত চাক্‌রী দিতে। ফিরোজশা 1915 সালে ব্যারেলভীকে 'বোম্বে ক্রনিকল্‌' এর সহকারী সম্পাদকর্‌পে নিয্‌ক্ত করেন। প্রথম বিশ্বয্‌দ্ধের সময়ে এই পত্রিকার সম্পাদক বি. জি. হার্নিমান যখন নির্বাসিত হন, তখন ব্যারেলভী সম্পাদক হন। কিছুদিন 'বোম্বে ক্রনিকলে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভ শ্‌ন্য রেখে তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ছাপার প্‌র্বে সংবাদ পরীক্ষা করার যে আদেশ সরকার এই পত্রিকা সম্বন্ধে জারি করেছিল তারই প্রতিবাদ স্বর্‌প এই শ্‌ন্য সম্পাদকীয় স্তম্ভ প্রকাশের সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন। 1920 সালে মার্মাডিউক পিকথল সম্পাদকর্‌পে নিয্‌ক্ত হন এবং ব্যারেলভী য্‌গ্ম সম্পাদক-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চার বৎসর পর পিকথল পদত্যাগ করলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত (জান্‌য়ারি 1949) ব্যারেলভী 'বোম্বে ক্রনিকলের' সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ব্যারেলভীর দ্‌ষ্টিভঙ্গি ছিল জাতীয়তাবাদী। যখন 1917-18 সালে কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল ও সংস্কার-বিরোধী লোক ম্‌সলীম লীগের নেতার্‌পে এম. এ. জিন্নার নেতৃত্বকে অস্বীকার করে তখন বোম্বাইতে লীগের অধিবেশনের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ কিছু ব্রিটিশ অফিসারের প্ররোচনায় এই উত্তেজনা দেখা দেয়। ব্যারেলভী তখন মি. জিন্নার পক্ষ সমর্থন করেন এবং কিছু ম্‌সলিম দ্‌ব্‌ত্ত ব্যক্তি 'হর্নিম্যান্‌স ম্যান' এই আখ্যা দিয়ে তাঁর বির্‌দ্ধে ধিক্কার জানায়। ব্যারেলভী প্রধানত সাংবাদিকর্‌পেই জাতির সেবা করে গেছেন। 'অল ইণ্ডিয়া নিউজপেপার এডিটরস্‌ কনফারেন্স' এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 1943 সালে এই কন্‌ফারেন্স প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তিনি কার্যনির্বাহক সদস্য হন এবং 1945 সালে সভাপতি পদে মনোনীত হন। ভারত সরকার কর্তৃক নিয্‌ক্ত 'প্রেস ল' এনকোয়ারি কমিটির তিনি সদস্য হন। 1948 সালে জেনেভায় অন্‌ষ্ঠিত সংবাদপত্রের

স্বাধীনতা সম্পর্কে জাতিসংঘের সম্মেলনে ব্যারেলভী ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগের অধিকাংশ সাংবাদিকের ন্যায় ব্যারেলভীও গান্ধীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে যোগদান করেন। খুব অল্প সময়ের জন্য তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিকল্প সদস্য হন। 1930 ও 1932 সালে তিনি দুইবার কারারুদ্ধ হন।

হিন্দু মুসলমান ঐক্যে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন ব্যারেলভী এবং সমগ্র জীবনব্যাপী তিনি এই আদর্শের রূপায়ণের জন্য অক্লান্ত ভাবে কাজ করে গেছেন। 1929 সালে বোম্বাই কংগ্রেস মুসলীম পার্টির প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই পার্টি গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য মুসলমানদের প্রভাবিত করা। ঐ বৎসরই বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত 'ইণ্টার কমিউন্যাল এ্যামিটি কনফারেন্সে'র অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। 1944 সালে রাজাজীর সূত্রের মাধ্যমে গান্ধীজী ও জিন্নার মধ্যে আলাপ আলোচনার যে ভিত্তি প্রস্তুত করা হয়েছিল ব্যারেলভী তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ব্যারেলভী অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। 1934 সালে তিনি আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত 'গুজরাট স্টেটস্‌ পিপল্‌স কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব করেন। 1939 সালে সুরাটে অনুষ্ঠিত গুজরাটের যুব কর্মীদের সম্মেলনেও তিনি সভাপতি হন। 1944 সালে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত 'সিভিল লিবার্টিজ কনফারেন্সে' ব্যারেলভী পুনরায় সভাপতিত্ব করেন। 1939 সালে বোম্বাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'টেক্‌-স্টাইল লেবার এনকোয়ারি কমিটি'র তিনি সদস্য হন।

সমাজ সংস্কারের বিষয়ে ব্যারেলভী উদারচেতা ছিলেন। তাঁর পত্নী—তিনি একবারই (1935) দার পরিগ্রহ করেন—কখনও পর্দানশীল ছিলেন না। ইসলামে বিশ্বাসী হলেও তিনি কখনও গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। তিনি কখনও মসজিদে যান নি অথবা বাড়ীতেও ইসলাম ধর্মের রীতি অনুযায়ী কখনও উপাসনা করেন নি। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কোন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁর বহু অমুসলমান বন্ধু ছিল। যৌবনে ব্যারেলভী লাল্লুভাই সমাল দাস কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবিত হন। সমাল দাসের বাড়ীতে তিনি প্রায় পরিবারের একজন সদস্যরূপেই গণ্য হতেন। সমাল দাসের তিন পুত্র ছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু একবার তাঁকে 'লাল্লুভাই সমাল দাসের চতুর্থ পুত্র' বলে অভিহিত করেছিলেন। মৌলানা আজাদ, ডঃ জাকির হোসেন, ডঃ আনসারি, সরোজিনী নাইডু, উমর শোভানী, মহাদেব দেশাই, ভি. এন. মেহতা, এবং জি. এল. মেহতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সঙ্গে ব্যারেলভী তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

ব্যারেলভী দেশ বিভাগের আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি। ফলে অনেক ভর্ৎসনা ও অপমান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। জিন্না অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। 1945 সালে নির্বাচনে বোম্বাই-এর ভোটকেন্দ্রে তিনি যখন ভোট দিতে যান, তখন নানা রকম গালি গালাজ, এমন কি চপেটাঘাত পর্যন্ত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনই সংযম না হারিয়ে শান্ত ও স্থির ছিলেন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রতি কখনই তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল না। তিনি ইংরেজ সরকার ও মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত আপোষের পক্ষপাতী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর এই আচরণকে কিছু সংখ্যক কংগ্রেসী সদস্য 'অসংগত' বলে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর সরলতা, উদারতা, সততা ও সার্বজনীতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ব্যারেলভী তাঁর জীবনী রচনা করতে আগ্রহী ছিলেন। ওমরের এই চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতিফলন ব্যারেলভীর চরিত্রেও দেখা যায়। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ যে সংগ্রাম শুরু করেছিল, 'বোম্বে ক্রনিকলের' সম্পাদকরূপে ব্যারেলভী তার পুরোভাগে ছিলেন। রাজপ্রতিনিধিরূপে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের কার্যাবলীর সমালোচনা করে 'পর্বত-প্রমাণ অযোগত্যা' শিরোনাম দিয়ে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন পরে তা এত বিখ্যাত হয়ে পড়ে যে পুস্তিকা আকারে তা পুনর্মুদ্রিত হয়। তিনি ছিলেন সরকারের নির্ভীক সমালোচক। তাঁর সম্পাদনাকালে 'বোম্বে ক্রনিকল' সকল জাতীয়তাবাদী আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। 1924-1949 সালের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

1949 সালের 9 জানুয়ারী বোম্বাইতে স্বগৃহে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যারেলভী প্রাণত্যাগ করেন। (পূর্বে তাঁর দুই কি তিনবার অনুরূপ আক্রমণ হয়েছিল)। মৃত্যুশয্যায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক ডি. এল. মেহতা।

[Home Political Dept. 1930 / F. N. 366 (in National Archives) ; Interviews with Mrs. Brelvi and her son ; Interviews with Shri Narayanswami, Editor, Bharat Jyoti, a weekly published from Bombay, and who worked for 28 years with Mr. Brelvi ; Manuscript of Brelvi's letter to Gandhi before Quit India Movement ; Bombay Chronicle, files from 1924 to 1949 ; Brelvi's Presidential Address at First Girgaon (Dist.) Co op. Conference (March 1929) ; Presidential Address at Second Karnatak Journalists' Conf. (1929) ; Speech as Chairman of the Reception Committee at Inter-Communal Amity Conference (1929) ; Presidential Address at Gujarat States People's Conference (1934) ; Presidential Address at Kerala Provincial Conference (1935) ; Presidential Address at the Convention of Youth Workers of Gujarat, Kathiawad (1939) ; Presidential Address at Newspaper Editors' Conference (1944) ; Presidential Address at Civil Liberties Conference (1944) ; Presidential Address at All India Newspaper Editors' Conference (1945) ; Manuscript of his report of the meeting of Azad Muslim Board ; Report of Textile Labour Inquiry (Govt. of Bombay, 1939).]

জি. এল. মেহতা

আবদুল্লাহ্ শেখ (ডঃ) (১৮৭৪-১৯৬৫)

Abdullah, Sheikh (Dr.) (1874-1965)

কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার একটি গ্রামে শেখ আবদুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ মেহতা মস্ত রাম ছিলেন গ্রামের নম্বরদার। তাঁর পিতার নাম ছিল মেহতা গুরুমুখ সিং এবং ধর্মান্তরের আগে তাঁর আসল নাম ছিল ঠাকুর দাস। 1891 সালে লাহোরে থাকাকালে তিনি স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 1902 সালে আলিগড়ে তিনি দিল্লীর মির্জা মহম্মদ ইব্রাহিমের কনিষ্ঠা কন্যা ওয়াহেদ জাহানকে বিবাহ করেন। তিনি পাঁচ কন্যা এবং একটি পুত্র সন্তান রেখে গিয়েছেন। তাঁর কন্যাদের মধ্যে একজন মুমতাজ জাহান (মিসেস হায়দর) ত্রিশ বছর ধরে আলিগড়ে উইমেনস কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেছেন। তিনিই ছিলেন কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি গ্রামের স্কুলেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ইংরাজি শিক্ষার জন্য তাঁকে ঘর ছাড়তে হয়। তিনি প্রথমে জম্মু ও পরে লাহোরে যান। লাহোর থেকে 1891 সালে মাট্রিক পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি আলিগড়ে চলে যান। আলিগড়ে থাকার সময় তিনি স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। সৈয়দ আহমেদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে শেখ আবদুল্লাহ্ মুসলমান সমাজের উন্নয়নের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। বি. এ. এবং এল. এল. বি. ডিগ্রী লাভ করার পর আইনজীবী হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন এবং আলিগড়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। আইনজীবী হলেও তিনি স্ত্রী জাতির উন্নতি সাধনের আকাংক্ষাকে লালন পালন করে চলেছিলেন।

শেখ আবদুল্লাহ্ মহিলাদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য আগ্রহী ছিলেন। সেই কারণে 1902 সালে মুসলিম শিক্ষা সংক্রান্ত অধিবেশনে তাঁকে মহিলা শাখার সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তিনি সেই অধিবেশনের কাজকর্ম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। 1904 সালে তিনি মহিলাদের জন্য 'Khatoon' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী জাতির শিক্ষার জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি স্ত্রী শিক্ষার সুযোগ সুবিধার প্রসারে এবং তাদের সার্বিক উন্নতিসাধনের জন্য আবেদন জানাতেন। এক দশক ধরে পত্রিকাটি স্ত্রী শিক্ষা বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করেছিল। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি একাই সংগ্রাম করে চলেছিলেন সেই উদ্দেশ্যকে দেশের বিভিন্ন অংশে অন্যান্যরাও গ্রহণ করেছে তখন তিনি অপ্রয়োজনবোধে এই পত্রিকার সম্পাদনা বন্ধ করে দেন।

এরপর তিনি মেয়েদের বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনের জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করলেন। এর ফলে 1906 সালে স্থাপিত হলো একটি বালিকা বিদ্যালয়।

এ বিষয়ে তিনি ভূপালের শাসনকর্ত্রী বেগম স্লতান জাহানের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহে সমর্থ হয়েছিলেন। এরপর সরকারী সাহায্যও পাওয়া গেল। 1914 সালে বিদ্যালয়টির বোর্ডিং-এর উদ্বোধন করেছিলেন ভূপালের বেগম। বিদ্যালয় চত্বরে মহিলাদের একটি অধিবেশনও খ্ব সার্থকভাবে সংগঠিত হয়েছিল। এইভাবে খ্ব অল্প সময়ের মধ্যেই শেখ আবদ্ল্লাহ্ জনসাধারণকে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিদ্যালয় চালানোর ব্যাপারে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে থেকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন সেজন্যই তিনি বিশেষভাবে সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। 1914 সাল থেকে 1939 সাল পর্যন্ত এই পঁচিশ বছর ধরে তাঁর স্ত্রী বিদ্যালয় বোর্ডিং-য়ের অবৈতনিক স্পারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে কাজ করে গিয়েছেন। সারাজীবন ধরে তিনি ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির দেখাশোনা করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শত শত মেয়ের কাছে তিনি ছিলেন সত্যিকারের পথ নির্দেশিকা এবং জননী। এইভাবে তাঁদের দ্জনের মিলিত প্রচেষ্টা ও তত্ত্বাবধানের ফলে ছোট প্রতিষ্ঠানটি ব্দ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ডিগ্রী কলেজে পরিণত হয়েছিল (বর্তমানে এটি "ম্সলিম ইউনিভার্সিটি উইমেনস কলেজ" নামে পরিচিত)।

শেখ আবদ্ল্লাহ ম্সলিম ইউনিভার্সিটির জন্য নানাভাবে কাজ করেছিলেন। 1920 সাল থেকে আম্ত্যু তিনি ছিলেন ইউনিভার্সিটি কোর্টের সদস্য। 1920 থেকে 1928 সাল অবধি তিনি ছিলেন কার্যনির্বাহ পরিষদের সদস্য এবং অনেকবার ইউনিভার্সিটির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষের আসনে আসীন ছিলেন। তিনি আলিগড় সিভিল কোর্টের একজন প্রতিষ্ঠিত এ্যাডভোকেট ছিলেন। এছাড়া উকিল সভার সভাপতিও হয়েছিলেন। 1950 সালে আলিগড় ম্সলিম ইউনিভার্সিটি তাঁকে এল. এল. ডি. ডিগ্রী প্রদান করে। 1964 সালে তাঁকে 'পদ্মভ্ষণ' উপাধিতে ভ্ষিত করা হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রথম দিকে তাঁকে 'খান বাহাদ্র' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

শেখ আবদ্ল্লাহ্র প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল শিক্ষা এবং সমাজ সংস্কার। কিন্তু তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে সম্প্র্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখেননি। যদিও তিনি কোন দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন না। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে তিনি সরকারী ব্যবস্থার আধ্নিকীকরণের জন্য সওয়াল করেছিলেন কিন্তু তিনি কখনও প্র্ণ গণতন্ত্র অথবা স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন নি। বিশের দশকে কিছু সময়ের জন্য তিনি উত্তরপ্রদেশ আইন সভার সদস্য ছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি তিনি সহান্ভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় খিলাফৎ আন্দোলনের নেতারা যখন তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভাজনের প্রশ্নে ম্সলমান সম্প্রদায়কে বিক্ষ্ব্ধ করতে চেষ্টা করছিলেন তখন আবদ্ল্লাহ্ তা প্রোপ্রি সমর্থন করেননি। সর্বভারতীয় ম্সলিম লীগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে য্ক্ত না হয়েও তিনি লীগের ম্লনীতির সমর্থক ছিলেন। 1925 সালে লীগের আলিগড় অধিবেশনের সময় তিনি সম্বর্ধনা সমিতির স্থায়ী সভাপতি নিয্ক্ত হয়েছিলেন। ত্রিশের দশকের শেষদিকে এবং চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে ভারতবর্ষের দ্ই প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিবাদ তাঁকে বেদনাহত করে তুলেছিল। দ্ই সম্প্রদায়ের নেতাদের তিনি বলেছিলেন রাজনৈতিক বোঝাপড়া এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করতে।

শেখ আবদ্ল্লাহের মধ্যে কর্মী, দার্শনিক এবং মানবতাবাদী এই তিন গ্ণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল। সারা জীবন ধরে তিনি একটি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সংগ্রাম করে গিয়েছেন, যথা ম্সলমান মহিলাদের বন্ধনম্ক্ত করা। নানাবিধ অস্ববিধার জন্য কাজটি সম্পন্ন করা খ্বই কঠিন ছিল কারণ ম্সলমান সম্প্রদায়ের রক্ষণশীলতা এবং ব্রিটিশের নামের সংগে য্ক্ত সব কিছ্র প্রতি ঘ্ণা। রক্ষণশীল শ্রেণীর বিরোধিতার সম্ম্খীন তাঁকে হতে হয়েছিল এবং মানহানিকর প্রচারকে তিনি শান্তভাবে সহ্য করেছিলেন। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা বিপত্তির অবসান ঘটেছিল।

[Interview with Dr. (Mrs.) M.A. Haidar —daughter of Dr. Sheikh Abdullah—Principal, Women's College, Aligarh : Sawanah Hayat Abdullah Begum Merhoom (Biography of Mrs. Sheikh Abdullah—by Dr. Sheikh Abdullah (in Urdu) : An Appeal to the Members of the Court of the Muslim University, Aligarh, for financial help to the Muslim Girls' College, Aligarh—by Dr. Sheikh Abdullah consulted at the residence of Dr. (Mrs.) M. A. Haidar ; Khatoon—(Monthly magazine in Urdu published and edited by Sheikh Abdullah)—May 1911, January 1914 ; Kafir aur Kafirgar pamphlet

(in Urdu) (1930) by Dr. Sheikh Abdullah ; Asool Wa Tanzeem Jamiat Ahbab (Pamphlet in Urdu) by Dr. Sheikh Abdullah (A. M. U. Publication) ; The Aligarh Monthly—April 1904, Vol. 2, No. 4 (Urdu Magazine,) M. A. O. College, Aligarh publication ; Muslim League Zindabad—Lecture delivered by Dr. Sheikh Abdullah at Women's College, Aligarh, on 23rd March 1946 (in Urdu)—consulted at the residence of Dr. (Mrs.) M. A. Haidar in Aligarh ; Autobiographical Notes (in Urdu)—Written by Dr. Sheikh Abdullah (in manuscript form)—consulted at the residence of Dr. (Mrs.)M. A. Haidar in Aligarh ; Presidential address by Dr. Sheikh Abdullah, Chairman, Reception Committee—17th Session of the A. I. Muslim League, Aligarh, Dec. 1925 (in Urdu) ; Proceedings of the All India Mohammedan Educational Conference (in Urdu) 1898, 1902, 1904, 1908, 1910.]

(এল. দেওয়ানী) **এস. এম. জিয়াউদ্দিন আলাভী**

আবদুল্লাহ্ শেখ মহম্মদ (১৯০৫-১৯৮২)
Abdullah Sheikh Muhammad (1905-1982)

শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ্ 1905 সালের 5 ডিসেম্বর শ্রীনগরের উপকণ্ঠে সৌরা-তে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ মহম্মদ ইব্রাহিম তাঁর জন্মের পনের দিন আগে স্ত্রী, ছয় পুত্র এবং দুই কন্যাকে রেখে পরলোকগমন করেন। পরিবারটি মাঝারি রকমের পশম ও শাল ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল।

শেখ আবদুল্লাহ্ শ্রীনগরের সরকারী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন, এফ. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন জম্মুর 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্ কলেজ' থেকে, লাহোরের ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি. এস. সি এবং সবশেষে 1930 সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় এম. এ পাশ করেন।

হ্যারী নিদো যিনি পূর্বে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁর কন্যা আকবর জাহানকে শেখ আবদুল্লাহ্ বিবাহ করেন 1932 সালে। তাঁদের তিন পুত্র এবং দুই কন্যা। সংকট-জনক পরিস্থিতিতে যখন তিনি কারাগারে থাকতেন, তাঁর স্ত্রী তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করে রাখতেন। কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি এবং তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে একতা বজায় রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করতেন। তাঁকে কাশ্মীরের জনগণ 'মাদরে মেহেরবান' (দয়ালু মাতা) নামে ডাকত।

ধর্মপ্রাণা জননী এবং বড় ভাইয়ের কাছে শেখ আবদুল্লাহ্ ইসলামের বাণী ও ইতিহাস সম্পর্কে যে শিক্ষালাভ করেছিলেন সেই শিক্ষা শেখ সাহেবের প্রথম জীবনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবি ইকবালও তাঁর মনের উপর গভীর ছাপ ফেলেছিলেন। রাজনীতির জগতে প্রবেশ করার পর তিনি গান্ধীজী, আজাদ, নেহরু এবং আলি ভাইদের ধ্যান ধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এছাড়া তুরস্কের মুস্তাফা পাশাও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

1930 সালে শেখ আবদুল্লাহ্ যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি মুসলিম সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থার কাজ ছিল সরকারী চাকুরিতে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্য চালানো। পরে তিনি মাসিক আশি টাকা মাইনেতে শ্রী নগরের সরকারী হাইস্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকার জন্য কয়েক মাস পরে তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়।

তাঁর প্রথম রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ ঘটে যখন 1931 সালের 13 জুলাই আবদুল কাদিরের বিচার উপলক্ষে আদালতের বাইরে অপেক্ষমান জনতার উপর পুলিশের গুলি চালনার বিরুদ্ধে সাতজন খ্যাতনামা কাশ্মীরী মুসলমানদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। শেখ আবদুল্লাহ্ এই কমিটির সদস্য ছিলেন।

1931 সালের 21 সেপ্টেম্বর শেখ আবদুল্লাহ্ প্রথম গ্রেপ্তার বরণ করেন। তারপর থেকে তিনি নয়বারে সবশুদ্ধ পনের বছর সাত মাস পাঁচ দিন বন্দী ছিলেন। 1932 সালের অক্টোবর মাসে সংগঠিত মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। 1939 সালের প্রথম দিকে এটি জাতীয় সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়। তিনি এর সভাপতি থাকেন 1942 এবং 1944 সাল বাদ দিয়ে একটানা 1953 সাল পর্যন্ত। কাশ্মীরে মহারাজার শাসনের বৈধতায় আপত্তি জানানো এবং 'কাশ্মীর

ছাড়ো' আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য 1946 সালের মে মাসে তাঁকে ন বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। সেই বছরই তিনি সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের জনগণের সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

1947 সালের 29 সেপ্টেম্বর মুক্তি লাভের পর তিনি ঘোষণা করেন যে শাসক গোষ্ঠী নয় জনগণই রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন কিন্তু পাকিস্তান কাশ্মীর অধিকার করার জন্য উপজাতিদের দিয়ে হঠাৎ বহিরাক্রমণের আয়োজন করল। শেখ আবদুল্লাহ্ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ এবং ভারতের সঙ্গে তাঁর রাজ্যের সংযুক্তির জন্য সমর্থন গড়ে তুললেন। 31 অক্টোবর তাঁকে জরুরীকালীন শাসনব্যবস্থার প্রধান নিযুক্ত করা হল এবং 1948 সালের 5 মার্চ তিনি হলেন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। 1949 সালের জুন মাসে তিনি গণপরিষদে যোগদান করলেন এবং সংবিধানে স্বাক্ষরকারীদের তিনি ছিলেন অন্যতম।

এই সময় জম্মুতে বিক্ষোভ দেখা দিল। জম্মুর উপর তাঁর প্রভাব এবং সে অঞ্চল বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। জম্মু প্রদেশের বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটল "ভারতীয় যুক্তরাজ্য-এ রাজ্যটির সম্পূর্ণ অখণ্ডতা বজায় রাখা"—এই মর্মে আন্দোলনের মাধ্যমে। আন্দোলন পরিচালনা করেছিল প্রজা পরিষদ এবং সমর্থন জানিয়েছিল ভারতীয় জনসংঘ। রাজ্যের সার্বভৌমত্বের জন্য পরিষদ ও সংঘের ভীতি প্রদর্শনের ফলে শেখ আবদুল্লাহ্ বুঝতে পারলেন রাজ্যকে বিশেষ স্থায়ী মর্যাদা দানের যে আমন্ত্রণ ভারত সরকার জানিয়েছেন সে আমন্ত্রণ কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে যে সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে তা দূর করতে পারবে না (1953 সালের 16 জুলাই মৌলানা আজাদকে লেখা চিঠি)।

শেখ আবদুল্লাহ্ এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অবিশ্বাস ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং এই বিরোধ তুঙ্গে উঠল যখন ভারতবর্ষ থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে বিদেশী শক্তির সঙ্গে গোপন ও ক্ষতিকর যোগাযোগ করা হয়েছে—এই অভিযোগে শেখ আবদুল্লাহ্‌কে বরখাস্ত করে বন্দী করা হল। 1958 সালের 10 জানুয়ারী তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল কিন্তু আবার 29 এপ্রিল তিনি বন্দী হলেন। ছয় বছর পরে কারাগারের বাইরে এসে তিনি অনেকবার দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। তিনি কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধে মধ্যস্থতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তির প্রশ্নে তাঁর মনোভাব ছিল ধোঁয়াটে এবং অস্পষ্ট। তাঁর দ্বিধাপূর্ণ এবং পরস্পর-বিরোধী ঘোষণা স্বভাবতঃই ভারতীয় রাজনীতিকগণ এবং সেই সঙ্গে কাশ্মীরে জনগণের এক বিরাট অংশ তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। 1964 সালের 26 মে নেহরুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসার পথ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

1965 সালের 8 মে বিদেশ ভ্রমণ এবং হজ করে দিল্লীতে ফেরার পর তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হল। এবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিদেশে বিশেষ করে যেসব দেশ ভারতের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন নয় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাঁর কার্যকলাপ। 1968 সালের 2 জানুয়ারী তিনি মুক্তি লাভ করলেন।

তাঁর নেতৃত্বে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জনগণের সম্মেলন আহূত হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার মানুষ সেখানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দু-বছর ধরে চিন্তাভাবনা এবং মত বিনিময়ের ফলে 1970 সালের জুন মাসে স্থির হয় যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সমস্ত অঞ্চলের স্বার্থের কথা মনে রেখে এবং যাবতীয় গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে সুসংহত এবং শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল্যবোধের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে চলবে। কিন্তু শীঘ্রই আবার শেখ সাহেব চঞ্চল ও অস্থিরমতি হয়ে পড়লেন। কাশ্মীর সরকার এবং ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সহযোগিতার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান আক্রমণ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিপদ হিসেব দেখা দেয়। এর ফলে 1971 সালের জুন মাসে দু'জন প্রধান সহকর্মীসহ তাঁকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হল।

1960 সালের 8 আগস্ট জম্মু বিচারালয়ে শেখ আবদুল্লাহ্ বলেছিলেন ঃ- "এই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে আমি এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বলে পরিচিত হয়েছি।" একদিকে তিনি ছিলেন ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তির প্রধান স্থপতি। তিনি গান্ধীজীর নামে শপথ করতেন এবং দ্বিজাতি মতবাদকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন সংশোধনের পক্ষে ছিলেন, পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীও তিনি পছন্দ করতেন। অন্যদিকে ভারতের মধ্যে তিনি কাশ্মীরের মর্যাদার সমন্বয় সাধন করতে পারছিলেন না। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একতার আবেদন এবং মুসলমান মজলিশ

মুশাবাটের কাজ অনুমোদন ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি কেন্দ্রিক রাজনৈতিক অভিন্নতার আদর্শের উপর তিনি যে গুরুত্ব আরোপ করতেন তার পরিমাণ বেশ কিছু মাত্রায় হ্রাস করে দেয়।

সম্ভবতঃ শেখ আবদুল্লাহ্ তাঁর অবস্থাকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছিলেন যখন তিনি নিজেকে পাসপোর্টের দরখাস্তে 'কাশ্মীরী মুসলমান' বলে অভিহিত করেছিলেন। কাশ্মীরী জাতীয়বাদের নায়ক হিসেবে তিনি ইসলামের নামে কাশ্মীরী সত্তাকে মিলিত করে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান হিসাবে তাঁর জাতিত্ব ভৌগোলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।

জনমোহিতকারী ব্যক্তিত্ব, পিতৃসম ভাবমূর্তি, দীর্ঘকাল অত্যাচারজনিত শহীদের মর্যাদা, প্রচণ্ড দুর্মদ সাহসিকতা, অসাধারণ বাগ্মিতা এবং ছয় ফুট এক ইঞ্চি দৈহিক উচ্চতা—সব কিছু মিলিয়ে শেখ আবদুল্লাহ্ ছিলেন কাশ্মীরের সব চেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে তাঁর একাত্মতায়, যারা তাঁকে 'কাশ্মীরের সিংহ' আখ্যা দিয়েছিল, দু-রকম ফল পাওয়া গিয়েছিল। একদিকে তিনি যেমন তাদের চিন্তা চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন অন্য দিকে নিজেও তাদের আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন।

[Personal meetings with Sheikh Abdullah ; Ashabistan Urdu Digest, New Delhi, Supplementary issue, 1968 ; A Bird's Eye View of Sher-i-Kashmir's Life, by Sadar-ud-Din Majahid, Srinagar ; Sheikh Abdullah Then and Now, by S. Vashishth Maulik Sahitya Prakashan, Delhi-7 ; Sheikh Abdullah and We, by Atique Siddiqi, Maktaha Shahra, Urdu Bazar, Delhi-6 ; Kashmir Affairs, Delhi, No. 7, Ed. Balraj Puri ; Speeches and Interviews by Sheikh Abdullah, published by Plebiscite Front, Srinagar ; The History of Struggle for Freedom in Kashmir, by P. N. Bazaz, New Delhi ; Two Nations and Kashmir, by Lord Birdwood, London ; Who's Who, published by State People's Convention, Srinagar.]

ডি. এল. দত্ত বলরাজ পুরী

আবদুস সামাদ খান (১৮৯৫—১৯৭৩)

Abdus Samad Khan (1895—1973)

1895 সালে বালুচিস্তানে কোয়েটার কাছাকাছি গুলিস্তানে আবদুস সামাদ খান (বালুচ গান্ধী নামে সমধিক পরিচিত) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খান নূর মহম্মদ খান ধনী জমিদার এবং গুলিস্তানের আচকজাই উপজাতির একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। আবদুস সামাদ খানের দুই ভ্রাতা খান আবদুল সালাম ও মহম্মদ আয়ুব খান।

আবদুস সামাদ খান চিরাচরিত প্রথায় তাঁর গ্রামের মক্তবে শিক্ষালাভ করেন। তিনি উর্দু, ফার্সী ও পুস্তু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গুলিস্তানের এক বিদ্যালয়েও তিনি মিডল ভার্ণাকুলার শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন যদিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। বহু কাল পরে মধ্য জীবনে পাকিস্তানের জেলে বন্দী থাকাকালীন (1958-68) তিনি ম্যাট্রিকুলেশন, ইন্টারমিডিয়েট আর্টস-এ এবং ডিস্টিংশন নিয়ে বি. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন।

আবদুস সামাদ খান অত্যন্ত সহজ, সরল জীবন কাটিয়েছেন। তরুণ বয়সেই তিনি গান্ধীজীর প্রভাবে আসেন এবং তাঁর অহিংস নীতি অনুসরণ করেন। ক্রমশঃ তিনি শুধুমাত্র বালুচিস্তানেই নয় সমগ্র ভারতবর্ষে বালুচ-গান্ধী নামেই পরিচিতি লাভ করেন। জাতি, বর্ণ ও ধর্মভেদের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী।

1920 সালে বালুচিস্তানের অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে নিয়ে বালুচ জাতির মধ্যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'আঞ্জুমান-ই-ওয়াতান' নামক সংস্থা গড়ে তুলে আবদুস সামাদ খান জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এইভাবে সে যুগের অনগ্রসর বালুচিস্তানের একজন সমাজসেবী রূপে তিনি তাঁর জীবন শুরু করেন। বালুচিস্তানবাসীরা সে সময় ছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রাচীনপন্থী। তাঁদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য এবং তাঁদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য বালুচিস্তানে সামাদ বহু শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে

তোলেন এবং সামাজিক দুরাচারগুলির বিরুদ্ধে অনলস প্রচার চালান। বালুচ জাতিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করাবার জন্য তিনি কঠিন সংগ্রাম করেন। অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি বালুচ-দের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একজন তীব্র জাতীয়তাবাদী রূপে খান আবদুস সামাদ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বালুচিস্তানের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে সংযুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান 'আঞ্জুমান-ই-ওয়াতান'-কে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। বিশ দশক থেকেই তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। 1928-29 সালে উত্তর ভারতের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান নও-জওয়ান ভারত সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করার সময় তাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 1929 সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে এবং পরবর্তী অন্যান্য রাজনৈতিক সভা সমিতিতে যোগদান করেন। লাহোর অধিবেশনে বালুচিস্তানে শ্বাসরোধকারী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। লাহোর থেকে তিনি প্রভূত রাজনৈতিক পত্র পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে যান এবং বালুচিস্তানে এক রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। 1930 সালে আবদুস সামাদ ও তাঁর দুই ভ্রাতাকে কোয়েটা-তে আনা হয় এবং সরকার বিরোধী কাজকর্মের জন্য জিরগা তাঁদের দুবছরের জন্য কারারুদ্ধ করার আদেশ দেন।

মুক্তিলাভের পর সরকারের দ্বারা আরোপিত কঠোরতম প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে আবদুস সামাদ তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্ম পুনরায় শুরু করেন। 1933 সালের ডিসেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে (সিন্ধ্) অনুষ্ঠিত বালুচ সম্মেলনে বালুচিস্তানের অধিবাসীদের দুর্দশার কথা তিনি তুলে ধরেন এবং বালুচিস্তানকে এক সম মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলির কাছ থেকে সাহায্য চান। এই সম্মেলনে বালুচিস্তানকে পূর্ণ প্রদেশের মর্যাদা দেবার দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 1934 সালের জানুয়ারী মাসে করাচীতে করাচী বালুচিস্তান রিফর্মস কমিটির দ্বারা আহূত এক সম্মেলনে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে বালুচ জনসাধারণের জন্য রাজনৈতিক অধিকার দাবী করেন। বালুচিস্তানে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জিরগা কর্তৃক তিনি তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বালুচ ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন ও করাচী বালুচিস্তান রিফর্মস কমিটি-র পক্ষ থেকে তাঁর মুক্তির জন্য সোচ্চার দাবী ওঠে। বালুচিস্তানে আবদুস সামাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং যুব-সম্প্রদায়ের ওপর তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করে বালুচিস্তান সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়েন: 'একটি বিরাট আশঙ্কা এই যে তাঁর কার্যাবলীর প্রতিক্রিয়া যদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা না হয় তাহলে সন্ত্রাসবাদীরা এই অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠবে।' সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক দাবীর পক্ষে আন্দোলন করার সময় আবদুস সামাদ উপজাতিক জিরগাদের নিয়ন্ত্রণকারী সর্দার ও মালিক শ্রেণীকে ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আবদুস সামাদ খান বিপুল উদ্যমে তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলী আরম্ভ করেন। 1940 সালে বালুচিস্তানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার বিষয়ে তিনি ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করতে যান। যুদ্ধ বিরোধী প্রচারে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন এবং 1942-এর জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেন। 1942 সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইন অনুসারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। 1945 সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি পুনরায় রাজনৈতিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের সংঘর্ষে তিনি কংগ্রেসের পক্ষ গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধতা করেন। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ করে তিনি মুসলমানদের কংগ্রেসের সঙ্গে এক হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান।

1946 সালের শেষ ভাগে মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পাকিস্তান দাবী মেনে নেবার ইচ্ছা প্রকট হয়ে উঠলে আবদুস সামাদ খান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গফ্ফর খান একত্রে পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং পাঠানী ও বালুচিদের জন্য স্বাধীনতা দাবী করেন। অবশেষে 1947 সালে কংগ্রেস ভারত বিভাগে সম্মত হলে আবদুস সামাদ খান বিরাট আঘাত পান এবং এই মর্মে বিলাপ করেন যে তাঁকে একদল শিকারী নেকড়ের সামনে ফেলে দেওয়া হল। পাকিস্তান হবার পরেও

তিনি সাহসিকতার সঙ্গে স্বাধীন বাল্চিস্তানের দাবীতে সংগ্রাম চালান। জিন্না তাঁকে দ্রত গ্রেপ্তার করেন। 1954 সালে তাঁকে ম্ক্তি দেওয়া হয়। 1957 সালে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। কিন্তু 1958 সালে তাঁকে প্নরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং চোদ্দ বছরের জন্য বন্দী রাখা হয়। যাইহোক 1968 সালেই তিনি ম্ক্তি পান।

সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক সচেতনতা জাগানর জন্য তিনি যে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তার প্রচারের জন্য আবদ্স সামাদ খান 1934 সালে প্স্তু ভাষায় 'ইস্তিকলাল' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় যাতে রাজনৈতিক মতামত না দিতে পারে সে জন্য ব্রিটিশ সরকার বিধি নিষেধ আরোপ করেন। 1947 সালে পাকিস্তান সরকার এই পত্রিকা ও সংগঠন 'আঞ্জ্মান-ই-ওয়াতান'-কে বেআইনী ঘোষণা করেন।

আবদ্স সামাদ খান ছিলেন এমন একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ম্সলমান যিনি সাম্প্রদায়িক বিভেদের উর্ধ্বে উঠেছিলেন। তাঁর সংগ্রাম ছিল শ্ধ্ মাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বির্দ্ধে নয়—ছিল সাম্প্রদায়িক শক্তির বির্দ্ধে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদ্ল গফ্ফর খানের মত আবদ্স সামাদ খানও তাঁর জাতির নব-জাগরণের উদ্গাতা, বিরাট দেশপ্রেমিক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একজন আজীবন সংগ্রামীর্পে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

[Proceedings Foreign and Political Department, 1920-35 ; Proceedings Home Political Department, 1920-45 ; Proceedings of the Indian Legislative Assembly, 1934-35 ; B. G. Tendulkar—Abdul Ghaffar Khan, Bombay, 1967 ;—The Three Gandhis (an article published in the Frontier Mail, Dehra Dun, dated 5 February 1967) ; M. S. M. Sharma—Peeps into Pakistan, Patna, 1954 ; Mushtaq Ahmad—Government and Politics in Pakistan, Karachi, 1963 ; Pyarelal—Thrown to the Wolves, Abdul Ghaffar Khan, Calcutta, 1966 ; The Indian Annual Register, 1920-47 ; The Tribune Files, 1930-46 ; Personal Interview of the Research Fellow with K. B. Narang, an old associate of Abdul Samad Khan ; Information supplied by Mahammad Ayub Khan, brother of Abdus Samad Khan, from Kabul.]

টি. আর. সারীন **বখ্শিস সিং নিজ্জর**

আব্ল-কালাম আজাদ (মৌলানা) (১৮৮৮-১৯৫৮)
Abul-Kalam Azad (Maulana) (1888-1958)

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে দিল্লীর স্বনামধন্য পীর মৌলানা ম্নাওয়ার্দ্দীন (1787-1857) হজ উপলক্ষে মক্কায় গিয়ে সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। তাঁর দৌহিত্র খইর্দ্দীনও (1831-1908) তাঁর সঙ্গী হন। খইর্দ্দীন তাঁর আরব শিক্ষক ও মদিনার ম্ফতি শেখ মহম্মদ জাহির ওয়াত্রির কন্যা আলিয়াকে বিবাহ করেন। 1888 সালে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। বংশের প্রথা অন্যায়ী তাঁর নামকরণ করা হয় ফিরোজ বখ্ত। তবে মহিউদ্দীন নামেই তিনি সাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন। এই নবজাতক যখন ক্ষ্দ্র শিশ্, তখন তাঁর পিতা-মাতা কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে মনস্থ করেন ও ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। কলকাতায় তাঁর পিতা মৌলানা খইর্দ্দীন ধর্মগ্র্ র্পে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর আরবদেশীয়া মাতা উর্দ্ভাষা সামান্যই জানতেন। ফলে মহিউদ্দীন অধিকাংশ সময় বাড়িতে পিতামাতা ও ভ্রাতা-ভগ্নীদের সঙ্গে আরবী ভাষাতেই কথাবার্তা বলতেন। 1944 সালে কলকাতায় মহিউদ্দীন জ্লেখা বেগমকে বিবাহ করেন। জ্লেখা তাঁর পিতার শিষ্য মৌলভী আফতাব্দ্দীনের দ্বিতীয়া কন্যা। তাঁদের হ্সেন নামে একটি প্ত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু কিছ্কাল পরে মাত্র চার বছর বয়সে তাঁর ম্ত্যু হয়।

কিশোর বয়সেই মহিউদ্দীন 'আব্ল কালাম আজাদ' এই ছদ্মনামে ম্সলমান ব্দ্ধিজীবী মহলে খ্যাতিলাভ করেন। তৎকালীন উর্দ্ পত্রিকায় তিনি এই নামে ধর্মীয় এবং সাহিত্য বিষয়ক রচনা লিখতেন।

আজাদ তাঁর পিতার নিকট সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি কখনও কোন মাদ্রাসা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার আধ্নিক কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-

গ্রহণ করেন নি। স্বগৃহে পড়াশুনা করে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে আজাদ উচ্চ ইসলামিক শিক্ষার পাঠক্রম সমাপ্ত করেন। সাধারণত মুসলিম ছাত্রগণ এই পাঠক্রম বাইশ অথবা পঁচিশ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ করে। এই সময়ে তিনি স্যার সৈয়দ আহমেদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। স্যার সৈয়দ আহমেদের চিন্তাধারা তাঁকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে, যেহেতু তিনি ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, অতএব তাঁর শিক্ষা-লাভকে তিনি অসম্পূর্ণ বলে জ্ঞান করলেন।

পিতাকে গোপন করে তিনি ইংরাজি শিক্ষাগ্রহণ করতে শুরু করেন এবং তাঁর নিজের প্রচেষ্টায় ইতিহাস ও দর্শনের গ্রন্থগুলি পাঠ করার মত ইংরাজি ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান তিনি অর্জন করেন।

বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ, বিশেষত স্যার সৈয়দের রচিত গ্রন্থ আজাদের মনে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। তিনি এমনই এক গোঁড়া পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে-ছিলেন, যেখানে সনাতন পদ্ধতির বিরোধী কোনরূপ জীবনধারা প্রায় অকল্পনীয় ছিল। সনাতন জীবন-ধারাকে বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা হত। যাইহোক বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থাদি পাঠের ফলে নানারূপ জিজ্ঞাসা আজাদের মনকে আলোড়িত করে তুললো। তিনি ভাবতে লাগলেন, "যদি ধর্ম সার্বজনীন সত্যই প্রকাশ করে থাকে, তাহলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কেন এই দ্বন্দ্ব, কেন এই বিভেদ? কেন প্রত্যেক ধর্মই স্বীয় মতকে সত্যের একমাত্র আধার বলে বিবেচনা করে?" ক্রমশঃ ধর্মের ক্ষেত্রে গোঁড়া পরিবারের সন্তান আজাদ এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হলেন, যেখানে তিনি যুক্তি ও দৈবশক্তিতে আস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সচেষ্ট হলেন। এই মনোভাব সকলের অগোচরে তাঁকে এক-সময় একদিকে 'নাস্তিকতা', অপরদিকে পাপবোধ সম্পর্কিত মতবাদের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এইরূপ ধর্মীয় চিন্তাধারার সংকটের ও জটিলতার মধ্যে ছিলেন। যাইহোক প্রায় নয় বছর (1901-1910) উদ্দেশ্যবিহীন পরিভ্রমণের পর স্বীয় লক্ষ্য তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি যে শক্তি তাঁকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেন নি, একই কারণে তাঁর আলোর দিশারী সম্বন্ধেও কিছু প্রকাশ করতে সক্ষম হন নি।

এই সময়ে আজাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারাও ছিল কিছুটা বিক্ষিপ্ত। তাঁর দেশ বিদেশী শাসন হতে মুক্ত হোক,—এই তাঁর কাম্য ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের মন্থর-গতির আন্দোলনকে তাঁর তেজোদৃপ্ত চিন্তাধারা সমর্থন করেনি। অন্যদিকে রাজনৈতিক মতবাদের দরুন মুসলিম লীগকেও তিনি সমর্থন করতে পারলেন না। ফলে, তিনি দোলায়মান চিত্তে বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত হলেন, যদিও তিনি সম্যকরূপে জানতেন যে হিন্দুপ্রধান এই বিপ্লববাদীরা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি উদাসীন ও মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আজাদ তাঁদের এই সত্য উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে এইরূপে আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে আন্দোলনের সার্থকতা ও সাফল্য ক্রমে কঠিনতন হয়ে উঠবে।

1908 সালে আজাদ বিদেশযাত্রা করেন এবং ইরাক, মিশর, সিরিয়া এবং তুরস্ক প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। তিনি ইউরোপ ভ্রমণে ইচ্ছুক ছিলেন এবং ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু তাঁর পিতার অসুস্থতার সংবাদে ফ্রান্স থেকে তাঁকে দ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আজাদ 1912 সালে 13 জুলাই কলকাতা থেকে 'অল-হিলাল' (Al-Hilal) নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ নতুন এক গতিময় রচনাশৈলীতে লেখা এই পত্রিকাটি ছিল শক্তি-শালী ও অনন্যসাধারণ। সচিত্র এই পত্রিকাটি উর্দু হরফে মুদ্রিত। এই পত্রিকা সর্বত্র বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয়ক্ষেত্রেই আজাদ চরমপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে তাঁর পত্রিকা গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর কঠোর আঘাত হানে এবং তাঁদের অসন্তোষ ও আলোড়ন ধূমায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু বেশীর ভাগ মুসলমান আজাদের প্রতি সমর্থন জানান।

'অল-হিলাল' পত্রিকাটিতে আজাদ ইংরেজদের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের আনুগত্য ও মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বিরূপ মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। বাংলা সরকার পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নীতি অপছন্দ করেন ও প্রেস অ্যাক্ট অনুযায়ী পত্রিকাটির প্রকাশনার জন্য গচ্ছিত দুই হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেন। পুনরায় দশ হাজার টাকা নতুন করে জমা দেওয়া হলে, সে টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং 1914 সালে বাংলা সরকার আইন করে এই পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। 1915 সালে 12 নভেম্বর আবুল কালাম আজাদ 'অল বলাগ' (Al-Balagh) নামে একটি নতুন

সাপ্তাহিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি 1916 সালের 31 মার্চ অবধি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পত্রিকাটিও সরকার আইন করে বন্ধ করে দেন এবং ভারতীয় আইনবিধি অনুযায়ী মৌলানা আজাদকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই একই আইনানুসারে পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ এবং বোম্বাই সরকার তাঁদের রাজ্যে আজাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি রাঁচীতে যান এবং সেখানে 1920 সালের 1 জানুয়ারী পর্যন্ত কার্যতঃ অন্তরীণ ছিলেন।

1920-1945 সালের মধ্যে আজাদ একাধিকবার কারাবরণ করেন। রাঁচী ত্যাগ করার পর 1920 সালে আজাদ 'অল ইণ্ডিয়া খিলাফত কমিটি' ও 'ইউ-নিটি কনফারেন্সে'র (দিল্লী, 1924) সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। 1928 সালে তিনি 'ন্যাশনালিষ্ট মুসলিম কনফারেন্সে'র সভাপতিত্ব করেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি 1937 সালে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে আজাদ দুইবার নির্বাচিত হন—প্রথমে 1923 সালে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ও দ্বিতীয়বার 1940 সালে। 1946 সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে ছয় বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ 1942 সালে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের অধি-কাংশ নেতাই তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। ফলে এই সময় কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। কংগ্রেস নেতৃ-বৃন্দের মুক্তিলাভের পর, মৌলানা আজাদ 1946 সালে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন এবং শিক্ষামন্ত্রী-রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পদে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (22 ফেব্রুয়ারী, 1958 সাল) তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

যদিও শিক্ষাবিভাগ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তথাপি আজাদ শিক্ষার সার্বিক উন্নতির জন্য কেন্দ্রের সহ-যোগিতার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি 1948 সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন এবং 1952 সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান কমিশন গঠনের বিষয়েও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি শিক্ষা-খাতে বার্ষিক জমা খরচ 20,000,000৲ থেকে 300,000,000৲ (1958) টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করেছিলেন।

ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে আজাদ সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে প্রত্যেক ধর্মই তাঁর নিজস্ব মতবাদ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিত হতে পারে, কিন্তু কার্যতঃ সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। কোরাণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "প্রতিটি ধর্মকেই মূলতঃ সত্য ধর্ম বলে গ্রহণ করা উচিত। সব ধর্মের সারতত্ত্বই যে এক, সকল মতই যে মিলিত হয়েছে একই মোহনায়, অনাদি ও অনন্ত পরমেশ্বরের পাদমূলে, এই পরম সত্যটি বিশেষ করে উপলব্ধি করতে হবে, অবহেলিত এই সারতত্ত্ব পুনরুদ্ধার করতে হবে। মত পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়কে তাদের আদি, অকৃত্রিম উৎস মুখে ফিরে যেতে হবে। সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনের ব্রত গ্রহণ করতে হবে।"

সঙ্গত কারণেই একথা স্বীকার্য যে আজাদের ধর্মীয় মতাদর্শ উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। কারণ স্বীয় মতাদর্শ উর্দু ভাষায় প্রকাশ করে আজাদ নিজেকে একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ফলে, আজাদের বক্তব্য অধিকাংশ ভারতবাসীই উপলব্ধি করতে পারেননি। অপর কারণটি রাজনৈতিক। আজাদ কংগ্রেসে যোগদান করে-ছিলেন। একজন কংগ্রেসীরূপেই তিনি সাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন। সেইজন্য ধর্মীয় ঐক্য সম্পর্কে আজাদের বক্তব্য বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমানদের কাছে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন বলে গণ্য হয়ে-ছিল। ফলে তাঁর মতবাদ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

মুসলমান সম্প্রদায়ের চিরাচরিত ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কেও আজাদের কোন গোঁড়ামি ছিল না। তিনি এই ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, মাদ্রাসার স্নাতকেরাও যেন আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। 1914 সালে জুলাই মাসে তিনি 'দারউল-ইরশাদ' নামে একটি শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতায় স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পদ্ধতিতে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু রাজনৈতিক কার্যে সদাব্যস্ত আজাদের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটি বেশীদিন পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি যখন শিক্ষামন্ত্রী হন, তখন ধর্মীয় শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত উলেমাদের উপর মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার তিনি চিরাচরিত সনাতন প্রথার

পরিবর্তন সাধনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ফলে উলেমাদের ধারণা হয় যে, সরকার তাঁদের স্বাধীন শিক্ষানীতিতে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছেন। আজাদ তাঁদের এই অমূলক আশংকা দূর করতে পারেন নি।

জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের সময় অর্থাৎ রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে আজাদ ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশেষরূপে আস্থাবান ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি সেই বিরল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের অন্যতম যাঁরা দেশ বিভক্ত হওয়ার পরেও বহু জাতির ভাবধারায় সৃষ্টি ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁদের বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। সুবক্তা ও অসাধারণ শক্তিশালী লেখক হয়েও আজাদ মানুষের সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী থাকতেন, তুচ্ছ রাজনৈতিক তর্কে তাঁর তীক্ষ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন মন কখনও সায় দেয়নি। তিনি ছিলেন এমন একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তা অথবা কার্যধারাকে বিনাশর্তে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। তিনি এতই আদর্শনিষ্ঠ ছিলেন যে কখনই তিনি প্রচলিত অর্থে দক্ষ প্রশাসকে পরিণত হতে পারেন নি। তাঁর জীবন ও কার্যের প্রামাণ্য তথ্য তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা।

[Maulana Abul Kalam Azad—India Wins Freedom ; Humayun Kabir (Ed.)—Maulana Abul Kalam Azad Memorial Volumes ; Mahadev Desai—Maulana Abul Kalam Azad ; Darbara Singh—Indian Nation ; The Future of Education in India (Publications Division) ; Maulana Azad—Tarjuman al-Quran (translated into English by Dr. Syed Abdul Latif) ; Abdur-razzaq Malihabadi—Zikr-i-Azad, Calcutta, 1960 ; W. C. Smith—Modern Islam in India, Lahore, 1969 ; M. Mujeeb—The Indian Muslims, London, 1966.]

(মনতোষ সিং) মুশির-উল্ হক

আব্বাস তায়েবজী (১৮৫৪-১৯৩৬)

Abbas Tyabji (1854-1936)

আব্বাস তায়েবজী 1854 সালে 1 ফেব্রুয়ারী বরোদায় জন্মগ্রহণ করেন এবং 1936 সালে 9 মে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর পিতা শামসুদ্দিন ছিলেন ভাই মিয়াঁ তায়েবজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বদরুদ্দিন তায়েবজীর ভ্রাতা। শামসুদ্দিন তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ আয়েবজী এ্যাণ্ড কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন। ইউরোপ ও চীনের সঙ্গে এই কোম্পানীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শামসুদ্দিন বোম্বাই এবং করাচীতে ব্যবসায়ী রাজার মতো জীবন কাটাতেন।

আব্বাস প্রথমে বিবাহ করেন তাঁর পিতৃব্য কামরুদ্দিন তায়েবজীর কন্যা আসরফ উন্নিসাকে। এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিবাহ করেন পিতৃব্য বদরুদ্দিন তায়েবজীর কন্যা আমিনা বেগমকে (1881)।

আব্বাস তাঁর পিতামহ তায়েবজী প্রবর্তিত উদার, প্রগতিপন্থী, অভিজাত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের আবহাওয়ায় বড় হয়েছিলেন। এখানকার বৈশিষ্ট্য ছিল ইসলামের মূল ভিত্তি সহিষ্ণুতা, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সর্বব্যাপী ও দয়ার্দ্র ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস। এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল কাল ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রয়োজন বিষয়ে সচেতনতা এবং দেশের বা বিদেশের সর্বোত্তম সবকিছু আত্মস্থ করার ক্ষমতা। তিনি উর্দু শিখেছিলেন (হিন্দুস্থানী) কারণ 1859 সালে তাঁদের পরিবার বুঝেছিলেন যে এটিই হবে ভবিষ্যতের সর্বভারতীয় ভাষা এবং গুজরাটী ভাষা যেটি তাঁরা তখন পর্যন্ত ব্যবহার করতেন, ত্যাগ করেন। তাঁর ফার্সী ও কোরাণের শিক্ষা সুরু হয়েছিল গৃহে এবং পরবর্তীকালে একটি মিশন স্কুলে তিনি ইংরেজী শেখেন।

তাঁর এগার বছর বয়সে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠান হয়। সেখান থেকে তিনি 1872 সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে (1875) তিনি ব্যারিষ্টার হন। এগার বছর তিনি ইংলণ্ডে সানন্দে কাটিয়েছিলেন এবং বহু পুরানো পারিবারিক বন্ধুদের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। এই মধুর অভিজ্ঞতা তাঁকে ব্রিটিশ সামাজিক সংস্থা এবং পশ্চিমী জীবনধারা এবং চিন্তাভাবনার প্রতি সশ্রদ্ধ করে তোলে। রানী ভিক্টোরিয়ার একজন অত্যন্ত অনুগত প্রজা হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দীর্ঘকাল এমনকি 1918 সালেও তিনি ব্রিটিশরাজ বা ব্রিটিশ পতাকার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি। শীঘ্রই তিনি বরোদা রাজ্যের চাকুরীতে যোগ দেন (1879) এবং প্রগতিপন্থী রাজা তৃতীয় সয়াজিরাও গাইকোয়াড়ের বন্ধু এবং সহচর হন, বরোদা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন, এবং চৌত্রিশ বছর রাজ্যের সেবা করার পর প্রধান বিচারপতি-

রূপে অবসর গ্রহণ করেন (1913)।

ইসলামিক ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক আব্বাস একটি উত্তম, ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। উদার মানসিকতার মানুষ আব্বাস প্রচ্ছন্ন কৌতুককে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে ভালবাসতেন। মহারাজা ইউরোপ পরিভ্রমণে তাঁকে সঙ্গী করেছিলেন এবং কয়েকবছর পর মহারাজা ও মহারানীকে বিদেশ ভ্রমণে সঙ্গ দেবার জন্য তিনি সস্ত্রীক পুনরায় আমন্ত্রিত হন (1893)। বরোদাতে দরিদ্র মুসলমান শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য তিনি অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বর্মায়ও গিয়েছিলেন।

অনগ্রসর মুসলমান সমাজের প্রতি সংবেদনশীল আব্বাস বহুকাল বরোদার আঞ্জুমান-ই-ইসলাম এবং তাঁর পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সুরমায়া-জামেতি-সুলাইমানই আবাসিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। তিনি নিজেও বরোদা ও নগরওয়াড়ায় আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন।

বরোদা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আব্বাসের গৃহে ছিল অবারিত দ্বার। তাঁর নিয়মিত পারিবারিক পার্টিতে ছিল সবার আমন্ত্রণ এবং এটাই সমাজে চালু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সকল সন্তান এমনকি তাঁর কন্যারাও এই প্রথাতেই বড় হয়ে উঠেছিল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনের প্রতি সচেতনতা থেকে তিনি কতকগুলি বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার আঞ্চলিক এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কারের উর্ধ্বে। শিক্ষিত ভোটদাতাদের মাধ্যমে গঠিত সংসদীয় গণতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

সামাজিক কর্মের জগতে তাঁর অসামান্য সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর উদার, স্নেহ প্রবণ মুক্ত মানসিকতা এবং সার্বজনীন রুচি। ঐতিহ্যপূর্ণ ইন্দো-ইসলামিক সংস্কৃতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্যের চিন্তাভাবনার মূর্ত প্রতীক আব্বাস বিনা আয়াসেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবরকম সমাজে তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নিজের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রগতিবাদের একটি কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন যা বরোদার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ওপর চুম্বকের মত কাজ করেছিল এবং পুরানো রক্ষণশীল সমাজের সকল সামাজিক বাধা নিষেধ ভেঙ্গে তাঁকে বরোদাবাসীর ও পরে ভারতবাসীর সম্মান ও প্রীতির পাত্র করে তুলেছিল। তিনি দক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন। শিকার, অশ্বারোহণ, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, ভ্রমণ ইত্যাদির মধ্যে তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিল। তিনি সঙ্গীত ও লেখাপড়া ভালবাসতেন। তিনি সাগ্রহে তাঁর পরিবারের লোক এবং অন্যান্য প্রতিভাবানদের জনস্বার্থে অনুষ্ঠিত উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিতেন। এভাবে অনেকেই নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছিল।

1885 সালে কংগ্রেসের জন্মকাল থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত আব্বাস জালিয়ানওয়ালা বাগের মর্মান্তিক ঘটনার অনুসন্ধানকারী কংগ্রেস এনকোয়ারি কমিটিতে (1919) কাজ করার পর গান্ধীজীর নির্দেশে ব্রিটিশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই ঘটনা ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের বাস্তবতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল।

এই রূপান্তর ঘটে তাঁর চৌষট্টি বছর বয়সে এবং তাঁর জীবন ও ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে। জীবনের অবশিষ্ট ষোল বছর তিনি আবাল্য অভ্যস্ত বিলাসবহুল ও আভিজাত্যপূর্ণ জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। নিজের বিদেশী পরিধেয় বস্ত্রাদি তিনি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন এবং একজন সত্যাগ্রহীর মতো অবশিষ্ট জীবন যাপন করেছেন এবং কাজ করেছেন।

বরোদার প্রজা মণ্ডলের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঃ 1919-20 ঃ কংগ্রেস জালিয়ানওয়ালা বাগের এনকোয়ারি কমিটির সদস্য ; 1920 (আগস্ট) ঃ গুজরাট রাজকীয় পরিষদের (আমেদাবাদ) সভাপতি, যে পরিষদ কংগ্রেসের পূর্বেই মহাত্মাজীর অসহযোগ পরিকল্পনাকে রাজনৈতিক আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিল ; 1921 ঃ কয়রা জেলায় তিলক তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহে নেতৃত্ব দান ; আমেদাবাদ কংগ্রেস (রিসেপশন কমিটি) সহ-সভাপতি, গুজরাট এবং কাথিয়াওয়াড়ে খাদি সামগ্রী বিক্রীর আয়োজক ; 1928 ঃ বারদোলি সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ ; 1930 ঃ লবণ সত্যাগ্রহে (ডাণ্ডি অভিযান) ছিলেন দ্বিতীয় নেতা, মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হলে নেতৃত্ব গ্রহণ, কিছুদিন পরে স্বয়ং কারাবরণ, সে সময় আটাত্তর বছর বয়সে সক্রেটিস-সুলভ দার্শনিকতায় জেলের সকল অসম্মান সহ্য করা ; 1932 ঃ পুনরায় কারাবরণ ; 1933 ঃ আমরোলিতে বরোদা প্রজা মণ্ডলের একাদশ সম্মেলনের সভাপতি ; 1935 ঃ বরোদায় প্রজা মণ্ডলের দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি।

যৌবনে দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত, দৃঢ় গ্রীসিয় অবয়ব ও রক্তিমাভ গাত্রবর্ণ এবং নিখুঁত ইউরোপীয়ান পোশাকে

আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত রূপবান রাজকুমার। পরবর্তী জীবনে অবিন্যস্ত রূপালী সাদা চুলের প্রাচুর্যে, অমসৃণ শ্মশ্রুতে, মোটা কিন্তু নিখুঁত সাদা খাদির টুপি, কুর্তা এবং পায়জামাতে তাঁকে ওল্ড টেস্টামেন্টের ধর্মযাজকদের মত দেখাত। সাধারণ মানুষ অথবা শিক্ষিত সমাজ যাদেরই তিনি সম্বোধন করতেন—তাঁদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল জাতীয়তাবাদের ঋষি উদ্গাতার মত।

আব্বাস ইংরেজী, উর্দু, হিন্দুস্তানী এবং গুজরাটী ভাষায় দক্ষ বক্তা ছিলেন কিন্তু সব কিছুর উপরে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব যা দিয়ে তিনি বন্ধুকে জয় করেছেন এবং সমালোচককে নিরস্ত্র করেছেন। যা কিছু তিনি বলেছেন তাই তিনি করে দেখিয়েছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম বিশ্বস্ত এবং অনুগত অনুচর হয়েছিলেন।

প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র ও তিন কন্যাকে তিনি তাঁর মৃত্যুকালে রেখে গিয়েছেন।

[Husain B. Tyabji—Badruddin Tyabji ; A Biography (1952) ; Vadodra Rajya Praja Mandal Rajat Mahotsava Smarak Granth (1917-42) (in Gujarati, Baroda, April 1942) ; The Praja Mandal, Issue of 15 June 1936 (a Gujarati monthly organ of the Vadodra Rajya Praja Mandal) ; Shri Chimanabai Stri Udyogahay Vadodra Suvarna Mahotsava Smriti Granth (1914-64) in Gujarati, Baroda, 1965) ; Kalyanjibhai Mehta—Buzurga Juvan (in Gujarati, Baroda, 1938.)]

(কুমুদ প্রসন্ন) বদরুদ্দিন তায়েবজী

আমীর, আহমদ খান (রাজা অফ মেহ্মুদাবাদ)
(১৯১৪- ?)

Amir Ahmad Khan (Raja Of Mahmudabad)
(1914- ?)

মেহ্মুদাবাদের রাজা আমীর আহমদ খাঁন ছিলেন অযোধ্যার অন্যতম সমৃদ্ধ এস্টেট মেহ্মুদাবাদের মহারাজা স্যার মহম্মদ আলি খানের পুত্র। 1931 সালে পিতার মৃত্যুতে তিনি গদীতে বসেন। লক্ষ্মৌর লা মার্টিনিয়ার কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। মেহ্মুদাবাদের আর এক শাখা বিলেহ্রার রাণী সাহেবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ইংরেজি চালচলন ও আদব কায়দায় দিন যাপন করতেন। তিনি অত্যন্ত মার্জিত ও উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। প্রথম জীবন থেকেই মুসলমানদের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল কিন্তু তাঁর আগ্রহ ছিল আরো অনেক বিষয়ে যথা চিত্রকলা, অশ্বারোহণ, আলোকচিত্র ও কবিতা। এছাড়া নানা বিষয়ে তিনি পড়াশোনা করেছিলেন, বিশেষত রাজনীতি, সামাজিক সমস্যা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সর্ব-ভারতীয় মুসলীম লীগের মঞ্চ থেকে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। 1937 সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে, 1939 সালে নয়া দিল্লীতে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সম্মেলনে, 1940 সালে হুবলীতে বোম্বাই মুসলিম লীগ সম্মেলনে এবং 1941 সালে পালঘাটে মালাবার জেলা মুসলিম লীগ সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত সমস্যা বিষয়ে তিনি তীক্ষ্ণ সচেতনতার পরিচয় দেন। মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে যারা মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের বৃহৎ প্রকল্পের ভার নিয়েছিলেন আমীর আহমদ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর দানের উপর নির্ভর করে বহু শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের সংগ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।

চল্লিশের দশকে তিনি মুসলমান জনসাধারণের কাছে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর অর্থ তুলে ধরার দায়িত্ব নেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব পরিত্যাগ করে জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হবার অনুরোধ জানিয়ে তিনি সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে আবেদন করেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রাজা সাহেব ছিলেন একজন উৎসাহী কর্মবীর। সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের অন্যতম সুবক্তা রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি

সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেছেন। মুসলিম লীগকে সম্মানের শিখরে তোলার জন্য তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের সাফল্যেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে চাননি। মুসলমানদের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনও তাঁর লক্ষ্য ছিল।

মেহ্‌মুদাবাদের রাজা সাহেব ছিলেন একজন সর্ব-ভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন মুসলিম লীগ নেতা যাঁর কথা ও নির্দেশ মুসলমান জনসাধারণের কাছে গুরুত্ব পেত। মুসলমান জনসাধারণকে জড়তা থেকে মুক্ত করা এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে সচেতন করার বিষয়ে তাঁর অবদান অনেক। তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনায় তিনি ইসলামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

[The Indian Year Book and Who's Who, 1936-37, Vol. XXIII; Mohd. Noman—Muslim India: Rise and Growth of All India Muslim League (Allahabad, 1942).]

এস. এম. জিয়াউদ্দিন আলভি

আমির চাঁদ (মাষ্টার) (?-১৯১৫)

Amir Chand (Master) (?-1915)

আমির চাঁদ দিল্লীর এক আগরওয়াল (বৈশ্য) পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সঠিক ভাবে জানা যায় না। 1915 সালে মৃত্যুদণ্ডের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষরা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন এবং দিল্লীর দারিবা অঞ্চলে প্রভূত বিষয় সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু 1857 সালে তাঁরা সর্বস্বান্ত হন। আমির চাঁদের পিতা হুকুম চাঁদ ছিলেন প্রথমে লাহোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পরে হায়দ্রাবাদ হাই কোর্টের বিচারপতি এবং সবশেষে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে নিজামের উপদেষ্টা। তাঁর পরিবারকে রক্ষণশীল উচ্চমধ্যবিত্ত বলা যেতে পারে।

বার বছর বয়সে আমির চাঁদের বিবাহ হয় কিন্তু পাঁচ বছর পরেই তাঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। তিনি অন্যান্য কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেন যেহেতু বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার নেই সেহেতু তিনি আর বিবাহ করবেন না।

আমির চাঁদ দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেনস্ স্কুল ও সেণ্ট স্টিফেনস কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে তিনি অ-নিয়মিত (ক্যাজুয়েল) ছাত্ররূপে ইতিহাস ও ইংরেজিতে পাঠ গ্রহণ করেন। আমির চাঁদ পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেননি বটে কিন্তু তিনি নানা বিষয়ে ভালভাবে পড়াশোনা করেছিলেন, ব্যাকরণে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

আমির চাঁদ শিক্ষকতা করতেন বটে কিন্তু তাঁর বন্ধুরা ছিলেন গুণী ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক এবং সেণ্ট স্টিফেন্‌স কলেজের ইংরেজ মিশনারী শিক্ষকবৃন্দ। বিপ্লবী গোষ্ঠীতে তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন হনুমন্ত সহায়, অবধ বিহারী, বাল মুকুন্দ ও বসন্ত কুমার বিশ্বাস। লালা হরদয়াল ও রাসবিহারী বসুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শেও তিনি এসেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ এবং সরকারী দমন নীতি তাঁকে একজন কট্টর বিপ্লবীতে পরিণত করে।

দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন্‌স স্কুলে শিক্ষক হিসেবে মাষ্টার আমির চাঁদ তাঁর জীবন শুরু করেন। পরে তিনি দিল্লীর Sanskrit High School-এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। লালা হনুমন্ত সহায় যখন দেশাত্মবোধক গ্রন্থের পাঠাগার সহ একটি জাতীয়তাবাদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তখন মাষ্টার আমির চাঁদ সেখানে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন।

বাংলা বিভাগের পরে তিনি নিজেকে স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। পুলিশকে তিনি তাঁর বয়কট সংক্রান্ত বক্তৃতাগুলি পাঠাতেন। রামচন্দ্রকে (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এক বিপ্লবী) সম্পাদক করে 1908 সালে তিনি 'আকাশ' নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

আমলাতন্ত্রের নিপীড়নে জনমত প্রকাশের এই মাধ্যমকে শীঘ্রই বাতিল করতে হয়। মাষ্টারজীর ছাত্র লালা হরদয়াল দিল্লী আসেন এবং মাষ্টার আমির চাঁদকে নেতা করে একটি বিপ্লবী দল সংগঠিত করেন। ইতিমধ্যে সরকার কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর করা স্থির করেন। বাংলাদেশের চরমপন্থীরা এবং দিল্লীর বিপ্লবী গোষ্ঠী এবার একত্র হন এবং চাঁদনি চকে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় (1912)।

চাঁদনি চকের সামনে দিয়ে ভাইসরয়-এর মিছিল যাবার সময় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ছাদ থেকে রাসবিহারী বসুর ইঙ্গিতে মহিলা বেশধারী বসন্ত কুমার বিশ্বাস বোমাটি নিক্ষেপ করেন।

পুলিশ কিভাবে আমির চাঁদ এবং তাঁর সহযোগী-দের সন্ধান পায় এ ব্যাপারে মতদ্বৈধ আছে। কলকাতা, দিল্লী, লাহোর এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাপক অনু-সন্ধানের ফলে আমির চাঁদ এবং তাঁর বেশ কয়েকজন সহযোগী ধরা পড়েন। দু'জন রাজ সাক্ষীর স্বীকা-রোক্তির উপর নির্ভর করে বিচার চালান হয়। 1914 সালে আমির চাঁদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হাই কোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সিলে আপীল অগ্রাহ্য হয় এবং 1915 সালের এপ্রিলে তাঁর ফাঁসি হয়।

[Interviews with Lala Sultan Chand, adopted son of Master Amir Chand ; with Hanumant Sahay, a revolutionary associate of Master Amir Chand ; and with Jogesh Chandra Chatterjee, a former revolutionary leader.]

(মনতোষ সিং) অম্বা প্রসাদ

আম্মু স্বামীনাথন (১৮৯৪— ?)

Ammu Swaminathan (1894— ?)

আনাক্কারা বেদাক্কাথ পরিবারের আম্মু আম্মার কন্যা আম্মু স্বামীনাথন 1894 সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ সরকারের কর্মচারী পেরুর্মপিলাভি পরিবারের সদস্য গোবিন্দ মেনন তাঁর পিতা ছিলেন। দুটিই উত্তর কেরালার সুপরিচিত নায়ার পরিবার। 1908 সালে মাদ্রাজের অন্যতম প্রসিদ্ধ আইনজীবী ডঃ স্বামীনাথনের সঙ্গে আম্মুর বিবাহ হয়। তাদের সন্তানগণ যথাক্রমে—গোবিন্দ, মাদ্রাজের আ্যাডভোকেট-জেনারেল, ব্যবসায়ে নিযুক্ত সুরাম, আই. এন. এ'র কর্ণেল লক্ষ্মী এবং প্রখ্যাত নৃত্যকলাবিদ মৃণালিনী সারাভাই। শ্রীমতী স্বামীনাথনের শিক্ষা শুধু মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে স্বামীর সস্নেহ সহায়তায় তিনি জ্ঞানানুশীলনে ও সামাজিক আচার-আচরণে অনেক উচ্চশিক্ষা নারী-দেরও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। অনেক বিশিষ্ট যোগাযোগ, বিশ্ব পরিক্রমা ও নানা প্রকার সমিতির কার্যাবলী তাঁকে আরও উন্নত করে তোলে।

ডঃ স্বামীনাথন যখন মাদ্রাজে আইন ব্যবসায় শুরু করেন তিনি তাঁর পত্নীকে জনহিতকর কর্মে অংশ গ্রহণ ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্য উৎসাহ দিতেন। তিনি মাদ্রাজে অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স্ কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাত্রী ও সদস্য ছিলেন। তাঁর ভাবধারা গঠনের পিছনে গান্ধীজী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, লালা লাজপত রায় এবং জওহরলাল নেহরুর প্রধান ভূমিকা ছিল। 1934 সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। 1934 থেকে 1939 সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ পুরসভার সদস্য ছিলেন। 1942 সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ-দানের ফলে তাঁর দু'বছরের জন্য কারাদণ্ড হয়। 1945 সালে তিনি সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে এবং পরের বছর সংবিধান পরিকল্পনা পরিষদে (Constitution-making Committee) নির্বাচিত হন। ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বের জন্য তিনি 1948 সালে ইথিওপিয়া, 1949 সালে জেনিভায় ইউনেসকোর এক সম্মেলনে এবং সেই একই বছর আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের জন্য কোপেনহেগেন গমন করেন। 1950 থেকে 1957 সাল পর্যন্ত তিনি লোকসভার সদস্যা ছিলেন। তিনি 1953 সালে জাপান ও 1954 সালে চীনদেশ ভ্রমণ করেন। 1957 থেকে 1960 সাল পর্যন্ত তিনি রাজ্য সভার সদস্যা ছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় ফিলম সেন্সর বোর্ড ও ফিলম অ্যাওয়ার্ড কমিটিতে ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ ফিলম সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। 1960 থেকে 1963 সাল পর্যন্ত তিনি ভারত স্কাউটস্ ও গাইড-সেরও সভাপতি ছিলেন। এই সময় তিনি নানা প্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন—বিশেষতঃ শিশু ও নারী কল্যাণমূলক কার্যাবলী সমূহের সঙ্গে। শেষ কয়েক বছরের জন্য তিনি মাদ্রাজে অবসর জীবন যাপন করেন।

তিনি প্রগতিশীল মতবাদিনী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এক প্রাচীন নৈষ্ঠিক পরিবারে জন্ম হেতু স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হোক—এ ধরনের মতবাদকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। কিছু কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় প্রচলিত নিষেধাজ্ঞার প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তিনি নারী-পুরুষের সমানাধিকারের সপক্ষে ছিলেন। ফিলম

বোর্ডে থাকাকালীন কিছু কিছু ছবির শিল্পবোধ ও যুবমানসে তার প্রতিফলন বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব সুখকর ছিল না। জন্ম সূত্রে কেরালার কন্যা হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদী আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। নিজে প্রাণবন্ত ও আশাবাদী হওয়ার দরুন তিনি সর্বদা নিপীড়িতদের জন্য মুক্তহস্ত ছিলেন। এক বিশাল এলাকা জুড়ে সকলের কাছেই তিনি "চেরিআম্মা" অর্থাৎ "মাসীমা" বলে খ্যাত ছিলেন। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় সাধারণের কাছে তিনি কতখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী ছিলেন। তাঁর সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ও জনজীবনে তাঁর স্থান কতখানি ব্যাপ্ত ছিল এর থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

[A Shridhar Menon (Ed)—Kerala District Gazetteer, Kozhikode, Trivandrum 1962 ; The Year Book and Who's Who in Malabar (Compiled by N. Ahmed Koya), Kozhikode, 1954 ; the A. I. C. C. Ernakulam Session Souvenir, September 1966 ; Nair Service Society Subarna Grandham, Changanachery, 1964 ; Personal interview of the Research Fellow with Mrs. Ammu Swaminathan and with Mrs. A. V. Kuttimalu Amma ; Personal Knowledge of the Contributor.]

(এন. এম. কে. নায়ার) টি. সি. শংকর মেনন

আর. এন. আরোকিয়াস্বামী মুদালিয়ার

(১৮৭০-১৯৩৩)

R. N. Arokiaswami Mudaliar

(1870-1933)

পারিবারিক পরিচয়ে মুদালিয়ার এবং ধর্মের দিক থেকে ক্যাথলিক আর. এন. আরোকিয়াস্বামী (আরোগ্য স্বামী নামেও পরিচিত) মুদালিয়ার ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার যিনি পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন একজন রাজনীতিবিদ্। মাদ্রাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বড় হয়েছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মীয় পরিবেশে। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় তিনি মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজের উদার পারিপার্শ্বিকতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। 1890 সালে স্নাতক হয়ে তিনি মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হন এবং 1895 সালে বি. ই. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় 1896 সালে নেলোরে মাদ্রাজ সরকারের অধীনে সরকারী পূর্ত বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরে তাঁর পদোন্নতি হলে তিনি ইঞ্জিনীয়ার এবং 1919 সালে তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জিনীয়ার পদ গ্রহণ করেন। 1925 সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং 'নেশন ফার্স্ট পার্টি' নামক সংগঠনের নেতা হন। স্বরাজ আন্দোলন যে সময় শক্তিশালী হয়ে উঠছিল সে সময় তিনি কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। 1926 সালে তিনি মাদ্রাজ কেন্দ্রীয় খ্রীষ্টান নির্বাচন-কেন্দ্র থেকে বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন ; পর পর দুবার তিনি নির্বাচন দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছিলেন। 1927-28 সালে অল্পদিনের জন্য তিনি প্রথম সুব্বারায়ান মন্ত্রীসভায় সদস্য ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় মন্ত্রীসভা থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। 1931 সালে তিনি মাদ্রাজে রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটির সদস্য রূপে কাজ করেন।

একজন নিবেদিতপ্রাণ, দক্ষ ও মৌলিক উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিনীয়াররূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প ও আপার অ্যাণ্ড লোয়ার ভবানী প্রকল্প ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্পগুলির সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত আছে। পরিকল্পনা-জলসরবরাহ এবং পরিবহন সংক্রান্ত পরিকল্পনার সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর বিশেষ প্রশংসনীয় কাজের মধ্যে আছে 1913 সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আর্কট জেলার প্রবল বন্যাজনিত সমস্যার সমাধানে তৎপরতা। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 1914 সালে 'রায়বাহাদুর' এবং 1925 সালে 'দেওয়ান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

শুধুমাত্র আন্তরিকতাপূর্ণ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যই তিনি সুপরিচিত ছিলেন তা নয়, খ্রীষ্টধর্মালম্বী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও তিনি ছিলেন এক ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক। জাতীয় জাগরণের সঙ্গে একীভূত না হওয়া পর্যন্ত খ্রীষ্টানরা তাদের আসন সংরক্ষণের দাবি আদায়ের জন্য চাপ দিতে থাকবে—এই সম্ভাবনাকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারে আগ্রহী

মুদালিয়ার অবদমিত শ্রেণীর উন্নতির জন্য খৃীস্ট-ধর্মাবলম্বীদের অগ্রসর হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডে তাঁর ক্রিয়াকলাপ সীমিত ছিল স্বল্প সময়ের মধ্যে—1926 থেকে 1931 সাল মাত্র। কারণ তাঁর কর্মজীবনের বৃহত্তর সময় কেটেছে একজন পেশাদার ইঞ্জিনীয়ার রূপে। মাদ্রাজ ছিল তাঁর কাজের কেন্দ্রস্থল। আপোষপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ মুদালিয়ার ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের সমর্থক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই স্বায়ত্ত শাসনাধিকার সাংবিধানিক পথে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। স্বাভাবিক-ভাবেই তাই তিনি সাইমন কমিশন নিয়োগ এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তবু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর পরি-কল্পনার তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁর আশংকা ছিল যে এই পরিকল্পনা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহ ও উত্তেজনা চিরস্থায়ী করবে। তিনি জাস্টিস পার্টির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচার-অভিযান চালিয়েছেন, প্রধানতঃ চাকুরী লাভের উদ্দেশ্যে অব্রাহ্মণদের আন্দোলনের নিন্দা করেছিলেন, রাজন্যবর্গকে তাদের পুরাতন আমলের পদমর্যাদা ও বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন এবং নিজের দেশকে শিল্পনির্মাণে স্বনির্ভর দেখতে চেয়েছেন। জাতীয়তাবাদের প্রতি আরোকিয়া-স্বামীর অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য কিন্তু তাঁর দুটি সীমাবদ্ধতার কথা অস্বীকার করা যায় না—একটি যে সংখ্যালঘু খৃীস্টান সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিনিধি ছিলেন বিশেষ ভাবে তাদের হিতসাধনের প্রচেষ্টা। দ্বিতীয়টি ছিল ইরেজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, যাদের তিনি সরকারী চাকুরিয়ারূপে দীর্ঘদিন সেবা করেছেন। এজন্যই তিনি খৃীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য অস্থায়ীভাবে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর পরামর্শ দিয়ে-ছিলেন এবং ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে, তিনি চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার।

[N. N. Mitra (Ed.)—The Indian Annual Register, Vol. I, 1926 ; The Asylum Press Almanac and Directory, 1931-32 ; The Hindu Files ; Proceedings of the Madras Legislative Council, 1926-30 ; Who's Who in Madras, 1932.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) কে. রাজাইয়ান

আর. এল. পুরুষোত্তম রেড্ডি (১৯০৬—?)

R. L. Purushothama Reddy (1906—?)

আর. এল. পুরুষোত্তম রেড্ডি 1906 সালের 1 জুলাই পণ্ডিচেরী রাজ্যের বাহুর কম্যুনে ইরুলাসাণ্ডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাতা ছিলেন কৃষিজীবী। লক্ষ্মীনারায়ণ রেড্ডিয়ার নামে তাঁর একজন ধর্ম পিতা ছিলেন। তাঁরা জাতিতে ছিলেন রেড্ডি। পুরুষোত্তম 1941 সালে ত্রিপুরাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। ত্রিপুরা সুন্দরীর পিতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত জনকর্মী। তিনি হরিজন সেবক, স্বদেশী আন্দোলন, খাদি আন্দোলন ইত্যাদি নানাবিধ জাতীয়তাবাদী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পুরুষোত্তম প্রথমে বাহুরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভ করেছিলেন। পরে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের জন্য 1922-30 সাল তিনি লেখাপড়া করেছিলেন পণ্ডিচেরীর কলেজ কলোনিয়নে। সমাজ জীবনে পণ্ডিচেরীর একজন আইনজীবী সবরিনাথন এবং বিশেষভাবে পণ্ডিচেরীর একজন সাংবাদিক এস. আর. সুব্রামনিয়ামের প্রভাবে তিনি প্রভাবিত হয়ে-ছিলেন। এস. আর. সুব্রামনিয়াম পরবর্তীকালে তামিলনাড়ুর সর্বোদয় মণ্ডলের সচিব নিযুক্ত হয়ে-ছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনাকে প্রভাবান্বিত করেছিল ফরাসী দর্শন, জে. কৃষ্ণমূর্তির রচনাসমূহ এবং তামিল কবি এস. ভারতী। 1933 সালে তিনি সিংহলে গিয়েছিলেন। তাঁর বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফরাসীরা। শ্রেষ্ঠ ফরাসী লেখকদের রচনা যেমন মলিয়ের, রেসিনে এবং ভিকটর হুগো ছাড়াও ইংরেজ এবং জার্মান সাহিত্যও তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল।

ডি, সুব্বাইয়া প্রকাশিত তামিল সাপ্তাহিকী 'স্বাদনদিরমে'তে তিনি প্রায়ই শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে লিখতেন। জনসভা ও ছাপাখানা ছিল তার প্রধান প্রধান কর্মক্ষেত্র। এই দুই মাধ্যমকে তিনি 1934

সাল থেকে 1964 সাল অবধি জাতীয় মুক্তি এবং সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার বলে গ্রহণ করেছিলেন। 1942 থেকে 1946 সালের মধ্যে তিনি গোপনে মিটিং এবং গোপনে রেডিও ট্রান্সমিটার ইত্যাদি ব্যবহার করে-ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তিনি সদস্য ছিলেন 1934 থেকে 1946 অবধি, পণ্ডিচেরীর 'ইয়ুথ লীগে'র সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন 1932-35 সালের জন্য। তিনি ছিলেন ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি (1946-55), পণ্ডিচেরী রাজ্য কংগ্রেসের আহ্বায়কের পদে আসীন ছিলেন 1955 সাল পর্যন্ত। 1936-38 সালে ছিলেন মহাজন সভার কোষাধ্যক্ষ, রাজ্য প্রতিনিধি সভার সভা-পতির পদ অলংকৃত করেছিলেন 1955-58 সাল পর্যন্ত এবং তারপর আবার 1958 থেকে 1963 সাল অবধি। 1958 থেকে 1963 সালের মধ্যে তিনি পার্মানেণ্ট কমিশনের সভাপতি ছিলেন এবং এছাড়া ছিলেন রাজ্য প্রতিনিধি সভার ফাইন্যান্স কমিশনের স্থায়ী সভাপতি। 1955 সাল থেকে তিনি রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ডের সদস্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। 1947 সালের জুন মাসে তিনি অল পিপলস কন-ফারেন্সের সভাপতি হয়েছিলেন এবং 1964 সালে তাঁকে পণ্ডিচেরীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস সংকলন কমিটির স্থায়ী সভাপতি করা হয়েছিল। 1933 থেকে 45 সালে তাঁকে পণ্ডিচেরীর বৈদ্যুতিক সংকেত গ্রহণ কেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি 1933 থেকে 1937 সাল পর্যন্ত হরিজনদের উন্নতি-বিধানের জন্য কাজ করে গিয়েছেন গ্রামে গ্রামে। হরিজন ছাত্রদের অর্থ এবং জিনিসপত্র দিয়েও সাহায্য করতেন। 1936 সালের প্রথম থেকেই তিনি পণ্ড-চেরীর শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য রূপে তিনি পুস্তিকা বিতরণ, জাতীয়তাবাদী প্রচারকার্য চালানোর জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাগুলি ইত্যাদি সরবরাহ করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। যুব লীগের সচিব থাকাকালে তিনি অত্যন্ত কর্মতৎপর ছিলেন এবং যুবকদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে নানা রকম রচনা প্রচার করতেন। যে সময় তিনি ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ভারতীয়দের হাতে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি সে সময় অনেক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি কোন সময় ফরাসী নেতাদের তাদের কাজের জন্য সমালোচনা থেকে অব্যাহতি দেন নি। 1949 সাল থেকে তাঁর বক্তব্য ছিল একটিই—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফরাসী উপনিবেশগুলির সম্পূর্ণ মিশ্রণ। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি তিনি ছিলেন কংগ্রেস দলের সদস্য।

পুরুষোত্তম জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে এ সমস্ত সামাজিক শান্তি এবং জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করে। তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন—কিন্ত মহিলাদের রাজনীতিতে এবং জনসাধারণের কাজে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে তার কিছু কিছু গোঁড়ামি ছিল। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল এরকম—তিনি নিয়মাবদ্ধ সুসংগঠিত ধর্মের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন একজন মানুষের চরিত্র কখনই ধর্মের প্রভাবাধীন হবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ তাঁর মতে এই শিক্ষা ব্যবস্থা হল বস্তুবাদী। তিনি বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ এক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি যা হবে আঞ্চলিকতাবাদ এবং প্রাদেশিকতাবোধ থেকে মুক্ত। পুরুষোত্তম ব্রিটিশ শাসকদের সমালোচনা করতেন তাদের বিভেদ এবং শাসন নীতির জন্য। তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল সেই সমস্ত ফরাসীদের প্রতি যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী হলেও ব্যক্তি এবং প্রজাদের সম্বন্ধে যাঁদের ছিল গভীর মানবিকতা বোধ এবং শ্রদ্ধা। ফ্রান্সের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক রক্ষা করতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন।

পুরুষোত্তমের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলে সকলেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি একাধারে গান্ধীজীর চিন্তাভাবনা এবং অন্যদিকে ফরাসী সংস্কৃতির প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দুটি—ফরাসী ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা এবং ফরাসী উপনিবেশ থেকে জন-গণের সামাজিক মুক্তি লাভ করা।

তিনি জনগণের সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্য মনেপ্রাণে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর ছিল সত্যিকারের দেশপ্রেম। নিপীড়িত এবং নিগৃহীত জাতির জন্য তাঁর ছিল উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

[The Swadandiram Files 1936-54 ; The Hindu Files 1948-54 ; The Dessobagari Files 1937-41 ; Personal interview of the Research Fellow in August 1966 with Purushottamreddy ; The Congress party Files (Pondicherry) ; The Liberation Files 1949-50 ; The Jeunesse Files, 1947-48 ; Personal Knowledge of the Contributor.

ইমানুয়েল ডিভিয়েন **ই. ডিভিয়েন**

আর. কে. সম্মুগম চেট্টি (১৮৯২-১৯৫৩)

R. K. Shanmugam Chetty (1892-1953)

আর. কে. সম্মুগম চেট্টি 1892 সালের 17 অক্টোবর তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আর. কান্দস্বামী চেট্টিয়ার, মাতা শ্রীরঙ্গম্মাল। তাঁদের পরিবার ছিল বণিক বিষিয়া (তৈল ব্যবসায়ী) গোষ্ঠীর অন্তর্গত ধনী ব্যবসায়ী পরিবার। তাঁর পিতামহ উপ্পিলিপালায়ম রামস্বামী চেট্টিয়ার ছিলেন এক ধনী ব্যবসায়ী। সম্মুগম চেট্টি দুবার বিবাহ করেছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী আয়াম্মালের মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজাম্মালকে বিবাহ করেন।

সম্মুগম চেট্টির শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয়েছিল মাত্র চার বছর বয়সে। একজন গৃহ শিক্ষক তাঁর জন্য নিযুক্ত ছিলেন। কোয়েম্বাটুরের লণ্ডন মিশন হাই স্কুলে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। 1910 সালে তিনি মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজে যোগ দেন এবং সেখান থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি মাদ্রাজ ল কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন আগাগোড়াই কৃতিত্বপূর্ণ ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি গোখলে, এস. এন. ব্যানার্জী, বি. সি. পাল, মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিসেস্ অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রভাবে আসেন। এঁরা ছাড়াও খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ স্কিনার এবং 'হিন্দু' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতের সঙ্গে 'শিলপ্পাদিকরম্' এবং বিখ্যাত নীতিশাস্ত্র 'কুরাল' তাঁর মনে বিশেষ রেখাপাত করে। মাদ্রাজে বি. সি. পালের ভাষণ প্রথম তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান ধারণাকে রূপ দান করে এবং তাঁর বাক্ প্রকাশ ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

1919 সালে সম্মুগম চেট্টি বারে যোগ দেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় আগ্রহ নিতে শুরু করেন। 1924 সালে মিসেস অ্যানি বেসান্ত তাঁকে ইংলণ্ডে ন্যাশনাল কনভেনশনের প্রতিনিধি দলে অংশ নিতে আহ্বান জানান। সেই সময় তিনি সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। 1926 সালে এম্পায়ার পার্লামেন্টারী ডেলিগেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনি অস্ট্রেলিয়া যান। 1927 থেকে 1930 সালের মধ্যে তিনি পর পর তিনবার ভারতের এমপ্লয়ারস্ ডেলিগেশনের উপদেষ্টা রূপে জেনেভায় যান। 1932 সালে ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে শুল্ক চুক্তি বিবেচনা করার জন্য ইম্পিরিয়াল ইকনমিক কনফারেন্সে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে তিনি কানাডার অটোয়াতে গিয়েছিলেন। 1938 সালে তিনি লীগ অফ নেশনস্-এর একজন প্রতিনিধি হন। 1941-42 সালে আই. এল. ও.-র নিউইয়র্ক সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে তিনি আমেরিকাতে ছিলেন। 1944 সালে তিনি আমেরিকার ব্রেটন উড্সে ইণ্টারন্যাশনাল মনিটারি কনফারেন্সে যোগ দেন।

ভারতে তিনি বহু সম্মানজনক ও দায়িত্বশীল পদে আসীন ছিলেন। কোয়েম্বাটুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যানরূপে তিনি জীবন শুরু করেন। 1920-22 সালে তিনি মাদ্রাজ বিধান পরিষদের সদস্য হন এবং 1923-1934 সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভায় ছিলেন। 1926 এবং 1930 সালে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন। 1925 সালে স্বরাজ্য পার্টির টিকিটে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু লাহোর কংগ্রেসের পর তিনি পদত্যাগ করেন। 1931 সালে তিনি বিধানসভায় সহকারী সভাপতি এবং 1933 সালে সর্বসম্মতিক্রমে এর সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই বছরই তাঁকে কে. সি. আই. ই. খেতাব দেওয়া হয় কিন্তু 1947 সালের অগাস্ট মাসে তিনি তাঁর খেতাব ত্যাগ করেন।

1935-41 সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কোচিনের দেওয়ান। 1945 সালে তিনি চেম্বার অফ প্রিন্সেসের চ্যান্সেলরের সাংবিধানিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। 1945 সালের নভেম্বর মাসে তিনি ইণ্ডিয়ান টারিফ বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হন। 1947 সালের মে

থেকে 1949 সালের অগাষ্ট মাস পর্যন্ত তিনি স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী হন। এক দুর্ভাগ্যজনক বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পরামর্শে তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব ত্যাগ করেন। পরে তাঁকে 1949 সালে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করা হয়। 1951-52 সালে তিনি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। 1952 সালে তিনি মাদ্রাজ বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন। কিন্তু 1953 সালের মে মাসে মৃত্যু তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের অবসান ঘটায়।

জীবনের প্রথমদিকে সম্মুগম চেট্টি জাস্টিস পার্টির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি জাতিভেদ প্রথার প্রতিবাদ করেছেন এবং অস্পৃশ্যতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি বুঝতেন ধর্ম মানুষের একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধর্মের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন প্রচলিত রীতির বিরোধী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কঠোর সমালোচক হলেও তিনি পূর্ণ স্বরাজ্যের চেয়েও স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল এবং তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রাসঙ্গিক এবং অবধারিত একথা বুঝেছিলেন। যাই হোক তাঁর বক্তব্য ছিল যে জাতিভেদ ও গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী যদিও তিনি গান্ধীজীর অনুরাগী এবং তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তবু তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেন নি। ক্রমপর্যায়ে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে জাতীয় উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। সমগ্র ভারতবাসীর, তাঁরা যেখানেই বসবাস করুন, পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকারের জন্য এবং সব জাতির লোকেদের প্রতি সমব্যবহারের জন্য তিনি তীব্রভাবে চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি লবণ আইন, সেনাবাহিনীর জন্য বিশেষ অর্থব্যয়, ব্যবসায়ে রাজন্যবর্গের বিশেষ সুযোগ সুবিধার বিরোধিতা করেছেন। রিজার্ভ ব্যাংক আরো আগে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন এবং তিনি চেয়েছিলেন একে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে।

কোচিনের দেওয়ান থাকাকালে তিনি সমবায় আন্দোলনে এবং শিল্পোন্নয়নে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ঐ রকম একটি গোঁড়া রাজ্যেও তিনি হরিজনদের জন্য সরকারী রাস্তাঘাট উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন। আইনগুলিকে সুসংহত করে জনপ্রিয় মন্ত্রী নিয়োগ করে তিনি সেই রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার স্থাপন করেছিলেন।

তামিল সাহিত্যের তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ছাত্র। তিনি টীকা ভাষ্য সহ 'শিলপ্পাদিকরমে'র সম্পাদনা করেছিলেন। রাইট অনারেবল শাস্ত্রী এনডাওমেণ্ট ভাষণে তিনি 1945 সালে 'দি কনসেপশন অফ দি ন্যাশনাল স্টেট অ্যাপ্লায়েড টু ইণ্ডিয়া' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এছাড়া ছিল তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতামালা। তামিল ইসাই আন্দোলনে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বোদ্ধা অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ শাসক, সুবক্তা এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তিনি ছিলেন নির্ভীক এবং অন্য সমস্ত কিছুর উপরে স্থান দিতেন তাঁর বিবেককে।

[Commemoration Vol. on his 61st birthday, Madras, 1952 ; K. M. Balasubrahmanyan—South Indian Celebrities, Vol. I, Madras, 1934 ; P. S. Chettiar—R. K. Shanmugam Chettiar (in Tamil), 1954 ; N. Perumal—Economic Ambassador (The Life and Work of Dr. R. K. Shanmugam Chettiar), Coimbatore, 1954 ; Who's Who in Madras, Vol. III, Pearl Press, Cochin, 1934 ; Proceedings of the Madras Legislative Council, 1920-22 ; Proceedings of the Central Legislative Assembly, 1923-24 ; Indian Review Files ; Hindu Files.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) এন. সুব্রাহ্মনিয়ন

আর কৃষ্ণমূর্তি (কল্কি) (১৮৯৯-১৯৫৪)

R. Krishnamurthi (Kalki) (1899-1954)

তাঞ্জোর জেলায় মায়াবরমের সন্নিকটে বুদ্ধমঙ্গলম্ নামে একটি ছোট গ্রামে 1899 সালের 9 সেপ্টেম্বর কৃষ্ণমূর্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামস্বামী আয়ার ছিলেন গ্রামের কর্ণম বা হিসাব রক্ষক, তাঁর মাতা আইয়াল নায়কী। তিনি এক দরিদ্র কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তাঁর স্ত্রী রুক্মিনী

আম্মাল যাঁকে কৃষ্ণমূর্তি ছাব্বিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন অনুরূপ পরিবারেরই কন্যা।

বুদ্ধমঙ্গলমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। শৈশবেই কতকগুলি সুকুমার শিল্প ও বিনোদন যেমন, হরিকথা (ধর্ম বিষয়ে সঙ্গীত সহকারে আলোচনা), ভজন ও অন্যান্য ধরণের সঙ্গীত ইত্যাদি উপভোগে তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। তিরুচিরাপ্পল্লীর ন্যাশনাল কলেজ হাই স্কুলে তিনি মধ্য ও উচ্চশিক্ষা শেষ করেন। সহপাঠীদের মধ্যে তিনি সাধারণের বেশ উপরে ছিলেন এবং ভাল ছাত্র বলে তাঁর সুনাম ছিল। যাইহোক ন্যাশনাল কলেজে তিনি মাত্র ইণ্টারমিডিয়েট মান পর্যন্তই পড়েছিলেন।

কিন্তু 1921 সালে যখন মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন তখন আরো বহু ছাত্রের মত কৃষ্ণমূর্তিও জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য লেখাপড়া ছাড়লেন। তিনি কংগ্রেস দলের সদস্য হন এবং তিরুচিরাপ্পল্লী কংগ্রেস কার্যালয়ে করণিকের কাজ গ্রহণ করেন। সেই বছরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কারুরে (তিরুচি জেলায়) আটক রাখা হয়। পরবর্তীকালের কংগ্রেস আন্দোলনগুলিতেও তিনি যোগ দেন। 1940 সালে একক সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে পুনরায় কারাবরণ করেন।

তিনি একজন একনিষ্ঠ সাংবাদিক ও সহজাতগুণ-সম্পন্ন লেখক ছিলেন। 1930 সাল থেকে তিনি তৎকালীন সুখ্যাত তামিল পত্রিকা 'নবশক্তি'র সম্পাদক ভি. কল্যাণসুন্দরম্ মুদালিয়ারের কাছে শিক্ষানবিসি করেন। পরে 'বিমোচনম' নামক পত্রিকাটির সম্পাদনা কাজে রাজাজীর সঙ্গে কিছুকাল সংশ্লিষ্ট থাকার সূত্রে রাজাজীর কছে তাঁর শিক্ষানবিসি করার সুযোগ হয়। এই পত্রিকাটি তখন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের প্রচারের পক্ষে নিয়োজিত ছিল। সালেম জেলার তিরুচেনগোদের গান্ধী আশ্রমে তিনি কিছুদিন ছিলেন। সেখানে তিনি ছিলেন রাজাজীর একনিষ্ঠ শিষ্য। এস. এস. বাসান সম্পাদিত 'আনন্দ বিকাতন' নামে একটি মাদ্রাজী সরস সাপ্তাহিক পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণমূর্তির প্রধান ও পরিণত সাংবাদিকতার কাজ শুরু হয়। শীঘ্রই এই পত্রিকাটি প্রতি গৃহে একটি পরিচিত নাম ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অবশ্য পাঠ্য হয়ে ওঠে। কৃষ্ণমূর্তি যথেষ্ট ইংরেজীও পড়েছিলেন এবং গী দ্য মোপাসাঁ, টলস্টয় ও ও'হেনরী ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রিয় লেখক। সেদিনের তামিল পাঠক গোষ্ঠী সপ্তাহ ধরে তাঁদের অফুরন্ত আগ্রহ নিয়ে সঙ্গীত, পত্রাবলী ও রাজনীতির ওপর কৃষ্ণমূর্তির বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু সর্বদাই উত্তেজক ও উদ্দেশ্যমূলক মতামত ও সমালোচনার জন্য অপেক্ষা করে থেকেছেন। তিনি ছিলেন এক মহান ও সৃজনশীল শিল্পসমালোচক। তিনি লেখার সময় 'কল্কি' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি 'কর্ণাটকম', 'তামিল তেনি', 'রা. কি.' ইত্যাদি নামেও লিখেছেন। 1941 সালে তিনি 'আনন্দ বিকাতন' ছেড়ে দেন এবং 1941 সালের 15 অগাস্ট 'কল্কি' নামে নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করেন। 1954 সালের 5 ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছেন।

কল্কি যদিও প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প ও রম্য-রচনার লেখক ও সমালোচক তবু বিশেষ করে তিনি তামিল ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক। তাঁর 'শিবকামিয়িন সবাথম' ও 'পার্থিপান কানাভু' নামের দুটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসে তামিল ভূমির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ শব্দময় হয়ে উঠেছে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল 'শরদায়িন তানধিরম' 'কানাইয়ালিয়িন কানাভু', 'বিনাই ভাবানী', 'আলাই-য়োশাই', 'কলভানিন কদলী', 'পোনুনিয়িন সেলভন' ইত্যাদি। তিনি 'ইলঙ্গানগাক্ষিপরায়ানাম' (সিংহল ভ্রমণ) নামে একটি আকর্ষণীয় ভ্রমণ কাহিনীও লিখেছেন, গান্ধীর আত্মজীবনী তামিল ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তামিল কবি ভারথিয়ারের তিনি অনুরাগী ছিলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কবিতার সঙ্গে তামিল পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক লেখককুল তাঁকে অগ্রজ পথিকৃৎ বলে স্বীকার করেছেন এবং তামিল লেখক সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত করেছেন। কিছুকাল তিনি 'তামিল বলার্চি কলাগামে'র সম্পাদক ছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি রাজাজীর, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এম. এস. সুব্বালক্ষ্মীর এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে টি. কে. চিদাম্বরনাথ মুদালিয়ারের ঘনিষ্ঠ সহ-যোগী ছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তিনি এই দিক্পালদের সঙ্গে জনতার সেতুবন্ধনের কাজ করেছেন। জনতার অনুদানে 'মণ্ডপ' গুলি নির্মাণ করে তিনি ভারথি, গান্ধী ও ভি. কল্যাণসুন্দর মুদালিয়ারের মত মহৎ নেতাদের স্মৃতিরক্ষায় সাহায্য করেন এবং ভা. রামস্বামী আয়েঙ্গার, নামককাল রামলিঙ্গম পিল্লাই এবং পরালি নেলুলাইয়াপ্পারের মত পণ্ডিতদের

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করেছেন। তুতি-কোরিনের ভি. ও সি. কলেজটির সংগঠনের কাজেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তিনি অনাড়ম্বর জীবন কাটিয়েছেন এবং গান্ধী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে সবরকম বাহুল্য ত্যাগ করেছেন। স্বভাবধর্মেই তিনি ছিলেন সমাজ-সংস্কারক এবং জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী। তিনি ছিলেন অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদী। তামিল ভূমির জাতীয় জাগরণে তাঁর রচনার যথেষ্ট অবদান ছিল এবং তামিল সাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক ও ক্রিয়াশীল সাংবাদিকরূপে তাঁর আসন নির্ধারিত হয়েছিল। তিনি সাধারণের কাছে সহজলভ্য ও স্থিরচিত্ত মানুষ ছিলেন। তাঁর দৃঢ় ও প্রগতিশীল মতামত তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছেন।

[The Tamil Encyclopaedia, Vol. III (Sri Mi. Pa. Somasundaram) ; The Kalki Files ; The Ananda Vikatan Files ; Kalki's own numerous publications.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) এন. সুব্রাহ্মনিয়ন

আর. রঘুনাথ রাও (১৮৩১-১৯১২)
R. Raghunath Rao (1831-1912)

দেওয়ান বাহাদুর রুবগুণ্ডে রঘুনাথ রাও 1831 সালের 7 ফেব্রুয়ারী কুম্ভোকোনামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক প্রাচীন ঐতিহ্যবান সুসম্পর্কিত মারাঠি ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত ব্যক্তি। তাঁদের পরিবার মাদ্রাজ রাজ্যের তাঞ্জোর জেলায় দীর্ঘকাল বাস করেছেন। তাঁর পূর্বসূরীগণ সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঞ্জোরে দক্ষিণ মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা রায় রায়া রুবগুণ্ডে ভেঙ্কট রাও ছিলেন তাঁর সময়ের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান এবং পরবর্তী 1834 সালে তিনি মহীশূর সরকারের রেভিনিউ কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাতা লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন বিরল গুণের অধিকারী। তিনি সংস্কৃত জানতেন। রঘুনাথ রাও ছিলেন উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের, যাঁদের আর্থিক সঙ্গতি ছিল প্রচুর। তিনি আশি বছর বেঁচে ছিলেন এবং চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন 1888 সালে। প্রবীণ রাও বছরে পাঁচ হাজার টাকা করে পেনসন পেতেন।

রঘু নাথ রাও-এর বিদ্যালয় জীবন আরম্ভ হয়েছিল বাঙ্গালোরে, তাঁদের বাড়ির কাছেই একটি মিশনারী বিদ্যালয়ে। 1845 সালে তিনি মাদ্রাজ হাইস্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল পরে আরও বড় হয়ে হয়েছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ। কুম্ভোকোনামে পারিবারিক বিশাল জমিদারী দেখাশোনা করার জন্য 1850 সালে তিনি বিদ্যালয়ের লেখাপড়া ছেড়ে দেন। তিনি বাড়ীতেই আইন শিক্ষা করেছিলেন এবং সরকারী চাকরীর জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলেছিলেন। 1856 সালে তিনি ওকালতি করার জন্য ডিপ্লোমা অর্জন করেন। জন রাসকিনের রচনাবলী তাঁকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল বিশেষ করে 'সেভেন ল্যাম্পস অফ আর্কিটেকচারে' তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তাঞ্জোরে কালেকটারের অফিসে অনুবাদকের কাজ নিয়ে রঘুনাথ রাও তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন। পরে তিনি কুম্ভোকোনামের সাব কোর্টের সেরেস্তাদার হয়েছিলেন। 1859 সালে তদানীন্তন মাদ্রাজ গভর্ণর চার্লস ট্রেভলিয়ান তাঁকে ডেপুটি কালেকটর নিযুক্ত করেন। এছাড়া তিনি সে সময়কার ভারতীয়দের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ পদ প্রধান সেরেস্তাদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন মাদ্রাজের রেভেনিউ বোর্ডের অফিসে। পরবর্তীকালে তাঁকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং মাদ্রাজ শহরের 'জাস্টিস অফ দি পিস' নিযুক্ত করা হয়েছিল। 1875 সালে তিনি ইন্দোরের রাজস্ব-মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। 1881 সালে মাদ্রাজ সরকারের চাকরীতে তিনি ফিরে আসেন। 1887 থেকে 1888 সাল পর্যন্ত তিনি ইন্দোরের দেওয়ানের পদে নিয়োজিত ছিলেন। 1888 সালেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইন্দোরের দেওয়ান থাকাকালে তাঁর সফরকারী প্রিন্স অব ওয়েলসকে (পরে যিনি হয়েছিলেন রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড) অভ্যর্থনা জানানোর অনন্য সম্মান লাভ করার সুযোগ হয়। প্রিন্স দেওয়ানকে একটি সোনার মেডেল উপহার দিয়ে-ছিলেন।

রঘুনাথ রাও-এর ছিল বহুমুখী প্রতিভা। তিনি ছিলেন একজন সৃজনশীল লেখক। প্রতিদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কাগজে মতামত ব্যক্ত করতেন। দেশবাসী এবং সরকারের অবগতির জন্য তিনি অকপটভাবে তাঁর নিজস্ব মতামত এবং অভি-

জ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনিই মাদ্রাজে প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। সেই পত্রিকাটিই ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ করে এবং আজকের 'হিন্দু' পত্রিকাটি সেই সাপ্তাহিকটিরই পরিণত রূপ। তিনি আরবুথনট ক্র্যাশের উপর লিখেছিলেন এবং সে সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রচারক লেখক ছিলেন। (দ্রঃ দি হিন্দু ঃ ইটস অরিজিন এ্যান্ড হিস্ট্রি—এ গোল্ডেন জুবিলি পাবলিকেশন, 1928, পৃঃ 27)।

রঘুনাথ রাও আদর্শ হিন্দু ধার্মিকের ন্যায় জীবনযাপন করতেন। হিন্দুদের সব পবিত্র গ্রন্থগুলি তিনি পড়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল হিন্দু ধর্ম সকল কিছুর পরিপূরক এবং এর মূল ধারণাগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক। তিনি শিশুদের জন্য প্রশ্নোত্তর বই লিখেছিলেন। এছাড়া ভগবৎ, ভগবদ্‌গীতা এবং ঋগ্‌ বেদের উপর ছোট গল্প সংকলন করেছিলেন। ত্রিচির ল্যান্ড কমিশনার থাকাকালে শ্রীরঙ্গম মন্দিরের জন্য তিনি একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। বেআইনীভাবে দখলীকৃত এই মন্দিরের অধিকাংশ জমিই তিনি মন্দিরের জন্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে আপোষপন্থী হয়েও তাঁর মতামত ছিল সুদৃঢ়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সমার্জের নীচু স্তর থেকে কাজ আরম্ভ করার পরিবর্তে সমাজের উঁচু স্তর থেকে কাজ আরম্ভ করার জন্য 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' সংগঠনকে তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। তিনি গ্রাম স্তর থেকে শুরু করে শেষে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। সাধারণভাবে তিনি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব পছন্দ করতেন না তবু তিনি মুসলমান এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে উদার হাতে সুবিধাদানের পক্ষে বলেছেন। (ইন্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান, নটেসান এন্ড কোম্পানী মাদ্রাজ, পৃঃ 34)।

রঘুনাথ রাও-এর কৃষির প্রতি অত্যধিক আগ্রহ ছিল। তরুণ বয়সেই তিনি "সাদার্ন প্রেসিডেন্সী"তে নির্যাতনের কথা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন এবং তাঞ্জোর জেলা অঞ্চলে ছোট ছোট ইনামদের শোষণ বন্ধ করেছিলেন। 1860 সালের জুন মাসে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়নের প্রস্থানকালে তাঞ্জোরের জমি ভোগদখলের শর্তাবলী নিয়ে তিনি তাঁকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। জমিতে 'মিরসদারের' অধিকার নিয়েও তিনি চিঠিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এছাড়া জমির বন্দোবস্তের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার প্রস্তাবও তিনি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে "আমার প্রস্তাব যদি কার্যকরী হয় তাহলে নিশ্চিত এবং চিরস্থায়ীভাবে জমির মালিকরা হবেন সমৃদ্ধ এবং স্বাধীন এবং সরকারের পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হবে।" লর্ড কার্জনের সময় মাদ্রাজে জমি নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ককালে রঘুনাথ রাও আবার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সরকারে নৈর্ব্যক্তিক ব্যবস্থার তিনি সমালোচনা করতেন। তাঁর মতে "জমির স্বত্বভোগের স্থায়ী শর্তাবলী এবং জনসেবকের বেতনভোগী কাজই শুধু মাত্র ভারতবর্ষকে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করতে পারবে"। (ইন্ডিয়ান স্টেটস্‌ম্যান, নটেসান এন্ড কোং, মাদ্রাজ পৃঃ 330-38)।

পরিণত বয়সে সমস্ত খ্যাতির শীর্ষে থেকে, সকলের সম্মান ও পরিচিতদের শোক অর্জন করে 1912 সালের 3 মে মধ্যরাত্রে রঘুনাথ রাও পরলোক গমন করেন। তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। তাঁর কর্মজীবন ছিল বৃহৎ ও কষ্টার্জিত। যে কোনো কাজে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ। "এজ অফ কনসেন্ট" বিলের উত্থাপনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁরই ছিল। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল শ্রেণী এ বিলের কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পন্থা সম্পর্কে সাবধান ছিলেন। "ইন্ডিয়ান সোস্যাল কনফারেন্সে"র প্রথম ব্যবস্থাপকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। 1885 সালের ডিসেম্বরে বম্বেতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন নি। (দি হিষ্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ভল্যুম ওয়ান, পৃঃ 17)।

কুম্ভোকোনামে একটি হাসপাতাল স্থাপিতহয়েছিল বিশেষভাবে রঘুনাথ রাও-এর প্রচেষ্টায়। বস্তুতঃ বর্তমানের কুম্ভোকোনাম কলেজের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বহু সংখ্যক অবৈতনিক "ছত্তরম" এবং "অগ্রহারম" স্থাপন করেছিলেন।

1893 সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে সোস্যাল কনফারেন্সে রানাডে রঘুনাথ রাও-এর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছিলেন—"রঘুনাথ রাও হলেন এই আন্দোলনের জনক এবং পথ প্রদর্শক"। (ইন্ডিয়ান স্টেটস্‌ম্যান পৃঃ 348)।

[Indian Statesman (G. A. Natesan & Company), Madras, 1927; Pattabhi Sitaramayya—The History of the Indian

National Congress, Vol. I, V. K. Narasimhan—Kasturi Ranga Iyengar ; A. Besant—How Indian Wrought Her Freedom ; Sankar L. Bhandarkar—Kasturi Srinivasan ; The Hindu : Its Origin & History, National Press, Madras, 1928 ; Encyclopaedia of The Madras and Adjacent States, 1921.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) বি. নরসিংহরাজন

আর. সুগাথান (১৯০২-১৯৭০)

R. Sugathan (1902-1970)

1902 সালে আর. সুগাথান আলেপ্পীর অন্তর্ভুক্ত আলিসেরির এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তাঁর পারিবারিক ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আর কিছু জানা যায় না। পূর্বকালে এই আলেপ্পী অন্তর্দেশীয় নৌ-বাণিজ্য ও নারিকেল তন্তু শিল্পের জন্য ত্রিবাংকুর রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

সুগাথানের পিতা রামন কৃষি শ্রমিক ছিলেন এবং তিনি যখন বিদ্যালয়ে পাঠরত কিশোর মাত্র তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। সমাজ সংস্কারমূলক কর্মের মাধ্যমেই সুগাথানের জনহিতকর কর্মজীবনের সূচনা হয়। তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করেন যে স্বশ্রেণীর জনগণকে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করার মাধ্যমেই সমাজের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধন সম্ভব। শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। তিনি "কেরালার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জনক" হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। যদিও শোনা যায় শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন কোন এক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তাঁর ভালবাসা ছিল এবং তিনিও সম্ভবতঃ কোনদিন সুগাথান তাঁকে বিবাহ করবেন এই আশাতেই আজীবন অবিবাহিতা ছিলেন।

প্রথম জীবনে কর্মব্যস্ত নৌ-বন্দরে তাঁকে সাধারণ শ্রমিক হিসাবে যাত্রীদের মাল বহন করার কাজও করতে হয়েছে। পিতা মাতা তাঁকে শ্রীধরণ বলে ডাকতেন। খর্বকায়, শ্যামবর্ণ, বলিষ্ঠ ছেলেটিকে পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত এবং সেই সঙ্গে পড়াশুনাও করতে হত। তিনি যখন 'Malayalam Higher Examination' এ উত্তীর্ণ হন এই বিদ্যা বলে তখন অতি সহজেই মজুর বৃত্তি ছাড়া অন্য কাজ পাওয়া যেত। কিন্তু ঐ সতের বছর বয়সেই তিনি উচ্চকোটির শিক্ষকদের সান্নিধ্য অপেক্ষা রুক্ষ, রূঢ় তন্তুশিল্পের মজদুরদের সংস্পর্শ অধিকতর কাম্য বলে মনে করতেন। তিনি ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত "Volkart Brothers"-এর নারকেল তন্তু কারখানায় শ্রমিকের কাজে যোগ দেন।

শ্রীধরণ নাম থেকে বোঝা যায় জন্মসূত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও বর্ণভেদে তিনি Ezhava-গোত্রভুক্ত ছিলেন। Ezhava-রা ছিলেন কেরালার অন্যতম সংখ্যাগুরু অনুন্নত শ্রেণী। এদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের খুবই অভাব ছিল। সেই সময় এই তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেই কেরালার মহান সমাজ সংস্কারক তথা সন্ন্যাসী ও দার্শনিক শ্রীনারায়ণ গুরুর আবির্ভাব ঘটে। তিনিই সমাজকে এক নতুন চেতনায় আলোড়িত করে তোলেন। তাঁর বাণী ছিল "সব মানুষেরই এক জাত, এক ধর্ম এবং একই ভগবান"—মানুষে মানুষে "জাতি বিভেদের কোন অবকাশই নেই"। এই কথাগুলি সুগাথানের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল আবার এর সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবও তিনি অনুভব করতেন।

বর্তমান আলেপ্পী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত কানিহারামচিরার "Asan Primary Grant School" এ তিনি শিক্ষকতা করতেন। 1921 থেকে 1935 সাল পর্যন্ত পনের বছর তিনি শিক্ষকতা করেন। তিনি যুক্তিবাদী আন্দোলন এবং বৌদ্ধ মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই জন্য শ্রীধরণ নাম পরিবর্তন করে তিনি সুগাথান নাম গ্রহণ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাগ্মী হিসাবে তাঁর খুব চাহিদা ছিল। উচ্চশ্রেণীর জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য তিনি গোঁফ রাখতে শুরু করেন। সেই সময় অধস্তন শ্রেণীর লোকেদের গোঁফ রাখা নিষিদ্ধ ছিল। রাজ্যের সর্বাধিক প্রভাবশালী মজদুর সংগঠন—"Alleppy Labour Association" দ্বারা প্রধানতঃ মজদুরদের জন্য স্থাপিত নৈশ বিদ্যালয়ে এই 'বিদ্রোহী'কে শিক্ষকতার জন্য আহ্বান করা হয়। এই সময়টিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এবং রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে সন্ধিক্ষণ বলা যায়।

1935 সালে "Alleppy Labour Association" তাঁকে সেক্রেটারী নির্বাচিত করে। ট্রেড

ইউনিয়নের কাজ ও রাজনীতিতে সর্বতোভাবে আত্ম-নিয়োগের জন্য তিনি শিক্ষকতার কাজে ইস্তফা দেন। 1938 সালে প্রথম তিনি নারিকেল তন্তু শিল্প কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রথম গ্রেফতার হন। পরের বছর আলেপ্পীর শ্রমিকরা ত্রিবাংকুর রাজ্য জুড়ে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট পালন করে। তিনিই ছিলেন এর সংগঠক এবং তিনিই প্রথমে গ্রেপ্তার হন। মুক্তিলাভের পর তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এরপর 1946 সালে আলেপ্পীর শ্রমিক শ্রেণী আরেকবার রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এইবার তারা সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়। আলেপ্পী শহরের উত্তর ও দক্ষিণের এই বিদ্রোহের দুটি প্রধান কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে ভায়ালার এবং পুন্নাপ্রার পঞ্চায়েত। সহস্রাধিক মানুষ এই বিদ্রোহে যোগদান করে। বিক্ষোভের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই সুগাথানকে গ্রেপ্তার করা হয়। 1950 সালে এই বিদ্রোহের অন্যান্য উচ্চবর্গীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হয়। ঐ বছরই প্রথম নির্বাচনে তিনি Travancore State Assembly-তে নির্বাচিত হন। এর পর কেরালা পৃথক রাজ্য এবং ত্রিবাংকুর-কোচিন মালাবারের সঙ্গে একীভূত হয়ে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত মাদ্রাজ রাজ্যের অংশ হিসাবে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্থ হয়। এর পরও তিনি প্রতিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার ফলে 1965 সালে তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন।

বহু বছর তিনি কেরালা রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার (K S T U C) সভাপতি ছিলেন। কিছুদিন A I T U C রাজ্য শাখারও তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি Working Committee-র সদস্যও ছিলেন। আমৃত্যু তিনি C P I State Council-এর সদস্য ছিলেন।

1966 সাল নাগাদ তিনি বহুমূত্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আলেপ্পী নৌ-ঘাটের উল্টো দিকে অবস্থিত তাঁর নিজের বাড়ীটি ছিল একটি ছোট হোটেলখানা। ছোট্ট কুটিরটি ও জমিটি যেখানে তাঁর জন্ম এবং যেখানে তিনি লালিত পালিত হয়েছিলেন 1942 সালে তিনি সেটি কম্যুনিস্ট পার্টিকে দান করে দেন। শারীরিক দুর্বলতা হেতু তাঁর পক্ষে যখন একা থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তখন তিনি ত্রিবান্দ্রামের C P I State Council অফিসে চলে আসেন। 1968 সালে সেখান থেকেই তিনি Moscow-তে চিকিৎসার জন্য যান। 1970 সালের 14 ফেব্রুয়ারী সকালে Medical College Hospital-এ প্রায় অকস্মাৎই তাঁর মৃত্যু হয়।

সুগাথান শুধু শক্তিশালী লেখক ও বক্তা ছিলেন না তিনি একজন দক্ষ সাংবাদিকও ছিলেন। "Proletarian Kavithakal" নামে তাঁর কবিতা সংকলন এবং "Janakeeya Sahitya Vicharam" নামে প্রবন্ধ সংকলন (মালয়ালম ভাষায়) প্রকাশিত হয়েছিল।

সুগাথানের জীবন ছিল অনাড়ম্বর। সর্বক্ষেত্রে সর্ব ঋতুতে তিনি শ্রমিকদের পোষাক পরিধান করতেন—একটি রঙ্গীন মোটা কাপড়ের "কায়িলি" এবং ঐ ধরনেরই একটি বোতামবিহীন আধহাতা শার্ট।

[D. R. Mankekar—The Red Riddle of Kerala, Bombay 1965 ; A. K. Gopalan —Autobiography, Kottayam, 1972 ; N. E. Balaram – A Short History of the Communist Party in India (in Malayalam) : Kazhinjakala Chithrangal, 1950, Personal Knowledge of the Contributor.]

টি. ভি. কৃষ্ণ

আর. সোনারাম সাংমা (১৮৫৬ ? -১৯১৩)

R. Sonaram Sangma (1856 ? - 1913)

আর সোনারাম সাংমা ছিলেন গারোদের মধ্যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। শ্রদ্ধা এবং গর্বের সঙ্গে তাঁর নাম আজও স্মরণ করা হয়।

1856 সালে অথবা কাছাকাছি কোনও সময়ে সোনারাম আসামের গোয়ালপাড়া জেলার মালপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্লাংগ. জি. মোমিন ছিলেন সে অঞ্চলের প্রভাবশালী ব্যক্তি। মা চামড়ে আর সাংমা দয়ামায়া এবং ধর্মে প্রগাঢ় আসক্তির জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। সর্বভূতের মধ্যে রয়েছে চৈতন্য-সত্তা—এটি তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও স্নেহ ভালবাসা দিয়ে বড় করে তুলেছিলেন। পরিবারের তিন পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে সোনারাম ছিলেন দ্বিতীয় পুত্র। 1905 সালে লেখা তার ডায়েরি থেকে আমরা তাঁদের পরিবারকে

এক নজরে দেখতে পাই এবং যে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পটভূমিতে তাঁরা বড় হয়ে উঠেছিলেন তা জানতে পারি। তিনি লিখেছিলেন "আমি, আর. সোনারাম সাংমা ছিলাম এক স্বাধীন উপজাতির সন্তান। কিন্তু আমরা এখন আর স্বাধীন নই। আমি ছিলাম গারো যোদ্ধাদের বংশজাত। আমার মা এবং আমার বোনেরা সবাই এখন গরীব। একসময়ে আমার মা'র ছিল বহুসংখ্যক ভৃত্য, বিশাল শস্যক্ষেত্র এবং বিপুল সংখ্যক প্রজা। যদিও দারিদ্র্য আমাদের গ্রাস করেছে তবু আমাদের গারো ভাইরা এখনও আমাদের 'রাজা' অথবা 'নকমা' নামেই ডাকে।" ('নকমা' কথাটির গারো ভাষায় অর্থ হল ধনী অথবা প্রধান)। সোনারাম বিবাহ করেছিলেন তোকজী এম মোমিনকে। এঁর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল শান্তি-পুর গ্রামে যখন সোনারাম শিক্ষকতা করতেন।

সেই সময় বেশির ভাগ অঞ্চলে স্কুল না থাকায় সোনারাম একটু দেরী করেই স্কুলে গিয়েছিলেন। তাঁদের গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেখানে ভর্তি হয়েছিলেন। চারবছর পর সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে গারো পাহাড়ের অন্যতম প্রধান শহর তুরার আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন নরমাল স্কুলে তিনি যোগদান করেন। দু বছর পর কৃতিত্ব সহকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এইভাবে সোনারাম তাঁর জেলায় সব চাইতে উঁচুমানের ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন।

শান্তিপুরের গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করার আগে লেখাপড়া সমাপ্ত করে সোনারাম কিছুদিনের জন্য গৌহাটিতে পুলিশের চাকরীতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে পুলিশী কাজকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। সেইজন্য তিনি এখান থেকে ইস্তফা দিয়ে পূর্ত বিভাগে অধীক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় নবছর তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নতুন কর্মভার গ্রহণ করে তাঁকে গারো পাহাড় এবং গোয়ালপাড়া জেলার প্রতিটি আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। এর ফলে নিজের লোকজনদের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ স্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল।

এই চাকরীতে থাকাকালেই সোনারাম বুঝতে পারলেন যে ব্রিটিশ সরকার গারোদের প্রতি কত অবিচার এবং অমানবিক ব্যবহার করে চলেছে। 'বেগার' অথবা 'বাধ্যতামূলক শ্রম' ছিল এই অবিচারের অন্যতম। এই ব্যবস্থায় গারোদের কোনরকম বেতন অথবা পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করতে হত। এছাড়া আর একটি ছিল সংরক্ষিত বন প্রকল্প। এই প্রকল্প অনুযায়ী স্থানীয় জনসাধারণকে তাদের চাষযোগ্য জমি থেকে উৎখাত করে বিশাল জমি দখল করা হত। এ ধরনের অবিচার দূর করার জন্য সোনারাম বারবার সরকারের কাছে আবেদন জানান। যখন তাঁর আবেদন নিষ্ফল হলো তখন তিনি তাঁর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিজেই ছোটোখাটো ব্যবসা শুরু করলেন। এই ব্যবসার সূত্রে খ্যাতনামা আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁকে কলকাতায় আসতে হত। একবার কলকাতা যাওয়ার পথে তিনি লখিপুরের পথের ধারে একটি দলিল পেয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি আবিষ্কার করলেন যে বিজনী এস্টেটের জমিদার বহু-বছর ধরে যে জমি ভোগদখল করে চলেছেন তা প্রকৃত অর্থে গারোদের সম্পত্তি। এইভাবে আন্দোলন করার জন্য আরও একটি কারণও তিনি বার করলেন।

দীর্ঘদিনের এই সমস্ত অবিচার প্রত্যক্ষ করে তিনি এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবেন। কিন্তু এই সংগ্রাম পরিচালিত হবে অহিংসার পথে। সুতরাং তিনি সেই তিনটি ঘটনা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেন। সমস্ত উপজাতি তাঁকে সমর্থন জানাল। এদের মনে জাতীয় অনুভূতি তিনি ইতিমধ্যেই জাগ্রত করে তুলেছিলেন। এদের অধিকার এবং আইনগত অবস্থা সম্পর্কে জনগণের মনে যে সন্দেহের ছায়া তাদের প্রকৃত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা দূর করার জন্য তিনি স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দফায় দফায় স্মারকলিপি পাঠাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিকারপ্রার্থী হয়ে তিনি বিচারালয়ের দ্বারস্থ হলেন। সরকারের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন মামলা পরিচালন কালে তাঁকে অন্তত বারোবার কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সংগ্রাম এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে পেরেছিলেন। এর ফলে রাস্তা তৈরীর কাজে বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হল এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের অধীনে অন্যান্য কাজের জন্যও সম্পূর্ণ বেতন দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হলো। এছাড়া তিনি সংরক্ষিত অরণ্যের বিস্তৃতি রোধ করার জন্য সরকারী অনুমতিও লাভ করেছিলেন। বিজনীর জমিদারের বেআইনী দখলের ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। নকমা অথবা প্রকৃত জমির মালিকরা যে পরগণাগুলি নিজেদের

বলে দাবী করেছিলেন সেসব জমির করের পঁচিশ শতাংশ তাদের প্রদান করা হবে বলে স্থির করা হলো। কিন্তু ঐসব জমিতে তাদের পূর্ণ স্বত্বাধিকারের দাবীর ক্ষেত্রে ভারত সরকার আসামের তদানীন্তন মুখ্য কমিশনার স্যার বামফিল্ড ফুলারের অনুমোদন ক্রমে চূড়ান্ত রায় দিয়ে জানালেন "ব্রিটিশ শাসনাধীনে গারোরা জমি হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার সংশোধন করা অসম্ভব।" এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে সোনারাম 1913 সালে মারা গেলেন।

সাম্রাজ্যবাদী সরকার এবং বিজনী জমিদারের বিরুদ্ধে আইন মাফিক লড়াই করেই সোনারামের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। এর ফলে তাঁর অন্যান্য বিষয়ে সংস্কার-সাধনের জন্য না ছিল যথেষ্ট সময় না ছিল আগ্রহ। আইনের দ্বারা এবং সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষোভ প্রশমিত করার কাজে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

তাঁর গায়ের রং ছিল কালো এবং চেহারা ছিল ছোটখাট। কিন্তু তিনি ছিলেন শক্তিশালী এবং সুগঠিত দেহের অধিকারী। স্কুলে থাকাকালে তিনি ধুতি এবং শার্ট পরতেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁর পোশাক ছিল প্যান্ট এবং কোট। সাধারণ জীবন যাপনে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। পায়ে হেঁটে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। যে খাবার তাঁকে দেওয়া হত তাই তিনি খেয়ে নিতেন। এইভাবে তিনি সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ছিল ধারালো বুদ্ধি এবং সহজেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। উচ্চ কণ্ঠস্বর এবং তীক্ষ্ম দৃষ্টির জন্য তাঁকে ব্যক্তিত্বপূর্ণ দেখাত। সর্বোপরি তাঁর ছিল দুর্লভ একটি গুণ, জনগণের অর্থব্যয়ের বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ।

সঠিক অর্থে সোনারামকে বলা যায় প্রথম গারো জাতীয় নেতা। গারো পাহাড়ের রাস্তা তৈরীর তিনিই ছিলেন প্রবর্তক। গারোদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে গারোদের মধ্যে প্রথম স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচলন হয়। এই কারণেই সরকারের সঙ্গে আইনের যুদ্ধের জন্য তাঁর আহবান গারো উপ-জাতির সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া জাগিয়েছিল। এছাড়া তাঁর মধ্যে ছিল একজন প্রকৃত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতার গুণাবলী। কারণ তিনি সবরকম বিদ্রোহের পথকে পরিহার করে চলতেন এবং গারো জাতীয়তাবাদের জন্য অহিংস আন্দোলনের প্রতি ছিল তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা। তিনি একজন প্রকৃত স্বজাতিপ্রেমী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর জীবনী অনুধাবন করলে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে তাঁর বৃহত্তর গারো পাহাড়ের দাবী আজও মেঘালয় সরকার এবং সেই সঙ্গে গারো পাহাড়ের বাইরে বসবাসকারী গারোরাও সমর্থন করে চলেছে।

[A Chik Ku'rang (The voice of the Garos), a monthly Garo Journal, Vol. I, November—December, 1965, Vol. II January—February 1966, Vol. III, July—August, 1966, Vol. V, November—December 1966; Court Criminal records (unpublished) of Sonaram R. Sangma (Petitions), Nos. 110, 168 and 174, 1905; Unpublished Records of the Department of Revenue and Agriculture, Land Revenue, Nos. 358—507—2, 1908; Interviews with Rev. Tillokchon Momin with Lipson Sangma, with Kaliram Momin, a peon of Sonaram Sangma, with Ambe. R. Sangma, a grand-niece of Sonaram and with Kaliram Sangma, an associate of Sonaram in the suits.]

মিল্টন সাংমা

আর শ্রীনিবাসন দেওয়ান বাহাদুর (১৮৫৯-১৯৪৫)

R. Sri Nivasan Dewan Bahadur
(1859–1945)

তপসিলী সম্প্রদায়ের নেতা দেওয়ান বাহাদুর আর শ্রীনিবাসন 1859 সালে জন্মগ্রহণ করেন, প্রায় পঁচাশি বছরের সুদীর্ঘ জীবন যাপনের পর 1945 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন। 1923 সাল থেকে 1935 সাল পর্যন্ত তিনি সামাজিক এবং রাজ-নৈতিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন। মাদ্রাজ রাজ্যে তিনি আদি দ্রাবিড়দের নেতারূপে পরিচিত ছিলেন। আদি দ্রাবিড় যুবকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কলেজ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি কোয়েম্বাটুর সরকারী কলেজে শিক্ষালাভ

করেছিলেন। এছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় আদি দ্রাবিড়দের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম চাকুরী উপলক্ষে বিদেশ যাত্রা করেন। 1904 সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং 1920 সাল পর্যন্ত সেই চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমরা জানিনা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের অধীনে কি ধরনের কাজে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদেশে তাঁর চাকরীর ব্যাপারে কোন তথ্যই সংগ্রহ করা যায়নি। পূর্ব আফ্রিকাতেও তিনি দুবছর বসবাস করেছিলেন।

1919 সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন (যা 1921 সালে কার্যকরী হয়েছিল) অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাগত শ্রীনিবাসন মাদ্রাজ বিধান পরিষদে তপসিলী জাতির নেতা মনোনীত হয়েছিলেন। 1923 সাল থেকে 1935 সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। অনুন্নত শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলীর প্রয়োজন—এই মতবাদে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করেছিলেন কিনা সেকথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক সংস্থার মতামত প্রকাশের জন্য 1930-31 সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন। তপসিলী জাতির প্রতিনিধিরূপে শ্রীনিবাসনকে ব্রিটিশ সরকার মনোনীত করেছিলেন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করবার জন্য। স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের মতবাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী শ্রীনিবাসন আদি দ্রাবিড়দের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থাকে এই বৈঠকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন ডঃ আম্বেদকারের একনিষ্ঠ অনুরাগী।

শ্রীনিবাসন ছিলেন আদি দ্রাবিড়দের অধিকার রক্ষার একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। 1891 সালের প্রথম দিকে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের দাবিগুলি যাতে গৃহীত হয় সেজন্য তিনি গঠন করেছিলেন আদি দ্রাবিড় মহা জনসভা। শোষিত শ্রেণীর সুবিধার্থে স্বতন্ত্র সংবাদপত্র প্রকাশ করার কৃতিত্বের অধিকারীও ছিলেন শ্রীনিবাসন, তিনি 'পরাইয়ান' নামে পরিচিত পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই পত্রিকায় অস্পৃশ্যদের সমস্যাই বিশেষভাবে আলোচিত হত। পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনাবোধের সঞ্চার করতে। অস্পৃশ্যতা সামাজিক ক্ষেত্রে এক অভিশাপ এই চিন্তা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলতো। তাঁর কাছে অস্পৃশ্যতা ছিল এমন এক সামাজিক ক্ষত যা হিন্দু সমাজের জীবনীশক্তিকে ক্রমশ পঙ্গু করে তুলেছিল। তিনি বলতেন যে আদি দ্রাবিড়গণ হলেন হিন্দু সংখ্যালঘুদের এমন একটি শ্রেণী যাঁরা বছরের পর বছর ধরে শোষিত হয়েছেন। বর্ণ হিন্দুরা তাঁদের যথাবিধি অর্থনৈতিক সামাজিক, এবং ধর্মীয় সমতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে আদি দ্রাবিড়রা যাঁরা সামাজিক সোপানের নীচু স্তরে পড়ে রয়েছেন শুধু মাত্র সরকারী সহযোগিতায় তাঁরা উঠে দাঁড়াতে পারেন। তার জার্নাল 'পরাইয়ান'-এর মাধ্যমে তিনি যে শুধু মাত্র তাঁর স্বজাতিদের মধ্যেই শিক্ষার প্রসার করেছিলেন তা নয়—তিনি বর্ণ হিন্দুদের কাছেও এই মর্মে আবেদন জানিয়েছিলেন যে তাদের কর্তব্য হল অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান ভাইদের শিক্ষালাভ এবং সরকারী চাকুরী গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত ও সাহায্য দান করা। 1895 সালে তদানীন্তন ভাইসরয়ের কাছে প্রেরিত একটি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে তিনি আদি দ্রাবিড়দের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার চিত্রটি তুলে ধরেছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার সাথে সাথে 'পরাইয়ান' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল।

মাদ্রাজ বিধান পরিষদের সদস্য থাকাকালে 1923 সাল থেকে 1935 সালের মধ্যে তিনি অনুন্নত শ্রেণীর জন্য নানাবিধ অনুদান এবং শিক্ষা বিষয়ক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বজাতির জন্য তাঁর কাজকর্মের পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'দেওয়ান বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেছিলেন। শ্রীনিবাসন নিঃসন্দেহে একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারকরূপে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে গণ্য হয়েছিলেন। তিনি আদি দ্রাবিড়দের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করার জন্য উৎসাহ দান করতেন। তিনি বলতেন বর্ণ হিন্দু এবং সরকারের কাছ থেকে সুবিচার আদায় করার জন্য তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি ছিলেন আদি দ্রাবিড়দের প্রতি বর্ণ হিন্দুদের আচরিত নিষ্ঠুর এবং সহানুভূতিহীন ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী। বর্তমান ভারতীয় সংবিধান অনুসারে অস্পৃশ্যতার লোপ সাধন করা হয়েছে—এ কৃতিত্বের জন্য অনেকখানি দায়ী শ্রীনিবাসনের নিরলস প্রচেষ্টা। পুনা চুক্তিকে তিনি এই কারণে সমর্থন জানিয়েছিলেন যে এর ফলে আদি দ্রাবিড়দের মূল হিন্দু সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা হয়নি।

তিনি এই মতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে যথাযথ শিক্ষা এবং চাকুরীর সুযোগ লাভ করলে আদি দ্রাবিড় সম্প্রদায় নিজেদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে সমর্থ হবে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য এবং হিন্দু সমাজের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য শ্রীনিবাসনের নিরলস প্রচেষ্টা অবশ্যই স্মরণীয়।

[The Hindu Files (Madras); The Paraiyan (Tamil) Files (Madras); Madras Legislative Council Debates, 1923—25; Proceedings of the Round Table Conference, I and II sessions.]

(ইম্যানুয়েল ডিভিয়েন) এ. কৃষ্ণস্বামী

আলতাফ হুসেন (খাজা) হালি (১৮৩৭-১৯১৪)
Altaf Hussain (Khwaja) Hali
(1837-1914)

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি খাজা আলতাফ হুসেন হালি 1837 সালে পাঞ্জাবের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাণিপথ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতৃপুরুষরা ছিলেন অভিজাত বংশীয়। এঁরা গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করেন। তাঁর পিতার নাম আইজাদ বকস্। 1854 সাল পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। 1855 সালে তিনি পাণিপথে ফিরে আসেন এবং স্বগৃহে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন। 1856 সালে হিসারের কালেকটারের অফিসে তিনি একটি নিম্ন পদে যোগ দেন কিন্তু 1857 খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি চাকুরী ছেড়ে দেন। 1861 সালে তিনি প্রখ্যাত উর্দু কবি নবাব মুস্তফা খান সৈফতা-র সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি তাঁর সময়ের আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ—যেমন আরবী, ফারসী, ন্যায় শাস্ত্র, দর্শন, ছন্দশাস্ত্র, ব্যাকরণ ইত্যাদি অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি ইংরাজি শেখেননি কারণ সে সময়ে তাঁর সমগোত্রীয় প্রাচ্যবিদরা ইংরাজিকে সুনজরে দেখেন নি।

হালির আসল জীবন শুরু হয় 1854-55 সালে যে সময়ে তিনি দিল্লীতে প্রায়শঃই গালিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এই সাক্ষাতের ফলেই তাঁর মধ্যে কবি প্রতিভার উন্মেষ হয়। পরবর্তীকালে (1861-69) সৈফতা-র অনুপ্রেরণায় তাঁর কাব্য প্রতিভা সম্যকরূপে বিকাশ লাভ করে। হালি তাঁর রচনায় সৈফতা-র প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এর পর তিনি অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসেন। এই সময়েই স্যার সৈয়দ আহমদ খান ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান সমাজকে পুনর্জীবিত করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। দিল্লীতে তিনি স্যার সৈয়দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। স্যার সৈয়দ তাঁকে মুসলমান সমাজের অধঃপতনের কারণ নিয়ে লিখতে বলেন। 'ইসলামের জোয়ার ভাঁটা ('মুসদ্দাস') শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করে তিনি প্রশংসনীয় দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন। এই কবিতাটি (1879) যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। 'হায়াৎ-ই-জয়েদ' (Hayat-i-Jawed) শীর্ষক গ্রন্থখানি তিনি স্যার সৈয়দের জীবনী অবলম্বন করে প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে তিনি ইংরাজি গ্রন্থগুলির উর্দুতে অনুবাদ করার একটি কাজ পেয়ে যান লাহোরের গভর্ণমেণ্ট বুক ডিপো-তে। এই কাজটি পেয়ে তিনি অত্যন্ত উপকৃত হন। এই কাজের মাধ্যমেই তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রসাস্বাদ লাভ করেন ও তাঁর সাহিত্যিক জীবনে এক অভাবিত পরিবর্তন সূচিত হয়। উৎকর্ষ, সারল্য এবং বিশুদ্ধতার জন্য অচিরেই তিনি ইংরাজি কাব্যের একজন রসজ্ঞ গুণগ্রাহী হয়ে উঠেন। ইংরাজি কবিতার এই গুণগুলি যাতে উর্দু কবিতাতেও আরোপ করা যায় সে বিষয়ে তিনি সচেষ্ট হন। কর্ণেল হলরয়েড-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি একটি সাহিত্য সমিতি গড়ে তোলেন।

লাহোরের Chiefs' College এবং দিল্লীর Anglo-Arabic School-এ কিছুকালের জন্য তিনি শিক্ষকতা করেন। 1887 সাল থেকে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর জন্য মাসিক 75/- টাকার একটি বৃত্তি বরাদ্দ করেন। তিনি ছিলেন শিষ্ট নম্র এবং সহৃদয় প্রকৃতির এক আদর্শ ভদ্রলোক, বিলাসবাহুল্যের প্রতি উদাসীন থেকে তিনি বিদ্বানসুলভ জীবন যাপন করেছেন। তাঁর সহমর্মিতা ছিল গভীর ও ব্যাপক এবং সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের কোন নজির তিনি সৃষ্টি করেন নি। তিনি শুধু কবি-ই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সংস্কারকও। তাঁর সহানুভূতি শুধু তাঁর আপন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, সকল দেশবাসীর প্রতিই তাঁর সহমর্মিতা বোধ

প্রসারিত ছিল। একজন ধর্মীয় বিদ্যার শিক্ষক, ধর্ম প্রচারক এবং একজন সমাজ সংস্কারক—বিবিধ ভূমিকায় তাঁকে দেখা গিয়েছে।

অনুপ্রেরণা সূচক কাব্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বধর্মীদের উদার এবং স্বার্থহীনভাবে কাজ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

হালি লিখেছেন প্রচুর। তাঁর প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ইয়াৎ-ই-জয়েদ' (স্যার সৈয়দ আহমেদ খান-এর জীবনী) 'ইয়াদগার-ই-গালিব' (গালিব সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ), 'মুসদ্দাস' (ইসলামের জোয়ার ভাঁটা) 'দিওয়ান-ই-হালি (কাব্য সংগ্রহ), 'ওয়াতান' (মাতৃভূমি) 'মুনজাত-ই-বেওয়া' (বিধবার প্রার্থনা) এবং 'মজলিসাল-নিসা' (স্ত্রী-শিক্ষা)।

উর্দু সাহিত্য জগতে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর কবিতাগুলির মাধ্যমেই তিনি প্রচার করেছেন যে মুসলমানেরা যেন নিজেরাই সংস্কারে উদ্যমী হ'ন। তিনিই প্রথম উর্দু কবি যিনি প্রথম 'ওয়াতান' বা মাতৃভূমির উপর কবিতা রচনা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শকে কবিতার অন্তর্ভুক্ত করেন।

তিনি মূলতঃ একজন সংস্কারক ছিলেন। 'শিক-ওয়াই হিন্দ' শীর্ষক কবিতায় তিনি ভারতের অতীত গৌরব এবং ঐতিহ্য সন্ধান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পুনর্জাগরণের যে বার্তা তিনি ঘোষণা করেছেন তা শুধু মুসলমানদের জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারত বাসীর উদ্দেশেই প্রযোজ্য।

[Ram Babu Saksena—A History of Urdu Literature ; J. L. Kaul—Interpretations of Ghalib ; Hali's own works.]

(মনতোষ সিং) এস. এম. জিয়াউদ্দিন আলাভি

আলি ইমাম (স্যার) ১৮৬৯-১৯৩২
Ali Imam (Sir) (1869-1932)

আলি ইমাম 1869 সালের 11 ফেব্রুয়ারী পাটনা জেলার নেওরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমদাদ ইমামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ধর্মের দিক থেকে তিনি ছিলেন শিয়াপন্থী মুসলমান। তিনি একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। 1887 সালে আরা জেলা স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হন এবং তারপর ইংলণ্ডে যান। 1890 সালে তিনি ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে পাটনায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন।

1891-তে তিনি তাঁর সম্পর্কিত ভগিনী নয়িমা খাতুনকে বিবাহ করেন; তাঁদের পাঁচটি কন্যাসন্তান ছিল। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে 1916 সালে চন্দননগরের মেরি রোজকে বিবাহ করেন। পরে 1918 তে আনিস ইমামের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়—যিনি এখনও জীবিত আছেন।

1910 সালে কলকাতা হাইকোর্টে ভারত সরকারের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হিসাবে নিযুক্ত হন এবং সেই বছরের শেষের দিকে গভর্নর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের আইন-সদস্য নিযুক্ত হন। এই কাউন্সিলের তিনি সহ-সভাপতিও ছিলেন। এই পদের সুযোগে তিনি পর্দার অন্তরাল থেকে একজিকিউটিভ কাউন্সিলে বিহারকে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 1914 সালে তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাটনা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন এবং 1918-19 সালে বিহার এবং উড়িষ্যার একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন। এর পরই 1919 সালের আগস্ট মাসে তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে বৃত হন। বেরার যাতে নিজামের হাতছাড়া না হয় তার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করে-ছিলেন কিন্তু সফল হননি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর স্থায়িত্বকাল প্রসঙ্গে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বলেছেন ঃ 'যতটা সার্থক হওয়া উচিত ছিল ঠিক ততটা হয়নি'। এরজন্য বিশেষভাবে দায়ী রাজপ্রাসাদের চক্রান্ত। 1920 সালে লীগ অব নেশনসের প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের জন্য মনোনীত হন আলি ইমাম। তিনি কোভেনান্টের সংশোধনী, আই এল ওর গভর্নিং বডিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব এবং উক্ত সংস্থার অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন। 1923 সালে পাটনায় তিনি পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। 1932-এর 27 অক্টোবর রাঁচিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

1910 সালে তিনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। এর পূর্বে 1908-এ আলিগড় কলেজের ট্রাস্টি হিসাবে নির্বাচিত হন এবং 1908-12 সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ ভাষাতাত্ত্বিক। আরবী, ফার্সী, উর্দু, ইংরেজি এবং ফরাসী ভাষায় তাঁর দখল ছিল।

1908 সালে বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। এইভাবে

আলি ইমামের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। প্রথমদিকে তিনি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন—'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে মুসলমানদের জন্য একটি কার্যকরী এবং আলাদা নির্বাচন ক্ষেত্র ছাড়া ভারতবর্ষে সত্যিকারের জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বের সমস্যার সমাধান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের মৌলিক রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতির উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন। 1908 সালে অমৃতসরে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত ধর্মীয়, সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণী যুগ যুগ ধরে মহান ভারতবর্ষে এক পবিত্র সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। মাতৃভূমির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কারুর চেয়ে কম নয়।' এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তিনি বুঝতে পারেন যে আলাদা নির্বাচন ক্ষেত্র শুধুমাত্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেই অস্বীকার করা নয়, মুসলমানদের নিজেদের পক্ষেই যথেষ্ট ক্ষতিকর। 1931 সালে লক্ষ্মৌতে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে বিশেষ ধরনের সুযোগ সুবিধা কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না—সেটা একমাত্র হতে পারে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানেরা কতটা অংশ নিতে পারছে সেই অনুপাত অনুযায়ী। একই সঙ্গে আগ্রাসী হিন্দু জাতীয়তাবাদকে তিনি তীব্র নিন্দা করেন। জাতীয়তাবাদের অন্তরালে আসলে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচারিত করা হচ্ছে—সে সম্পর্কে তাঁর সন্দেহকে বাড়িয়ে তুলেছিল। তিনি ভারতবর্ষের সংহতিতে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু একথাও তিনি মানতেন যে আবেগকে যুক্তি এবং সহানুভূতির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সার্থকতা।

পাশ্চাত্য উদারনৈতিক আদর্শে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত আলি ইমাম ব্রিটিশ শাসনের কিছু কল্যাণমূলক ফলাফল—যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতি, শিক্ষিত ভারতবাসীর এক সাধারণ ভাষা হিসাবে ইংরাজির প্রসার এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার ইত্যাদির উপর জোর দিতেন। তিনি এমনকি ভারতীয়দের স্বরাজের দাবীকে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক তা মেনে নেওয়াকে প্রচণ্ড ভুল হিসাবে মনে করতেন, যতক্ষণ না সংকীর্ণতাবাদী আগ্রাসী নীতি এবং ধর্ম ও জাতিগত বিভিন্নতা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মতামতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে ; এবং 1931 নাগাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে তিনি ঘোষণা করেন যে ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমশঃ এমন শক্তি সঞ্চয় করবে যাকে রুখতে পারে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই। (সভাপতির বক্তৃতা, লক্ষ্মৌ 1931)।

আলি ইমাম দীর্ঘাকৃতি ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। সুকণ্ঠের অধিকারী এবং একজন সুবক্তা ছিলেন। তিনি প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতেন এবং বেশভূষা করতেন পাশ্চাত্য আদব কায়দায়। তাঁর আয় ছিল প্রচুর—তেমনি তাঁর খরচও। তিনি বহুজনকে অর্থদান করেছেন এবং তার অধিকাংশই গোপনে।

[Personal interview with Lady Imam ; Choudhary, V.C.P.—The Creation of Modern Bihar, Patna, 1964 ; Datta, K. K., —History of Freedom Movement in Bihar, I & II, Patna, 1957 ; Sinha, S.,—Some Eminent Bihar Contemporaries, Patna, 1944 ; Indian Annual Register, (Ed.) N. N. Mitra, Calcutta, I-II, 1927, I, 1931 ; Indian Year Book, Bombay, 1932 ; The Hindustan Review, ed. S. Sinha, Patna, Sept.-Oct. 1932 ; The Beharee, Daily Newspaper, Patna, January-November 1909 ; The Searchlight, Daily Newspaper, Patna, 1 December 1918, 10 April 1931.]

কেয়ামউদ্দিন আহমদ

আলি, মুহম্মাদ খান, মুহম্মাদ, মহারাজা অব মেহমুদাবাদ (স্যার) (১৮৭৯-১৯৩১)

Ali Muhammad Khan, Muhammad, Maharaja of Mahmudabad (Sir) (1879-1931)

স্যার মুহম্মাদ আমির হাসান খানের পুত্র মহম্মাদ আলি মহম্মদ খান (মেহমুদাবাদের মহারাজা) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) সীতাপুর জেলার আমরোতায় 1879 সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন বাগদাদ থেকে। তাঁদের পরিবার ছিল প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক এক ধনী অভিজাত পরিবার এবং তিনি আমৃত্যু রাজকীয়ভাবে দিনযাপন করেছিলেন। এছাড়া তাঁদের পরিবার সরকারী সহযোগিতায় উচ্চ মর্যাদালাভ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁকে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং লক্ষ্ণৌর মুন্সেফরূপে নিয়োগ করা হয়েছিল। সরকারী আনুকূল্য তিনি অনেকদিন উপভোগ করেন। 1904 সালে উত্তর প্রদেশ আইন সভায় তাঁকে সদস্য করা হয়। 1909 সালে তিনি ভারতীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেওয়া হয় এবং কে. সি. এস. আই, ও কে. সি. আই. ই এই খেতাব দুটি প্রদান করা হয়। 1921 সালে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের কার্যনির্বাহী সভার স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করেছিলেনঃ কয়েকবার ইংলণ্ডে ও ইউরোপ সফর করেন। সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারে তিনি সহায়তা করতেন। তিনি 'দি ইণ্ডিয়ান ডেইলি টেলিগ্রাফ' নামে নিজে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। মৌলানা মহম্মদ আলির 'কমরেড' পত্রিকাটিকেও প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। তাঁর অঞ্চলে তিনি অনেক স্কুল স্থাপন করেন, লক্ষ্ণৌর কলভিন তালুকদারের স্কুলে, লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজে, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভৃত অর্থ দান করেন। আলিগড়ের এম. এ. ও কলেজ এবং পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য করা হয়েছিল। ইংলণ্ডের স্যাণ্ডহার্স্ট কলেজের অনুসরণে ভারতবর্ষে মিলিটারি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীতা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য 1924 সালে যে 'স্কীন কমিটি' (Skeen-Committee) গঠন করা হয়েছিল ভারত সরকার তাঁকে সেই কমিটির সদস্য নিয়োগ করেন। সংখ্যা-গরিষ্ঠের সঙ্গে তার মতের অমিল হয় এবং তিনি একটি ভিন্ন মতসূচক রিপোর্ট দাখিল করেন।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী অভি-জাত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি সাংবিধানিক পথে আন্দোলন পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়কেই তিনি সমর্থন করতেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং তিনি সব দলেরই প্রসার চাইতেন। খিলাফৎ আন্দো-লনকে তিনি সাহায্য করেছিলেন, মুসলমান সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দান করেছিলেন এবং জিন্নাকে মুসলীম লীগে নিয়ে এসেছিলেন। দু'বার তিনি মুসলিম লীগের সম্মেলনে (1917 এবং 1928 সালে) অংশগ্রহণ করলেও তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। সাধারণ ভাবে বলা যায় তিনি সাম্প্রদায়িক নির্বাচক গোষ্ঠীর বিরোধিতা করেছিলেন। মুসলিম লীগের সভাপতির ভাষণে তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে দোষারোপ করেছিলেন। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রকৃত এবং মূল স্বার্থই হল জাতীয় স্বার্থ। যাই হোক তিনি এই যুক্তি দেখাতেন যে স্বরাজ লাভের জন্য সমগ্র জাতি এবং সম্প্রদায়ের উচিত তাদের সব শক্তি নিয়োজিত করা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সন্দেহ বা আশংকা থাকা অসম্ভব নয় এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হল তাদের মন থেকে সন্দেহ এবং ভীতি দূর করা একথা তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে অযৌক্তিক এবং অতিরিক্ত কোনও কিছু না করার জন্য। তিনি ইংলণ্ডের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক বিচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন। তিনি এই সম্পর্ককে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করতেন। তিনি স্বদেশের (Dominion Status) লাভের পক্ষে ছিলেন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিকাশ ত্বরান্বিত করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

[Indian Year Book—Who's Who in India, 1926 ; Indian Biographical Dictionary—by C. H. Rao ; Pathway to Pakistan—by Chaudhury Khaliquzzaman ; The Communal Triangle in India—by Mehta & Patwardhan ; The Problem of Minorities—by K. B. Krishna ; The Makers of Pakistan—Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of Pakistan Publication ; The Indian Annual Register, 1924 to 1931 , U. P. Legislative Council Proceedings, 1909, 1921-23 ; Aligrah Muslim University Gazettes, 1916onwards; Skeen Committee Report (Govt. of IndiaPubn.),

1924 ; I. N. Congress, 1916, Lucknow Session Proceedings.]

(এল. দেওয়ান) এম. এস. জৈন

আল্লাডি, কৃষ্ণস্বামী আইয়ার (১৮৮৩-১৯৫৩)
Alladi Krishnaswami Aiyar (1883-1953)

আল্লাডি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নেলোর জেলার নয়ডুপেটের নিকটবর্তী পুদুর গ্রামে 1883 সালে 14 মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন 'পুদুর দ্রাবিড়' নামে তামিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত। এই ছোট সম্প্রদায়ে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির বিকাশ ঘটেছিল। তাঁর পূর্বপুরুষগণ বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতা একাম্বরা শাস্ত্রী ছিলেন মন্দিরের পুরোহিত। দরিদ্র হলেও তিনি তাঁর পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কারণ তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল তাঁর পুত্র ভবিষ্যতে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হবে।

1891 সালে আইয়ার পরিবার গ্রাম থেকে মাদ্রাজে চলে আসেন। আল্লাডি পেন্দুনাইকেকনপেট মিডল্ স্কুলে ভর্তি হন এবং 1899 সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1901 সালে তিনি দি চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড মিশন কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দুবছর পরে মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। 1905 সালে তিনি বি. এল. ডিগ্রী অর্জন করেন। বি. এ. ক্লাসে পড়বার সময় আল্লাডি কৃষ্ণস্বামী অধ্যাপক কেলেটের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন ; অধ্যাপক কেলেট তাঁর প্রতিভা ও চরিত্র সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। মাদ্রাজ খৃষ্টান কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে আল্লাডি নিযুক্ত হন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য তিনি ভালভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 1933 সালে তিনি কোম্লাপ্রোল আপীল সংক্রান্ত কাজে ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ব্রিটিশ আইন কানুনের প্রয়োগ সম্পর্কে পড়াশুনা করেন।

আল্লাডির লেখা অনেক প্রবন্ধ ও সমালোচনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 1907 সালে তিনি অ্যাডভোকেটরূপে আদালতে যোগদান করেন এবং অতি স্বল্পকালের মধ্যেই অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন। আদালতে যোগদান করার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি বহু মামলায় জুনিয়র কৌঁসুলী হিসাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। 1915 সালে কে. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে মাদ্রাজ হাইকোর্টে বিচারক পদে নিয়োগের পিছনে আল্লাডি কৃষ্ণস্বামীর অবদান অনেকখানি। স্বীয় যোগ্যতায় তিনি একজন প্রধান আইনজীবী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন এবং কয়েকটি মামলায় খ্যাতনামা আইনজীবীদের বিপক্ষে স্বীয় মতামত প্রতিষ্ঠিত করেন। 1920 সালের শেষে তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের ব্যবহারজীবীদের অন্যতম প্রধান নেতা রূপে পরিচিত হন। 1929 সালে গঠিত "ইণ্ডিয়ান সেল অফ গুডস্ বিল" সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং 'পার্টনারশিপ বিল' কমিটিতে (1930-31) কৃষ্ণস্বামী সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি Drafting Committee of the Indian Constitution এবং Indian Constituent Assembly-র সদস্যরূপে যোগদান করেন। তের বছরেরও অধিককাল তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার এবং বেশ কয়েক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ছিলেন। পঁচিশ বছরেরও অধিককাল তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট-এর সদস্য ছিলেন। 1929 সালে তিনি মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট-জেনারেল-রূপে মনোনীত হন এবং একাদিক্রমে পনের বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাইজার-ই-হিন্দ্ (1926), দেওয়ান বাহাদুর (1930) এবং নাইট (1932) ইত্যাদি কয়েকটি সম্মান সূচক উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করা হয়। কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি নিয়মিত অর্থসাহায্য করেন। উচ্চ শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর ঔৎসুক্য ও আগ্রহ ছিল। 1938 সালে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হন এবং সেই বৎসরেই তিনি কংগ্রেসের পক্ষে 'মিউনিসিপ্যাল পার্লামেণ্টারী পার্টি' গঠন করেন। 1942 সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেন নি।

আল্লাডি কৃষ্ণস্বামী সর্বদাই এই অভিমত ব্যক্ত করতেন যে আইনজীবীদের শুধুমাত্র মামলার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চিন্তা করেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়, প্রগতিশীল সমাজ গঠন সম্পর্কেও তাঁদের ভাবা উচিত। সমাজের কল্যাণ সাধনের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে

করতেন। তিনি ছিলেন বিশেষরূপে ধর্মীয়ভাবাপন্ন। গোঁড়া মনোভাবাপন্ন হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে হিন্দু আইনের ব্যাপক সংস্কার সাধন একান্ত প্রয়োজনীয়। রাজনীতি সম্পর্কে চরমপন্থী আল্লাডি কৃষ্ণস্বামী মনে করতেন যে ভারতীয়দের সপক্ষে যথাযোগ্য ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অহেতুক বিলম্ব করা ব্রিটিশদের অনুচিত। ভারতীয় সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে 'ড্রাফটিং কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে আল্লাডি কৃষ্ণস্বামী এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার রূপে তিনি খ্যাতিলাভ করেন।

[Constituent Assembly Debates, 1946-47 ; Modern Review Files ; Indian Review Files ; Who's Who in Madras, 1934 ; Hindu Files ; Golden Jubilee Souvenir ; Perumal V.—Contemporary South Indians ; Shashtyabdapoorthi Souvenir Volume.]

(ইমানুয়েল্স ডিভিয়েন) কে. কে. পিল্লাই

আল্লাদিয়া খান (ওস্তাদ) (১৮৫৫-১৯৪৬)
ALLADIYA KHAN (1855-1946)

1855 সালের 10 অগাষ্ট তারিখে আল্লাদিয়া খান উনিয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এমাৎ খান উনিয়ারা রাজ দরবারে বিশিষ্ট সভাগায়ক ছিলেন। সমসাময়িক সঙ্গীতজ্ঞেরা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। সঙ্গীতের প্রচলিত এবং অপ্রচলিত উভয় ধরনেরই বহুল পরিমাণ 'চীজ' ও 'রাগ'-এর উপর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আল্লাদিয়ার বয়স যখন ঠিক 14 কিংবা 15 সেই সময়ে এমাৎ খান মারা যান।

আল্লাদিয়ার আসল নাম ছিল গোলাম আহমেদ। কিন্তু পূর্বের 4/5টি সন্তান মারা যাওয়ার পর কোন এক ফকিরের বরদানের ফলে গোলাম আহমেদের জন্ম হয়েছিল বলে সবাই আদর করে তাঁকে 'আল্লাদিয়া' (ঈশ্বরের দান) বলে ডাকত এবং পরবর্তীকালে এই নামেই তিনি স্থায়ীভাবে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে তাঁর আরবী ও ফার্সি ভাষা শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। কিন্তু এমাৎ খান মারা যাওয়ার পর দু তিনটি বোন এবং একটি নাবালক ভাই-এর ভরণ-পোষণের সব দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ল। তাঁর কাকা জাহাঙ্গীর খান-এর আদেশে তিনি পারিবারিক ঐতিহ্য অর্থাৎ সঙ্গীতের পথ অনুসরণ করলেন। আল্লাদিয়ার ছোটবেলায় তাঁর বাবা তাঁকে কোনরূপ সঙ্গীত শেখাতে পারেন নি কারণ তাঁর বেশীর ভাগ সময়ই খেলাধূলা ও আরবী ফার্সি শিক্ষায় অতিবাহিত হয়। তাঁর কাকা জাহাঙ্গীর খানও ছিলেন একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি তখন তার নাবালক ভাইপোকে সংগীতের প্রচুর রাগ ও 'চীজ' বিষয় তালিম দেন। প্রথম চার পাঁচ বছর ইনি 'ধ্রুপদ' শিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন এবং আল্লাদিয়া অসাধারণ বুদ্ধি বলে 'ধ্রুপদ' সহজেই অধিগত করার পর তাঁর কাকা শুরু করলেন খেয়াল গানের শিক্ষা দান।

এই শিক্ষানবীশী কাল চলেছিল তাঁর 32 বৎসর বয়স পর্যন্ত ঐ সময়ের মধ্যে আল্লাদিয়া রাজস্থানে, উত্তর প্রদেশ, বিহার, গুজরাট ও বোম্বাইয়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান অজয়গড়, বান্দা, টঙ্ক, আলমোটা প্রভৃতি জায়গায় পরিভ্রমণ করেছিলেন। অবশেষে 1895 সাল হতে প্রায় 1920 সাল পর্যন্ত তিনি কোলাপুর রাজদরবারে সভাগায়করূপে স্থিতিলাভ করেন। তাঁর জীবনের শেষ পঁচিশ বছর তিনি বোম্বাইতেই অতিবাহিত করেন এবং সেখানে যাঁদের তিনি শিক্ষাদান করেন তাঁদের অন্যতম কেশরবাই ও মঘুবাই।

হাদুখান, মুবারক আলি খান ও জানরস খান এর মত যশস্বী সঙ্গীতজ্ঞদের গান জানার অফুরন্ত সুযোগ আল্লাদিয়া খান পেয়েছিলেন এবং এঁদের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। মুবারক খানের টোড়ী তান ফিরাৎ কায়দার জটিল পদ্ধতিতে অসাধারণ দক্ষতার প্রতি তাঁর বিশেষ আসক্তি ছিল। আল্লাদিয়ার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার, এছাড়া মুবারক আলি খান নিজেই তাঁকে শিক্ষাদান করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল আল্লাদিয়া খানের পারিবারিক খ্যাতি। তাঁর গুরুজনেরা কেউই তাঁকে নিজেদের 'ঘরানা' ছেড়ে অন্যের কাছে শিক্ষালাভের অনুমতি দিলেন না। এই ঘটনা আল্লাদিয়ার হৃদয়ে স্থায়ী দুঃখের ছাপ রেখেছিল। তিনি প্রায়ই তাঁর বন্ধুদের বলতেন " তোমরা আমার গায়কীর কী এত প্রশংসা কর ? এতো মুবারক আলি খানের সঙ্গীতের ভগ্নাংশ মাত্র এবং আমার স্মৃতিতে তাঁর বিশিষ্ট

পদ্ধতির যে ছাপ অঙ্কিত আছে তার উপর নির্ভরশীল।"

সঙ্গীতের দুটি মৌলিক উপাদান যথাক্রমে সুর ও সময়। যে পদ্ধতিতে সুরের সামান্য পরিমাণ পার্থক্য অপেক্ষাকৃতভাবে উপেক্ষা করে ছন্দ, তাল ও লয়ের উপর অত্যধিক প্রবণতা থাকে তাকে বলা যেতে পারে সময় সংক্রান্ত, দ্বিতীয়টি স্বরের উপরেই অধিক দৃষ্টি দেয় এবং তৃতীয়টি উভয়েরই কম গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বর্জন করে প্রধান গুণাবলীর সমন্বয় সাধন করে। এইরূপে আবদুল করিম খান এর 'কিরণ' গায়কীতে স্বরের প্রাধান্য ছিল, কিছু কিছু আগ্রা ঘরাণায়—তাল ও লয়ের প্রাধান্য ছিল। আল্লাদিয়ার জয়পুর গায়কী ছিল উভয় পদ্ধতির সুখশ্রাব্য সংমিশ্রণ। সূক্ষ্মভাবে স্বর ও লয়ের সঙ্গীত স্থাপনই ছিল আল্লাদিয়ার শিল্প কৌশল। অন্যান্য ঘরাণাগুলি সঙ্গীতের স্বর ও লয় এর বিস্তীর্ণ বর্ণালী পটের বিভিন্ন স্থানে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

নাটের প্রকার, বিলাবল, কামোদ, টোড়ী প্রভৃতি অপ্রচলিত রাগকে জনপ্রিয় করে তোলাই হল জয়পুর গায়কীর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। খান সাহেব কর্তৃক প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে এগুলি অপরিচিত ছিল। বালকৃষ্ণ বুয়া ইচলকা রঞ্জিকর মহারাষ্ট্রে বহু জনপ্রিয় রাগের মাধ্যমে যে খেয়াল পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন ইহা তার পরিপন্থী।

জয়পুর ঘরানার আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তার টেঢী অথবা জটিল ফিরাৎ। বোলতান এবং অতি সুন্দরভাবে ও প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে সমে অবতরণ। প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হল খেয়ালকে বর্ণাঢ্য-স্থাপত্য শিল্পের কাঠামোর ন্যায় উপস্থাপিত করা।

আল্লাদিয়া অত্যন্ত রুচিবাগীশ, ঐতিহ্যপন্থী অথচ উদার শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে 'গায়েন মহর্ষি" বলা হত, কারণ তাঁর জীবনের 40 বছরেরও অধিককাল তিনি এই শিল্পের তপস্যায় নিরত ছিলেন। নিজের সম্পদ রক্ষায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহশীল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন ভাস্করবুয়া বাখালে কেশরবাই এবং মঘুবাই কারণ এঁরা সবাই কিংবদন্তীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং একাডেমী পুরস্কার বিজয়ী।

আল্লাদিয়ার ভাই হাইদার খান। দুই পুত্র মঞ্জী খান ও ভুর্জী খান এবং ভাইপো নাথান খান-এর সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ রক্তের সম্পর্ক। মঞ্জী খানকে পরিবারের 'ফুল' নামে অভিহিত করা হত। বর্তমানে একমাত্র জীবিত বংশধর কোলাপুরে ভুর্জী খানের পুত্র বাব্বর আজিজ খান তাঁর পিতামহের 'চীজ' এর বিপুল ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত।

[Govindyao Ternbi's biography of Alladiya Khan; Sangeet Kala Vihar (Marathi), articles by Ajij Khan.]

ডি. জি. হটলকার

আল্লাহ বক্স সুমরু (১৯০০-১৯৪৩)
Allah Bux Soomro (1900-1943)

সুফী প্রধান সিন্ধুপ্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন আল্লাহ বক্স সুমরু। দেশ বিভাগের পূর্ববর্তী কালের ভারতবর্ষে মুসলীম মন্ত্রীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাকিস্তানের দাবীকে সমর্থন করা এবং মুসলীম লীগে যোগদানের জন্য জিন্নার প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হয়ে তার গতিরোধে সমর্থ হয়েছিলেন। এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের দাম তাঁকে জীবন দিয়ে দিতে হয়। কিন্তু এইভাবে তিনি ভারতীয় মুসলীমদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের এক মহান ঐতিহ্য রেখে যান।

1900 সালে আল্লাহ বক্স এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা চাষের পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ কাজের মাধ্যমে বেশী রোজগার করতেন। তাঁর বাবা এবং দাদু ছিলেন উত্তর সিন্ধুর সরকারী ঠিকাদার। সুমরুরা ছিলেন এক আত্মসচেতন রাজপুত গোষ্ঠী। অষ্টম এবং একাদশ শতাব্দীতে যথাক্রমে আরব ও গাজনী আক্রমণের পর স্থানীয় সুমরু বংশই উত্তরাধিকার সূত্রে সিন্ধুপ্রদেশের শাসন চালিয়ে আসছিলেন। আজও দোদো সুমরুর বীরত্বপূর্ণ গাঁথা প্রচলিত আছে।

আল্লাহ বক্সের জন্মস্থান ছিল শিকারপুর; এই বিষয়ে তিনি খুব ভাগ্যবান ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ব্যাপারে এই শহরটির এক অসাধারণ ঐতিহ্য ছিল। পর্যালোচনায় এটি অবশ্যই গবেষণার বিষয় যে কেন একই জেলার সুক্কুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য কুখ্যাত অন্যদিকে শিকারপুর কোনরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকায় অভিনন্দনযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

শিকারপুরে জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠার পর, আল্লাহ বক্স শিকারপুরেরই হোপফুল একাডেমীতে যোগদান করেন। 1918 সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে না গিয়ে তিনি তাঁর পিতার ব্যবসায় যোগদান করেন।

তাঁর একমাত্র ভাই ছিল হাজী মৌলা বক্স। ইনি পরে সিন্ধু প্রদেশের মন্ত্রী হন। আল্লাহ বক্সের একটিই স্ত্রী ও তিনটি সন্তান ছিল। তেইশ বছর বয়সেই তিনি জাকোবাবাদ পৌর সভা কমিটি এবং সুক্কুর জেলার স্থানীয় বোর্ডে নির্বাচিত হন। পরে 1928 সালে তিনি সুক্কুর স্থানীয় জেলা বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। 1931 সালে তিনি সিন্ধু প্রদেশের স্থানীয় জেলা বোর্ডের সভাপতিদের নিয়ে স্থানীয় জেলা বোর্ডগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা এবং অর্থের দাবীতে জাকোবাবাদে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন।

আল্লা বক্স নিয়মিত নমাজ পাঠ করতেন। কিন্তু তাঁর পিতা বা কনিষ্ঠ ভাইয়ের মত তিনি মক্কায় গিয়ে 'হাজী' হতে চান নি।

1926 থেকে 1936 সাল পর্যন্ত আল্লাহ বক্স বোম্বাই কাউন্সিলে উত্তর সিন্ধু প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সেখানে তিনি জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিতা স্যার শাহ নওয়াজ খাঁন-এর প্রধান সহায় ছিলেন। বোম্বাই কাউন্সিলে তিনি পাবলিক একাউণ্টস কমিটি সহ অনেক কমিটির মধ্যেই ছিলেন। তিনি সিন্ধুপ্রদেশের অন্যান্য অনেক এম. এল.-এর সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টায় বিশালকায় সুক্কুর ব্যারেজ প্রকল্প রূপায়িত করতে সাহায্য করেন। এই প্রকল্পটি সিন্ধু প্রদেশকে একটি ঘাটতি প্রদেশ থেকে উদ্বৃত্ত প্রদেশে পরিণত করেছিল।

1935 সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত এবং বোম্বাই থেকে সিন্ধু প্রদেশকে একটি আলাদা প্রদেশে উন্নীত করা হলো। স্যার শাহ নওয়াজ ভুট্টো, স্যার আবদুল্লাহ্ হারুণ এবং (বর্তমান) খান বাহাদুর আল্লাহ বক্স সিন্ধুপ্রদেশের বিধান সভার নির্বাচনে লড়বার জন্য ইত্তেহাদ (ঐক্য) পার্টি গঠন করলেন। বিধানসভার 60টি আসনের 35টি মুসলীম আসনের মধ্যে এই পার্টি 24টি আসনে জয়লাভ করল। কিন্তু নির্বাচনে ভুট্টো, হারুন দু'জনেই পরাজিত হন। রাজ্যপাল স্যার গোলাম হুসেনকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানালেন। মাত্র একবছর পরে 1938 সালে যখন গোলাম হুসেনের মন্ত্রীসভার পতন ঘটল তখন আল্লাহ বক্সকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান হল।

মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে আল্লাহ বকস সিন্ধু-প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তাঁর মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরা কংগ্রেসের মন্ত্রীদের মত কম বেতন নিতেন। যদিও তিনি দু'বছরও থাকতে পারেননি কারণ মুসলীম লীগের খাঁন বাহাদুর মহম্মদ আইয়ুব খুহ্রু তাঁকে সরিয়ে ঐ আসনে বসেন। কিন্তু পরের বছরই আল্লাহ বক্স খুহরুকে পরাজিত করে ওই পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হন। পরের দুবছর ছিল আল্লাহ বক্সের নেতৃত্বের এক স্বর্ণযুগ।

মুসলীম লীগ তার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্রগুলিকে ফজলুল হকসহ করাচীতে এনে হাজির করল যাতে আল্লাহ বক্সকে তাদের পার্টিতে যোগ দিতে রাজী করানো যায়। কিন্তু আল্লাহ বক্স রাজী হলেন না। তাঁর রাজী না হওয়ার কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে তিনি বিধানসভায় আটটি কংগ্রেস ভোটের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন আসলে সাম্প্রদায়িকতাকে একদমই আস্কারা দিতে চাইতেন না। উদাত্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করে-ছিলেনঃ "মুসলমানদের সম্পর্কে মুসলীম লীগের মত হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে তাদের আলাদা জাতি হিসেবে অস্তিত্ব আছে, যা সম্পূর্ণ অ-ঐসলামিক ; কোরাণের প্রকৃত শিক্ষা এবং নির্দেশ অনুযায়ী একজন প্রকৃত মুসলীম হচ্ছেন তিনি যিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন, চরিত্রবান এবং জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও একতা বজায় রাখতে সর্বদাই প্রচেষ্টা চালান। বিশ্বের বর্তমান ধর্মের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে যে বিভাজন রয়েছে তা মূলত ভুল এবং বিপজ্জনক এই কারণে যে এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অন্য ধর্মাবলম্বী একজন উচ্চ পর্যায়ের আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তির চেয়ে একজন চরিত্রহীন ও পাপী ব্যক্তিকেও মহান ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত করতে হবে যদি সে মুসলমান হয়।"

আল্লাহ বক্সের নাম ক্রমশ বিখ্যাত হয়ে উঠল। 1940 সালে দিল্লীতে যখন জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা সর্বভারতীয় আজাদ সম্মেলন ডাক দিল তখন তারা আল্লাহ বক্সকেই উক্ত অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করল।

ঠিকাদারী ব্যবসা চালনাকালে তিনি প্রথমে খান সাহেব পরে খান বাহাদুর হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে একজন জাতীয়তাবাদী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং বছরের পর বছর খদ্দর পরিধান করেন। তিনি ঘুরে ঘুরে খদ্দর বিক্রী করেছেন।

ভারত-ছাড়ো আন্দোলন যখন শুরু হল তখন তিনি করাচীর সুন্দর সমুদ্র তীরবর্তী ক্লিফটনে মহিলা সত্যাগ্রহীদের জন্য এক বিরাট বাংলো ভাড়া করেছিলেন। 1942 সালে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তিনি করাচী জেল পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি তাঁর বৃদ্ধ শিক্ষক পরশরাম ডি আহিলরমনকে দেখে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ভাইসরয় তাঁকে ত্রিশ জনের প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে মনোনীত করেন এবং অর্ডার অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার উপাধি প্রদান করেন। 1942 এর সেপ্টেম্বরে যখন ভারত-ছাড়ো আন্দোলন তুঙ্গে তখন তিনি ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ এবং সমস্ত খেতাবগুলি পরিত্যাগ করেন। তাঁর এই কাজের কারণ স্বরূপ ভাইসরয়কে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন ভারতবর্ষকে জোর করে টেনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়ে মনুষ্যসম্পদ এবং অর্থসম্পদের দিক দিয়ে ভারতকে রিক্ত করেছে ব্রিটিশ। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছে এবং 'বিভক্ত করো ও শাসন করো' এই দুরভিসন্ধি মূলক নীতির দ্বারা দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ ঘটিয়েছে।

ব্রিটিশরা এতে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলো। গভর্ণর আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করেন উপরোক্ত চিঠিটিকে এবং তাঁর ওপরে আর আস্থা না রেখে সমস্ত পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এই বীরত্বপূর্ণ কিন্তু হঠকারী পদক্ষেপে কিছু কংগ্রেসী তাঁকে উৎসাহিত করেন। এই পদক্ষেপে সেই সময়ে খুব হৈ চৈ হয়। কিন্তু একজন জাতীয়তাবাদী নেতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে সরে যেতে হল।

বরখাস্তের কয়েক মাস পরে 1943-এর 14 মে শিকারপুরে আল্লাহ বক্‌সকে গুলি করে মারা হয়। সমস্ত সিন্ধুপ্রদেশ তাঁর জন্য কেঁদেছিল। এটা যে একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহই ছিল না। লীগ নেতা খুহরুকে সবাই সন্দেহ করতে লাগল। সুক্‌কুরের সেশনস জজ খুহরুকে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিলেন। প্রমাণিত হল যে খুহরুর জমিদারীর প্রধান দালালের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে এবং এটা জানা কথা যে জমিদারের দালালরা তাদের মালিকের অনুমতি না নিয়ে বা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ ধরনের কাজ করতে পারে না।

আল্লাহ বক্‌সের মৃত্যু সিন্ধুপ্রদেশে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির কাছে এক নিদারুণ আঘাত হিসেবে প্রতিভাত হল। পরবর্তী দু'বছরে সিন্ধুপ্রদেশের রাজনীতিতে কোন জাতীয়তাবাদী মুসলীমকে পাওয়া গেল না। যখন গোলাম মহম্মদ সৈয়দ লীগ পরিত্যাগ করে জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। পাকিস্তান আন্দোলনকে আর সফলভাবে ঠেকানোর কোনো উপায়ই নেই।

[G. M. Syed,—Jimba Guzariom Jin Seen Vol. II ; Proceeding of the Bombay Legislative Council, 1926-36 ; Sind Legislative Assembly Debates, 1937-43 ; Personal knowledge of the contributor.]

কে. পি. মালকানি

আল্লামা মাশরিকী (১৮১৮-১৯৬৩)

Allama Mashriqi (1818-1963)

অমৃতসরের দরখাস্ত লেখক মঃ আতা মুহম্মদের পরিবারে আল্লামা মাশরিকীর জন্ম 1818 সালের 25 আগস্ট। প্রথম জীবনে ইতি পরিচিত ছিলেন ইনায়তুল্লাহ খান নামে। মুসলিম সম্প্রদায়ের দুর্দশা মোচনে ইনায়তুল্লাহ খান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এক মধ্যবিত্ত পাঠান পরিবারের তিনি সন্তান। তিনি দুবার বিবাহ করেন—প্রথমে বিলায়েত বেগম এবং পরে ডকটর এন. এম. আলভির কন্যা জাইদা বেগমকে।

তাঁর শিক্ষাজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। উনিশ বছর বয়সে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে তিনি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। পরে তিনি ইংলণ্ডে যান এবং 1908 সালে একটি বৃত্তি পান। 1911 সালে তিনি প্রাচ্য ভাষাতে প্রথম শ্রেণীর ট্রাইপোস এবং 1912 সালে মেকানিক্যাল বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রাইপোস লাভ করেন।

সাধারণতঃ বলা হয় যে পেশোয়ারের ইসলামিক কলেজের আরবীর অধ্যাপক মৌলভী মহম্মদ মুসলিম ফারুকীর দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং বীরত্বপূর্ণ জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে ইসলামিক ধরনের জীবন যাপনের মাধ্যমেই এই অভিশপ্ত পৃথিবী থেকে মুক্তি পাওয়া

যেতে পারে। তিনি অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন যে কোরাণেই ঈশ্বরের সবচেয়ে নিখুঁত প্রকাশ ঘটেছে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মত এর কোন ভ্রান্তি নেই। ফলতঃ তাঁর মতে জাতি গঠনের সার্বজনীন নীতি এবং সমাজের আত্মিক নবজীবন লাভের একমাত্র পথনির্দেশ রয়েছে ইসলাম প্রদর্শিত নীতির মধ্যে।

শিক্ষা এবং রাজনীতি—প্রধানতঃ এই দুইটিবিষয়ে নানা কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু প্রদেশে। 1913 সালে ইংলণ্ড থেকে ফেরার পরে তিনি ইসলামিক কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। দুবছরের মধ্যে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। 1919 সালের অক্টোবরে তিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে যোগদান করেন। 1922 সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকারী ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 1931 সালে পদত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি শিক্ষা দপ্তরের বহু দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ছিলেন, যেমন পরীক্ষার রেজিষ্ট্রার, স্কুলের ইন্‌স্পেকটর এবং পেশোয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

ন্যায়নিষ্ঠ ইসলাম পন্থী হিসাবে তিনি 1926 সালে কায়রোতে ঐসলামিক সম্মেলনে বেসরকারীভাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি মিশরের সুলতান-কে 'খলিফু-তুল-মুসলমান' হিসাবে নির্বাচিত করার প্রস্তাবকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন এই কারণে যে একজন পরাধীন শাসক কখনই ঐসলামিক বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে গণ্য হতে পারেন না। কায়রোর এই সভায় তিনি 20,000 পাউণ্ডের একটি সাধারণ ইসলামীয় তহবিল (বাইত উল মাল) গঠনের চেষ্টা করেন ; সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি।

1931 সালে তিনি 'খাকসার' বা 'খোদাতাল্লার দাস' নামে এক রাজনৈতিক দল সংগঠিত করেন। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন যেহেতু তাঁর মতে হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যেই কংগ্রেস অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি নিহিত ছিল। তাছাড়া অহিংস পদ্ধতিতে গণ আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধেও তিনি সন্দিহান ছিলেন। মুসলিম লীগের সঙ্গেও তাঁর সদ্ভাব হচ্ছিল না। 'খাকসার' আন্দোলন শুরু করে তিনি মুসলিমদের পৃথিবী জয়ের মহান ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন "আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুনরায় পৃথিবীর রাজা, সম্রাট প্রভৃতিতে ভূষিত হওয়া—এটাই হচ্ছে আমাদের ধর্ম, আমাদের ইসলাম। আমাদের ধর্মমত এবং বিশ্বাস।" এইভাবে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তিনিই স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণাকে আমদানী করেন। তাঁর দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাম্য এবং প্রেম। ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁর অনুগামী-দের একই বর্ণের বস্ত্র পরিধান বাধ্যতামূলক করেছিলেন।

শ্রমিক শ্রেণীর এবং দরিদ্র জনসাধারণের একজন প্রবল প্রবক্তা ছিলেন তিনি। ধনতন্ত্র, তা যে কোনো আকারেরই হোক না কেন, তিনি তার নিন্দাবাদ করতেন। তাঁর কাছে গণতন্ত্রের অর্থ ছিল ইসলামীয় সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাঁর চিন্তা ভাবনাকে প্রচার করার জন্য তিনি সংবাদপত্র এবং বক্তৃতামঞ্চ দুটোই ব্যবহার করতেন। অসংখ্য ইস্তাহার ছাড়াও, তিনি বইও লিখেছেন, যেমন 'তাজকারা' (উর্দু এবং পার্সী 1924-এ), 'ইশারাৎ' (1931) 'খারিতা' এবং 'কোয়াল-ই যায়জল'। খাকসার পার্টির মুখপত্র 'আলই শাহ' নামে লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিকে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি মোট চারবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন—দুবার 1939-এ এবং 1940-43-এ দুবার। মাদ্রাজে তিনি এক বছর অন্তরীণ ছিলেন। একজন সাম্প্রদায়িক হিসাবে তাঁর আবির্ভাবের সূচনা হলেও চার-এর দশকে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচার করেছিলেন। এমনকি, তিনি জিন্নাকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একটি সম্মানজনক আপোষ রফায় আসতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লামা মাসরিকি নামে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র মুসলিম রাজনীতিতে উৎসাহ প্রদান করেননি—সাম্প্রদায়িক এবং জাতিগত বিদ্বেষের অন্যতম প্রবক্তাও ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তাঁর কথার উপর বিশেষ একটা গুরুত্ব দেওয়া হত না, কারণ তাঁর মানসিক প্রবণতা এমনই ছিল যার উপর আস্থা রাখা চলে না। 1963 সালের 25 আগস্ট পাকিস্তানে তাঁর মৃত্যু বিশেষ কারুর মনে রেখাপাত করেনি।

[Home Political, F. 118/35 Poll (N. A. I.) ; Home Political, F. 160/33 Poll (N. A. I.) ; Times of India Directory and Year Book, 1949 ; Syed Tufail Ahmed—Mussalmano Ka Roshan Mustakhil (Urdu), Delhi, 1945 ; W. C. Smith,—Modern

Islam in India, London, 1916 ; Hira Lal Seth;—The Khaksar Movement, Lahore, 1946 ; The Muslim World, Vol. XXI, No. 11, April, 1931 ; Inayat Ullah Khan,—Tazkara (Urdu & Persian), 1924 ; Inayat Ullah Khan,—Isharat, 1931.]

এস. কে' বাজাজ

আল্লুরি সীতারাম রাজু (১৮৯৭-১৯২৪)
Alluri Sitaram Raju (1897-1924)

আল্লুরি সীতারাম রাজু 1897 সালের 15 মে এক মধ্যবিত্ত ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বাস করতেন অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলার মোগাল্লু গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিল ভেঙ্কটরামা রাজু আর মা ছিলেন সূর্য নারায়ণ আম্মা।

তাঁর শৈশব অথবা লেখাপড়া সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি খুবই কম পাওয়া যায়। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তাঁকে সম্ভবতঃ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠানো হয়েছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য, যেমন 1910 সালে রাজামুন্দ্রিতে, রামচন্দ্রপুরমে 1911 সালে, কোকনাদে 1912 সালে, বিশাখাপত্তনমে 1913 সালে, 1914 সালে নারাসাপুরে এবং টুনিতে। প্রতিবছরই তিনি নীচু ক্লাস থেকে উঁচু ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখাপড়ার খুব একটা উন্নতি হয়নি সে সময়। তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন ঘোড়ায় চড়া, জ্যোতিষ বিদ্যা এবং ওষুধের গুণাবলী আছে এমন গাছ-গাছড়ার সন্ধান বিষয়ে। একথা বলা হয়ে থাকে যে রামা রাজু নামে তাঁদেরই কোনও আত্মীয় এবং রাজামুন্দ্রি কলেজের দর্শনের ছাত্রের প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তার ফলে আঠারো বছর বয়সে তিনি হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। আত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য যোগে মন দিলেন তিনি।

যোগী এবং একজন কঠোর তপস্বী রূপে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বিশাখাপত্তনম্ অঞ্চল এবং গোদাবরী জেলার পার্বত্য উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। তাঁর আত্মসংযম, ওষুধ সম্বন্ধে জ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বন্যপ্রাণীদের বশ্যতা স্বীকার করানোর সর্বজনবিদিত ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ সরলমনা উপজাতি সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে উঠলো।

সম্ভবতঃ 1920 সালের মধ্যে রাজু গান্ধীজীর মতাদর্শে আকৃষ্ট হন এবং স্বরাজ সম্পর্কিত তাঁর বাণী ও চিন্তাধারা দ্বারাও তিনি অনুপ্রাণিত হন। তাঁর উপজাতীয় অনুগামীদের তিনি যুক্তির মাধ্যমে রাজী করিয়েছিলেন মদ্যপান ত্যাগ করতে এবং তাদের ঝগড়া-ঝাঁটি পঞ্চায়েতের সাহায্যে মিটিয়ে নিতে। তাঁকে এজন্য ব্রিটিশ শাসকবর্গ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন এবং তাঁকে পুলিশের নজরাধীনে রাখা হল। কিন্তু যেভাবেই হোক একজন মুসলমান আঞ্চলিক সহকারী কমিশনারের সাহায্যে তিনি ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা বহাল রাখতে পেরেছিলেন। এই সময় থেকেই তিনি স্বরাজ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অহিংস উপায়ে গান্ধীজী পরিকল্পিত এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ প্রাপ্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। হিংসাত্মক যুদ্ধ করার প্রকৃত ক্ষমতা যা ক্ষত্রিয়েরা বহন করে একমাত্র তার মাধ্যমেই স্বরাজ লাভ করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। সেই অনুসারে তিনি স্থির করলেন যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উপজাতিদের বিদ্রোহী করে তুলবেন এবং এই বিদ্রোহে তিনি নেতৃত্ব দান করবেন। তিনি আরও স্থির করলেন যে, এজেন্সি এলাকায় একটি স্বাধীন রাজ্যও স্থাপন করবেন।

এই পরিকল্পনাকে উপজাতিরা সাদরে গ্রহণ করে-ছিল। ব্রিটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে তাদের অনেকদিন ধরে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। কারণ অফিসাররা তাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে শ্রম আদায় করতেন। তাদের চাষবাসের প্রথাগত পদ্ধতির ওপর নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করতেন, বনে গবাদি পশুর বিচরণে বাধা দিতেন। কাঠ কাটার সময় আরোপ করতেন নানা বাধা নিষেধ এবং অরণ্য সম্পদ সংগ্রহে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন। শাসকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা উপজাতিদের পক্ষে নতুন কিছুই ছিল না। অতীতে এ ধরনের বিদ্রোহ বহুবার হয়েছে। কিন্তু 1922-24 সালের এই বিদ্রোহ পূর্ববর্তী বিদ্রোহের থেকে খানিকটা আলাদা ধরনের ছিল। এবারের বিদ্রোহ ছিল রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং পরিচালনা করেছিলেন বাইরের একজন ক্ষত্রিয় তপস্বী। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে : "রাজুর এ ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা কার্যকরী করার মতো সাহস ও ক্ষমতা ছিল এবং তিনি

ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদ সাধনের জন্য তাঁর কর্মসূচী অনুযায়ী এইভাবে 'ফিতুরী' আরম্ভ করেছিলেন।"

রাজু 1922 সালের 22 শে আগস্ট চিন্তাপল্লী পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করলেন এবং সেখানে মজুত করে রাখা অস্ত্র-শস্ত্র দখল করে নিলেন। এরপর আরও পুলিশ ফাঁড়ির ওপর আক্রমণ চালানো হল এবং এর ফলে বহু আগ্নেয়াস্ত্রও তাঁর হস্তগত হ'ল। তাঁকে দমন করার কাজে নিয়মিত পুলিশ বাহিনী তাঁর সমকক্ষ ছিল না। আক্রমণগুলি সার্থকতা লাভ করায় দুজন শক্তিশালী উপজাতীয় নেতা তাঁর শিবিরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁরা দুজন হলেন গাম মাল্লু ডোরা এবং গাম গন্তম ডোরা। পরবর্তীকালে এঁরা তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর হয়েছিলেন। এঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন উপজাতি সম্প্রদায়ের শত শত নর-নারী। তাঁদের সাহায্যে রাজু গঠন করলেন এক অভিনব কর্মঠ গোয়েন্দাদল। এরা তাঁকে পুলিশের গতিবিধি সম্বন্ধে আগেই অবহিত করত। সুতরাং পুলিশের কর্মসূচীর রূপায়ন সহজ ছিল না বরং তাঁর হাতে পুলিশ চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়েছিল 1922 সালের 3 সেপ্টেম্বরে অঞ্জেরি ঘাটে। অল্পকাল পরেই দামনাপল্লী ঘাটে আবার পুলিশী দলের প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হল।

সরকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন এবং মালাবার পুলিশের একাংশকে আনা হল তাঁদের মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু পুলিশবাহিনীর প্রয়াস এবারও ব্যর্থ হল। রাজুর বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রইল। তিনি যে সমস্ত জায়গা আক্রমণ করেছিলেন তা হল ঃ— রম্পা চোদাভরম্ (16 অক্টোবর), মাকারম্ (3 নভেম্বর), রামপোল এবং চাপার্থিপালেম (17 অক্টোবর), অনন্তসাগরম্ এবং ভেলাগাপালেম্ (30 নভেম্বর)। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে রাজু (6 ডিসেম্বর) পেড্ডাগুড্ডাপালেমে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন এবং দিন কয়েক পরে লিঙ্গপুরমেও তাঁর পরাজয় ঘটে। এর ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে যায় এবং তাঁর আন্দোলনের তীব্রতা স্তিমিত হতে থাকে। 1923 সালের মার্চ মাসে সরকার ধরে নেন যে রাজুর বৈপ্লবিক কাজকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এজন্য কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়ন না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এ সমস্ত যে হতে পারে রাজু আগেই অনুমান করেছিলেন। 1923 সালের 18 এপ্রিল আন্নাভরমে তিনি পুনরাক্রমণ চালালেন। বিভিন্ন জায়গায় যেমন কয়ুর (31 মে), কোণ্ডা কাম্বেরু, মালকা নগীরী (15 জুন) এবং এবুলুতে (21 জুন) তিনি নতুন করে আক্রমণ শুরু করলেন। যে পুলিশবাহিনী তাঁকে রামাভরমে আক্রমণ করেছিল তারাই রাজুর পালটা আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে দ্রুত পশ্চাদপসরণে বাধ্য হল। ভাগ্যের পরিহাসে কিছুকাল মধ্যে গামমাল্লু ডোরা পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। এতদসত্ত্বেও রাজু বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে সাফল্যের সঙ্গে হানা দিতে থাকেন। শেষকালে এই সকল স্থান আক্রমণ করে রাজুর বিশেষ লাভ হতো না। কারণ ইতিমধ্যে সরকার থানায় অস্ত্র মজুত রাখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই অবস্থায় স্বভাবতই রাজুর পর্যাপ্তভাবে অস্ত্র সংগ্রহের পথ বন্ধ হয়ে গেল।

1924 সালের প্রথমদিকে রাজুকে বাগে আনতে সরকার আসাম রাইফেল নামে সৈন্যবাহিনী আনয়ন করলেন। এর ফলে রাজুর কাজ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ল। এই সময় রাদারফোর্ড নামে এক জাঁদরেল ও অভিজ্ঞ ইংরেজ 'এজেন্সি কমিশনারের' দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি রাজুর অনুগামীদের শাস্তি দান এবং তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সন্ত্রাসবাদী কৌশল অবলম্বন করলেন। এর ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। তৎসত্ত্বেও রাজু 1924 সালের 6 মে পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর হাত এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐদিন তাঁর একদল অনুগামী এবং অগিগরাজু যিনি ছিলেন তাঁর ডান হাত ধরা পড়ে গেলেন। 7 মে রাজু নিজেও পুলিশের বিশেষ শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন অফিসারের হাতে বন্দী হলেন। তাঁকে নিয়ে আসা হল কয়ুরে। এখানে মেজর গুড়ালের অধীনে আসাম রাইফেলস ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ঃ "রাজুকে স্বাচ্ছন্দ্য দানের জন্য যখন যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হলো, তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন এবং তাঁকে গুলি করা হল। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।" তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল কৃষ্ণদেবীপেতাতে এবং 8 মে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। দু'বৎসর ধরে ব্রিটিশ সরকারের দুর্জয় শক্তিকে ঠেকিয়ে রেখে তিনি যে সামরিক ও সাংগঠনিক গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

[M. Venkatarangaiya—The Freedom Struggle in Andhra Pradesh (Andhra), vol. III, 1965, published by the Government of Andhra Pradesh ; Narasimha Rao-Yerramilli Sri Alluri Sitaramaraju Charitra

(Telugu), published by the Government of Andhra Pradesh ; G. V. Subbarao's article in the Goshti, vol. XI No. 6, May 1965, Amalapuram, East Godavari District ; M. K. Gandhi (Ed)—The Young India, dated 18 July 1929.]

বি. কেশবনারায়ণ **এম. বেঙ্কটরঙ্গাইয়া**

আহমদ খান সাইয়াদ (স্যার) (১৮১৭-১৮৯৮)
Ahmad Khan Sayyid (Sir) (1817-1898)

সাইয়াদ আহমদের জন্ম দিল্লীতে, 1817 সালের 17 এপ্রিল, মৃত্যু 28 মার্চ, 1898, আলিগড়ে। পিতার নাম মীর মুত্তাকাই (মৃত্যু 1838) এবং মা আজিজুন্নিসা বেগম। সাইয়াদ আহমাদের পূর্ব পুরুষেরা শাহজাহানের আমলে ভারতে এসেছিলেন এবং মুঘল রাজদরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পিতামহ নবাব জওয়াদ আলি খান একজন হাজারী মনসবদার ছিলেন এবং 'যওয়াদউদ্-দৌল্লা' উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের প্রধানমন্ত্রী।

সাইয়াদ আহমদের শিক্ষা শুরু হয় স্বগৃহে, কিছুটা অবিন্যস্তভাবে। তখনকার সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি বেশিদূর লেখাপড়া করেন নি এবং অন্যান্যদের মতই তাঁর সময় কাটত শিকার করে, সাঁতার কেটে আর বিলাসিতার মধ্যে, সন্ধ্যাবেলায় মজলিসে যোগ দিতেন। তা সত্ত্বেও তিনি অল্প স্বল্প লেখার কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করেন কারণ তখনকার বিশিষ্ট উর্দুসংবাদপত্র সৈয়দ-উল আখবরে তিনি লিখতেন। এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তাঁর বড় ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ খান। মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর তরুণ সাইয়াদ আহ্মাদ খানের উপর এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে মুঘল দরবারে চাকুরি করার জন্য সবাই সাইয়াদ আহমাদ খানকে পরামর্শ দিলেন। যখন তাঁর বয়স কুড়িও পেরোয়নি, তখনই তিনি বংশানুক্রমে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের কাছ থেকে 'জওয়াদ-উদ্-দৌল্লা' এবং 'আরিফ-জঙ' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের আসন্ন পতন পূর্বেই লক্ষ্য করে তিনি বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন সামান্য কর্মচারী-'সেরেস্তাদার'-হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা মনস্থ করলেন। পরের বছরই (1839) তাঁর পদোন্নতি হল 'নায়েব মীর মুন্শী'র পদে। অর্থাৎ আগ্রা ডিভিসনের কমিশনার মিঃ (পরে স্যার) রবার্ট হ্যামিলটনের সহকারী প্রধান সচিবের পদে। ইতিমধ্যে অবসর সময়ে তিনি আইন পড়া শুরু করে দিয়েছিলেন। 1841 সালে তিনি মুন্সেফ-এর পদে মনোনীত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করলেন। এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার জন্য ঘুরে বেড়ালেন, দিল্লী (1846-1854), উত্তর প্রদেশ (বিজনোর 1855-1860, মোরাদাবাদ 1861, গাজিপুর 1862, আলিগড় 1864, বেনারস 1867, আলিগড় 1877) এবং শেষে 1878 সালে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সাবঅর্ডিনেট জজের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে তিনি লণ্ডন ঘুরে এসেছেন। তিনি গিয়েছিলেন দুটি উদ্দেশ্যে—এক, ইংরাজি শিক্ষাব্যবস্থা বিস্তারিত ভাবে জানা, দুই, ধর্মগুরু মুহম্মদ সম্বন্ধে একটি বই লেখার জন্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও অন্যান্য লাইব্রেরী থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। লণ্ডনেই তিনি (1869) ব্রিটিশ সরকারের 'কমপেনিয়ন অফ দি অর্ডার অফ্ দি ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া' উপাধি লাভ করেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁকে 'নাইট কমাণ্ডার অফ দি ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া'-উপাধিতে ভূষিত করা হল এবং গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে তিনি স্থান পেলেন। 1881 সালে আবার তিনি কাউন্সিলে মনোনীত হলেন এবং একাদিক্রমে পাঁচ বছর ঐ পদে আসীন ছিলেন। 1882 সালে তিনি গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত শিক্ষা কমিশনের সদস্য হয়েছিলেন।

1847 সালে দিল্লীর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের রাসায়নিক সংকেত সূত্রের ওপর সাইয়াদ আহমদের গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ক রচনা 'Asarus-Sanadid' প্রকাশিত হল। এই বই 1861 সালে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করলেন Garcin de Tassy ; ফলে লেখক পাশ্চাত্য দেশে পরিচিত হয়ে গেলেন। এর অব্যবহিত পরেই 1864 সালে সাইয়াদ আহমেদ লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একজন সাম্মানিক সদস্য মনোনীত হলেন এবং 1889 সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করল।

1857 সালের বিদ্রোহের সময় সাইয়াদ আহমুদ

বিদ্রোহের কেন্দ্রে, বিজনোর শহরে, ছিলেন। তিনি ইংরেজদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন এবং বহু ইংরেজের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। পরে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর তাঁকে খেলাত (পদ-মর্যাদাসূচক পোশাক) এবং সারা জীবনের জন্য বিশেষ অবসর ভাতা দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত এক বিশাল তালুকও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি বিবেকের সাড়া না পাওয়ায় তালুক গ্রহণ করেন নি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতি বিরূপ এবং মুসলমানরাও ইংরেজদের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নয়। এ-কারণে তিনি তাঁর লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন যাতে এই দুই জাতির বিরোধ বিসংবাদ এবং কুসংস্কার দূরীভূত হয়।

তিনি তাঁর এই লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য বিজনোরের বিদ্রোহের বিবরণী 'তারিখ-ই-সরকাশী বিজনোর' লিখলেন, যাতে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। একই সঙ্গে প্রকাশিত হল তাঁর আর একটি সংকলন গ্রন্থ 'রিসালাহ্-খিরখওয়াহান মুসলমান' (ভারতের বিশ্বস্ত মুসলমান সম্প্রদায়) 1860 সালে, দুই খণ্ডে, উর্দু এবং ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিসালাহ্ আসবাব-ই-ভগবৎ-ই-হিন্দ্'। এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন এবং জি. এফ. আই গ্রাহাম। বইটির ইংরেজি নাম ছিল 'দি কজেস অফ ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট' (আগ্রা, 1903)। বহুদিন পর্যন্ত এই বই জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কেবলমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যদের বইটি পড়তে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের নিজেদের অবগতির জন্য—যাতে তাঁরা বিদ্রোহের আসল কারণগুলিকে অনুধাবন করতে পারেন। লেখক বইটিতে বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভারতীয় ও ইংরেজ উভয়পক্ষকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।

যখন সাইয়াদ আহমদ গাজীপুরে চাকুরীরত, তখন তিনি 1864 সালের 9 জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করলেন একটি অনুবাদ সংস্থা (Translation Society)। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় গ্রন্থ উর্দুতে অনুবাদ এবং প্রকাশ করা যাতে ইউরোপীয় ভাবনাচিন্তা সম্বন্ধে ভারতবাসীদের অসীম অজ্ঞানতা দূর করা যায়। পরে সংস্থাটি আলিগড়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং তার নতুন নাম হয়েছিল 'দি সায়েণ্টিফিক সোসাইটি'। 1866 সাল থেকে তিনি বিখ্যাত সাপ্তাহিক সায়েণ্টিফিক সোসাইটির মুখপত্র 'আলিগড় ইনস্টিটিউট গেজেট', প্রকাশ করতে শুরু করলেন। সেই সময় পত্রিকাটি প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হত। পরে সপ্তাহে দুবার, প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার, পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকায় ইংরেজি ও উর্দু উভয় ভাষাতেই লেখা থাকতো এবং প্রত্যেক উর্দু বা ইংরেজি লেখার পাশে অন্য ভাষায় তার অনুবাদ করা থাকতো। 1890 সালে এই পত্রিকা Mohammadan Anglo-Oriental College Magazine (আলিগড়)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং এই দ্বিভাষিক পত্রিকা থিওডোর বেক্ এবং শিবলি নু'মানির যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে।

গাজীপুরে থাকার সময় সাইয়াদ আহ্মদ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে শুরু করেন, তা হল-ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেণ্টস-এর উর্দু তর্জমা 'তাব' 'ইনুল-কালাম'। এই লেখায় তিনি ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সাম্য এবং এই দুই ধর্মীয় মতবাদের ও বিশ্বাসের মিলগুলিকে তুলে ধরেন।

আলিগড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর সাইয়াদ আহমেদের মূল কর্মসূচী হল ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত উন্নতি-সাধন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় আধুনিক উদার শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বের কথা তাঁর বক্তৃতায় দিনরাত বলতে থাকলেন। এবং শেষে মুসলিম গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর জয় হল। 1875 সালে প্রতিষ্ঠিত হল মহামেডান অ্যাংলো- ওরিয়েণ্টাল কলেজ—পরে 1920 সালে এই কলেজই রূপান্তরিত হল আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে। 1886 সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন মহামেডান এ্যাডুকেশান্যাল কংগ্রেস। 1890 সাল পর্যন্ত এই সংস্থা পরিচিত ছিল মহামেডান এডুকেশা-ন্যাল কন্ফারেন্স হিসেবে। (1890 সালে দশম অধিবেশনে যার নাম হয়েছিল এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল এডুকেশান্যাল কন্ফারেন্স)। এই অধিবেশন ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। এই সংস্থার উদ্দেশ্য সংস্থার নামেই নিহিত-মুসলমানদের মধ্যে উদারনৈতিক শিক্ষার বিস্তার। যদিও তিনি ছিলেন শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে, কিন্তু সাইয়াদ আহ্মাদ মুসলমানদের কারিগরী শিক্ষাগ্রহণ বা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন।

সাইয়াদ আহমদ ধর্ম-বিশ্বাস ও বিজ্ঞানকে একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণে গোঁড়া মুসলমানরা তাঁর বিরুদ্ধে সনাতন ধর্ম পুস্তকের অপব্যাখ্যা

করার অভিযোগ এনেছিল ও তাঁর কাজের কঠোর সমালোচনা করেছিল। বিশেষতঃ কোরাণ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা অসমাপ্ত এবং উর্দু সাপ্তাহিক 'তাজিবুল-আখলাক' (শুরু 24 ডিসেম্বর 1870) এ প্রকাশিত সমাজ ও ধর্মের উপর প্রকাশিত লেখাগুলি বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। নিজের সম্প্রদায়ের কাছেই তিনি বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হলেন তার আর একটি বই-এর জন্য। 'আহ্‌কাম-ই-তাম্ম-ই আল-ই-কিতাব' (লাহোর 1899) গ্রন্থে তিনি খৃীষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু যুক্তিবাদী হলেও সাইয়াদ আহমদ কখনোই চুপ করে থাকেন নি যখন তাঁর ধর্ম বা তাঁর সম্প্রদায় বিনা কারণে অন্যের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে ; অনেক সময় তিনি এই কারণে অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পেয়েছেন। একবার যখন স্যার উইলিয়াম মুর 'লাইফ অফ মোহম্মদ' বই-এ হজরৎ মহম্মদ-কে অত্যন্ত 'নীচ চরিত্র' বলে বর্ণনা করেছিলেন, তখন সাইয়াদ আহমদ খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি লণ্ডনে ছিলেন (1869-70) এবং অনেক পরিশ্রমের পর 'কুতুবাৎ-ই-আহমাদিয়া' নামে একটি বই প্রকাশ করলেন স্যার উইলিয়াম মুরের কুৎসার বিরুদ্ধে। বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন সম্ভবতঃ তাঁর ছেলে সৈয়দ মাহমুদ। লণ্ডন থেকেই 1870 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং সাইয়াদ আহমদ-ই একমাত্র ভারতীয় যিনি হাণ্টারের 'ইণ্ডিয়ান মুসলমান' বইটির সমালোচনা করে একটি লেখা লিখেছিলেন। বইটি 1872 সালে ইংরেজি ও উর্দু এই দুই ভাষাতে প্রকাশিত হয়েছিল বেনারস থেকে।

সমসাময়িক আরও অনেক হিন্দু মুসলমানের মত সাইয়াদ আহমদও ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রয়োজনীয়তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে তখনকার সবচাইতে বেশি রাজনৈতিক সচেতনতা হল সেটাই যখন কেউ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রভুদের বিশ্বস্ত হবে। এই কারণে 1886 সালে 10 মে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সংস্থা প্রধানত ভারতের ব্রিটিশ রাজত্বের সমর্থনেই তৈরী হয়েছিল। তিনি চাইতেন না যে ভারতীয়রা এমন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন করুক যার মধ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহাত্মক' কোন বীজ সুপ্ত থাকে। শুধুমাত্র এই কারণে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তীব্র বিরোধী ছিলেন। 1888 সালের 12 আগষ্ট তিনি প্রভাবশালী কিছু হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়ে 'ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করলেন। এই সংস্থার মাসিক চাঁদার হার ছিল পাঁচ টাকা, যা তখনকার পক্ষে যথেষ্ট বেশি। এই সংস্থা, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করেছিল তার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের মানুষকে সচেতন করার জন্য এবং ভারতবর্ষের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিবহাল করার জন্য পুস্তিকা, প্রচারপত্র ইত্যাদি বিলি করত। শীঘ্রই এই সংস্থা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। সংস্থার যিনি সহ-সম্পাদক ছিলেন—রাজা শিব প্রসাদ, তিনি সংস্থাকে হিন্দু আর মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়গত ভাবে ভাগ করার প্রস্তাব আনলেন। তিনি বললেন এই দুটি শাখা 'অঞ্জুমান-খাইরক্‌-ওয়াহান মুলক্‌-ই-হিন্দ' বা ইণ্ডিয়ান লয়্যাল অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি কেন্দ্রীয় শাখার অধীনে থাকবে। সাইয়াদ আহমদ এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন না। শিব প্রসাদ 1880 সালের 23 নভেম্বর আর একটি প্রস্তাবে বললেন যে কংগ্রেস নেতাদের যাতে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করে তার জন্য সরকারের কাছে দরবার করা হোক। সাইয়াদ আহমদ এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করায় সংস্থা ভাগ হয়ে গেল। তিনি 'দি ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়ট্রিক অ্যাসোসিয়েশন'—এই নতুন নাম দিয়ে সংস্থাটিকে পুনর্গঠিত করলেন।

সাইয়াদ আহমদের বিশ্বাস ছিল ভারতে বহু জাতি ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের পাশাপাশি অবস্থানের জন্য ভারতীয়রা এখনও স্ব-শাসনের উপযুক্ত হয়নি। একথা সত্য যে একজন ভারতীয় হিসেবে তাঁর গর্ববোধ থাকলেও—মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে তিনি যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন,—এই দুঃখ বহুবার বহু জায়গায় প্রকাশ করেছেন। নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি মমত্ববোধ তাঁর বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল যে রাজনীতি করাটা মুসলমানদের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকারক হবে, সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজদের প্রতিশোধ নীতি এবং পরবর্তী কালে মুসলমানদের সম্পর্কে ইংরাজদের নব-জাগ্রত আগ্রহ এই সব অভিজ্ঞতা মিলিয়েই তাঁর এই বিশ্বাস জন্মে ছিল। অল্প কিছু সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তিদের হাতেই সব রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকা উচিত এই ছিল সাধারণভাবে সাইয়াদ আহমদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই মতবাদ কংগ্রেসের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং এই কারণে এই মতবাদ "হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যে

প্রথমে ভারতীয়"—এই চিন্তাধারার থেকেও তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

[Eminent Mussalmans —(Biographical Essay on Sir Syed), G. A. Natesan & Co., Madras ; The Life and Work of Sir Syed Ahmad Khan—by G. F, I. Graham ; Biography of Sir Syed Ahmad Khan—(in-Urdu) ; Encyclopaedia of Islam ; Fikro-o-Nazar—Documents on Aligarh Movements—Documents on Scientific Society, A. M. Univ. Pubn., 1963 ; British Indian Association, 1869, Nos. 5 & 6 ; On Present State of National Affairs—by Sir Syed Ahmad ; Strictures upon the Present Educational System in India—by Sir Syed Ahmed Khan ; Aligarh Institute Gazette, 1870 ; M. A. O. College Annual Report, 1910-11 ; Britain in India—by R. P. Masani ; Communal Triangle—by Mehta & Patwardhan ; India's Hindu Muslim Question—by Beni Prasad ; Muslim Politics in India—by B. M. Chaudhuri ; India Divided—by Rajendra Prasad ; Problem of Minorities in India—by B. R. Ambedkar .]

(এল. দেওয়ানি) মুশিরুল হক

আহমাদ, জিয়াউদ্দিন (স্যার)—(১৮৭৮-১৯৪৭)
Ahmed Ziauddin (Sir)—(1878-1947)

1878 সালে জিয়াউদ্দিন আহমাদ মীরাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক ভিটা ছিল উত্তর প্রদেশের ইটা জেলার মারেহরা শহরে। তাঁর পিতা হাফিজ মৈনুদ্দিন ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেটের একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। জিয়াউদ্দিনের শৈশব দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। মাদ্রাসায় প্রাথমিক ফার্সী এবং ধর্ম গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু পাঠগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। অধ্যয়নশীল প্রকৃতি ও বুদ্ধিমত্তা উভয়ের সমন্বয়ের ফলে পিতার সাহায্য ছাড়া স্বোপার্জিত বৃত্তির দ্বারাই স্বাধীনভাবে এম. এ. ও. কলেজ থেকে স্নাতক হন। স্নাতক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য অধ্যক্ষ থিওডর মরিসন তাঁর নাম ডেপুটি কালেকটারের পদে মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং এম. এ. ও. কলেজে গণিতের শিক্ষক পদের জন্য সাইয়াদ আহমাদ খানের নিকট আবেদন জানান। তিনি যখন নিয়োগপত্রে তাঁকে সই করতে বলেন, জিয়াউদ্দিন তৎক্ষণাৎ জবাব দেন—"মহাশয়, আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করব।" তাঁর এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রচ্ছন্ন ছিল। অভিভূত বৃদ্ধ মানুষটির হাত থেকে তখন নিয়োগপত্রটি খসে পড়ে যায়।

তিনি তাঁর যোগ্যতার মান উন্নয়নের জন্য 1901 সালে ডি. এস. সি.-এর মতো দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। ঐ একই বছর তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অনার্স ডিগ্রীর জন্য 'স্টেট স্কলারশিপ' সংগ্রহ করেন এবং মহামান্য আগা খান প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যে বিদেশ যাত্রা করেন। দুই বছর পর শিক্ষাক্রম সমাপনান্তে তাঁকে "ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি অফ লণ্ডন"-এর সদস্য এবং "ফেলো অফ দি রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি" মনোনীত করা হয় এবং আইজ্যাক্ নিউটন স্কলার হিসেবে কেম্ব্রিজে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। 1904 সালে তিনি ইউরোপের অপর প্রান্তে গিয়ে গটিনজেন থেকে পি. এইচ-ডি. করেন। তিনি প্যারিসেও কিছুকাল ছিলেন এবং ইটালীর বোলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক জ্যামিতি অধ্যয়ন করেন। ইউরোপের সকল খ্যাতিমান গণিতজ্ঞের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং উচ্চতর স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ তাঁর ছিল। সুযোগ সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও শুধু গবেষণা করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। ভারতে তাঁর জন্য সম্পূর্ণ এক নতুন জগৎ অপেক্ষা করে ছিল। বিদেশে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের পথ অনেকখানি সুগম করেছিল।

1907 সালে তিনি আলিগড়ে তাঁর পুরানো কাজে ফিরে যান এবং 1907 সালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এ "স্যাডলার কমিশন" স্থাপিত হয় তাঁর দুজন ভারতীয় সদস্যের একজন হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করা হয়। অপর সদস্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর এই প্রবীণ বিদগ্ধ ও দেশপ্রেমী সহকর্মী বঙ্গদেশের শিক্ষাবিস্তারকল্পে যে ধ্যানধারণা

মনে মনে পোষণ করতেন তাঁর সাহচর্যের ফলে জিয়াউদ্দিন সেই নীতি ও আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর একান্ত কামনা ছিল যে ভারতের প্রতিটি মুসলমান-গৃহে অন্ততঃ একজন সদস্যও স্নাতক হবেন।

1919 সালে তিনি এই আদর্শ রূপায়ণের সুযোগ পেলেন। এই বছর কলেজের অধ্যক্ষ এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ইস্তফা দিলে কলেজ ট্রাস্টি বোর্ড জিয়াউদ্দিনের উপর এই গুরু দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন। এক নতুন যুগের সূচনা করবেন এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে জিয়াউদ্দিন অধ্যক্ষ পদে আসীন হন। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই তিনি এক অপ্রত্যাশিত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। যার ফলে কলেজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে ওঠে। এই সময় মৌলানা মহম্মদ আলি এবং খিলাফৎ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গান্ধীজি আলিগড়ে এসে উপস্থিত হন এবং একে কেন্দ্র করেই অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সরকারী সাহায্য প্রত্যাখ্যান এবং ইংরেজী শিক্ষাবর্জন। মৌলানা মহম্মদ আলি স্থির করেছিলেন যে যত শীঘ্র সম্ভব এই কলেজটিকে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-এ পরিণত করবেন। এই সময় দেশের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মুসলমান নেতৃবৃন্দ আলিগড়ে সম্মিলিত হয়েছিলেন। জিয়াউদ্দিন অসাধারণ কৌশল এবং সাহসের সঙ্গে এই সংকট উত্তীর্ণ হলেন।

1920 সালের ডিসেম্বর মাসে যখন মুসলিম ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট কার্যকর হয় তখন ডঃ আহমাদ প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। কিন্তু 1928 সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য তত্ত্বাবধানার্থে গঠিত রহমতুল্লা কমিশনের সুপারিশে এই পদে তিনি ইস্তফা দেন। 1935 সালে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। 1947 সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন। ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে তিনি লণ্ডনে পরলোকগমন করেন। তিনি সেই সময় তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মেডিকেল কলেজ পরিকল্পনা' সংক্রান্ত ব্যাপারে লণ্ডনে গিয়েছিলেন।

সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ্ অ্যাসেম্বলীর একজন সদস্য হিসেবে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে গৃহীত হত—বিশেষতঃ রেলপথ, মুদ্রা, বাণিজ্য এবং আর্থিক বিষয়ে। 1930 সালে নির্দলীয় হিসেবে 'হাউসে' নির্বাচিত হন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। 'Systems of Education', 'Systems of Examination', 'Indian Railways', প্রভৃতি বই তিনি লেখেন। 'Elliptic Functions' তাঁর রচিত একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ।

[Mohammad Noman—Muslim India : Rise and Growth of the All India Muslim League, Allahabad, 1942 ; Indian Annual Register, 1936-1939 ; The Indian Year Book ; Who's Who in India, 1934-1944 ; Indian Legislative Assembly Debates, 1930-47 ; Calcutta University Commission (1917-19) Report, 1919.]

নবি হাদি

আহমদ, সৈয়দ সুলতান (স্যার) (১৮৮০-১৯৬৩)
Ahmad, Sayyid Sultan (Sir) (1880-1963)

1880 সালে 24 ডিসেম্বর সৈয়দ সুলতান আহমদ পাটনা জেলার আলিনগরপল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ খৈরাত আহমদ। তিনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র। শিয়া মতাবলম্বী, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত জমিদার পরিবারে সুলতান আহমদের জন্ম হয়। গয়ার আদালতে তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা উভয়েই স্বনামখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। তাঁর পিতার রাজনৈতিক জীবনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। 1897 সালে সুলতান আহমদ গয়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পাটনা কলেজে দুই বৎসরাধিক পড়াশোনা করেন। 1902 সালে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন এবং গ্রে'স ইনএ ভর্তি হন। 1905 সালে তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করেন। ঐ বৎসরই দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন প্রথমে কলকাতায় (1905-15) এবং পরে পাটনা হাইকোর্টে।

1900 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি তাঁর আত্মীয়া (সম্পর্কে ভগিনী) বিবি তাসলিমানকে বিবাহ করেন। কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাজমুল হাসানকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। বহুবিধ কার্যে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন—আইন, সংবিধান, শিক্ষা এবং রাজনীতি। তবে প্রথম দুটি ক্ষেত্রেই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হন এবং অবশ্যই পদাধিকার বলে।

1919-20 সালে তিনি পাটনা হাইকোর্টের

বিচারপতি হন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রথম ভারতীয় উপাচার্য (1923-30)। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে তিনি অংশ গ্রহণ করেন (1930-31) এবং 1937 সালে রাজপ্রতিনিধির কার্যনির্বাহক পরিষদের (রেল ও বাণিজ্য) সদস্য হন। পদাধিকার বলে তিনি ভারত সরকারের উপর কিছু পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেন। ফলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক রাজ্যপালের বিবেচনামূলক ক্ষমতার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয় এবং দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার থাকবে না বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। এর ফলে রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন সহজ হয়। পরের বছর তিনি লীগ অফ নেশনসে ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন। 1938 সালে পার্মানেণ্ট কোর্ট অব ইণ্টারন্যাশনাল জাস্টিসের (হেগ) অস্থায়ী শূন্য পদের জন্য তিনি মনোনীত হন এবং পরবর্তী বছর নির্বাচন হওয়ার প্রকৃতই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ায় নির্বাচন স্থগিত হয়। 1940 সালে তিনি 'যুদ্ধ কমিটি'র সদস্য হন। মিত্র পক্ষকে তিনি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং কিছু কিছু ভারতীয় নেতার মিত্রপক্ষের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সমালোচনা করেন। 1941 সালে তিনি ভারত সরকারের আইন সদস্য রূপে নিযুক্ত হন। 1945 সালে পদত্যাগ করে তিনি চেম্বার অফ প্রিন্সেসের পরামর্শদাতা পদে নিযুক্ত হন (1947)। অবশেষে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁকে 'নিগোশিয়েটিং কমিটি'র সদস্য পদে নিযুক্ত করেন হায়দ্রাবাদের ভারত-ভুক্তি সম্পর্কে আলোচনার নিমিত্ত। এই নাটকীয় ঘটনার প্রধান অংশ গ্রহণকারীদের ভূমিকা সম্বন্ধে খুব বেশী জানা যায় না, তবে এটা সত্য যে ভারত-ভুক্তির সপক্ষে স্যার সুলতান যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন।

1948 সালে স্যার সুলতান পাটনা প্রত্যাবর্তন করে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। 1963 সালে 27 ফেব্রুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং পলিতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

সরকারি চুক্তিবদ্ধ কাজের মধ্যেও তিনি 'রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশান কমিশন' (1922) এবং 'হার্টগ কমিশন অন এডুকেশানে'র সদস্য নিযুক্ত হন। 1932 সালে তিনি 'মহামেডান এডুকেশান কমিটি'র সভাপতি হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মুল্লার 'মহমেডান ল' নামক গ্রন্থের দুটি খণ্ডের সম্পাদনা করেন (1951-1961)। 1944 সালে তিনি 'এ ট্রিটি বিট্যুইন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড দি ইউনাইটেড কিংডম' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি দেশবিভাগের বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন।

তিনি 1927। সালে 'নাইট' উপাধি এবং 1945 সালে কে. সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন। 1931 সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজক 'ডক্টর অফ ল' উপাধিতে ভূষিত করে।

স্যার সুলতান সর্বদা আন্দোলনমূলক রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছেন, "জাতিগত ও রাজনীতিগতভাবে আমরা সকলেই ভারতবাসী, একই পরিবেশে আমরা বাস করি ও একই জমিতে চাষ করি। একই ঐতিহ্যময় পুরাতন সভ্যতার আমরা গর্বিত উত্তরাধিকারী"। (সমাবর্তন ভাষণ, আলিগড় 1940)। সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার অসারতা ও দ্বি-জাতি তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচিত করে তিনি বলেন, "সাম্প্রদায়িকতাবাদ সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল এর প্রকৃতিগত অস্বাভাবিকতা, এটিকে ধর্মীয় সমস্যারূপে গণ্য করা হচ্ছে অথচ এর লক্ষ্য হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা। ধর্মীয় সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে আমরা ইচ্ছুক অথচ যে সুযোগ গ্রহণ করতে আমরা সচেষ্ট হচ্ছি তা একান্ত পার্থিব। অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখা দিচ্ছে, ধর্ম ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে।" (টু লেকচারস্ অন মহাত্মা গান্ধী, পাটনা, এপ্রিল 1948)। হিংস্র আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ ক্ষতিকারক, বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারার বিকাশ হওয়া একান্তই উচিত। শিল্প প্রসারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি সরকারের সমালোচনা করেন এবং এই ক্ষেত্রে অতীতে যে সামান্য প্রচেষ্টামাত্র করা হয়েছে তার উল্লেখ করেন। পাটনার 'হিন্দুস্থান সাইকেল ফ্যাক্টরি'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন।

স্যার সুলতান ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া ব্যাপকরূপে পরিভ্রমণ করেন। পাশ্চাত্যের উদার ভাবধারায় তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং ভারতীয় মুসলমান সমাজে সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হন। পর্দা প্রথার নিবারণ ও নারী শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি আবেদন জানান।

স্যার সুলতানের দৈহিক উচ্চতা ছিল মাঝারি, এবং গায়ের রং কালো। উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী সুলতান তদনুযায়ী বেশভূষা করতেন ও সাহেবী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত

জীবনে ও গৃহে ভারতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ণ ছিল—অবশ্যই তাঁর পত্নীর প্রভাবে ও ব্যক্তিত্বে।

[Sahay, I—The Makers of Modern Bihar ; Verma, S. N.—Sir Syed Sultan Ahmad (in Hindi) ; Who's Who in Bihar & Orissa—ed. C. S. Ram Nathan. Who's Who in India, Burma & Ceylon, 1940 ; The Golden Year Book of India, 1939-40 ; Indian Annual Register, Vol. II, 1930, 1940 ; Hindusthan Review, Patna, January 1905 & December 1948, The Searchlight, Patna, 30 December 1944, 28 February 1963 ; The Nusrat (an Urdu monthly magazine, Lahore, Pakistan), June 1963, contains a biographical Account of Sir Sulthan by Ahaullah Palvi.]

(রামেশ্বর প্রসাদ) কেয়ামুদ্দীন আহমদ

আহমদ উল্লাহ্ শাহ্ (মৌলভী) (১৭৮৭/৮৯-১৮৫৮)

Ahmad Ullah Shah (Moulvi) (1787/89 1858)

আর্কটের সুন্নি মুসলিম নবাব পরিবারে জন্ম, আহমদ আলী ওরফে জিয়াউদ্দিনের। তবে তিনি ফৈজাবাদের মৌলভী নামেই জনপ্রিয়। চিন্নাপতনের (মাদ্রাজ) নবাব গোলাম হুসেন খান ছিলেন তাঁর বাবা এবং মুহম্মদ আলী যিনি 1751 সালে আর্কট আক্রমণ করেন, তিনি ছিলেন তাঁর দাদু। তাঁর জন্ম সাল অনিশ্চিত—হয় 1787 অথবা 1789। তাঁর ছেলেবেলা সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছুই জানা যায় না। অল্প বয়সে সুন্নি ঈশ্বরতত্ত্ব পাঠ সমাপন করে তিনি সৈনিক হওয়ার জন্য তালিম নেন এবং সামান্য কিছু ইংরাজি শেখেন। ষোল বছর বয়সে মাদ্রাজ ছেড়ে হায়দ্রাবাদ চলে যান এবং সেখানে গিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সেখান থেকে তিনি লণ্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ফিরে আসার পথে তিনি ইরাক এবং ইরানের মধ্য দিয়ে মক্কা এবং মদিনা ভ্রমণ করে আসেন।

তাঁর চরিত্র গঠনে সুফিবাদ এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমে তিনি কুরবান আলী শাহ নামে এক দরবেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তারপর হেরার শাহ কাদেরী নামে আরেকজনের কাছ থেকে পথ নির্দেশ নেন। ইনি তাঁকে খলিফা ঘোষণা করেন এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে আদেশ করেন। জামিয়াত-উল-উলেমা নামে এক সংগঠন গঠন করা ছিল এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রথম ধাপ। তারপর আগ্রা ত্যাগের নির্দেশ এলে তিনি 1856 সালের নভেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে গিয়ে জেহাদ প্রচার করেন। এই ঘটনা ঘটে অযোধ্যা দখলের স্বল্পকাল পরেই এবং এর ফলে তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়। 1857 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ফৈজাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সেখানে তাঁর কার্যকলাপের জন্য তাঁকে ব্রিটিশ পুলিশ এবং সিপাহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হয়। ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে গুরুতর চক্রান্ত সংগঠনের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কিছু চিঠিপত্র উদ্ধার হওয়ার ফলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু এই দণ্ডাদেশ কার্যকরী হওয়ার আগেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। (জুন 10,1857)। বিপ্লবীরা মৌলবীকে জেল্ থেকে বার করে নিয়ে আসে এবং তাদের নেতা বলে স্বীকার করে নেয়। যেহেতু আন্দোলনটির নির্দেশনা এবং পরিকল্পনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় স্থান প্রয়োজন ছিল, সেজন্য তিনি রাজা মান সিং-এর হাতে ফৈজাবাদের ভার দিয়ে নিজে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে লক্ষ্ণৌ রওনা হয়ে যান। পথিমধ্যে চিনহাটে (লক্ষ্ণৌ থেকে সাত মাইল দূরে) ব্রিটিশের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ বাঁধে (30 জুন 1857) এবং সেখানে তিনি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে নিদারুণভাবে পরাজিত করেন। তারপর 1 জুলাই তিনি লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি (বেইলী-গার্ড) আক্রমণ করলে কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। সেখানে অযোধ্যার চীফ কমিশনার আহত হয়ে পরে মারা যান। তিনি 87 দিনের জন্য রেসিডেন্সীতে অবরোধ করে রাখেন এবং আউটরাম প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলে তাঁকে রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তৃতীয় লড়াইটা হয় আলামবাগে (লক্ষ্ণৌ) 23 ডিসেম্বর 1857 এবং সেখানে বিরাট ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত হন। চতুর্থ সংঘর্ষটি ঘটে কাইজারবাগে (লক্ষ্ণৌ) যখন সৈন্যাধ্যক্ষ কলিন ক্যাম্পবেল এবং হোপ গ্রাণ্ট তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করেন। সাংঘাতিক লড়াই হয় এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর

পরাভব ঘটে যদিও তিনি অনুকরণযোগ্য সাহস প্রদর্শন করে সবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। আহমদ-উল্লাহ আত্মিক এবং পার্থিব কর্তৃত্বের উৎস হিসাবে নিজেকে 'খলিফৎ উল্লাহ' ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর মাথার জন্য পুরস্কার ধার্য করেন 50 হাজার টাকা। লক্ষ্মৌর পতনের পরও মৌলভী রোহিলখণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। তিনি শাহজাহানপুর দখল করেন এবং মোহামদী (লখিমপুর জেলা) থেকে তাঁকে সরানো সম্ভব হয় নি। অবশেষে তিনি পাওয়াই (শাহজাহানপুর জেলা) পেঁছান সেখানে তিনি তাঁর একজন বিশ্বস্ত স্থানীয় রাজার বিশ্বাসঘাতকতায় 1858 সালের 15 জুন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে অযোধ্যার স্বাধীনতা আন্দোলনের অধ্যায় শেষ হল।

মৌলভী আহমদ উল্লাহ্ শাহ ছিলেন সাধু এবং সৈনিকের এক বিরল সমন্বয়। তিনি অসাম্প্রদায়িক পথে বিপ্লবী কার্যকলাপ সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ করে-ছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক নজীরহীন স্বার্থত্যাগ ও বীরত্বের সঙ্গে মৃত্যুকে উপেক্ষা করার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আহম্মদ উল্লাহ্ ছিলেন সুপুরুষ-দীর্ঘ আকৃতি, সুগঠিত দেহ, তাঁর চক্ষু বিশাল ও গভীর। তাঁর আকৃতিতে আভিজাত্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। অযোধ্যার বিদ্রোহের তিনি ছিলেন মূল নেতা। "উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ডে তাঁর ভ্রমণ এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতার ফলেই অযোধ্যায় প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয়।"

[Sir Colin Campbell :—Narrative of the Indian Revolt from its Outbreak to the Capture of Lucknow (London: 1858); Hope Grant :—Incidents in the Sepoys War, 1857-58 (London : 1863) ; Charles Ball :—The History of the Indian Mutiny, in two Volumes (London) ; Kaye and Malleson :—History of the Indian Mutiny of 1857-58, Vols. II (1879), Vol. IV (London : 1898), Vol.—V (London : 1898) ; Mcleod Innes :—The Sepoy Revolt (London : 1897). G. B. Malleson :—The Indian Mutiny of 1857 (London : 1891) ; Kamaluddin : Sawanehat-Salatin-Auadh ; Vol.—II (Lucknow) ; Najmul Ghani Khan :—Tarikh-i-Amadh, Vol.—V (Lucknow, 1919) ; Mohammad Abrar Husain Farooqi :—Tazkira-i-Maulana Ahmad Ullah Shah Sahid Yani Maqsir-i-Dilawari (Hardoi : 1966) ; V. D. Savarkar .—The Indian War of Independence, 1857 (Bombay : 1947) ; R. C. Majumdar .—The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857 (Calcutta) : 1957) ; Freedom Struggle in Uttar Pradesh, Vol.—II (Lucknow) ; Sangharsh Kalin Nebuon Ki Jeevaniyan, Bhag I (Lucknow : 1957) ; S. N. Sen :—Eighteen Fifty seven (Delhi : 1957) ; Rebellion 1857, a Symposium edited by P. C. Joshi (New Delhi : 1957) ; Ashoka Mehta : 1857, the Great Rebellion (Bombay) ; Ra's Ahmad Jafar —Najid Ali Aur Unka Ahed (Lahore : 1957), Michael Edwardes :—Battles of the Indian Mutiny (London : 1969) ; Intizam Ullah Shahabi :—East India Company Aur Baghi Ullema (Delhi) ; Ghadar Ke Chand Ullema (Delhi).]

মনতোষ সিং সফী আহমেদ

আসফ আলি (১৮৮৮-১৯৫৩)

Asaf Ali (1888-1953)

1888 সালের 11 মে দিল্লীতে এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে আসফ আলি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন উত্তর প্রদেশের বুলন্দ-শায়ের জেলার এক বিশিষ্ট জমিদার। এই পরিবারের দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, এবং বালক আসফ আলিকে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য দিল্লীর অ্যাংলো-অ্যারাবিক হাইস্কুলে পাঠান হয়। এখানে তিনি একদিকে সনাতন ইসলামিক রীতির শিক্ষা পদ্ধতি এবং অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-ধারার সঙ্গে পরিচিত হন। অ্যাংলো—অ্যারাবিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি

মিশন পরিচালিত দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেনস্ কলেজে ভর্তি হন।

সেণ্ট স্টিফেনস্ কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 1909 সালে তিনি লণ্ডনে যান এবং লিঙ্কন্‌স্ ইন-এ যোগ দেন। 1912 সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ব্যারিস্টার হন। পরবর্তী দুটি বছর তিনি ইংলণ্ড এবং ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে পরিচিতি এবং এর ফলে লব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তে 1914 সালে আসফ আলি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লী হাইকোর্টে তিনি আইনবিদরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং কতকগুলি স্মরণীয় বিচারের ক্ষেত্রে অভি-যুক্তের পক্ষ সমর্থন করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এগুলির একটি হল সণ্ডার্স হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ভগৎ সিং-এর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে পাঞ্জাব হাইকোর্টে পুনর্বিচারের প্রার্থনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে পরিচালিত হোমরুল লীগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করেই তিনি প্রথম ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তবে তাঁর সমসাময়িক আরো অনেক ভারতীয়দের মত তিনিও অচিরেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। 1918 সালে তিনি 'ভারত রক্ষা আইনে' বন্দী হন। বিচারে তিনি স্বয়ং বিশেষ দক্ষতা সহকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজের মুক্তি অর্জন করেন। তিন বছর পর 1921 সালে তিনি পুনরায় বন্দী হন। কিন্তু এবার বিচারে তিনি আঠারো মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি খেলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভারতীয় মুসলমানরা সে সময় দলে দলে খেলাফৎ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। গান্ধীবাদ এবং অসহ-যোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আসফ আলির ধারণা এত গভীর ও সুস্পষ্ট ছিল যে 1921 সালে তিনি 'কন-স্ট্রাকটিভ নন্ কো-অপারেশন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই বইটিকে যথার্থই গান্ধীবাদী রাজনৈতিক রণ কৌশলের ভাষ্য রূপে অভিহিত করা যায়। 1927 সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন এবং তিন বছর পর 1930 সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। ব্রিটিশ বিরোধী কার্য-কলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে আর একবার স্বল্পকালের জন্য কারাবরণ করতে হলেও তিনি ছিলেন অকুতোভয়। 1934 থেকে 1946 সাল অবধি তিনি সেণ্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে তিনি চিফ হুইপ, সেক্রেটারী জেনারেল এবং ডেপুটি লিডার রূপে কাজ করেছেন। অ্যাসেম্বলীর সভ্য থাকাকালীনই তিনি 1935 সালে দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে নির্বাচিত হন। এই পদে পুনর্নির্বাচিত হয়ে পরবর্তী দেড় দশকও তিনি ঐ সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদীরূপে আসফ আলি হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি রক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ভারতের অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। এরই পরি-প্রেক্ষিতে তিনি 1932 সালে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ও সংযোগ ঘটানোর উদ্দেশ্যে আহূত সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসাবে সেখানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। যাই হোক তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম-নিরপেক্ষতার খ্যাতি তাঁকে দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিটি নির্বাচনেই হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পরাজিত করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আবার তাঁকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা যায়। সে সময় তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং কংগ্রেস পরিষদ দলের সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ইংরেজদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোনরকম সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিণামে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রে প্ররোচনা দেবার অভিযোগে 1942 সালের আগস্ট মাসে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অন্যান্য সকল সদস্যদের সঙ্গে আসফ আলিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি অনির্দিষ্ট কালের জন্য আহমদনগর দুর্গে আটক থাকেন।

দুর্বিষহ কারাজীবনে আসফ আলির স্বাস্থ্যহানি ঘটায় গুরুতর পীড়িত অবস্থায় তিনি 1945 সালের মে মাসে মুক্তিলাভ করেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে আসফ আলি ভুলাভাই দেশাই-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির

সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিচালনাধীন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগদানকারী এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দেশদ্রোহীরূপে অ্যাখ্যাত ব্যক্তিদের সমর্থন করার জন্য উপরিউক্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল।

1946 সালে লর্ড পেথিক লরেন্স-এর নেতৃত্বে যে ক্যাবিনেট মিশনটি ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনার জন্য ভারতে আসেন কংগ্রেস দলের উচ্চ পর্যায়ের একজন সভ্যরূপে আসফ আলি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ঐ বছরের আগস্ট মাসে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবহন ও রেল দপ্তরের মন্ত্রীত্বপদ তাঁকে দেওয়া হয়। যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ভারতের সংবিধানের প্রণয়ন করে তারও তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নেহরু অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিশালী এবং মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্ররূপে আমেরিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল। এজন্য ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদটি অন্তর্বর্তী সরকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে। এই কারণে ভারত এবং আমেরিকার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার উল্লেখযোগ্য কাজে ভূমিকা নেবার জন্য আসফ আলিকে মনোনীত করা হয়। 1947 সালের ফেব্রুয়ারী থেকে 1948 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আসফ আলি ওয়াশিংটনে ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে প্রায়শঃই ভারতের হয়ে তিনি জাতিপুঞ্জে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

ওয়াশিংটনের ভারতীয় সম্প্রদায়ের এক অংশের কাছে তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ালে তাঁকে উড়িষ্যার রাজ্যপাল নিযুক্ত করে কটকে পাঠান হয়। 1948 জুন থেকে 1952 সালের মে মাস পর্যন্ত তিনি এই অবিতর্কিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে 1952 সালে তাঁকে সুইটজারল্যাণ্ডের বার্ন-এ ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। অস্ট্রিয়া এবং ভ্যাটিক্যানেও তিনি একই সঙ্গে ভারতের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় শান্তির দূত রূপে তিনি প্রয়োজনের সময় আহূত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ইউনাইটেড নেশন্‌সে প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু তাঁর কাজ বেশি দূর অগ্রসর হবার আগেই তিনি 1953 সালের 2 এপ্রিল অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে পরলোকগমন করেন। তাঁর মরদেহ বিমানে তাঁর প্রিয় শহর দিল্লীতে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে মহান দরবেশ হজরৎ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার স্মৃতিসৌধের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

1928 সালে অরুণা গাঙ্গুলির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রী অরুণা তরুণী হলেও নিজের ক্ষমতায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে শুরু করেন এবং শীঘ্রই নিজেকে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের কোনও সন্তানাদি ছিল না।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও আসফ আলি উর্দু, ইংরেজি ও হিন্দীতে গদ্য ও পদ্য রচনায় দক্ষ ছিলেন। কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রে লিখতেন। এর ফলে তাঁর যে অর্থাগম হত তা ছিল ব্যারিস্টারি পেশায় অর্জিত আয়ের অতিরিক্ত। 'কনস্ট্রাক্‌টিভ নন-কোঅপারেশন' গ্রন্থটি ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে তিনি একটি রিপোর্ট এবং উর্দুতে স্টালিনের জীবন নিয়ে কবিতা লেখেন। 1930-এর দশকের কোন এক সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের কারণ এবং তার অপসারণের বিষয় নিয়ে তিনি 'সাম আর্জেন্ট ইণ্ডিয়ান প্রবলেমস্' নামে আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। বাগ্মীরূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল অসামান্য।

আসফ আলি ছিলেন সুপুরুষ এবং সচেতন মানসিকতায় ভরপুর। অমায়িক প্রকৃতির এই মানুষটি বেশবাসে ছিলেন অতিশয় নিখুঁত। সেই বেশবাস গান্ধী টুপি বা আচকান সহ চুড়িদার পায়জামাই হোক অথবা তাঁর প্রথম জীবনে এক চক্ষুতে চশমা পরিহিত ভেনেশিয়ান বো-সহ এক সম্পূর্ণ পশ্চিমী পোশাকই হোক। তিনি সচরাচর চশমা ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং কোন সময়েই যথোচিত প্রত্যুত্তরের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হতো না।

এ্যাডভোকেট এবং জেরাকারীরূপে তিনি ছিলেন অনন্য। একনিষ্ঠভাবে আইন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারলে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন।

আদর্শ জীবন যাপনের মান নির্ণয়ের নিয়ামক হিসাবে তিনি বিগত যুগের সংস্কৃত ও মার্জিত রুচির সমর্থন করতেন। তাঁর আতিথেয়তা ছিল উদার এবং আন্তরিক। পরিশেষে এটুকুই বলা যায় যে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর গভীর আসক্তির ফলে আইন জগৎ একজন

মহান আইনজীবীকে, উর্দু কাব্য একজন প্রথম সারির কবিকে, সাহিত্য একজন সম্ভাবনাময় সাহিত্যিককে এবং সাংবাদিকতা একজন সাংবাদিককে হারিয়েছে। এর পরিবর্তে তিনি নিজে যা পেয়েছেন এবং যা তিনি দেশকে দিয়েছেন তা হল দ্বিতীয় সারির নেতৃত্ব এবং অপ্রীতিকর পরিবেশের প্রতিকূলতা থেকে ত্রাণলাভের কৌশল।

[Bharat Varsha Ki Vibhutiyan (Hindi) —ed by D. R. Toliwaal ; Indian National Congress : A Descriptive Bibliography—Jagadish Saran Sharma ; Indian Year Book & Who's Who—1947 (Times of India) ; Life Sketch of Mr. Asaf Ali—Pub. by the Municipal Corporation, Delhi ; Life Sketch by Mr. Juggal Kishore Khanna ; Interviews with Mrs. Aruna Asaf Ali and with Mr. Juggal Kishore Khanna (old colleague of Asaf Ali) by the Research Fellow.]

মনতোষ সিং **নূর-উদ্দিন আহমদ**

আসাদ্‌উল্লা খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯)
Asadullah Khan Ghalib (1797-1869)

আসাদউল্লা খান গালিব উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু ও ফার্সী কবি ও লেখক, 1797 সালের 27 ডিসেম্বর আগ্রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তুর্কী বংশজাত। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী সালজুক তুর্কী রাজাদের বংশধর বলে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। সালজুক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ধরলে সালজুক রাজারা মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন শাখায় ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েন। গালিবের প্রপিতামহ কুকান বেগ খান অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সালজুকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন। কিছু দিনের জন্য তিনি দ্বিতীয় শাহ আলমের দরবারে চাকুরী করেছেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ঐ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে জয়পুরের মহারাজার দরবারে আগমন করেন। দুই পুত্র ও তিন কন্যা নিয়ে তিনি দিল্লী থেকে আগ্রাতে তাঁর বসতবাটীটিও স্থানান্তরিত করেন। বড় ছেলের নাম ছিল আবদুল্লা বেগ খান। তিনি ছিলেন গালিবের পিতা। গালিবের মা ইজ্জত-উন-নিসা বেগম ছিলেন আগ্রায় অবসরপ্রাপ্ত সামরিক নেতা গুলাম হুসেন খানের কন্যা।

আবদুল্লা বেগ খান সামরিক বাহিনীতে প্রথমে যোগদান করেন অযোধ্যায় তারপর হায়দ্রাবাদের নিজামের অধীনে এবং সর্বশেষে আলোয়ারের শাসকের ফৌজে। 1802 সালে একটি কন্যা এবং দুটি পুত্র রেখে তিনি মারা যান। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আসাদ উল্লা খান। এই অবস্থায় আবদুল্লা বেগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নসরুল্লা বেগ খান পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইনি সিন্ধিয়ার সামরিক বাহিনীতে কাজ করতেন। জেনারেল পেরণ-এর অধীনে তিনি আগ্রা দুর্গের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় নসরুল্লা খান দুর্গটি সহ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে নিজেদের সামরিক বাহিনীতে 400 অশ্বারোহীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তাঁর মাসিক মাহিনা 1700/- টাকা। কিছু দিন পর নিজের ক্ষমতাবলে তিনি ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সোঙ্ক এবং সোন্সা নামক দুটি জেলা অধিকার করে নিলেন। ব্রিটিশ সরকার এই বিষয়টি অনুমোদন করে নসরুল্লা খাঁকে দুটি জেলার জায়গীরদার বলে মেনে নিলেন। নসরুল্লা খানের মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকার তাঁর পরিবারের জন্য মোটা পেনসন বরাদ্দ করেন। মহম্মদ মুয়াজ্জম ছিলেন সে সময়কার একজন নাম করা শিক্ষিত ব্যক্তি। তার অধ্যক্ষতায় পরিচালিত মক্তবে নসরুল্লা খানের ভ্রাতুষ্পুত্র গালিবের পড়াশুনা শুরু হয়। এখানে উচ্চাঙ্গের ফার্সী গদ্য রচনা ও কবিতা সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন। 1810 সালে আবদুর সামাদ নামে একজন পারস্য দেশীয় পর্যটক আগ্রায় আসেন। জন্ম সূত্রে তিনি ছিলেন জরথুস্ত্রের অনুগামী, পরে ইনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রায় দু'বৎসর তিনি গালিব পরিবারে বসবাস করেন। ফলে গালিবের সঙ্গে ফার্সী ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যালোচনার আসরও খুব জমে ওঠে। গালিবের পিতৃব্য নসরুল্লা বেগ খানের সঙ্গে ফিরোজপুর ঝিরকা এবং লোহারুর নবাব আহম্মদ বক্‌স খানের ভগ্নীর বিবাহ হয়েছিল। আহম্মদ বক্‌স খানের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং বিখ্যাত উর্দু কবি ইলাহী বক্‌স খানের কন্যা উমরাও বেগমের সঙ্গে গালিবের বিবাহ হয় (1810)। 1812 সালে আগ্রা পরিত্যাগ

করে গালিব স্থায়ী ভাবে বসবাস করবার জন্য দিল্লীতে চলে আসেন।

গালিবের শিক্ষালাভ ছিল অত্যন্ত এলোমেলো ধরনের। প্রথমে মহম্মদ মুয়াজ্জম এবং পরে আবদুস সামাদের কাছ থেকে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তারপর আর কোন কেতাবী শিক্ষা তিনি লাভ করেন নি। কিন্তু কেতাবী শিক্ষার অভাব তিনি দূর করেছিলেন নিজের চেষ্টায় ফার্সী ভাষায় লেখা বহু রচনার সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমে। সেইজন্য ক্রমে লোহারু পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ঘটায় দিল্লীর বিদ্বজ্জন সমাজে তিনি খুব সহজ ভাবেই স্থান করে নিয়েছিলেন। দিল্লীতে এ সময় ঘটেছিল বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সমাবেশ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মোমিন ও জৌক-এর মতো কবি, মুফতি সদরউদ্দিন ও ফজল হকের মত পণ্ডিত ব্যক্তি, আহসানুল্লা খান ও তফজ্জল হুসেন খানের মত রাষ্ট্রনেতা, মিঞা কালে নাসিরুদ্দিনের ন্যায় ধর্মপ্রবক্তা এবং আরো অন্যান্য অনেকে। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন আহম্মদ বকস্‌ খান ও ইলাহী বকস খানের প্রিয়বন্ধু। এঁদের সান্নিধ্য লাভ করে গালিব নিজের বিদ্যাবত্তার সমকক্ষতার অভাববোধ করেন, কিন্তু এই অভাবকে তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। নিজের চেষ্টায় ও অধ্যাবসায়ে পড়াশুনা করে তিনি অনতিকাল মধ্যেই দিল্লীর জ্ঞানী গুণী সমাজে নিজ অধিকার লাভ করেছিলেন। শুধু অন্যান্য জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজের সমকক্ষতাই তিনি লাভ করেন নি, এঁদের কারো কাছেই তিনি বশম্বদ হয়ে থাকেন নি। নিজের ক্ষমতা বলে তিনি দিল্লীর জ্ঞানী গুণী মহলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকারে সক্ষম হয়েছিলেন।

1806 সালে পিতৃব্য নসরুল্লা খান মারা গেলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পেনশন নিয়ে গালিব পরিবারের প্রচণ্ড বিবাদ বাধে। প্রথমে মৃত নসরুল্লা খানের পরিবারের জন্য ব্রিটিশ সরকার বার্ষিক 10,000 টাকার পেনশন মঞ্জুর করেন। নবাব আহম্মদ বকস্‌ খান এই পেনশন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু পরে অজ্ঞাত কারণে পেনশনের হার 10,000 থেকে কমিয়ে 5,000 করা হলো। গালিবের ভাগ্যে জুটলো মাত্র 750 টাকা। নবাব আহম্মদ বক্‌স খানের কাছ থেকে তিনি অতিরিক্ত কিছু মাসোহারা পেতেন। কিন্তু যেরূপ বিলাসী জীবনে গালিব অভ্যস্ত ছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে সংসার জীবন যাপন করা ক্রমশঃ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। যখন তিনি জানতে পারলেন যে লোহারুর নবাবের হস্তক্ষেপের ফলে পারিবারিক পেনশনের মাত্রা দশ হাজার থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার করা হয়েছে তখন গালিব প্রতিকারের জন্য কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন (1826)। মোকদ্দমা তদারকী করার জন্য দীর্ঘপথ পেরিয়ে 1828 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গালিব পৌঁছুলেন কলকাতায়। লোহারুর নবাবের বিরুদ্ধে এই মামলার রায় শেষ পর্যন্ত গালিবের অনুকুলে হয়নি।

এই সময় থেকে নবাব আহম্মদ বক্‌স খান অনিয়মিতভাবে হলেও যে আর্থিক সাহায্য গালিবকে দিতেন তাও বন্ধ হয়ে গেল। ফলে গালিব চরম আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। এই দুর্দিনে গালিবের সাহায্যে এগিয়ে এলেন দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের দুজন প্রভাবশালী পার্ষদ উজীর হাকিম আসানুল্লাহ্‌ খান এবং ধর্মোপদেষ্টা মিঞা কালে নাসিরুদ্দিন। বাদশাহ নিজে ছিলেন কাব্য অনুরাগী। পর্ষদদের কথায় বাদশাহ-গালিবকে তৈমুর বংশের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দিলেন। এই কাজের জন্য গালিবকে প্রতি বৎসর 600 টাকা বৃত্তি হিসাবে দেওয়া হবে বলে স্থির হলো। বাদশাহ এছাড়া গালিবকে বাদশাহী সম্মানে ভূষিত করলেন। তাঁর নতুন পরিচয় হলো নাজমউদ্দৌলা দিবির-উল-মুলক নিজাম জঙ্গনামে (জুলাই, 1850)। চার বছর পর রাজকবি পরলোক গমন করলে বাদশাহী নির্দেশে গালিব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন (1854)।

গালিবের এই স্বাচ্ছন্দ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। দিল্লীতে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখা গেল চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা তখন থেকেই গালিবের পেনশন বন্ধ হয়ে গেল। তিন বৎসর পর রামপুরের নবাবের হস্তক্ষেপের ফলে এই পেনশন পুনঃ প্রবর্তিত হয়। নবাব নিজে ছিলেন গালিবের গুণগ্রাহী। তিনি নিজেও তাঁকে প্রতি মাসে একশো টাকা মাসোহারা দিতেন। তবু গালিবের অর্থাভাব দূর হয়নি। জীবনের শেষ কটি বছর তাঁর অতিবাহিত হয়েছিল নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে। তাঁর আয়ের তুলনায় ব্যয় ছিল অনেক বেশী। ফলে ঋণের বোঝা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। আর্থিক অভাব অনটনের সঙ্গে যুক্ত হলো শারীরিক আধি ব্যাধি। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে 1869 সালের 15 ফেব্রুয়ারী তাঁর দেহান্ত ঘটে। তাঁকে কবরস্থ করা হয় নিজামউদ্দিন এলাকায়।

এখানে রয়েছে 1956 সালে গালিব সমিতির উদ্যোগে নির্মিত একটি মর্মর সমাধি মন্দির।

উর্দু ও ফার্সী উভয় ভাষায় গালিবের রচনা সমূহ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি বলে গণ্য করা যায়। প্রায় 5,000 হাজার উর্দু কবিতা তিনি লেখেন। এদের মধ্যে থেকে বাছাই করা প্রায় 2000 কবিতা নিয়ে তার একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়। তাঁর লিখিত পত্রাবলীও পুস্তকাকারে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উর্দু অপেক্ষা ফার্সী ভাষায় তিনি বেশী লিখতেন। '11,000 এরও বেশী কবিতার রচয়িতা তিনি। 'পঞ্জআহ্' (ফার্সী ব্যাকরণ ও ভাষা তত্ত্ব) 'মির-ই-নিমরোজ' (মুঘল-ইতিহাস-প্রথম খণ্ড) দস্তানবু (সিপাহী বিদ্রোহের কিছু ঘটনা), কাতি বুরহান (বিখ্যাত ফার্সী বুরহান-ই-কাতির সমালোচনা) তাঁর অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক কীর্তি।

উর্দু গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের জগতে গালিব ছিলেন অগ্রদূত। যদিও সাহিত্যের গতানুগতিক ধারাকে তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি, তবু অনেক বিষয়ে তিনি ছিলেন নতুন পথের দিশারী। ফার্সী কায়দা অনুসরণ করে রচিত উর্দু কবিতা ছিল কল্পিত প্রেম, মদ ও অবাস্তব চিন্তাধারার মধ্যে সংবদ্ধ। গালিব তাকে মানুষের জীবন মরণের দিকচক্রবালের মধ্যে, আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের আবর্তে, অকৃত্রিম ঈশ্বরের একমেব অদ্বিতীয়মের অস্তিত্বের মধ্যে এনে মুক্তি দেন—এখানেই মহামতি গালিব আসাদুউল্লাখান শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি।

ফার্সী ভাষায় রচনাগুলিও তাঁর স্বকীয়তার দাবী রাখে।

[Mohammad Husain Azad—Ab-i Hayat, Lahore ; Altaf Husain Hali—Yadgar-i Ghalib, Aligarh, 1930 ; Ghulam Rasul Mihr—Ghalib, Lahore, 1946 ; S. M. Ikram—Hayat-i Ghalib, Lahore ; Malik Ram—Zikr-i Ghalib, Delhi, 1964.]

মনতোষ সিং **মালিক রাম বাভেজা**

আশুতোষ কালী (১৮৯১-১৯৬৫)

Ashutosh Kali (1891-1965)

1891 সালে ফরিদপুর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত) পালং থানার অধীন বিলাসখান গ্রামে বিপ্লবী ও অনুশীলন সমিতির একজন প্রথম সারির নেতা আশুতোষ কালী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র কালী। ভাই বোনদের মধ্যে আশুতোষ সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। পালং স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সিলেটের মুরারী চাঁদ কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখানে তিনি অধ্যাপক সুরেন্দ্র কুণ্ডুর সঙ্গে বসবাস করতেন। সুরেন্দ্র কুণ্ডু অনুশীলন সমিতির প্রধান সদস্য ছিলেন। এই সময় আশুতোষের মনে এক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়—বিদ্যাভাস করবেন, না, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে পুরোমাত্রায় নিয়োজিত করবেন। দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি এগিয়ে আসেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ-এর দলীয় কাজকর্ম দেখাশুনা করবার জন্য আশুতোষকে বিশেষ ভার দেওয়া হয়। এরপর দলের নির্দেশে তিনি উত্তরপ্রদেশে যান। সেখানে কর্মী হিসাবে তিনি লাভ করেন রাজেন লাহিড়ীর মতো সাহসী ও উদ্যোগী যুবককে। পরবর্তীকালে লাহিড়ী কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার ফলে আশুতোষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এক সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইন অনুসারে আশুতোষকে এলাহাবাদে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দীর্ঘকাল এলাহাবাদ দুর্গ ও আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হয়। সেখানে তাঁর উপর পুলিশ অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন করে এবং তাঁকে সেখান থেকে কলকাতার কিড ষ্ট্রীট পুলিশ থানায় আনা হয়। যদিও এখানেও তাঁকে শারীরিক পীড়া দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা সম্ভব হয় নি।

অনুশীলন সমিতির সদস্য হিসেবে আশুতোষ একদিকে সাহস, সংযম, দৃঢ়তা ও অন্যদিকে এক উন্নত মানের চারিত্রিক উৎকর্ষতা লাভ করেছিলেন যার ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। এর ফলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কুতুবদিয়া থেকে পালাবার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং দালন্দা হাউসে পাঠান হয়। 1921 সাল পর্যন্ত আলিপুর, মেদিনীপুর, রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে রাজবন্দী হিসেবে তাঁকে রাখা হয়। তিন বছর

পর 1924 সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অন্বসারে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় ও চার বছরের জন্য রায়পুর ও অন্যান্য জেলে আটক রাখা হয়। ছাড়া পাবার পর তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার ল্বণ্ঠনের পর আন্দোলন দমনের জন্য প্বলিশী তৎপরতা ব্দিধ পেলে 1930 সালে তিনি গা ঢাকা দেন। এরপর 1931 সালে বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেনডমেণ্ট অ্যাক্ট অন্বযায়ী তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে সাত বছরের জন্য বক্সা ও দেউলিতে আটক রাখা হয়। ম্বক্তির পর স্বভাষ চন্দ্র বস্বর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। 1940 সালে আশ্বতোষ আবার গ্রেপ্তার হন এবং ছ' বছরের জন্য বক্সা ক্যাম্প ও দমদম সেণ্ট্রাল জেলে তাঁকে রাখা হয়। 1946 সালে তাঁকে ম্বক্তি দেওয়া হয়।

আশ্বতোষ তাঁর নিজের গ্রামে অন্বশীলন সমিতির অন্যান্য সদস্য রাইহরণ সেন, জীবন কুমার ঠাকুরতা এবং সীতানাথ দের বিশেষ সমর্থনে জাতীয় "শিক্ষা আশ্রম" নামে একটি বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। বিদ্যালয়টি ঐ জেলার অন্বশীলন সমিতির বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিচালনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। আশ্বতোষ দীর্ঘকাল সোনারগাঁ জাতীয় স্কুলের সাথে যোগাযোগ রাখার সময় ঢাকায় বৈপ্লবিক কাজকর্ম দেখাশ্বনার জন্য সেখানে একটি বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন। জীবনের শেষ দিকে আজীবনের বন্ধ্ব কেদারেশ্বর সেনের বিশেষ সাহায্যে কলকাতার কাছাকাছি টালিগঞ্জে "অন্বশীলন ভবন" গড়ে তোলেন। এটা ম্বলতঃ বার্ধক্য উপনীত বিপ্লবীদের মেলামেশার ক্ষেত্র এবং প্রয়োজন অন্বসারে বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হলেও স্বাধীনতা লাভের উপযোগী কার্যক্রম সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হত।

আশ্বতোষ কিছুকালের জন্য ফরিদপ্বর জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। এছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিরও একজন প্রথম সারির সদস্য হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবী কাজকর্ম ছাড়াও জটিল রাজনৈতিক সমস্যা, সমাজবিদ্যা ও দর্শনের ওপর তাঁর বিশেষ দখল ছিল। প্থিবীর ইতিহাস ছিল তাঁর নখদর্পণে।

তিনি তাঁর জীবনকে দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রে নিঃস্বার্থ মনোভাব, নম্রতার পরিচয় থাকার জন্য অতি প্রচারম্বলক কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে কখনোই প্রতিষ্ঠা করতে চান নি।

তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি ছিল বিশেষ দ্বঃখের। 1965 সালের 7 জ্বন 74 বছর বয়সে অন্বশীলন ভবনের প্রধান কক্ষের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর ম্ত্যু ঘটে।

[R. C. Majumdar—History of the Freedom Movement in India, Vols. II + III, Suprakash Roy—Bharater Baiplabik Sangramer Itihas, Calcutta, 1955; Bhupendra Kumar Dotta—Bharater Dwitiya Swadhinata Sangram, Calcutta, 1949; Green Book of Bengal Revolutionaries maintained, by the D. I. G., I. B., West Bengal (Lord Sinha Road, Calcutta; Information Supplied by close relatives, colleagues, friends and political co-workers; Personal knowledge of the Contributor.]

কমলাক্ষ চরণ ভট্টাচার্য

আশ্বতোষ চৌধ্বরী (স্যার) (১৮৬০-১৯২৪)
Asutosh Chaudhuri (Sir) (1860-1924)

সগ্নময়ী এবং দ্বর্গাদাস চৌধ্বরীর জ্যেষ্ঠপ্বত্র আশ্বতোষ জন্মগ্রহণ করেন পাবনা জেলার (তৎকালীন উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার) হরিপ্বর গ্রামে। রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের দেওয়ান রামদেব চৌধ্বরীর বংশধর দ্বর্গাদাস ছিলেন হরিপ্বরের জমিদার এবং বাংলার সাবঅর্ডিনেট এক্জিকিউটিভ সার্ভিস-এর অন্যতম প্রথম সভ্য। প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী দ্বর্গাদাস ছিলেন আগ্রহী সাহিত্যান্বরাগী এবং তাঁর বাসভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধ্ব মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন এবং মনোমোহন ঘোষ প্রম্বখ সেকালের বিশিষ্ট সাহিত্য সেবীগণের যাতায়াত ছিল। প্রাচুর্য এবং সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠায় আশ্বতোষ তাঁর কর্মজীবনে সাহিত্য প্রীতির প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আশ্বতোষ কলকাতার

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। 1881 সালে যাঁরা একই সঙ্গে বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলেন আশুতোষ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সেই বছরেই তিনি ইংলণ্ড যান এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেণ্ট জন্‌স কলেজ থেকে 1884 সালে বি. এ. এবং 1885 সালে এল. এল. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মিডল টেম্পল থেকে 1886 সালে তিনি ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে 1886 সালে তিনি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভার (1865-1922) সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রতিভা নিজেও ছিলেন আলোকপ্রাপ্তা এবং উঁচু দরের সঙ্গীতশিল্পী। আশু-তোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের অন্যতম, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক প্রমথনাথও বিবাহ করেন রবীন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরাকে।

বিত্তশালী পিতার পুত্র আশুতোষ নিজেও আদালতে আইনজীবীর পেশায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। ব্যারিস্টারী পেশায় তাঁর খ্যাতি তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হতে সাহায্য করেছিল। তিনি 1912 সালের ফেব্রুয়ারী থেকে 1920 সালের জুন পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন।

ঠাকুর পরিবারের জামাতা আশুতোষের সাহিত্যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। মাতৃভাষা বাংলা এবং ইংরাজীতে দক্ষতা অর্জন ছাড়াও ফরাসী সাহিত্যেরও তিনি ছিলেন রসজ্ঞ পাঠক। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং তিনি কবিকে 'কড়ি ও কোমল' (1886) প্রকাশনায় সাহায্য করেন। প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে ইংরাজিতে কবিতা রচনা করতে নিরুৎসাহ করেন। লেখক হিসাবে আশু-তোষের যোগ্যতাও কম ছিল না। সমগ্রভাবে সাহিত্যের এবং বিশেষভাবে ইংরাজি কাব্যে তাঁর রসাস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা পাওয়া যায় অধুনা অবলুপ্ত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কীটস্‌, পো, বার্নস এবং অন্যান্যের রচনার উপর লেখা নিবন্ধগুলিতে। সৃজনধর্মী সাহিত্যে কথ্যভাষা প্রয়োগের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবক্তা। অপরদিকে, স্বনামখ্যাত কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমথনাথ বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষাকে দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও ইনডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত সংঘ-এর তিনি ছিলেন একজন পৃষ্ঠপোষক।

আশুতোষ ইংরাজি শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট দিকটি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অযৌক্তিক ইংরাজি অনুকরণকে তিনি বর্জন করেছেন। পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বৃত্তির সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং আদর্শ। জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে আশুতোষ তাঁর সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা বিদেশী প্রভুদের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা ভিক্ষা করার চেয়ে দেশবাসীরা নিজেদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে—তিনি এটিই চাইতেন। সংকীর্ণ এবং প্রাদেশিকতামূলক রাজনীতিতে তাঁদের শক্তি ও সময় অপচয় না করে তাঁদের তিনি দেশের শিল্পোন্নয়ন এর চিন্তায় নিজেদের নিয়োজিত করতে বলেছেন। তিনি দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন, "আমাদের অগ্রগতি দেশের শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।" এজন্যই তিনি অ্যাসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়াণ্টিফিক এ্যাণ্ড ইনডাস-ট্রিয়াল এডুকেশন এর একজন সক্রিয় সমর্থক ছিলেন —এই সংস্থার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আশুতোষ ছিলেন একমত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আশুতোষ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে প্রতিটি জেলায় এই সংস্থার একটি করে শাখা খোলা হোক এবং এদের একটি দায়িত্ব হবে কারিগরী ও বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে ছাত্রদের প্রেরণা করা। এইরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা ভারতীয় মূলধনে শিল্প কারখানা স্থাপনে সাহায্য করতে পারে এবং এইটিই জাতি গঠনের প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। দূরদর্শী আশুতোষ আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটিগুলি উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি বলেছিলেন, "যে সময় মানবজাতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, তখন এই ব্যবস্থার ফলে ভারত ক্রমশঃ ভয়াবহভাবে পিছিয়ে পড়বে।" দেশ যাতে মধ্যযুগীয় আবহাওয়া থেকে গণতান্ত্রিক এবং বাণিজ্যিক যুগে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তিনি বিশেষভাবে কারিগরী বিদ্যাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন ছিল তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও মতাদর্শের শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ। সরকারী শিক্ষায়তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনে অনিচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীদের জন্য 1905 সালে স্থাপিত

এই প্রতিষ্ঠানটির কাণ্ডারীর ভ্বমিকা মৃত্যুকাল অবধি পালন করেছেন আশ্বতোষ। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং যাদবপ্বর কলেজ অফ ইনজিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজির জন্য বিজ্ঞান ও প্রয্বক্তি বিষয়ের একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য তিনি যথোচিত আর্থিক সাহায্যও করেছেন। 1906 সালে কাউন্সিলের আন্বকুল্যে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা তাঁর ঈপ্সিত স্বদেশবাসীদের মধ্যে স্বনির্ভরতার চেতনা জাগিয়ে তুলতে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের স্বচনা করেছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এড্বকেশনের প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সম্মিলিত শিক্ষায় "স্কুল থেকে যে সমস্ত ছেলেরা এবং নাগরিকেরা শিক্ষিত হবে তারা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মিটিয়ে দেশসেবার কাজ করবে, এবং এই কলেজ থেকে বেরিয়ে আসবে বৈজ্ঞানিক, গবেষক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাবাণিজ্যের পরিচালক।"

অতএব আশ্বতোষ ম্বলতঃ রাজনীতির দিক থেকে না হলেও শিক্ষানৈতিক দিক থেকে একজন প্রকৃত স্বদেশসেবী ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের কার্যকারিতার ওপর তিনি তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মন্তব্য 'পরাধীন জাতির কোন রাজনীতি নেই' তৎকালীন জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে এক গভীর আলোড়নের স্বষ্টি করেছিল। তিনি রাজনীতিতে চরমপন্থার বিরোধী ছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থায়িত্বের পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। তব্বও তিনি নিজেকে সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখেননি এবং একাধিকবার সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। 1905 সালের 16 অক্টোবর ফেডারেশন হলে অন্বষ্ঠিত রাখীবন্ধন উৎসবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং এখানেই তিনি আনন্দমোহন বস্বর উত্তেজক ভাষণের ইংরাজি অন্ববাদ পড়ে শোনান। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন শীর্ষস্থানীয় সভ্য আশ্বতোষ ল্যাণ্ডহোল্ডার'স এ্যাসোসিয়েশনেরও প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বির্বদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই সমিতি যে প্রস্তাব পেশ করে তার খসড়া তৈরী করেছিলেন আশ্বতোষ স্বয়ং। স্বয়ং বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকার কার্জনের মতে এই সমিতির স্মারকপত্রই ছিল সব থেকে সারগর্ভ এবং জোরালো। 1909 সালে তিনি দ্বীপান্তরে প্রেরণ প্রসঙ্গে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারের নিন্দা করেন। নিজস্ব ভঙ্গীতে তিনি স্বদেশী ভাষায় স্পষ্টভাবে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অন্বরাগের কথাও স্মরণযোগ্য।

আশ্বতোষ জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন। জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক কুপ্রথাগ্বলির তিনি সমালোচক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং কিছুকালের জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। কেম্ব্রিজ অধ্যয়নকালে তিনি 'ইনডিয়ান মজলিস' প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের এইটিই সর্বাপেক্ষা প্বরাতন সমিতি। তিনি একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমিতির সঙ্গে য্বক্ত ছিলেন—যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর ও রিপন কলেজ, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি, হিন্দ্বস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্বরেন্স কোম্পানী এবং হিন্দ্বস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। 1921 সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য হন। 1904 সালে তিনি বর্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন এবং 1907 সালে পাবনা জেলা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। 1908 সালে পাবনায় অন্বষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান র্বপে কাজ করেছিলেন। 1917 সালে সরকার বাহাদ্বর তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভ্বষিত করেন।

[Rabindranath Tagore—Jivansmriti, Calcutta 1319 B. S. ; Ramananda Chattopadhyoya—Sriyukta Asutosh Chaudhuri, in Pravasi, Ashar, 1331 B. S. ; Manmathanath Ghose—Sir Asutosh Choudhuri, in Manasi O Marmavani, Agrahayan and Paush, 1331 B. S. ; The National Council of Education, in Journal of the College of Engineering and Technology, December, 1938; Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee—The Origin of the National Education Movement, Jadavpur University, 1957 ; Sir Asutosh Chaudhuri, The Centenary of a great Indian, in Hindusthan Standard, June 12, 1960.]

(এস্. ম্বখোপাধ্যায়) কে. কে. দাশগ্বপ্ত

আশুতোষ দাশ (ডঃ) (১৮৮৮-১৯৪১)

Ashutosh Das (Dr) (1888-1941)

আশুতোষ দাশের জন্ম 1888 সালে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের এক দরিদ্র পরিবারে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং মিডল্ ইংলিশ, এণ্ট্রাস ও এফ. এ. পরীক্ষায় বৃত্তি পান। বাল্যাবস্থাতেই তিনি সুপরিচিত বিপ্লবী শিক্ষক সতীশ চন্দ্র সেনগুপ্তের প্রভাবে আসেন ও কলেজে পড়ার সময়ে তিনি কলকাতায় 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগদান করেন। অনুশীলন সমিতি ছিল বাংলাদেশের বিখ্যাত বিপ্লবী সংগঠনগুলির কেন্দ্র, পরবর্তীকালে যার একটি শাখা রূপে যুগান্তর পার্টির অভ্যুদয় ঘটে। তাঁকে হুগলী জেলায় ও জেলার চারপাশে বিপ্লবী কাজকর্ম সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি এই কঠিন কাজ একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী ও যতীন মুখোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতনামা বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন।

1914 সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে আশুতোষ দাশ স্নাতক হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি আই. এম. এস.-এ যোগদান করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, মেসোপটেমিয়া ও আরবে কাজ করেন। বিশ্বযুদ্ধের অবসানে গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি আই. এম. এসের স্থায়ী চাকুরী ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন। এরপর তিনি গান্ধীজীর জনসংযোগ ও গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর বিধ্বস্ত একটি গ্রাম হরিপালে বাস করতে শুরু করেন। তাঁর দুঃসাহসিক দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে ঐ অঞ্চল থেকে কালাজ্বর অপসারণ করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি একদল তরুণকে নিজের বাড়ীতে, বাড়ীর লোকের মতই রেখে—তাদের গ্রামীণ-স্বাস্থ্য সেবার কাজ করার জন্য তৈরী করেন।

1922 সালে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণভাবে বন্যাত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি হরিপালে 'কল্যাণ সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 1925 সালে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। 1930-34 সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। 1932 সালে বাংলা আইন অমান্য আন্দোলনের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। বহু বছর তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি ও অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন জেলা-কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা সংগঠন করার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করেন। তিনি ওয়ার্ধা ও সেবাগ্রাম পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 1940 সালে পূর্ব-বাংলায় গান্ধী সেবা সংঘের মালিকান্দা অধিবেশনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

"কংগ্রেস চক্ষু চিকিৎসা" সমিতি তাঁরই প্রচেষ্টায় তৈরী হয়। দীর্ঘদিন এই সংস্থা গ্রামে চিকিৎসকের দল পাঠিয়ে গ্রামের গরীব মানুষের চোখের চিকিৎসা, ছানি কাটা ইত্যাদির মাধ্যমে সাহায্য করেছিল। তাঁর এই মহৎ মানব সেবার কাজে তাঁর যোগ্য সহকর্মী ছিলেন ডঃ অনাদি চরণ ভট্টাচার্য্য।

আশুতোষ দাশ চিরকুমার ছিলেন। তাঁর উপার্জনের সবই তিনি দেশের কাজে ব্যয় করেছেন। তাঁর কোন জীবনবীমা বা ব্যাংক আমানত ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নীরব ও নম্র কর্মী। বলা যায় তাঁর বাঁ হাত তাঁর ডান হাতের কাজ টের পেত না। 'স্বার্থ' কোনদিনই তাঁর হিসাব নিকাশের মধ্যে স্থান পায় নি। গ্রাম গ্রামান্তরে পদযাত্রায় একক সত্যাগ্রহে অংশ নেবার সময় তিনি ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। 1941 সালের 31 জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র গান্ধীজী তাঁর শোক-বার্তায় লিখে পাঠান—"তাঁর মৃত্যু আমাদের বিরাট ক্ষতি করে গেল। তাঁর প্রতি শোক জানাতে হলে আমাদের আরও বেশী দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাঁর মাকে আমার গভীর শোক জানাবেন।"

[Jadugopal Mukherjee—Biplabi Jibaner Smriti Katha ; Patra (Bengali Weekly), Asutosh Number, 28 August 1941 ; Prabasi, Ashar 1362 B.S. ; Personal information of the contributor, a close and lifelong associate of Ashutosh Das.]

রতনমণি চ্যাটার্জী

আশুতোষ দাশগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৪৭)

Ashutosh Dasgupta (1885-1947)

আশুতোষ দাশগুপ্তের জন্ম 1885 সালে ঢাকা জেলার গরুরগাঁও গ্রামে, এক মধ্যবিত্ত হিন্দু বৈদ্য

পরিবারে। তিনি তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর পিতা কাশীপ্রসন্ন দাশগ্বপ্ত ঐ অঞ্চলের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আশ্বতোষ পড়াশ্বনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। এম. ই. পরীক্ষায় তিনি ঢাকা জেলায় প্রথম হন এবং তারপর ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে 1905 সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

1905 সাল বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় বছর। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। আশ্বতোষও এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। তিনি স্কুল ছেড়ে দেন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ছাত্র বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। পরে তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন এবং সেখানে প্রধান নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন। প্বনরায় পড়াশ্বনা শ্বর্ব করে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আই. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পার্টির কাজকর্মের জন্য তাঁর বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কোন রকম আক্ষেপ না রেখেই তিনি লেখাপড়া ছেড়েছিলেন কারণ নিজের শিক্ষাজীবনের চেয়ে দেশের সেবাই তাঁর কাছে মহত্তর ছিল।

1907 সালে বৃদ্ধ পিতার একান্ত অনুরোধে তিনি সোনারঙের শ্রীনাথ সেনের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। যদিও রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য আশ্বতোষকে দীর্ঘ দশ বছর পরিবার পরিজন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হয়েছিল তব্ব তাঁর স্ত্রীও জাতীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুশীলন সমিতির ডাকে সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। নিদার্বণ আর্থিক দ্বঃসময়ের সময় তাঁর স্ত্রী আশ্ব-তোষকে তাঁর সব অলংকার দিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুশীলন সমিতিতে প্বলিন বিহারী দাশের ডান হাত আশ্বতোষ দাশগ্বপ্তের স্থান ছিল ঠিক প্বলিন বিহারীর পরেই। লাঠি চালনায় তিনি দক্ষ ছিলেন। একবার প্রদর্শনী লাঠি খেলায় তিনি চারশত লোকের বিরুদ্ধে একা লড়ে জয়লাভ করেছিলেন। তিনি শ্বধ্বমাত্র দৈহিক দিক দিয়ে বলশালী ছিলেন না, মানসিক দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃতি-বান।

1905 সালে আশ্বতোষ আগরতলায় গ্রেফতার হন এবং ফরিদপ্বর জেলে আটক থাকেন। 1910 সালে ম্বক্তি পাবার পর আবার ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার স্বত্রে তাঁকে বন্দী করা হয় এবং তাঁকে ছয় বছরের নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। এই সময় তাঁর উপর সবরকমের অত্যাচার চালানো হয়েছিল। জেলের বিধানে এমন কোন দণ্ড ছিল না যা তিনি ভোগ করেন নি তব্ব তিনি অদম্য ছিলেন। 1918 সালে তিনি জেল থেকে ম্বক্তি পান এবং প্বনরায় দেশের স্বাধীনতার কার্যে যোগ দেন।

1923 সালে আশ্বতোষ পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। 1927 সালে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ পান এবং দীর্ঘ পনের বছর সেখানে কাজ করেন। এই সময় তিনি শিশ্ব শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু বই লিখেছিলেন যা শিক্ষাবিদ্বদের দ্বারা বহ্ব প্রশংসিত হয়েছিল। 1942 সালের পর তিনি নিঃসঙ্গ, একক ও চিন্তাশীল থাকতেন। 1947 সালের 14 অক্টোবর 62 বছর বয়সে এক প্বত্র ও তিন কন্যা রেখে তিনি প্রয়াত হন।

[Jibantara Halder—Anusilan Samitir Sankshipta Itihas, Calcutta ; Bhupendra Nath Datta—Bharater Dwitiya Swadhinata Sangram, Calcutta ; Hem Chandra Kanungo—Banglay Biplab Prachesta Calcutta ; Material in the Anushilan Bhawan.]

নলিনী রঞ্জন ভট্টাচার্য

আশ্বতোষ ম্বখোপাধ্যায় (স্যার) (১৮৬৪-১৯২৪)

Asutosh Mukhopadhyay (Sir) (1864-1924)

সমসাময়িক কালে আশ্বতোষ ম্বখোপাধ্যায় এক শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ এবং বিচারপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ষাট বৎসর ব্যাপী জীবন-কালের মধ্যে ভারতের প্বনর্জাগরণ এক সর্বতোম্বখী ও শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের র্বপ নেয়। বিশেষ করে বিশ শতকের প্রথম দিকে যে সময়ে স্বদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি এক জীবনদাত্রী শক্তির্বপে বিরাজ করেছিলেন। অপরদিকে 1903 সাল থেকে 1924 সাল অবধি কুড়ি বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে

অন্যতম বিচারপতি হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1899 সাল থেকে 1903 সাল পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্যপদ অলংকৃত করেছিলেন।

জগত্তারিণী দেবী (মৃত্যু 1914) এবং ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (মৃত্যু 1889) জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন 1864 সালের 29 জুন। এই মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলায়। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ দক্ষিণ কলিকাতার 77 নম্বর রসা রোডে ডাক্তারি করতেন এবং আশুতোষের কলিকাতায়ই জন্ম। তাঁর পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ ডাক্তারি করে অর্থোপার্জন করেছিলেন এবং বাংলা ভাষায় তিনিই চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। আশুতোষ তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বিদ্যোৎসাহিতা অর্জন করেছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে; মাতা জগত্তারিণীর কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন গভীর ব্যবহারিক জ্ঞান ও স্বাধীনচেতা মনোভাব। অপরদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' তাঁর এক পিতৃব্য রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়(1884) তাঁর প্রতিভাধর ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে উৎসাহ।

আশুতোষের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় চক্রবেড়িয়া চিলড্রেনস্ স্কুলে (1869-72); পরবর্তী দুই বৎসর তিনি একজন গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন, এরপর সাউথ সুবার্বন স্কুলে (1876-78)। এই স্কুল থেকে 1879 সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 1880 সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। কৃতিত্বপূর্ণভাবে প্রথম স্থানের অধিকারী হয়ে তিনি অংক নিয়ে স্নাতক হন।

1884 সালে এবং পরের বছর 1885 সালে অংক শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। 1886 সালে তিনি অংক শাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক বৃত্তি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। 1888 সালে তিনি বি. এল. ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে একজন আইনবিদ্ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ কালেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি ডক্টর অফ্ ল-তে ভূষিত হন। জাতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছাত্র হিসেবে আশুতোষ ছিলেন অন্যতম।

আশুতোষ-এর সহধর্মিণী যোগমায়া দেবী। ইনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর আরও ত্রিশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় আশুতোষ তদানীন্তন বাংলার স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেন। এঁরা হলেন তাঁর শিক্ষক স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ সি. এইচ. টনি, অধ্যাপক এইচ.এম.পার্সিভাল। তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। পরবর্তীকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকার সময় যে সকল সেরা শিক্ষাবিদ্ এবং পণ্ডিতের সাহচর্য তিনি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দীনেশ চন্দ্র সেন, বিরাজকুমার মজুমদার, পি. ই. হারটোগ, এস. রাধাকৃষ্ণান এবং সি. ভি. রামন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর জীবনধারণ প্রণালী ছিল অত্যন্ত সরল এবং তাঁর আচরণও ছিল অকপট। নিতান্ত সাধারণ বাঙ্গালীর বেশ—ধুতি, খাটো কুর্তা এবং খদ্দর এই ছিল তাঁর সব সময়ের পরিধান। কেবলমাত্র বিচারালয়ে এবং বিচারকের আসনেই তাঁর ভারতীয় পরিচ্ছদ ছিল চাপকান এবং ঢিলা প্যান্ট। পাণ্ডিত্যের এক আগ্রহী পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী এবং ছাত্রদের এক স্নেহপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল পরামর্শদাতা তিনি ছিলেন সকলের নিকটই সুগম। সংস্কৃতির আলোকজাত মৃদু উষ্ণতাপ এবং মানবিকতাবোধ 77 নং রসা রোডের ভবনটি থেকে বিচ্ছুরিত হত। তাঁর পুরুষোচিত বিরাট গোঁফ ও বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে যে অসাসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষটি সেই গৃহের মধ্যমণিরূপে বিরাজ করতেন সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভীক সংগ্রামের জন্য তিনি "দি বেঙ্গল টাইগার" বা "বাংলার বাঘ" আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গর্বের সঙ্গেই গোঁড়া ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করতেন। অপরদিকে জ্ঞানদীপ্ত উদার মূল্যবোধকেও তিনি মর্যাদা দিতেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডারের গহ্বর থেকে রত্নরাজি চয়ন করেছিলেন। 1970 সালে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন উৎসবে স্নাতকদের উদ্দেশে তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেন "পাশ্চাত্য সভ্যতার যা কিছু মহান তার সঠিক গুণকীর্তন করেও তোমরা কোন অবস্থায়ই তোমাদের দেশকে যেন ছোট করে দেখো না।" গোঁড়া ভারতীয়দের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ইউরোপ ভ্রমণ না করার কোন যুক্তি খুঁজে পান নি। একদিকে প্রাচীনপন্থী হয়েও অস্পৃশ্যতা

প্রথাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি, প্রয়োজনে তিনি সামাজিক সংস্কারেরও নির্দেশ দিয়েছেন। সমস্ত প্রকারের গোঁড়া বিরোধিতা উপেক্ষা করে তিনি 1908 সালে তাঁর প্রথমা কন্যা বালবিধবা কমলাকে পুনরায় বিবাহ দিয়েছিলেন।

গভীর স্বাদেশিকতাবোধ এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা আশুতোষকে বহুবিধ কাজে লিপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও তাঁর বহু কাজের মধ্যে দেখা যেতো স্বদেশ প্রেমের প্রতিফলন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণকালে ছাত্রদের বিক্ষোভে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু তাঁর সমমেধাসম্পন্ন ইংরেজরা তাঁর থেকেও উঁচু পদ পাবে সেইহেতু তিনি তাঁর চাকুরী জীবনের প্রাক্‌কালে শিক্ষাবিভাগের সরকারী চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তাঁর মিত্রদের মধ্যে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইংরাজি শিক্ষাবিদ্‌দের স্থান দিয়েছিলেন। 1906 সালে স্বদেশী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এই সময়ে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্ররোচনা সত্ত্বেও তিনি বিক্ষোভরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেন। 1905 এবং 1921 সালের দুটি পর্যায়ের জাতীয় আন্দোলন থেকে তিনি দূরে সরেছিলেন, কারণ সে সময়ে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা এবং বিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস বয়কটের যে আন্দোলন সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে তিনি তা সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানের আলোক পাশ্চাত্ত্যের সিংহদুয়ার দিয়েই প্রবেশ করবে এবং সেজন্যই পাশ্চাত্ত্য রীতির শিক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন। 1905 সালের পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনকে হাতিয়ার করেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ দেন এবং সেই লক্ষ্য অভিমুখেই তিনি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করতে থাকেন। 1923 সালে তাঁর একটি বড় কাজ হল লর্ড লিটন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার খর্ব করতে উদ্যত হন তখন তিনি প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ জানান এবং উপাচার্যের পদে ইস্তফা দিয়ে ঘোষণা করেন, "স্বাধীনতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয়, স্বাধীনতা সর্বক্ষণের, এর কমে আমি সন্তুষ্ট নই।"

রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখনও সুদূরপরাহত। আশুতোষ আইনানুগ পথেই সংগ্রাম করেছিলেন। জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত, অর্থ, মেধা ও পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ জনগণের নেতৃত্বে শক্তি সঞ্চয় করে গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 1889 সালে তিনি প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিণ্ডিকেটে নির্বাচিত হন। 1891 সালে তিনি বি. এ. এবং এম. এ. পাঠ্যসূচীতে বাংলা, হিন্দী, উর্দু ইত্যাদি ভারতীয় ভাষার পঠন পাঠনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। যদিও তাঁর সেই চেষ্টা সে সময় ফলপ্রসূ হয়নি। 1904 সালে তিনি লর্ড কার্জন কর্তৃক উত্থাপিত 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস্‌ অ্যাক্ট' (1904) এর প্রস্তাবিত অধিকতর সংখ্যায় ইউরোপীয়দের নিয়োগের বিরোধিতা তিনি অবশ্যই করেছিলেন। কিন্তু এই আইনের প্রত্যেকটি ধারার বিরোধিতা তিনি করেন নি। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেচারে জি. কে. গোখলে কর্তৃক উত্থাপিত 'আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিল'ও তাঁর অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়। 1906 সালে তিনিই নতুন আইন অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। 1914 সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একজন বিচক্ষণ পরিচালক ও সুযোগ্য শিক্ষাবিদের হাতে ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়-এর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় নিছক পরীক্ষা গ্রহণের সংস্থার পরিবর্তে উন্নত মানের পঠন পাঠনের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। শুধুমাত্র বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের স্থলে এখানে জ্ঞানের সার্বিক শাখায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় এবং 'বিমাতার কক্ষে' মাতৃভাষার সম্মানজনক স্থানলাভ সম্ভব হয়। তাঁর পদাধিকারকালেই মাতৃভাষায় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে বিধি নিয়ম রচিত হয়। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন এবং গবেষণার জন্য কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়দের (বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষ) দানে বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখায় প্রশিক্ষণের জন্য মেধাবী ছাত্রদের বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়; ব্যবহারিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে চিকিৎসা শাস্ত্র এবং আইন অধ্যয়নজনিত শিক্ষাকে নূতন করে ঢেলে সাজানো হয়, শিক্ষার উন্নতমান নির্ণয়সূচক গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; মৌলিক গবেষণার জন্য ডকটরেট অফ ফিলসফি এবং ডকটরেট অফ্‌ সায়েন্স প্রদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়,

গ্রন্থাগার এবং গবেষণা সংস্থা সমূহও প্রবর্তিত হয়। 1914 সালে আশুতোষ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন সেই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় জীবন এবং কৃষ্টির ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় এক বাস্তবোচিত অভিনব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও আশুতোষের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব ছিন্ন হয় নি। 1917 সালে যে ইউনিভার্সিটি কমিশন (স্যাডলার কমিশন) অধিকতর হারে প্রগতিশীল সংস্কারের পক্ষে রায় দেন, আশুতোষ ছিলেন সেই কমিশনের শীর্ষস্থানীয় সভ্য। কিন্তু এই কমিশনের অনুমোদিত প্রস্তাব সমূহকে সরকার সুনজরে দেখেন নি। 1921 সালে তিনি পুনরায় উপচার্যপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ই সর্বপ্রথম ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভারতীয় ভাষাগুলির পঠন পাঠন শুরু হয়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দাবীর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক কঠোর সর্ত আরোপিত হলে (1922), আশুতোষের পক্ষে উপাচার্য পদে থাকা বিড়ম্বনা স্বরূপ হয়ে ওঠে। 1923 সালে "স্বাধীনতা সর্বক্ষণের" শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণ দিয়ে তিনি উপাচার্য পদে ইস্তফা দেন। এক বৎসর পরেই তিনি কলিকাতা হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণ করেন। হাইকোর্টে তৎকালীন স্বদেশীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলার রায়দান প্রসঙ্গে তিনি যে অগাধ জ্ঞান ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তার ফলে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কাজে আশুতোষের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ ছাড়াও তিনি কয়েকবার কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। এছাড়াও তিনি লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং প্যারিসের ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কাউন্সিল অফ দি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (বর্তমানের ন্যাশনাল লাইব্রেরী) এবং Sanskrit Association-এরও সভাপতি ছিলেন। সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে বিভিন্ন উপাধি দান করে সম্মান জানানো হয়। কয়েকটির উল্লেখ করা যায় ; যেমন 1914 সালে ইংরাজ সরকার তাঁকে কে. টি, সি. এস. আই. উপাধিতে ভূষিত করেন। লণ্ডন এবং প্যারিসের এশিয়াটিক সোসাইটিগুলি তাঁকে ফেলোশিপ দিয়ে সম্মানিত করেন। সংস্কৃত পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হয় 'সরস্বতী' উপাধি এবং সিংহলের 'বুদ্ধিষ্ট সংঘ অফ ইণ্ডিয়া' তাঁকে 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী' পদবী দানে সম্মানিত করেন।

বিচারালয়ে বিচারকের রায়, বিদ্বৎ পরিষৎ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অভিভাষণ এবং বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য নিবন্ধ ছাড়াও তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছিলেন, 'Geometry of Conics' (1892), 'Law of Perpetuities' (1899), 'Arithmetic for Schools' (1901) এবং 'জাতীয় সাহিত্য' (বাংলা ভাষায়, 1932)।

[The Calcutta Review, July 1925, Calcutta, 1925 ; Lalit Mohan Chatterjee and Shyama Prasad Mookerjee—Representative Indians, Calcutta, 1931 ; Dinesh Chandra Sen—Asutosh Smriti Katha, Calcutta, 1936. Hundred Years of the University of Calcutta, Calcutta, 1957 ; Asutosh Mukhopadhyay Centenary Exhibition 1965 (National Library), Calcutta, 1965 ; Bibhas Ray Chaudhuri (ed) —Sir Asutosh Janma Satabarsiki Smarak Grantha, Calcutta, 1964 ; Mani Bagchi—Sikshaguru Asutosh, Calcutta ; 1964.]

(অমিয়া বরাট) গোপাল হালদার

ই. ইক্কান্দা ওয়ারিয়র (১৮৯০- ?)

E. Ikkanda, Warrier (1890- ?)

কেরালার কোচিন রাজ্যের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ই. ইক্কান্দা ওয়ারিয়র 1890 সালের 4 মে ত্রিচুরের নিকটবর্তী এডাকুন্নি ওয়ারিয়ামে (ওল্লুর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মেলাদত শংকরণ নাম্বুদিরিপাদ এবং মা ছিলেন এডাকুন্নিস ওয়ারিয়মের ধনী, অভিজাত পরিবারের কন্যা লক্ষ্মী কুট্টি ওয়ারাসিয়ার। তাঁর ঠাকুরদা শংকর ওয়ারিয়র কিছু দিনের জন্য কোচিন রাজ্যের দেওয়ান হয়েছিলেন। ওয়ারিয়র সম্প্রদায় হিন্দুদের একটি উপগোষ্ঠী, তাদের কিছু সুযোগ সুবিধা এবং মন্দিরের দায়িত্ব দেওয়া হত। 1921

সালে ইক্কন্দা চেন্দামঙ্গলমের কোজিকোদ পরিবারের কন্যা লক্ষ্মী কুট্টি আম্মাকে বিবাহ করেছিলেন।

ইক্কান্দা ছিলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের স্নাতক। "গান্ধীজীর জীবন এবং বাণী" তাঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তুলেছিল। অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতারা যেমন বি. জি. তিলক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত এবং পরবর্তীকালে বিনোবা ভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। গীতা এবং রামায়ণে উল্লিখিত নৈতিক আদর্শের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

1918 সালে এডভোকেটরূপে তিনি ত্রিচুরে কর্মজীবন আরম্ভ করেন এবং স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি, মিউনিসিপাল কমিটি প্রভৃতির সদস্যভুক্ত হয়ে জনসাধারণের জন্য কাজকর্মও করতে শুরু করেন। 1925 সালে তিনি কোচিনে বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। 1931 সাল নাগাদ মন্দির প্রবেশ আন্দোলন এবং একই কারণে গুরুভায়ুর সত্যাগ্রহ শুরু হলে ওয়ারিয়র এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন অত্যুৎসাহী সদস্য। 1935 সালে তিনি 'কেরলম্', নামে একটি মালয়ালম দৈনিকপত্র প্রকাশিত করেন। এই দৈনিকপত্রের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু সেই সময়টা অনুকুল ছিল না এবং কাগজটিকে কোচিন সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। 1935 সাল নাগাদ তিনি মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হলে আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য ওয়ারিয়রকে অল্প সময়ের জন্যে কারাগারে বন্দী হতে হয়েছিল। তিনি কোচিন রাজ্য প্রজা মণ্ডলের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এই প্রজামণ্ডল রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের জন্য গঠিত হয়েছিল। 1948 সাল নাগাদ এটি কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায় এবং নির্বাচনে জয়লাভের পর কোচিন রাজ্যে প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। 1948 সাল থেকে 1950 সাল পর্যন্ত ওয়ারিয়র ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তীকালে ত্রিবাংকুর-কোচিন রাজ্য গঠিত হলে ওয়ারিয়র 1949-1950 সাল পর্যন্ত কৃষি ও রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। 1952 সাল থেকে তিন বছরের জন্য তিনি রাজ্য খাদ্য উৎপাদন সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। 1957 সাল অবধি তিনিই ছিলেন কেরালা ভূদান যজ্ঞ সমিতির প্রথম আহবায়ক। 1956 সাল থেকে 1966 সাল পর্যন্ত তিনি কেরালায় খাদি ও গ্রামীণ বোর্ডের সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন।

জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস কিন্তু তার আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি নয়। এর দর্শন এবং কর্ম ও অদ্বৈতবাদের গুরুত্বে তিনি ছিলেন আস্থাবান। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করলেও স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে তার সংস্কৃতি ও প্রয়োজনের পরিপূরক শিক্ষা ব্যবস্থাই ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করতে পারবে। তিনি ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রশংসা করতেন কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষকে শোষণ করার বিরোধী ছিলেন। প্রাদেশিকতাবাদ সম্পর্কে তাঁর বিরাগ ছিল কারণ তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। ভারতবর্ষের অর্থনীতির উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট সংখ্যায় কুটীর শিল্প স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। এছাড়া ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন যে জমি কর্ষণ করবে সেই হবে জমির মালিক। তাঁর রাজনীতিক চিন্তাধারা কখনই নিজস্বার্থের অনুকুলে প্রবাহিত হয়নি। মন্ত্রীত্বে থাকাকালীন তিনি আড়ম্বর এবং দম্ভোক্তি পরিহার করে চলতেন। আজও তিনি অতীতের মতোই সাধারণ সৎ জীবন যাপন করছেন এবং সর্বোদয় কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

[A Sreedhara Menon—Kerala District Gazeteers, Kozhikode, Trichur and Ernakulam, Trivandrum, 1962 and 1965; A. K. Pillay—Congress and Kerala (Published by the K. P. C. C.), 1935; K. P. Kesava Menon—Kazhinja Kalam, Kozhikode, 1957; E. Ikkanda Warrier—Gramandanam and Kerala, Chenadamangalam, 1965; The Kerala Sabdam (Weekly from Quilon), 13 March 1916; The Mathrubhumi (Ernakulam), A. I. C. C. Supplement, 24 September, 1966; Personal interviews of the Research Fellow with E. Ikkanda Warrier and with Kurur Nilakanthan Namboodiripad, one the prominent national leaders of Kerala.]

(এন. এম. কে. নায়ার) টি. সি. শংকর মেনন

ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ (১৯০৯—)
E. M. S. Namboordiripad (1909—)

কেরালা প্রদেশের পালঘাট জেলায় এক নিষ্ঠাবান নাম্বুদিরি পরিবারে (মালায়ালী ব্রাহ্মণ) 1909 সালের 14 জুন ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইলমকুলাম মানা গোষ্ঠীর সন্তান। এই গোষ্ঠীটি ছিল অধ্যান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। নাম্বুদিরিরা ছিলেন অর্থ সম্পদের দিক থেকেও স্বচ্ছল। শংকরণ (এইটিই তাঁর আসল নাম) যখন নিতান্ত শিশু, তাঁর পিতা পরমেশ্বরম নাম্বুদিরিপাদের মৃত্যু হয়; এই অবস্থায় মাতা বিষ্ণু দত্ত অন্থারাজনমকেই পুত্রের পড়াশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তাঁর দুটি পুত্রের ইতিপূর্বে অকালমৃত্যু ঘটায় আর তৃতীয়টি মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়ায় তিনি স্বভাবতঃই চতুর্থ পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষা কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। শংকরণকে তিনি 'ওয়াথেন' (অর্থাৎ ঋগবেদে পারদর্শী) করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস; এ হেন পুত্রই পরে জড়বাদী দর্শন গ্রহণ করে ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতা হিসেবে গণ্য হলেন। নাম্বুদিরিপাদের বিবাহ হয় এক নিষ্ঠাবান পরিবারের কন্যা আর্য অন্থারাজনমের সঙ্গে। তাঁদের দুই পুত্র, দুই কন্যা।

খুব অল্প বয়সেই নাম্বুদিরির সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়; উপনয়নের পরপরই শুরু হয় ঋগবেদ চর্চা। ঐ ভাবে চলে বেশ কিছু কাল। ইংরাজি ভাষাও শিক্ষা করেন তিনি। অন্যান্য ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থের সঙ্গেও তিনি নিজের উদ্যমে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর আবশ্যিক শিক্ষা-দীক্ষা শুরু হয় সপ্তম শ্রেণী থেকে। সতেরো বছর বয়সে পেরিনথালমান্না হাই স্কুলে তিনি যোগদান করেন এবং তারপর পালঘাটের ভিক্টোরিয়া কলেজ হাই স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হয় প্রথমে পালঘাটের ভিক্টোরিয়া কলেজে এবং পরে ত্রিচুরের সেন্ট-টমাস কলেজে।

সমগ্র কেরালা প্রদেশ জুড়ে যে শক্তিশালী সমাজ-সংস্কার আন্দোলন চলছিল তার প্রভাব নাম্বুদিরির জীবনের গোড়ার দিকেও অনুভূত হয়েছিল। কেরালার প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ই অন্যায় এবং সামাজিক অনিষ্টকর নিয়মকানুন উচ্ছেদ করে ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হয়। নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলার জন্য যাঁরা আগ্রহী ছিলেন তাঁদের অন্যতম নাম্বুদিরিপাদ স্বয়ং। 'যোগক্ষেম সভা' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সভ্যদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার। তাই নাম্বুদিরিপাদও এর সংস্পর্শে এসে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

নাম্বুদিরিপাদের কৈশোর থেকেই কেরালায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়। 'মাথৃভূমি' নামে একটি মালয়ালম্ সংবাদ পত্র (পত্রিকাটি সপ্তাহে তিনদিন কালিকট থেকে প্রকাশিত হত) জনগণের মনে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। সংবাদপত্রটি এই সময়েই প্রকাশিত হয় এবং নাম্বুদিরিপাদের সরল মনকে প্রভাবিত করে। কে. পি. কেশব মেননের লেখা গোখলে, তিলক এবং গান্ধীজীর জীবন তাঁকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কেরালায় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য নেতা কুরুর নীলকান্তন্ নাম্বুদিরিপাদ শংকরণের মাতামহ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। নাম্বুদিরিপাদকে জাতীয় আন্দোলনে আকৃষ্ট করতে তাঁর ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

'যোগক্ষেম'-এর মাধ্যমে নাম্বুদিরিপাদের জনজীবনের সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তিনি 1948 সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। 'যোগক্ষেম' সভার বিপ্লবী শাখাটি 'উন্নি নাম্বুদিরি আন্দোলন' নামে পরিচিত ছিল। বলতে গেলে এই শাখাটির মুখপত্র 'উন্নি নাম্বুদিরি উইক্লি' কাগজটি নাম্বুদিরিপাদ স্বয়ং সম্পাদনা করতেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

1932 সালে জাতীয়তাবাদের দিক্‌চক্রবালে যখন মেঘ ঘনীভূত হয়ে আসছে, ঠিক সেই সময়ে একজন যথার্থ দেশপ্রেমিকের আদর্শে অনুপ্রাণিত নাম্বুদিরিপাদ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। এর ফলে সেন্ট টমাস কলেজে বি. এ. ক্লাশের ছাত্র থাকতে থাকতেই নাম্বুদিরিপাদের লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটে। খুব শীঘ্রই তিনি গ্রেপ্তার হন; প্রায় তিন বছরের কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয় তাঁকে। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে 1933 সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

কারাগারের জীবন নাম্বুদিরিপাদকে বিপ্লবী করে তোলে। ক্যানানোর সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন তিনি

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী কমলনাথ তিওয়ারী এবং বাংলার অনুশীলন সমিতির সেনগুপ্ত, চক্রবর্তী এবং আচার্যের মত রাজবন্দীদের সংস্পর্শে আসেন। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বীজবপন করা হয়েছিল ঐ ক্যানানোর সেন্ট্রাল জেলেই। কেরালায় কম্যুনিস্ট পার্টির সংস্থাপক স্বর্গত পি. কৃষ্ণ. পিল্লাইও ঐ একই কারাগারে বন্দী ছিলেন। কারাগারের অন্তরালে নাম্বুদিরিপাদ, কৃষ্ণপিল্লাই এবং অন্যান্যদের সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই নীতিগুলি কেরালা কংগ্রেসে তুলে ধরতে চান। অতএব 1934 সালে পাটনায় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির জন্ম ঘোষিত হলে নাম্বুদিরি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য হলেন। তিনি এই সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদকও নিযুক্ত হন। 1934 সালে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ একই বছরে কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কাজকর্মের দায়িত্ব পরিচালনার সুযোগ লাভ করেন নাম্বুদিরিপাদ। স্বভাবতই তাঁর সংস্পর্শে এসে কংগ্রেসের উপর সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব বেশীমাত্রায় পড়তে শুরু করে এবং কংগ্রেস আস্তে আস্তে একটি গণমুখী দলে পরিবর্তিত হয়।

কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে 1937 সালে নাম্বুদিরিপাদ মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। 1937-1939 সাল পর্যন্ত তিনি কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। 1940 সালে কেরালায় নাম্বুদিরিপাদের সহায়তায় সমগ্র কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি 'কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ায়' রূপান্তরিত হয়। 1943 সালে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটিতে তিনি নির্বাচিত হন, 1964 সালে কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়া অবধি তিনি দলের পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন। সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের সদস্যরূপে তিনি দলকে প্রভূতভাবে সেবা করেন; 1953 সালের পর অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে একাধিকবার কাজকর্ম চালান। আদর্শগত বিরোধের ফলে যখন কম্যুনিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া (মার্কসিস্ট) দলে যোগ দেন এবং তারপর থেকেই পলিটব্যুরোর সদস্য হিসেবে পার্টিকে নানাভাবে সাহায্য করে আসছেন।

1952 সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মাদ্রাজ বিধানসভার জন্য কালিকট কেন্দ্রের প্রার্থী হলে, নাম্বুদিরিপাদ পরাজিত হন। কিন্তু 1957 সালের নির্বাচনে তিনি শুধুমাত্র নীলশ্বরম্ কেন্দ্র থেকেই নির্বাচিত হন নি, কম্যুনিস্ট এবং কম্যুনিস্ট দলের সমর্থক অন্যান্য দলের প্রার্থীরা কেরালা বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার ফলে তিনি কেরালায় প্রথম কম্যুনিস্ট সরকার গঠন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 1959 'র জুলাই মাসেই নাম্বুদিরি সরকারের পতন হয়। 1960 সালের অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে নাম্বুদিরিপাদ পাট্টাম্বি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে কেরালা বিধানসভায় বিপক্ষ দল গঠন করেন। 1967 সালে সি. পি. আই (এম), সি. পি. আই., মুসলীম লীগ, আর. এস. পি এবং আরও কয়েকটি আঞ্চলিক দল সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিনিধিরূপে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী হন। যুক্তফ্রন্টে পুনরায় ভাঙন ধরলে নাম্বুদিরিপাদ 1969 সালে পদত্যাগ করেন এবং তারপর থেকেই তিনি কেরালা বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা হয়ে কাজ করে চলেছেন।

মালয়ালাম সাহিত্যে নাম্বুদিরিপাদ এক খ্যাতনামা লেখক। তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ- "Jawaharlal Nehru", "Socialism", "Keralam Malayalikalute Mathrubhoomi" (Kerala, the Motherland of the Malayaus)," "Keralathik Deseeya Prasham "(The National Question in Kerala), "Gandhi and Gandhism" ও "Autobiography"। ইংরাজি ভাষায় লেখা তাঁর বইগুলির অন্যতম—"The National Question in Kerala," "Gandhi and his Ism," "The Peasant Question in Kerala" এবং "Kerala Yesterday, Today and Tomorrow। মালয়ালম ভাষায় লেখা তাঁর আত্মজীবনী কেরালা সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক পুরস্কারভূষিত হয়েছে।

পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অভ্যাসে নাম্বুদিরিপাদ এক সহজ সরল মানুষ। সাধারণ মালয়ালীর মত তিনি সাদা ধুতি এবং সাদা শার্ট পরেন। নিষ্ঠাবান, নিরামিষাশী মালয়ালী ব্রাহ্মণ হলেও, আমিষ খাদ্যের প্রতি তাঁর কোনরকম অনীহা নেই।

বাইরের এই সারল্য ভেদ করে আলাপকারীর কাছে ফুটে বার হয় নাম্বুদিরিপাদের অন্তরের ধ্যান-ধারণার বৈচিত্র্য। মানুষ, বিষয়বস্তু এবং তার ভাবনা মূল্যায়ন করার এক বিশেষ পদ্ধতি আছে তাঁর। পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটি তাঁর এতই প্রখর যে, যাঁকে তিনি পছন্দ করেন না তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখার চেষ্টাও তিনি করেন না। একবার এমন ঘটেছিল যে উত্তর ভিয়েৎনামের (যাদের স্বপক্ষে ছিলেন নাম্বুদিরিপাদ) প্রতিনিধিদলের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে কেরালার সি. পি.

আই মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেনন যোগ দিয়েছেন শুনে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। জাতীয় নেতা গান্ধীজী ও নেহরু সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত শুনে মনেই হয় না যে ওঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমন কি গান্ধী সম্পর্কে নাম্বুদিরিপাদের মূল্যায়ন লেনিনের (যাঁকে তিনি বহু বিষয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা বলে মনে করেন) মূল্যায়নের সম্পূর্ণ বিপরীত। লেনিনের মতে বস্তুনিষ্ঠ বিচারে ভারতের সংগ্রামে গান্ধীজীর ভূমিকা ছিল বৈপ্লবিক।

যাইহোক, নাম্বুদিরিপাদ জাতীয় আন্দোলন বা অন্যান্য আন্দোলন সম্পর্কে যে মতই পোষণ করুন, একথা ঠিক যে জাতীয় জীবনের যে কোন সমস্যাই তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আমাদের "পাঁচশালা পরিকল্পনার" প্রতি তাঁর রয়েছে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংসস্তূপের উপর এক নূতন ভারতবর্ষ গড়ার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। যতদিন যুক্তফ্রন্টের সম্মিলিত দলগুলি ভারতীয় মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে নেবে ততদিন নাম্বুদিরিপাদ যুক্তফ্রন্ট গঠনে আগ্রহী। শ্রেণী সংগ্রামের জবরদস্ত সমর্থক তিনি, সাহিত্য যে এমন উদ্দেশ্যকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় এ কথা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন।

গোড়ার দিকে কেরালার জনসাধারণের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে চেতনা জাগাবার জন্য নাম্বুদিরিপাদ সক্রিয় ভূমিকা নেন। কম্যুনিস্ট আন্দোলন শুরু করতে পি. কৃষ্ণপিল্লাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও পথপ্রদর্শক বলা হয়। তাঁর চল্লিশ দশকের রচনায় প্রভাবিত হয়ে বহু বুদ্ধিজীবী ও লেখক কম্যুনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির "ক্যালকাটা থিসিজের" উপর নির্ভর করে যখন তিনি এক ছাড়পত্র প্রস্তুত করেন, তখন অনেকেই বিমর্ষ হন। তবুও এখনও কেরালার বিপুল সংখ্যক মানুষ মনে করে যে নাম্বুদিরিপাদের মত মহৎ ব্যক্তিই দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম।

[Namboodiripad—Autobiography (Malayalam) ;—National Question in Kerala ; C. P. Sreedharan—Writers of To-day (Malayalam) ; N. E. Balaram—A Short History of the Communist Party of India (Malayalam) ; India Who's Who, New Delhi, 1969 ; Kerala Legislative Assembly Who's Who (1972). Personal Knowledge of the Contributor.]

পি. কে. গোপালকৃষ্ণ

ই. ভি. রামস্বামী নায়েকার (১৮৭৯-১৯৭৩)
E. V. Ramaswami Naicker (1879-1973)

দ্রাবিড় আন্দোলনের ইতিহাসে ই. ভি. রামস্বামী নায়েকার ছিলেন নিঃসন্দেহে এক বরেণ্য নেতা। কন্নড় নায়েকার সম্প্রদায়ের একটি বিত্তবান পরিবারে 1879 সালের 17 সেপ্টেম্বর এরোড-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চিন্নথাই আম্মাল ছিলেন তাঁর মাতা। পিতার নাম বেঙ্কটপ্পা নায়েকার। তাঁর মাতাপিতা ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু; এজন্য তাঁরা চেয়েছিলেন সনাতন প্রথা অনুযায়ী পুত্রকে মানুষ করে তুলবেন। কিন্তু অবাধ্য বালক রামস্বামীকে তাঁরা বশে আনতে পারেন নি। তিন বৎসর তাঁকে নিকটবর্তী বিদ্যালয়-এ রাখার পর শিক্ষক মহাশয় জানালেন যে সে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের অযোগ্য। এরপর তাঁর অভিভাবকরা তাঁকে ব্যবসায় দেখাশোনা করার কাজে নিয়োগ করেন এবং উনিশ বৎসর বয়সের সময়ে তের বৎসর বয়স্কা দূর সম্পর্কিত ভগিনী নাগাম্মাল-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন।

যুবক রামস্বামী গরীব এবং অস্পৃশ্যদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ধর্মীয় পুস্তকগুলি পড়েন এবং একজন জিজ্ঞাসুর ভূমিকা নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এইসব আলোচনা তাঁর জ্ঞান অর্জনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে যে বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য তিনি আবিষ্কার করেন তা তাঁর যুক্তিবাদী মনে গভীর রেখাপাত করে। সত্যকে জানার উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর ভারত পরিভ্রমণে বার হন। কিন্তু বর্ষা ও শীতের প্রকোপে জর্জরিত হয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অনেকটাই হারিয়ে তিনি গৃহে ফিরে আসেন এবং তখন থেকে সামাজিক সমস্যার সংস্কার সাধনে দৃঢ়সংকল্প হয়ে আত্মনিয়োগ করেন। অতীতেও সামাজিক সংস্কারের কাজ তিনি হাতে নিয়েছিলেন কিন্তু সেগুলি তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। সুতরাং নতুন

দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতি গ্রহণ করাই তাঁর কাছে বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে হল।

এরোড-এ তাঁর জীবন শুরু হয় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণাকারী এবং সামাজিক সমতা আনয়নকারীর পথ নির্দেশকরূপে। এরোড মিউনিসিপাল কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়ে তিনি এর সভাপতি হন এবং তাঁর কাজ ও যোগ্যতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। সেই সময়ে তিনি পি. বরদারাজুলু নাইডু এবং ভি. ও. চিদাম্বরম পিল্লাই-এর সাহচর্য লাভ করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের শরিক হন। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর আমন্ত্রণে তিনি কংগ্রেস দলে যোগ দেন। এই দলের প্রচারসূচীতে যে বিষয়গুলি ছিল—স্বদেশের স্বাধীনতা, সমাজের পুনর্গঠন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং মাদকদ্রব্য বর্জন-সবই তাঁর মতের সঙ্গে মিলে যায়। একজন জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি দলের তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করেন এবং সাধারণ মানুষকে এই দলের সামিল হতে আহ্বান জানান। 1920 সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। মাদ্রাজ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে 1922 সালে তিনি নির্বাচিত হন। কিন্তু ব্রাহ্মণ শ্রেণীর নেতৃত্বে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তিনি ঐ পদ লাভে বঞ্চিত হন। ত্রিবাংকুর-এর হরিজনদের উপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করার দাবীতে ভাইকোম সত্যাগ্রহে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা, তিরুনেলভেলীর সেরমাদেবীতে কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত গুরুকুলে অব্রাহ্মণ সভ্যদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণের বিরুদ্ধে তাঁর হস্তক্ষেপ এবং প্রশাসন ও বিধানসভায় অবহেলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবীগুলি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত এবং সমালোচিত হলে তিনি দলের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন।

নিপীড়িত সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে নায়েকার 1925 সালে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এর কিছু পরে 1931 সালে তিনি ইউরোপ এবং রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই দেশের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের সমস্যার সমাধান নিহিত আছে বস্তুবাদে, অধ্যাত্মবাদে নয়। 1933 সালে যখন তিনি এদেশের মানুষকে ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্ররোচনা দেন, সে সময় তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। 1937 সালে তিনি প্রথম হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এজন্য রাজাগোপালাচারী সরকার তাঁকে কারান্তরালে প্রেরণ করেন। কারাগৃহে থাকার সময়েই তিনি "জাস্টিস পার্টির" সভাপতি নির্বাচিত হন। 1944 সালে তিনি "জাস্টিস পার্টিকে" দ্রাবিড় কাঝাগাম বা দ্রাবিড়দের সংঘ-এ রূপান্তরিত করেন। এই দলের ঘোষিত নীতি ছিল একটি সার্বভৌম এবং বর্ণহীন দ্রাবিড়নাড়ু প্রতিষ্ঠা করা। 1949 সালে তাঁর প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি মানিতাম্মাই নাম্নী আঠাশ বছর বয়স্কা দলের এক কর্মীকে বিবাহ করেন। এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু সংখ্যক সদস্য তাঁর দল পরিত্যাগ করে। এদের নেতৃত্ব দেন আন্নাদুরাই। বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার আকাংক্ষাই এই সদস্যদের দলত্যাগের কারণ। এসব সত্ত্বেও নায়েকার-এর প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। রাজগোপালাচারীর বর্ণগত পেশাভিত্তিক শিক্ষানীতির তিনি বিরোধিতা করেন। এর ফলে মাদ্রাজে 1953 সালে কামরাজ মন্ত্রীসভা শাসন ক্ষমতা লাভ করে। 1967 সালে নির্বাচনে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগাম দলের জয় তার জীবনের উদ্দেশ্যের চরিতার্থতার জয়। 1971 সালের জানুয়ারী মাসে তিনি কু-সংস্কার নির্মূলীকরণ সমাবেশের আয়োজন করেন। এই অধিবেশন ধর্ম, জাতি এবং ভাষাভিত্তিক বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানায়; এছাড়া ধর্মীয় রীতিনীতির সমালোচনা করার স্বাধীনতা দেওয়া এবং হিন্দু দেবদেবীদের "রক্ষণ" করার নীতি প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবী জানানো হয়।

নায়েকার-এর কর্মতৎপরতার প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল কোয়াম্বাটুর, এরোড, সালেম, মাদ্রাজ এবং তিরুচিরাপল্লী। প্রধানতঃ জাতীয়তার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কাল ছিল 1918 থেকে 1934 সাল পর্যন্ত। একজন জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি মনে করতেন যে একমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারাই ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব। উদার চিন্তাধারার মাধ্যমে সামাজিক সংস্কারে এক প্রচেষ্টা 1934 সাল থেকেই তিনি শুরু করেন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁর বক্তৃতায় নায়েকার হিন্দুধর্মকে ব্রাহ্মণ শাসিত এক যন্ত্ররূপে বর্ণনা করেন। মনুর বিধানকে অমানবিক, পুরাণ গ্রন্থগুলিকে রূপকথা বলে আখ্যা দেন। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতামূলক বৈধব্য জীবন প্রভৃতি প্রথাগুলিকে তীব্র আক্রমণ ও নিন্দা করেন। কোয়েম্বাটুরের এক সভায় (1958) তিনি ঘোষণা করেন, "প্রায় সর্বপ্রকার সুদর্শন

পশুপাখি আমাদের আরাধ্য দেবতা। উই-ঢিপি আমাদের স্ত্রীজাতিকে আমন্ত্রণ জানায় দুধ ঢালার জন্য। কেন প্রতিদিন বিভিন্ন দেবতাকে স্নান করানো হয়, নূতন বস্ত্র পরিধান করানো হয়? এমনকি স্ত্রী-দেবতাদেরও পোশাক পরিবর্তন করেন পুরুষ পুরোহিতরা। দেবতা যাঁরা তাঁদেরও রয়েছেন পত্নী ও উপপত্নী। প্রতিবৎসর আবার তাঁদের বিবাহোৎসব পালন করা হয়। বিভিন্ন অস্ত্রে এক এক দেবতা সজ্জিত—কেউ ত্রিশূলধারী, কেউ তীর ধনুকধারী, কেউ বা গদা ও ছুরিকা শোভিত। এক দেবতা তো তাঁর অঙ্গুলিতে সদা ঘূর্ণায়মান চক্রকে ধরে রাখেন। এই যে এত অস্ত্রের সমারোহ এর কারণ তো একটিই। দেবতারা দুষ্টের দমন করেন এই সকল অস্ত্রের সাহায্যে। কখনও যুদ্ধ করে, কখনও বধ করে, কখনও বা শুধু বল প্রয়োগের মাধ্যমে। যদি তাই-ই হয়, তাহলে এখনও কি সময় হয়নি আমাদের দেবতাদের আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করার? তীর-ধনুকের পরিবর্তে কি মেশিন-গান এবং হাত-বোমা দেওয়া উচিত নয়? ঐ সেকেলে রথে কি কৃষ্ণকে আর সাজে? পরিবর্তে আধুনিক ট্যাঙ্ক-আরোহী হলেই তাঁকে মানায়। এইসব ধর্মীয় প্রথাগুলির সংস্কার সম্ভব নয়। এগুলির অবসানই কাম্য। ব্রাহ্মণ শাসিত হিন্দুধর্মও এইরূপ। এর বিনাশই শ্রেয়ঃ।"

এইভাবে তিনি যে শুধুমাত্র হিন্দুধর্মকেই সমালোচনা করেছেন—তার কু-সংস্কারকে আক্রমণ করেছেন তাই নয়, দ্রাবিড়দের উপর হিন্দী ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তামিল ভাষা সুসংস্কৃত করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। ভারতীয় সংবিধানকে নায়েকার দ্রাবিড়দের উপর আর্য নির্যাতনের এক হাতিয়াররূপে বর্ণনা করেন। তাঁর আদর্শ আঞ্চলিকতাবাদের প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করেন, নাটক মঞ্চস্থ করেন, আন্দোলন পরিচালনা করেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং আত্মসম্মানের পরিপূরক নতুন বিবাহ বিধির প্রচলন করেন। তিনি অসংখ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশ করেন। "কুদিবরসু" (জনগণের সরকার), "পুরাত্চী" (বিপ্লব), "পকুথরিয়ু" (অন্তর্দৃষ্টি) এবং "বিদুথালাই" (স্বাধীনতা) পত্রিকাগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর সহজ অনাড়ম্বর পোশাক ও শ্মশ্রুধারী মুখমণ্ডলের অন্তরালে সদাই বিরাজিত ছিল অবহেলিত সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সামাজিক অনাচার দূরীভূত করার দৃঢ় সংকল্প। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন ক্রোধপ্রবণ। জনগণের মানসিক প্রবণতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিতর্কিত নীতি গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। নায়েকারের মতে সামাজিক বৈষম্য ও অনাচার দূর করতে হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; যেমন ব্রাহ্মণদের যজ্ঞোপবীত বা টিকি কেটে দেওয়া, পাদুকা দ্বারা দেব দেবীকে আঘাত দেওয়া ও প্রতিমা ভেঙ্গে দেওয়া। একমাত্র এইপ্রকার আঘাতের দ্বারাই সামাজিক কু-সংস্কার থেকে হিন্দু সমাজকে মুক্ত করে সমাজে নূতন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন।

বর্তমান যুগের সমাজ-বিপ্লবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য রামস্বামী নায়েকার অন্যান্য উদারমতাবলম্বী সংস্কারদের ন্যায় একাধারে নিন্দা ও প্রশংসার অংশীদার হয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁকে বর্বর বলে অভিহিত করেন। গোঁড়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তাঁকে প্রচলিত সংস্কার ভঙ্গকারী ব্রাহ্মণ-বিরোধীরূপে চিহ্নিত করেন। কিন্তু নায়েকার এ জাতীয় নিন্দাবাদে কর্ণপাত করতেন না। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও দুঃসাহসিক দার্শনিক; নিজের আদর্শকে সার্থক করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন। স্বীয় বিশ্বাস ও একাগ্রতার বলে লক্ষ্যে পেঁছিবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কোন পরিণামের কথাই কখনও চিন্তা করতেন না। 1971 সালের জানুয়ারী মাসে তিনি "কু-সংস্কার দূরীকরণ সম্মেলন" সংগঠন করলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু নায়েকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে উত্তর দিয়েছিলেন, "এজাতীয় বিক্ষোভ আমার কাছে নূতন নয়। একে আমি আমার উদ্দেশ্য, বিশ্বাস ও নীতির পুরস্কাররূপে গ্রহণ করি।" একজন অতুলনীয় নেতা, উদার চিন্তাবিদ এবং সমাজ-সংস্কারকরূপে নায়েকার দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র পূজিত হন। শ্রদ্ধাভরে তাঁকে সেখানে "থানথাই" বা "পিতা" এবং "পেরিয়ার" বা "মহাত্মা" বলে সম্মানিত করা হয়।

[An Admirer—Periyar E. V. Ramaswami, Erode, 1962 ; Anandurai, C. N.—Nadum Yedum ; Chidambaranar—Thamizhar Thalaivar, Erode, 1960 ; The Dinamani Kadir (Weekly), 11 March 1969 ; The Hindu Files ; Janardhanan, A. P.—Anna, A Sketch ; Naicker, E. V. Ramaswami—Ariya Chadar, Tiruchurapalli,

1968 ;—Ini Varum Ulakam, Erode, 1961 ; —Mathacheharpin Maiyum Nama the Arasum, Tiruchurapalli, 1968 ;—Social Reform or Social Revolution, Madras, 1965 ;—Suthanthira Nadu En, Erode, 1961 ;—Thathuna Vilakkam, Erode, 1960 ;—Vaikam Poratta Varataru, Erode, 1968 ;—Smith, D. E.—South Asian Politics and Religion, Princeton, 1966.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) কে. রাজাইয়ান

ই. রাঘবেন্দ্র রাও (১৮৮৯-১৯৪২)

E. Raghavendra Rao (Dr.) (1889-1942)

ডক্টর ই. রাঘবেন্দ্র রাও লোকসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্য এবং একটি রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় রাজ্যপাল যিনি ব্রিটিশ শাসনকালে শাসন-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের সময়ও সর্বদাই খাদি পোশাক এবং গান্ধী টুপি ব্যবহার করতেন।

1889 সালের 4 আগষ্ট নাগপুরের নিকটবর্তী কামপ্‌টিতে ডঃ রাও জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গতিপূর্ণ পরিবারের সন্তান ডঃ রাও এর আদি নিবাস ছিল অন্ধ্র-প্রদেশের কিসনা জেলার পেড্‌ডামড্‌ডালি গ্রামে। 19 শতকের প্রথম দিকে এই পরিবারটি সেই গ্রাম থেকে এসে কাম্‌পটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁর পিতা এড়ুপুগান্তি নাগাম্না পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে নিজেকে ঠিকাদাররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

ই. নাগাম্না এবং লক্ষ্মী নরসম্ভমা বুঝতে পেরে-ছিলেন যে তাঁদের পুত্র রাঘবেন্দ্র অত্যন্ত প্রতিভাবান। সে কারণে তাঁর শিক্ষার প্রতি তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। বিলাসপুরের মিউনিসিপল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাঘবেন্দ্র রাওকে পরবর্তী শিক্ষার জন্য পাঠানো হল নাগপুরের হিস্‌লপ্‌ কলেজে।

রাও পরিবারের আধ্যাত্মিক জগতে পথপ্রদর্শক ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী গঙ্গাধর মহারাজ। ইনি মহারাষ্ট্রের আক্‌কাল কোটের সদগুরু মহ্‌লজীর পবিত্র স্মৃতি মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মীয় প্রধান ছিলেন। রাঘবেন্দ্র রাওকে ইংলণ্ডে আইন শিক্ষার জন্য প্রেরণ করার যে সিদ্ধান্ত নাগাম্না নেন গঙ্গাধর মহারাজ সেজন্য সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। গুরুর প্রতি তিনি আজীবন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এমন কি 1936 সালে সি. পি. এবং বেরারের রাজ্যপালের পদে আসীন থাকা কালেও ডঃ রাও গঙ্গাধর মহারাজের নাগপুর পরিভ্রমণের সময় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসতেন।

1909 সালে ডঃ রাও ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন একজন বহিরাগত ছাত্র এবং তিনি মিডল টেম্পল থেকে আইন পাঠের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করতেন, এমনকি ধূমপানও করতেন না।

ডঃ রাও-এর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয় 1917 সালে। সে সময় তিনি তিলক এবং মিসেস অ্যানি বেসান্ত পরিচালিত হোমরুল আন্দোলনে যোগদান করেন। লোকমান্য তিলকের নেতৃত্ব তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। দেশের জাগরণ এবং স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন।

যদিও তিনি সরকারের সঙ্গে প্রতিবেদনশীল সহ-যোগিতার সমর্থক ছিলেন, কিন্তু গোঁড়া জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে সরাসরি দোষারোপও করেছেন। একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে 1921 সালে জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত হিন্দী সি. পি. প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে তাঁর সভাপতির ভাষণ থেকে। তিনি বলেছিলেনঃ "আমরা মনে করি বর্তমান সরকারী ব্যবস্থা আদর্শের দিক থেকে টিঁকে থাকতে পারে না, রাজনৈতিকভাবে অনুভূতিশূন্য এর লক্ষ্য হল আমাদের পৌরুষকে বলহীন করে দেওয়া এবং আমাদের অর্থনৈতিক দাসত্বকে সম্পূর্ণ করা।"

ডঃ রাও তাঁর কর্মজীবনের প্রথম থেকেই আইনের সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঠাকুর ছেদিলাল, হরি সিং গৌর, পণ্ডিত বিষ্ণু দত্ত শুক্লা এবং এস. বি. তাম্বের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অল্প দিনের মধ্যেই রাজ্যে প্রথম সারির নেতারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। 1921 সালে 'হিন্দী সি. পি. প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হল তাঁকে। 1923 সালের নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের সাফল্যের পিছনে ছিল তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা। সি. পি. ছিল দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে স্বরাজ্য পার্টি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে এরকম

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। সে সময় ডঃ রাও-এর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন ডঃ বি. এস. মুঞ্জে, বি. জি. খাপার্দে এবং পণ্ডিত রবি শঙ্কর শুক্লা (পরবর্তীকালে যিনি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।)

1924 সালের জানুয়ারীতে যে নতুন মন্ত্রীসভা দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবকে সার্থকভাবে আনয়ন করে সি. পি. আইন সভায় তিনি রীতিমত ইতিহাস সৃষ্টি করেন। 1919 সালের সংস্কার আইনে' (Reform Act) এটাই ছিল সরকারের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব এবং একে 'সংস্কার আইন' (Reform Act) অনুসারে আইনসভার অভ্যন্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সাফল্য হিসেবে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে তিনি এক জোরালো ও তেজোদীপ্ত ভাষণ দেন যাতে তিনি রাজ্যপালের সমগ্র কার্য পরিকল্পনা পদ্ধতিকে অকাট্যভাবে অভিযুক্ত করেন। এছাড়া তিনি আরও "দুজন শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোকের কার্যের সমালোচনা করেন যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ কোন দলের কাছে উল্লেখ মাত্র না করেই নির্বাচকমণ্ডলী ও আইনসভার তরফে হস্তান্তরিত বিভাগগুলিকে পরিচালনা করার নৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণকে উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন।"

1926 সালের মার্চ মাসে ডঃ রাও স্বরাজ্য দলের জাতীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে নিয়ে ঘোষণা করেন যে তাঁর পার্টি আর বাজেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবে না। পরিষদকে কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয় এবং সেকারণে সি. পি. তে দ্বৈতশাসন কার্যতঃ বাতিল হয়ে যায়।

ডঃ রাও অবশ্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন কেননা তিনি কংগ্রেসের পরিকল্পনা এবং নীতি পছন্দ করতেন না।

ইতিমধ্যে স্বরাজ্য দল অভ্যন্তরীন বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং ডাঃ রাও সি. পি. এবং বেরারের হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিতে একটা স্বতন্ত্র দল গড়ে তোলেন। 1926 এর নির্বাচনে এই নতুন দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়ে পরাজিত হলেন কিন্তু তিনি নিজে কাউন্সিলে নির্বাচিত হন।

অন্যান্য দলের সমর্থন না পাওয়াতে যেহেতু কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তি সমাবেশ করতে পারে নি, তিনি তেত্রিশজন সদস্যের একটি গোষ্ঠী গঠন করেন যার নামকরণ করেন 'ন্যাশনালিস্ট পার্টি' এবং 1927 সালের 12 জানুয়ারী তিনি এবং আর. এম. দেশমুখ মন্ত্রী নিযুক্ত হন। 1927-28 সাল পর্যন্ত মন্ত্রীসভা বহাল থাকে। 1930 সালের পর তিনি আর কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। 1942 সালের 15 জুন তাঁর অকাল মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রতিবেদনশীল সহযোগিতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোনও আত্ম-মর্যাদার প্রশ্নে আপোষ না করে কোন না কোনও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনা করে গিয়েছেন।

তাঁর জীবনের আরম্ভ থেকেই ডাঃ রাও এই ধারণা পোষণ করতেন যে স্বায়ত্ত শাসনের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যখনই সরকার সমতার ভিত্তিতে সহযোগিতা চাইবেন তখনই সহযোগিতার হাত বাড়ানো উচিত। এই পথ অনুসরণ করে তিনি সি. পি. সরকারের মন্ত্রীত্বভার দু'বার গ্রহণ করেন এবং পরে 1930 সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন। 1936 সালে তিনি রাজ্যপাল রূপে কাজ করেন। 1937 সালে তিনি রাজ্যের আইন সভায় নির্বাচিত হন এবং সে সময় যখন কংগ্রেস কার্যভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তখন তিনি একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং 1937 সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

পরে 1939 সালে তিনি লণ্ডনে ভারতের "সেক্রেটারী অব্ স্টেট্স" এর উপদেষ্টা পদে আসীন হন। 1941 সালে তিনি অসুস্থ শরীরে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন আরও একটি দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার নিয়ে। ভাইসরয়ের বর্ধিত কর্ম পরিষদে তিনি 'সিভিল ডিফেন্স' মন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। 1942 সালের মৃত্যুকাল অবধি বাকী সময়টুকু তিনি বস্তুত শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের বিরাগভাজন হন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে প্রতিরক্ষা দপ্তর একজন ভারতীয়কে অবশ্যই দেওয়া উচিত।

ডাঃ রাও, সর্বভাবে একজন বুদ্ধিজীবী ছিলেন। তিনি উদার মনোভাবাপন্ন পুরুষ ছিলেন। শিক্ষার প্রসারকে তিনি সমর্থন করতেন এবং সি. পি. তে জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে পরিচালনা করার কাজে ঠাকুর ছেদিলাল এবং শ্যামসুন্দর ভার্গবের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষামণ্ডল গড়ে তোলেন। নাগপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

তাঁর পরিবারের কৃষি সংক্রান্ত পশ্চাদ্‌পট তাঁকে কৃষকদের সমস্যার সমাধানে আগ্রহী করে তোলে এবং 1933 সালে আইন পরিষদে ঋণ সংক্রান্ত বিরোধ নিরোধক এবং 'মহাজনী রেজিস্ট্রেশন আইন' পাশ করাতে সাহায্য করেন। সহযোগিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম ব্যক্তি যিনি সমবায়গুলিকে তাদের কার্যপরিধি ঋণমুক্ত কাজকর্মের দিকে অগ্রসর করতে বলেন। তাঁর সাংবাদিকতার প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা। পণ্ডিত বিষ্ণু দত্ত শুক্লা এবং মাধব রাও সাপ্রের সঙ্গে তিনি জব্বলপুরে হিন্দী "কর্মবীর" প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই সংবাদপত্রই পণ্ডিত মাখনলাল চতুর্বেদীর সম্পাদনাকালে খুব জনপ্রিয় হয়।

[The History of the Freedom Movement in Madhya Pradesh (Government of M. P. Publication), Nagpur, 1956 ; Maman Rao Khankhote—Seminary Hill Ka Jadugar Ya Swargeeya Dr. E. Raghavendra Rao Ka Alp Parichay (in Hindi), Bilaspur, 1942 ; Personal Papers of Dr. Raghavendra Rao Preserved at the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi ; Information supplied by E. Nagaswara Rao, son of Dr. E. Raghavendra Rao. The Gazeteer of India Extraordinary, Home Department (Public) Notification, 15 June 1942 ; The Indian Annual Register, 1924, Vol. I. The Hindusthan Times and the Statesman, New Delhi, 16 June, 1942 ; The Hindu, Madras, 20 June 1942 ; The Pioneer, Lucknow, 26 June 1942.]

(এল. দেওয়ানি)   জি. টি. পরাণ্ডে

ই. সুরেন্দ্রনাথ আর্য (?—?)

E. Surendranath Arya (?—?)

ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে একজন গোঁড়া দেশপ্রেমিক এথিরাজুলু সুরেন্দ্রনাথ আর্য মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ জানা যায়নি। জন্মসূত্রে তেলেগুভাষী, ধর্মে হিন্দু, তিনি ছিলেন রাজুপরিবারের সন্তান। এঁরা সম্ভবতঃ এসেছিলেন করবতনগর থেকে কিন্তু পরে মাদ্রাজের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি ছোট-খাট কিছু কাজ করেছিলেন কিন্তু সে কাজে বিশেষ সুবিধা হয়নি। এই সময় তিনি দ্রাবিড় আন্দোলনের নায়ক এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষভাবে বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন। কয়েকবছর তিনি 'আত্মসম্মানের জন্য আন্দোলনে' নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, 'আত্মসম্মানের আন্দোলনে'র নীতিগুলি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির অপরিহার্য সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বদেশী আন্দোলনকে গড়ে তোলার কাজে মনপ্রাণ নিয়োগ করেছিলেন এবং মাদ্রাজের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছিলেন। 1908 সালে তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং 1909 সালে বিপিনচন্দ্র পালের মুক্তির জন্য আয়োজিত সভায় পুলিশের নিষেধ অমান্য করেছিলেন। সভাতে তিনি বক্তৃতা দিতেন, জনসাধারণকে উত্তেজিত করতেন এবং বলতেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আদালতে নিয়ে গিয়ে বলা হয় যে বিদেশীদের বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলছেন প্রবলভাবে। এই কারণে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়।

মাদ্রাজকে তাঁর কর্মকেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়ে আর্য বিশেষভাবে তেলেগুদের মধ্যে কাজ শুরু করেছিলেন। 1900 সাল থেকে 1909 সাল পর্যন্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন অংশে যে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল সেই মতবাদকে সংগঠিত করে তোলার কাজে তাঁর সবিশেষ অবদান ছিল। জনগণকে রাজনৈতিক দাসত্বে পরিণত করার জন্য জনগণের রোজগার শোষণ করার জন্য এবং দমনমূলক নীতি গ্রহণের জন্য তিনি ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড সমালোচনা করতেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবক্তারূপে তিনি ব্রিটিশ সরকারের ব্যবসায়িক নীতিকে দোষারোপ করতেন এবং দেশীয় শিল্পের অধোগতির দায়িত্ব অসম আর্থিক বণ্টনের উপর আরোপ করে জনসাধারণকে শুধু মাত্র গোঁড় ভারতীয় দ্রব্য ব্যবহারের জন্য বলতেন। তিনি ছিলেন একতা এবং হিংসাত্মক সংগ্রাম দেশে স্বাধীনতা এনে দেবে। "এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে আমাদের লক্ষ্য

স্বরাজ। সেদিন আসবে যেদিন আমরা সবাই একতাবদ্ধ হব।"

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত চেন্নাই জনসঙ্গমের শুভারম্ভের এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন "কম কথা বল এবং বড় কাজ কর। আমেরিকাবাসীরা ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছে তাদের দেশের জন্য এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছে। রুশরা জাপানীদের সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করেনি এবং পরাজিত হয়েছে। ভারতবর্ষ সমুদ্রে একটা জাহাজের মতো ডুবতে চলেছে কিন্তু আমরা আমাদের দেশের ভাল করার চেষ্টা না করে নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে নিমজ্জিত রয়েছি। ইংরেজের শক্তি ভারতের সেনাবাহিনীতে কেন্দ্রীভূত। যে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে আমরা সেই বৃহৎ শক্তিকে করায়ত্ত করবো, তাকে ছিন্ন ভিন্ন করবো এবং তার রক্ত শুষে নেবো। আত্মা অবিনশ্বর এবং আমাদের জাতির উন্নতির জন্য আমরা নিশ্চয়ই আমাদের জীবন উৎসর্গ করবো।"

একজন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী সুরেন্দ্রনাথ আর্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাঁর সমস্ত কর্মময় জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ করা সত্ত্বেও ইংরেজ জনসাধারণের প্রতি তাঁর কোনও বিদ্বেষ ছিল না। একজন গোঁড়া হিন্দু হিসেবে তিনি তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে আধ্যাত্মিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক। জাতিভেদ প্রথার দোষগুলি এবং এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশকে শোষণের বিরুদ্ধে তিনি স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন চারিত্রিক মর্যাদা, সংবদ্ধ সুগঠিত জীবনযাপনের আদর্শ।

[Hindu Files (specially of 1908) ; Justice, 1929 ; History of the Madras Police, 1959.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) কে. রাজাইয়ান

ইউ. গোপাল মেনন (১৮৮৩-১৯৬৪)

U. Gopala Menon (1883-1964)

ইউ. গোপাল মেনন 1883 সালের 23 জুন, কালিকট শহরে তিরুভানুরের উল্লাত্তিলে এক মধ্যবিত্ত নায়ার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আচায়ত ভালাম্পা মেনন ছিলেন কালিকটে পিয়ার্স লেসলি এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজার। মার নাম ছিল উল্লাত্তিল উন্নীপারু আম্মা। অনেক প্রভাবশালী লোকজনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল মতবাদে বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁর চার ভাই এবং তিন বোন। এঁরা সকলেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

1911 সালে তিনি মালাবারের এক সম্ভ্রান্ত নায়ার পরিবারের পেরুমভিলাবিলের নারায়ণী আম্মাকে বিবাহ করেন। তাঁদের দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান।

গুরুর অধীনে মালয়ালাম এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন করার পর তিনি 1898 সালে কালিকটের ব্যাসেল জার্মান মিশন কলেজ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কালিকটের কেরালা বিদ্যাশালা থেকে তিনি এফ. এ. এবং মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

1906 সালে তিনি মাদ্রাজ 'ল' কলেজ থেকে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কালিকটের ব্যাসেল জার্মান মিশন কলেজের ফাদার নেবলুক প্রথমদিকে তাঁর চরিত্র এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে গোখলে, গান্ধীজী, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত এবং সি. রাজাগোপালাচারীর প্রভাব তাঁর রাজনৈতিক,জাতীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হয়েছিল।

একদিকে যেমন মহাভারত, রামায়ণ এবং গীতা ছিল তাঁর নির্দেশিকা গ্রন্থ, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর পথ প্রদর্শক ছিলেন রমন মহর্ষি। কোরাণ এবং বাইবেল পড়ে তিনি প্রভূত আনন্দ পেতেন।

1910 সালে কালিকট বারে উকিল হিসাবে ব্যবসায় শুরু করার পর তিনি ধীরে ধীরে বারের নেতা এবং সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেন। 1937 সাল থেকে তিনি মালাবারের Government Pleader ও Public Prosecutor ছিলেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী দু'টি আইনশাস্ত্র সম্পর্কেই তিনি ছিলেন সমান বিশেষজ্ঞ।

1905 সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং 1907 সালে সুরাট কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে অংশ নেন। হোমরুল এবং খিলাফৎ আন্দোলনকে তিনি প্রচণ্ডভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং

প্রথম থেকে কেরালার রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

যখন 1921 সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন তখন কালিকটে অন্যান্য অনেক নেতার সঙ্গে মেনন 1921 সালের 16 ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হন। তাঁর ছয় মাসের জেল হয়। জেলের সময়সীমা পুরো পার হলে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আইন ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বহু দিন তিনি কেরালা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। কিছু কালের জন্য তিনি কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

প্রথমদিকে তিনি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের স্বপক্ষে ছিলেন, তা সত্ত্বেও যখন কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে এল তখন এই প্রস্তাবকে তিনি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। 1924 সালে তিনি পুনরায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। আবার 1930 সালে গান্ধীজী যখন লবণ সত্যাগ্রহের সূচনা করলেন তখন তিনি ব্যবসায় বন্ধ রেখে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। এর ফলে 1930 সালের 9 জুলাই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং চার বছরের জন্য তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

1931-32 সালে তিনি গান্ধীজীর নির্দেশানুসারে রাজাগোপালাচারী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে গুরু-ভায়ুর মন্দির প্রবেশের জন্য গণভোট সংগঠিত করেন। কেরালা হরিজন সেবক সংঘের (1932-33) সভাপতি হিসেবে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম খুবই প্রশংসনীয়। কালিকটে দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ে লেবার ইউনিয়নের সম্পাদকরূপে তিনি একজন উঁচুদরের শ্রমিক নেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি ছিলেন অসাধারণ পুস্তক অনুরাগী। যে কেরালা সাহিত্য সোসাইটির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরবর্তীকালে তা' কালিকটের পাবলিক লাইব্রেরীতে পরিণত হয়। কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারকারী মালয়ালাম পত্রিকা 'নবীন কেরালার' (1921-1925) প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকও ছিলেন তিনি।

কালিকট তালুক বোর্ডের সদস্য হিসেবে (1918-22) এবং বেশ কিছুকাল ধরে কালিকট পৌরসভা কাউন্সিলের সদস্য এবং 1936 থেকে 1939 পর্যন্ত সভাপতি হিসেবে স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি মাদ্রাজ বিধানসভারও সদস্য ছিলেন।

'ঐক্য কেরালা কমিটি'র সহ-সভাপতি হিসাবে কেরালা রাজ্যের পুনর্গঠনের জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 1950 সালে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর সব কাজকর্ম, হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। 1964 সালের 30 জুন তাঁর মৃত্যু ঘটে।

একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসাবে তিনি হিন্দু-সমাজকে সমস্ত রকম ভাবে দূষণমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ইংরাজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণগ্রাহী হয়েও তিনি হিন্দী, সংস্কৃত এবং মালয়ালাম ভাষায় তাঁর দক্ষতা বাড়িয়ে তোলেন। খাদি এবং কুটীর শিল্পের মধ্যেই তিনি দেশের মুক্তি এবং গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তাঁর কার্যকলাপ ছিল সমস্ত কেরালা জুড়ে এবং তাঁর বাইরেও তা বিস্তৃত ছিল।

তিনি সুন্দর নরম হাতে বোনা খাদি পছন্দ করতেন এবং তাই পরিধান করতেন। সুস্থ জীবনের অনুরাগী তিনি ছিলেন দয়ালু এবং উদার মনোভাবাপন্ন। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক এবং ভদ্র ও সুবক্তা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

তিনি দেশকে স্বার্থহীনভাবে সেবা করেছেন এবং প্রচুর ত্যাগও করেছেন। প্রকৃত নেতার সবকটি গুণের অধিকারী গোপাল মেনন বিরুদ্ধ-মনোভাবাপন্নদের মধ্যেও শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বিদ্বান, ঐতিহাসিক এবং সুলেখক।

[Kerala District Gazeteers, Kozhikode ; A. K. Pillai—Congress and Kerala (in Malayalam) ; Nair Service Society Suvarna Grandham 1964 ; K. P. Kesava Menon—Kozhinzha Kalam ; E. Moidu Moulavi—Ormakal ; Personal Knowlege of the Contributor ; Personal interviews with K. P. Ramunni Menon, K. A. Damodara Menon.]

(এন. এম. কে নায়ার) কে. ভি. নায়ার

ইউ. জীবন. রায় (১৮৩৮-১৯০৩)

U. Jeeban Roy (1838-1903)

আধুনিক খাসি পার্বত্য-ভূমির অন্যতম প্রধান-

স্হপতি ইউ. জীবন. রায় 1838 সালে চেরাপ্নঞ্জীতে জম্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাম সিং ছিলেন একজন উদ্যোগী ব্যবসায়ী। যে য্নগে খাসি উপজাতির সঙ্গে বাইরের জগতের পরিচয় ছিল নিতান্ত ক্ষীণ সেই সময় তিনি বহ্নদ্নরে অবস্হিত কলকাতা ভ্রমণ করার মতো সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই কারণে দেশবাসীর কাছে 'করকাতা' নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

উদ্যমশীল পরিবারের সন্তান জীবন রায় কৈশোরেই দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর চরিত্রের আর সব বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ উদ্যমশীল। তিনি ছিলেন উৎসাহের প্রতীক। খাসি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে ভারতীয়দের পক্ষে সর্বোচ্চ পদ অতিরিক্ত সহকারী কমিশনারের পদমর্যাদা তিনিই সর্বপ্রথম লাভ করেছিলেন। রায় ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন স্নশিক্ষিত মান্নষ। নিজের চেষ্টায় তিনি তাঁর মাতৃভাষা খাসি ছাড়াও অন্যান্য ভাষায়—যেমন ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃতে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি হিন্দ্ন ধর্মসাহিত্য যেমন গীতা, উপনিষদ, মহাকাব্যগ্নলি এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত ধর্মসাহিত্যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ভারতবর্ষের ধর্মসাহিত্যগ্নলি অধ্যয়ন করে রায় খাসি এবং ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে গর্ববোধ করতেন। সাধারণ খাসি উপজাতিদের মধ্যে সে সময় খ্নীষ্টান ধর্মযাজকরা যে গোপন প্রচার চালাতেন তা থেকে খাসি ঐতিহ্যকে রক্ষা করায় তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরলস।

কতগ্নলি বিশেষ ক্ষেত্রে মিশনারীদের কার্যকলাপের ফলে যে জাতীয়তা বিরোধী মনোভাবের স্নৃষ্টি হয়েছিল জীবন রায় তার মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। খাসি সম্প্রদায়ের যথাসম্ভব সার্বিক উন্নতির জন্য রায় স্বার্থহীনভাবে তাঁর বিশাল ব্যবসা প্রতিভাকে নিয়োগ করেছিলেন। আক্ষরিক অর্থে তিনি খাসিদের নতুন শিল্পকৌশল, শিল্প, আধ্নিক ধরনের খামার এবং বাগিচা নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। অনেক ফলের চাষ যেমন পাম এবং পীচ জীবন রায় প্রবর্তন করেছিলেন। সে রকম প্রথম ছাপাখানারও তিনি ছিলেন প্রবর্তক যার জন্য শিলং আজও গর্বিত। খাসি সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে দারিদ্র্যকে সম্নলে উৎপাটিত করার জন্যও তিনি আন্তরিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁর অফুরন্ত উৎসাহকে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন খাসি মহিলাদের নতুন ধরনের শিল্পকৌশল শিক্ষাদানের কাজে।

খাসি পাহাড়ে আধ্নিক এবং জাতীয়তাবাদী শিক্ষার ক্ষেত্রেও জীবন রায়ের কাজকর্ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহ্ন সংখ্যক বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন। আজও শিলং সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় তাঁর স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। খাসিদের মধ্যে শিক্ষার জন্য তাঁর উদার দান-দাক্ষিণ্য ছিল সর্বজনবিদিত।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে রায় ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে সহজ করার জন্য রায় নিজেই খাসি ভাষায় বহ্ন সংখ্যক প্রাথমিক পাঠ্যপ্নস্তক রচনা করেছিলেন। এছাড়া রায় ছিলেন বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। তিনি খাসি সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন তাদের মাতৃভাষা ছাড়াও বাংলাভাষা শিক্ষা করে এবং আলোকপ্রাপ্ত বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সৌহার্দ্যপ্নর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে।

রায়ের সমস্ত কাজকর্মের উৎস ছিল গভীর জাতীয়তাবাদী দ্নষ্টিভঙ্গী। তাঁর 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' বইটির ভ্নমিকা (খাসি ভাষায়) এবং তাঁর অন্যান্য রচনা ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার প্রমাণ। লোকজনদের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করতেন যে খাসি সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ জড়িত ভারতবর্ষের সঙ্গে।

খাসিদের ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ, আদিম সমাজ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত খ্নলে দিয়েছিলেন জীবন রায়। তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান হতে এবং বিভিন্ন মান্নষ এবং বহ্ন জাতির মাতৃভ্নমি ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য। তাদের মনে নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি গর্ববোধ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করার জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন 'সেং খাসি' যা ছিল খাসি জাতীয় কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। খাসি পাহাড়ে আধ্নিক সংস্কৃতির অন্নপ্রবেশ ঘটানোর প্রচেষ্টা ছিল বিশেষ আগ্রহের ব্যাপার। তৎকালে 'খাসি পাহাড়ের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয়' ব্যক্তি জীবন রায়কে সঠিকভাবে প্রশংসা জানিয়ে 'খাসি মীনটা' তাঁকে 'আধ্নিক খাসির জনক' আখ্যা দিয়েছিলেন। 1903 সালে তাঁর মৃত্যুর পর অলংকারপ্নর্ণ ভাষায় শ্রদ্ধা জানিয়ে 'খাসি মীনটা' আরও লিখেছিল—"পাহাড় অঞ্চলে এমন কোনও সম্প্নর্ণ আন্দোলন হয়নি সেখানে তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শ পড়েনি। তাঁর অজ্ঞ দেশবাসীকে চরম

দুর্দশা থেকে উন্নত করার জন্য যা কিছু তাঁর পক্ষে করা সম্ভব সবই তিনি করেছিলেন।" প্রকৃত সৎ এবং দেশপ্রেমিক জীবন রায় ছিলেন ঊনিশ শতকের আসামের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

[Ka Jingialang Kynmaw (Printed by La Shon Ha Ri Khasi Press), Mawkhar, 1933 ; Ka Khasi Mynta, Raisaw, 1902 ; U Khasi Mynta, Jylliew, June 1903. A Pamphlet published by the Ri Khasi Press in 1899 ; Statement of the Maham Singh, a grandson of Jeebon Roy, recorded on 20 September 1967 ; J. Roy—Ka Ramayan, 1900 ;—History of India, 1900 ;—Hitopadesa.]

পি. এন. দত্ত

এস. পি. দে

ইউ তিরোট সিং (১৮০২—১৮৩৪)
U. Tirot Singh (1802—1834)

ইউ তিরোট সিং ছিলেন নংখলউ রাজ্যের "শ্যিয়েম" বা রাজা। প্রাক ব্রিটিশ আমলে আসামের উঁচু নিচু খাসি জয়ন্তিয়া পাহাড়কে ভাগাভাগি করে যে ত্রিশটি ক্ষুদ্র রাজ্য অবস্থিত ছিল নংখলউ তাদের অন্যতম। 1802 সালে ইউ. তিরোট সিং-এর জন্ম। খুব অল্প বয়সেই রাজ্যের দরবার কর্তৃক তিনি শ্যিয়েম নির্বাচিত হয়েছিলেন। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিরোট সিং তাঁর রাজ্য যাতে তার স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখতে পারে সেজন্য তাকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং শক্তি নিয়োগ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বন্ধ হয়ে গেল।

খাসি পাহাড়ের যাবতীয় অঞ্চল এবং নংখলউ রাজ্যের পক্ষেও দুঃসময়ে আসামের ইংরেজ এজেন্ট ডেভিড স্কট 1826 সালে তিরোট সিংকে বাধ্য করলেন সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে। এই চুক্তির ফলে কোম্পানীকে তাঁর অঞ্চলের মধ্যে একটি রাস্তা তৈরী করার অনুমতি দেওয়া হল। এর উদ্দেশ্য ছিল গৌহাটির সঙ্গে সিলেটের যোগাযোগ স্থাপন। খাসিদের প্রধান নেতা ছিলেন খুবই সরল প্রকৃতির, তিনি সেই সময়ে বুঝতে পারেননি যে এই রাস্তাটি তাঁর রাজ্যের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কিছুদিন পর পরিকল্পিত রাস্তা তৈরীর কাজ এগিয়ে গেলে তিরোট সিং উপলব্ধি করলেন যে কি ভুলই না তিনি করেছেন। শুরু থেকেই ব্রিটিশরা নংখলউকে তাদের পদানত রাজ্য হিসাবে দেখত এবং তাদের সৈন্যবাহিনী জনগণের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাত। ব্রিটিশের এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণে হতচকিত হয়ে তিরোট সিং সৈন্যদের আচরণের বিরুদ্ধে স্কটের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা তাঁর প্রজাদের উপর কর ধার্য করতে পারে এই গুজব তাঁর মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে তীব্রতর করে তুলল।

তিনি স্থির করলেন যে, যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে তিনি তাঁর রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করবেন এবং অবাঞ্ছিত বিদেশীদের শক্তি প্রয়োগ করে বিতাড়িত করবেন। এই সিদ্ধান্তের পরেই তিরোট এবং তাঁর সঙ্গীরা 1829 সালের এপ্রিল মাসে নংখলউতে ইংরেজদের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালালে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তথাকথিত "নংখলউ হত্যাকাণ্ড" নংখলউর জন-বিদ্রোহের সূচনা মাত্র। আদিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের বীর দলপতির অধীনে স্বরাজ্য থেকে বিদেশীদের বহিষ্কারের জন্য সাহসিকতার সঙ্গে তারা লড়াই করেছিলেন। এই সংগ্রাম চার বছর ধরে চলেছিল (1829-33) এবং মিলিথেম এবং থাইরেম নামে দুটি বড় বড় খাসি রাজ্য এই সংঘর্ষে যোগদান করেছিল ; এমন কি তিরোট সিং ভূটানবাসীদের এবং আহোম যুবরাজদেরও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ব্রিটিশরা প্রথমে এই বিদ্রোহে হতচকিত এবং এই "বন্য দলপতির" বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই অসম যুদ্ধের ফলাফল বেশীদিন অনির্ধারিত অবস্থায় রইল না। অধিকাংশ নেতাই একবছর পরে সংগ্রাম পরিত্যাগ করে ব্রিটিশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাদের সঙ্গে মীমাংসায় এলেন। কিন্তু তিরোট সিং এই অসম যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে রাজী হলেন না। "অন্য সবাই হতাশায় নিজেদের সরিয়ে নিলেও" তিনি বিরোধিতায় অটল রইলেন।

অসম্ভব ধরনের বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য এবং অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সহ্য করে তিনি ব্রিটিশকে হয়রান করে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত এই অসম যুদ্ধ চলাকালে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে তিরোট সিং

বন্দী হলেন। তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজদের এত ভয় ছিল যে অবিলম্বে তাঁকে হাতকড়া দিয়ে ঢাকার নির্জন জেলে স্থানান্তর করা হল। সেখানে একবছর হতাশায় মনমরা হয়ে কাটানোর পর 1834 সালে তিরোট সিং-এর জীবনাবসান ঘটল। ব্রিটিশের জেলে তিরোট সিং-এর শেষ দিনগুলি ছিল খুবই কষ্টদায়ক। যদিও তিনি জেল জীবনে প্রচুর অসম্মান এবং বঞ্চনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি যদি ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব মেনে নেন তাহলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্ত করে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই শর্তে প্রতিশ্রুতি দিলেও তিরোট সিং তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে "একজন ক্রীতদাসের নামে মাত্র রাজার জীবনযাপন করার চেয়ে সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করা তিনি বেশী পছন্দ করেন।"

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথমদিককার একজন সংগ্রামী হিসেবে তিরোট সিং-এর ত্যাগ এবং বীরত্ব তাঁকে দেশবাসীর হৃদয়ে অমর করে রেখেছে। খাসিরা তাঁর মহান দেশপ্রেমের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং নংখলউতে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসৌধ তৈরী করেছে যা খাসিদের তাদের জাতীয় বীরের প্রতি অকপট শ্রদ্ধার নিদর্শন। এমন কি সাম্রাজ্যবাদীর গোপন সমর্থকরাও এই সাহসী দল নেতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা গোপন করতে সক্ষম হয়নি, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে তিরোট সিং ছিলেন একজন 'উঁচুদরের দেশপ্রেমিক'। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি যাঁরা স্থাপন করেছিলেন তাঁদের কাছে তিরোট সিং-এর সুমহান ত্যাগ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অসম সাহসিকতাপূর্ণ লড়াই প্রেরণাদায়ক আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

[Watson, A and White, A—Memoir of the Late David Scott, Mukherjee—The North-East Frontier of Bengal; Sarma Roy, B. K.—History Jang Ka Rikhasi; Singdoh, H—Ki Syiem Khasibad Synteng; Cajee T.—Ka History Ka Ri Assam; Jairamdas Daulatram—Speeches dated 27 June 1952, Published by the Assam Government; U. Victor G. Bareh—U Tirot Singh; Observations of the Commission headed by A. Alley and U. Norman Singh Syiem regarding the life of Tirot Singh; Manuscripts of N. S. Syiem of Jaiaw, Shillong; Thesis of S. P. De of Gauhati University on "The Problem of Labour in Assam (1826-1901)"; Thesis of Dr. H. Bareh of Shillong on "The Origin and the History of the Khasis"; The Asiatic Journal, Vol. VII, 1832; Aitchison—Treaties and Engagements, etc. (Treaties No. LVIII, of 30 November 1826); Assam Administrative Reports.]

(এস. পি. দে) পি. এন. দত্ত

ইউ সোসো থাম (১৮৭৩-১৯৪০)

U. Soso Tham (1873-1940)

খাসি সাহিত্য-মণ্ডলে ইউ সোসো থামের নাম উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসেবেই পরিগণিত হয়। স্বদেশবাসীর দৃষ্টিতে তিনি শুধুমাত্র খাসি গদ্য এবং পদ্যের জনক বলে অভিহিত নন, খাসি সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবেও তাঁকে গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালের সমস্ত লেখকদের কাছে তাঁর লেখনী অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছে।

ইউ সোসো থামের জন্ম চেরাপুঞ্জির সৈতসোপেন গ্রামে। তখনকার দিনে এই গ্রামটি একদিকে খাসি সংস্কৃতি, আদব কায়দা, ঐতিহ্য অপর দিকে পূর্ব বাংলার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ সমস্ত কিছুরই কেন্দ্র ছিল। তিনি ছিলেন এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃ বিয়োগ হয়। খাসি পাহাড় অঞ্চলে থামদের পুরনো গোষ্ঠীই সে অঞ্চলের সব চাইতে বনেদী এবং সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী। চেরাপুঞ্জির আশেপাশে ছবির মত দৃশ্যাবলী, প্রকৃতির অজস্র ঐশ্বর্য তাঁর তরুণ মনকে এতো গভীরভাবে অভিভূত করেছিল যে তাঁর যৌবনের এই উপলব্ধি পরিণত বয়সে তাঁর কাব্য চর্চার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

ইউ সোসো থামের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় চেরাপুঞ্জির ওয়েলস মিশন স্কুলে। সেখান থেকে 1886 সালে তিনি মাইনর পরীক্ষায় (ষষ্ঠ শ্রেণী) উত্তীর্ণ হন। যেহেতু চেরাপুঞ্জিতে সেই সময় কোনো হাইস্কুল ছিল না, সেজন্য ইউ সোসো থাম শিলঙে

গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু দারিদ্র্যবশতঃ 1888 সালে তাঁকে অষ্টম শ্রেণীতে স্কুল ছেড়ে চেরাপুঞ্জিতে ফিরে গিয়ে জীবিকা অর্জনের উপায় সন্ধান করতে হয়। কিন্তু চেরাপুঞ্জির থিওলজিক্যাল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ জন রবার্টসের উৎসাহ এবং সাহায্যে ইউ সোসো থামকে সেই কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি মাত্র এক বছরের মধ্যেই কলেজ ছেড়ে দিলেন যেহেতু পুরোহিত বা ধর্মযাজক হওয়ার কোনোরকম ইচ্ছাই তাঁর ছিল না।

তাঁর বাল্য ও যৌবনের পরিবেশের কথা স্মরণ করলে এ কথাই মনে হবে যে সোসো থাম ছিলেন খাসি সংস্কৃতি এবং খৃষ্টান শিক্ষার যুগ্ম ফসল। ডঃ এস. কে. ভুঁইয়া সঠিকভাবেই বলেছেন—"মিঃ থামের ব্যক্তিত্বে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উদ্দীপনার সঙ্গে খাসি উপজাতিসুলভ সরলতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। খৃষ্ট-ধর্মের কাছে তাঁর ঋণ সত্ত্বেও তাঁর দেশপ্রেম, জন্মভূমির 'ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁর চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল।"

কম বয়সেই রুজি-রোজগারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে খাসি জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তাঁকে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। 1889 সালে শাংপুং গ্রামে এক মিশনারী বিদ্যালয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়। এই সময়ে গোটফো গোষ্ঠীর এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। চার পুত্র ও কন্যার জন্ম দেওয়ার পর তাঁর স্ত্রী মারা যান। অতঃপর থাম সমস্ত বোঝা একাই বহন করেন।

বিদ্যালয় শিক্ষকের নানাবিধ দায়িত্ব এবং বড় পরিবারের পিতা হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য সেবা থেকে থাম বিরত থাকেন নি। খাসি ভাষাকে সমৃদ্ধ এবং খাসি সাহিত্যের মান উন্নয়ন করাই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রেরণা। চৌদ্দ বছর ধরে গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর ইউ সোসো থাম কথ্য খাসি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-ভাণ্ডার হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। 1903 সালে শিলং গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলের রেভারেণ্ড জে, সি ইভান্স তাঁকে তাঁর বিদ্যালয়ে খাসি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। শিলং-এ আসার সঙ্গে সঙ্গেই সোসো থাম "ইউ লুরশাই" (প্রভাতের তারা) নামে এক বিখ্যাত খাসি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন এবং 1923 সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর সম্পাদনা করেন। তারপরে পত্রিকাটির ভার নেন উইলসন রীড্।

রেভারেণ্ড অলিভার টমাস (যিনি পরবর্তীকালে শিলং গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন) সোসো থামকে প্রভূত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 1927 সালে রেভারেণ্ড টমাস লিখছেন—"আমার পক্ষে ইউ সোসোকে বাদ দিয়ে খাসি পাহাড় সম্বন্ধে চিন্তা করা খুবই কষ্টকর·········আমি তাঁর কাছে সর্বতোভাবে ঋণী থাকব কারণ শুধুমাত্র খাসি ভাষায় কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে তিনি যে আমায় সাহায্য করেছেন তাই নয়, খাসিদের মনকে গভীরভাবে বুঝতে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্ন মানুষ। তরুণ বয়সে যদি তাঁর পক্ষে শিক্ষাগত তালিমের সুযোগ ঘটত তাহলে তিনি অবশ্যই একজন বিদ্বান বা পণ্ডিত হতে পারতেন। একজন বিখ্যাত ভাষাবিদ্ হওয়ার মতো সহজাত ক্ষমতা তাঁর ছিল। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং আন্তরিক ভালবাসা ছিল। এখনও এমন শত শত লোক আছেন যাঁদের খাসি ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি উৎসাহ তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া।"

শিলং গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে ইউ. সোসো থাম কুড়ি বছর ধরে খাসি ভাষার শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর কাছে কাব্যচর্চার গবেষণাগার-স্বরূপ। সেই সময় খাসিতে পাঠ্য বইয়ের অন্যতম ছিল 'ঈশপস ফেবলস'। তাড়াহুড়ো না করে অতীব যত্নের সঙ্গে থাম এই গল্পগুলি অনুবাদ করেছিলেন। 1920 সালে তিনি তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করলেন "Ki Phawer U Aeshop"—এটি খাসি সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ রচনা বলে গণ্য।

এটি সুবিদিত যে এস এম আমজাদ আলি, রেভারেণ্ড মোরখা জোসেফ এবং ডঃ জন রবার্টসের লেখা কিছু কবিতা ছাড়া সোসো থামের আগে নিয়মিত-ভাবে খাসি কবিতা লেখা হত না। এই ব্যাপারে তাঁর অবদান কারুর পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। খাসিতে কোনো ছন্দশাস্ত্র ছিল না এবং কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে থাম ইংরেজি কবিতার ছন্দবদ্ধ সূত্রগুলি অধ্যয়নের পরে নিজেই একটি সূত্র বার করেন। তাঁর প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল কিছু ইংরাজি গীতি কবিতার অনুবাদ—যেমন—জেন টাইলারের 'The Little Star", এ্যান টেইলরের "My Mother", সেক্সপীয়ারের "The Passionate Pilgrims", উইলিয়াম ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের "Lucy", "To The Cuckoo" ও "Reaper", স্যার ওয়ালটার স্কটের "Breathes There the Man with Soul so Dead", টমাস মুরের "The Last Rose of Summer", লর্ড বায়রনের "The Destruction of Sennacherib" এবং

উইলিয়াম কুপারের "The Diverting History of John Gilpin"। তাঁর অনুবাদগুলি এত নিখুঁত হয়েছিল যে পাঠকদের পক্ষে বার করা কঠিন হয়ে পড়ত যে আসল রচনাটি পাঠ করছে না নিছক অনুবাদ পড়ছে। তারপর থাম নিজেকে খাসি ছন্দ শাস্ত্রের সূত্রগুলির সূত্রায়নে নিয়োজিত করলেন। 1925 সালে তিনি "Ki Poetry Khasi" নামে গীতি-কবিতা এবং ব্যালাডের এক সংকলন কৃতিত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেন। 1936 সালে এই বইটির পুনরায় নামকরণ হয় "Ka Duitara Ksiar"।

তাঁর কবিতা সংকলন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ এস কে ভুঁইয়া মন্তব্য করেছেন "কালক্রমে খাসি কবিতার ইতিহাস লেখা হবে এবং সেখানে ইউ সোসো থামের নাম তার দেশের সাংস্কৃতিক জগতে এক নতুন যুগের সূচনাকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাঁর কবিতাগুলি ছিল সহজ সরল গাথা-সঙ্গীত এবং সেজন্য শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলে গানের সুরে পড়তো। এগুলির এমন একটা আকর্ষণ ক্ষমতা ছিল যা প্রতিরোধ করা পাঠক বা শ্রোতা কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। খাসি জীবন, তার আচার আচরণ এবং তাদের দুঃখ যন্ত্রণা সহজ সাধারণ দরিদ্র লোকেদের কষ্টানুভূতির প্রতিফলন ঘটত এই সঙ্গীত-গুলিতে। সমস্ত দেশ এবং বিভিন্ন জাতির ভ্রমণকারীদের কাছে শিলং এবং চেরাপুঞ্জির পরিবেশের যে আকর্ষণ তার অন্তর্নিহিত সমস্ত সৌন্দর্য ও মুগ্ধতা জাদুর মত রয়ে গেছে খাসি উপত্যকা বর্ণিত এই সমস্ত কবিতার লাইনগুলিতে।"

কাজ থেকে অবসরগ্রহণের পর থাম তাঁর সময়ের পুরোটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে মহান কাজে ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহান রচনাটি প্রকাশের আগেই তিনি "Ka Jingim U Trai Jong Ngi" নামে এক বিশাল অনুবাদ কর্ম প্রকাশনায় সফল হয়েছিলেন। এটিই তিনি চার্লস ডিকেন্সের "The Life of our Lord থেকে 1936 সালে অনুবাদ করেছিলেন। সেই বছরই তিনি তাঁর এগারো বছরের পরিশ্রমের চূড়ান্ত ফসল "Ki Sngi Barim U Hynniew Trep" (The Golden Days of the Seven Huts) প্রকাশিত করেন। খাসিতে এতাবৎকাল প্রকাশিত কবিতাবলীর মধ্যে এটা নিঃসন্দেহ সর্বশ্রেষ্ঠ। এতে খাসি জাতির সূচনার কথা বলা আছে, যার মূল খুঁজে পাওয়া যায় স্বর্গের ষোলটি পরিবারের মধ্যে সাতটি পরিবার সমস্ত খাসি জাতির পূর্বপুরুষ হিসাবে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। বইটি অতীতের স্বর্ণময় যুগ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছে। এতে ভগবানের বাসস্থানের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথাও বলা আছে। অধ্যাপক আর. আর. টমাস মন্তব্য করেছেন—"এই বইটি রচনা করে মিঃ সোসো থাম দীর্ঘকালীন নীরবতা ভঙ্গ করেছেন। তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ কাজটি ভাষা, চিন্তা এবং কল্পনা শক্তির দিক দিয়ে এতই অসাধারণ যে খাসিরা তার জন্য গর্ববোধ করতে পারে। খাসি সাহিত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যদি বা না হয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে তা অবশ্যই গণ্য হতে পারে। খাসি ভাষায় প্রকাশিত কবিতার মধ্যে এটাই সর্বোত্তম এবং নিঃসন্দেহে তা 'ক্লাসিকে'র পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার দাবীদার। সমস্ত খাসি জাতির উচিত লেখকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকা যিনি আমার মতে খাসিদের কবি-সম্রাট।"

1940 সালের 18 ডিসেম্বর শিলং-এ উ সোসো থাম পরলোক গমন করেন। এস. কে. ভূঁইয়ার মন্তব্য দিয়েই শেষ করি—"মিঃ থাম যে বীজ বুনে গেছেন কালে কালে তা এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে যার শাখা-প্রশাখা ভবিষ্যতে আরও অনেক স্বজাতীয়দের আশ্রয় প্রদান করবে।"

[The U. Lurshai Files (A monthly magazine in Khasi); Soso Tham—Ki Phamer U. Arop ;—Ki Poetry Khasi ;—Ka Duitara Kriar ;—Ka Jingim U. Trai Jong Ngi ;—Ki Sngi Barim U Hynniew Trep (The Golden Days of the Seven Huts.) ; Personal Knowledge of the Contributor, an eminent Khasi scholar and Speaker of the Meghalaya Assembly.]

রাধোন আর. এল. লিংডো

ইউসুফ জাফর মেহের আলি (১৯০৩-১৯৫০)
Yusuf Jaffar Meherally (1903-1950)

ইউসুফ জাফর মেহের আলির জন্ম 1903 সালে বোম্বাই-এর এক অভিজাত খোজা মুসলীম পরিবারে। তাঁর পিতা জাফর মেহের আলি ছিলেন একজন সম্পন্ন

ব্যবসায়ী। ইউসুফের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় কলকাতায় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন বোম্বাই-এর সেণ্ট জেভিয়ার্স এবং নিউ হাইস্কুলে। 1920-21 সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বোম্বাই-এর এলফিনস্টোন কলেজে যোগদান করেন। 1925 সালে তিনি স্নাতক হন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তাঁর এল. বি. ডিগ্রী লাভ করেন কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষ তাঁকে সনদ দিতে অস্বীকৃত হন।

তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে মিনু মাসানী, উপেন্দ্র দেশাই, অশোক মেহতা, কে. এফ্. নরিম্যান, অচ্যুত পট্টবর্ধন, জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।

তিনি খুব আগ্রহসম্পন্ন পড়ুয়া ছিলেন এবং ফার্সীকাব্য ও জীবনী গ্রন্থের ভক্ত ছিলেন। মার্ক্সিনী, গারিবল্ডী, এবং সমাজতন্ত্রী লেখকদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই ছিল জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত। কলেজের ছাত্র থাকাকালীনই 1925 সালে তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন। 1928 সালে বোম্বাই-এর অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনের তিনি ছিলেন মূল প্রেরণা। এই সম্মেলনে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে 1700 জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এখানেই বোম্বাই প্রাদেশিক যুবলীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এই সম্মেলনটিই কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্যের বিকল্প হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদকল্পে এ ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব গৃহীত হয়। 1928 সালের 3 ফেব্রুয়ারী মেহের আলি 400 জন দৃঢ়চেতা তরুণ যুবক নিয়ে মিছিল করে বোম্বাই পোতাশ্রয়ে ভোর হওয়ার আগে শ্বেতাঙ্গ-সর্বস্ব সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে যান। তাদের প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করা হয় এবং মেহের আলি গুরুতরভাবে আহত হন। খবরটি আগুনের ফুলকির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সম্পূর্ণ বয়কট পালিত হয়।

1929 সালে মেহের আলি সামরিক কায়দায় 'ন্যাশনাল মিলিশিয়া' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে জেনারেল কমাণ্ডিং অফিসার হন। এটি বিভিন্ন রেজিমেণ্টে ভাগ করা ছিল। প্রত্যেকটি এক একটি ক্যাপ্টেনের অধীনে পরিচালিত ছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ ছিল জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে শিক্ষিত এবং তাদের কাজে উদ্বুদ্ধ করা। সুন্দর কাট-ছাঁটের পোশাক পরিহিত প্রত্যেকটি রেজিমেণ্টের স্বেচ্ছাসেবকদের এক গুচ্ছ করে লিখিত বক্তৃতা, শ্লোগান এবং স্থানীয় এলাকার রাস্তার ম্যাপ সরবরাহ করা হত। সকালে এবং সন্ধ্যায় স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদের নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে টহল দিত, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিত অথবা লিখিত-ভাষণ পড়ে শোনাত যা কখনই দু'মিনিটের বেশী সময় নিত না। 1930 সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যখন মিছিল এবং জনসভাগুলি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল তখন স্বেচ্ছাসেবকেরা জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অসাধারণ কাজ করেছিল।

মেহের আলির উৎসাহ ও নেতৃত্বদানের ফলে বোম্বাই প্রাদেশিক যুবলীগ 'বম্বে প্রেসিডেন্সিতে' একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হল। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরেই এর শাখা ছিল।

1930-এর মার্চ এপ্রিলে লবণ সত্যাগ্রহের সময় মেহের আলি এবং তাঁর সহযোগীরা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম এবং কারাবরণ করেছিলেন। আন্দোলনটি আগাগোড়াই পরিচালিত হয়েছিল এই সমস্ত যুবকদের দ্বারা। সেই সময় তাঁর 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকায় মেহের আলি গান্ধীজীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মেহের আলি চার মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। 1934 সালে তাঁকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করার চক্রান্তের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং নাসিক জেলের 'সি' বিভাগে দু'বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এখানে পরবর্তীকালের সহকর্মীদের তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তিনি সারা দেশ বিস্তৃতভাবে সফর করেন এবং দিনে পাঁচটি করে জনসভা করেন। 1940 সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সময় তিনি আবার গ্রেপ্তার হন কিন্তু পরের বছরেই তিনি মুক্তি পান।

1941 সালে পাটনাতে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ফলে শীঘ্রই গ্রেপ্তার হন এবং এক বছরের জন্য লাহোর জেলে তাঁর স্থান হয়। জেলে থাকাকালীন তিনি বোম্বাই-এর মেয়র নির্বাচিত হন। সরকার খুব বিব্রত হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। সেই সময় তিনি ছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

1942 এর 7 আগস্টের কিছুদিন আগে তিনি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির ক্যাম্প সংগঠিত করেন এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কার্যক্রমের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করেন। পুলিশ এ বিষয়টির আঁচ পাওয়ার ফলে আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। 1943 সালে যখন তিনি মুক্তি পেলেন তখন তাঁর দেহ কয়েকটি অস্থির সমষ্টিমাত্র। তারপরই প্রকৃতপক্ষে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তিনি যদিও চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন (1947) তা সত্ত্বেও তিনি বেশিদিন বাঁচেন নি। 1950 সালে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেহের আলি ছিলেন বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এবং ভারতের সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য। 1938 সালে তিনি ইউরোপ, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ভ্রমণ করেন।

মেহের আলি ছিলেন নাস্তিক। তাঁর কাছে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে ধর্ম কোনো বিচার্য বিষয় ছিল না। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন বহু হিন্দু এবং পার্শী। নিজে উদারনৈতিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তিনি চাইতেন যে দেশের যুবকদের জাতীয়তাবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করা হোক।

তিনি চাইতেন প্রত্যেকটি দেশ যেন তার নিজস্ব লোকের দ্বারাই শাসিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তনশীল ঘটনাবলী সম্বন্ধে তিনি ভালো রকম ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং বিশেষতঃ রাশিয়া এবং মিশরে জাতীয় অভ্যুত্থান সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সমতার শর্তে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার অনুরাগী ছিলেন।

মেহের আলি লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন যা ছিল ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণের বিরুদ্ধে এক প্রতীক সংগ্রাম। স্বদেশী চিন্তাভাবনার একজন প্রবক্তা হয়েও তিনি শিল্পোন্নয়নের স্বপক্ষে ছিলেন, তিনি শুধু চাইতেন যে শ্রমিকদের যেন তার বিষময় ফলগুলি থেকে সুরক্ষিত করা যায়।

তিনি কেরানীদের এবং দোকানীদের নিয়ে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। 'গোমস্তা মণ্ডল' বোধ হয় প্রথম কেরানী বাবুদের ট্রেড ইউনিয়ন। অতি শীঘ্রই এটি দেশের একটি সর্বাধিক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়।

1929 সালে তিনি যুবকদের জন্য 'ভ্যানগার্ড' নামে একটি প্রগতিশীল পত্রিকা প্রকাশ করেন। 1930 সালে সেটি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি সমাজতন্ত্রী দলের মুখপত্র 'জনতা' পরিচালনা করতেন।

তিনি জনগণের মঞ্চের বহুল ব্যবহার করেছেন; তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় বক্তা। আভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশে তিনি বাস করতেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত লেখার মধ্যে উল্লেখ করা যায় 'লীডারস অফ ইণ্ডিয়া', দুই খণ্ডে (বম্বে, 1942) 'এ ট্রিপ টু পাকিস্তান' (বম্বে, 1943), 'দি মডার্ণ ওয়ার্ল্ড' (বম্বে, 1946), 'দি প্রাইস অফ লিবার্টি' (বম্বে, 1948)।

[Chattapadhyay, Kamaladevi—At The Crossroads, Bombay, 1942; Y. I. Meherally—Leader of India, in 2 Parts, Bombay; 1942;—A Trip to Pakistan, Bombay, 1943;—The Modern World: A Political Study Syllabus, Bombay, 1945;—The Price of Liberty, Bombay, 1948;—Acharya Narandra Dev—Socialism and the National Revolution, Bombay, 1946; Jayaprakash Narayan—Sangharsh-Ki-Aur, Introduction (Hindi), Agra, 1948; Yusuf Meherally Centre Souvenir, Bombay, 1966.]

কুমুদ প্রসন্ন ডি. জি. হাটলকার

ইউসুফ শাহ মির ওয়াইজ (১৮৯৫—?)

Yusuf Shah Mir Waiz (1895 – ?)

1895 সালে কাশ্মীরে ইউসুফ শাহ মির ওয়াইজের জন্ম হয়। 'শুক্রবার মসজিদে' যিনি প্রধান পীর (অর্থাৎ পুরোহিত) রূপে প্রার্থনাদি পরিচালনা করেন, কাশ্মীরে তাঁকে মির ওয়াইজ আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর পিতা মৌলভী গুলাম রসুল শাহকে (অথবা রসুল শাহ) সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণও বিশেষরূপে শ্রদ্ধা করতেন। মির ওয়াইজ

ইকবাল মহম্মদ (স্যার) (১৮৭৭-১৯৩৮)

Iqbal Muhammad (Sir) (1877-1938)

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন ইকবাল মহম্মদ। তাঁর জনৈক পূর্বপুরুষ 17 শতকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তাঁরা মুসলীম হন। ইকবালের পিতামহ শেখ মহম্মদ রফিক শ্রীনগর থেকে শিয়ালকোটে (পাঞ্জাবে) তাঁর নূতন বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই 1857 সালের মহাবিদ্রোহের আগে ইকবালের পিতা শেখ নূর মহম্মদ-এর জন্ম হয়। নূর মহম্মদ নিরক্ষর হলেও মনে প্রাণে ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইমান বিবিকে বিবাহ করেন। তাঁর দুই পুত্র। আতা মহম্মদ ও মহম্মদ ইকবাল পরবর্তীকালের কবি। ইকবালের জন্ম হয় 1877 সালের 9 নভেম্বর শিয়ালকোটে।

তাঁর শৈশব শিক্ষা শুরু হয় প্রাচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত সৈয়দ মীর হাসানের কাছে। ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তিনি শিয়ালকোটেই লেখাপড়া করেন এবং পরে লাহোরের গভর্ণমেণ্ট কলেজে পড়াশুনা করেন। 1899 সালে তিনি দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন ও স্বর্ণপদক পান। এরপর ইকবাল ওরিয়েণ্টাল কলেজের স্থানীয় শাখায় আরবী বিভাগে 'ম্যাকলিওড রিডারে'র পদে যোগদান করেন এবং অনতিকাল পরেই আবার তিনি কৈশোরের মহাবিদ্যালয় লাহোর সরকারী কলেজে দর্শনের সহায়ক অধ্যাপক পদে আসীন হন। 1905 সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ বছরই তিনি আইন বিষয়ক পড়াশুনার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়াশুনা করেন। নিও হেগেলিয়ান ম্যাক্‌টেগার্ট ও জেম্‌স ওয়ার্ড ছিলেন তাঁর প্রিয় শিক্ষক। 1908 সালে তিনি আইন শিক্ষা সমাপ্ত করে ব্যারিস্টার হন। একই সময়ে তিনি মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "The Development of Metaphysics in Persia"। তিনি 1908 সালে লাহোরে আসেন ও 'চিফকোর্টে'র বিচারপতি হন। কিন্তু আইনজ্ঞ বা তথাকথিত আইন ব্যবসার লোভনীয় দিকটির প্রতি ইকবালের কোনও ধারণা বা চেষ্টা না থাকায় কোর্টে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। তিনি বাহুল্য বর্জন করে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাঁর প্রয়োজন ছিল সীমিত। ধর্মপ্রাণ পরিবারের সন্তান হিসাবে তিনি কোনদিন অর্থলোলুপতার প্রশ্রয় দেননি।

বিলেত যাত্রার আগে থেকেই ইকবাল কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথমে তিনি উর্দুতে লিখতেন। লেখাগুলো ছিল প্রধানতঃ স্বজাতি ও প্রকৃতি বিষয়ক। উর্দু কবিতা লেখার প্রথাগত ধরনেই তিনি লিখতেন। বিখ্যাত উর্দু কবি নবাব মিরজা খান দাগ-এর তিনি অনুগামী ছিলেন। তিনি গজল গান রচনা করলেও তার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তাঁর স্বাভাবিক কাব্যিক গতি ছিল 'নজমে'র (কবিতা) প্রতি। ইংলণ্ডবাসের তিনটি বছর তিনি একদিকে কবিতা রচনা করেছেন অন্যদিকে মুসলীম জগতের সমস্যা সমাধানের কথা ভেবেছেন। তাঁর মতে ইসলামের অনগ্রসরতার জন্য দায়ী হলো অ-ইসলামীয় জীবনযাত্রা।

'প্যান ইসলাম' বা ঈশ্বরের 'একমেব অদ্বিতীয়' অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাসই মুসলীমদের অনুন্নতির কারণ—জামাল-উদ্-দিন আফগানী ছিলেন বিংশ শতকে এই মতের প্রধান প্রবক্তা। ইকবাল ছিলেন তাঁর প্রধান অনুরক্ত শিষ্যস্বরূপ। তাই ইকবাল অন্য সব বাদ দিয়ে ঈশ্বরের এক অস্তিত্ব প্রচারে মনোনিবেশ করলেন এবং ভারতের বাইরে মুসলীম জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রচারের জন্য তিনি উর্দু ভাষা বাদ দিয়ে ফার্সী ভাষায় তাঁর লেখা শুরু করলেন।

তাঁর রচিত 'ফলসাফা-ই-খুদি'র মধ্যে তাঁর এই সময়কার মনোভাবের পরিষ্কার প্রতিফলন পাওয়া যায়। 1911 সালে রচিত তাঁর একটি কবিতা 1915 সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "আসরার-ই-খুদি"র অগ্রদূত হিসাবে গণ্য হতে পারে। মানুষ হলো "ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনবাদের ফসল"—এ কথাই তিনি এই গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে মানুষ হলো ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ। পৃথিবীকে সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করবার জন্য ঈশ্বর তাকে সবরকম ক্ষমতাই দিয়েছেন। (ইকবালের মতে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে—সম্ভবতঃ সে তার সহজাত ক্ষমতা সম্বন্ধেও অজ্ঞ। সুতরাং তিনি তখন মুসলমানদের মধ্যে এই তথ্যই প্রচার করেন যে শেষ দৈবী প্রকাশ 'কোরাণ'-এর গ্রহীতা—এই মুসলীমগণ।) বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দূষণের জন্য তিনি প্রথাগত 'ঈশ্বরদর্শনবাদ' বা অতীন্দ্রিয়বাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং সুফী সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় ও প্রখ্যাত কবি হাফিজও তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি।

ইউসুফ শাহ পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেছেন। তিনি কাশ্মীরের এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উত্তরপ্রদেশের সাহারাণপুরে উচ্চশিক্ষার্থে গমন করেন। ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সাহারাণপুরে থাকাকালীন তিনি রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনসমাবেশ গড়ে তুলতে পারদর্শী হন।

1931 সালে যখন তিনি কাশ্মীরের 'শুক্রবার মসজিদে'র মির ওয়াইজ হন, তখন কাশ্মীরের যুব আন্দোলনকারীদের পক্ষে তিনি যোগদান করেন। এই দলের নাম ছিল 'অল্ জম্মু এ্যাণ্ড কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স'। জম্মু এবং কাশ্মীরের ডোগরা রাজার বিরুদ্ধে এই দল স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যুবকবৃন্দ মুসলিম কনফারেন্সে যোগদান করেন। শেখ আবদুল্লাও উপস্থিত ছিলেন। মির ওয়াইজ মসজিদের প্রচার বেদী থেকে জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকেন। 1931 সালে অক্টোবর মাসে মহারাজা জনগণের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনে দুজন বেসরকারী সদস্য নিযুক্ত করা হয়। মির ওয়াইজ তাঁদের অন্যতম। কথিত আছে যে এই সময়ে মহারাজা 'বিভেদ এবং শাসন' এই নীতি গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই মুসলিম কনফারেন্সের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একদল আন্দোলনকারী মির ওয়াইজের নেতৃত্বে 'আজাদ কনফারেন্স' নামে একটি নতুন দল গঠন করে। ইউসুফ শাহ এই নতুন দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হন (1932-41)। 1939 সালে 'অল্ জম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স' দলের নাম পরিবর্তন করে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' নামে পরিচিত হয়। এই ঘটনায় মির ওয়াইজ বিচলিত হন। ফলে 1941 সালে তিনি তাঁর অনুগামীদের সংঘবদ্ধ করে পরিত্যক্ত 'মুসলিম কনফারেন্স' নাম দিয়ে দল গঠন করেন। 1945 সালে তিনি এই দলের সভাপতি হন এবং 1947 সাল পর্যন্ত সদস্যরূপে এই দলভুক্ত ছিলেন। 'ন্যাশনাল' এবং 'মুসলিম' এই দুই বিরোধী দল যথাক্রমে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' ও 'ইণ্ডিয়ান মুসলিম লীগ' এই দুই পার্টি হতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ন্যাশনাল কনফারেন্স কাশ্মীরের ডোগরা রাজ-শাসনের বিরুদ্ধে 'কাশ্মীর-ছাড়ো' আন্দোলন করে। মির ওয়াইজ এই আন্দোলনকে সময়োপযোগী বলে মনে করলেন না। সমগ্র কাশ্মীরীদের তিনি এই আন্দোলন বয়কট করতে আবেদন জানান। অবশ্য তাঁর এই আবেদনে সামান্যই সাড়া পাওয়া যায়। দেশবিভাগের পর মির ওয়াইজ পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার জন্য করাচী গমন করেন। আলোচনা শেষে তিনি কাশ্মীরে ফিরতে চাইলে, মহারাজা তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে আদেশ জারি করেন। তিনি পাকিস্তানে ফিরে যান এবং 'প্রভিশনাল আজাদ কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট'-এ যোগদান করেন। তিনি কিছুদিন এই সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। পরে সভাপতি-রূপে অধিষ্ঠিত হন।

প্রকৃত পক্ষে মির ওয়াইজ একজন ধর্ম-প্রচারক ও গোঁড়া সমাজ-সংস্কারক। ইসলাম ধর্মের গোঁড়া নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও তিনি তাঁর সাধ্যমত জনগণের উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি বালক ও বালিকাদের জন্য দুটি ইসলামিয়া হাই স্কুল স্থাপন করেন। ধূমপান ও মদ্যপানের অপকারিতা প্রদর্শন করে তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করে প্রবন্ধ রচনা করেন। 1934 সালে তিনি 'দি ইসলাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি অতি অল্পকাল স্থায়ী হয়। 1936 সালে তিনি পুনরায় 'মিলাৎ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচারের জন্য। পাকিস্তানে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় নি।

[P. M. Bazaz—Inside Kashmir, Srinagar, 1941 ;—History of the Struggle for Freedom in Kashmir, New Delhi, 1947 ;—Kashmir Ka Gandhi, Srinagar, 1935 ; P. N. K. Bamzai—The History of Kashmir, New Delhi, 1962 ; Dewan N. D. Nargis—History of the Dogra Raj (in Urdu), Jammu, 1967 ; Personal interview of the Research fellow with Mir Waiz Yusuf Shah's son Maulavi Tarooq, and another old associate in Srinagar.]

(টি, আর. সারীন) মুশীরল হক্

1918 সালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রুমজ-ই-বেখুদী' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি মুসলীম সম্প্রদায়কে কোরানের অনুগামী হতে বারবার অনুরোধ করেছেন।

ইকবাল কোন সময়েই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে খুব একটা চিন্তিত ছিলেন না বা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদানও করেন নি। এই সময়টি ছিল পাঞ্জাবের পক্ষে ঘোরতর বিপদের দিন। পাঞ্জাব তখন কুখ্যাত 'রাউলাট এ্যাক্‌টে'র শিকার। ইকবাল কিন্তু সাহিত্যেই নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। বৃটিশ সরকার এই সময় তাঁকে 'নাইটহুড' উপাধি দান করেন। অধ্যাপক আর. এ. নিকোলসন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করেন এবং পাশ্চাত্যে তাঁর পরিচিতি হয়। 'নাইটহুড' উপাধি ইকবালের কবিত্বের পুরস্কার।

1923 সালে 'বাঙ্গ-ই-দীরা' নামে একটি পুস্তকে উর্দুতে তাঁর বিক্ষিপ্ত কবিতাবলী গ্রন্থিত করেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু উর্দু ভাষার মাধ্যমে। উর্দু কবি হিসাবেই মহম্মদ ইকবালের খ্যাতি স্বদেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপরেই কবি ইকবালের জীবনে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। আইন ব্যবসায়ে তাঁর যেহেতু একেবারেই মনোযোগ ছিল না, তাই সেদিকেও তিনি বেশী ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। 1926 সালে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন ও পাঞ্জাব আইন-পরিষদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন।

এই সময়েই ভারত এবং ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়া অ্যাক্‌ট নিয়ে প্রচণ্ড মতানৈক্য দেখা দেয়। বৃটিশ সরকার যখন সাইমন কমিশন নিযুক্ত করলেন তখন কংগ্রেস ও অন্যান্য সমস্ত জাতীয় দলগুলির কাজে এই ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার গঠনে অবহেলা ও অবজ্ঞাসূচক বলে প্রতিভাত হয়। তাঁরা পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে একটি "সাংবিধানিক দক্ষ দল" (Committee of Constitutional Experts) গঠন করলেন। এই দলটি নেহরুর নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটি রিপোর্ট রচনা করেন। কিন্তু মুসলীমরা তাতে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে বলে মনে করেন এবং কবি ইকবাল নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন।

মুসলীমদের চেতনা ও চাওয়া পাওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হউক এই মর্মে দিল্লীতে 1 জানুয়ারী 1929-এ অল পার্টি'স মুসলীম কনফারেন্স (All Parties Muslim Conference) আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে প্রধানতঃ পরবর্তী India Act-এ সংযোজিত করার মানসে ১৩টি দাবী সমন্বিত একটি resolution প্রস্তুত করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিখ্যাত এম. এ. জিন্না সৃষ্ট চৌদ্দ দফা দাবীর প্রথম পাদপীঠ এখানেই রচিত হয়।

1930 সালে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের বার্ষিক অনুষ্ঠান শুরু হয় এলাহাবাদে। এখানেই প্রথম পাকিস্তান সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং তার রচয়িতা ও উদ্বোধক ছিলেন কবি ইকবাল স্বয়ং। তিনি বলেন—পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান নিয়ে একটি স্বতন্ত্ররাষ্ট্র গঠিত হবে—বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে অথবা বাইরে যেখানেই হোক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসম্পন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনই রাজনৈতিক অশান্তি ও অনৈক্য দূরীকরণের একমাত্র পথ। ইকবালের এই প্রস্তাবই বর্তমান পাকিস্তানের জন্মের প্রথম সোপান হিসাবে গণ্য হতে পারে।

এই সময় থেকেই ইকবাল মুসলীম সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেন। তিনি 1931-32 সালে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় লণ্ডন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। এখানে তিনি যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন।

কিন্তু তাঁর শেষ জীবন সুখের ছিল না। পরিবারে ক্রমান্বয় দুটি বিয়োগান্তক ঘটনা ইকবালের মন ও স্বাস্থ্য দুইই ভেঙ্গে দিয়ে যায়। 1934 সাল নাগাদ তিনি দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েন যা মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী ছিল। কিন্তু তাঁর মানসিক সচেতনতা একটুও নষ্ট হয়নি। সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ গঠনের পশ্চাতে তাঁর সক্রিয়তা আগের মতই অক্ষুণ্ণ ছিল। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লীগ গঠনে তাই স্যার ইকবাল মহম্মদের নাম চিরস্মরণীয়।

21 এপ্রিল 1938 সালে ইকবাল লাহোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মুঘল বাদশা আওরঙ্গজেব নির্মিত "বাদশাহী মসজিদ" অঞ্চলে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

কিছু কিছু ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের কাছে ইকবালের অবদান অসামান্য। প্রথম জীবনেই ইকবাল কেমব্রিজের দুই শিক্ষক ম্যাকটেগার্ট ও ওয়ার্ডের মাধ্যমে হেগেলের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। জার্মান লেখক নীৎস-এর দর্শনও তাঁকে

প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। জার্মান দার্শনিক 'ফিকটে', ফরাসী চিন্তাবিদ 'হেনরী বার্গসন', 'ম্যাসিগনন'ও তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি অনেকটাই রিভাইভালিস্ট বা পুনরুজ্জীবনবাদী হয়ে ওঠেন। তাঁর মতে দর্শন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগতে যে অগ্রগতি হয়েছিল তার অনেক আগেই মুসলীম জগতে তার স্ফুরণ ঘটেছিল।

ফার্সী ও উর্দু কবিত্বের জগতে ইকবাল ছিলেন সত্যই অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং দিকপাল। চিন্তার গভীরতা, ভাষার উপর দখল এবং কল্পনার প্রসারতার দিক থেকে ইকবাল এর সমকক্ষ পাওয়া ছিল দুষ্কর। তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা 'Reconstruciton of Religious Thought in Islam' মুসলীম দর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। ভারতে ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে ইকবাল লিখিত ফার্সী ও উর্দুভাষায় নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল ও ইকবালকে কবিত্বের শ্রেষ্ঠাসনে আসীন করেছিল : 'Zyubur-i-Azam', 'Javeed-Nameh', 'Pas Chih Bayed Kard', 'Bal-i-jibrael' এবং Zarb-i-Kalim। তাঁর বহু রচনা ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যদিও ইকবাল কোন ধারাবাহিক দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা আমাদের কাছে রেখে যাননি, তবুও পৃথিবীর চিন্তাবিদ্ মহলে ইকবালের স্থান তর্কাতীত ও অক্ষুণ্ণই থাকবে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই তাঁকে ঘিরে অনেক আবেগ ও ভাবালুতা প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কেবলমাত্র একজন নিরপেক্ষ গবেষকই বিশ্বের দর্শন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেন।

[Iqbal's Works, most of which are available in English, French, German and Italian Translations as well ; "Abdul Majid 'Salik'—Dhikr-i-Iqbal (Urdu biography), Lahore, 1955 ; Khatyifa 'Abdel-Hakim—Hayat-i Iqbal, Lahore, n. d. ;— Fikr-i-Iqbal, Lahore 1961 ; Abdulla Anmar Beg—The Poet of the East : The Life and Work of Dr. Shekh Muhammad Iqbal, the Poet-Philosopher, Lahore, 1939 ; B. A. Dar—A Study in Iqbal's Philosophy, Lahore, 1944 ; A. Schimmel—The Western Influence on Sir Muhammad Iqbal's Thought (Vide Proc. IX International Congress for the History of Religions), Tokyo, 1960 ; Gabriel's Wing, Leiden, 1963 ; W. Cantwell Smith—Modern Islam in India, Lahore, 1947 ; 'Ata Muhammad—Iqbal Nama (2 Vols.) ; Collections of Iqbal's Letters, Lahore, n. d. ; S. Nazir Niyazi—Maktubat-i-Iqbal, Karachi, n. d. ; Syed Iqbal Vahid—Thoughts and Reflections of Iqbal, Lahore, 1964.]

(ডি. এল. দত্ত) মালিক রাম বাভেজা

ইন্দর পাল পণ্ডিত (১৯০১-১৯৪৯)
Indar Pal Pandit (1901-1949)

1901 সালের 30 জুন ইন্দর পাল পণ্ডিত পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার জ্বালামুখী নামক তীর্থস্থান থেকে পাঁচ মাইল দূরে নদাউন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত হরিরাম একজন সামান্য দোকানদার ও শ্রমিক (যদিও জাতিতে ব্রাহ্মণ) ছিলেন। তাঁর মাতার নাম রাম দেবী। ইন্দর পাল জ্বালামুখীতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন ও লাহোর থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি রেফ্রিজারেটারের মিস্ত্রীরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি 'বিষাণ' 'বীরভারত', 'প্রতাপ' প্রভৃতি পত্রিকায় হস্তলিপি বিশারদরূপে কিছুদিন কাজ করেন। সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় তিনি ইংরাজীতে বি. এ.-র সমতুল্য জ্ঞান অর্জন করেন। অতীব কৌতূহল ও অভিনিবেশ সহকারে তিনি লর্ড অ্যাকটনের 'লেকচারস অন্ দি ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশান' ও রুশো ও মণ্টেনের গ্রন্থাবলী পাঠ করেন।

1927 সালের লাহোরের পোস্ট মাস্টারের কন্যা জগদীশ কুমারীর সঙ্গে ইন্দরপালের বিবাহ হয়। তাঁদের বীরভারত ও মধুবালা নামে একটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়।

দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্যের নিদারুণ কশাঘাতে জর্জরিত স্বদেশবাসীর দুরবস্থা দেখে ইন্দরপাল গভীর দুঃখ ও যন্ত্রণাবোধ করেন। ইন্দরপাল প্রথম যখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তখন

লালা লাজপত রায় ও হরদয়ালের অনুসৃত মতাদর্শে আকৃষ্ট হন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এক নিজস্ব অভিনব পন্থা অনুসরণ করেন। রুশবিপ্লব তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। গদর-পার্টির অনুকরণে তিনি হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো। বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে তিনি পণ্ডিত রূপচাঁদ, ভগবতীচরণ, যশপাল পণ্ডিত, অমৃক সিং এবং গুলাব সিং প্রমুখের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। তিনি হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি নামে একটি গোপন সংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই সংস্থার নেতা ছিলেন মহাতেজস্বী চন্দ্রশেখর আজাদ। তিনি গোপনে যুবকবৃন্দকে গেরিলা যুদ্ধের নীতি প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। 1920 সালে তিনি (ইন্দরপাল) জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন ও সেই বছরই কারারুদ্ধ হন। ঐ বছরই রাওয়ালপিণ্ডির জেলে বন্দী অবস্থায় ইন্দরপাল একটি কবিতা রচনা করেন 'মঞ্জিল-ই-আজাদী' (স্বাধীনতার লক্ষ্য)।

সাইমন কমিশন বর্জনের জন্য লাহোরে যে শোভাযাত্রা হয়, ইন্দরপাল তাতে অংশগ্রহণ করেন। ঐ শোভাযাত্রাতেই লালা লাজপত রায় আহত হন। 1930 সালে 19 জুন লাহোর, অমৃতসর, লয়লাপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, গুজরানওয়ালা এবং শেখপুরাতে একই সঙ্গে যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে, ইন্দরপাল তাতে জড়িত ছিলেন।

পরবর্তীকালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। তবে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের চরমপন্থী গোষ্ঠীর প্রতিই তাঁর বিশেষ সমর্থন ছিল। তিনি একাধিকবার কারারুদ্ধ হন। সর্বশেষ কারাবরণ করেন 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সময়। 1947 সালে স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি সপরিবারে দিল্লীতে চলে আসেন। এরপর আর তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। 1948 সালে মহাত্মা গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পান। 1949 সালের 18 এপ্রিল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ইন্দরপালের জীবনাবসান হয়। তিনি প্রকৃতই একজন ধর্মনিরপেক্ষ ও নিরলস যোদ্ধা ছিলেন।

[Gulab Singh—Under the Shadow of Gallows ; Files of the Tribune ; History of Freedom Movement Records, Punjab Archives, Patiala ; Information collected from Inderpal Pandit's brother Dina Nath Pandit at Delhi, and his political associate, Rup Chand, at Chandigarh.]

এস. ডি. গজরানি **ভি. এন. দত্ত**

ইন্দুমতী সিংহ (১৮৯৯-১৯৬৭)

Indumati Sinha (1899-1967)

1899 সালে 21 জুলাই চট্টগ্রামে ইন্দুমতী সিংহের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম গোলাপ সিংহ ও মাতার নাম রাজকুমারী দেবী। তিনি ছিলেন বিপ্লবী নন্দলাল সিংহ ও অনন্তলাল সিংহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বর্তমান শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশ দশকে চট্টগ্রাম শহরের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন এই দুই ভ্রাতা।

ইন্দুমতী দেবী আই. এ. অবধি পড়াশুনা করেছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। লক্ষ্যভেদে তাঁর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। তাঁর পিতার বন্দুক নিয়ে ইন্দুমতী নিয়মিত বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করতেন। তাঁর ভ্রাতা অনন্তলাল তাঁকে একটি রিভলভার দান করেন। এই রিভলভার ব্যবহারেও তিনি সমান দক্ষতা অর্জন করেন। মোটর গাড়ি চালনাতেও তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। ইন্দুমতী একটি মহিলা ব্যায়ামাগার পরিচালনা করতেন।

তিনি কখনও বিদেশী পোশাক পরিধান করতেন না। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 1920 সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইন্দুমতী খদ্দর পরিধান করতে শুরু করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই খদ্দরই তাঁর একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র ছিল।

1930 সালের 18 এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রস্তুতিপর্বে ইন্দুমতী দেবী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মাস্টারদা (সূর্য সেন) নারী সদস্যাদের যখন সম্মুখ সংগ্রামে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন না, তখন ইন্দুমতী কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে সস্নেহে মাস্টারদা নিজের হাতে একটি চিঠি লেখেন। বিপ্লবী ভাইদের সকলের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ভগিনী।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে জড়িত—এই অভি-যোগক্রমে ধৃত বিপ্লবীদের বিচারের জন্য একটি বিশেষ বিচারালয় গঠিত হয়। আইনজীবীদের ফি ও মামলার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য বিপ্লবী দলের পক্ষ থেকে ইন্দুমতী দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। এলাহাবাদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁকে 501 টাকা প্রদান করেন। ইন্দুমতী নিজের চেষ্টায় 23 টি ডিনামাইটের স্টিক সংগ্রহ করেন ও গোপনে চট্টগ্রাম জেলে প্রেরণ করেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল বোমার আঘাতে জেল ভেঙে বিপ্লবীদের উদ্ধার করা। কিন্তু তাঁর এই গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ায় তিনি ব্যর্থ হন।

তিনি বহুবার পুলিশী তল্লাসীর সম্মুখীন হন। স্টীমারে, রেলে ও পথে ঘাটে সর্বত্রই তাঁকে ছায়ার মত পুলিশ অনুসরণ করত। কিন্তু কখনই তাঁর কাছ থেকে সন্দেহজনক কোন বস্তুই পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি।

ত্রিপুরার জেলাশাসক মিঃ স্টিফেনসকে গুলি করে হত্যা করে শান্তি ও সুনীতি নামে দুই বিপ্লবী তরুণী। তারপরই 1931 সালে ইন্দুমতী পুলিশের হাতে বন্দী হন। কুমিল্লাতে তিনি ধরা পড়েন। দীর্ঘ ছ'বছর তিনি কখনও জেলে বন্দী থেকেছেন, কখনও গৃহে অন্তরীন অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। মুক্তি লাভ করে ইন্দুমতী জীবন-বীমার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন।

1941 সালে নেতাজীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর পুলিশ তাঁকে নানাবিধ উপায়ে লাঞ্ছিত করে যাতে জেরার মুখে তিনি নেতাজী সম্পর্কে কোন গোপনসূত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু ইন্দুমতীর অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে পুলিশকে নতিস্বীকার করতে হয়।

মহান, উদার, সাহসী ও মহিমান্বিত নারী চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইন্দুমতী সিংহ। তিনি আজীবন চিরকুমারী ছিলেন। 1967 সালের 4 মে কলকাতায় এই বীর রমণীর জীবনাবসান হয়।

[Ananda Prasad Gupta—Chattagram Bidroher Kahini, Calcutta, 1948 ; Kamala Das Gupta—Swadhinata Sangrame Banglar Nari, Calcutta, 1370 B.S. ; Charu Bikas Datta—Chattagram Astragar Lunthan, Calcutta, 1363 B.S. ; Kalpana Datta —Chittagong Armoury Raiders ;—Reminiscences, Bombay, 1945 ; Personal Knowledge of the Contributor.]

মিহির বোস

ইন্দুলাল যাজ্ঞিক (১৮৯২-১৯৭২)
Indulal Yagnik (1892-1972)

ইন্দুলাল যাজ্ঞিক 1892 সালের 22 ফেব্রুয়ারী গুজরাটের নাদিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। নাদিয়াদ তখন সাহিত্য চর্চার কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত ছিল। ইন্দুলালের পিতা ছিলেন নাগরব্রাহ্মণ কানাইয়ালাল যাজ্ঞিক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ইন্দুলালের দাদা ডঃ রমনলাল যাজ্ঞিক ছিলেন গুজরাটের খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী।

ইন্দুলাল যখন বোম্বাই-এর গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়েন সেই সময় কানাইয়ালাল মারা যান। ইন্দুলাল উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন অদম্য সাহস, স্বাধীনচিন্তা ও সংস্কার-পন্থী দৃষ্টিভঙ্গী। ইন্দুলালের মাতা মনি-গৌরী ছিলেন খুবই স্নেহপ্রবণ। 1914 সালে মনসুখ-রাম ত্রিপাঠীর কন্যা কুমুদের সঙ্গে ইন্দুলালের বিবাহ হয়।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ইন্দুলালের বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়েছিল নাদিয়াদ বিদ্যালয়েই। 1906 সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় নাদিয়াদ জেলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার এবং বৃত্তি লাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি এক ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছিলেন। 1907 সালে তিনি আমেদাবাদে অবস্থিত গুজরাট কলেজে ভর্তি হন। এখানে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি বোম্বাই-এর সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এই পরীক্ষায় কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করার ফলে তিনি 'দক্ষিণা ফেলোশিপ' প্রাপ্ত হন। 1912 সালে তিনি এল. এল. বি. ডিগ্রী লাভ করেন। বোম্বাই-এ শিক্ষালাভকালে তিনি কে. এম. মুন্সীর সঙ্গে একত্রে 'গুর্জর সভায়' যোগদান করেন। গুজরাটের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এই সভাটি গঠিত হয়েছিল। মিল, স্পেন্সার, টলস্টয়, মাৎসিনি প্রভৃতি লেখকের রচনা দ্বারা তিনি বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। অরবিন্দ ও অ্যানি বেসান্তের রচনার প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষ অনুরক্ত।

ছাত্রাবস্থা থেকেই ইন্দ্রলাল ছিলেন কিশোর সাংবাদিক। 1912-13 সালে 'বম্বে সমাচার'-এ তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। পরে তিনি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক হিন্দুস্থান পত্রিকায়ও বহু প্রবন্ধ লেখেন।

1915-তে গুজরাটি মাসিক পত্রিকা 'নবজীবন অনে সত্য' নামক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখা শুরু করেন। পরে এই পত্রিকাটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন গান্ধীজী (1919)। এরপর শঙ্করলাল ব্যাঙকারের সঙ্গে একযোগে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিকী প্রকাশ করেন। এ বছরেই তিনি 'সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে যোগদান করেন।

1919 সালে কিছুকালের জন্য তিনি সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির নাগপুর শাখায় কাজকর্ম পরিচালনা করেন। এই সময় এখানকার ইংরাজি সাপ্তাহিকী 'হিতবাদে' পত্রিকায় তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়। এই বছরেই তিনি গুজরাটবাসীর সেবার জন্য আমেদাবাদে আসেন। ঠক্কর বাপা ও রণজিৎরাম ভাবধাই-এর সংস্পর্শে এসে তিনি 'গুজরাট এডুকেশন কনফারেন্স' গঠন করেন।

1917 সালে তিনি প্রেস প্রতিনিধি হিসেবে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য মেসোপটেমিয়া গমন করেন।

মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরে এসে তিনি সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে গুজরাটে 'হোমরুল' আন্দোলনে যোগদান করেন। 1917 সালের অক্টোবর-এ তিনি ব্রোচে দ্বিতীয় গুজরাট এডুকেশন কনফারেন্স গঠন করেন। একই বছর তিনি গোধারায় (পঞ্চমহল জেলা) প্রথম রাজকীয় পরিষদ গঠন করেন। মহাত্মা গান্ধী এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। ইন্দ্রলাল এই সময় গুজরাট এডুকেশন এসোসিয়েশন ও গুজরাট রাজকীয় মণ্ডলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। আমেদাবাদের গুজরাট সভার সদস্যও ছিলেন তিনি।

1918 সালে কায়রা সত্যাগ্রহে 'কর-বন্ধ আন্দোলনে' যোগদান করেন ইন্দ্রলাল। বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে একযোগে তিনি 'গুজরাট ফেমিন রিপোর্ট' তৈরী করেন। 1919-এ তিনি গুজরাটের পঞ্চ মহল জেলায় 'দুর্ভিক্ষ উপশম' সংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 'রাউলাট এ্যাক্ট' এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অভিযানেও এই সময়ে তিনি নেতৃত্ব দান করেন।

1920 সালে ইন্দ্রলাল স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কিশোর লাল মসরুওয়ালার সঙ্গে 'গুজরাট বিদ্যাপীঠ' গঠন করেন। তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলেই আমেদাবাদে 'নবী গুজরাটীশালা' ও 'মহিলা পাঠশালা' গঠিত হয়।

1921 সালে গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সম্পাদক হিসাবে তিনি ব্রোচে গুজরাট রাজকীয় পরিষদের পঞ্চম অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে তীব্র মত বৈষম্য হওয়ার ফলে তিনি সব ক'টি সমিতি থেকেই পদত্যাগ করেন।

1922 সালে তিনি ঠক্কর বাপার সঙ্গে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি গঠন করেন। তিনি ভীল শিশু বিদ্যালয় ও 'মিরখেদী ভীল আশ্রম' গঠন করেন।

1922-এর অক্টোবর মাসে 'যুগধর্ম' নামে একটি গুজরাটি মাসিক পত্রিকা বার করেন। 1923 এ তিনি অন্ত্যজ সেবা মণ্ডলের সম্পাদক নিযুক্ত হন। গুজরাটের সত্যাগ্রহ কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে তিনি বহু সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবককে সংগঠিত করেন। 1923 সালে ইন্দ্রলাল এক বছরের জন্য ধৃত ও বন্দী হন। প্রায় দশমাসকাল তিনি তাঁর আরাধ্য নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যারবেদা জেলে বন্দী ছিলেন। কিন্তু জেল থেকে 1924 সালে ছাড়া পাবার পরে তিনি গান্ধীজীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও মতামতের বিরূপ সমালোচনা করেন। এরপর তিনি আমেদাবাদ ছেড়ে বোম্বাই চলে আসেন। গুজরাটি দৈনিক পত্রিকা 'হিন্দুস্থান' ও ইংরাজি পত্রিকা 'এ্যাডভোকেট অব ইণ্ডিয়া' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 1926-27 সালে তিনি 'বম্বে ক্রনিকলের' সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন।

1928 সালে ইন্দ্রলাল 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার কার্যে ইস্তফা দিয়ে চলচ্চিত্রশিল্পে যোগদান করেন। গল্প লেখক, নির্দেশক ও স্টুডিও মালিক হিসেবে যোগদান করলেও তিনি এখানে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নি।

1930-35 সালে পর্যন্ত পাঁচ বৎসর ইন্দ্রলাল ইউরোপ সফর করেন। প্রথমে তিনি জার্মানীতে যান। সেখান থেকে 1931 সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে যাত্রা করেন। লণ্ডনে তিনি ভারতবর্ষে 'অবশ্যম্ভাবী স্বাধীনতা আসুক' এই দাবী জানিয়ে একটি সাপ্তাহিকী প্রচার করেন। 1932-33 সালে ডাবলিনে থাকাকালীন তিনি 'India-Ireland Friendship Association' গঠন করেন।

1935 সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে আইরিশ জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত যাজ্ঞিক জাতীয় পোশাক, জাতীয় খেলাধুলা, জাতীয় ভাষা বিষয়ে প্রচার শুরু করেন। 1936 সালে তিনি সক্রিয়ভাবে 'কিষাণ সভা'য় যোগদান করেন ও 1939-এ গুজরাট 'কিষাণ পরিষদ' গঠন করেন। 1940-41-এ 'যুদ্ধ বিরোধী' প্রচার কার্যের জন্য তিনি ধৃত ও বন্দী হন। 1942-এ তিনি 'অখিল-হিন্দ-কিষাণ সভার' বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং 'নতুন গুজরাট' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 1943-এ তিনি আবার 'গুজরাট কিষাণ সভার' সভাপতির পদে বৃত হন ও গুজরাটের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান। 1942-44 এ তিনি 'কায়রা জেলার সমবায় বিপনির' চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এরপর তিনি গুজরাটের নানাস্থানে বিদ্যালয় ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 1944-56 সাল পর্যন্ত তিনি কায়রা জেলার নেনপুর আশ্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকেন।

1952 সালে তিনি চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন।

1956 সালে তিনি 'মহাগুজরাট আন্দোলনে' যোগদান করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী করেন। 'মহা-গুজরাট জনতা পরিষদের' তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

1957 সাল থেকে (1972) সাল পর্যন্ত তিনি আমেদাবাদ নির্বাচনমণ্ডলী থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। মৃত্যু কাল 1972 পর্যন্ত তিনি লোকসভার সদস্য ছিলেন।

অনাড়ম্বর পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন ইন্দুলাল। মর্ম-বিদ্ধকারী দুটি আয়ত চক্ষু, তাপস-সদৃশ ইন্দুলালকে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বিরল দৃষ্ট নেতাদের অন্যতমরূপে চিহ্নিত করেছে। তাঁর মতে নারী জাতির উন্নতি ছাড়া একটি সুসংগঠিত জাতি সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করতেন দারিদ্র্য ও অন্ত্যজর মধ্যেই ঈশ্বরের মূল অধিষ্ঠান।

যদিও গুজরাট ছিল তাঁর মূল কার্য-ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্যাবলীই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হত। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থক হলেও ইন্দুলাল একই সঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলনে আগ্রহী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনেরও একজন বড় হোতা ছিলেন ইন্দুলাল। সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাহিত্যগত সমস্ত দিক থেকেই গুজরাটের উন্নতির সঙ্গে ইন্দুলালের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য ইন্দুলাল বহু সংবাদ পত্রে নানা বিষয়ে অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইংরাজিতে লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—"Mahatma Gandhi As I Know Him", "Shyamji Krishna Varma", "Peasants' Revolt", "Irish Athletic Movement", "Life of Ranchoddas Lotwala", "Fight For Swadeshi ও গুজরাটি ভাষায় লেখা "গান্ধীজীনা সহবাসমন্" "কুমারনান স্ত্রীরত্ন স্বদেশী স্বমতে?" "বদভাখর পিতানি তস্বির" (জেমস্ কনোলীর জীবনী) "শহীদনো সন্দেশ" প্রভৃতি এবং কয়েকটি নাটক যেমন—'রণসংগ্রাম', 'আশা নিরাশা' 'দুকাল' প্রভৃতি। এই লেখাগুলিই গুজরাটি জনমানসে তৎকালে খুবই সাড়া জাগিয়ে ছিল। পার্থিব কোনও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী না হয়ে ইন্দুলাল গুজরাটের মাটিকে সন্ন্যাসী সেবকের মতই একনিষ্ঠভাবে সম্পূর্ণ নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করে সেবা করে গেছেন।

[Mehta, Sharada—Jeenam Sambharanan (in Gujarati), Ahmedabad, 1931; Munshi, Leelavati—Jeevant Rekhachitro (in Gujarati), Bombay; Oza, Dhanavant —Apana Indubhai (in Gujarati), Ahmedabad, 1953, Yagnik, Indulal—Atmakatha, 3 parts (in Gujarati), Ahmedabad;—Mahat ma Gandhi As I Know Him, Delhi, 1943; Shyamji Krishna Varma, Bombay, 1950; —Kumarnan Striratno (in Gujarati), Baroda, 1928;—Rashtrageet (in Gujaratati), Bombay, 1944;—Fight for Swadeshi;—Irish Athletic Movement;—Peasanti's Revolt;—Ranasangram (in Gujarati), Bombay, 1938; The Times of India Files, 1957-65; Personal interview of the Research Fellow with Indulal Yaghik.]

কুমুদ প্রসন্ন **আর. এল. রাভল**

ইন্দ্র বিদ্যা বাচস্পতি (১৮৮৯-১৯৬০)

Indra Vidya Vachaspati (1889-1960)

1889 সালের 9 নভেম্বর পাঞ্জাবের জলন্ধর

জেলার 'নবন শহরে' ইন্দ্র বিদ্যা বাচস্পতির জন্ম হয়। তিনি প্রখ্যাত লালা মুন্সী রামের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। মুন্সী রাম সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে সমধিক পরিচিত হয়েছিলেন। ইন্দ্র-র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিশচন্দ্র দিল্লী থেকে প্রথম হিন্দী সাপ্তাহিক "বিজয়" প্রকাশের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। 1914 সালে তিনি বিদেশ যান এবং সেখানে এক রহস্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা কনিষ্ঠ ভ্রাতার মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল।

ইন্দ্র দু'বার বিবাহ করেছিলেন—1921 সালে বিদ্যাবতীকে এবং তাঁর মৃত্যুর পর 1929 সালে চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করেন।

সাত বছর বয়সে ইন্দ্রকে গুজরানওয়ালার গুরুকুলে পাঠান হয়। সেখানে তিনি সংস্কৃতের মাধ্যমে সনাতনী ভারতীয় প্রথায় শিক্ষা লাভ করেন। পাঁচ বছর তিনি শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করেন। গণিত, বিজ্ঞান, ইংরেজি, ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে তিনি পরে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর পিতা তাঁকে আইনজীবী করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু দেশের কাজের প্রতিই পুত্রের অধিক ঔৎসুক্য ছিল। বিদেশ ভ্রমণের অনেক প্রস্তাবই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। প্রকৃত পক্ষে "বিদেশ ভ্রমণ ও সেখানে থেকে ডিগ্রী লাভ করা অত্যন্ত সম্মানজনক" এই ধরনের চিন্তাধারাকেই তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি গুরুকুল কাঙরিতে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি নিজেও জীবনের প্রথম শিক্ষালাভ এখানেই করেছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠান জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী আদর্শের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। অল্প বয়সেই তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং 1920-21 সালে দিল্লী কংগ্রেসের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। প্রথম জীবনে তিনি ডাঃ এম. এ. আনসারি, লালাশঙ্কর লাল, হাকিম আজমল খান, দেশবন্ধু গুপ্তের ন্যায় নেতাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আর্য সমাজ ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তখন থেকে দিল্লীর রাম সিং, আজমীরের চাঁদ করণ সর্দা প্রভৃতি নেতার সাহচর্যে কাজ করেছেন।

যে সব গ্রন্থ তাঁকে জনকল্যাণমূলক সমাজ-সংস্কারের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে "গ্ল্যাডস্টোনের জীবনী" সেগুলির অন্যতম। তিনি তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন—পাশ্চাত্য দেশে যাঁরা সমাজ-সংস্কারের কাজে নিযুক্ত থাকেন তাঁরা জনগণের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভ করেন কিন্তু ভারতে এই অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এর ফলেই তিনি আরও জনকল্যাণমূলক সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্ম সমর্পণ করবেন—এই মর্মে সংকল্প গ্রহণ করেন।

শ্রদ্ধানন্দের পুত্র এবং গুরুকুল কাঙরির ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে ইন্দ্র একজন নিষ্ঠাবান আর্যসমাজী এবং দয়ানন্দের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি আর্য সমাজের সন্ধ্যা, হবন, বিধবা-বিবাহ, শুদ্ধি, আশ্রম প্রথানুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি রীতিনীতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস মনে-প্রাণে পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি কোন প্রকার সম্প্রদায়-ভুক্ত বা ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছিলেন "বিদেশী চিন্তাধারায় যেমন দয়ানন্দের অবদান অসামান্য তেমনি তিনি তার থেকে গ্রহণও করেছেন প্রচুর।" তিনি ধর্মের পবিত্রতা ও সহন-শীলতার ওপর জোর দিতেন। হিন্দু ও শিখদের মধ্যে বিবাদ বা মতবিরোধিতা তাঁকে অসুখী করত।

তিনি বিশ্বাস করতেন মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা একজন মানুষকে সর্বান্তঃকরণে সমাজ ও জাতির সেবক করে তুলতে পারে। তাঁর কাছে ধর্ম এবং রাজনীতি ছিল অবিচ্ছেদ্য। তাঁর মতে আর্য সমাজের রাজনীতি পরিহার করা উচিত নয়; অপরদিকে রাজনীতির মধ্যেই কংগ্রেসের নিজেকে আবদ্ধ রাখা সঙ্গত। তাঁর মতানুসারে অহিংসা এবং সত্য একজনের ব্যক্তিগত জীবনে ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু অহিংসা রাজনৈতিক নীতি হতে পারে না। এ বিষয় গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর তীব্র মতানৈক্য হয় এবং প্রধানতঃ এই কারণেই 1941 সালে তিনি কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করেন।

গুরুকুল কাঙরির ছাত্র হিসাবে কয়েকজনের সহ-যোগিতায় তিনি জাতীয় পতাকার নক্‌শা তৈরি করার পরিকল্পনা করেন। সেই সময় এই ধরনের চিন্তা একমাত্র বিপ্লবীদেরই ছিল। তিনি পত্র-পত্রিকায় নির্ভীকভাবে লিখেছিলেন—সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুধুমাত্র বিদ্রোহ নয়, এ ধরনের অভ্যুত্থান বিপ্লবের অগ্রদূত। রক্তক্ষয় ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব এই মতবাদে তাঁর আস্থা ছিল না।

বিশের দশকের শেষ দিকে ইন্দ্র রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশঃ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। মুসলমানদের মনোভাব ও কংগ্রেসের আপোষনীতিই ছিল এর বিশেষ কারণ। কিন্তু হিন্দু মহাসভারও ধর্মান্ধ দলের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল না। তিনি

একবার এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন—"হিন্দু মহাসভার সনাতনীরা কংগ্রেসের মুসলমানদের মতোই ব্যবহার করছে।" মুসলমানদের সঙ্গে আপোষের জন্য তিনি গান্ধীজীর নিন্দাবাদ করেছিলেন। একবার তিনি তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন—"ওদের তোষণ করা কেন?" 1934 সালে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রত্যাহার বিষয়েও গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধতা ঘটে। তখন পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রবাদী দলের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর কাছে তখন নেহরুই ছিলেন প্রকৃত নেতা। 1941 সালের কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান এবং হিন্দু মহাসভায় পুরোপুরি যোগ দেন। 1946-47 সালে তিনি ভারত বিভাগের তীব্র বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস যখন ভারত ব্যবচ্ছেদের নীতি মেনে নেয় তখন তিনি একে পাগলামি ও বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যা দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি বলেছিলেন—ভারত এখন শুধুমাত্র হিন্দুদের আর এই দেশের প্রতি আনুগত্য থাকলে তবেই অন্যরা বাস করতে পারবে।

নির্ভীক জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক হিসাবেই ইন্দ্র বিদ্যা বাচস্পতি অধিক পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্তৃক প্রকাশিত "বিজয়া"র (দিল্লী) তিনি সম্পাদনা করেছিলেন 1920 সালে। এর পূর্বে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে আর্য সমাজ সম্পাদিত পত্রিকা 'সদ্ধর্ম প্রচারক'-এর প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি "বীর অর্জুন" প্রকাশ করেন এবং পঁচিশ বছর এর সম্পাদনা করেন। তিনি "সত্যবাদী"ও "জনসত্তা"রও সম্পাদনা করতেন।

তিনি কাশীর "নাগরী প্রচারনী সভা"র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সিন্ধের মুসলীম লীগ সরকার যখন "সত্যার্থ প্রকাশ"-এর প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তখন ইন্দ্রই অন্যতম প্রধান ব্যক্তি যিনি এর প্রতিবাদ করেন এবং পরবর্তীকালে এই নিয়ে এক জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

1927 সালে তিনি "বিজয়া"র আপত্তিজনক কিছু লেখার জন্য এবং পুনরায় 1930 সালে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য গ্রেপ্তার হন।

বহু প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীর ছাড়াও তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ ছিলঃ "Bharat Men British Samrajya Ka Udaya Aur Ant", "Mughal Samrajya Ke Kshaya Aur Uske Karan", "Marathon Ka Itihas", "Arya Samaj Ka Itihas", "Upanishadon Ki Bhumika", "Swatantra Bharat Ki Ruprekha", "Samrat Raghu", "Mere Pita" "Swaraja Aur Charitra Nirman", "Jeevan Jyoti", "Main Inka Reeni Hun", "Maharishi Dayanand", "Hamare Karmayogi Rashtrapati" এবং "Bharatiya Sanskriti Ka Pravah"।

একজন শক্তিশালী সাংবাদিক, নিবেদিত প্রাণ জাতীয়তাবাদী এবং মহৎ হৃদয় ইন্দ্র বিদ্যা বাচস্পতি জাতীয় আন্দোলনকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিলেন যদিও তাঁর কার্যাবলী পাঞ্জাব ও দিল্লীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

[Satyakam Vidyalankar and Anendra Vidyalankar—Indra Vidya-Vachaspati, Delhi, 1966; Dhirendra Varma and others (Ed.)—Hindi Sahitya Kosh Part—II, Varanasi, 1963; N. N. Mitra (Ed)—The Indian Annual Register, 1934—Vols. I+II, 1937—Vol. I; Files of the Vir Arjun, Vijaya, Jansatta; Indra Vidya Vachaspati's own works.]

(এল. দিওয়ানী) **অখিলেশ মিত্র**

ইফতিকার উদ্দিন মিঞা (১৯০৭- ?)

Iftikar-Uddin Mian (1907- ?)

1907 সালে লাহোরের ভোঘানপুরায় প্রখ্যাত মিঞা পরিবারে মিঞা ইফতিকার উদ্দিনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন ধনী ভূস্বামী এবং পাঞ্জাব বিধানসভার পার্লামেন্টারি সেক্রেটারী। মিঞা ইফতিকার উদ্দিনের সঙ্গে শাহ নওয়াজের বেগম, প্রধান বিচারপতি স্যার আবদুর রশিদ এবং স্বর্গীয় মিঞা মুহম্মদ শফীর বিধবা পত্নী লেডি শফীর আত্মীয়তা ছিল। লাহোরের Aitchison College-এ শিক্ষালাভ করার পর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালিওল কলেজ থেকে স্নাতক হন। তিনি একবারই বিবাহ করেছিলেন। 1938 সালে তাঁর পত্নী তাঁর সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তিনি প্রায় সমস্ত উপমহাদেশ সহ আমেরিকায় ব্যাপক ভ্রমণ করেন।

মিঞা ইফতিকার উদ্দিন একজন সুবক্তা এবং পাঞ্জাবে Indian National Congress-এর একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। 1935 সালে ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি Indian National Congress-এ যোগ দেন। সেই থেকে 1946 সালে পার্টিতে ইস্তফা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাব বিধান পরিষদের একজন সদস্য, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলের সম্পাদক এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদানের অভিযোগে তিনি দু'বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। 1946 সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে তিনি মুসলীম লীগে যোগদান করেন। তিনি তখন পাঞ্জাবের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরে তিনি গণ পরিষদে মুসলীম লীগের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। এই সময় থেকে মুসলমানদের অধিকার রক্ষার এবং পাকিস্তান গঠনের তিনি একজন উগ্র সমর্থক হয়ে ওঠেন। 1947 সালে পাঞ্জাবের বিশৃঙ্খলা রোধের জন্য যে শান্তি কমিটি গঠিত হয় তিনি তার সদস্য ছিলেন। 1947 সালে দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানের পুনর্বাসন মন্ত্রী হয়েছিলেন। 1950 সালে তিনি পাঞ্জাব মুসলীম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ বছরই পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি আজাদ পাকিস্তান পার্টি গঠন করেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে তিনি জাতীয় ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতি-ভেদহীন সমাজ গঠনের সপক্ষে ছিলেন। কিন্তু মুসলীম লীগে যোগদানের পর তিনি ধর্মান্ধ হয়ে ওঠেন এবং মুসলমান ও শিখদের জন্য পৃথক রাজ্যগঠনের সপক্ষে প্রচার শুরু করেন। উদারপন্থী হিসাবে তিনি সংসদীয় ও অহিংস পন্থার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের উগ্র সমালোচক ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের এবং ইউনিয়নিস্ট দলের বিরোধি ও তীব্র সমালোচক ছিলেন—কারণ এই পার্টি ছিল অভিজাত জমিদার সম্প্রদায়ের জন্য—জনগণের জন্য নয়। দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে 15 একরের কম পরিমাণ জমির মালিককে যেন করদান মকুব করা হয়। তিনি কৃষকদের নিরাপত্তার উন্নতিবিধানের সপক্ষে ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের ওপর 'আবিয়ানা' অথবা বিশেষ শুল্ক ধার্য করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। একইভাবে ভারতীয় শিল্পকে উদ্দীপিত করে তোলার জন্য, তিনি শিল্প তথা শিল্পোদ্ভূত দ্রব্যের ওপর মোটা কর ধার্য করার বিরোধী ছিলেন।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের জন্যও শিক্ষাব্যবস্থার নবীকরণের ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য তিনি জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে কে. এল. গোবার উক্তি যথার্থ—'জন্মসূত্রে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী, বুদ্ধিজাতভাবে ছিলেন সাম্যবাদী. ধর্মে ছিলেন নাস্তিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলীম লীগ অনুগামী এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূতভাবে সুযোগ সন্ধানী।'

[Home (Political) Department Records. 1937-45 ; Proceedings of the Punjab Legislative Assembly 1937-46 ; N. N. Mitra (Ed.)—The Indian Annual Register, 1935-47 ; Punjab's Who is Who (Lahore, 1945) ; Asia Who is Who, 1938 (Hongkong, 1958) : K. L. Gauba—Inside Pakistan (Delhi, 1948) ; Richard Symonds—The Making of Pakiston (London, 1949) ; A. N. Bali—Now It Can Be Told (Jullundur, 1949) ; Chaudhuri Khaliquzzaman Pathway to Pakistan (Karachi, 1960) ; G. D. Khosla—Stern Reckoning ; Chaudhuri Muhammad Ali—The Emergence of Pakistan (New York, 1967) ; Dr. Khalid Bin Syeed—Pakistan : The Formative Phase (Karachi, 1960) ; Leonard Binder—Religion and Politics in Pakistan (California, 1961.]

টি. আর. সারিন **এস. কে. বাজাজ**

ইব্রাহিম, মুহম্মদ (হাফিজ) (১৮৮৯-১৯৬৪)
Ibrahim Muhammad (Hafiz) (1889-1964)

1889 সালে উত্তর প্রদেশের বিজনোর জেলার

নাগিনা গ্রামে মুহম্মদ ইব্রাহিম (হাফিজ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাফিজ নাজমুল হুদা সামান্য জমির মালিক ছিলেন এবং বিশ শতকের প্রথম দিকের আগে পর্যন্ত কোন সময়েই তাঁর মালিকানাভুক্ত জমির নিরাপত্তা ছিল না। প্রথম জীবনে মুহম্মদ ইব্রাহিম প্রথানুযায়ী মাদ্রাসায় কোরাণ পাঠ করে সম্মানজনক 'হাফিজ' উপাধি লাভ করেন। তারপর 1908 থেকে 1915 সাল পর্যন্ত তিনি "ডিউটি সোসাইটি"-র আর্থিক সাহায্যে আলিগড়ে তীব্র প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে পড়াশুনা করেন। "ডিউটি সোসাইটি" নামক এই সংস্থাটি দরিদ্র ছাত্রদের অর্থ সাহায্য দিত। পরে তিনি তাঁর নিজ জেলাতেই ওকালতি শুরু করেন। সে সময়ে আইন ও রাজনীতি এত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিল যে তাঁর ঔৎসুক্য শুধু আইনব্যবসায়ের মধ্যেই সীমিত থাকেনি। অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র নিজ নির্বাচন কেন্দ্রেই আবদ্ধ ছিল।

1937 সালে মুসলীম লীগের প্রার্থী হিসাবে উত্তর প্রদেশ বিধান সভাতে নির্বাচিত হয়ে তিনি ক্ষমতা ও খ্যাতি অর্জন করেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ বছরটি ছিল ভারতীয় ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ ঃ উত্তর প্রদেশে নবগঠিত মন্ত্রীসভায় দপ্তর বণ্টনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। মুহম্মদ ইব্রাহিম লীগ ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় উভয় দলের মধ্যে কোন প্রকার মীমংসার আশা সুদূরপরাহত হয়ে ওঠে। সেই সময় থেকেই কংগ্রেস পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা দখলের বিষয়ে অটল হয়ে থাকে এবং মুসলীম লীগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রধান রক্ষাকবচ সাংবিধানিক ক্ষমতা অর্জনের আশা হারায়। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস তৎক্ষণাৎ মুহম্মদ ইব্রাহিমকে নবগঠিত প্রাদেশিক সরকারের একজন মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে নেয় এবং প্রায় তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কোন না কোন দপ্তরের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ত্রিশ দশকের শেষ দিকে মুসলমান সম্প্রদায় কোন কংগ্রেসীর আনুগত্য স্বীকার করে না এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ বিধান সভায় পরীক্ষামূলক নির্বাচনে শুধু মাত্র মুহম্মদ ইব্রাহিমের ব্যক্তিগত সাফল্যের জোরে জয়ী হন। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিশেষতঃ কংগ্রেসের অনুগামী সেইসব মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন যাঁরা নিজেদের জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলে পরিচয় দিতেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে এরা ব্রিটিশ-বিরোধী, খিলাফতের পক্ষপাতী, নিখিল ঐসলামিক আবেদনে সাড়া দিয়ে কংগ্রেসের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। এঁরা সাংবিধানিক ক্ষমতা অর্জনের চুলচেরা ভাগাভাগি সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন না। অথচ বৃহত্তর মুসলীম সমাজের কাছে ক্ষমতা ও নিরাপত্তার প্রশ্নই সেদিন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই বাস্তব পরিস্থিতিটি মেনে না নেওয়ার ফলেই সমস্যা ঘনীভূত হয়েছিল ও এই অবহেলাই অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তান দাবীর মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কংগ্রেসের সঙ্গে ইব্রাহিম হাফিজ সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং স্বাধীনতোত্তর যুগেও তিনি বহু বছর উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন। 1958 সালে আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুর পর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীসভার সেই পদটি লাভ করেন। 1963 সালে লোকসভা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হলে তাঁকে পাঞ্জাবের গভর্ণরের পদে অভিষিক্ত করা হয়।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি ঠিক সেই ধরনের নেতা ছিলেন না যাঁদের ভাবাদর্শ এবং কার্যাবলী বৃহত্তর মানবজীবনে স্থায়ী অথবা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হিসাবে শাসনক্ষেত্রে তিনি এমন কোন কাজ বা নীতি নির্ধারণ করতে পারেন নি যা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল উদাহরণযোগ্য অনাড়ম্বরতা ও কৃচ্ছ্রসাধন। তিনি ক্ষমতা ও উচ্চপদের অভীপ্সা কখনও মনে পোষণ করেন নি। একজন দরিদ্র মানুষের মতো জীবনযাপনের পর তিনি সাধারণ অবস্থায় সাধারণ মানুষের মতোই মৃত্যুবরণ করে নিয়েছিলেন।

[Personal interviews of the Research Fellow with son of Hafiz Mohammad Ibrahim.]

মনতোষ সিং নবী হাদি

ইব্রাহিম রহিমতুলা (স্যার) (১৮৬২-১৯৪২)

Ibrahim Rahimtoola (Sir) (1862-1942)

1862 সালে বোম্বাই-এর এক খোজা মুসলমান

পরিবারে ইব্রাহিম রহিমতুলা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রহিমতুল্লা কাদেরভাই ব্যবসায়কে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ইব্রাহিম রহিমতুলার কনিষ্ঠ তথা চতুর্থ পুত্র হাবিব রহিমতুলা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি নানা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্যার ইব্রাহিম বোম্বাই-এর Elphinstone High School-এ—পড়তেন কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করেন। তাঁর দু'বার বিবাহ হয়। 1903 সালে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

তিনি স্যার ফিরোজ শাহ্ মেহতা, স্যার চিমনলাল শেতলবাদ, স্যার সি. পি. রামস্বামী এবং স্যার কয়াসজী জাহাঙ্গীরের ন্যায় প্রতিভাবান ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন। ক্রিকেট এবং টেনিস খেলায় স্যার ইব্রাহিমের পারদর্শিতার উল্লেখ করেছেন পোরবন্দরের মহারাজা। পবিত্র কোরাণ তিনি গভীর-ভাবে অনুশীলন করেছিলেন বিশেষতঃ আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে। 1908 ও 1930 সালে তিনি ইউরোপে যান। ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড আরউইনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। ইংরাজি বই-এর একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল তাঁর। তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার ছিল বিশাল এবং তিনি প্রায়ই Dickens ও Gibbon—থেকে উদ্ধৃতি দিতেন।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুলার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। "মুসলীম শিক্ষা সম্মেলনে" তিনি নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ-ভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং তাঁর পরিবারস্থ মহিলারা পর্দাপ্রথা না মেনে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে খোলাখুলি মেলামেশার মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর চারিত্রিক উদারতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। আজীবন তিনি কোরাণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন। জন্মসূত্রে যদিও তিনি ইসমাইলি খোজা ছিলেন তথাপি আগা খানের ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করাকে তিনি সমর্থনযোগ্য বলে মনে করতেন না। পার্সী, হিন্দু এবং খৃষ্টানদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মাধ্যমেই তাঁর ধর্মীয় উদারতা প্রতিভাত হত।

পশ্চিমী শিক্ষার একজন গুণমুগ্ধ অনুরাগী হিসাবে স্যার ইব্রাহিম তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে পশ্চিমী সংস্কৃতির সুফল বিষয়ে অবহিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি হিন্দুদের সংস্কৃত ও মুসলমানদের আরবী পঠনের ওপর জোর দিতেন যাতে তারা নিজেদের সংস্কৃতি উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের অন্যতম অগ্রণী হিসাবে রহিমতুলা 1901 সালে Bombay Legislature'এ "Bombay City Primary Education Act" পাশ করানোর বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি স্বায়ত্তশাসনে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য সাংবিধানিক পন্থা গ্রহণের সমর্থক ছিলেন। ব্যাপক সফরের ফলে আন্ত-র্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল। দেশের ভাষাভিত্তিক বিভাজনের কুফল সম্পর্কেও তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। সেইজন্য শুধুমাত্র শাসনকার্যের সুবিধার কথা চিন্তা করেই ভারতের অঞ্চল বিভাজনের নীতির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। স্যার ইব্রাহিমের মতে ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি ভারত-বাসীর অবিশ্বাসই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভের কারণ। 1940 সালে রহিমতুলা তাঁর প্রণীত "A Constitution for Self-Governing India" গ্রন্থে নিরক্ষরতাজনিত কারণে ভারত "পার্লা-মেন্টারি সরকার" গঠনের যোগ্যতা অর্জন করে নি বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে তিনি শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক "ইউনিটারি সরকার" গঠনের সপক্ষে ছিলেন। তিনি চাইতেন ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্যতম সমানাধিকারসম্পন্ন সদস্য হবে।

দেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে স্যার ইব্রাহিমের বক্তব্য ছিল—"বৃটেন নিজ দেশের উৎপাদক শ্রেণীর স্বার্থে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে।" ভারতীয় বক্তব্যকে উপেক্ষা করে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে যে নীতি ব্রিটিশ সরকার অনুসরণ করে চলতেন রহিমতুলা তাঁর লেখায় এবং ভাষণে তার তীব্র নিন্দা করতেন। ভারতীয়দের করভারে জর্জরিত করে যে ভাবে বৃটেনের অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতি অনুসৃত হত তিনি তা ঘৃণ্য বলে মনে করতেন। ভারত সরকার দ্বারা নিযুক্ত "Indian Fiscal Commission" এর প্রথম সভাপতি হবার পর তিনি ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 'Tariff Board' নিয়োগের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং কমিশনে ইউরোপীয়দের সংখ্যাধিক্য ও তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত সরকার তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন।

স্যার ইব্রাহিম রহিমতুলা মাঝে মাঝে বোম্বাই-এর 'Times of India' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন।

তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধের মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য—একটি 1917 সালে ভারতের 'Secretary of State'-কে উদ্দেশ্য করে 'A Scheme for the Defence of India' এবং অপরটি 'A Constitution for Self-Governing India' (1940)।

ইব্রাহিম রহিমতুলা প্রথমে মুসলীম লীগের সদস্য ছিলেন কিন্তু পরে তিনি 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে' সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 1912 সালে মুসলীম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। 1914 থেকে 1916 সাল পর্যন্ত কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। 1920 সালে রহিমতুলা 'গোলটেবিল সম্মেলনের' অন্যতম প্রতিনিধি-সদস্য ছিলেন। গান্ধী আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরকালে তিনি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

স্যার ইব্রাহিম বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছিলেন—1899 সালে তিনি Bombay Municipal Corporation ও 1931-33 সাল পর্যন্ত Imperial Legislative Assembly'র সভাপতি ও 1899 সালে Bombay Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন। 1918 সালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন তার থেকেই শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর উৎসাহ প্রমাণিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তিনি নানা উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

1892 সালে বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি যে জনহিতকর কাজ শুরু করেন 1942 সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তা অব্যাহত ছিল। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই City Improvement Trust'এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব Bombay Municipal Corporation'এর হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক প্রধান প্রবক্তা ছিলেন এবং স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম 'Hindu-Muslim Unity Conference-এ প্রতিনিধিত্ব করেন। স্যার ইব্রাহিম একাধারে অসাধারণ ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। তিনি সেইসব বিরল সংখ্যক মানুষদের অন্যতম ছিলেন যাঁদের পরামর্শ ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস নেতা—উভয়পক্ষের কাছেই সমভাবে গ্রহণীয় ছিল। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সেই 1912 সালেই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ব্রিটিশদের বলেছিলেন যে ব্রিটিশরা একদিন এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভও অবশ্যম্ভাবী। ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এ তাঁর অনন্যসাধারণ ভূমিকা গ্রহণের ফলেই এদেশের শিল্প-বাণিজ্য অগ্রগতি লাভ করে। ভারতে ব্রিটিশরা যে অন্যান্য অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে তিনি তাঁর তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সরকারী বিভিন্ন বিভাগে ভারতীয়করণের নীতি প্রয়োগের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন।

[Speech of Sir Ibrahim at the Indian Industrial and Commercial Congress, Madras, 1927 ; Sir Ibrahim Rahimtoola—A Scheme for the Defence of India : A Note addressed to the Secretary of State for India by Sir Ibrahim (The Times of India, Bombay, dated 25 Nov. 1917) ;—A Constitution for Self-Governing India, 1940 ;—Sir Ibrahim's Presidential Address at the 37th All India Muslim Education Conference held at Bombay on 27-29 December 1924, The Times of India (Bombay), 4 June and 6 August 1942 ; The Mumbai Samachar (Gujarati daily), 4 June, 1942 ; The Ismaili, 7 June 1942 ; The Indian Social Reformer, 6 June 1942 ; The Bombay Chronicle, 2 June 1942.]

কুমুদ প্রসন্ন এ. চেরিয়ান

ইমাম সৈয়দ হাসান (১৮৭১-১৯৩৩)

Imam Syed Hasan (1871-1933)

ইমদাদ ইমামের পুত্র, স্যার আলি ইমামের ছোট ভাই হাসান ইমাম 1871 সালের 31 আগষ্ট পাটনা জেলার নেওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে শিয়া সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের সন্তান। স্কুলে পড়াশুনার সময় অসুস্থতার কারণে তাঁর পড়াশুনা প্রায়ই বিঘ্নিত হত। 1889 সালের জুলাই মাসে তিনি ইংলণ্ডে যান এবং মিডল টেম্পল-এ যোগদান করেন। আইন বিষয়ক পড়াশুনা ছাড়াও তাঁর আগ্রহ

দেখা গেল অন্য ধরনের কাজকর্মেও। 1891 সালে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে দাদাভাই নৌরজীর জন্য তিনি বিশেষ প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে বসবাসকারী ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ইমামের সমসাময়িক মজহারুল হক কর্তৃক গঠিত আঞ্জুমান ই-ইসলামিয়ার তিনি ছিলেন সেক্রেটারী। এছাড়া বাগ্মিতা অভ্যাস করে তিনি সুবক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। 1892 সালে বার-এর শিক্ষা সমাপ্তির পর সেই বছরই তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এই সময় হাসান তাঁর এক আত্মীয়া মুনিবা খাতুনকে বিবাহ করেন। তাঁদের এক পুত্র এবং দুই কন্যা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর 1920 সালে তিনি একজন ফরাসী ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করেন। এই ভদ্রমহিলা অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের অংশীদার হয়েছিলেন।

হাসান ইমাম 1912 সাল থেকে 1916 সাল পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। 1916 সালে পাটনা হাইকোর্ট স্থাপিত হলে তাঁকে সেখানে বদলি করার একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিহার এবং উড়িষ্যার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন—কারণ 'অতি উৎসাহী শাসক কর্তৃক প্রজাবর্গের অধিকারে অবৈধভাবে হস্তার্পণে' ইমাম বাধাদানে আগ্রহী হয়েছিলেন। এর ফলে ইমাম কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং পাটনাতে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। 1921 সালে তাঁকে বিহার এবং উড়িষ্যার বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত করা হয়েছিল; 1921-22 সালে তিনি এখানকার প্রথম নির্বাচিত উপ-সভাপতি হলেন। লীগ অব নেশনস্‌-এর চতুর্থ অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য-রূপেও তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

1892 সাল থেকে 1908 সাল পর্যন্ত ইমাম সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত রেখে-ছিলেন এবং ঈর্ষা উদ্রেককারী সুখ্যাতি এবং প্রচুর অর্থ সম্পদ গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তী চার বছর রাজনৈতিক কাজে তিনি কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 1909 সালের অক্টোবর মাসে তিনি নির্বাচিত হলেন বিহার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং পরের মাসে বিহার ছাত্র সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। 1916 সালে বিচারপতির কর্মভার ত্যাগ করার পর তিনি ব্যাপক ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আরম্ভ করলেন। হোমরুল আন্দোলনে তিনি যোগদান করেছিলেন এবং 1917 সালের নভেম্বর মাসে বিহার আঞ্চলিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি শ্রীমতী বেসান্তের কারামুক্তির দাবী উত্থাপন করেন। যে সব বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা ভারত সচিব মণ্টেগুকে এদেশ পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি হলেন তাঁদের অন্যতম। ভারত সচিব তাঁকে চিহ্নিত করে-ছিলেন এদেশে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্য ক্ষমতাবান নেতা হিসাবে (Montagu, E. S.—An Indian Diary)। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনার আলোচনার জন্য 1918 সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই অধিবেশন ছিল একাধারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন সমস্যাসঙ্কুল। এই অধিবেশনে পরিকল্পনাটির গুণাগুণ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচারকালে মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল। হাসান ইমাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

হাসান ইমাম ছিলেন গোঁড়া সাংবিধানিক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে 'আমাদের কংগ্রেসের' ইতিহাস হল 'ধৈর্যশীল আইনানুগ সংগ্রামের ইতিহাস'। সেই কারণে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে 'অশিক্ষিত জনসাধারণের আবেগকে প্রজ্বলিত করা হলে' হিংসা এবং ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করা হবে। তিনি সালিশী আদালত গঠনেরও সমলোচনা করেছেন এই কারণে যে তাদের আদেশ কার্যকরী করার ক্ষমতা ছিল না।

হাসান ইমাম খিলাফত আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য কংগ্রেস দল কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের তিনি ছিলেন একজন সদস্য।

বিশ শতকের শেষ দিকে ইমামের জীবনে এক পরিবর্তনের সূচনা হয়। 1930 সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং পাটনায় নব-গঠিত স্বদেশী লীগ-এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। খদ্দর ব্যবহার এবং বিদেশী সামগ্রী বয়কট করার জন্য তিনি বিশেষ প্রচার অভিযান চালাতে শুরু করেন। এর আগে 1927 সালে বিহারে সাইমন কমিশন বয়কটকে সাফল্যমণ্ডিত করা বিষয়ে তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব ছিল অসামান্য।

হাসান ইমাম ছিলেন একজন উৎসাহী এবং কর্মঠ সমাজ সংস্কারক। বিশেষভাবে মহিলাদের এবং দলিত শ্রেণীর উন্নতিসাধন করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। 1909 সালে ছাত্র সম্মেলনে ভাষণদানকালে তিনি বলেছিলেন

—'রাজনীতির পূর্বে সামাজিক দায়-দায়িত্বের স্থান। একজন গোখলে অথবা একজন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দ্বারা সমগ্র জাতি গঠন করা সম্ভব নয়…।' 'আমাদের জনগণের অধিকাংশ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত… শোষিত শ্রেণী রয়েছে চিরস্থায়ী দাসত্বের মধ্যে, স্ত্রী-জাতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অযৌক্তিক বিধিনিষেধের বাঁধনে বন্দী, এরকম অবস্থায় আমাদের অগ্রগতির চাকা সম্মুখের দিকে যাবে না, বরং পশ্চাদ্গামী হবার আশংকাই বেশী।' তিনি বার বার শিক্ষার প্রসারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন, বিশেষভাবে বালিকা শিক্ষা; টিকারি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য থাকাকালে তিনি বালিকাদের শিক্ষার জন্য নানারকম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার বিরুদ্ধে সমাজে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান ছিল সেসবের তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন এবং শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে তাঁর নিজের সন্তানদের এমনকি, কন্যা-দেরও প্রেরণ করে এক ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আলিগড় কলেজের ট্রাস্টি রূপে তিনি আলিগড় এবং বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্য বিহারে গঠিত কমিটির নেতৃত্ব দান করেছিলেন। তিনি পাটনার বি. এন. কলেজে বছরে এক হাজার টাকা ব্যক্তিগত ভাবে দান করতেন।

কোম্পানীর শাসন এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন উভয় সময়ই দেশে যে অর্থনৈতিক শোষণ চলেছিল হাসান ইমাম সেসব জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে এই দু'টি আমলের মধ্যে 'একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে (সাম্রাজ্যবাদী শাসনে) অত্যাচার ছিল সুসংগঠিত, লুঠতরাজ হত বৈজ্ঞানিক উপায়ে'। বিহারের রোটাস অঞ্চলে শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি বহু কর্মসূচীর প্রবর্তক ছিলেন।

বিহারের সর্বাধিক প্রচারিত ইংরাজি দৈনিক 'বিহারী'র ট্রাস্টি বোর্ডের তিনি ছিলেন সভাপতি। এছাড়া তিনি ছিলেন 'সার্চ লাইট' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-দের অন্যতম। হাসান ইমাম ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে সরকারী এবং ব্যক্তিগত কাজে অনেক-বার ভ্রমণ করেছিলেন। সুদর্শন এই পুরুষটি জীবনযাত্রায় এবং পোশাক পরিচ্ছদে ছিলেন পাশ্চমী। কিন্তু জীবনের শেষদিকে তিনি সাধারণ এবং অনাড়ম্বর ভাবে দিন কাটিয়েছেন খাদি পরিধান করে। 1933 সালের 19 এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন। শাহাবাদ জেলার জাপালায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

[G. A. Natesan (Ed.)—Eminent Musalman; Sachchidananda Sinha—Some Eminent Bihar Contemporarise; K. K. Datta—History of the Freedom Movement in Bihar, Vols. I-III; Non Co-operation and Khilafat Movements in Bihar and Orissa; Reports of the Indian National Congress, 1905 and 1910; The Searchlight Files, 1918-30; The Beharee Files, 1909.]

(রামেশ্বর প্রসাদ) কেয়ামউদ্দিন আহমদ

ইয়াকুব হাসান (১৮৭৫-১৯৪০)
Yakub Hasan (1875-1940)

1875 সালে নাগপুরে ইয়াকুব হাসানের জন্ম হয়। সম্মানভাজন মওলানা পরিবারের সন্তান ইয়াকুব আলিগড়ের Muhammadan College-এ শিক্ষালাভ করেন। 1919 সালে তিনি তুরস্কের 'কনসাল জেনারেল' আহমেদ আতাউললাহ্র কন্যা খাদিজাকে বিবাহ করেন। খাদিজা কনস্টান্টিনোপল এবং লণ্ডনে পড়াশুনা করেছিলেন। স্বামীর মতাদর্শানুসারে তিনিও ভারতীয় রাজনীতি, সামাজিক ও শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তিনি 'অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্সে' সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং 'ন্যাশনাল হেল্থ এ্যাসোসিয়েশন', 'রেড ক্রস সোসাইটি', 'চিলড্রেনস এইড সোসাইটি', 'মুসলীম লেডিস এ্যাসোসিয়েশন' ও 'ইণ্ডিয়ান উই-মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন'-এর কমিটিভুক্ত সদস্য ছিলেন। মুসলীম মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মাদ্রাজের 'Honorary Presidency Magistrate' নিযুক্ত হন। City Juvenile Court-এর কাজকর্ম সম্পর্কেও তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। 1937 সালে নির্দল প্রার্থী হিসাবে তিনি Madras Legislative Assembly-তে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আলিগড়ের Muhammadan College-এ শিক্ষা-বসানের পর 1893 সালে ব্যাঙ্গালোরের ব্যবসায়ীরূপে তিনি জীবন শুরু করেন। 1901 সাল থেকে তিনি তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে মাদ্রাজে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। প্রথমে 1912 সালে এবং পরে 1919 সালে পুনরায়

মুসলীম লীগ এবং খিলাফত সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ইউরোপ যান। মুসলিম লীগ গঠনের ক্ষেত্রে যাঁরা বিশিষ্ট ও দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। রাজনীতি ও রাজনৈতিক সমস্যার তিনি একজন উৎসাহী পর্যবেক্ষক ছিলেন এবং তুলনামূলক রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা। তিনি মাদ্রাজ পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ; পরে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Fellow-ও হন। 1916 থেকে 1920 পর্যন্ত তিনি Madras Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন। তিনি মাদ্রাজের 'Harbour Trust-এ South India Chamber of Commerce-এর প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সেভ্রের সন্ধিপত্র অনুসারে যখন তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন করা হয় তখন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সমস্ত পদে ইস্তফা দেন। 1919 সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'All India Khilafat Conference-এ তিনি যোগদান করেছিলেন ; মুসলীম লীগ ও খিলাফত কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ইংলণ্ড সফর করেন।

মুসলীম লীগ গঠনের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও 1915 সাল থেকে ইয়াকুব হাসান Indian National Congress এরও সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের দাবীর বিরোধিতা করে 1928 সালে তিনি সাময়িকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 1930 সালে তিনি Madras Legislative Council-এ সদস্য নির্বাচিত হন এবং Madras Council-এ মুসলীম পার্টির নেতা হন। তিনি United Nationalist Partyরও বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। যাই হোক 1937 সালের নির্বাচনে তিনি চিতুর জেলার মুসলমান প্রধান কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য লাভ করেন। 1937 সালে মাদ্রাজে যখন কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তখন কংগ্রেস নেতা সি. রাজাগোপালাচারী ইয়াকুব হাসানকে জনকল্যাণ, কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রীসভাভুক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজাগোপালাচারীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে তিনি অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে 1939 সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলে ইয়াকুব হাসানের রাজনৈতিক জীবনেরও ইতি ঘটে। 1940 সালের 23 মার্চ তাঁর জীবনাবসান হয়।

ইয়াকুব হাসান একজন স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন এবং জেলে বন্দীদশা কাটানোর সময় তিনি শ্রেণীবদ্ধভাবে কোরাণের টীকা রচনা করেন। এই টীকা ছাপানোর জন্য হায়দ্রাবাদের নিজাম ষাট হাজার টাকা অনুদান দেন। আরবি এবং ফার্সী ভাষায় তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও দলীয় রাজনীতি বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ তাঁর মৃত্যুর পর 1940 সালের 24 মার্চ 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে তিনি এক নিষ্ঠাবান ও পরমতসহিষ্ণু মুসলমান ছিলেন। 1910 সালের অক্টোবর মাসে তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি মুসলীম লীগের সেক্রেটারী হন। মুসলীম লীগের সদস্য হিসাবে তিনি পৃথক মুসলীম প্রতিনিধিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'স্বায়ত্তশাসনে মুসলমানরা শুধুমাত্র ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্যই অধিকার দাবী করছে না। তারা ভারতীয় জাতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ—এই ভিত্তিতে মাতৃভূমির সেবার উদ্দেশ্যে অন্যান্যদের মতো সমান সুযোগ দাবী করছে।' 1916 সালে কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের মধ্যে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

খিলাফত আন্দোলনের সূত্রে ইংলণ্ডে প্রবাসকালে তিনি লণ্ডনে একটি 'Muslim Information Bureau' প্রতিষ্ঠা এবং 'Muslim OutlooK' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। লণ্ডনে কয়েকটি ভাষণদানকালে তিনি তুরস্কের প্রতি মিত্র শক্তির মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। মুসলীম সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহের পরিচয় বহন করে তাঁর নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টা। দক্ষিণ ভারতের 'The Muslim Educational Association', 'The Muslim Service Corps' এবং 'Modern Muslim Hostel' প্রভৃতি সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠা ইয়াকুব হাসানের উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে সরকারী কাজে নিযুক্তির জন্য নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করবে। তাঁর শিক্ষানীতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল।

ইয়াকুব হাসান একজন অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন এবং 'পাকিস্তান' তত্ত্বে তিনি আস্থা-

শীল ছিলেন না। কংগ্রেস সংগঠনের একজন অকৃত্রিম সমর্থক হিসাবে তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি মনে করতেন পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার ভারতের জাতীয়তাবাদকে প্রণোদিত করেছিল। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ ছিল ভাষাগত অথবা ধর্মীয় সংকীর্ণতামুক্ত ও স্বাধীন। তাঁর মতে জাতীয়-ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে ধর্ম, জাতি এবং ভাষাগত ঐক্য অপরিহার্য নয়। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, জাতি, ধর্ম এবং ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মানুষের সদিচ্ছার দ্বারাই তারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারে। 'ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে—যাকে দেশ না বলে উপমহাদেশ বলাই অধিক সঙ্গত—নানাবিধ বিভিন্নতা সত্ত্বেও সেখানকার জনসাধারণ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতিগঠনে সমর্থ হয়েছে।' তাঁর বেশ কয়েকটি ভাষণে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ বিস্মৃত হয়ে পরস্পর একত্র হয়ে এক শক্তিশালী জাতিগঠনের আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'প্রকৃত জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রশাসনক্ষমতা এবং দেশাত্মবোধ বিচ্ছিন্নতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং সহৃদয়তা, যথার্থ উপলব্ধি এবং সহনশীলতার দ্বারাই এদের প্রস্তরোপম দৃঢ়ভিত্তিক করে গড়ে তোলা উচিত।' তিনি বিশ্বাস করতেন হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে খোলাখুলি মত বিনিময়ের মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো সম্ভব। এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি দু'বছরের জন্য 'Kowmi Halchal' ও 'Muslim Patriot' নামক যথাক্রমে একটি উর্দু ও একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। এছাড়া 'মুসলমান' পত্রিকায় তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

ইয়াকুব হাসান ব্রিটিশ সংবিধান অনুমোদিত সংসদীয় গণতন্ত্র এবং তাদের সংযম ও ন্যায়বোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর মতে পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে ভারতের স্বায়ত্তশাসনাধিকার অর্জন করাই সঙ্গত। গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললে ভারতের পক্ষে বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির অনুরূপ ভূমিকা পালন করা যেত। স্বরাজলাভের জন্য সাংবিধানিক পন্থা অনুসরণ করাই তিনি ন্যায়সঙ্গত বলে ভাবতেন।

মধ্যপন্থাবাদী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় আন্দোলন অবদমনের জন্য ব্রিটিশ শাসননীতির তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার এবং দেশবাসীর সেবার জন্য আত্মত্যাগে তিনি কুণ্ঠিত হন নি; এর ফলে তাঁকে নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। 1921 সালে মালাবারের অধিবাসী বিদ্রোহী মোপলাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি কালিকট যাত্রা করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ তাঁকে মোপলা বিদ্রোহের সমর্থক ভেবে ছ'মাসের জন্য কারারুদ্ধ করেন। 1921 সালে তাঞ্জোরে অনুষ্ঠিত 'Provincial Conference' এর সভাপতি হিসাবে ভাষণকালে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঞ্জোরের ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে পুনরায় দু'বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

[Who is Who in Madras, 1934, 1938 and 1940; Directory of the Madras Legislature, 1938; Proceedings of the Madras Legislative Council, 1916-20, of the Legislative Assembly, 1937; Y. Hasan-Hindu-Muslim Problem, Madras, 1919; Party Politics, Madras, 1930; The Hindu Files; The Tribunal Files; The Mail Files; Muslim League Papers.]

ইমানুয়েল ভিভিয়েন — এ. কৃষ্ণস্বামী

ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগর (১৮৯৭-১৯৬০)

Ismail Ibrahim Chundrigar (1897-1960)

ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগর উচ্চ-মধ্যবিত্ত মুসলীম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা হয়েছিল আমেদাবাদে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। এখান থেকে তিনি আইনের ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। ডিগ্রী লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমেদাবাদে আইনব্যবসা শুরু করেন।

তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন এম. এ জিন্না। সাতাশ বছর বয়সে আমেদাবাদ মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে নির্বাচিত হয়ে তিনি জনসবামূলক কাজকর্ম শুরু করেন। কর্পোরেশনের কাজে তিনি তিন বছর লিপ্ত ছিলেন অর্থাৎ 1927 সাল পর্যন্ত। সম্ভবতঃ এই সময় তিনি বোম্বাই চলে এসেছিলেন। 1937 সালে

তিনি বোম্বাই বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই জিন্নার আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। পরের বছরই তিনি বোম্বাই বিধানসভায় মুসলীম লীগের সহকারী নেতা নির্বাচিত হলেন। 1940 সালে তিনি নির্বাচিত হলেন বোম্বাই প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সভাপতি। এই পদে তিনি সাত বছর আসীন ছিলেন। বোম্বাই-এ পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। 1942 সালে তাঁকে বোম্বাই বন্দরের হজ কমিটির চেয়ারম্যান করা হল। সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের কার্যকরী সমিতিরও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। 1946 সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রীরূপে যোগদান করেছিলেন।

পরের বছর জেনেভায় অনুষ্ঠিত ইউ. এন. ও-র বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থার প্রস্তুতিমূলক সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের তিনি নেতৃত্ব দান করেছিলেন।

1947 সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান গঠিত হলে চুন্দ্রিগর পাকিস্তান সরকারের প্রথম শিল্প-বাণিজ্য এবং কর্ম সংস্থার মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। 1948-49 সালে তাঁকে আফগানিস্তানে প্রেরণ করা হল পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতরূপে। সেই সময় এই দুই দেশের মধ্যবর্তী ডুরাণ্ড সীমান্তরেখা নিয়ে অসন্তোষ চলছিল। আফগানিস্তান ডুরাণ্ড লাইনের সংশোধন দাবী করে আসছিল। তাঁকে এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক সহজ করে তোলার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। 1950-51 সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হলেন, 1951-53 সালে পাঞ্জাবের; 1955 সালে মহম্মদ আলি সরকারের তিনি হলেন আইনমন্ত্রী। এই সময় তিনি পাকিস্তানের সংবিধানকে তার সর্বশেষ পর্যায়ে সঠিকভাবে চালনা করতে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং এজন্যই ব্রিটিশ কমনওয়েলথে পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্ররূপে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। 1956 সালে সুরাবর্দী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করলে চুন্দ্রিগর হলেন বিরোধী পক্ষের নেতা। 1957 সালে তিনি হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ এবং পুনর্বাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি। 1957 সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি নির্বাচনের প্রাক্কালে পদত্যাগ করেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি পরিভ্রমণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইসলামিক জাতিসমূহের মধ্যে পাকিস্তান সম্পর্কে ভালো ধারণা গড়ে তোলা।

জিন্নার অনুগামীরূপে তিনি নিশ্চয়ই সাংবিধানিক উপায়ে স্বাধীনতা লাভে বিশ্বাসী ছিলেন। জিন্নার কাছ থেকে তিনি গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন এবং যে কোনও সমস্যাকে আইনের চোখে দেখার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রভাবশালী বক্তা এবং ইংরাজি ও উর্দুতে সমান দক্ষভাবে ভাষণ দিতে পারতেন।

[Far East Trade, Dec, 1957 issue; Forum, 12 March 1950; Times of India Files, 1942-60; Bhavan's Journal, 17 November 1957; Times (London) Supplement, 14 August 1963; Dawn (Karachi), 14 August, 1967.]

কুমুদ প্রসন্ন ভি. জি. হাটলকার

ইসমাইল খান, মুহম্মদ (নবাব) (১৮৮৪-১৯৫৮)

Ismail Khan Muhammad (Nawab)
(1884-1958)

1884 সালে আগস্ট মাসে আগ্রায় নবাব মুহম্মদ ইসমাইল খান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবাব মুস্তাফা খানের দৌহিত্র ছিলেন। মুস্তাফা খান বাহাদুর শাহের আমলে দিল্লীর সাহিত্য ক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক জগতের জ্যোতির্বিচ্ছুরণকারী মাণিক্য-বিশেষ ছিলেন। 'সঈফতা' ছদ্মনামে সুপরিচিত তিনি উর্দু ও ফার্সী কবি ও সমালোচক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি এবং মির্জা গালিবের ভক্ত ও গুণমুগ্ধ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সম্মান অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। 1857 সালে নবাব সঈফতা ইংরেজ-বিরোধী প্রতিরোধ বাহিনীর প্রথম সারির অন্যতম নেতা ছিলেন। ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠার পর সঈফতা অল্পের জন্য ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা পান কিন্তু দক্ষিণ দিল্লীতে তাঁর পৈতৃক রাজ্য পালওয়াল বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং 'নবাব' উপাধির বিলোপ করা হয়। তথাপি তিনি জেল থেকে মুক্ত হবার পর দেশবাসীর কাছে তাঁর সম্মান দ্বিগুণ হয়ে ওঠে এবং সঈফতার যেটুকু সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল তার বিনিময়ে তিনি পৈতৃক রাজ্যের মাত্র বারোটি গ্রাম পুনর্দখল করেন। তাঁর উত্তরপুরুষরা সঈফতা অর্জিত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন নি। ব্রিটিশরা পরে মুসলমান

অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করলে মুহম্মদ ইসমাইল খানের পিতা নবাব ঈশাক খানকে 'Indian Civil Sirvice'-এর জন্য নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি এই আমলাতান্ত্রিক জীবন ত্যাগ করে আলিগড়ের এম. এ. ও. মহাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর কার্যভার গ্রহণ করেন।

উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যখন পশ্চিমী শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এক বিতর্কিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখন ইসমাইলের পিতামাতা পশ্চিমী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিই তাঁদের সাগ্রহ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তাঁরা তাঁদের বারো বছরের পুত্রকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেন। তিনি সেখানে দশ বছর থেকে কেম্ব্রিজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্যারিস্টারি পড়েন। ব্রিটিশ রাজের অধীনে 'সিভিল সারভেণ্ট'দের প্রাপ্য সংবিধানুযায়ী তিনি কোন উচ্চ-পদে অধিষ্ঠিত হবেন অথবা ব্যারিস্টারি করে প্রভূত ধনোপার্জন করবেন এই ছিল পরিবারের প্রত্যাশা। পিতামাতার এই উচ্চাশা তাঁদের সুযোগ্য পুত্র সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দেন কারণ কেম্ব্রিজ থেকে সম্পূর্ণ প্রাচ্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এক যুবাপুরুষ প্রত্যাবর্তন করেন এবং জীবনে কখনও তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারে এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি।

ঘটনা পরম্পরাগতভাবে, যে সময়ে (1906) তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সে সময়টি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ ছিল—সে সময় শীঘ্রই উপকূলবর্তী বাঙ্গলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ থেকে অধিক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-ভারত ক্রমশঃ রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছিল, আবার কংগ্রেস কার্যকলাপের প্রসার-লাভের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতাও কিছুটা কুক্ষিগত করার সুযোগ সন্ধানে রত হয়; সর্বোপরি ভারতীয় রাজনৈতিক জগৎ থেকে মুসলমানদের বিচ্ছেদ এবং সিমলায় Viceroy-এর নিকট যথাযথ গুরুত্ব ও পৃথক নির্বাচনের জন্য তারা যে দরবার করেছিল তা মঞ্জুর হওয়া। এই সকল ঘটনাপঞ্জী বহু ভারতীয় যুবককে প্রভাবিত করে এবং তারা রাজনীতি সম্পর্কে ক্রমশঃ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ইসমাইল খান দেখেন তাঁর প্রতিভা প্রতিবিম্বিত হওয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই আছে।

তিনি এই আশা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন যে ব্রিটিশদের প্রতি দাবী ও পেষণ নীতির মাধ্যমে কংগ্রেস নিশ্চিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য প্রাপ্য সুবিধা আদায়ে সমর্থ হবে। সৈয়দ আহমেদ খান এবং আমির আলি ও বাঙ্গলার আব্দুল লতিফের ন্যায় ব্যক্তিরা পূর্বেই তাঁদের অবস্থা কি প্রকার তা প্রকাশ করে দিয়ে-ছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ ধরনের প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হলে তাঁরা চিরতরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-দের গোলামে পরিণত হবেন ভেবে ভয় পেয়েছিলেন। তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন নির্দিষ্ট সংসদীয় পন্থা গ্রহণ ব্যতীত আর কোন কিছুতেই তাঁরা পরিতুষ্ট হচ্ছিলেন না। এই দাবীর সমর্থনে এক সময় (1916) কংগ্রেস পরিমণ্ডলে সদিচ্ছা ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। জি. কে গোখলে থেকে সি. আর. দাশ পর্যন্ত বহু নেতা মুসলমানদের এই দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন তাদের জন্য উদারভাবে কিছু করা উচিত। মুসলমান নেতৃত্বের যে দলটি একাধারে উদারপন্থী ও সমন্বয়সাধক ছিলেন ইসমাইল খান ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

খিলাফৎ আন্দোলনকালে তিনি বিশেষ বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিশাল বাসগৃহ মীরাটের 'মুস্তাফা ক্যাসল'-এ তৎকালীন প্রায় সব জাতীয় নেতা প্রায়ই পদার্পণ করতেন। খিলাফৎ বিষয়ের মাধ্যমে সাধারণ রাজনৈতিক বিষয়ে জনমতকে পরিমার্জিত করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অমূল্য। এই আন্দো-লনের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশের মুসলমানগণ পুনরায় কংগ্রেসের সঙ্গে ক্ষমতা দখলের লড়াই নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ইসমাইল খান তাঁদের মধ্যে একজন স্পষ্ট বক্তা ব্যক্তি ছিলেন এবং বিশ থেকে তিরিশের দশকের মধ্যে তিনি বহু অধি-বেশনের উদ্যোগ আয়োজন ও সভাপতিত্ব করেন। 1930 থেকে 1946 সাল পর্যন্ত তিনি মুসলীম লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন—তিনি দীর্ঘকাল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, ইউ. পি. লীগ পার্টির সভাপতি এবং 1945-46 সালে 'লীগ একশন কমিটি'র সদস্য ছিলেন। এসব সত্ত্বেও কংগ্রেসে তাঁর বহু ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

ইসমাইল খান এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না যিনি ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন। তবুও 1937 সালে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে যে অনিবার্য এবং বিপর্যয়পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে তার ব্যাখ্যা করার সময় প্রত্যেক স্মৃতিকথালেখকই উত্তরপ্রদেশের প্রচলিত মত বিরোধী হলেও সত্যবিরোধী নয় এমন দুই নেতা ইসমাইল খান এবং খালিকুজ্জামানের নাম অবধারিত-

ভাবে উল্লেখ করেছেন। খালিকুয়াজ্জামান উত্তর-পুরুষদের বিচারের জন্য 'পাথওয়ে টু পাকিস্তান' নামক বিশাল গ্রন্থে তাঁর সাক্ষ্য প্রকাশিত করেছিলেন। আর ইসমাইল খানের মতো অতি সজ্জন মানুষের পক্ষে নিজের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে যাওয়া সম্ভব ছিল না। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে জিন্নার বিরাগভাজন হয়ে তাঁকে তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারার মূল্য দিতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত 1946 সালে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য সদস্য নির্বাচনকালে মুসলীম লীগও তাঁর সঙ্গে 1937 সালে কংগ্রেসের ন্যায় একই রকম ব্যবহার করে। 1947-48 সালে 'আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ে'-র উপাচার্যের দায়িত্বই তাঁর শেষ জনকল্যাণমূলক কার্য। 1958 সালে তিনি মীরাটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

[Indian Legislative Assembly Debates, 1938, Vol. III ; Taqrir-i-Sadaarat : All Muslim Parties' Conference, Amritsar, 16 July 1925 (available at Mustafa Castle, Meerut) ; Presidential Address delivered by Nawab Mohammad Ismail Khan at the second session of the All India Muslim Conference, 15 November 1930 (available at Mustafa Castle, Meerut) ; Khutba-i-Sadarat : Muslim League, Garakhpur, 18-20 March 1939 (available at Mustafa Castle, Meerut) ; Maulana Abul Kalam Azad—India Wins Freedom ; Abul Majid Khan—The Communalism in India : Its Origin and Growth ; Struggle for Independence (1857-1947) : A Political Record of the Pakistan Movement, Pakistan Publication ; Jag Parvesh Chandra—India Steps Forward ; The Indian Review ; January 1930 ; N. N. Mitra (Ed.)—The Indian Annual Register, 1930—Vol. II, 1934—Vol. I, 1945 – Vol. I + 1947—Vol. I ; Personal interviews of the Research Fellow with Mrs. Akhter Ahmed Khan, daughter of Nawab Ismail Khan and with Aslam Saifi, an old politician in Meerut.]

এস. নবী হাদি

এল. দিওয়ানী

ইসমাইল মির্জা মহম্মদ (স্যার) (১৮৮৩-১৯৫৯)
Ismail Mirza Muhammad (Sir) (1883-1959)

মহীশূরের প্রশাসক ও রাষ্ট্রনায়ক মীর্জা মহম্মদ ইসমাইল 1883 সালের 23 অক্টোবর ব্যাঙ্গালোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পারস্যদেশের ঘোটক ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। পরে মহীশূরে বসবাসের ফলে পরিবারের প্রধান আলি আসকার সৈয়তের সঙ্গে মহীশূরের শাসক পরিবার এবং ব্রিটিশ সরকারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্রমে আলি আসকার সৈয়তের সঙ্গে মহীশূরের মহারাজা তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণাইয়া ওয়েদিয়ারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

মীর্জা ইসমাইল বাঙ্গালোরে সেন্ট প্যাট্রিক স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু করেন; পরবর্তীকালে ওয়েসলিয়েন উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। 1896 সালে যখন যুবরাজ চতুর্থ শ্রীকৃষ্ণাইয়া ওয়েদিয়ার-এর জন্য মহীশূর শহরে একটি বিশেষ বিদ্যালয় খোলা হয় তখন মীর্জাকে একই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়। 1901 সালে বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষাপ্রণালী ত্যাগ করে তিনি বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল কলেজে যোগ দিয়ে 1905 সালে স্নাতক হন। 1905 সালে তিনি মহীশূর সরকারের অধীন সহকারী পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। 1908 সালে তিনি মহারাজার সহকারী সচিব, 1918 সালে হুজুর সচিব এবং 1923 সালে মহারাজার ব্যক্তিগত পদে নিযুক্ত হন। 1926 সালের এপ্রিল মাসে মীর্জা মহীশূরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। 1941 সালের মে মাস পর্যন্ত এই দায়িত্বশীল পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন মহীশূর রাজ্যে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সব কিছুতেই উন্নতির সূচনা হয়। ব্রিটিশ সরকারকে দেয় 35 লাখ টাকা 1928 সালে সাড়ে দশ লাখ টাকায় হ্রাস করা হয়। 55,000 একর জমি সেচসেবিত করার জন্য সেচ খাল প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা প্রথমে আরভিন এবং পরে বিশ্বেশ্বরাইয়া খাল নামে পরিচিত হয়। শিল্পায়নের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা সরকারের কর্তব্য—এই নীতি তিনি মেনে চলতেন। কাগজ, সার, সিমেন্ট, ইস্পাত, বিমানপোত, ইলেকট্রিক বাল্ব, চিনি, কফি পরিশোধন প্রভৃতি 25 টি শিল্প তিনি চালু করেন বা চালু করতে সাহায্য দান করেন। তাঁর উদ্যোগে দু'টি হাইড্রো-ইলেকট্রিক পরিকল্পনা যথাক্রমে 'যোগ ফলস'

এবং 'শিমোগা ফলস' চালু হয়। ভারতে প্রথম গ্রাম বৈদ্যুতিকীকরণের কর্মসূচী তিনিই গ্রহণ করেন। আনন্দপ্রদ পরিবেশে সুস্থ নাগরিক জীবন গড়ে তোলার জন্য তিনি সরকারী উদ্যোগে পার্ক এবং বেসরকারী উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বাগান তৈরির উপযোগী এক সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরী করেন। কে. আর. সাগরের নিকট অবস্থিত বিখ্যাত বৃন্দাবন উদ্যান তাঁরই উদ্যোগে নির্মিত হয়। গ্রাম, নগর, শহর কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি এবং জলসরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের পরিচ্ছন্নতা, বাস থামার জায়গা, বিশ্রামাগার, ইত্যাদি জনজীবনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। শহরবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও গ্রামীণ মানুষের উন্নতিকল্পে তাঁর নিরলস সেবার তুলনা হয় না।

তিনি লন্ডনে আয়োজিত তিনটি গোলটেবিল বৈঠকেই যোগ দেন (1930-32) এবং সারা ভারতের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাবী জানান।

1928 সালের আগস্ট মাসে বাঙ্গালোরে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল উৎস অর্থাৎ সর্ব প্রকার গোড়ামি ধ্বংস করতে অসাধারণ দক্ষতা দেখান। গোরক্ষণ বিষয়ে তাঁর সময়ে যে কমিটি নিযুক্ত হয় তাতে সরকার এবং সাধারণের স্বার্থে পশু-উন্নয়ণের জন্য বিবিধ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে রাজ্যের শ্রেণী-ধর্ম-নির্বিশেষে রাজ্যের সমস্ত শ্রেণীরমানুষের প্রতি সমদর্শিতার নীতি অবলম্বন করেন।

দেওয়ান হিসাবে মীর্জা ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী। সকাল 6 টা থেকে 11 টা পর্যন্ত তিনি নিয়তই ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। সকাল বেলায় নিয়মিত ভাবে তিনি শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করতেন। সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থা পরিদর্শন, পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা, জনগণের আমোদপ্রমোদ ব্যবস্থা, জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে জনসংযোগ রক্ষা এবং সরকারী কর্মচারীদের কাজকর্মের উন্নতি বিষয়ে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বিভিন্ন সমস্যার যথাসম্ভব সুরাহার ব্যবস্থা তিনি তৎপরতার সঙ্গে করতেন। কোন সমস্যা দেরী না করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুরাহার জন্য তার প্রচেষ্টা ছিল নিরলস।

মীর্জা তাঁর কর্মকান্ডে মহারাজার অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিলেন। তাঁর কাছে প্রভু ও ভৃত্যের কোন তফাৎ ছিল না এবং বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তা বজায় রাখার চেষ্টা তিনি সব সময় করতেন। প্রশাসন ব্যবস্থার নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে তিনি সুঠাম ব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বত্র তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। শাসনব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্যও তিনি প্রচেষ্টা চালান। দেওয়ান থাকাকালীন তিনি সংসদে যে বিল পাঠাতেন তাঁর একশোটির মধ্যে নিরানব্বইটিই মহারাজা মঞ্জুর করতেন। সম্ভবতঃ শতকরা 1 টি মহারাজা সংসদে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাতেন এবং সুপারিশগুলি প্রায় সবই কার্যকরী করতেন। সাংবিধানিক পথে প্রজাগণের কল্যাণার্থে তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহ ছিল সঠিক পথের দিশারী এবং স্বার্থহীন ভাবে তা সকলের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেটাত।

মীর্জা ঘুষ বা দুর্নীতিকে দূর করার চেষ্টা করতেন। প্রজার সমালোচনাকে তিনি সংবেদনশীল দৃষ্টিতে দেখতেন এবং সমাজের সকল রকম প্রতারণা দূর করতে তিনি ছিলেন দৃঢ়-সংকল্প। রাষ্ট্র ও সরকারের সকল কাজকর্মের প্রতি তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতেন।

মহীশূরের দেওয়ান পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর 1942 থেকে 1946 সাল পর্যন্ত তিনি জয়পুরের প্রধানমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'Pink City of Jaipur'কে তিনি নবসাজে সজ্জিত করেন। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তাদান এবং রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অক্লান্ত পরিশ্রম সর্বজন বিদিত। তাঁর সুপারিশেই 1944 সালের 1 জানুয়ারী থেকে জয়পুরে সাংবিধানিক সংস্কার চালু হয়।

নিজামের অনুরোধে 1946 সালের আগস্ট মাসে তিনি হায়দ্রাবাদের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে মুসলীমদের এক গোষ্ঠী হায়দ্রাবাদকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের বিরোধী তখন তিনি 1947 সালের মে মাসে সেই পদ থেকে ইস্তাফা দেন। তিনি নিজাম এবং ভারত সরকারের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে বিরোধিতার সম্মুখীনও হন। তিনি ভারত বিভাগের বিরোধিতা করতেন। তিনি মুসলীম লীগে যোগদানের বহু আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন।

1937 সালে বান্দুং-এ (জাভা) আয়োজিত দূর-প্রাচ্যদেশসমূহের সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের তিনি নেতা ছিলেন। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রামীণ স্বাস্থ্য উন্নয়ন। পরে তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহকারী প্রতিনিধি হিসাবে

ইন্দোনেশিয়া যান। 1952 সালে মীর্জা মধ্য-প্রাচ্য পরিভ্রমণ করেন।

তাঁর শাসননীতির মধ্যে প্রতিফলিত হতো আদর্শ-বাদ এবং বাস্তববাদের এক অপূর্ব সমন্বয়। এই শাসননীতি ছিল সামঞ্জস্য নীতির পরিপূরক। তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে সুস্থ পরিচ্ছন্নতা বিরাজ করত। গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাবান মীর্জা ছিলেন সর্বপ্রকার সংস্কারের ধারক ও বাহক।

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাঁর রুচিসম্মত আচরণ তাঁর অন্তরের ঔজ্জ্বল্যকেই প্রস্ফুটিত করত।

1930 সালে মীর্জাকে কে. সি. আই. ই. উপাধির দ্বারা সম্মানিত করা হয়। তাঁর রচিত 'My Public Life' 1954 সালে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতোত্তর ভারতের অনেক ঘটনা তাঁর মনঃপূত হয়নি; তাই জীবনের শেষ ভাগ তিনি কবি ও কাব্যকার গুণীজনদের বাসভূমি পারস্যে অতিবাহিত করেন। 1959 সালের 5 জানুয়ারী 75 বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

পারস্য দেশের সংস্কৃতির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল মীর্জা প্রসঙ্গে তাঁর একটি প্রিয় কবিতার উদ্ধৃতি ঃ ওগো মানুষ তুমি ধরায় এসেছো কেবলই কাঁদিতে / অথবা সময় শেখাবে তোমাকে হাসিতে/ আয়ুর চাকায় জীবনের রথ যখনই / পড়িবে থামি / তুমি নেই তবু তোমার স্মৃতিতে / রয়েছে কান্না ও হাসি / রয়েছে ধরায় হাসি।

[Sir Mirza Ismail—My Public Life: Recollection and Reflection, London, 1954; Speeches by Sir Mirza Ismail (1926-50) in 5 Vols; Sir Mirza Ismail: Views and Opinions on Him, 1942; Proceedings of the Mysore Representatives Assembly, 1926-38; Proceedings of the Round Table Conference 1930-31; Joint Committee on Indian Constitutional Reforms, 1932-33; Madras University Convocation Address, 5 Aug. 1938; Files of the Hindu, The Indian Review, the Indian Social Reformer, the Bombay Chronicle, the Spectator and the London Times.]

(এস. আর. ভেংকটরমন ডি. ভি. গুণ্ডাপ্পা
বি. এস. সুব্বারায়া)

ইসমাইল মোহামেদ (১৮৯৬-১৯৭২)

Ismail Mohamed (1896-1972)

মোহামেদ ইসমাইল 1896 সালের 5 জুন মাদ্রাজের তিন্নেভেল্লি জেলার পেট্টাই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা মৌলভী রৌথার আরবী, উর্দু, তামিল এবং সংস্কৃতে মহা পণ্ডিত ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মোহামেদ ইসমাইল তাঁর পিতাকে হারান এবং তাঁকে ও তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরকে লালন পালনের দায়িত্ব তাঁর মাতাকে গ্রহণ করতে হয়। তিনি একজন স্বাধীনচেতা মহিলা ছিলেন। আর্থিক স্বচ্ছলতার দিক দিয়ে তাঁরা মধ্যবিত্ত হলেও গরীব ছিলেন না। প্রথানুযায়ী স্থানীয় মাদ্রাসায় ধর্ম শিক্ষান্তে তিনি তিন্নেভেল্লির সি. এম. এস. হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি Madras Christian College-এ যোগদান করেন। গ্রন্থকীট না হলেও পড়াশুনার প্রতি ইসমাইলের গভীর মনোযোগ ছিল এবং তিনি কিছু পারিতোষিকও লাভ করেছিলেন।

কলেজের পড়াশুনা শেষ হবার পূর্বেই ইসমাইল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। মহাত্মা গান্ধীর আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি 1920 সালে পড়াশুনা ত্যাগ করে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই ইসমাইলের সংগঠনী শক্তি প্রকাশ পায়। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আহমেদ ইব্রাহিমের সহযোগিতায় তাঁর নিজ শহর পেট্টাইতে Young Muslim Society নামে এক নতুন সংস্থা স্থাপন করেন। এটি ছিল ভাবী বক্তা এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে অংশ গ্রহণেচ্ছুদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কিছু কিছু রাজনৈতিক পুস্তিকাও এই সংস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত হত এবং মুসলমান যুব সম্প্রদায়কে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ ও তার দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হত।

ইসমাইল সাহেব কখনই মুসলীম লীগের উগ্রপন্থী সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ, সঙ্কীর্ণ মনোভাবের সমর্থক ছিলেন

না। তিনি উদারপন্থী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। সেইজন্যই তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য ও সমর্থক ছিলেন। যখন এস. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে তিন্নেভিল্লিতে মাদ্রাজ প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনীর অধিবেশন হয় তখন ইসমাইল এবং তাঁর ভাই দু'জনেই এই অধিবেশনের সাফল্যের জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং 1920-22 সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিও তাঁদের সমর্থন শর্তহীন ছিল।

কলেজের পড়াশুনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইসমাইল মাদ্রাজের মেসার্স জামাল মহিউদ্দীন অ্যান্ড কোম্পানী নামে এক বিখ্যাত চামড়া রপ্তানির বাণিজ্য-সংস্থায় কর্ম গ্রহণ করেন। ইসমাইল এই সংস্থায় একজন সহকারী কর্মী হিসাবে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধি ও নিষ্ঠা সহকারে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি এই সংস্থার প্রথমে ম্যানেজার পদে আসীন এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির একজন অংশীদার হয়েছিলেন। তাঁর একান্ত নিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতার জন্য তিনি কোম্পানির অন্যতম অংশীদার আবদুল্লা সাহেবের স্নেহ ও প্রশংসা লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর জামাতা হয়েছিলেন। এইভাবে মাদ্রাজের দু'টি বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইসমাইল দম্পতি সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করেন এবং মিঞাখাঁ নামে তাঁদের এক পুত্র হয়।

ব্যবসায়ে ইসমাইল প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করেন এবং মুক্তহস্তে গরীবদের বিতরণ করেন। তিনি বহু মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থ বেনামে দান করেছেন। তিনি মাদ্রাজের সাদার্ন ইণ্ডিয়া স্কিন অ্যান্ড হাইডস মার্চেণ্ট এ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সেক্রেটারী হন। ভারতীয় অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর উপর তাঁর অগাধ জ্ঞানের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য এফ. ই. জেমস্ ও আর. কে. সম্মুগম চেট্টি প্রমুখদের ভাজন হয়েছিলেন। মনুষ্য চরিত্র এবং সমকালীন ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ফলে অতি সহজেই তিনি প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য হতে পারতেন কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা কালে এ ধরনের কোন সদস্যপদ গ্রহণের বাসনা তাঁর হয়নি।

একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে মোহামেদ ইসমাইল মনে করতেন প্রত্যেক শিশুরই ইসলাম সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান লাভ করা উচিত। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যখন ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয় তখন 'মক্তার', 'মাদ্রাসা' প্রভৃতি ইসলামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি চালু রাখার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ফল-স্বরূপ মাদ্রাজের সরকারী মুসলীম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের নাম থেকে 'মহামেডান' শব্দটি যখন বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তখন মুসলীম এডুকেশনাল এ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইণ্ডিয়া-র সহায়তায় ইসমাইল নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। মাদ্রাজে নতুন কলেজ স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বশীর আহমেদ সৈয়দের সহযোগিতায় মোহামেদ ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বর্মা, মালয় এবং সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। এই প্রতিনিধিদল প্রায় পাঁচ লাখ টাকার অধিক অর্থ সংগ্রহ করে এবং এই অর্থের দ্বারা 1959 সালের জুলাই মাসে রায়াপেট্টায় 'নতুন কলেজের' উদ্বোধন হয়। ঐ একই বছরের একই মাসে তিরুচিরাপল্লীতে হাজী জামাল মুহম্মদ সাহেবের বদান্যতায় 'জামাল মহম্মদ কলেজ' নামক অপর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজ স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠাতাকে অনুপ্রাণিত করা ও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করার পেছনে মোহামেদ ইসমাইলের ভূমিকা কিছু কম ছিল না। মালাবারে 'ফেরোক কলেজ' স্থাপনের ক্ষেত্রেও মোহামেদ ইসমাইলের গভীর উৎসাহ ও প্রচেষ্টা ছিল। তাঞ্জোর জেলার আদিরামপট্টি নগরে 'কাদের মহিউদ্দিন কলেজ' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি সহায়তা করেন। প্রতিটি কলেজের ক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয় বিষয় হল প্রত্যেকটিই ছিল ভিত্তিগতভাবে জাতীয় এবং এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র ও শিক্ষকরা ইসলাম ধর্মী ছিলেন না।

প্রথমেই বলা যায় ইসমাইল ছিলেন একজন কট্টর কংগ্রেসী এবং জামাল মুহম্মদ ছিলেন মাদ্রাজের ব্যবসায়ী মহলের এক মহারথী, একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী— বিভিন্ন খাতে তিনি কংগ্রেস তহবিলে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেন ; তাছাড়া তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর এক বিশ্বস্ত বন্ধু। এতদসত্ত্বেও 1936 সালে যখন তিনি মাদ্রাজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তখন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পুনরাভ্যুত্থান ঘটায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী টি. টি. কৃষ্ণমাচারি নির্বাচিত হলেন। জামাল মুহম্মদ মুসলীম লীগে যোগদান করতে বাধ্য হলেন এবং মোহামেদ ইসমাইলও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

মুসলীম লীগের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও মোহামেদ

ইসমাইল সংকীর্ণমনা ধর্মান্ধ ছিলেন না বরং তিনি এক মৌলিক সত্যে বিশ্বসী ছিলেন যে ভারতীয় মুসলমানরাও ভারতীয়ই এবং তাঁরা পাকিস্তানে যেতে পারেন না। তিনি সর্বান্তঃকরণে একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং মনে করতেন বিবাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করে হিন্দু-মুসলমানের একত্রে বসবাস সম্ভব। দেশ বিভাগের পর ইসমাইল তামিলনাড়ুর মুসলীম লীগের নেতা হন। যখন কাউন্সিল অফ দি অল ইন্ডিয়া মুসলীম লীগ করাচিতে মিলিত হয় তখন ইসমাইল এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে একমাত্র ধর্ম ব্যতীত ভারতীয় ও পাকিস্তানী মুসলমানদের আর কিছুই এক নয়। লিয়াকৎ আলি খানের কাছে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেন তার দ্বারা তাঁর মজ্জাগত জাতীয়তাবাদই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—'নবাব সাহেব, আজ আমরা পরস্পরের কাছে বিদেশী। আমরা দু'টি পৃথক দেশে পৃথক জাতি হিসাবে বসবাস করি। কিন্তু যেহেতু আপনি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী তাই আপনাকে কিছু কথা বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি। কোন অবস্থাতেই ভারতীয় মুসলমানদের কোন ব্যাপারেই আপনাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আমরা আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য তথা আমাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং এদের কিভাবে রক্ষা করতে হয় সে বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ অবগত… ভারতে মুসলমানদের যাই হোক না কেন পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আপনাদের ন্যায় ও বদান্যতার আদর্শ রক্ষা করে চলা সঙ্গত।'

মোহামেদ ইসমাইল ছিলেন অনাড়ম্বর এবং মিষ্টভাষী ও শান্ত স্বভাবের মানুষ। কিন্তু আদর্শগতভাবে তিনি ছিলেন কঠোর এবং অনমনীয়। তিনি যদি বা কখনও ভাঙ্গতেন কিন্তু কোথাও নত হতেন না। পেশাগতভাবে তিনি রাজনীতিক ছিলেন না; ছিলেন ব্যবসায়ী—যিনি দেশের মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি 1946 সালে মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির সদস্য হয়েছিলেন এবং পরে বিরোধী পক্ষের নেতা। বিরোধী পক্ষের নেতা হিসাবে তিনি নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সবাই শুনত।

প্রতিটি বিষয়েই ইসমাইলের মতামত অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। ইংরাজি ও তামিল উভয় ভাষাতেই তাঁর বক্তৃতা ও লেখা ভাব ও ভাষার সারল্য ও স্পষ্টতার জন্য লক্ষণীয় হয়ে উঠত। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও উচ্চমার্গের ভাবধারার পক্ষপাতী ছিলেন। শেরওয়ানী, পায়জামা ও ফেজ টুপিতে সজ্জিত তাঁর চেহারা ছিল রাজকীয়। বয়স সত্ত্বেও তাঁর বক্তৃতা ও বাচনভঙ্গী ছিল মনোহর এবং নির্দেশব্যঞ্জক। তাঁর কথাবার্তা ছিল কৌতুকপূর্ণ ও সরস। তিনি যখন একবার কোন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন তখন তিনি ভাষণ দানের জন্য এক বিশিষ্ট লেখকের নাম ঘোষণা করেন, তখন সেই লেখক তাকে জানান যে তিনি শুধু লিখতেই সক্ষম, বক্তৃতা দিতে নন। ইসমাইল তখন হাসির রোলের মধ্যে মাইকে ঘোষণা করেন—'আমাদের বিশিষ্ট লেখক বলছেন তিনি শুধু লিখতেই সক্ষম—বলতে নন। তবে আপনাদের হতাশ হবার কিছু নেই। তিনি আমাকে বলেছেন তিনি এখন যা বলতে চান পরে তাই গ্রন্থাকারে লিখে দেবেন। আপনাদের শুধু সেই বইটি কিনে বক্তব্যগুলি নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে।' 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং কমিশন' এবং মাইকা এনকোয়ারি কমিশন-এর সদস্য হিসাবে মোহামেদ ইসমাইল নেভেলীতে লিগনাইট খননকার্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন।

[Zalal Zakariah—Meet Mr. Mohamed Ismail, Madras, 1960; Mahammad Sulaiman—Speeches of Mr. Mohamed Ismail in Tamil; N. Perumal—Talented Tamils, Madras, 1959; L. Bahadur—The Muslim Legue, Its History and Achievements; Natesan—Eminent Mussalmans, Madras, 1922; The Hindu Files.]

ইমানুয়েল ডিভিয়েন এ. কৃষ্ণস্বামী

ঈশার সিং মাঝাইল (১৯০১— ?)
Ishar Singh Majhail (1901— ?)

1901 সালের জানুয়ারী মাসে ঈশার সিং অমৃতসর জেলার সরাই আমানত খাঁতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সর্দার আশা সিং শিখ ধর্মাবলম্বী জাঠ। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের 'মাঝা' অর্থাৎ মধ্যাঞ্চলের মাঝারি অবস্থার কৃষিজীবী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ঈশার সিংকে ভাদনাতে ডিস্ট্রিকট্ বোর্ড মিডিল স্কুলে প্রেরণ করেন। ভাদনা ছিল লাহোর জেলার একটি বড় গ্রাম। সেখানকার

বিদ্যালয়ে সর্দার জোয়ান্দ সিং সান্ধু প্রধান শিক্ষক-রূপে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এরপর ঈশার সিং আম্বালা এবং লুধিয়ানার অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে 1923 সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তিনি সর্দার সুরেন সিং-এর কন্যা শ্রীমতি পূরণ কাউরকে বিবাহ করেন।

1920 সালের প্রথম দিকে ঈশার সিং পাঞ্জাবের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। গুরুকা বাগ এবং জয়তো-তে আকালি বিদ্রোহে অংশ-গ্রহণ করার জন্য তিনি দু'বছরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। 1920 সালের শেষের দিকে ঈশার সিং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও নিজেকে যুক্তকরেন। কংগ্রেস মঞ্চ থেকে ব্রিটিশ-বিরোধী ভাষণ প্রদান করার জন্য 1929 সালে তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 1931-32 সালে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য আবার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। 1947 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের তিনি প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করে এসেছেন। 1938 এবং 1939 সালে সরকারী আদেশ অমান্য করে তিনি স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন এবং 1942 সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেও অংশ-গ্রহণ করেন। এই সময় সর্বদাই তিনি ছিলেন আকালি দলের একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য। 1936 সালে তিনি ছিলেন দরবার সাহেব ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতি; 1938 সালে শিরোমণি আকালিদলের সেক্রেটারী। একই সঙ্গে সে বছর 10 ফেব্রুয়ারী আকালি সম্মেলনে সংবর্ধনা সমিতির সেক্রেটারীর দায়িত্বও পালন করেছেন।

ঈশার সিং-এর কাজকর্ম শুধুমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমান উৎসাহ সহকারে তিনি শিক্ষা এবং সাংবাদিকতার কাজ করেছেন। অমৃতসর জেলার গোয়িন্দওয়ালে মহারাজা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার তিনিই ছিলেন মুখ্য উদ্যোক্তা এবং লাহোর-এ 'Sikh National Collge-এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। তিনি লাহোর থেকে 'আকালি' পত্রিকা, অমৃতসর থেকে 'বর্তমান', পাঞ্জাবী ভাষায় পাতিয়ালা থেকে 'ইনক্লাব' এবং অমৃতসর থেকে প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা 'শের-ই-ভারত' বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেছেন।

প্রাক্ স্বাধীনতা কালের রাজনীতি ঈশার সিং-এর জাতীয়তাবাদের প্রতি অনুপ্রেরণা এবং শিখদের প্রতি সহানুভূতির ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি এসেছিল। তিনি কম্যুনিস্টদের তাদের উগ্র মত-বাদের প্রতি আনুগত্যের জন্য সমালোচনা করতেন। মুসলীম লীগকে দোষারোপ করতেন তাদের নগ্ন জাতীয়তাবাদী মনোভাবের জন্য এবং পরিশেষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দেশবিভাগের নীতির তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। দেশবিভাগের সময় শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং তাদের অধিকারকে তিনি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়ে-ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সদস্য থেকেও এবং 1948 সালে পাঞ্জাবে কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও শিরোমণি আকালি দলেরও ছিলেন সাধারণ সম্পাদক।

ঈশার সিং সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। রাজনীতিতে তাঁর অংশগ্রহণ জাঁকজমক বর্জিত হলেও সুদৃঢ় ভিত্তিক ছিল। তিনি সিং সভার সাধারণ সমস্যা এবং আকালি আন্দোলনের সমস্যাগুলি তুলে ধরেছিলেন, শ্রেণী বিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন, স্ত্রীজাতির সমানাধিকার এবং বিধবা বিবাহের প্রবক্তা ছিলেন। জাতীয় স্বাধীনতার ধারণা তাঁর মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। কং-গ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অব্যাহত ছিল। এই মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ব্রিটিশকে দোষারোপ করতেন মুসলীম লীগের বিভেদপূর্ণ রাজনীতির জন্য। পাকিস্তান দাবীর তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। বিশেষভাবে তিনি মনে করতেন শিখদের প্রতি বিপদস্বরূপ হবে এই সৃষ্টি: 'আমাদের আদর্শ হল স্বাধীন ভারতবর্ষ যেখানে শিখরাও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো থাকবে স্বাধীন।' যদি পাকিস্তানীরা নিজেদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র দাবী করে তাহলে তাদেরও একথা ভুলে গেলে চলবে না যে 'শিখরাও একটি পৃথক জাতি এবং তাদেরও ইচ্ছা হতে পারে নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের'। ঈশার সিং-এর শিখদের 'হোমল্যাণ্ডে'র ধারণার মতোই গভীরভাবে জন্ম নিয়েছিল মুসলীম লীগের প্রতি অবিশ্বাস, এই উপমহাদেশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিখ সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং উৎসাহ যেন পিছিয়ে না থাকে এই ছিল তাঁর একান্ত কামনা।

[Gauba, K. L.—The Consequences of Pakistan, Lahore, 1946 ; Harbans Singh—The Heritage of the Sikhs, Bombay, 1946 ; Harnam Singh—Punjab : The Homeland of the Sikhs, Lahore, 1945 ; India and

Pakistan Year Book, 1952-53 ; Khuswant Singh—The Sikhs, London, 1951 ; Majhail Singh—Personal Account in September, 1967 ; Mitra, N. N. (Ed)—The Indian Annual Register, 12 Vols., 1940-47 ; Proceedings of the Punjab Legislative Assembly, 1946-47 ; Personal Knowledge of the Contributor.]

টি. আর. সারিন জে. এস. গ্রেওয়াল

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)
Iswar Chandra Gupta (1812-1859)

1812 সালে বর্তমান পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়ায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। যে সকল কবি ও সাংবাদিক আধুনিক বাংলার নব প্রজন্মের কাছে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদের মধ্যে একজন। এক বনেদী বৈদ্য পরিবারে তাঁর জন্ম। সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী এই পরিবারটিকে স্থানীয় বাসিন্দারা যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত তাঁর আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য পুত্র কন্যাদের যথাযথ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পারেন নি। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন। বিমাতার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র দশ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর মাতামহের গৃহে চলে আসেন।

বিবাহ সম্পর্কে বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও 1827 সালে দুর্গামণি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দুর্গামণি দেবী সুশ্রী ছিলেন না। এমন কি বুদ্ধিও খুব স্বাভাবিক ছিল না। ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। এই অসুখী দাম্পত্য জীবনের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর রচনায় যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ দেখা যায়, সম্ভবতঃ এটা তাঁর অসুখী জীবনেরই পরোক্ষ প্রভাব। অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র দুর্গামণির প্রতিপালনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। দুর্গামণি ছিলেন নিঃসন্তান এবং সধবা অবস্থাতেই মারা যান।

ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। কিন্তু লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। তবে তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার মাত্র শুনেই তিনি সব মনে রাখতে পারতেন। এইভাবে তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করেন। ইংরাজি ভাষা শিক্ষার জন্যই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর দরিদ্র মাতামহের ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ দানের সঙ্গতি ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র নিজের জীবন নিজেই তৈরি করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরাজি ভাষা কিছু কিছু শিখেছিলেন। তবে বেদান্ত ও তন্ত্রশাস্ত্র তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। সঙ্গীত রচনা করার জন্মগত ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁদের গ্রামে যখনই কোন কবিওয়ালার দল আসত, তখনই তাঁর ডাক পড়ত তাদের পালার উপযোগী গান রচনার জন্য।

1830 সালে পাথুরিয়াঘাটার জমিদার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহযোগিতায় ঈশ্বরচন্দ্র 'নর্ববিশিষ্ট শিষ্টগণ সভা' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। এই সংস্থারই সেক্রেটারীরূপে সর্বজনসমক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। তার পিতামহ ছিলেন এই অঞ্চলের বাসিন্দা, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। এই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে যোগেন্দ্রমোহনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং যোগেন্দ্রমোহনের পৃষ্ঠপোষকতায় 1831 সালে 28 জানুয়ারী তিনি তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত করেন। তখন সাপ্তাহিক পত্রিকারূপেই 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়েছিল। মাত্র এক বছর পরেই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবাদ রত্নাবলী' নামে অন্য একটি পত্রিকায় কিছুদিনের জন্য কাজ করেন।

এরই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র উড়িষ্যা পরিভ্রমণ করেন। সেখানে তাঁর এক পিতৃব্যর কাছে থাকার সময় তিনি তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 1836 সালে কলকাতায় ফিরে ঈশ্বরচন্দ্র সপ্তাহে তিনবার করে আবার ত্রৈ-সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি তাঁর পূর্বের অনেক গোঁড়ামি ও সংস্কার ত্যাগ করেন। তৎকালীন বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত হন ; যেমন—ডিরোজিও-র ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ' (1838), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা (1838), 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা', 'বারাসত স্কুল কমিটি' (1839), 'দেশ হিতৈষিণী সভা' (1842), 'নীতিতরঙ্গিনী সভা' (1842), 'হিন্দু থিওফিলানথ্রফিক সোসাইটি'

(1845), Anto-Lex Loci Society (1850), 'হিন্দু হিতৈষিণী সভা' (1846), 'বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা' (1854), ইত্যাদি।

1839 সালে 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রথম ভারতীয় ভাষায় দৈনিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঈশ্বরচন্দ্র এই পত্রিকার সম্পাদকরূপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। 1853 সালে তিনি একটি মাসিক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেন। এই ক্রোড়পত্রে নীতি-কথামূলক প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ-প্রভাকর' ব্যতীত আরও দুইটি পত্রিকা ঈশ্বরচন্দ্র প্রকাশ করেন— 'পাষণ্ড পীড়ন' (1838) এবং 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (1847)। পত্রিকা দু'টি অল্প কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

1848 সালে ঈশ্বরচন্দ্র মীরাট, দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, কানপুর এবং বারানসী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ কালে তিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি জনগণের মনোভাব কিরূপ তা অনুধাবন করেন এবং সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত চেতনা কিরূপ সে সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেন। নিয়মিতভাবে এই সকল তথ্য তাঁর কাগজে প্রকাশিত হত। পূর্ব বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলেও তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন।

1833 সালে ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদ সেনের 'কালী-কীর্তনে'র সংকলনও সম্পাদনা করেন। পুরাতন বাংলা কাব্যগুলি শুধুমাত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, অষ্টাদশ শতকের এইসকল বিস্মৃত-প্রায় কবিদের জীবন ও কার্য সম্বন্ধে নিজেও উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। এই জাতীয় প্রবন্ধাদির মধ্যে একমাত্র ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধটিই পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয় (1855)। 1857 সালে 'প্রবোধ প্রভাকর' নামে একটি সুচিন্তিত নীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদির সংকলন প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর রচিত চারটি পুস্তক ছাপাখানায় প্রকাশের অপেক্ষায়—'হিত-প্রভাকর' (1861), 'হিতোপদেশের কাহিনী—সমগ্র', 'বোধেন্দু-বিকাশ' (১ম খণ্ড), ও 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ে'র অনুবাদ। ঈশ্বরচন্দ্রের ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাব্য-গ্রন্থগুলি আট খণ্ডে সংকলন (1862-74) করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 1885 সালে 'কবিতা-সংগ্রহ' নামে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত কবিতার একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংযোজন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন এমন এক যুগে যখন সমাজের সর্বত্র সার্বিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার সংবাদে ও প্রবন্ধে এই রূপান্তরের বার্তা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি কখনই এই পরিবর্তনের চেতনা ও বাণীকে হেয় জ্ঞান করেন নি। গভীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি যে-সব কাব্য রচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই কাব্যগুলি সৃষ্টি করেছে এক নতুন কাব্য-চেতনার প্রবাহ। আজীবন অনুকরণপ্রিয়তাকে তিনি ঘৃণা করেছেন। ফলে যখন দেশব্যাপী সাহেবীয়ানার স্রোত বয়ে চলেছে, সেই সময় তিনি মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করেছেন, ইংরাজি শিক্ষিত নব্য যুব সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করেছেন মাতৃভাষার মাধ্যমে নবযুগের বার্তা প্রচার করতে। তিনি যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করতেন সরকারী চাকুরী গ্রহণ করার জন্য। কারণ সরকারী চাকুরীর মাধ্যমেই তারা দেশবাসীর কাছে পেঁছাতে পারবে। পারস্পরিক আদান-প্রদান সহজতর হবে। নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। বিধবা বিবাহ সমর্থন করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব ছিল। হিন্দু হয়েও তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন।

ঈশ্বরচন্দ্র ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সমর্থক ছিলেন। তবে নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তীব্র নিন্দা করেন। আফিং ও লবণের একচেটিয়া সরকারী ব্যবসাকেও তিনি তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর সুগভীর দেশপ্রেম স্বজাতির দৈন্যদশায় আহত হয়েছিল। ইংরেজ অফিসার ও বণিক গোষ্ঠীর বিপুল বৈভবকে তিনি সহ্য করতে পারেন নি। নানাভাবে তিনি তাঁর পত্রিকায় এদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। কৃষি ও কৃষকের শোচনীয় দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। জমিদারদের দোষারোপ না করলেও, রায়ত-দের প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তৎকালীন বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজে এই জাতীয় মনোভাব বিশেষ-রূপে দেখা যেত। ঈশ্বরচন্দ্র যুব সম্প্রদায়কে ব্যবসা বাণিজ্য করতে উৎসাহিত করতেন।

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এক চিরস্মরণীয় নাম। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলির কোথাও কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা প্রকাশ পায়নি। তাঁর নির্মল কৌতুকপ্রিয় মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের বিকাশ ঘটেছে এই সকল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক ও সমালোচক। যুব-

সমাজকে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বে ও প্রতিভায় আকৃষ্ট করেছেন, তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন, পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেরও নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন।

[The Samvad Prabhakar, 1848-1859, Brojendranath Bandopadhyaya—Iswar Chandra Gupta (in Bengali), Sahitya-sadhak Charitmala Series, published by the Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta, Magh, 1330 B.S., (1944); Bhabotosh Datta (Ed.)—Iswar Chandra Gupta Rachita Kavijibani (in Bengali), Calcutta, 1958; Iswar Chandra Gupta Jibancharit O Kavita by Bankim Chandra Chatto-padhyaya (in Bengali), Jijansa, Calcutta, 1968; The Yugantar (a Bengali Daily), magazine section, 30 Oct 1960, article by Amalendu De : Banglar Nil Chas O Iswar Chandra Gupta; Benoy Ghosh (Ed)—Samayikpatre Banglar Samaj Chitra (1840-1905), Vol. I; Calcutta, 1962.]

ভবতোষ দত্ত

(অমলেন্দু দে)

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)
Iswar Chandra Vidyasagar (1820-1891)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 1820 সালের 26 সেপ্টেম্বর অবিভক্ত বঙ্গে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কালংকার আদি বাসস্থান হুগলি থেকে বীরসিংহ গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গরীব ব্রাহ্মণ। মাতা ভগবতী দেবী ছিলেন গোঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা। ঈশ্বরচন্দ্রের তিন ভাই ছিলেন—দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, এবং ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা ঠাকুরদাস কলকাতার একটি ব্যবসায়ী সংস্থায় মাসিক আট টাকা বেতনে সামান্য কেরানীর কাজ করতেন। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে বিদ্যাসাগরের জন্ম।

ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ী দেবীর সঙ্গে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয়। নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের একমাত্র পুত্র সন্তান।

ঈশ্বরচন্দ্রকে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পাঠশালায় অধ্যয়নকালে তিন বছরের মধ্যেই তিনি গুরুমহাশয়ের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। 1253 বঙ্গাব্দে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। কথিত আছে, বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় আসার সময় রাস্তার পাশে মাইল নির্দেশক স্তম্ভ দেখে পিতাকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করে ইংরেজী সংখ্যা শিখে ফেলেছিলেন। কলকাতায় এসে ঈশ্বরচন্দ্র বড়বাজারের একটি পাঠশালায় ভর্তি হন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল পুত্রকে সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত করা। 1829 সালে ঈশ্বর-চন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তাঁর পিতার মনোগত অভিপ্রায় ছিল পুত্র যেন পুরুষানুক্রমিক পেশা গ্রহণ করে এবং চতুষ্পাঠী খুলে সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার সাধন করে। অত্যল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর অসাধারণ মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন। 1831 সালে তিনি মাসিক পাঁচ টাকা ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। দরিদ্রতার ফলে সন্ধ্যাকালে উপযুক্ত আলোর অভাবে তিনি রাস্তার আলোকস্তম্ভের নীচে দাঁড়িয়ে বিদ্যাভ্যাস করতেন।

মাত্র বার বছর পাঁচ মাস বয়সে (1829-42) ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন সাহিত্য, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, অলংকার এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ মেধার ফলে তিনি প্রতি বৎসর ছাত্রবৃত্তি লাভ করতেন। বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ও নগদ আশি টাকা পুরস্কার পান।

ঈশ্বরচন্দ্রের উপর পিতামাতার প্রভাব অতি শৈশব-কাল থেকেই ছিল। সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় তিনি তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন এবং আজীবন তাঁদের একান্ত অনুগত ছিলেন। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, চারিত্রিক শুচিতা, স্পষ্টবাদিতা, স্বজনপ্রীতি, ন্যায় ও সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা এই সকল চারিত্রিক গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে বিদ্যাসাগর পিতামাতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

কলকাতার ছাত্রজীবনে বড়বাজারের যে বাড়িতে বিদ্যাসাগর থাকতেন সেইখানে রাইমণি দেবী নামে জনৈকা মহিলার কাছ থেকেও মাতৃবৎ স্নেহ ও দয়া

পেয়েছিলেন। তাঁর সদয় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হয়ে নারীর শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সবিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন।

ছাত্র হিসাবে যেমন, মানুষ হিসাবেও ঈশ্বরচন্দ্রের তেমন অসাধারণ খ্যাতি ছিল। সংস্কৃতে পন্ডিত হয়েও তিনি ইংরাজি চর্চা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। 1830 সালে তিনি যখন সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাত্র, সেই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি ক্লাসের ছাত্ররূপেও যোগদান করেন। 1834-35 সালে তিনি ইংরাজি ভাষায় পারদর্শিতার জন্য পুরস্কার লাভ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রথম পন্ডিতরূপে কর্মরত বিদ্যাসাগর ডাঃ দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইংরাজি বিদ্যায় পারদর্শী হবার জন্য ইংরাজী ভাষা অনুশীলন করতেন। 1841 সালে তিনি হিন্দী ভাষাও চর্চা করেন। 1839 সালে তিনি হিন্দু 'ল' কমিটির পরীক্ষায় যোগদান করেন এবং সসম্মানে কৃতকার্য হয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন।

1841 সালে শিক্ষা লাভ শেষ করে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পন্ডিতরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সচিবরূপে তিনি কলেজের উন্নতি সাধনের জন্য কিছু কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করলেও তা কাউন্সিল অফ এডুকেশন অগ্রাহ্য করেন। এতে অপমানিত বোধ করে ঈশ্বরচন্দ্র পদত্যাগ করেন। 1849 সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। 1850 সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। মাত্র এক বছরের মধ্যেই তিনি কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন।

অধ্যক্ষপদে থাকাকালীন ঈশ্বরচন্দ্র 1855 সালে হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং নদীয়া জেলার বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত হন। এই অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য তাঁকে মাসে পাঁচশত টাকা বেতন দেওয়া হত। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এই জেলাগুলির বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। কিন্তু তৎকালীন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশান ঈশ্বরচন্দ্রের এবম্বিধ কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হন। ফলে 1858 সালে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় সরকারী চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন। তবে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণরগণ সর্বদাই তাঁর অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ পান্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে সম্মানিত করেন। এক অসামান্য সমাজ সংস্কারকরূপে চিহ্নিত করে 1880 সালে মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে সি. আই. ই. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। 1864 সালে তিনি ইংলন্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির 'সম্মানীয়' সদস্য পদে মনোনীত হন।

কেবল প্রখর পান্ডিত্য ও অগাধ জ্ঞানের জন্যই নয়, পাশাপাশি সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর যুগান্তকারী সংস্কার সাধন ও সমাজের নীচু তলার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসা এবং দরিদ্র ও বঞ্চিতের প্রতি অপরিসীম দয়ালুতাই তাঁকে দেশবাসীর কাছে সবার প্রিয় মানুষ করে রেখেছিল। অসামান্য বদান্যতা ও মানবতার জন্য তাঁর কথা দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত ঘরেও শোনা যেত।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সংস্কৃত কলেজেও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। নিম্নবর্ণের ছাত্রদের অবাধ প্রবেশের জন্য তিনি রক্ষণশীল সংস্কৃত কলেজের দরজাও খুলে ধরেন।

1864 সালে তিনি বিখ্যাত মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন। গভর্ণমেন্ট ওয়ার্ডস্‌ ইনস্টিটিউশান, দি হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুইটি ফান্ড এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশান অব সায়েন্সও তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও আর্থিক অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়নি। 1853 সালে তিনি একটি অবৈতনিক শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। 1890 সালে তাঁর মাতার স্মৃতি রক্ষায় স্বগ্রামে 'বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন।

সংস্কৃত ও শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করলেও বিদ্যাসাগর ছিলেন উদার মতাবলম্বী। 1849 সালে ডিঙ্কওয়াটার বেথুন নারী শিক্ষায়তন স্থাপন করলে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর বেথুন সাহেবের বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীরূপেও কিছুদিন এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর মিঃ হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে গ্রামাঞ্চলেও নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ উৎসাহিত করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলা গদ্যের

জনকও বলা হয়। দুরূহ সংস্কৃত শব্দের শৃঙ্খল থেকে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে মুক্ত করে সহজ ও সুললিত ভাষায় রূপান্তরিত করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই কারণেই 'শিল্পী' আখ্যা দিয়েছিলেন। বর্তমান বাংলা ভাষার লালিত্য, ঐশ্বর্য, সহজবোধ্যতা ও মাধুর্য এক কথায় তাঁরই অবদান।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সাংবাদিকতার প্রতিও আকৃষ্ট হন। 'সর্বশুভঙ্করী' পত্রিকায় তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে প্রবন্ধ লেখেন। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রায়শই তাঁর প্রবন্ধাদি বিদ্যাসাগরকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিতেন। তখন বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার লেখা নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তৎকালীন (1855) বিখ্যাত পত্রিকা 'সোমপ্রকাশে'র সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকাটির দুঃসময়ে বিদ্যাসাগরই পত্রিকাটির পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর আমরণ আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। বহু-বিবাহ প্রথা দূরীভূত করা ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের জন্য তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা করেন। সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করে এই সামাজিক সংস্কারের স্বপক্ষে তিনি শাস্ত্রসম্মত যুক্তির অবতারণা করেন। তীব্র বিরোধিতার সম্মুখে তাঁর লেখনীও তীব্রতর হয়ে ওঠে। বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করার জন্য তিনি মহামান্য সরকার বাহাদুরকে লিখিতভাবে অনুরোধ করেন এবং নিজ পুত্রের সঙ্গে জনৈকা বিধবা বালিকার বিবাহ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'বাংলার ইতিহাস', 'বোধোদয়', 'সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা', 'ঋজুপাঠ', 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (4 খণ্ড), 'শকুন্তলা', 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতৎ বিষয়ক প্রস্তাব', 'বর্ণ পরিচয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', ও 'ভূগোলে খগোলে বর্ণনম্' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগর কর্তৃক সম্পাদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম 'আনন্দ-মঙ্গল', 'বেতাল পঁচিশী', 'রঘুবংশম', 'কিরাতার্জুনয়ম', 'সর্বদর্শন সংগ্রহ', 'শিশুপালবধ', 'কাদম্বরী', 'মেঘদূতম্,' 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', ও 'হর্ষ-চরিতম্'।

বিদেশে না গেলেও তিনি বহু গুণী বিদেশীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। ডাল, বেথুন, হ্যালিডে, সিটন-কার, বিডন, মার্শাল এরকম বিখ্যাত ব্যক্তি ছাড়াও অন্যান্য বিদেশীদের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। খুব সম্ভবতঃ বিদেশী সাহচর্যের প্রভাবেই তাঁর চরিত্রে গড়ে ওঠে অনমনীয় দৃঢ়তা। উদারমতা-বলম্বী বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা সর্বদাই ছিল প্রগতি-শীল। সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে এই প্রগতিশীল চিন্তাধারা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্যই তিনি অনুক্ষণ প্রচেষ্টা করে গেছেন।

কোনরকম সংকীর্ণতা তাঁর চিন্তা বা কর্মকে কখনও প্রভাবিত করেনি। বাঙ্গালী পণ্ডিতের চিরাচরিত পোষাকই তিনি পরতেন। তাঁর দানশীলতা ও মানবপ্রীতি সর্বজনবিদিত। বেশ কয়েকটি দরিদ্র পরিবার ও দুঃস্থ ছাত্রবৃন্দ তাঁরই একান্ত অনুদানে দিনাতিপাত করতো। দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম দয়া ও মমতা। কিন্তু কোনরূপ ভাবালুতা বা অবাস্তবতা তাঁর চরিত্রে ছিল না। একদিকে তিনি ছিলেন যেমন বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী, অন্যদিকে তেমনই ছিলেন কঠোর ও আপোষহীন। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে তিনি স্বাগত জানাতেন, কিন্তু এই সম্পর্কে কোন অন্ধভক্তি তাঁর ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

সাধারণ প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলতে যা বোঝায় বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হন নি। সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের চিন্তা তিনি করেন নি। পৃথিবীর মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ও আনন্দ নিয়েই তাঁর সকল চিন্তা ভাবনা। বিদ্যাসাগর কখনও কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত হন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত সাধারণ মানুষের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও মানসিকতা ছিল উঁচু সুরে বাঁধা। তিনি অতি দুঃস্থ অবস্থা থেকে মোটামুটি স্বচ্ছল জীবনযাত্রায় উন্নীত হয়েছিলেন। সমাজে তিনি ছিলেন সকলের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তিনি কোনদিনই সমাজের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হন নি।

সাধারণ ধুতি, চাদর ও বিখ্যাত তালতলার চটি পায়ে বিদ্যাসাগরের এই পরিচিত অতি সাধারণ চেহারা প্রখর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধে অসাধারণ হয়ে দেখা দিত। পোশাকে ও ব্যবহারে সহজ, সরল বিদ্যাসাগর স্বভাবে ও আচরণে ছিলেন সতেজ ও সুদৃঢ়। তাঁর

ঊর্ধ্বতন ইউরোপীয় অফিসারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তিনি কখনও হীনমন্যতা প্রকাশ করেন নি।

একজন সমাজ-সংস্কারক, বহু-বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করণের পক্ষপাতী, বিধবা-বিবাহ ও নারী শিক্ষার সমর্থক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যসেবী, মানব-হিতৈষী, একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী, তীক্ষ্ম আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও নির্ভীক চরিত্রের মানুষরূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক অসাধারণ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ। রাজনীতিতে কখনও তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটেনি সত্য, কিন্তু জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম অবদান জাতির চেতনাবোধ ও চরিত্র গঠনে এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

[Brojendranath Banerjee—Sahitya-sadhak Charitmala ; Shambhunath Vidya-ratna—Vidyasagar O Bhramanirash ; Chandi Charan Bandopadhyaya—Vidya-sagar ; Vidyasagar Granthabali, Vols I & II ; Benoy Ghosh—Vidyasagar O Ban-gali Samaj, Vols I & II ;—Vidyasagar O Tatkalin Banga Samaj ; Bihari Lal Sarkar —Vidyasagar ; Mani Bagchi—Vidya-sagar ; C. E. Buckland—Lieuteanant Governors of Bengal, Vol II.]

(এস. ঘোষ) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর শরণ (মুন্সী) (১৮৭৪-১৯৪৭)

Iswar Saran (Munshi) (1874-1947)

1874 সালের 26 আগস্ট উত্তর প্রদেশের গোরখপুর অঞ্চলে ঈশ্বর শরণ মুন্সী জন্মগ্রহণ করেন। মুন্সী পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল বিহারের ছাপরা জেলায়। তাঁর পিতা মুন্সী ছোটুলাল উকিল ছিলেন। তিনিই গোরখপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর মাতার নাম বাসমতী দেবী।

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ঈশ্বর শরণের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় উর্দু ও ফার্সী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে। পরে স্থানীয় খ্রীস্টান মিশন স্কুলে ভর্তি হন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি যথাসময়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি পৈতৃক পেশা গ্রহণ করে আইনজীবীরূপে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগদান করেন।

তিনি শিবরানী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুখরানী দেবীর সঙ্গে তাঁর পুনরায় বিবাহ হয়। প্রথমা পত্নীর গর্ভে তাঁর দুই পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। দ্বিতীয়া পত্নী মুখরানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন।

অল্প বয়স থেকেই ঈশ্বর শরণ কয়েকজন একনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। মিসেস অ্যানি বেসান্ত ও জর্জ আরুণ্ডেলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। ব্রহ্ম বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল। সেইসঙ্গে উদার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। জেমস্ মিল ও চার্লস ব্র্যাডল-এর রচনা দ্বারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, বাবু গঙ্গাপ্রসাদ বর্মা, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রভৃতি বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে ও সাহচর্যে আসার ফলে ঈশ্বর শরণ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। 1910 সালে তিনি উত্তর প্রদেশ রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং 1918 সালে উত্তর প্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ক্রমে তিনি লিওনেল কার্টিসের সঙ্গে আলোচনা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত ঈশ্বর শরণ কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালেও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি অনেক বিষয়ে তাঁর আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। 1921 সালে একজন নির্দল প্রার্থীরূপে তিনি ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং সদস্য থাকাকালীন সর্বদাই তিনি সরকারের বিরোধী পক্ষভুক্ত ছিলেন।

ঈশ্বর শরণ একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের মহিমান্বিত মূর্তি তিনি মানসচক্ষে দেখতে পেতেন; আনন্দে পুলকিত হতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর জীবদ্দশায় তিনি দেশকে স্বাধীন হতে দেখতে পেলেন না। তিনি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ বলে বিবেচনা করতেন এবং শাসনতান্ত্রিক উপায়ে এই আদর্শ বাস্তবায়িত করতে তিনি সচেষ্ট হন। এই কারণে তিনি অসহযোগ অথবা আইন-অমান্য

আন্দোলন, কোনটিতেই যোগদান করেন নি। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শকে সমর্থন করতেন। তাঁর মতে, "প্রকৃত ও ব্যাপক স্বাদেশিকতার একটা অঙ্গ এই স্বদেশী আন্দোলন, যাকে 'জাতীয়তাবাদ' আখ্যা দেওয়া চলে। দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদের যে বিপুল তরঙ্গ বয়ে চলেছে, তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই স্বদেশী আন্দোলন।" তিনি কুটীর-শিল্পের বিকাশকে সমর্থন করতেন এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাতেন।

অসহযোগ আন্দোলনকে অনুমোদন না করেও ঈশ্বর শরণ ইংরেজ সরকারের দমনমূলক নীতিকে কখনই বরদাস্ত করতে পারেন নি। তিনি কঠোর ভাষায় সরকারের কার্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। 1922 সালে 18 জানুয়ারী আইন পরিষদে তিনি তাঁর ভাষণে জনগণের হিংসাত্মক কার্যের নিন্দা করেন। সেই সঙ্গে আরও তীব্র ভাষায় সরকারের সমালোচনা করেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন দমন ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার জন্য। "সরকার কংগ্রেস কমিটির সভাকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করেছেন। সেইজন্য অসহযোগ আন্দোলনকারীরা সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছেন। কারাবাস তাঁদের কাছে বিভীষিকার স্থান নয়, পরন্তু তীর্থস্থানে রূপান্তরিত। অসহযোগ কোন রোগ নয়, একটি লক্ষণ মাত্র। কখনও এর বিনাশ হতে পারে না। সুতরাং এই আন্দোলনের গতিরোধ করে বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং সরকারের পক্ষে কোন গঠনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত যার দ্বারা আন্দোলনের মূল কারণগুলি বিদূরিত হয়।" আইন পরিষদের ভাষণে এই-ই ছিল তাঁর বক্তব্য।

1933 সালের পর থেকে জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর তিনি সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তপশীলী জাতির উন্নতি সাধনের জন্য তিনি এলাহাবাদে হরিজন আশ্রম স্থাপন করেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও সাম্যবাদের প্রতি তাঁর যে গভীর বিশ্বাস ছিল এই সংস্থা তাঁর জীবন্ত উদাহরণ। সামাজিক সংস্কারের প্রতি তাঁর এই আগ্রহের প্রকাশ, ঈশ্বর শরণের অল্প বয়সের কাজের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। তাঁর স্বজাতি বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিলাত হতে প্রত্যাবর্তন করলে ঈশ্বর শরণ তাঁদের স্বাগত জানানো ও সমাজে তাঁদের যথাযোগ্য সমাদর ও মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করতেন। তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করতেন। পরবর্তীকালে তিনি জাতিভেদ প্রথা দূরীভূত করে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত করার পক্ষপাতী হন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও জনসভায় ঈশ্বর শরণ তাঁর এই সকল অভিমত প্রকাশ করতেন। ইংরাজি, হিন্দী ও উর্দু—এই তিন ভাষাতেই তিনি সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বহু ও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কায়স্থ পাঠশালা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও অ্যানি বেসান্ত স্কুল প্রভৃতি শিক্ষায়তনের সঙ্গে তিনি আজীবন ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখেছেন।

[Indian National Congress Proceedings 1908, Madras Session; Indian Legislative Assembly Debates, 1922-24; N. N. Mitra (Ed.)—The Indian Annual Register, 1923 and 1924; Personal interview of the Research Fellow with Shankar Saran, son of Munshi Iswar Saran.]

(এল. দিওয়ানী) **বিশ্বেশ্বর প্রসাদ**

উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ (স্যার) (১৮৩৮-১৯১৮)
William Wedderburn (Sir) (1838-1918)

স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা শহরের, 2 নম্বর অ্যাথল ক্রেসেণ্টে, 1838 সালের 25 মার্চ উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ব্যালিনডিনের দ্বিতীয় ব্যারনেট স্যার জন ওয়েডারবার্ণ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী উইলিয়াম মিলবার্ণের কন্যা হেনরিয়েট লুইসার ষষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন ওয়েডারবার্ণ।

স্কটল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা ওয়েডারবার্ণেরা এক সুপরিচিত প্রাচীন পরিবার। 1807 থেকে 1837 সাল পর্যন্ত স্যার জন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত ছিলেন। উইলিয়মের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন ওয়েডারবার্ণ ছিলেন হিসার জেলার জেলা-শাসক ও তহশীলদার; 1857 সালের মহাবিদ্রোহে, জন তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়। উইলিয়মের অপর ভ্রাতা ডেভিড সে যুগের লোকেদের তুলনায় ভারতবর্ষের বিষয়ে অনেক বেশী খুঁটিনাটি বিষয় জানতেন।

1878 সালের 12 সেপ্টেম্বর গ্রিউকর্ণের নর্থ

পেরট ম্যানরের হেনরি উইলিয়ম হস্‌কিন্স-এর কন্যা রুশের সঙ্গে উইলিয়মের বিবাহ হয়।

1844 সাল অবধি স্বদেশের লেখাপড়া যথাসময়ে শেষ করে, উইলিয়ম সুইজারল্যাণ্ড এবং ইতালী পাড়ি দেন—এই সফর ভবিষ্যতের বিভিন্ন ধ্যান ধারণা গঠন করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। অস্ট্রিয়ার অধীন ইতালী তখন জাতীয় সংগ্রামের প্রস্তুতিতে মগ্ন। উইলিয়মের বক্তব্য থেকে জানা যায়, 'এক সহজ সরল কল্পনাবিলাসী বালকের পক্ষে স্বভাবতই জাতীয় চেতনাবোধ একপ্রকার সহানুভূতি জাগিয়েছিল, ক্ষমতার চরম অপব্যবহার এবং বিদেশী শক্তির উৎপীড়নে ঘৃণাবোধ হয়েছিল সেই বালকের।' (উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণের দিনলিপি থেকে উদ্ধৃত)।

বার্ণের কাছাকাছি Hofwyl নামক স্থানের এক বিদ্যালয়ে উইলিয়ম এবং ডেভিড 1847 সালে যোগ দেন। 1851 সালে ওয়েডারবার্ণ পরিবার লণ্ডনে চলে এলে, সেই বছরই হেমন্তকালে উইলিয়মকে লরেটো হাউসে ভর্তি করানো হয়। অতঃপর উইলিয়ম এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন 1854 সালে এবং 1857'এ আধুনিক ভাষা শেখার প্রেরণায় প্রায় ছয় মাস কাল ইউরোপ সফর করেন।

এরপর 1859 সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসেন উইলিয়ম। স্বল্প সময়ের জন্য আইন সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করে, 1860 সালে ভারতবর্ষে চলে আসেন কাজকর্মের ব্যাপারে।

ধারওয়ারের সহ-তহশীলদার কাজের মাধ্যমেই তাঁর সরকারী কাজকর্মের সূচনা হয়। 1860 সালে তিনি ধারওয়ারের সরকারী বিচারক নিযুক্ত হন। আইন আদালত বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে—করাচী, বোম্বাই ইত্যাদি জায়গায় নানা পদে কাজ করার পর ওয়েডার-বার্ণ-কে সিন্ধুর অস্থায়ী জুডিশিয়াল কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। এরপর 1874 সালে তিনি সদর কোর্টের বিচারকের কার্যভার গ্রহণ করেন। 1882 সালে পুণার ডিস্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ নিযুক্ত হন। 1887-তে তাঁর অবসর গ্রহণের সময়ে ওয়েডারবার্ণ বোম্বাই সরকারের মুখ্য-সচিব পদে আসীন ছিলেন।

ভারতে কার্যকালে উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণের দৃষ্টি ভারতের দুর্ভিক্ষ, ভারতীয় কৃষকদের দারিদ্র্য, কৃষি ঋণ এবং পুরাতন গ্রামীণ সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

কৃষিকার্যের বিকাশের জন্য পরিমিত হারে মূল-ধনের বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে ওয়েডারবার্ণ কৃষি-ব্যাংক স্থাপন করার পরামর্শ দেন। সরকারী ডেট কোর্ট-এর বিকল্প ব্যবহাররূপে তিনি প্রাচীন ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েত সভা পুনর্গঠন করে, এক নতুন পরি-কল্পনা পেশ করেন।

এই সমস্যাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার ফলে ওয়েডারবার্ণ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসেন। অবসর গ্রহণের পর, তিনি কায়মনোবাক্যে কংগ্রেসের কাজকর্মে সক্রিয় ভূমিকা নেন—তাই 1889 সালে বোম্বাইতে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন উদ্বোধন করার সময় মন্তব্য করেন, 'ভারতের জনসেবায় শুধু আত্মনিয়োগই করি নি, তাদের 'নিমক'ও খেয়েছি'।

এর মধ্যে ভ্রাতা ডেভিডের মৃত্যু হলে, 1879 সালে ব্যারনেটের সমস্ত দায়িত্ব উইলিয়মের উপর ন্যস্ত হয়। 1893 সালে লিবারেল দলের সদস্যরূপে ব্যাংফশায়ার অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এ নির্বাচিত হন তিনি। এই সময়ে ভারতীয়দের প্রতি হাউসের বিমাতৃসুলভ আচরণের তীব্র নিন্দা করে, ভারতীয় অভাব অনুযোগ পার্লামেন্টে তুলে ধরেন। এই একই উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্টারি কমিটি স্থাপন করে, প্রায় 1873 থেকে 1900 সাল অবধি তার সভাপতির দায়িত্ব বহন করেন ওয়েডারবার্ণ।

ভারতীয় আয়-ব্যয় বিষয়ে আলোচনার জন্য গঠিত ওয়েলবি কমিশনে (অর্থাৎ রয়্যাল কমিশনে) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ওয়েডারবার্ণ। এছাড়া, ভারতীয় দুর্ভিক্ষের তদন্ত এবং প্রতিকারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, 1901 সালের জুন মাসে গঠিত 'ইণ্ডিয়ান ফেমিন ইউনিয়নের' কাজকর্মেও তিনি অংশ-গ্রহণ করেন।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিংশতিতম অধি-বেশনে অংশ গ্রহণ করার জন্য ওয়েডারবার্ণ 1904 সালে বোম্বাইতে আসেন। স্যার হেনরি কটন এই সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন। 1910 সালের 25তম অধিবেশন উদ্বোধন করার জন্য ওয়েডারবার্ণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। 1889 সালের জুলাই মাসে তাঁর মৃত্যু অবধি, তিনি কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সভাপতি ছিলেন।

'লিবারেল' মতাবলম্বী, উইলিয়ম স্ব-শাসন পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সংস্থাপকদের মত তাঁর ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভাগীদার হিসাবে ভারতবর্ষের

ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। 1907 সালে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে, চরমপন্থীরা তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, ওয়েডারবার্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হন। 1907 সালের মার্চ মাসে লর্ড মর্লের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং 'আইরিশ ও রাশিয়ান মাৎস্যন্যায়' থেকে সংগৃহীত 'মালমশলার' ভিত্তিতে আন্দোলনের সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তাই যখন 1917 সালে 20 আগস্ট ইংরেজরা ঘোষণা করে যে তারা চায় ভারতের জন্য এক উন্নতিকামী স্ব-শাসন পদ্ধতি—ওয়েডারবার্ণ তাতে আশ্বস্ত হন। বুদ্ধিমত্তা ও বিবেকবোধের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। তাঁর সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল মদ্যপানের কু-অভ্যাস বর্জন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচলিত আবগারি আইনের সংস্কার চেয়েছিলেন। নারী-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত করাচির এক নারী বিদ্যালয়ের মাধ্যমে—পরে এই বিদ্যালয়টি 'ওয়েডারবার্ণ হিন্দু গার্লস্ স্কুল' নামে পরিচিত হয়।

পুরাতনপন্থীরা ওয়েডারবার্ণকে রাজভক্তিহীন, আমলাদের কাজকর্মের নিন্দুক ও ভারতীয় কৃষকদের সমর্থক ও যথার্থ সাহায্যকারী বলে বর্ণনা করলেও, তাঁর সুমার্জিত ব্যবহারের সপ্রশংস স্বীকৃতি জানাতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি।

ওয়েডারবার্ণের জীবনের সর্বাধিক কৃতিত্ব ভারতীয়-গণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষকল্পে তাঁর একাগ্র প্রচেষ্টা। তাই মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড সংস্কারের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর আজীবনের প্রচেষ্টার সফল প্রতিফলন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের মতামত, 'পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, এমন এক সুশৃংখল বিপ্লবের আত্মপ্রকাশ আমরা আমাদের সম্মুখে যেন দেখতে পাচ্ছি।'

[Ratcliffe, S. K.—Sir William Wedderburn and the Indian Reform Movement, London, 1923; William Wedderburn's Dairy; B. B. Majumdar—Congress and Congressman in the Pre-Gandhian Era.]

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

উচ্চরংগ্রে নাভলশংকর ধেবড় (১৯০৫—১৯৭৭)

Uchharangray Navalshankar Dhebar (1905—1977)

উচ্চরংগ্রে নাভলশংকর ধেবড় বর্তমান গুজরাট রাজ্যের জামনগর থেকে এগারো মাইল দূরে গঙ্গাজলা নামে একটি ছোট গ্রামে 1905 সালের 21 সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। নাভলশংকর ভি. ধেবড় এবং উজমবাঈ-এর তিনি ছিলেন একমাত্র পুত্র। তিনি ছিলেন নাগর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পরিবারটিকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সংগ্রাম যুবক ধেবড়ের মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধেবড় মানুবেনকে বিবাহ করেছিলেন। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন জাতির সেবায়।

ধেবড়ের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল রাজকোটের তালুক স্কুলে। মাধ্যমিক শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন বোম্বাই-এর টিউটোরিয়াল হাইস্কুল এবং রাজকোটের সৌরাষ্ট্র হাইস্কুলে। 1922 সালে তিনি রাজকোট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি বোম্বাই-এর সেণ্ট জেভিয়ার স্কুলে যোগদান করেন। কিন্তু 1923 সালে পদার্থবিদ্যায় অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। বোম্বাইতে এক সলিসিটরের দপ্তরে কাজ করার সময় তিনি প্রাইভেটে আইন পড়তে আরম্ভ করেন (1923-28 সাল)। 1928 সালে হিন্দু 'ল' এ 'ডিস্টিংশান' নিয়ে তিনি হাইকোর্টের প্লীডারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিনি আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং প্রায় প্রথম থেকেই আইনজীবীরূপে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু গান্ধীজীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি 1936 সালে লাভজনক আইনব্যবসা ত্যাগ করে জাতির সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

গান্ধীজীর দার্শনিক চিন্তাভাবনা ধেবড়কে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলেরও তিনি আস্থাভাজন হয়েছিলেন। ধর্ম-মনোভাবাপন্ন তাঁর বন্ধুস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন মুনী শ্রী সন্ত বালাজী, শ্রী বালকোবাজী এবং আচার্য রজনীশ। ধেবড় ভাই সংস্কৃত সাহিত্য এবং গান্ধীজীর রচনাসমূহ অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। টলস্টয়ও তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাঁর জাতীয় রাজকর্মের সুদীর্ঘ জীবন আরম্ভ হয় 1936 সালে যে সময় তিনি আইনব্যবসা ত্যাগ করে রাজকোট থেকে পাঁচ মাইল দূরে থুরালা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। প্রতিবেশী দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামে ত্রাণ সাহায্যের কাজ পরিচালনা করে তিনি গ্রামের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। সেই বছরই রাজকোটের দেওয়ানের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি গঠন করেন রাজকোট মিল কামাদার মজদুর সংঘ ; এই সংঘের চেয়ারম্যান করা হয় তাঁকে। আট বছর অচল অবস্থায় ছিল যে কাথিয়াওয়াড় রাজনৈতিক সম্মেলন সেই সম্মেলনকেও তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। দেওয়ানের বিশেষ আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি রাজকোটে অধিবেশন আহ্বান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন সর্দার প্যাটেল এবং দরবার গোপাল দাস।

1937 সালে ধেবড় রাজকোট দরবারের আদেশে গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু জনমতের চাপে শীঘ্রই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। রাজকোটের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য তিনি তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। এই সংগ্রাম পরিণতি লাভ করে 1938-39 সালের বিখ্যাত রাজকোট সত্যাগ্রহে। শেষপর্যন্ত গান্ধীজীর অনশন সত্যাগ্রহের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ কংগ্রেস ক্রমশই দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সংগ্রামে জড়িত হয়ে পড়েছিল। রাজকোট সত্যাগ্রহের পরেই কাথিয়াওয়াড়ে দেখা দিল নজিরবিহীন দুর্ভিক্ষ। ধেবড় ত্রাণকার্য পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

1941 সালে গান্ধীজী বিরামগাঁও-এ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য ধেবড়কে নির্বাচিত করলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। ছ' মাসের জন্য তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। 1942 সালে 'ভারতছাড়ো আন্দোলনের' সময় তিনি আবার কারারুদ্ধ হন।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সঙ্গে কাথিয়াওয়াড় রাজ্যকে মিলিত করার জন্য এবং পরে কাথিয়াওয়াড় যুক্তরাজ্য গঠনকালে, যে রাজ্যটি 'সৌরাষ্ট্র' নামে পরিচিত, তাতে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 1948 সালে তিনি সৌরাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। তাঁর শাসনকালে গ্রামের উন্নতিসাধনের জন্য সৌরাষ্ট্রের নানাবিধ সংস্কার সাধিত হয়েছিল। গ্রামীণ সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসার সুবিধা, পানীয় জলের যথাযথ সরবরাহ এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। কিন্তু তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার জড়িত ছিল সৌরাষ্ট্রের প্রজাস্বত্ব সমস্যার সঙ্গে। সেগুলি ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্ট, বরখালি অ্যাবলিশান এ্যাক্ট, স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট এবং এগ্রিকালচার ডেট রিলিফ এ্যাক্ট যার ফলাফলস্বরূপ ভাড়াটিয়ারা সন্দেহাতীতভাবে তার জমির মালিক হবার সুযোগ পেলেন।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে এবং তারপরেও খাদি, গ্রামীণ শিল্প এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য গঠনমূলক কাজের প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 1955 সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এই পদে তিনি প্রথম যা করেছিলেন তা হল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের সকলকে এক সপ্তাহব্যাপী একটি সম্মেলনে একত্রিত করা। কংগ্রেস কিভাবে কাজ করলে ভালোভাবে জাতির সেবা করতে পারবে তা স্থির করাই ছিল এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়।

1960 সালে 'শিড্যুইল ট্রাইব এরিয়াজ কমিশনের' চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়েছিল তাঁকে। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট তিনি 1961 সালে প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করলেন। পরের বছর তিনি নির্বাচিত হলেন লোক সভায়।

গান্ধীবাদী একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করার জন্য 1958 সালে তিনি এডেনে গিয়েছিলেন। 1962 সালে আক্রায় অনুষ্ঠিত এণ্টি-নিউক্লিয়ার আমর্স কনফারেন্সে তিনি যোগদান করেন এবং রাশিয়া ও ইটালি ভ্রমণ করেন।

দেশের সামাজিক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধেবড় জড়িত ছিলেন। 1957 সাল থেকে 1962 সাল পর্যন্ত তিনি 'ভারতীয় আদিম জাতি সংঘের' সহ-সভাপতি নিযুক্ত ছিলেন এবং 1962 সাল থেকে 1964 সাল পর্যন্ত ছিলেন এই সংঘের সভাপতি। স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান রাজকোটের 'বিকাশগৃহে'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এছাড়া সৌরাষ্ট্রের ভবনগর জেলার সনোসারায় একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'লোকভারতীর' সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। 1944 সাল থেকে তিনি ছিলেন 'রাষ্ট্রীয় শালার' ট্রাষ্টী। বিরানী বিদ্যা মন্দিরের তিনি ছিলেন সভাপতি এবং 'বল্লভ কন্যা' বিদ্যালয়েরও সভাপতি ছিলেন 1958 সাল থেকে 1966 সাল পর্যন্ত। 1963 সালে খাদি

এবং গ্রামীণ শিল্প কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন তিনি।

ঈশ্বরের প্রতি ধেবড়ের ছিল অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে মূর্তি পূজায় নয় কোনও স্বার্থব্যতিরেকে নিজেকে কাজে উৎসর্গ করাই হল আসলে ঈশ্বরের আরাধনা করা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের সঙ্গে তিনি উদারভাবে মিশতে পারতেন।

পশ্চিমী শিক্ষার প্রশংসা করলেও ধেবড় ছিলেন জাতীয় শিক্ষার একজন গোঁড়া প্রবক্তা এবং তিনি রাষ্ট্রীয় শালা এবং লোকভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সরকার কর্তৃক গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা কমিশনের তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। সৌরাষ্ট্রের কুটীর এবং গ্রামীণ শিল্প বিকাশের জন্য তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যন্ত্র-সভ্যতার বিরোধী ছিলেন না কিন্তু তিনি মনে করতেন কোনও দেশের শিল্পগত ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্পের প্রসারও প্রয়োজন। গান্ধীবাদী বিষয়ে তিনি ইংরাজি, গুজরাটী, হিন্দীতে নানাবিধ রচনা লিখেছিলেন, যেমন—Gandhian Philosophy, Socialist Co-operative, Gandhiji as a Practical Idealist এবং Role of Panchayats in New India. তিনি ছিলেন সরলতা এবং কর্মের প্রতীক।

[Interview of the Research Fellow with the Private Secretary to Dhebar ; Times of India, Files from 1957 to 1964 ; Dhebar, U. N.—Lectures on Gandhian Philosophy (Annamalai University),—Towards A Socialist Co-operative Commonwealth (Delhi, 1957) ;—Gandhian Thought (Kurukshetra Uni.) ;—Gandhiji, A Practical Idealist (1964) ; Role of Panchayats in New India (Delhi, 1957) ;—A True Reformer (1955).]

আর. কে. ধারাইয়া

(কুমুদ প্রসন্ন)

উজ্জ্বল সিং (সর্দার) (১৮৯৫-১৯৮৩)
Ujjal Singh (Sardar) (1895-1983)

বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের শাপুর জেলার হাডাল নামে ক্ষুদ্র এবং স্বল্প পরিচিত একটি গ্রামে 1895 সালে 27 ডিসেম্বর উজ্জ্বল সিং জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল সর্দার সুজন সিং।

সুজন সিং-এর স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী দুই পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, শোভা সিং এবং উজ্জ্বল সিং। বড় পুত্রটি হয়েছিল তার পিতার মতো। সে ছিল দীর্ঘাকৃতি এবং ব্যবসার প্রতি আগ্রহী। ছোট ছেলে উজ্জ্বল সিং অনেকটা ছিল তার মায়ের মতো। সে ছিল ছোটখাটো চেহারার এবং অত্যন্ত ধার্মিক।

উজ্জ্বল সিং ছিলেন ভালো ছাত্র। গ্রামের ধরম-শালা এবং মাদ্রাসার প্রথাগত শিক্ষা সমাপ্ত হলে তাঁকে অমৃতসরে খালসা হাইস্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ক্লাসে শুধুমাত্র লেখাপড়াতে শীর্ষস্থানে থাকতেন তাই নয় খেলাধুলাতেও ছিলেন অসাধারণ। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি হকি খেলায় পারদর্শিতার জন্য 'তারকা' খেতাব অর্জন করেন।

একটি বৃত্তি লাভ করে উজ্জ্বল সিং ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য লাহোরের মডেল স্কুলে ভর্তি হন। এরপর তিনি যোগদান করলেন সরকারী কলেজে। তাঁকে কলেজ হকি একাদশের দলপতি নির্বাচিত করা হল এবং তাঁর দল বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় জয়লাভ করে। 1916 সালে ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন উজ্জ্বল সিং।

কলেজ ছেড়ে দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রাজ-নৈতিক এবং শিখদের বিষয়ে উজ্জ্বল সিং-এর আগ্রহ দেখা দিতে থাকে। প্রধান খালসা দেওয়ানের সক্রিয় সদস্য হয়ে গেলেন তিনি। এই সংগঠনটি সেই সময় সার সুন্দর সিং মাজিথিয়ার সভাপতিত্বে শিখদের একমাত্র সুসংগঠিত এবং প্রভাবশালী সংগঠন ছিল। এখানকার সমস্ত নেতৃস্থানীয় সদস্যরা রাজনীতির ব্যাপারে উদার মত পোষণ করতেন কিন্তু শিখদের স্বার্থ রক্ষায় ছিলেন প্রবল আগ্রহী। মিণ্টো-মর্লে সং-স্কারের সময় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তদানীন্তন ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু যে সময় ভারতে এসেছিলেন সে সময়ও তাঁরা শিখদের পক্ষে স্মারকলিপি প্রদান করেছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টাকে সফল করতে তাঁরা স্থির করলেন শিখদের সমস্যাদি ব্রিটিশ শাসকবর্গের সম্মুখে পেশ করার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। উজ্জ্বল সিং তখন সবেমাত্র কলেজ ছেড়েছেন এবং জনজীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা মাত্র কয়েক বছরের তবু লণ্ডনে প্রেরিত শিখ প্রতিনিধি দলে তাঁকে সদস্য মনোনীত করা হল। যদিও প্রতিনিধিদলটি উদ্দেশ্য

সাধনে ব্যর্থ হয় ; কিন্তু উজ্জ্বল সিং সেখানে ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ শিখ সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে ইংলণ্ডের মতকে অবহিত করাবার জন্য অসংখ্য প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে এবং পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন।

উজ্জ্বল সিং শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এখানকার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। 1930 সাল পর্যন্ত তিনি এই কমিটির কাজ করে গিয়েছেন। এরপর আর তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নি।

1926 সালে উজ্জ্বল সিং এর সংসদ জীবন আরম্ভ হয়। সেবছর নির্দল প্রার্থীরূপে শিখ পৌর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি পাঞ্জাব বিধানসভায় এলেন। 1927 সালে গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলন চলাকালে আকালি বন্দীদের মুক্ত না করার কারণে প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি বিধানসভার সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। 1930 সালে একই নির্বাচন কেন্দ্র থেকে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ফিরে এলেন।

1930 সালে ব্রিটিশ সরকার প্রথম গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলে বৈঠকে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উজ্জ্বল সিংকে মনোনীত করা হল। ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার অর্পণ করার জন্য সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে আলোচনা করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। 'ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটি' এবং সভার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে তিনি কাজ করেছিলেন। কিন্তু এই বৈঠকে কোনরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারায়, ভাইসরয় গান্ধীজী এবং কংগ্রেসকে 1931 সালে আহূত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য সম্মত করালেন। গান্ধীজী কংগ্রেসের মতানুসারে এখানে সমস্ত দেশের সমস্যাকে তুলে ধরলেন। এই সম্মেলনেও শিখ সম্প্রদায়ের সমস্যাসমূহের মুখপাত্ররূপে উজ্জ্বল সিংকে মনোনীত করা হয়েছিল। এই সম্মেলনও আশাপ্রদ হল না। দেশের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন যখন পূর্বেকার দুই সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে 'সংস্কারের জন্য উপদেষ্টা কমিটি' গঠন করেছিলেন উজ্জ্বল সিংকে তখন সেই কমিটির সদস্য করা হয়। যাহোক গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে অস্বীকার করেছিল যে সাম্প্রদায়িক রায় (Communal Award) তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তিনি 1932 সালের আগস্ট মাসে কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত 1932 সালের একতা সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি উজ্জ্বল সিং-এর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন তিনি ছিলেন না। তাঁর কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল বিধানমণ্ডল এবং জনসভায় ভাষণের মধ্যে। তিনি কখনও কৃত্রিমভাবে কথা বলতেন না এবং যদি মনে করতেন যে তাঁর কাজের জন্য গোষ্ঠী স্বার্থ আরও সংরক্ষিত হবে তার জন্য তিনি দলীয় সম্পর্ক ছেদ করতেন না। যেমন তিনি শিখদের বিরুদ্ধে বিভেদ সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক রায়-এর পর গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। এছাড়া কয়েকবছর পর 1942-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় সংসদের সচিবের (স্বরাষ্ট্র) পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। কংগ্রেস দলের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও তিনি একাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন কঠোর জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশী আন্দোলনে বিশ্বাসী। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বছর 1919 থেকে তিনি সর্বদাই ভারতে তৈরি জামাকাপড় পরতেন। এমনকি বহু বছর শুধুমাত্র খাদি ব্যবহার করেছেন।

1945 সালে কুইবেকে (কানাডা) ইউ. এন. ও কর্তৃক অনুমোদিত এফ. এ. ও.'র একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য উজ্জ্বল সিং সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি ইউ. এস. এ. পরিদর্শনের সময় নিজেকে ঐ দেশের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করানোর সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলেন। একই বছরে তিনি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি নিখিল ভারত প্রযুক্তিবিদ্যা পরিষদেরও সদস্য হয়েছিলেন। 1949 সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন।

দেশের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে 1946 সালে স্বাধীন ভারতের সংবিধান তৈরির জন্য একটি সাংবিধানিক পরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হয়েছিল। এই সাংবিধানিক পরিষদের সদস্য মনোনীত করেছিল পরিষদগুলি। উজ্জ্বল সিং মনোনীত হলেন পাঞ্জাব পরিষদ কর্তৃক। উজ্জ্বল সিং-এর পক্ষে ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত সম্মানের এবং জনজীবন সম্বন্ধে তাঁর যে মূল্যবান ধারণা হয়েছিল সংবিধান রচনাকারী সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে সেগুলিকে তিনি কাজে লাগানোর সুযোগ লাভ করেছিলেন।

হাজার হাজার একর কৃষিযোগ্য জমি, ফ্যাক্টরি এবং শহরের সম্পত্তি অর্থাৎ বিশাল এস্টেট ত্যাগ করে গৃহহীন উদ্বাস্তু হয়ে উজ্জ্বল সিং পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে চলে এসেছিলেন। কিছু দিনের জন্য তিনি ভাই (স্যার শোভা সিং) এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তারপর মোসোরাতে (সিমলা) একটি বাড়ী কেনেন। রাজনৈতিক কাজকর্ম তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নবগঠিত পূর্ব পাঞ্জাবের বিধান পরিষদে তিনি পুনর্নির্বাচিত হলেন এবং একের পর এক সরবরাহ, শিল্প এবং অর্থ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত দ্বিতীয় অর্থ কমিশনেরও সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর আগ্রহ ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল এবং প্রায় এক দশক ধরে তিনি ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিশন এবং বম্বের টেকসটাইল বোর্ডের কাজ করেছেন। উত্তরভারত চেম্বার অব কমার্সের তিনি ছিলেন সভাপতি এবং নানাবিধ সংগঠনের ডাইরেক্টর ছিলেন ; যেমন—লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেবলস্ লিমিটেড, হিন্দুস্তান হাউসিং ফ্যাকটরি, ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন। রাজ্যপাল হওয়া পর্যন্ত শেষোক্ত সংগঠনটির তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত ছিলেন।

1965 সাল নাগাদ উজ্জ্বল সিং রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে অবসর গ্রহণের জন্য বিশেষ আগ্রহী হন এবং হারানো ভাগ্যকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য এবং সমাজ সংস্কারের কাজে বিশেষ মনোযোগী হয়ে পড়েন (পাণিপথের কাছে সামান্য ফলের বাগান তিনি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লাভ করেছিলেন)। কিন্তু সে সময় সরকারের ভীষণভাবে প্রয়োজন ছিল এমন একজন শিখ নেতা যিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে হবেন শ্রদ্ধাস্পদ এবং একই সঙ্গে যাঁর সততা হবে কলঙ্কহীন। সে সময় পাঞ্জাবী সুবার জন্য আকালিরা বিদ্রোহ আরম্ভ করেছে, পাকিস্তানীরা কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারী পাঠাচ্ছে এবং ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার জন্য শিখদের বশীভূত করার চেষ্টা করছে। সরকার উজ্জ্বল সিংকে সময়োপযোগী মানুষ বলে মনে করলেন এবং 1965 সালের 1 সেপ্টেম্বর তাঁকে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল করা হল। যেরকম অনুমান করা হয়েছিল সে অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হল। পাকিস্তানী প্লেন অমৃতসরে বোমাবর্ষণ করতে লাগল এবং যুদ্ধের আনুষঙ্গিক সবই ঘটতে লাগল—উজ্জ্বল সিং এই সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছিলেন। 6 এবং 11 সেপ্টেম্বর অল ইণ্ডিয়া রেডিও-তে ভাষণের মাধ্যমে তিনি জনগণ এবং বিশেষভাবে জওয়ানদের উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়ে আক্রমণকারীদের দূরে হটিয়ে দেওয়ার জন্য আলোড়নসৃষ্টিকারী আবেদন জানান। 1966 সালের জুন মাসে তাঁকে মাদ্রাজের রাজ্যপাল মনোনীত করা হয় এবং বহুদিন তিনি এই পদে আসীন ছিলেন।

অবস্থাপন্ন স্থপতি সুন্দর সিং ধুপিয়ার কন্যা এবং অমৃতসরের প্রসিদ্ধ শিখ কবি, দার্শনিক ও ধর্ম উপদেষ্টা ভাই-সাহিব ভাই বীর সিংহ এর পৌত্রী শান্ত সেবকে বিবাহ করেছিলেন উজ্জ্বল সিং। বিবাহের সময় যদিও তিনি ছিলেন উনিশ বছরের একটি মেয়ে কিন্তু স্বামীর রাজনৈতিক এবং সমাজ জীবনে নিজেকে তিনি সুযোগ্যা সঙ্গিনী প্রমাণিত করেছিলেন। গোল টেবিল বৈঠকের সময় তিনি লণ্ডনে গিয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গিনী হয়ে। অনেক সমাজসংস্কারমূলক কাজকর্মের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁদের তিন কন্যারই বিবাহ হয়েছে ধনী সর্দারদের সঙ্গে।

তিনটি উপাদান যা উজ্জ্বল সিং-এর জীবনে সাফল্য আনয়ন করেছিল সেগুলি হল—অসাধারণ কর্ম ক্ষমতা, সততা এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস। ভোর হওয়ার অনেক আগেই তিনি ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। প্রার্থনা এবং ব্যায়াম দিয়ে তাঁর দিনের কাজ আরম্ভ হত। আহারের এবং নিদ্রার স্বল্প বিরতি ছাড়া সমস্ত দিন কাজ করতেন। গুরুদ্বারে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও দিন তাঁর ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর দিন যেমন আরম্ভ হত প্রার্থনা দিয়ে, দিনের সমাপ্তিও ঘটত প্রার্থনা দিয়ে।

[Arunam and Sheel—Personalities, Northern India Volume, 1951-52, New Delhi ; Khuswant Singh—The Sikhs, London, 1953 ;—Sikhs Today, Calcutta, 1959 ; The Punjab Legislative Council Debates, 1930 and 1936 ; The Punjab Legislative Assembly Debates, 1941 ; N. N. Mitra (Ed.)—The Indian Annual Register, 1945-47.]

(ডি. এন. দত্ত)

উধম সিংহ শহীদ (সর্দার) (১৮৯৯-১৯৪০)
Udham Singh Shaheed (Sardar)
(1899-1940)

ভারতের অগ্নিযুগের ইতিহাসে সর্দার উধম সিংহ শহীদ একটি স্মরণীয় নাম। বিবিধ ছদ্মনামে তিনি পরিচিত। যেমন, শের সিং, উদে সিং, রাম মহম্মদ সিং আজাদ এবং ফ্রাংক ব্রিজিল। প্রতিটি ভারতবাসী, বিশেষতঃ পাঞ্জাবী মাত্রেই, তাঁর জন্য গর্বিত। 1899 সালে 28 ডিসেম্বর সাংগ্রুর জেলার ঐতিহাসিক শহর শুনামে স্বদেশমাতার সুযোগ্য সন্তান উধম সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তেহল সিং কাম্বোজ ছিলেন এক অতি সাধারণ দরিদ্র চাষী। অত্যন্ত কায়ক্লেশে প্রায় নিস্ফলা জমি আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। উপ্পলি গ্রামে রেলের লেভেল-ক্রসিং-এ দ্বাররক্ষকের চাকুরী করতে তিনি বাধ্য হন। এইখানেই কিশোর বয়স্ক দুই পুত্র নিয়ে উধম সিং বাস করতেন তাঁর যৎসামান্য উপার্জনকে একটু বাড়ানোর আশায়।

এই নিদারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যে নিরুপায় তেহল সিং অবশেষে দ্বাররক্ষকের চাকুরী ত্যাগ করেন ও সাত বছর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র সাধু সিং এবং পাঁচ বছর বয়স্ক উধম সিং সহ অমৃতসরে আসেন। এখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে অতি দীনহীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শিশুপুত্রেরা অনাথ হয়ে পড়ে। একদিন একদল জিপসীর সঙ্গে এই দুই ভাইকে ঘুরে বেড়াতে দেখে শুনামের অধিবাসী পরিব্রাজক চন্দ সিং 'শিখ অনাথ আশ্রমে' এদের ভর্তি করে দিলেন। অমৃতসরের 'পুতলি ঘরে' দুই ভাইয়ের আশ্রয় মিলল। কিছুদিন পর উধম সিংয়ের বড় ভাই সাধু সিংহের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে উধম সিং ধাতু শিল্পী ও ছুতোর মিস্ত্রীর কাজে দক্ষতা অর্জন করেন।

সময় বয়ে যায়। ক্রমশঃ স্বদেশী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিক্ষোভ ও আন্দোলন ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়। বিভিন্ন দমনমূলক নীতি বিশেষতঃ ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও কুখ্যাত রাউলাট আইনের প্রয়োগ ভারতীয়দের ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ সইফুদ্দিন কিচ্লু প্রভৃতি জাতীয় নেতৃবৃন্দ অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা-বাগে বৈশাখী উৎসব পালন করার জন্য 1919 সালের 13 এপ্রিল সর্বসাধারণকে আহ্বান করেন। স্বনামখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও বক্তাগণ একই মঞ্চ থেকে এই অভূতপূর্ব বিপুল সমাবেশে বক্তৃতা দিতে আহূত হন। বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের নিমিত্ত হিন্দু, শিখ ও মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। নারী, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধ নির্বিশেষে অগণিত মানুষ জালিয়ানওয়ালাবাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে; সর্বসাধারণকে ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল যে দেশের চারণ কবিরাও গান গাইবেন।

কিন্তু পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ও' ডাওয়ার এই উৎসব বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। অপরিসীম ঔদ্ধত্যে ও ক্ষমতার গর্বে তিনি ঘোষণা করলেন: 'আমার আদেশ অমান্য করলে প্রতিটি মানুষকে আমি হত্যা করবো।' জলন্ধরে কর্মরত মিলিটারী কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর. হ্যারী ডায়ারকে আহ্বান করে কঠোরতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তিনি আদেশ দিলেন। এই উৎসব ও জনসমাবেশকে গভর্ণর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত ও বিক্ষোভ বলে অভিযুক্ত করেন।

রুপার্ট ফার্ণো (Rupert Furneaux) 'Massacre at Amritsar বইতে লিখেছেন: 'ভারপ্রাপ্ত অফিসার আদেশ দিলেন সমবেত জনতার উপর গুলি ছুঁড়তে। তারপর প্রায় সাড়ে দশ মিনিট ব্যাপী অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ চলল সেই নিরস্ত্র অসহায় জনতার উপর। জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই মৃত্যুফাঁদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য জনতার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। সর্বসাকুল্যে মোট 1,650 রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। 379 জন নরনারী ও শিশু নিহত হয়। 500 জন গুরুতররূপে আহত হয়। আক্রমণ প্রতিরোধ করতে একটি পাথরও কেউ ছোঁড়েনি, একটি লাঠিও উদ্যত হয়নি। পথে ছড়ানো রক্তাক্ত খণ্ডিত মৃত দেহ থেকে, পথের কুকুর ও শৃগাল ব্যস্ত হয়ে উঠল মাংস খুবলে খেতে।' আহতদের মধ্যে একজন সর্দার উধম সিং। পরবর্তীকালে তিনি রাজনৈতিক কারণে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তিলাভ করে তিনি তাঁর দেশে (শুনামে) ফিরে যান। কিন্তু কেন্দ্রীয় গুপ্তচরবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও বিরক্ত উধম সিং দেশত্যাগ করতে মনস্থ করেন ও বিলাত যাত্রা করেন। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেন ও আমেরিকায় বেশ কিছুকাল বসবাস করেন। এখানে উধম সিং পড়শুনা করেন। 1937 সাল থেকে তিনি ইংলণ্ডে বাস করেন মাইকেল ও'ডাওয়ারকে

হত্যা করবেন এই সংকল্প নিয়ে। মাইকেল ও' ডাওয়ার অবসর গ্রহণের পর ডেভোনশায়ার কাউন্টির থার্লস্টোনে বাস করতে থাকেন। থার্লস্টোনের সর্বত্র উধম সিং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করেন। মাইকেল ও' ডাওয়ারের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ম নজর রাখেন। একজন বেয়ারা ও গাড়ী চালকের ছদ্মবেশে উধম সিং থার্লস্টোন এলাকার সর্বত্র বিচরণ করেন।

1940 সালের 13 মার্চ মাইকেল ও' ডাওয়ার তাঁর কেনসিংটনের বাড়ী থেকে বেরোবার আগে স্ত্রীকে বললেন 'আমি বাইরে যাচ্ছি। পাঁচটার সময় বিকেলে চায়ের আসরের আগেই আমি আসবো।' তিনি রয়াল সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি ও ইস্ট ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক যুগ্মভাবে আহূত সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ক্যাক্সটন হল অভিমুখে যাত্রা করেন। সেদিন ক্যাক্সটন হলের 'টিউটর ঘরে' আফগানিস্তান সম্পর্কে স্যার পার্সি সাইক্সের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। চেয়ারম্যান ছিলেন লর্ড জেটল্যান্ড।

এই ঘটনার একদিন পূর্বে তাঁর বন্ধুদের উধম আভাসে ইঙ্গিতে জানালেন যে আগামীকাল বিকেলে লন্ডনবাসীরা এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাবেন। এক অভাবিত ঘটনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে। সভার প্রাক্কালে তাদের প্রিয় উধম সিং মঞ্চের সামনের সারির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসেন ও চতুর্থ কি পঞ্চম সারির নিকটস্থ দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ান।

স্যার পার্সি সাইক্স-এর বক্তৃতা শেষ হল। অনেক বক্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন। স্যার মাইকেল ও' ডাওয়ার তীব্র তীক্ষ্ম ভাষায় বক্তৃতা করে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। তিনি যখন বসবার জন্য আসন গ্রহণ করতে উদ্যত ঠিক তখনই উধম সিংয়ের বন্দুক গর্জে উঠল। গুলি এসে বিঁধল মাইকেল ও' ডাওয়ারের দেহে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। লর্ড লেমিংটন ও স্যার লুই ডেনও আহত হন। মাইকেল ও' ডাওয়ারের জ্ঞান আর ফিরে আসে নি, তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যান।

1940 সালের 2 এপ্রিল সর্দার উধম সিংকে বন্দী অবস্থায় বিচারের জন্য আদালতে হাজির করা হয়। ও' ডাওয়ারের প্রতি দীর্ঘদিনের বিদ্বেষ ও ঘৃণায় উধম সিং তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। এই হত্যা-পরিকল্পনা দীর্ঘ দিনের চিন্তাপ্রসূত, কোন আকস্মিক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে উধম সিং একাজ করেন নি। 1939 ও 1940 সালে লেখা তাঁর ডায়েরীতে ও' ডাওয়ারের নাম ও ঠিকানা পাওয়া যায়। উধম সিং আদালতে সর্বসমক্ষে জানালেন: 'আমি ও' ডাওয়ারকে হত্যা করেছি, কারণ তাঁর প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা ও আক্রোশ ছিল। এই শাস্তি তাঁর প্রাপ্য। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। একদিন তো যেতেই হবে এই পৃথিবী ছেড়ে। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কেন তার জন্য অপেক্ষা করা? শরীরে শক্তি-সামর্থ্য থাকতে থাকতেই মানুষের মৃত্যুবরণ করা উচিত। এই-ই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। আমি তাই করেছি। আমি আমার দেশের জন্য মৃত্যুকে বরণ করছি। আমার কোন আক্ষেপ নেই, অনুশোচনা নেই। লর্ড জেটল্যান্ড কি মারা গেছেন? আমি দু'বার গুলিবিদ্ধ করেছিলাম।' তিনি আরও বলতে লাগলেন—'ব্রিটিশ অপশাসনে আমার দেশের মানুষ অনাহারে ধুঁকছে, তাদের জীবনশক্তি ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে। আমি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। দেশের প্রতি এটা আমার কর্তব্য। কোন অন্যায় কাজ আমি করিনি। কোন শাস্তিকে আমি গ্রাহ্য করি না—দশ, কুড়ি অথবা পঞ্চাশ বছরের কারাবাসের প্রতি, এমনকি ফাঁসির হুকুমের প্রতিও আমার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।'

উধম সিংয়ের বিচার হল পুরাতন বেইলি সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টে। ফাঁসির আদেশ হল। 1940 সালের জুলাই মাসের 'ল রিপোর্ট' অনুসারে জানা যায় যে পেনটনভিল জেলে 30 জুলাই 1940 সালে ভারত মাতার এই মহান সন্তানকে ফাঁসি দেওয়া হয় মাইকেল ও' ডাওয়ারের হত্যাপরাধে। সর্দার উধম সিং দেশের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সমুচিত প্রতিশোধ তিনি গ্রহণ করেছেন। ভারতমাতার বীর সন্তান মহান দেশপ্রেমিক ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, শহীদ ভগৎ সিং এবং অন্যান্যদের তালিকায় তাঁর নামও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

[Rupert Furneaux—Massare at Amritsar, London, 1963 ; Kulwant Singh Virk—Twenty-one Years After Jallianwala Bagh (an article in the Tribune, deted 13 April 1961) ; The Tribune dated 14 and 15 March 1940.]

(ডি. এল. দত্ত)

বখ্শিস সিং নিজ্জর

উন্নাওয়া লক্ষ্মীনারায়ণ (১৮৭৩-১৯৫৮)
Unnava Lakshminarayana (1873-1958)

উন্নাওয়া লক্ষ্মীনারায়ণ 1873 সালে গুণ্টুর জেলার (বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ) উন্নাওয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা ছিলেন শ্রী রামুলু এবং শেষাম্মা। পিতা ছিলেন নিয়োগী ব্রাহ্মণ পরিবারের বংশধর। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন তিনি। উনিশ বছর বয়সে লক্ষ্মীনারায়ণ বিবাহ করেন লক্ষ্মীবায়াম্মাকে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে তাঁর সমস্ত রকম জাতীয়তাবাদী কাজকর্মে আন্তরিকতার সঙ্গে সাহায্য করতেন।

আইনজীবী হিসাবে উচ্চ যোগ্যতা অর্জনের জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ 1913 সালে ইংলণ্ডে এবং পরে আয়ারল্যাণ্ডে যান। ডাবলিনে তিন বছর পড়াশুনা করে 1916 সালে ব্যারিস্টার হয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। আয়ারল্যাণ্ডে থাকাকালে অধ্যয়নরত কয়েকজন ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য অন্তরঙ্গতা হয় ত্রিপুরীনেনি রামস্বামী চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি পরে একাধারে ব্যারিস্টার এবং কবিরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আর অন্তরঙ্গতা হয়েছিল ভি. ভি. গিরির সঙ্গে যিনি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি মিসেস স্কেফিংটনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই ভদ্রমহিলা ছিলেন জনৈক আইরিশ বিপ্লবীর স্ত্রী। 1916 সালে হোমরুল আন্দোলন চলার সময় ইনি গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। শ্রীমতী স্কেফিংটন ছিলেন একজন সম্মানীয় আইরিশ ভদ্রমহিলা এবং জার্মান ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত।

স্বদেশে ফিরে এসে তিনি তাঁর নিজের শহর গুণ্টুরে আইনব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মহাত্মা গান্ধী নির্দেশিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। সত্যাগ্রহ-এর সঠিক আদর্শ অনুসারে অরণ্য আইন (Forest Act) অমান্য করার জন্য তিনি পালনাড তালুকের গ্রামীণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। এর ফলে সরকারী আদেশ-এ অবিলম্বে তাঁকে (1921) কারাগারে বন্দী করা হল। 1922 সালেমুক্তিলাভের পর তিনি সমাজ পুনর্গঠনের কাজে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, কুটীর শিল্প এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। গুণ্টুরের প্রখ্যাত আইনজীবী ভ্রাতুষ্পুত্র নাদিমপল্লী সীতারামাইয়ার সাহায্যে তিনি স্থাপন করলেন 'সারদানিকেতনম্' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ছিল স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এবং স্ত্রী জাতির মঙ্গলসাধন করা। তিনিই ছিলেন বিদ্যালয়টির প্রধান সংগঠক। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়টির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এখানে তিনি হস্তশিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আবাসিকদের তাঁতের কাজ, মাদুর বোনা, বেতের কাজ, রং তৈরী করা এবং অঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। এছাড়া আরও শেখানো হত সংস্কৃত, তেলেগু, হিন্দী সাহিত্য, সেই সঙ্গে সঙ্গীত এবং ভরতনাট্যম। বিদ্যালয়টির দ্রুত প্রসার হতে লাগল এবং উপযুক্ত বাড়ী এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও ক্রমশ যোগাড় হল। স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তিনি পাঁচটি অনাথ মেয়েকে দত্তক নিয়েছিলেন এবং তাঁর পরিবারের পদবী এদের নামের সঙ্গে তিনি ব্যবহার করতেন। স্বামীহারাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি সমব্যথী ছিলেন। এই কারণে তাঁদের উন্নতিসাধনের জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'শরণালয়ম্'। কোনও এক বিজয়া দশমীর শুভ দিনে তিনি প্রথম বিধবা বিবাহের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অন্যরাও পরে অনুসরণ করেছিলেন।

ইউ লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন সক্রিয় কংগ্রেস সদস্য। বিখ্যাত সমাজসেবী বিরসালিঙ্গম পন্তলু দ্বারা তাঁর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজ সংস্কারকামী মনোভাব অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এছাড়া অন্ধ্র কংগ্রেসের একজন বর্ষীয়ান নেতারূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল। অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি অন্ধ্ররাজ্য গঠনের দাবী সমর্থন করতেন। 1930 সালে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। আবার তাঁকে বন্দী করা হল 1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়। প্রথম ঘটনার সময় তিনি হরতাল, পিকেটিং পরিচালনা করেছিলেন এবং গুণ্টুরে বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের তিনিই ছিলেন নেতা।

তেলেগু সাহিত্যের প্রতি তিনি সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পালনাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় 'টিক্কনা' রচিত 'পলনাতিবীরচরিত্র'র তিনি সমালোচনা করেছিলেন।

'মালাপল্লী' নামে তাঁর নিজের লেখা উপন্যাসটিতে তিনি হরিজনদের উন্নতিবিধানের কথা লিখেছেন। এছাড়া স্ত্রীশিক্ষা এবং বিধবা-বিবাহ বিষয়ে কয়েকটি পুস্তিকাও তিনি রচনা করেছিলেন।

[The Bharati (Telegu monthly), October, 1958 ; The Krishna Patrika (Telegu weekly), 26 October 1921 and 24 October 1925 ; The Andhra Patrika (Telegu daily), 27 and 29 September 1958 ; K. Iswara Dutt (Ed)—Andhra Souvenir ; G. Seetarama Sastri—Written Records of Saradaniketanam ; Personal Interview with Lakshminarayona's nephew, Nadimpalli Dasaradha Ramayya.]

(আর. নাগেশ্বর রাও) ভি. এন. হরিরাও

উন্নাওয়া লক্ষ্মীবায়াম্মা (১৮৮২-১৯৫৬)

Unnava Lakshmibayamma (1882-1956)

গুন্টুর জেলার (বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ) সথেনাপল্লী তালুকের আমিনাবাদ গ্রামে এক মধ্যবিত্ত নিয়োগী ব্রাহ্মণ পরিবারে 1882 সালে উন্নাওয়া লক্ষ্মীবায়াম্মা জন্মগ্রহণ করেন। নাদিমিপল্লী সীতারামাইয়া এবং লক্ষ্মম্মার তিনি ছিলেন চতুর্থ এবং শেষ সন্তান ; বাকী তিনজনের মধ্যে ছিল দুই পুত্র এবং এক কন্যা। সীতারামাইয়া ছিলেন গ্রামের করণম্ (হিসাবরক্ষক) এবং সকলের প্রিয়পাত্র। সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান হওয়ার জন্য লক্ষ্মীবায়াম্মা ছিলেন তাঁর পিতামাতার অত্যন্ত আদরের। তাঁরা তাঁকে প্রগতিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে গ্রামের বিদ্যালয়েও পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং প্রথাগত তেলেগু সাহিত্যের পরিচয় লাভ করেন।

দশ বছর বয়সে নিজ পছন্দে লক্ষ্মীবায়াম্মা উন্নাওয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে বিবাহ করেন। এটা ছিল সত্যিকারের আদর্শ বিবাহ। তিনি লক্ষ্মীনারাণকে শুধু পতি হিসাবেই গ্রহণ করেন নি, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শকেও তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি স্বামীর মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল ঔপন্যাসিক, লেখক এবং দার্শনিক লক্ষ্মীনারায়ণের প্রভাব। স্বামীর সমস্ত রকম ধ্যানধারণাকে লক্ষ্মীবায়াম্মা জনসভায় ভাষণের মাধ্যমে প্রচার করতেন। স্বামীর পরেই তাঁর মনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন গান্ধীজী। এর ফলে তাঁর বিদ্রোহী সত্তা পরিণত হয়েছিল বিপ্লবী সত্তায়। এছাড়া অন্যান্য যাঁরা তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের অন্যতম দুভ্‌ভুরি সুবায়াম্মা, পোনকা কনকাম্মা এবং যামিনীপূর্ণ তিলকম। অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিনগুলিতে তিনি এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থেকে কাজ করেছেন।

তাঁর চেহারা দেখে মনে হত তিনি আদর্শ 'দক্ষিণাদি' মহিলা (কৃষ্ণার দক্ষিণে গুন্টুর জেলার অভ্যন্তরে ব্যবহৃত শব্দ)। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়া—শারীরিক গঠন ছিল বলিষ্ঠ এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। জীবনের দীর্ঘকাল কঠিন এবং শ্রমসাধ্য কাজ করে, গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে, কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে এবং অভাব অনটন জনিত অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তাঁর দৃষ্টিতে এসে গিয়েছিল কাঠিন্যের ছাপ। কিন্তু আসল অন্তরের পরিচয়ে তিনি ছিলেন বোধশক্তিসম্পন্না দয়াদ্রচিত্তের অধিকারী মহিলা। অবশ্য জীবনের শেষের দিকে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন অনমনীয় এবং বাতিকগ্রস্ত। এমনকি 'সারদানিকেতনম' নামক প্রতিষ্ঠানটি যখন সাংঘাতিক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয় তখন তিনি মানসিক ভারসাম্য রাখতে পারেন নি। কিন্তু সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও তিনি ব্যর্থতার কাছে নতি স্বীকার করেন নি। একসময়, যখন তাঁকে এবং তাঁর স্বামীকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্ত রকম অনুষ্ঠানে তাঁদের যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, সে সময়েও অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণকে তিনি প্রতিহত করেছিলেন।

ভগবানে বিশ্বাসী হয়েও তিনি কিন্তু গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতেন না। হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি অন্য ধর্মের বিরোধিতা করেন নি। কুটীর শিল্প, খাদি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং হরিজনদের উন্নতি বিধানে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল। যদিও বিধবাবিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা এবং নারীদের জন্য রাজনৈতিক অধিকার অর্জন

ইত্যাদি সংস্কারমূলক কাজকর্মই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

জনহিতকর কাজকর্মের ক্ষেত্রে 1910, 1911, 1912 এই তিনটি বছর ছিল তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; তাঁর প্রথম পদক্ষেপ বিধবাবিবাহের প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজসংস্কারকমূলক কাজ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা গেল স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্যের জন্য আন্দোলনে যোগদান করে তিনি প্রাদেশিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন, এবং তাঁর তৃতীয় পদক্ষেপ হল অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে অন্ধ্রপ্রদেশের আন্দোলনকে জাতীয় রাজনীতির স্তরে উন্নীত করা। 1911 সাল থেকে 1942 সালের মধ্যে সর্বমোট ছ'বার তিনি কারাবরণ করেছিলেন। 1921, 1930 এবং 1942 সালে যথাক্রমে অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ এবং ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁকে অনেকদিনের জন্য কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল।

জনসেবার ক্ষেত্রে লক্ষ্মীবায়াম্মার প্রথম কর্মসূচী বিধবাবিবাহের প্রবর্তন। তাঁর স্বামী গুন্টুরের আরন্ডালপেটের বেন্দামুদি হনুমায়াম্মার পুনঃবিবাহ দিলে লক্ষ্মীবায়াম্মা পূর্ণ সহযোগিতা করেন। এই দিন থেকে প্রায় এক দশক ধরে সমাজ থেকে বিতাড়িত হলেও নিভীকভাবে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে স্বামীর কাজগুলি সমর্থন করে গিয়েছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় বহু বিধবার পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

1922 সালে অসহযোগ আন্দোলন, অন্ধ্র এবং অরণ্য সংরক্ষণ আন্দোলনে যোগদান করে তিনি মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। গান্ধীজী তাঁর মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি কংগ্রেসের নীতি ও কার্যক্রমের রূপায়ণে মেতে উঠলেন। 1913-1914 সালে অন্ধ্র নেতা কোনডা ভেঙ্কট আপ্পাইয়ার সমাজ সংস্কারকের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি অসহায় মহিলা, বিধবা এবং অনাথ বালিকারা যাতে সমাজে স্থান করে নিতে পারে সেইজন্য জেল থেকে মুক্তিলাভের পরই 1923 সালে তিনি গুন্টুরে প্রতিষ্ঠিত করলেন 'সারদানিকেতনম' নামে মহিলাদের একটি আবাসিক বিদ্যালয়। দশজন ছাত্রী নিয়ে কার্কান পুরুষোত্তমের বাড়ীতে শুরু হল এই বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন। আস্তে আস্তে শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করতেন। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে গ্রামবাসীরা যা টাকা দিতে পারে তিনি তাই সংগ্রহ করতেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই নিকেতনটি ব্রোদিপেট-এ নিজস্ব বাড়ীতে স্থানান্তরিত হল। জমি দিয়েছিলেন মুথিয়ালার রাজা এবং বাড়িগুলি তৈরী হয়েছিল কাশীনাথুনী নাগেশ্বর রাও পান্তুলুর দানে। তিন থেকে চার একর জমির উপর বিদ্যালয়ের বাড়ি তৈরী হল। ধর্ম, শ্রেণী, গোষ্ঠী নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতেন। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য যদিও ছিল জাতীয় এবং বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নতিসাধন কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত, তেলেগু এবং হিন্দী শিক্ষা এবং হাতের কাজ শিক্ষার প্রতি। হাতের কাজ ছিল—তাঁত বোনা, বেতের কাজ, চরকা চালানো, কুরুশের কাজ, সেলাই, ছবি আঁকা ; এছাড়া সঙ্গীতও শিক্ষা দেওয়া হত। বিদ্যালয় থেকে নিজস্ব ডিগ্রী প্রদান করা হত, যেমন 'সহিতি' এবং 'বিদুষী'। প্রথমে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, পরে জনসাধারণের দাবিতে ইংরাজিও পড়ানো হতে থাকে। ত্রিশের দশকে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিদ্বান ওরিয়েণ্টাল ডিগ্রীর' জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। 1944 সালে প্রতিষ্ঠানটি অন্ধ্রের ওয়ালটেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রধান চত্বরের বাইরে, এই প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানে ছিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিল্প শিক্ষার পাঠ্যসূচী সমেত একটি হাইস্কুল, এবং একটি প্রাচ্য বিদ্যালয়। প্রকাশম মন্ত্রীসভার আমলে রেপালেতে প্রতিষ্ঠানটি পঁচিশ একর জলাজমি এবং নিরানব্বুই একর শুখা জমির সম্পত্তি অর্জন করেছিল। অনেক অনাথ ছেলেমেয়ে এই বিদ্যালয়ে বড় হয়েছিল। গঠনমূলক কাজকর্মে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গড়ে উঠেছিল।

1948 সালে বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়েছিল বৃহদাকারে। এখানকার সমস্ত প্রাক্তন ছাত্ররা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। এরা লক্ষ্মীবায়াম্মাকে ডাকত 'আম্মা' বলে।

একইভাবে লক্ষ্মীবায়াম্মা সক্রিয় ছিলেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র গড়ে ওঠে প্রথম 1911 সালে যে সময় তিনি বাপটলায় অনুষ্ঠিত প্রথম অন্ধ্র রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগদান করেন। 1921 সালে তিনি অরণ্য আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল পালনাদ অঞ্চলে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনি আন্দোলনের

নেত্রী ছিলেন। 1922, 1930 এবং 1942 সালে তিনি সমগ্র অন্ধ্র রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। জনসাধারণকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি শত শত জনসভায় ভাষণ প্রদান করেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় নেলোর টাউন হলে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সারদানিকেতনমের নামেমাত্র অভিভাবক এবং ট্রাস্টি হয়ে রইলেন। অসুস্থতা এবং বার্ধক্যের কারণে শারীরিক ভাবে তিনি এতবেশী অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন যে অতীতের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। নানা কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরিচালনায় দক্ষতার অভাব, হিসাবপত্র সঠিক রাখার ব্যাপারে ঔদাসীন্য এবং প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে নিজের সত্তাকে স্থান দেওয়ার জন্য লক্ষ্মীবায়াম্মা শেষ জীবনে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। বহু বাদবিতণ্ডার পর প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার অধিগ্রহণ করেন।

তা সত্ত্বেও আদর্শপ্রাণা মহিলা নেত্রীরূপে অন্ধ্রপ্রদেশে তিনি শ্রদ্ধার আসন দাবী করতে পারেন। সারদানিকেতনমের বাসিন্দাদের মনে এখনও তাঁর স্মৃতি অক্ষুণ্ণ। তিনি ছিলেন অকৃত্রিম দেশপ্রেমী। সারাজীবন তিনি খাদি পরিধান করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে গান্ধীজির আদর্শ অনুসরণ করেছেন। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর 1956 সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

[K. Iswara Dutt—Andhra Souvenir ; G. Seetarama Sastri, V. Venkata Ramana Rao and Venkata Seetamma—Written Records of Saradaniketanam ; Basavaraju Appa Rao—Sri Andhra Ratna Dutulu ; The Bharati (a Telegu monthly), October 1958 ; The Krishna Patrika (a Telegu weekly), 26 October 1921 and 24 October 1925 ; Personal interviews of the Research Fellow with Lakshmibayamma's nephew Nadimapalli Dasaradha Ramayya and her adopted daughter, U. Katyaini.]

(আর নাগেশ্বর রাও) পি. ঝান্সি লক্ষ্মী

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যানার্জী)

(১৮৭৯-১৯৫০)

Upendranoth Banerjee (1879-1950)

1879 সালের 6 জুন চন্দননগরের (হুগলী জেলা) গোন্দলপাড়ার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতা রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ অঞ্চলের উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উপেন্দ্রনাথের তিন ভাই—গোপেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথ। 1904 সালে তিনি কলিকাতার অখিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা নলিনীবালা দেবীর সঙ্গে (1889-1953) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

উপেন্দ্রনাথ চন্দননগরের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। ম্যাট্রিক পাশের পর তিনি ডুপ্লেক্স কলেজে ভর্তি হন ও ঐ কলেজ থেকেই এফ. এ পাশ করে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ শিক্ষা অর্ধসমাপ্ত রাখেন। এই সময় তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন ও সাধারণ সাধু রূপে আশ্রমে যোগদান করেন। স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপেন্দ্রনাথ ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। সন্ন্যাসজীবনের প্রাথমিক পর্বে তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী এবং বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। তিনি অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল এবং সি. আর. দাশের ন্যায় বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত ও অন্যান্য সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সৌহার্দ্য উপেন্দ্রনাথকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে। এমন কি, তাঁর পরবর্তীজীবনের কর্মধারাকেও নিয়ন্ত্রিত করে।

বহু দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে উপেন্দ্রনাথ চন্দননগরে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথমে ভদ্রেশ্বর বিদ্যালয়ে ও পরে চন্দননগর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন (1903-1904)। এরপর শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে তিনি সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ তিনি জাতীয় আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীতে কর্মরত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে জড়িত হন ও সক্রিয় সদস্যে পরিণত হন। তিনি নিয়মিতভাবে 'সন্ধ্যা',

'কর্মযোগিন' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় লিখতেন। 1908 সালে মুরারিপুকুর বোমা মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। 1909 সালে 12 ডিসেম্বর অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তিনিও আন্দামানে নির্বাসিত হন।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন বলবৎ হলে, রাজবন্দীদের সাধারণভাবে মুক্তিদানের প্রস্তাব ঘোষিত হয়। ফলে 11 বছর কারাবাসের পর উপেন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি 'বিজলি' ও 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীতে যোগদান করেন। 1922 সালে তিনি 'আত্মশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক হন। তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পরিবর্তনপন্থী দলকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন ও 1923 সালে পুনরায় কারাবরণ করেন। মুক্তিলাভ করে তিনি সি. আর. দাশের স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন এবং দলের মুখপাত্র 'স্বদেশ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 1926 সাল থেকে তিনি 'ফরওয়ার্ড' ও 'লিবার্টি' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যুক্ত হন। 1933 সাল থেকে তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন এবং 1945 সালে 'দৈনিক বসুমতীর' সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সাংবাদিক উপেন্দ্রনাথ তাঁর পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও জনসেবামূলক ও রাজনৈতিক কাজেও সমান অংশগ্রহণ করতেন। 1933-34 সালে কলিকাতার পৌরসভার কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্যরূপে, পরে স্বরাজ্য পার্টির সদস্যরূপে এবং সবশেষে হিন্দু মহাসভার নেতারূপে তিনি বহু ভাষণ দেন। তিনি দেশ বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি মহাসভার সংগে যুক্ত ছিলেন। 1949 সালের ডিসেম্বর-এ হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে তিনি চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সাহিত্য কীর্তির কথা উল্লেখ না করলে উপেন্দ্রনাথের জীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সংবাদপত্রের কাজে সদাব্যস্ত উপেন্দ্রনাথের অবসর সময় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, যেমন—'নির্বাসিতের আত্মকথা', 'উনপঞ্চাশী', 'জ্যোতির বিড়ম্বনা', 'ধর্ম ও কর্ম', 'ভবঘুরের চিঠি' ইত্যাদি।

উপেন্দ্রনাথের জীবনে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে। যিনি ছিলেন বিপ্লবী, জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তিনিই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে আকৃষ্ট হন। তবে তিনি সমগ্র জীবনব্যাপী জাতীয়তাবাদের আদর্শে একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কখনও বিলাতযাত্রা করেন নি। কিন্তু সর্বদাই ইউরোপের ইতিহাস পাঠ করতে ভালবাসতেন। ইংরাজী সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ইংরাজী শিক্ষা এদেশে প্রচলিত করার সমর্থক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার জন্য উপেন্দ্রনাথ সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এবং গান্ধীজীর 'নয়া তালিম' সূচীকে সমর্থন করতেন। উদার মতাবলম্বী উপেন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদপ্রথাকে ঘৃণা করতেন ও নারী প্রগতির সমর্থক ছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদের আদর্শের কোথাও সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদের স্থান ছিল না। তিনি স্বাধীনতা চেয়েছেন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই। বৃটিশ শাসনব্যবস্থার উচ্চপর্যায়ে যে অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য ছিল, সেজন্য তিনি বৃটিশ সরকারকে সমালোচনা করেছেন ও সঠিক পথে শিল্পোন্নতি করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। দেশকে স্বনির্ভরশীল করতে হলে সরকারের উচিত দেশীয় শিক্ষাপ্রসারে উৎসাহ প্রদান করা এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত। তাঁর ধর্মীয় মতামতও ছিল বিশিষ্ট ও অনন্য। ধর্মান্ধতাকে তিনি কখনই সমর্থন করেন নি বরং তাঁর মতে ধর্ম জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্মকে পরিহার করে ভারতবর্ষে কোন কিছুই করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। পরে যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে ধর্মের পথই একমাত্র পথ নয়, তিনি শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করলেন এবং ছাত্রদের মধ্যে স্বাদেশিকতার আদর্শ ও বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদী ধর্মের প্রধানতম লক্ষ্য স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা।

তাঁর জীবন ছিল সহজ, অনাড়ম্বর ও বীরত্বব্যঞ্জক। তিনি একাধারে শিক্ষক, প্রচারক ও রাজনৈতিক কর্মী। উপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে আমরা একই সঙ্গে শক্তিধর সমালোচক, সাংবাদিক ও জাতীয়তাবাদীর অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাই।

[Jadu Gopal Mukherjee,—Biplabi Jibaner Smriti ; Upendra Nath Banerjee

Granthabali (Basumati Sahitya Mandir) ; Bharat Kosha, Vol. I ; Dainik Basumati Suvarna Jayanti Smarak Grantha ; Jibani Abhidhan, edited by Sudhir Chandra Sarkar ; Suprakash Roy,—Bharater Baiplabik Sangramer Itihash ; Amrita Bazar Patrika, 6 April 1950 ; Ananda Bazar Patrika 6 April 1950.]

তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (স্যার) (১৮৭৫—১৯৪৬)
Upendra Nath Brahmachari (Sir)
(1875-1946)

1875 সালের 7 জুন তারিখে উত্তর বিহারের বিখ্যাত রেলওয়ে শহর জামালপুরে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নীলমণি ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের একজন চিকিৎসক এবং মায়ের নাম ছিল সৌরভ সুন্দরী দেবী। ডাঃ নীলমণি ছিলেন একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক এবং উপেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর চার ছেলের মধ্যে দ্বিতীয়। মূলতঃ এই বংশের আদি বাসস্থান বর্ধমান জেলার সারদেঙ্গা গ্রামে এবং এঁরা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার—গোপাল ভারতী ব্রহ্মচারী ঠাকুরের বংশধর। উপেন্দ্রনাথের বয়স যখন পঁচিশ তখন ননীবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই দম্পতি দুই পুত্র এবং দুই কন্যা সন্তান লাভ করেন। পুত্রদ্বয় অতিশয় মেধাবী ছিলেন। ননীবালা ছিলেন সহজাত গুণসম্পন্না মহিলা, সুদক্ষা গৃহকর্ত্রী এবং উপেন্দ্রনাথের যোগ্য সহধর্মিনী। ভরদ্বাজ গোত্রীয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের যথাযথ উত্তরসূরী উপেন্দ্রনাথের শিক্ষায় শিক্ষকতা, গবেষণা, আচার-আচারণে, ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দয়ার্দ্রতা এবং বদান্যতায় সর্বত্রই প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রয়োজনীয় গুণসমূহ বিদ্যমান ছিল।

উপেন্দ্রনাথের শিক্ষা শুরু হয় জামালপুরের ইষ্টার্ন রেলওয়েজ বয়েজ স্কুলে এবং বাল্যকাল থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় দেন। জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তিনি সাহিত্যের অনুরাগী হলেন। ইংরাজীতে তিনি অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। 1893 সালে তিনি হুগলী কলেজ থেকে গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি Thwyates পদক লাভ করেন। এরপর ইনি স্থির করেন যে পিতার প্রদর্শিত পথে অর্থাৎ ভেষজ-বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করবেন। 1894 সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন। এই সময় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শ তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। 1899 সালে ইনি এল. এম. এফ. ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরের বছরই চ্যালেঞ্জে স্বরূপ এম. বি. চিকিৎসাশাস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় প্রথম স্থান পেয়ে গুদিভ ও ম্যাকলাওড পদক লাভ করেন। 1902 সালে উপেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। এখান থেকেই 1904 সালে ফিজিওলজিতে গবেষণা করে Studies in Haemolysis-এর জন্য তিনি পি. এইচ. ডি ডিগ্রী পান। বিশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উপেন্দ্রনাথ ছাড়া সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতবর্ষে কেউ সেই সময় 'মেডি-সিনের উপর ডক্টরেট লাভ করেন নি।

1899 সালে তিনি প্রাদেশিক চিকিৎসা বিভাগে যোগদান করেন এবং শীঘ্রই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মের জন্য 1901 সালে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে প্যাথোলজি ও মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক এবং চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। এখানে তিনি মেডিকেল স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ নেল ক্যাম্পবেলের সঙ্গে কাজ করেন। 1905 সালে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভেষজবিদ্যার শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ইনিই প্রথম চিকিৎসক যিনি এখানে দীর্ঘ 20 বছর অতিবাহিত করেছিলেন। শিক্ষকতায় অসা-ধারণ দক্ষতার জন্য তাঁকে বলা হয়—'দি লিভিং ডিক-সনারি অব মেডিসিন' বা চিকিৎসাবিদ্যার জীবন্ত অভিধান। 1923 থেকে 1927 সাল পর্যন্ত ইনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত চিকিৎসকের পদ অলংকৃত করে প্রথম নন-আই. এম. এস রূপে সম্মানিত হন। 1901 সালে উপেন্দ্রনাথ তাঁর 'কোয়ারাণ্টাইন ফিভার ইন বেঙ্গল' আবিষ্কারের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি 'ট্রপিক্যাল ডিজিজ' এবং পৃথকভাবে প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের সম্পর্কে গবেষণায় রত হন। ঐ সময়ে যখন কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে শতকরা 98 জন লোকের প্রাণহানি ঘটতো তখন কালাজ্বর বিষয়ে বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধান চলছিল। 1913 সাল থেকে 'টার্টার ইমেটিক' প্রয়োগের দরুন কিছুটা সুফল ফলতে

থাকে। উপেন্দ্রনাথ আরও ভাল ফল পাবার আশায় তার পরিবর্তে সোডিয়াম সল্টের ব্যবহারের কথা চিন্তা করেছিলেন। সুদীর্ঘ সাত বছর নিরলস গবেষণার ফলে তিনি অবশেষে কালাজ্বরের শক্তিশালী প্রতিষেধক রূপে একটি ঔষধ আবিষ্কার করলেন যার নাম দিলেন 'ইউরিয়া স্টিবেমাইন'। ব্রহ্মচারীর মতে ইউরিয়া স্টিবেমাইন হল এ্যামিনোফিনাইল স্টিবেনিক এ্যাসিড (C_7H O_4N_8SB)। প্রতিকূল অবস্থা, সীমিত আর্থিক সহায়তা এবং প্রযুক্তি বিদ্যার সহায়তায় তিনি যেভাবে এই দুঃসাধ্য সাধন করলেন তা সমগ্র জাতির কাছে বিস্ময়ের বিষয়। তারপর তিনি কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং কিছু পরেই তা সারা বিশ্বে কালাজ্বরের প্রতিষেধকরূপে গৃহীত হল। যেরূপ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে, আর্থিক অপ্রতুলতা', বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতির অভাব সত্ত্বেও তিনি গবেষণায় সিদ্ধকাম হয়েছিলেন তা বিস্ময়ের বিষয়। ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারও তাঁর আর এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

ডঃ ব্রহ্মচারী ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক। তিনি বেশ কিছু বই এবং ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে পরিচালিত বিজ্ঞানভিত্তিক ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনামূলক সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর রচিত বই-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'Kala-azar and its Treatment,' 'Treatise on Kala-azar' এবং 'Gleanings From my Research'। কালাজ্বরের উপর তাঁর গবেষণা কর্মের জন্য 1924 সালে ইনি 'কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক লাভ করেন। উপেন্দ্রনাথ বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে তিনবার তিনি সভাপতির পদ অলংকৃত কতেন।

তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণশীল মন তাঁকে বাইরের জগতে একজন বিশেষ নিদানিক হিসাবে পরিচিত করিয়েছিল। নিজেকে একান্তভাবে কাজে নিযুক্ত করে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভোর থেকে রাত একাগ্রমনে কাজ করে গেছেন। অফিস সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করেছেন, গবেষণার কাজ দেখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজকর্ম নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন আবার সমানভাবে চিকিৎসকরূপেও প্রচুর পসার জমিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব বদরাগী প্রকৃতির মানুষ হলেও ছাত্রদের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর স্নেহ। অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে জীবনযাপন করতেন। ধর্মীয় বিশেষ কোন আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না।

যে কোন বিষয় নিয়ে পড়াশুনার অতিমাত্রিক আসক্তি তাঁর বাড়ীতে তাঁকে একটি লাইব্রেরী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এবং লাইব্রেরীটি ছিল উপেন্দ্রনাথের চিরসঙ্গী। প্রৌঢ় বয়সে তিনি উদ্যান রচনাকে সখ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং লাউডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে সুন্দর একটি বাগান তৈরী করেন। সেখানে অর্কিড, ক্যাকটাস ও ফার্নজাতীয় গাছের সমৃদ্ধ সংগ্রহ ছিল। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন লোকহিতৈষী ব্যক্তি এবং বহু প্রতিষ্ঠান যেমন বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

1946 সালের 6ই ফেব্রুয়ারী ডঃ ব্রহ্মচারী 71 বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। ভারত তথা বিশ্ব মানচিত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক এবং 'কেমিওথেরাপিউটিক' গবেষক হিসাবেই তাঁর প্রতিভার বিশিষ্টতা। তিনিই প্রমাণ করলেন যে, ভারতবাসী ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার দ্বারাই প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

1911 সালে উপেন্দ্রনাথ তাঁর বহুবিধ লোকহিতকামী কর্মের জন্য প্রথমে রায়বাহাদুর উপাধি এবং পরে নাইটহুড লাভ করেন। তিনি তাঁর জীবনে যেমন বহু পুরস্কার, পদক এবং সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন তেমনি সম্মানিত হয়েছিলেন অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি লাভ করেছিলেন শ্রদ্ধা ও প্রীতি।

স্যার উপেন্দ্রনাথের একটি আবক্ষমূর্তি এশিয়াটিক সোসাইটির কক্ষে বর্তমান। অপর আবক্ষমূর্তি ক্যালকাটা স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর প্রধান সিঁড়ির পাশে এবং একটি ফলক ক্যাম্পবেল হাসপাতালের (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল) দেয়ালে দেখা যায়।

[Information collected from interview with Dr. P. N. Brahmachari, the eldest son of Sir U. N. Brahmachari and from the biography of his father written by Dr. P. N. Brahmachari]

ডঃ এস: বোস

উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭)

Umesh Chandra Dutt (1840-1907)

1840 সালে 16 ডিসেম্বর চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুরের এক কায়স্থ পরিবারে উমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম হয়। দত্ত-পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল বারাসতে। তাঁর পিতার নাম হরমোহন দত্ত, মাতার নাম সর্বমঙ্গলা। তাঁদের পাঁচটি সন্তান—তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। মজিলপুরের জমিদার হরমোহনের পিতাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। হরমোহন সেই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল না হলেও, সততা ও নিষ্ঠার জন্য তাঁদের পরিবারের খ্যাতি ছিল। 1867 সালে উমেশচন্দ্রের বিবাহ হয় কৈলাসকামিনী দেবীর সংগে। তিনি বর্ধমান জেলার একচাকা গ্রামের অধিবাসী ভুবনমোহন দেবসরকারের দ্বিতীয়া কন্যা।

প্রথম জীবনে উমেশচন্দ্রকে নানা দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করে তিনি মজিলপুরের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু মাত্র দশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হয়ে কিছুদিনের জন্য তিনি লেখাপড়া বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। তিনি পুনরায় শিক্ষা শুরু করেন মুক্তারাম পাঠশালায়। পরে মজিলপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়েই তিনি যাদববাবু ও চন্দ্রবাবুর ন্যায় শিক্ষকদের নিকট শিক্ষালাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। শিক্ষক শিবকৃষ্ণ বাবুর নিকটও তিনি প্রাইভেটে শিক্ষা গ্রহণ করেন। 1859 সালে তিনি কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে London Missionary Society's Institution-এ ভর্তি হন এবং প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এই সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন। সমগ্র পরিবারের প্রতিপালনের দায়িত্ব বহন করতে উমেশচন্দ্রকে কলেজের পড়া ত্যাগ করতে হয়। অর্থোপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে উমেশচন্দ্র 1864 সালে এফ. এ. ও 1867 সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জীবনের প্রারম্ভে উমেশচন্দ্র পিতামাতার দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হন। তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। মেডিকেল কলেজে থাকাকালীন উমেশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং কেশব চন্দ্র ও দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হন। ফলে 1859 সালে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি রাজনারায়ণ বসু, আনন্দমোহন বসু ও রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি স্বনামধন্য মনীষীর সংস্পর্শে আসেন। উমেশচন্দ্র রামতনু লাহিড়ীকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। রামতনু লাহিড়ীও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য উমেশচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

তাঁর বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের প্রথম প্রকাশ সূচিত হয় 1862 সালে, যখন তিনি জয়নগর বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। 1863 সালে এই বিদ্যালয় ত্যাগ করে তিনি "Calcutta Training Academy"-তে সাময়িকভাবে নিযুক্ত হন। এর পর হিন্দু স্কুলের শিক্ষক হন। 1864 সালে চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুরের নিবুধই মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। 1866 সালে এই বিদ্যালয় ত্যাগ করে তিনি দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে রাজপুর বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। 1867 সালে তিনি হরিনাভি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। কিন্তু 1869 সালের শেষ দিকে এই বিদ্যালয়ও ত্যাগ করেন। তারপর তিনি 1870 সালে কোন্নগর হাইস্কুলে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং 1874 সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করেন। 1879 সালে তিনি সিটি স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। 1881 সালে বিদ্যালয়টি কলেজে রূপান্তরিত হলে উমেশচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই দায়িত্ব বহন করেন।

প্রধানতঃ শিক্ষকতা করলেও, উমেশচন্দ্রের কর্মজীবনে অন্তর্ভুক্ত ছিল আরও একটি অধ্যায়। তিনি একাধারে লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন। তিনি ফরাসী ঐতিহাসিক উপন্যাস "Piceiola"-র বাংলা অনুবাদ করেন "কারা কুসুমিকা" নামে। 1859 সালে তিনি "রোমের ইতিহাস" রচনা করেন। "নারী শিক্ষা" নামে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক 1884 সালে তিনি প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে নারী শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশনা বর্ণিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর কাব্যগ্রন্থ "পুষ্পমালা"র ভূমিকা লেখেন উমেশচন্দ্র।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর সমান দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। 1863 সাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় চল্লিশ বছর তিনি মহিলা পত্রিকা "বামা বোধিনী"র সম্পাদনা করেছেন। দেশে নারীশিক্ষা ও প্রগতির প্রসার করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। এরই সঙ্গে 1872 সালে তিনি "ধর্মসাধন" নামে অপর একটি বাংলা সাপ্তা-

হিকের সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাটি কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী বন্দের মুখপত্র ছিল এবং নিয়মিতভাবে "ব্রাহ্মমন্দির" ও "সংগত সভার" কার্যবিবরণী প্রকাশিত হত। মজিলপুরের কালীনাথ দত্তের সহযোগিতায় তিনি অপর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় "ভারত সংস্কারক" নামে 1280 বঙ্গাব্দের 7 বৈশাখে। কয়েক বৎসর তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

পরবর্তীকালে উমেশচন্দ্র সমাজসেবকরূপে খ্যাতি-লাভ করেন। বহুবিধ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। 1893 সালে বহু প্রচেষ্টার পর তিনি কলকাতায় মূক-বধির বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যায়তনের সেক্রেটারী রূপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কাজ করেন। 1894 সালে ভোলাগিরি এই বিদ্যায়তন পরিদর্শন করে মোহিত হন। বিকলাঙ্গ শিশু ও বালক-বালিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এই শিক্ষায়তনের অবদান ও খ্যাতি শুনে ভোলাগিরি এখানে আসেন। পূর্বে তাঁর সঙ্গে উমেশচন্দ্রের পরিচয় হয়েছিল। উমেশচন্দ্র দেশে নারী শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিজ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে কলকাতার বেনিয়াটোলায়ও তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মদ্যপান নিষিদ্ধ-করণের জন্য তাঁর বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই উদ্দেশ্যে তাঁরই প্রচেষ্টায় "মেট্রোপলিটন টেম্পারেন্স্ অ্যান্ড পিওরিটি সোসাইটি" গঠিত হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন। কবি মধুসূদন দত্তের সমাধিতে স্মৃতি-ফলক নির্মিত হয়েছিল তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও উদ্যমে। 1888 সালের 1 ডিসেম্বর এই স্মৃতি-ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন মনোমোহন ঘোষ। দরিদ্র ও দুঃস্থ জনের সেবায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। দুর্ভিক্ষের সময় বহু নরনারী তাঁরই প্রচেষ্টায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

সমাজের উন্নতিবিধানে সদাব্যস্ত উমেশচন্দ্র বহু সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 1869 সালে তিনি হরিনাভিতে একটি ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপন করেন। "বামা বোধিনী সভার" তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য ছিলেন। কলকাতার বেথুন কলেজের কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে দীর্ঘকাল তিনি কাজ করে গেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটেরও তিনি সদস্য ছিলেন। 1903 সালে 24 ডিসেম্বর উমেশচন্দ্র লুপ্তপ্রায় "মজিলপুর জয়নগর হিতৈষিনী সভার" পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

'সহজ, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও মহৎ আদর্শের' মূর্ত প্রতীক ছিলেন উমেশচন্দ্র। উদার মনোভাবাপন্ন উমেশচন্দ্র তাঁর সমগ্র জীবন সমাজ সেবায় উৎসর্গ করেছেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। চিরদিন জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর এই ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হওয়ার কারণে কিছু কিছু অনুষ্ঠানে উমেশচন্দ্র ব্রাহ্ম-বিরোধীদের কাছে শাস্তি ভোগ করেন। কিন্তু এর জন্য কোনও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না। 1862 সালে জয়নগরের জমিদার উমেশচন্দ্রকে তাঁর পৈতৃক বিষয় থেকে বঞ্চিত করেন যেহেতু তিনি তাঁর পিতামহীর শেষকৃত্য ব্রাহ্ম ধর্মানু-যায়ী সম্পন্ন করেছেন। একই কারণে "জয়নগর স্কুলের" শিক্ষকতাও তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। পুনরায় 1869 সালে হরিনাভি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে উমেশচন্দ্র ইস্তফা দিতে বাধ্য হন, কেন না দ্বারকা-নাথ কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীদের সুনজরে দেখতেন না।

উমেশচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজেও ইংরাজি ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়ো-জনীয়তা সম্পর্কেও তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করলেও, সমসাময়িক সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। নিঃস্বার্থ ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ উমেশচন্দ্র সম্পর্কে স্যার আশুতোষ ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন যে—"নীরবে, শান্তভাবে, সবার অগোচরে কোনরূপ প্রত্যাশা না রেখে উমেশচন্দ্র শিক্ষকতা করে গেছেন।"

[Sahitya Sadhak Charitmala, No. 98, Vol. IX ; Jogesh Chandra Bagal—Muktir Sandhane Bharat ; Shibnath Shastri—Ramtanu Lahiri O Tatkalin Banga Samaj ;—Atma Charita ; Pandit Tara Kumar Kaviratna—Swargiya Umesh Chandra Shradhanjali ; Hundred Years of the University of Calcutta ; Jibani

of the University of Calcutta. Jibani Abhidhan, edited by Sudhir Chandra Sarkar.]

(পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যানার্জী) উমেশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯০৬)
Bonnerjee, Woomesh Chandra (1844-1906)

1844 সালের 29 শে ডিসেম্বর কলকাতার সোনাই খিদিরপুরে এক অভিজাত উচ্চ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল হাওড়া জেলার বাগন্দাতে। তাঁর পিতা গিরীশচন্দ্র একজন আইনজীবী ছিলেন। তাঁকে 'প্রিন্স অব এ্যাটর্নীজ' বলা হত। তাঁর মাতা সরস্বতী দেবী বিখ্যাত আইনজ্ঞ জয়নারায়ণ তর্কালংকা-রের প্রপৌত্রী ছিলেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যাবতীয় আইন সংক্রান্ত বিষয়ে জয়নারায়ণ পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। উমেশচন্দ্রের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁর মাতা সরস্বতী দেবী সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। উমেশচন্দ্রের পাঁচ ভগ্নী এবং এক ভ্রাতা ছিলেন।

উমেশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব শুরু হয় হরেরাম গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির একটি শাখাতে ভর্তি হন ও পরে সেমিনারির প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্র হন। হিন্দু স্কুল থেকে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন ও অকৃতকার্য হন। 1859 সালে মাত্র পনেরো বছর বয়সে বউবাজারে বিশ্বনাথ মতিলালের পৌত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে উমেশচন্দ্রের বিবাহ হয়। তিনি চার পুত্র ও চার কন্যার জনক হন।

1862 সালে কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের এ্যাটর্নী ডব্লিউ. পি. গিলান্ডারস্-এর ফার্মে কেরানী রূপে উমেশচন্দ্র নিযুক্ত হন। এই খানেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এই পদে কর্মরত উমেশচন্দ্র আইন সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর কর্ম-জীবনে এই আইন সংক্রান্ত জ্ঞান খুবই কাজে লাগে। 1864 সালে তাঁকে বিলাতে পাঠান হয়। তিনি ছাত্রবৃত্তি নিয়ে মিডল টেম্পল কলেজে ভর্তি হন। 1867 সালে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। 1868 সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার স্যার চার্লস পলের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেন। ব্যারিস্টার জে. পি. কেনেডিও তাঁকে প্রতিষ্ঠিত হতে বিশেষ সাহায্য করেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই উমেশচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত ও জনপ্রিয় ব্যারিস্টারে পরিণত হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি স্টান্ডিং কাউন্সেল রূপে কাজ করেন এবং চারবার তিনি এই পদে নিযুক্ত হন। 1883 সালে আদালত অবমাননার অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। উমেশচন্দ্র এই মামলায় সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ অবলম্বন করেন।

ধর্ম সম্বন্ধে উমেশচন্দ্রের কোন গোঁড়ামি বা অন্ধ সংস্কার ছিল না। হিন্দু হয়েও তিনি তাঁর পত্নীকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে সম্মতি দেন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী। তিনি বাল্য বিবাহ প্রথার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন এবং সর্বদা এই মত ব্যক্ত করতেন যে সমাজে যথাযোগ্য মর্যাদার আসন লাভ করার জন্য মহিলাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু একথা তিনি কখনই বিশ্বাস করতেন না যে সমাজ সংস্কার ব্যতিরেকে রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন যেহেতু আমাদের বিধবা রমণীর পুনর্বিবাহ হয় না, আমাদের দেশের মেয়েদের বিবাহ হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অল্প বয়সে, আমাদের স্ত্রী ও মেয়েরা পর্দান-শীন, তারা আমাদের সংগে ঘরের বাইরে যায় না, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে আমরা তাদের পাঠাই না, সেইজন্য কি আমরা রাজনৈতিক অধিকার লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হব না?' (সভাপতির ভাষণ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, 1892)।

উমেশচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন এবং উচ্চ শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ার সরকারী নীতিকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সরকারের উচিত সর্বপ্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। জনগণের স্বার্থে সর্বপ্রকার শিক্ষাখাতে সরকারের কর্তব্য সাধ্যমত রাজস্ব ব্যয় করা। শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষাখাতে নয়, কারিগরী বিদ্যার সকল বিভাগে ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারের সমান অর্থব্যয় করা উচিত। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন এবং 1884 সালে আইন বিভাগের সভাপতি নিযুক্ত হন। 1894-95 সালে তিনি বাংলাদেশের আইন পরিষদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

উমেশচন্দ্র অল্প বয়সেই রাজনীতিতে আগ্রহী হন এবং নরমপন্থী মতাদর্শে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। বিলাতযাত্রার পূর্বে তিনি গিরীশচন্দ্র ঘোষকে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করেন। মাসিক মাত্র কুড়ি টাকা প্রাপ্তির বিনিময়ে তিনি এই পত্রিকাতে সাপ্তাহিক সংবাদের সংকলন প্রকাশ করতেন। তিন বছর তিনি এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। বিলাতে ছাত্রাবস্থায়ও তিনি রাজনৈতিক কার্যাবলী অব্যাহত রেখেছিলেন। 'লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোস্যাইটি' (যেটি পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের সংগে যুক্ত হয়ে যায়) গঠনে উমেশচন্দ্র প্রভূত সাহায্য করেন।

1885 সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। 1886 সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি প্রস্তাব করেন যে দলীয় সংহতির স্বার্থে প্রতিটি প্রদেশে কংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হোক। এই অধিবেশনেই তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব অন্য সংস্থার উপর অর্পণ করে কংগ্রেসের উচিত রাজনৈতিক বিষয়েই শুধুমাত্র মনোযোগ সন্নিবেশিত করা। তৎকালীন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে উমেশচন্দ্র তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত আমরা আইন পরিষদের বিতর্কে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকব, ততদিন পর্যন্ত সরকারকে কখনই 'দায়িত্বশীল' এই আখ্যা দেওয়া যায় না। আমি বারংবার বলেছি যে যাঁরা আমাদের শাসন কার্যের দায়িত্ব বহন করছেন, আমাদের ভাইসরয়-গভর্নর, লেফটেনাণ্ট গভর্নর ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ সকলেই নিজেদের স্বার্থে ও জনগণের স্বার্থে কমবেশি সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য সচেষ্ট। কিন্তু সমগ্র শাসনব্যবস্থাই এত দূষিত ও ত্রুটিপূর্ণ যে কেউই কোন যথার্থ কল্যাণ সাধন করতে পারছেন না। বর্তমান আইন পরিষদের দ্বারাও কোন উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে না। কেননা, এই পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই সরকার কর্তৃক মনোনীত ও ইংরাজি ভাষায় অজ্ঞ। অথচ পরিষদের কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে ইংরাজি ভাষায়। ফলে, অতি সহজেই সরকার নিজের খুশিমত প্রস্তাব পাশ করাতে পারছেন। সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ একযোগে ভোট প্রদান করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জনগণের আপত্তি সত্ত্বেও যে কোন প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছেন।' বৃটিশ রাজনীতির ইতিহাস থেকে তথ্য উদ্ধৃত করে উমেশচন্দ্র দেখালেন যে জনপ্রতিনিধিত্ব ব্যতিরেকে রাজস্ব আদায় ও নির্ধারণ করা কোনমতেই চলতে পারে না। শাসন ব্যবস্থায় ভারত সচিবের হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক এবং কখনই দেশের পক্ষে শুভপ্রদ হতে পারে না। তিনি বলেন 'আমার মনে হয়, ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভারত সচিবের কোনরকম ধারণাই নেই। ভারতীয় কর্মচারীদের প্রস্তাব ও উপদেশের উপরই নির্ভর করে তাঁকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। এমন কোন শাসনতান্ত্রিক উপায়ও নেই যার সাহায্যে তিনি এই সকল কর্মচারীদের প্রেরিত বিবরণীর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারেন।'

অবশ্য উমেশচন্দ্র বৃটিশ রাজত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। 1888 সালে ইংলণ্ডের ওয়েনব্লিটের এক জনসভায় তিনি বলেন, 'ইংলণ্ডের প্রতি আমার দেশবাসীর অন্ধ আনুগত্য আছে। প্রয়োজনে ইংলণ্ডবাসীর সংগে একযোগে সংগ্রাম করে যে কোন বৈদেশিক অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করে ভারতে তারা বৃটিশ শাসন বজায় রাখতে প্রস্তুত।' অপর একটি জনসভায় তিনি বলেছেন, 'ভালো বা মন্দ যাই হোক, তোমাদের সঙ্গে ভারত আবদ্ধ। এতদিন শাসন করে এখন তোমরাও তাকে ছেড়ে দিতে পার না। আর ভারত স্বেচ্ছায় কখনই তোমাদের ছেড়ে যাবে না।' তিনি কখনই চিন্তা করতে পারতেন না যে ভারত ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কংগ্রেস সংগঠনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যে প্রতিফলন ও প্রকাশ ঘটেছে, তাঁর মতে, সেটা বৃটিশদের 'শুভকর্মের ফলশ্রুতি'। 'বৃটিশ অধ্যাপকগণ ইংলণ্ডের গৌরবময় শাসনব্যবস্হা সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, বৃটিশ ব্যবসায়ীরা দেখিয়েছেন কত ভালভাবে আমাদের দেশীয় উৎপাদিত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করা যায়, বৃটিশ প্রযুক্তিবিদগণ বিপুল দূরত্বকে অতিক্রম করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল অংশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্হাপন করতে সক্ষম হয়েছেন, বৃটিশ আবাদকারীরা শেখালেন আরও কত উন্নততর প্রথায় শস্য উৎপাদন সম্ভব—ভারতে বৃটিশ শাসনের এই প্রভাবের সামগ্রিক ফলশ্রুতি হলো কংগ্রেসের এই সাফল্য।'' (কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ, 1892)।

ইংরাজ জাতির সান্নিধ্য লাভ করে ভারতীয়গণ যে এতদিকে উপকৃত হয়েছে তার জন্য উমেশচন্দ্র

ইংরেজদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন, তারা 'বৃটেনে জাতীয় জীবনের যে সুযোগ সুবিধা বলবৎ করেছেন, যে ধারায় জাতীয় জীবন প্রবাহিত, 'সেই আদর্শ' যেন ভারতেও প্রচলিত হয়। এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হবে ত্বরিতগতিতে নয়, ধীরগতিতে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে। 1892 সালে তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছেন, 'কত দিনে এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে তা কেউ জানে না। কিন্তু আমাদের কর্তব্য হবে এই আশা পোষণ করা এবং বৃটিশ নাগরিকদের সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে আমরা সর্বদাই এই আশা পোষণ করছি'।

স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ছিল। তিনি জানতেন তাঁর দেশবাসী দায়িত্বের সঙ্গে যে কোন কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম। যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকার গঠনে যে ভারতবাসী সমর্থ একথা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি চাইতেন কংগ্রেস জনগণের সান্নিধ্যে আসুক। নেতৃবৃন্দও অন্তরঙ্গ হোক দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে।

উমেশচন্দ্র চাইতেন যে ভারতে এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা বলবৎ হোক যেখানে একটি প্রতিনিধিসভা ও গভর্নর জেনারেল সহ একটি সিনেট থাকবে। গভর্নর জেনারেলের ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু আমেরিকার সংবিধানের ন্যায় এই ক্ষমতা সীমিত হবে। এই প্রতিনিধিসভাতে দেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিনিধিত্ব করবে। এই সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে এমন কিছু নেই, যা আমাদের মুসলমান ভাইদের বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ-বিরুদ্ধ হবে। সর্বোত্তম প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করাই আমাদের লক্ষ্য'।

আইন সদস্য স্যার জে. এফ. জে. স্টিফেন্স কর্তৃক সংশোধিত আইনানুসারে (এ্যামেন্ডমেন্ট অব দি ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড) গঠিত 'জুরি প্রথা'কে উমেশচন্দ্র কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। এই আইনের বলে জুরিদের আবেদনে, বিচারকগণ দণ্ডাদেশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি এই সংশোধিত আইনকে 'সভ্য সমাজের মধ্যে কঠোরতম' আইন বলে আখ্যা দেন।

'লবণ কর' যখন প্রথম প্রচলিত হলো, উমেশচন্দ্র তখনই এই করকে অন্যায় বলে অভিহিত করেছেন। প্রতিবাদ করে তিনি বলেছেন যে, যে দেশের মানুষ দারিদ্র্য পীড়িত, আহারের সংস্থান করা যেখানে অধি-কাংশ মানুষের ক্ষমতার বাইরে, সেখানে অত্যাবশ্যকীয় ও প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর এরূপ কর স্থাপন করা অন্যায়। পরবর্তীকালে এই লবণ করকে উপলক্ষ্য করে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে। 1888 সালে ডিগবী ও দাদাভাই নৌরজীর সাহায্যে 'লণ্ডন এজেন্সী' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয় লবণ আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে জনমত গঠন করার জন্য। উমেশচন্দ্র ভারতে এই এজেন্সীর সমর্থনে অর্থ সংগ্রহ করেন।

সেনাবাহিনীর খাতে ব্যয়সংকোচ করা এবং ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে এই অর্থব্যয়ের সঠিক ও ন্যায্য ভাগ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে উমেশচন্দ্র একটি 'রয়াল কমিশন' গঠন করার জন্য সুপারিশ করেন। অন্যান্য জাতীয়তা-বাদীদের ন্যায় তিনি দেশের শিল্পোন্নতির ও শিল্পোদ্পাদনের পক্ষপাতী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি এই কারণেই তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। 1896 সালে যখন রাজদ্রোহ আইন (সিডিশনস) চালু হল এবং বোম্বাইতে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিবিধান করা হল, তখন উমেশচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ করেন (কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন, 1896)।

1894-95 সালে উমেশচন্দ্র বঙ্গীয় আইন পরিষদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। 1902 সালে তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ইংলণ্ডে যান ও সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ইং-লণ্ডেও তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত ছিল। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন-স্থানে ভাষণ দেন। বিশেষতঃ গভর্ণর জেনারেলের কার্যনির্বাহ সমিতিতে ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য তিনি বিশেষভাবে আবেদন করেন। দুবার তিনি বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়ায় ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেন। দেশের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে উমেশচন্দ্র ভারতে এবং ইংলণ্ডে প্রচুর অর্থব্যয় করেন। পার্লা-মেণ্টারি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির ও ইংলণ্ডে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা 'ইণ্ডিয়া'র সকল ব্যয়ভার অনেকদিন তিনি বহন করেন।

আচার ব্যবহারে, পোশাকে ও চিন্তাধারায় তিনি ছিলেন সাহেবী ভাবাপন্ন। তাঁর প্রিয় লেখকদ্বয়

ছিলেন শেক্সপীয়ার এবং চার্লস ডিকেন্স। বাইবেল এবং বুক অব প্রেয়ারের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে একজন সাধারণ আন্দোলনকারীরূপে কখনো চিহ্নিত করেন নি। বরং তিনি মনে করতেন যে উমেশচন্দ্রের সহযোগিতায় কংগ্রেস আন্দোলন মর্যাদাপূর্ণ ও দায়িত্বশীল আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

[Sadhana Bonnerjee—Life of W. C. Bonnerjee ; Manick Lal Mukherjee—W. C. Bonnerjee : Snapshots of his Life ; The Indian Nation Builders, Vol. II ; W. C. Bonnerjee—Presidential Address, Indian National Congress, 1892 ; Journal of East Indian Association, 1867 ; R. G. Sanyal—A General Biography of Bengal Celebrities ; Life of W. C. Bonnerjee, first President of the Indian Natianal Congress ; S. Bonnerjee—Selection from the Speeches of W. C. Bonnerjee ; Manmatha Nath Ghosh—Life of Girish Chandra Ghosh ; W. C. Bonnerjee—Speech at the Third Session of the Indian National Congress (1887) ; G. A. Natesan—Collection of Speeches and Resolutions ; S. N. Banerjea—A Nation in Making.]

ডি. পি. সিংহ

উল্লুর এস পরমেশ্বর আইয়ার (মহাকবি)

(১৮৭৭-১৯৪৯)

(Ulloor S. Parameswara Iyer)

(Mahakavi) (1877-1949)

পরমেশ্বর আইয়ার, সংক্ষেপে উল্লুর নামেই পরিচিত, 5 জুন 1877 কেরালার চাঙ্গানাচেরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সুব্রহ্মণ্য আইয়ার ছিলেন ত্রিবাংকুর মালয়ালাম বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শক এবং মার নাম ছিল ভগবতী আম্মল। এই গরীব ব্রাহ্মণ পরিবারটি ত্রিবান্দ্রামের উল্লুর নামে শহরতলির বাসিন্দা ছিলেন। 1892 সালে যখন পরমেশ্বর আইয়ার মাত্র পঞ্চম স্ট্যান্ডার্ডের ছাত্র তখন সরকারী দপ্তরের ম্যানেজার রাজামগাম আইয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্রী অনন্তলক্ষ্মী আম্মলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। 1903 সালে অনন্তলক্ষ্মীর মৃত্যু হলে তিনি নাগেরকোল বৈদ্যনাথ আইয়ারের কন্যা সুব্বা আম্মলকে বিবাহ করেন। উল্লুর ছটি পুত্র ও চারটি কন্যার জনক।

তাঁর পিতা এবং কল্লোড়কড়ে চক্রপাণি ওয়ারিয়ার কাছে উল্লুর সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। চাঙ্গনাচেরি এবং ত্রিবান্দ্রমে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি মহারাজা'স কলেজ থেকে 1897 সালে বি. এ. 1903 সালে বি. এল. এবং 1904 সালে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। বাল্যকালে তাঁর দিদিমা তাঁর রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মালয়ালামের অধ্যাপক রাম কুরুপ, ইংরাজির অধ্যাপক মিঃ বয়লে, এবং কেরালা ভর্মা ভালিয়া কয়েলথামপুরন (যিনি কেরালাতে সমসাময়িক কালের সংস্কৃত পণ্ডিতদের অন্যতম ছিলেন) এঁদের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর মনে জাতীয় চেতনার স্ফুরণের জন্য তিনি ডঃ অ্যানি বেসান্তের কাছে কিছু পরিমাণে ঋণী। একদিকে পুরাণ গ্রন্থ অপরদিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শিক্ষা তাঁর কাছে অগাধ ঐশ্বর্যপূর্ণ ভারতীয় কৃষ্টির দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। পাশ্চাত্যদেশীয় ক্লাসিক গ্রন্থ পাঠের ফলে জীবনের মূল নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাগুলি স্পষ্টতর হওয়ার সুযোগ পায়। সেকসপিয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের রচনা তাঁকে ক্লাসিক্যাল ঘরানায় বন্দী না করে রোমান্টিক জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিল।

1897 সালে উল্লুর ত্রিবাংকুরে টাউন হাইস্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। তিনি একজন সুদক্ষ এবং প্রেরণাসঞ্চারকারী শিক্ষক ছিলেন।

বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি প্রথমে তহশীলদার পদে এবং পরে মুন্সেফের পদে উন্নীত হন। তারপর তিনি সরকারের খাস দপ্তরে সহকারী সচিব হন। অবশেষে তিনি দেওয়ান পেশকার (কালেকটর এবং ম্যাজিস্ট্রেট) হন এবং একাধিকবার প্রধান সেক্রেটারী পদেও আসীন হয়েছিলেন। পদোন্নতির প্রত্যেকটি স্তরে তিনি তাঁর দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিলেন।

তা সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীর চেয়ে মালয়ালাম সাহিত্যসেবী হিসাবেই তাঁর বেশী খ্যাতি। গদ্য লেখকের চেয়ে কবি হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি ছিল বেশী। তাঁর কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে কয়েক খণ্ড কবিতা ও গদ্য গ্রন্থ। এছাড়াও মালয়ালাম ও ইংরাজিতে গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় দৈনিক ও সাময়িক পত্রে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাত খণ্ডে রচিত 'কেরালা সাহিত্য চরিত্রম' তাঁর কৃতিত্বের এক উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর। এতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং প্রকাশ বৈভবের পরিচয় পাওয়া যায়।

গদ্যের তুলনায় কবিতাই ছিল তাঁর অধিকতর প্রিয় বিষয়। তাঁর ছন্দ এবং রচনা শৈলীর বৈচিত্র্য ছিল তাঁর কাব্যসাহিত্যের প্রধান সম্পদ। অবশ্য তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাই ছিল পুরোপুরি অথবা আংশিক মহাকাব্য ধাঁচের। উনিশ পর্বে রচিত তাঁর 'উমাকেরলম্' কাব্য-গ্রন্থের বিষয়বস্তু কেরালার ইতিহাসের কিছু কিংবদন্তী-পূর্ণ ঘটনা। মালয়ালাম সাহিত্যের এটি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য। কর্ণের চরিত্র ব্যাখ্যান নিয়ে রচিত 'কর্ণভূষণম' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিণততম রচনা। প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতা বোধ হয় তিনি নিছক অবসর বিনোদনের জন্য লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে কবিতা হয়ে দাঁড়াল তাঁর কাছে চরিত্রের মহানুভবতা, মানুষের অস্তিত্বের মহান উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টির বিষয়কে ব্যাখ্যা করার মাধ্যম। তাঁর 'মাঝাথুল্লি' (বৃষ্টির ধারা) ক্ষুদ্রের মধ্যে বিশালতার প্রকাশকে ব্যাখ্যা করেছে। 'বিচার ধারায়' তিনি দেখিয়েছেন যে একজন হরিজন কন্যাও অন্য সকলের মতো ভগবানেরই সৃষ্টি।

যেমন 'কর্ণভূষণমে' তেমনি অন্যান্য অনেক কবিতায় তিনি আমাদের পুরাণের সম্পদকে উজার করে পৌরাণিক চরিত্রগুলির বর্ণময়তাকে প্রকাশ করেছেন। 'অন্নাম ইন্নাম'-এ (এখন এবং তখন) মহাভারতের কয়েকটি বীরপুরুষের উঁচু মানের নীতিজ্ঞানের পাশাপাশি তিনি এঁকেছেন চরিত্রের বর্তমান সংকটের ছবি। যাইহোক তাঁর আশাবাদ এবং দেশপ্রেম বরাবর বজায় ছিল ; তিনি মনে করতেন যে যদি অন্তর বাহির উভয় দিক থেকে আমরা নিজেদের পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারি তাহলে ভারত আবার আগে যেরকম ছিল সেরকম স্বর্গে পরিণত হবে। 'উমা-কেরলম্', 'ভাণ্ডীনাড়ু' এবং 'মণি মঞ্জুষা' হচ্ছে তাঁর আরও কয়েকটি রচনা যা তাঁর তীব্র দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে। 'উলবোধনমের' মত কবিতায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে আমাদের অভ্যন্তরেই আনন্দের বাস এবং বাইরে তার সন্ধান করতে যাওয়া মূর্খামির নামান্তর। বসুধৈব কুটুম্বম'-এ, তিনি মানবগোষ্ঠীর মূলগত ঐক্য সম্পর্কিত উপনিষদের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন।

উলদ্বরের কবিতাগুলি এই সমস্ত উপদেশ এবং ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। কেউ কেউ মনে করেন যে উলদ্বর তাঁর একটি রচনায় কাব্যিক গুণাগুণের থেকে তার নীতিগত দিকটিকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তাঁর কবিতায় প্রচুর নির্দেশিকা ছড়ান আছে এবং সময় সময় তা আমাদের মিল্টনের কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। মিল্টনের মত তিনি কবিতার জন্য খুব কমই সাধারণ ভাষা ব্যবহার করতেন। পরিবর্তে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ নির্বাচন করতেন। এরা তাঁর রচনার আভিজাত্য বাড়িয়ে তুলত। কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন যে এটা তাঁকে জনগণের কবি হবার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

এটা অনস্বীকার্য যে তিনি ছিলেন একজন একাধারে বিরাট পণ্ডিত ও কবি। তিনি ভারতীয় বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনের সদস্য ছিলেন এবং ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন প্রাচ্য-বিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে তিনি সদস্য হিসেবে ছিলেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মান-সূচক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। 1919 সালে কোচিনের মহারাজা তাঁকে 'কবি তিলক' উপাধিতে ভূষিত করেন। 1932 সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁকে 'রাও সাহেব' খেতাব দেন ; 1937 সালে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাঁকে 'মহাকবি' এবং বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'সাহিত্যভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করেন। এছাড়াও ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা এবং মহারানীর কাছ থেকে তিনি বহু দামী উপহার পেয়েছিলেন।

এ সমস্ত সত্ত্বেও তিনি খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। একজন গোঁড়া ধর্মপ্রবণ ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি জাতিভেদ অপছন্দ করতেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষ একই পরিবারে থেকে উদ্ভূত বলে তিনি মনে করতেন।

তিনি ছিলেন একজন কট্টর দেশপ্রেমিক। সরকারী কর্মচারী হিসেবে তাঁর সময়ে জাতীয়তাবাদী মতামত খুব সতর্কভাবে প্রকাশ করতে হত। ক্যাথারিন মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়ার' জবাব হিসাবে তিনি লিখে-ছিলেন—'চিত্রশালা' যেখানে আমরা ভারতবর্ষ এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীর অনুরাগ দেখতে পাই। 'এনডে মথমে' তিনি গান্ধীজি এবং ভারতবর্ষের স্বাধী-

নতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন। অন্যান্য কবিতা যেমন 'মথরুভূমিযুধে ত্রিপাদঙ্গনিল' এবং 'ক্ষেত্র সন্নিধিলে' তিনি তাঁর নিজস্ব দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং অন্যান্যদের অনুপ্রাণিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

তাঁর ছিল এক পরিপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যময় জীবন এবং সামাজিক ও শিক্ষামূলক সংস্কারে প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং দেশের সাহিত্য সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। তাঁর সময়কার কেরালায় তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ প্রশাসনিক কর্মী কিন্তু এসবের চেয়ে তিনি ছিলেন একজন বড় পণ্ডিত এবং লেখক যিনি মালয়ালাম সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছিলেন এবং তাঁর লেখনীর দ্বারা ভারতে জাতীয়তাবাদের অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত করতে সাহায্য করেছিলেন।

1949 সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[Vidwan A. D. Harisarma and M. O. Joseph—Mahakavi Ulloor (in Malayalam) ; Valakkumkoor Rajaraja Varma Raja—Ulloor Mahakavi (in Malayam) ; N. Gopal Pillai—Kerala Pratibha (in Sanskrit) ; Ulloor's own writings : Poetical works—Umakeralam, Chitrasala, Chithrodayam, Tharangini, Pimgala, Mani Manjusa, Mangala Manjori, Ratnamala, Kalpashakhi ; Prose Works : Vignana Deepika (in four parts), Kerala Sahitya Charitram (in seven volumes), Smarana Madhuri ; Report of the Temple Enquiry Committee (1934) ; The Triveni (a Quarterly from Bangalore), June 1944 ; The Mathrubhumi (Weekly), October 1944, 29 September 1946 and 3 June 1949. Personal interview of the Research Fellow with Ramanathan, son of Parameswara Iyer.]

(এন. এম. কে নায়ার) (টি. সি. শঙ্কর মেনন)

উল্লল পদ্মানভ মাল্য (১৮৯৮-১৯৬০)

Ullal Padmanabha Malya (Dr)

(1898-1960)

শ্রদ্ধেয় নেতা এবং জনপ্রিয় চিকিৎসক ডঃ উল্লল পদ্মনাভ মাল্য ম্যাঙ্গালোরের এক ধনী ব্যবসায়ী গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এক-সময়ের এ. আই. সি. সি-র সেক্রেটারী ডঃ শ্রীনিবাস মাল্যের তিনি ছিলেন বড় ভাই। 1922 সালের 30 এপ্রিল তিনি ম্যাঙ্গালোরের এক সমৃদ্ধ ব্যবসায়ীর কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করেন।

তিনি ম্যাঙ্গালোরের সেণ্ট এলয়সিয়াস কলেজ এবং মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। 1923 সালে তিনি ম্যাঙ্গালোর শল্য চিকিৎসা কেন্দ্র Mangalore Surgical Hall প্রতিষ্ঠা করেন। 1925 সালে তিনি গড়ে তোলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নার্সিংহোম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ; শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রী অরবিন্দ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

ডঃ মাল্য 1930 সালে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলন, একক সত্যাগ্রহ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একাদিক্রমে ভেলোর, তাঞ্জোর এবং মাদ্রাজ কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলন, জনজীবন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত একাধিক সংস্থার সঙ্গেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ কানাড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট (1937-39), মাদ্রাজ বিধানসভার (Legislative Assembly of Madras) সদস্য, ম্যাঙ্গালোর মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর (1934-40) এবং এক কার্যকালের জন্য সহ-সভাপতি, কানাড়া ব্যাংকিং কর্পোরেশনের পরিচালক, হিন্দী প্রচার সভার সভাপতি এবং কানাড়া হাইস্কুল পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য।

পদ্মনাভ ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ব্যক্তি এবং নিজ ক্ষমতা সম্বল করেই মানুষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে—এই মতবাদে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন দরিদ্রের প্রকৃত বন্ধু। চিকিৎসা বিদ্যাকেই তিনি তাঁর জীবিকারূপে

গ্রহণ করেছিলেন এবং আজীবন গরীবের সেবা করে গিয়েছেন তিনি। তিনি ছিলেন Mudushedde T. B. Sanatorium-এর প্রতিষ্ঠাতা। হরিজন সেবা সংঘের সভাপতি হিসাবে তিনি সচেষ্ট ছিলেন সমাজ সংস্কারে। গান্ধীজীর সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল এবং সর্বভারতীয় গ্রামীণ শিল্প-সংস্থার (All India Village Industries Association) সভাপতি থাকাকালে তিনি গ্রামীণ ও কুটীর শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন তিনি এবং শ্রী বালমূর্ত্তি ব্যায়ামশালা তাঁরই উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত সম্মানীয় এবং জনপ্রিয় নেতা। তাঁর মৃত্যুর পর ম্যাঙ্গালোরের শ্রীনিবাসনগরে যে বিপুল জন সমাগম হয়েছিল তা থেকেই প্রমাণিত হয় তিনি কতোখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

[Information mainly supplied by Saraswati Malya, wife of Dr. Malya.]

এইচ. ভি. শ্রীনিবাস মূর্তি

উল্লল শ্রীনিবাস মাল্লিয়া (১৯০৩-১৯৬৫)

Ullal Shrinivas Malliah (1903-1965)

1925 সাল থেকে 1965 সাল দীর্ঘ চল্লিশ বছর উল্লল শ্রীনিবাস মাল্লিয়া ছিলেন কর্ণাটকের দক্ষিণ কানাড়ার একজন সক্রিয় নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মী এবং প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ্।

1903 সালের 21 নভেম্বর দক্ষিণ কানাড়ার উল্লালে তিনি এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা উল্লাল মঞ্জুনাথ মাল্লিয়ার জমিজমা থাকলেও প্রধানতঃ ব্যবসাই ছিল তাঁর জীবিকা অর্জনের উপায়। শ্রীনিবাস মাল্লিয়া ম্যাঙ্গালোরের সেণ্ট এলয়সিয়াস কলেজ এবং পরে ম্যাঙ্গালোর সরকারী কলেজে শিক্ষালাভ করেছিলেন। সংস্কৃতে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং মহাভারত তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন, বিশেষভাবে ভগবৎ গীতা ছিল তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থ। কোরাণ এবং বাইবেলও তাঁর অধিগত ছিল। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন স্কাউট বাহিনীর এবং ফায়ার বিগ্রেডের সদস্য। নানাবিধ অভিযানের জন্য তিনি ছিলেন সুপরিচিত।

কলা শাস্ত্রে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি তাঁদের পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগদান করেন। সেই বছরই বনতোয়ালের (দক্ষিণ কানাড়া) ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সেই সময় দক্ষিণ কানাড়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ভেঙ্কটরায়া বালজী, সদাশিবরায়া কারনাড এবং অন্যান্যরা। তিনি এইসব নেতাদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং তাঁর গোপন কার্যকলাপের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের অন্যতম হয়ে উঠলেন। 1925 সালে প্রথম তাঁর দু' বছরের কারাদণ্ড হয়। কারাগারে তাঁর সঙ্গী ছিলেন কামরাজ নাদার—যার জীবনযাত্রা প্রণালী এবং ব্যক্তিত্ব তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। এছাড়া রঙ্গনাথ, ডি. পি. কারমারকর এবং কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যান্য সক্রিয় কর্মীদের তিনি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

দক্ষিণ কানাড়ায় শিক্ষা এবং ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তিনি ছিলেন সুবক্তা এবং সুসংগঠক। প্রশংসনীয় নেতৃত্ব এবং জনসংযোগ দক্ষতার জন্য 1937 সাল থেকে 1950 তিনি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে আসীন ছিলেন।

1936 সাল থেকে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (A. I. C. C.) সদস্য ছিলেন। 1939-1940 সাল তিনি ছিলেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং 1941 থেকে 1946 পর্যন্ত ছিলেন অস্থায়ী সভাপতি। 1946 সালে তাঁকে করা হয়েছিল কর্ণাটক আইন-সভার সভাপতি। 1947 সাল থেকে তিনি কে. পি. সি. সি.-র সহ-সভাপতি ছিলেন। ভারতীয় গণপরিষদেরও (Constituent Assembly of India) তিনি সদস্য ছিলেন। 1947 সাল থেকে 1957 সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভায় তিনি ছিলেন কংগ্রেস দলের হুইপ এবং 1952 সাল থেকে ছিলেন লোকসভার প্রধান হুইপ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের "কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির"ও (Central Election Committee) তিনি সদস্য ছিলেন। 1950 থেকে 1952 পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য ছিলেন এবং পরে উদিপি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে পর পর তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি এবং কিছু দিনের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও তাঁর উপর

ন্যস্ত ছিল। এই সময় পদাধিকার বলে তিনি লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং বলবন্তরায় মেহেতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। এছাড়া তিনি পণ্ডিত নেহরুরও আস্থাভাজন ছিলেন। প্রথম লোকসভার হাউস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল তাঁকে। নিখিল ভারত হস্তশিল্প সমিতির সহ-সভাপতি থাকাকালে তিনি যে সমস্ত কাজ করেছিলেন তার জন্য তিনি অর্জন করেছিলেন প্রভূত জনসমর্থন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে তিনি ডাবলিনে গিয়েছিলেন।

তিনি ইউ. কে., ইউ. এস. এ, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, তুরস্ক, সুইজারলণ্ড, ইজিপ্ট, লেবানন, সিরিয়া, বাহেরিন, পাকিস্তান এবং সিংহল পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন।

সর্বদাই তাঁকে ধুতি, কুর্তা এবং গান্ধী টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখা যেত। তিনি ভারতীয় জীবনধারার প্রতি অনুগত ছিলেন কিন্তু পশ্চিমের বিজ্ঞান ভিত্তিক ধ্যানধারণাকে প্রশংসা করতেন এবং গ্রহণও করতেন। অন্যদের সুখী এবং সন্তুষ্ট করার মধ্যেই তিনি নিজেও আনন্দকে খুঁজে পেতেন। তিনি ছিলেন সহৃদয় অতিথিপরায়ণ। তাঁর দৃষ্টিতে গরীব বড়লোক কোনও ভেদাভেদ ছিল না। তিনি কখনও সম্পদ আহরণ করেন নি, এমনকি একটা নিজস্ব বাড়ি পর্যন্ত তাঁর ছিল না। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদী। যিনি স্বাধীনতা আন্দোলন, দক্ষিণ কানাড়া জেলার উন্নতিসাধন এবং দরিদ্র-জনগণের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আধুনিক দক্ষিণ কানাড়াকে গড়ে তোলার কাজে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

[Information collected from friends and co-workers of Ullal Shrinivas Malliah.]

জি. এস. দীক্ষিত

উল্লাসকর দত্ত (১৮৮৫-১৯৬৫)

Ullaskar Dutta (1885-1965)

ত্রিপুরা জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) কালিকচ্ছ গ্রামে মাতুলালয় 'দেওয়ানবাড়ী'তে 1885 খৃষ্টাব্দের 16 এপ্রিল উল্লাসকর দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিত্রালয়ও সেই গ্রামের অন্য অংশে অবস্থিত ছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রথমস্থান অধিকার করে উল্লাসকরের পিতা দ্বিজদাস দত্ত ইংলণ্ডে কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য 'সাইরেনসেস্টার' (Cirencester) ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে দ্বিজদাস কলকাতার বেথুন কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি যথাক্রমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ এবং সবশেষে কলকাতার নিকটস্থ শিবপুর বেঙ্গল এগ্রিকালচারল কলেজের অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন।

আনন্দ চন্দ্র নন্দীর মধ্যস্থতায় দ্বিজদাস ব্রাহ্ম সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হন। আনন্দচন্দ্র হিন্দু কলেজের প্রথম ছাত্রদলের একজন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত ছিলেন। পরে দ্বিজদাস আনন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা মুক্তকেশীকে বিবাহ করেন। আনন্দচন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী চিকিৎসক এবং সমাজসেবক হিসাবে নিজ গ্রামেই সাধকের জীবন যাপন করতেন। মহেন্দ্রচন্দ্রের জীবনযাত্রা, উল্লাসকরকে আজীবন প্রভাবিত রেখেছিল।

তৎকালীন অধিকাংশ বিলাতফেরৎ চাকুরীজীবীর মতো দ্বিজদাস দত্ত তাঁর পারিবারিক জীবনে ইংরাজি অভ্যাস এবং প্রথার প্রবর্তন করেন। উল্লাসকর তাঁর অগ্রজ এবং অনুজ দুই ভ্রাতার সঙ্গে এই পরিবেশে বর্ধিত হন।

কালিকচ্ছের গ্রাম্য পাঠশালায় উল্লাসকর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে যখন তাঁর পিতা শিবপুরে চাকুরী করতেন উল্লাসকর হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং 1903 সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেখান থেকেই 1905 সালে তাঁর এফ. এ পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্বে তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হল। প্রেসিডেন্সী কলেজের জনৈক অধ্যাপক ডঃ রাসেলের অসতর্কভাবে উচ্চারিত অত্যন্ত অপমানকর এক মন্তব্যে উল্লাসকরের ভিতরকার আত্মসম্মানবোধ এবং পৌরুষ জেগে উঠল। তিনি যে কেবল ডঃ রাসেলের অকারণে অপমানজনক বক্তব্যের প্রতিবাদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কার্যকরভাবেই করলেন তা নয়; সেই সময়েই তিনি ইউরোপীয় পোশাকপরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার বর্জন করে মনেপ্রাণে সম্পূর্ণভাবে, সহজ, সরল, প্রাণদায়ী বাঙ্গালী জীবনধারায় প্রত্যাবর্তন করলেন। একই সময়ে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করলেন। কারণ তিনি বুঝতে

পেরেছিলেন যে, অগভীর সংস্কৃতির ছদ্মবেশে, বিবেকশূন্য, উদ্ধত, বিজেতা ইংরাজ জাতির কারও কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরীক্ষা তাঁর দেবার কথা, সে পর্যন্ত কলেজে যাবার জন্য পরিবারের সকলে তাঁকে বোঝালেও, উল্লাসকর তাঁর সংকল্পে দৃঢ় রইলেন। শেষ পর্যন্ত বস্ত্রোৎপাদন প্রয়োগশিল্পের একটি পাঠক্রম গ্রহণ করতে বোম্বাই যেতে তাঁকে রাজী করান গেল। পরবর্তী ঘটনায় বোঝা যায় যে তিনি ইতিমধ্যেই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ পরিচালিত ক্ষুদ্র এক বিপ্লবী দলের কার্যক্রমের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এই কারণে উল্লাসকরের বোম্বাই-এর প্রবাস জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয় এবং শীঘ্রই তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে মনেপ্রাণে 'যুগান্তরের' কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি, কেবল বাঙ্গলায় নয় সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়কার বহু যুবকযুবতীর মত উল্লাসকরও এই ঘটনাসমূহ দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত হলেন যদিও তাঁর পিতার সংসারের চিন্তাধারা জনসাধারণের এই ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিত না। মনে হয় তিনি জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা বিপিন চন্দ্র পালের (লেখিকার পিতা) অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হতেন।

সাধারণভাবে উল্লাসকর লোকজনের মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন। তিনি রসিক এবং হাসিখুশী প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর গলার সুর ছিল সুমিষ্ট এবং তিনি কৌশলে স্বর পরিবর্তন করে কথা বলায় দক্ষ ছিলেন। উল্লাসকর হাস্যকৌতুকেও পারদর্শী ছিলেন। যাঁরাই তাঁর কাছাকাছি থাকতেন তাঁদেরই তিনি গানে ও রসিকতায় আনন্দ দিতেন। 1905-06 সালে তাঁর চরিত্রের এই দিকটার পরিবর্তন ক্রমশঃই বর্ধিত হতে দেখা যায়। তিনি ক্রমশঃই অন্তর্মুখী ও গম্ভীর হতে লাগলেন। উল্লাসকরের অবর্তমানে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুখসাগর একদিন তাঁর বিছানার নীচে একটি ধাতব গোলা পেলেন। তিনি সেটি নিয়ে কাছেই একটি বাগানে, একটি গাছে নিক্ষেপ করলেন। প্রচন্ড এক বিস্ফোরণ হল এবং প্রচুর ধূম নির্গত হল। দ্বিজদাস সেই সময় বাড়ীতে ছিলেন না। সমস্ত ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হল।

এর কিছুদিন পর উল্লাসকর গৃহত্যাগ করলেন। কুমিল্লায় অল্প সময়ের জন্য আসা ছাড়া পরিবারের সঙ্গে তাঁর আর যোগ রইল না। তাঁর মামাতো ভাই-এর (লেখিকার স্বামী) বাড়ীতে, যেখানে তাঁর মা সেই সময়ে থাকতেন, দু'দিনের জন্য উল্লাসকর সেখানে এসেছিলেন। তখন সবসময়ই তিনি আত্মমগ্ন থাকতেন। দু'দিন আগে যেমন হঠাৎই এসেছিলেন, দু'দিন পরে তেমনি কাউকে কিছু না বলে তিনি হঠাৎই চলে যান। কিছুদিন পর (2মে,1908) মুরারীপুকুর বাগান বাড়ীতে অন্যান্য বিপ্লবী সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর দীর্ঘদিন এই ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলে। বিচারে অনেক অপরাধীর সঙ্গে উল্লাসকরেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

বিচার চলাকালে উল্লাসকর সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্বেগ ছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করার পরই মনে হয়েছে, তিনি তাঁর রসবোধ এবং অনেকের সঙ্গ লাভে আনন্দ করার অভ্যাস ফিরে পেয়েছেন। বিচারালয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাঠ করে শোনানো হলে, উল্লাসকর খুব ভদ্রভাবে একটি গান গাইবার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি দেওয়া হলে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে,' এই গানটি করেন যা বিচারপতি সহ বিচারালয়ে উপস্থিত সকলকে অশ্রুভারাক্রান্ত করে।

বিচারের পর, অধিকাংশ বন্দীকেই উচ্চতর ন্যায়ালয়ে আবেদন করতে রাজী করান গেলেও উল্লাস আবেদনপত্রে তাঁর হস্তাক্ষর দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মাতুল ডাঃ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, যাঁকে উল্লাসকর ঈশ্বরের ন্যায় মান্য করতেন তাঁর কথায় রাজী হলেন। আবেদনের ফলে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে আন্দামানের বন্দীশালায় যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকার আদেশ হল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাধারণভাবে সকলকে ক্ষমা করা হলে, উল্লাসকর আন্দামানের বহু পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরলেন।

মুক্তি পাবার পর, উল্লাসকর সক্রিয়ভাবে কোন রকম রাজনৈতিক কাজে যোগ দেন নি। তিনি মনে করতেন এবং একথা তিনি বহু ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কেবলমাত্র জনসাধারণের আন্দোলন, তা সত্যাগ্রহই হোক বা আর যা কিছু হোক, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। অহিংস নীতিতে তাঁর

অবিশ্বাস ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। উল্লাসকরের এক প্রকৃত আধুনিক এবং প্রগতিবাদী মন ছিল। তিনি মনে করতেন, রাজনীতিক স্বাধীনতা অথবা অঞ্চলভিত্তিক দেশপ্রেম মানুষের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার শেষ কথা হতে পারে না। ভবিষ্যৎ বিশ্বরাজনীতি, যাতে সমগ্র মানবজাতি এক হতে পারে, এসব তাঁরই প্রস্তুতি মাত্র।

1948 সালে 63 বৎসর বয়সে উল্লাসকর বিবাহ করেন। এটি বহুপ্রতীক্ষিত এক অভিনব প্রেমকাহিনীর প্রান্তিক ঘটনা। লীলা, (লেখিকার কনিষ্ঠা ভগিনী) বিপিনচন্দ্র পালের তৃতীয়া কন্যা, উল্লাসকর দ্বীপান্তরে যাবার আগেই তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। 1920 সালে উল্লাসকর ফিরে এলেন, লীলা ইতিমধ্যে তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। 1922 সালে লীলা ইংলণ্ড যান, নতুন এক আসক্তিতে জড়িয়ে পড়েন, বিবাহ করে নতুন জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু লীলার প্রতি উল্লাসের প্রেম স্থির ছিল। প্রায় পঁচিশ বৎসর পর 1946 সালে তাঁদের পুনরায় দেখা হয়। লীলা তখন বিধবা এবং প্রায় পঙ্গু। কলকাতার এক হাসপাতালে তাঁর দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসা চলছিল। প্রতিদিন বিকালে উল্লাসকর, হাসপাতালে লীলাকে দেখতে যেতেন। এক বৎসরের অধিককাল এই বিস্ময়কর পরিবেশে প্রেম নিবেদনের পর 1948 সালে তাঁরা বিবাহ করেন। কিছুদিন পর কলকাতা ত্যাগ করে তাঁরা আসামের শিলচরে বসবাস করতে যান। কয়েক দশক আগে যে বাঙ্গলা দেশের অঙ্গচ্ছেদ রোধ করতে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই বিভক্ত বাঙ্গলাদেশে উল্লাসকর বাস করতে চাইলেন না। রাজনৈতিক কারণে নিপীড়িত কর্মীদের জন্য স্বাধীন ভারতের সরকার যে অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি তাও গ্রহণ করলেন না। অর্থমূল্যে তিনি তাঁর দেশপ্রেমকে ক্ষুণ্ন করতে চাইলেন না।

1958 সালে লীলা মারা গেলেন। উল্লাসকর সাত বৎসর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করলেন। অবশেষে 1965 সালের 17 মে, তাঁর আকাঙ্খা অনুযায়ী মৃত্যু এসে উল্লাসকরকে লীলার কাছে নিয়ে গেল।

[Datta, Ullaskar—Karakahini ; Bandyapadhyaya, Upendranath—Nirbashiter Atmakatha, Calcutta, 1352 B.S. ; Ghosh, Barindra Kumar—Dwipantarer Katha, Calcutta, 1330 B.S. ; Gupta, Nilkanta—Smritir Pata, Sri Aurobindo Pathamandir, 1370 B.S. ; Kanango, Hemchandra—Banglay Biplabi Prachesta ; Majumdar, R. C. —History of Freedom Movement in India, Vol-II, Calcutta, 1963 ; Mukhopadhyaya, Pravat Kumar—Bharate Jatiya Andolan, Calcutta, February, 1925 ; Personal Knowledge and information of the Contributor, who had intimately known Ullaskar Datta for half a century.]

(পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়) শোভনা নন্দী

ঊর্মিলা দেবী (১৮৮৩-১৯৫৬)
Urmila Devi (1883-1956)

1883 সালের 3 ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলার তেলিরবাগের উচ্চমধ্যবিত্ত বৈদ্য পরিবারে ঊর্মিলা দেবীর জন্ম হয়। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী। তাঁর পিতা ভুবন মোহন দাশ একজন বিখ্যাত উকিল ও সলিসিটর ছিলেন।

ঊর্মিলা জন্মেছিলেন প্রবাদ বাক্যের সেই রুপোর চামচ মুখে দিয়ে। কলকাতার লরেটো কনভেন্টে তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। কিশোরী ঊর্মিলার বিবাহ হয় অনন্তনারায়ণ সেনের সঙ্গে। অচিরেই তিনি একাধারে পত্নী ও মায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর গৃহেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করতে থাকেন। শীঘ্রই বাংলা ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা থেকেই তিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে কলকাতায় তাঁর ভ্রাতার গৃহ 'কলিকাতার রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র' রূপে পরিণত হলে, ঊর্মিলা দেবী তৎকালীন যুগের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। এই সময়ে নানামত, নানাপ্রকার মানুষ ও বিভিন্ন ধর্মী আদর্শকে চেনা ও জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিল ; শিখতে পেরেছিলেন অনেক। এখানেই তিনি গান্ধীজীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। মৃদুভাষী মহাত্মা, যাঁর কাছে ধর্ম ও রাজনীতি ছিল

অভিন্ন, তিনি তাকে সর্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট করে-ছিলেন।

1920 সালে গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। সেই বছরই ঊর্মিলা দেবীর স্বামীর মৃত্যু হয়; তখন কোন একটা বিশেষ অবলম্বন তাঁর একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন তাঁর কাছে সেই অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। 1921 সালে ঊর্মিলা দেবী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। তারপর 1933 সাল পর্যন্ত তিনি গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। 1933 সালে গান্ধীজীর অনুরোধে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন। গান্ধীজীকে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য এত অধিক ছিল যে তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে গান্ধীজীর কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলেও তাঁর আনুগত্য লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় খাদি-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা সর্ব প্রথম অমান্য করেন যে মহিলা সত্যাগ্রহী দল, ঊর্মিলা দেবী তাঁদের অন্যতম। 1921 সালের 24 ডিসেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত ভ্রমণের জন্য এদেশে আগমণ করেন। ঐ দিনটিতে স্বদেশী-আন্দোলনকারীরা হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঊর্মিলা দেবী যখন হরতালের সপক্ষে প্রচার করছিলেন, তখন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভ করে তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য মহিলা-সংস্থারূপে 'নারী কর্ম-মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাতীয় সংগ্রামে পুরোমাত্রায় আত্মনিয়োগ করেন। শীঘ্রই সংস্থাটি 'বে-আইনী' বলে ঘোষিত হয় ও 'নিষিদ্ধ' সংস্থা-রূপে তালিকায় স্থান লাভ করে। 1926 সালে তিনি তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। 1930 সালে বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্রের সামনে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে তিনি 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' গঠন করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই সমিতি সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এক বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করে। ফলে এই সমিতিকে 'নিষিদ্ধ' বলে ঘোষণা করা হয় ও ঊর্মিলা দেবী ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 1931 সালে মুক্তিলাভ করে তিনি পুনরায় আন্দোলনে যোগদান করেন। হিজলী বন্দী নিবাসে পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হলে। সেই কমিশনে সংশ্লিষ্ট রাজবন্দীদের প্রতি-নিধিত্ব করার অধিকার দাবী উত্থাপন করে ঊর্মিলা দেবী আন্দোলন করেন। হাওড়ার একটি জনসভায় এই সম্পর্কে বক্তৃতাদান কালে তিনি পুনরায় বন্দী হন। পরবর্তীকালে তাঁকে দুইবার গৃহবন্দী করা হয় এবং দুবারই তিনি আদেশ অমান্য করেন।

এইরূপ উত্তেজক ও ঘটনাবহুল কর্মজীবন যাপনের পর ঊর্মিলা দেবী সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য গান্ধীজীর আদেশক্রমে যে কোন কার্য করার জন্য ঊর্মিলা দেবী সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। এই কারণেই 1933 সালে গান্ধীজীর অনুরোধে হরিজনদের স্বার্থে তিনি দক্ষিণ ভারতে যান এবং মালাবারের একটি মন্দিরের দরজা হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত করতে সফল হন। 1946 সালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি অঞ্চল সফর করেন।

1956 সালের 10 মে সংগ্রামশীলা ঊর্মিলা দেবীর মৃত্যু হয়। তাঁর সম্পর্কে একটা কথাই বলা যুক্তি-সঙ্গত বলে মনে হবে যে স্বনামধন্য ভ্রাতা চিত্তরঞ্জন দাশের পরিচয়ে ঊর্মিলা দেবীর পরিচিত ও গৌর-বান্বিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর স্বকৃত কর্মে ও স্বমহিমায় মহিমান্বিত। অবশ্য ঊর্মিলা দেবীর জীবনে ও কর্মে চিত্তরঞ্জন দাশের ব্যক্তিত্বের কোন প্রভাব পড়েনি, একথা বলা অন্যায় ও অযৌক্তিক। চিন্তায়, ভাবনায়, চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে তিনি এমনই গুণান্বিতা ও মহীয়সী এক রমণী যিনি সরলা দেবী চৌধুরানী ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গেই তুলনীয়।

[Kamala Das Gupta—Swadhinata Sangrame Banglar Nari, Calcutta 1370 B. S. Calcutta Municipal Gazette, 19 May 1956, Amrita Bazar Patrika, 11 May 1956]

(অমিয়া বরাট) ক্ষিতীশ রায়

এইচ. এম. হিণ্ডম্যান (১৮৪২-১৯২১)

H. M. Hyndman (1842-1921)

Winston Churchill একবার রাশিয়া সম্বন্ধে বলেছিলেন—"রাশিয়া রহস্যাবৃত ধাঁধা বিশেষ।" হিণ্ডম্যানের চরিত্র সম্বন্ধেও এই উক্তিটি অনেকাংশে প্রযোজ্য। নানা বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের এবং চরিতকারদের কাছে ছিলেন এক ধাঁধা বিশেষ।

একদিকে তিনি ছিলেন সমাজবাদী আবার অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিও তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী এবং শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধু। এসব সত্ত্বেও তিনি তথাকথিত "বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণী"র মানুষ হিসাবে গর্ববোধ করতেন এবং সবসময় খাঁটি ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করে আনন্দ পেতেন। তিনি সৌভ্রাত্র ও পরার্থবাদ প্রচার করতেন। অথচ কারো সঙ্গে সামান্যতম ব্যাপারেও মতানৈক্য হলে তিনি তাকে রীতিমত গালাগালি করতেন। তিনি একদিকে যেমন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি অন্যদিকে ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী। তিনি পুঁজিবাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব ব্যয়-নির্বাহ তথা সমাজবাদী বিদ্রোহে অর্থ সাহায্য করার জন্য কোম্পানি শেয়ার, স্টক নিয়ে ফাটকা খেলতেন। তিনি কয়েকবার পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। যদিও তিনি পার্লামেণ্টকে একটি অকেজো অচল প্রায় প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন।

1842'র 7 মার্চ হেনরি মেয়ার্স হিণ্ডম্যান লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। ছ বছর বয়সে তিনি মা'কে হারান। তাঁদের পরিবার ছিল ধনী, রক্ষণশীল ও ধর্মপ্রাণ। তিনি কিছুদিনের জন্য বিদ্যালয়ে পড়লেও প্রধানতঃ গৃহ শিক্ষকের নিকটই শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি Cambridge'এর Trinity College থেকেডিগ্রীলাভ করেন। তারপর তিনি আইন পড়তে শুরু করলেও পাঠ সমাপ্ত করেন নি।

1866-এ হিণ্ডম্যান ইটালীতে যান। তিনি Trentino'র বিরুদ্ধে পরিচালিত Garibaldi'র বাহিনীতে যোগ দেন। এই যাত্রা তাঁর জীবনে ছিল এক সন্ধিক্ষণ। কারণ এর ফলেই বিশ্ব রাজনীতি সম্বন্ধে উৎসাহের আর আগ্রহের সঞ্চার হয়।

1871 থেকে 1880 পর্যন্ত তিনি "Pall Mall Gazette"এর কর্মী ছিলেন। এই সময় থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় সমস্যাবলীর বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন এবং ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক তথা সামাজিক সংস্কারের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা ছিলেন। একবার ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে আমেরিকা যাত্রাকালে জাহাজে বসে Marx'র 'Das Kapital' পাঠ করেন। এরপরেই তিনি সমাজবাদী হয়ে ওঠেন।

1876 সালে হিণ্ডম্যান Matilda Ware-কে বিবাহ করেন। 1913 সালে তিনি পরলোক গমন করেন। পরের বছর তিনি Rosalind Travers নামে এক মহিলা কবিকে বিবাহ করেন। 1923 সালে তাঁরও জীবনাবসান ঘটে। 1921 সালের 22 নভেম্বর হিণ্ডম্যান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

হিণ্ডম্যানের অনেক সুহৃদ ছিল। George Meredith, Mazzini, Karl Marx, William Morris, Clamenceau, George Bernard Shaw। তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন দাদাভাই নওরোজী, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রাই এবং বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিরা।

বাগ্মী, তার্কিক ও লেখক হিণ্ডম্যান ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক সমাজবাদী আন্দোলনের সংগঠন ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইংলণ্ডের প্রথম সমাজবাদী দল 'Socialist Democratic Federation'এর (SDF) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। "The Fabian Society", "Socialist League" এবং "Independent Labour Party" মূলতঃ SDF-র ভাবধারা দ্বারা পুষ্টিলাভ করেছিল। Marx'এর "Surplus Value" নীতি অনুযায়ী তাঁর "ইংলণ্ড সবার জন্য" (England For All) ছিল সর্বপ্রথম জনপ্রিয় বুলি।

ভারতের জন্যও হিণ্ডম্যানের কার্যকলাপ ছিল অসাধারণ। তাঁর বহু প্রবন্ধে এবং গ্রন্থে, বিশেষতঃ "Awakening of Asia"য় তিনি ভারতে বৃটিশ শাসনের ত্রুটির ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে লুণ্ঠন ও অসভ্যতা চলছে ন্যূনতম বাণিজ্যিক সততাও তাকে সমর্থন করতে পারবে না।' তিনি আরো বলেছিলেন—'ভারতে ইংলণ্ড যা করেছে মানব জাতির ইতিহাসে আর কখনও এতবড় অপরাধ সংঘটিত হয় নি।'

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে হিণ্ডম্যানের প্রধান অবদান হলো তিনি ইংরাজী-ভাষী জগতের সামনে ভারতের সমস্যাবলীকে উপস্থাপিত করেছিলেন। SDF'এর পত্রিকা "Justice" ভারতে বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল কারণ হিণ্ডম্যান এই পত্রিকায় ভারতে বৃটিশ ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারকদের তীব্র সমালোচনা করতেন।

1881-এ তিনি দাদাভাই নওরোজীকে লিখেছিলেন তিনি সর্বদা ভারতের জন্য যুদ্ধ করবেন। ঊনিশ বছর পরে আরেকটি চিঠিতে তিনি নওরোজীকে ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন কি কারণে তিনি ভারতের জন্য দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—'একমাত্র আপনি ব্যতীত জগতে আর যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা আমি ভারতের জন্য অনেক বেশী করেছি। অবশ্য, তার জন্য কিছু যায় আসে না। ভারতেই হোক আর ইংলণ্ডেই হোক্ সর্বত্রই মানুষও একপ্রকার জন্তু বিশেষ। জন্তুদেরও আমি উপবাসী রাখার পক্ষপাতী নই—সেইজন্য আমি সবার প্রতি কর্তব্য পালন করি।'

হিণ্ডম্যানের প্রচুর অর্থ ছিল কিন্তু তিনি তার অধিকাংশই সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে ব্যয় করেছিলেন। অসম্ভব উদ্যমী, অস্থির চিত্ত, এবং বাক্‌পটু মানুষ হিসাবে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন ভালবাসতেন এবং প্রধানতঃ এই ছিল তার নীতিধারণের উদ্দেশ্য। তাঁর একজন রাজনৈতিক জীবনীকার তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের ছবিটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন—আন্দোলনের স্বার্থে তিনি কোন প্রকার মহান আত্মত্যাগ করেন নি বরং সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি আত্মিক পরিপূর্ণতা আহরণ করেছেন। H. G. Wells তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে বলেছেন—'তাঁর ছিল ভ্রান্ত গোয়ার্তুমি।' তিনি পরাজয় বরণ করতে পারতেন কিন্তু বিধ্বস্ত হতেন না।

সমাজবাদীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের এবং বহুলাংশে উদারপন্থী অপেক্ষা টোরি মনোভাবাপন্ন। বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি মার্কসবাদী ধারণাকে আত্মগত করতে পারেন নি। তিনি সাংবিধানিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলশেভিকদের এবং লেনিনের প্রধান সমালোচক ছিলেন।

হিণ্ডম্যান ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন কিন্তু তিনি বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হোক্। আদর্শ ভারতীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে 'বৃটিশ তত্ত্বাবধানে দেশীয় রাজ্য শাসনের' সপক্ষে ছিলেন তিনি।

নিউমোনিয়া থেকে আরোগ্য লাভের পরে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। "Golders Green Crematorium" এ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। লাল পতাকা আচ্ছাদিত তাঁর কফিনটি তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুবর্গ বহন করে নিয়ে যান। তাঁদের কণ্ঠে ছিল Chopin এর Funeral March সঙ্গীত। সেখানে সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর Marseillaise'র দুটি স্তবক পাঠ করা হয়। Rosalind Hyndman পরে এক বন্ধুকে লিখেছিলেন —'শোকার্ত বন্ধুবর্গ তাঁর অস্তিত্ব ও কাজের স্থায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারেন নি।'

[H. M. Hyndmam—England For All (1881) ; —Historical Basis of Socialism (1883) ;—Commercial Crisis of the 19th Century (1902) ;—The Record of an Adventurous Life (1911) ; Further Reminiscences (1912) ;—The Economics of Socialism (1915) ;—Evolution of Revolution (1920) ;—Awakening of Asia (1920) ;—The Life to Come (Unfinished) ; G. Truzuki—H. M. Hyndman and British Socialism (1961) ; Rosalind Hyndman—Last Years of H. M. Hyndman (1923) ; Sidney Webb—Socialism in England (1890) ; B. Max—History of British Socialism(1919-20) ; E. J. Gourld—Hyndman : Prophet of Socialism (1928).]

অসীম চৌধুরী

(কুমুদ প্রসন্ন)

এইচ. ডি. রাজা (১৯০৪-১৯৫৯)

H. D. Raja (1904-1959)

হরিহর ধর্ম রাজা 1904 এর 31 আগষ্ট ত্রিবাংকুর রাজ্যের সেনকোটা অঞ্চলের নিকটবর্তী কায়ানকুলামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিহর আয়ারের আদি বাসভূমি ছিল মাদ্রাজের তিন্নেভেলি জেলার ইলাথুর

গ্রাম। হরিহরের দ্বিতীয়া স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর গর্ভে রাজার জন্ম হয়। 1956 সালের আগষ্ট মাসে তাঁর মাতৃদেবী পরলোকগমন করেন। রাজার পিতা ছিলেন একজন তামিল ব্রাহ্মণ। তিনি একটি কাপড়ের দোকানের সাহায্যে মাসে একশো টাকার মত উপার্জন করতেন। 1938 সালে চৌত্রিশ বছর বয়সে সরোজিনী নাম্নী আঠারো বছরের এক অ-ব্রাহ্মণ মহিলার সঙ্গে রাজা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁদের একটিমাত্র সন্তান জন্মলাভ করে।

রাজা যখন পঞ্চম বর্ষীয় বালক সেই সময় কায়ানকুলামের একটি মালয়ালম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তিনি সেখানে সাত বছর অধ্যয়ন করেন তারপর তিনি একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। মাত্র সাত বছর বয়সে রাজা শ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্র হিসেবে কিং জর্জ ফিফথ করোনেশন মেডেল লাভ করেন। এরপর তিনি 1920-এ ত্রিবান্দ্রমে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 1923-এ সেখান থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কায়ানকুলামে থাকাকালীন তিনি জনৈক স্বদেশপ্রেমীর জীবনী অবলম্বনে লেখা একটি মালয়ালম গ্রন্থ পাঠ করেন। এই স্বদেশপ্রেমী পুরুষ হলেন স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পিল্লাই যিনি রাজনৈতিক কারণে ত্রিবাংকুরে নির্বাসিত হয়েছিলেন। যদিও রাজা ইংলিশ মিডল্ স্কুলে পড়ার সময়ে ছাত্র ধর্মঘট প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন তবুও তিনি জ্ঞানচর্চার জন্য যথেষ্ট সময় পেতেন। তিনি সমগ্র গীতা গ্রন্থটিকে পুংখানুপুংখভাবে অধ্যয়ন করেন এবং অত্যন্ত আবেগ সহকারে কোনও ভুলভ্রান্তি না করে এর শ্লোকগুলোকে আবৃত্তি করতে পারতেন। ডাঃ বরদারাজালু নাইডু এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের বক্তৃতা রাজাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তরুণ রাজার হৃদয়ে তাঁদের প্রভাব হয়েছিল গভীর ও স্থায়ী।

রাজার কর্মজীবন ছিল বিচিত্র এবং কিয়ৎ পরিমাণে অদ্ভুত। তিনি বহু ধরনের পেশা অবলম্বনের চেষ্টা করেছিলেন। 1925-এ তিনি শুল্ক বিভাগের করণিকের কাজ গ্রহণ করেন। 1934 সালে তিনি মোটর গাড়ীর ব্যবসায় শুরু করেন এবং এই উদ্দেশ্যে সিংহলে যান। তিনি নিউজিল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়াও পরিভ্রমণ করেন। তিনি বি. টি. বিশ্বানি নামে বোম্বাইয়ের একজন পাঠ্য পুস্তক প্রকাশকের সহযোগী হিসেবেও কাজ করেন। তিনি 'ইয়ুথ লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। এ ধরনের সংগঠন ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দিককার সংগঠনগুলোর অন্যতম। তিনি 'ইয়ং লিবারেটর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন এবং জ্বালাময়ী ভাষার সাহায্যে দেশের যুবসমাজকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হতে উৎসাহিত করেন। তিনি 'কৌশিক' এই ছদ্মনামে লিখতেন।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজার ছিল এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। 1924-এ রাজা বোম্বাই শহরে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। ঐ বছরই তিনি বোম্বাইতে যুব আন্দোলন গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। 1930 সালে লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের জন্য রাজাকে ছয় মাসের জন্য কারাবাস করতে হয়। তিনি অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। বোম্বাইতে তাঁর নেতৃত্বে 'গণ বাহিনী'র সৃষ্টি হয়। এই বাহিনীর লক্ষ্য ছিল অহিংস উপায়ে হাইকোর্ট, আয়কর ও শুল্ক অফিস প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকার করা। ফলস্বরূপ, 1930-এ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তিনি ধৃত হন এবং তাঁকে সাড়ে চার বছর কারান্তরালে কাটাতে হয়েছিল। প্রথমবার 1932 সালে জেল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং বোম্বাই সরকার কর্তৃক মাদ্রাজ প্রদেশে অন্তরীণ হন। পরের বছর মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামালার (দি হিন্দু, 5 আগষ্ট 1933) আসামী হিসেবে পুনরায় তাঁকে এক বছরের জন্য কারাবরণ করতে হয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আর্থিক সাহায্য দানের দায়ে পুলিশ 1942 সালে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং 1943 সালের আগষ্ট মাসে তিনি মুক্তিলাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মতবিরোধ হেতু কংগ্রেসের সঙ্গে সকল সংস্রব ছিন্ন করে 1950-এ একটি প্রজাতান্ত্রিক দল গঠন করেন। 1952 সাল থেকে তিনি ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য। তিনি আইরিশদের অনুকরণে একটি সরকার ও সমান্তরাল ধাঁচের সেইরকম আদালত গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন।

1959-এ 30 নভেম্বর পঞ্চান্ন বছর বয়সে রাজার কর্মময় জীবনের অবসান হয়। তাঁর মৃত্যুতে দেশ হারাল যথার্থ প্রজাতন্ত্রবাদী, একজন ক্ষমতাসম্পন্ন সাহসী বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীকে।

[Nilkan Perumal—A Crusade Against the Commonwealth; The Bombay Chronicle Files, 20 February 1931 ; The Hindu Files, 20 August 1942, 22 April 1951, and 1 December 1959 ; N. N. Mitra (Ed.)—The Indian Annual Register, 1931 (Jan-June), Vol. I.]

(ইমান্যুয়াল ডিভিয়েল) বি. নরসিংহরাজন

এ. কে. গোপালন (১৯০৪—১৯৭৭)
A. K. Gopalan (1904—1977)

এ. কে. গোপালন, বন্ধু ও গুণমুগ্ধদের প্রিয় এ. কে. জি. 1904 সালের জুলাই মাসে তেল্লিচেরির নিকট মাভিলাইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেরালার অন্তর্ভুক্ত উত্তর মালাবারের আয়িল্যাথ কুট্টিয়েরি নামে পরিচিত এক নায়ার পরিবারের সন্তান। ব্রিটিশ শাসনের সূচনাকালে এটি একটি পদস্থ সামন্ততান্ত্রিক পরিবার ছিল। কিন্তু গোপালনের জন্মকালে এই পরিবারটি তার পূর্বতন মর্যাদা হারিয়ে একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে পরিণত হয়। গোপালনের পিতা ভি. কে. রায়রু নাম্বিয়ার একজন অতি প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন এবং 'ব্যবসায়মিত্রম্' ও 'সমুদয় দীপিকা' নামক দুটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তিনি একটি ইংলিশ মিড্‌ল স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'তালুক বোর্ডে'র নির্বাচিত সদস্যদের অন্যতম ছিলেন। জনসাধারণের সঙ্গে মেশা এবং জনহিতকর কার্যে অংশগ্রহণ করা—এই ছিল পিতার নিকট থেকে গোপালনের প্রথম শিক্ষা।

গোপালনের মাতা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। কিন্তু গোপালনের প্রতি তাঁর স্নেহ এতই গভীর ছিল যে গোপালন যখন অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত 'তিয়া' বন্ধুদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন—তখন তিনি তাঁকে বাধা দিতেন না। গোপালন তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, তাঁর মা তাঁর সর্বপ্রকার জনহিতকর কাজের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সর্বকাজে সহায়তা করতেন।

রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করার আগেই তিনি বিবাহ করেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে তাঁর গভীর আকর্ষণ উপলব্ধি করেই তাঁর পিতা তাঁকে এই পথ থেকে নিবৃত্ত করার অভিপ্রায়ে তাঁর বিবাহ দিয়ে দেন। 1930 ও 1932 সালে অসহযোগ আন্দোলন ও গুরুবায়ুর মন্দিরে প্রবেশাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনকালে তিনি দুবার গ্রেপ্তার বরণ করলে তাঁর পত্নীর জ্যেষ্ঠতাত তাঁর পত্নীকে বলপূর্বক তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যান এবং পরবর্তীকালে তাঁরা আর কখনও মিলিত হন নি। 1952 সালে গোপালন দ্বিতীয়বার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী সুশীলা গোপালন ছিলেন চেরথালা তালুকের অন্তর্ভুক্ত চিরাপাণ্ডিয়ার অধিবাসী এক সাধারণ পরিবারের কন্যা। তাঁর পিতা করুণাকর পানিকর দীর্ঘকাল মুহাম্মা মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় গোপালন বেশ কয়েক মাস তাঁদের গৃহে তাঁর গোপন আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। গোপালনের দ্বিতীয়া পত্নীর একটি কন্যা হয়। সুশীলা গোপালন স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্তা ছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। 1967 থেকে 1971 পর্যন্ত তিনি লোকসভার সদস্যা ছিলেন।

গোপালন মিশন হাইস্কুল থেকে সেকেণ্ডারী লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তেল্লিচেরীর ব্রেনেন কলেজ থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি পেরালাসেরী বোর্ড স্কুলে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ. কে. শঙ্করন নাম্বিয়ার এই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি সেখানে সাত বৎসর কাজ করার পর জনসাধারণের হিতার্থে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রধান শিক্ষক স্বয়ং জনহিতকর কার্যের প্রতি উৎসাহী ছিলেন ; এই কারণে গোপালন সহজেই তাঁর অবসর সময়টুকু জনসাধারণের সেবায় ব্যয় করতে পারতেন। তিনি অনগ্রসর ছাত্রদের জন্য বিশেষ ক্লাস নিতেন এবং ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। তিনি খাদি প্রচার কার্যে এবং কংগ্রেসের কার্যপ্রণালীর অংশ হিসাবে বয়স্ক শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কালিকটের মুসলীম স্কুলে তিনি এক বছরের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংগে তার একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

1930 সালে ডাণ্ডিতে গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। প্রত্যেক রাজ্যেই প্রাদেশিক নেতারা

এই উদাহরণ অনুসরণ করতে শুরু করেন। মালাবারের কে. কেলাপ্পন পায়ান্নুরে এই আন্দোলন উদ্বোধন করার মনস্থ করেন। পথে তেল্লিচেরীর কাছে চোভ্ভায় তাঁকে এক সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং গোপালন তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন স্থির করেন। গোপালনের শিক্ষক জীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে ও তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে রাজনৈতিক কাজে নিয়োজিত করেন।

গোপালন কালিকটে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কান্নানোর ও ভেলোর জেলে আটক রাখা হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি সমগ্র উত্তর মালাবারে কংগ্রেস আন্দোলন সংগঠিত করেন। 1931 এর নভেম্বর মাসে যখন কেল্লাপ্পন মন্দিরে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকারের জন্য গুরুবায়ুর সত্যাগ্রহ শুরু করেন তখন গোপালন সত্যাগ্রহের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর উপাধ্যক্ষ ছিলেন। 1932 এর জানুয়ারী মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কয়েকটি কারা-আইন অমান্য করার জন্য তাঁর শাস্তিবিধান হয়। শাস্তিভোগকালে কান্নানোরের জেল-ওয়ার্ডাররা তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। অন্য এক সময়ে বেলারি জেলেও তাকে প্রচণ্ড প্রহার করা হয় এবং কয়েক সপ্তাহ দিবারাত্রি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। 1932-33 সালে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য যখন বন্দীত্ব গ্রহণ করেন—সেই সময়ে এই ঘটনাগুলি ঘটে।

1934-এ গোপালন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। কিন্তু তিনি কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিরও সম্পাদক ছিলেন। গোপালন, ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ ও পি. কৃষ্ণ. পিল্লাই একযোগে বেশীর ভাগ সক্রিয় কংগ্রেস কর্মীকে সোস্যালিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করে সোস্যালিস্ট পার্টি 1940-এ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক শাখায় পর্যবসিত না হওয়া পর্যন্ত একটি নির্ধারিত বামপন্থী প্রবণতা যুক্ত দল হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। 1934 থেকে একাদিক্রমে ছয় বছর গোপালন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। এক বছর তিনি কেরালা কংগ্রেস কমিটিরও সভাপতি ছিলেন। এই সময় তিনি মালাবারে মজদুর কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। 1936-এর ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে তিনি কোট্টায়াম ও কুরুম্বরানাদ তালুকে জনসংযোগের জন্য জাঠা পরিচালনা করেন।

আন্দোলনকারী হিসাবে গোপালনের ক্ষমতা ছিল বিস্ময়কর। 1937-এ তিনি মাদ্রাজে শত সহস্র অশিক্ষিত চাষী মজদুরকে অনুপ্রাণিত করে 750 মাইল পর্যন্ত এক 'ভুখা মিছিল' পরিচালিত করেন। এই মিছিল কান্নানোর থেকে হাঁটা শুরু করে লাখ লাখ চাষী মজদুর ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষকে সোস্যালিস্ট চেতনা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে মালাবার তামিলনাদের গ্রাম-গ্রামান্তর অতিক্রম করে। এই কাজের জন্য গোপালন ন'মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ত্রিচিনোপোলির কারাগারে বন্দী হন।

1938 -এ ত্রিবাংকুরে স্যার সি. পি. রামস্বামী আইয়ারের স্বেচ্ছাচারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ বিরোধিতার সময় গোপালন চল্লিশজন স্বেচ্ছাসেবক সমন্বিত এক জাঠার নেতৃত্ব দেন। তাঁরা কেরালার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করেন এবং জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তোলেন। গোপালনকে ত্রিবাংকুরে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

1940-এ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গে গোপালনকে জন-সংগ্রাম সংগঠনের জন্য আত্মগোপন করতে হয়। কিন্তু 1941-এর মার্চ মাসে তাঁকে ত্রিচিনোপলিতে গ্রেপ্তার করা হয়। ভেলোর কারাবাসকালে তিনি জেলের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পের দাবীতে আঠারো দিন অনশন করেন। 1941-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জেল ভেঙ্গে পলায়ন করে পাঁচ বছর আত্মগোপন করে থাকেন। 1946-এ পেরিনতালমান্নায় এক নির্বাচনী-প্রচারে বক্তারূপে আত্মপ্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় নি। গ্রেপ্তার করলেও এবার তাঁকে শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হয়।

স্বাধীনতালাভের পরও গোপালনকে আত্মগোপন করে কাজ করতে হয়। যদিও 1947-এর ডিসেম্বর মাসে প্রিভেণ্টিভ্ ডিটেন্শন অ্যাক্ট অনুসারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু মাদ্রাজ হাই কোর্টে 'হেবিয়াস কর্পাস' আবেদন পেশ করে তিনি যে শুধুমাত্র নিজে মুক্তিলাভ করেন তাই নয় ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি আইনতঃ স্বীকৃতিলাভ করে। ভারতের সাংবিধানিক আইনের ক্ষেত্রে এই মামলার রায় ঐতিহাসিকতার দাবী রাখে।

1951-এ মুক্তিলাভের পর গোপালন সংসদীয় কর্মে ব্যাপৃত হন। তিনি 1952, 1957, 1962 এবং 1967-এ কাসেরগোড কেন্দ্র থেকে লোকসভার

সদস্য নির্বাচিত হন। কিছুকালের জন্য তিনি লোক-সভায় কম্যুনিস্ট দলের নেতা ছিলেন। 1964-এ দলবিভাগের পর তিনি মার্কসবাদী ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং বহুদিন তিনি লোক-সভায় এই পার্টির নেতা ছিলেন। তিনি সি. পি. আই (এম) এর পলিটব্যুরোরও একজন সদস্য।

গোপালন সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, শ্রীলংকা, মালয় ও সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ সফর করেন। তিনি 1952'র সেপ্টেম্বর মাসে পিকিং-এ আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে এবং অক্টোবর মাসে মস্কোয় উনবিংশতিতম সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির কংগ্রেসেও যোগদান করেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরের পর তিনি মালয়ালাম ভাষায় 'I Saw A New World' নামে এক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন। তাঁর আত্মজীবনী তিনবার প্রকাশিত হয় এবং শেষটি 1972 সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। তিনি 'Kerala Past And Present' নামেও অপর একটি পুস্তক লেখেন।

অসংখ্য সংগ্রাম গোপালনকে ইস্পাতের ন্যায় কঠিন করে তুলেছিল। তাঁর চলার পথে কোন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিপক্ষকে তিনি কখনও ভয় করেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তাঁর দেশপ্রেমের গভীরতা প্রমাণিত হয় এবং তারপরও সারাজীবন তিনি জনগণের সেবায় প্রয়োজনবোধে পরিচালিত কোন সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত হন নি। 1957-এ গৃহহারা পার্বত্য উপজাতি-সমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য অমরাবতীতে কয়েক সপ্তাহ যাবত অনশন তাঁর আত্মত্যাগী দুর্দমনীয় সত্তার প্রতীক। তিনি অত্যন্ত সদাচারী যদিও কোন কোন সময় তিনি অত্যন্ত দ্রুত কঠোর সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। প্রধানতঃ তিনি মালাবার এবং অন্যান্য প্রদেশে কৃষক আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বহুবার সর্ব-ভারতীয় কিষাণ সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি একজন জনচিত্তস্পর্শী বক্তাও ছিলেন। অন্ততঃ এক-বারও যিনি কোন কারণে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন অথবা পরিচিত হয়েছেন তিনি তাঁর সম্বন্ধে গভীর সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন।

[A. K. Gopalan—Autobiography, Kottayam, 1972; Viswa Vijnana Kosh (Encyclopaedia in Malayalam); Article on A. K. Gopalan, Lok Sabha's Who's Who, New Delhi, 1967; India Who's Who, 1969, Infa Publications, New Delhi, 1969; D. R. Mankekar—The Red Riddle of Kerala, Bombay, 1965; Personal knowledge of the Contributors.]

পি. কে. গোপালকৃষ্ণ
এ. পি. ইব্রাহিম কুঞ্জুরু

এ. কে. পিল্লাই (১৮৯৩-১৯৪৯)
A. K. Pillai (1893-1949)

ত্রিবাংকুরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অন্যতম অগ্রণী সংগঠক ও সদস্য এবং কেরালার একজন প্রধান নেতা ছিলেন এ. কে. পিল্লাই। জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি দেশকে এবং জনগণকে গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বাদেশিকতার চেতনা ও স্বদেশবাসীর সেবা দেশের শক্তিবৃদ্ধি ও পুনরুজ্জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

তিনি কেরালায় অবস্থিত পালাক্কালের কুইলন জেলায় 1893-র 16 এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন এবং 1949-এর 5 অক্টোবর মাত্র 56 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি এক সম্ভ্রান্ত ও সম্পদ-শালী নায়ার পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা কুঞ্জুরামান আসন একজন কৃষিবিদ্ ও গ্রাম-প্রধান ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন লক্ষ্মী আম্মা। এ. শংকর পিল্লাই ও কে. কল্যাণী আম্মা যথাক্রমে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনী ছিলেন। গোমতী আম্মা ও বি. কল্যাণী আম্মা নামে তাঁর দুই পত্নী ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা।

প্রথানুগভাবে তিনি মালয়ালাম ভাষাতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ইংলিশ হাই স্কুলে শিক্ষা শুরু করেন এবং পরিশেষে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1919 সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন কিন্তু গান্ধীজীর উপদেশানুসারে তিনি এই শিক্ষা সমাপ্ত করেন নি। অবশ্য পরে 1930 সালে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

তিনি তিনবার ইংলণ্ডে যান। প্রথমবার উচ্চ-শিক্ষার্থে—দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার যথাক্রমে ইণ্ডিয়ান

স্টেট্‌স্‌ পিপল্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশন ও র‍্যাডিকেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র প্রতিনিধিত্বের জন্য তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এরপর তিনি রেঙ্গুন ও বর্মা যান। ইউরোপে বাসকালীন তিনি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া লীগের কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং বহু রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

মানবিকতাবোধ তিনি তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরু গান্ধীজীর নিবিড় সান্নিধ্য তাঁর অন্তরে স্বদেশী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এম. এন. রায়ের সাহচর্য তাঁর সামনে সামাজিক চেতনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। ছাত্রাবস্থায় শ্রীমতী বেসান্তের "হোম রুল" আন্দোলন তাঁকে আকৃষ্ট করে। বিদেশ পর্যটন ও বহু নতুন আদর্শের সঙ্গে পরিচয় তাঁর কার্যাবলী ও ভাবধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ফরাসী ও রুশ ভাষায় বিপ্লব-বিষয়ক সাহিত্য, স্বামী বিবেকানন্দের রচনা-সমূহ, গোপালকৃষ্ণ গোখলের ভাষণাবলী এবং সমগ্র গান্ধী-সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। এই সকল সূত্র থেকে তিনি যে ফসল সংগ্রহ করেছিলেন তা' তাঁর আদর্শ, মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

কেরালার জনগণের কাছে ভারতের জাতীয় মহা-সভার বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাংবাদিকতাকেই তিনি অন্যতম প্রধান বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মালয়ালাম সংবাদপত্র "স্বরাট" এবং মালয়ালাম মাসিক পত্রিকা "স্বদেশাভিমানী"'র মাধ্যমে তিনি কার্যতঃ কংগ্রেস ভাবধারাই প্রচার করতেন। তিনি সুদক্ষ বক্তাও ছিলেন। তিনি মালয়ালাম ভাষায় সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ "Congress and Kerala' নামে কংগ্রেসের সম্বন্ধে একটি ইতিহাস লেখেন।

তিনি ত্রিবাঙ্কুরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক ছিলেন। তিনি প্রাদেশিক ও জাতীয় উভয় স্তরেই পার্টি'র উচ্চতম পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এছাড়াও "All Travancore Youth League" এবং "Travancore State Congress" এর ওপরেও তাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল। পরে তিনি 'র‍্যাডিকেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি''রও একজন প্রধান নেতা হয়েছিলেন। তিনি কয়েক বছর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং অনেক বছর কেরল প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির ও তার কর্মসংবাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসভার লণ্ডন শাখারও সদস্য ছিলেন (1929-30)।

তিনি সমাজ সেবামূলক কাজেও উৎসাহী ছিলেন এবং আজীবন রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী কাজের সঙ্গে সঙ্গে এই কাজও অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা ছিল সমাজ থেকে প্রাচীন কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীভূত করা। জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি অন্ত্যজ মানুষের সঙ্গে তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতেন।

প্রিন্স অফ্‌ ওয়েল্‌স্‌ যখন ভারত ভ্রমণে আসেন তখন তিনি ত্রিবাঙ্কুরে হরতাল সংগঠন করেন এবং কুইলন-এ সমস্ত দোকানবাজার বন্ধ করানোর জন্য বন্দী হন।

1921 থেকে 1928 পর্যন্ত পিল্লাই কংগ্রেসের জন্য তাঁর সমস্ত সময় এবং সংস্থান উৎসর্গ করেন এবং কংগ্রেসের কর্মসূচী রূপায়ণে প্রেরণা দেবার চেষ্টা করেছেন। মন্দির প্রবেশের জন্য ভাইকম সত্যাগ্রহের তিনি একজন প্রধান সংগঠক এবং নেতা ছিলেন। এই সত্যাগ্রহের ফলে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। কারামুক্তির পরেও তিনি এ সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। 1924-এ 'আইনপরিষদ-প্রবেশ' সম্পর্কে গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন নি।

1928-এ ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি ভারতীয় নির্বাসিত ও ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বহু প্রতি-ষ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন। 'Indian States Peoples' Association' এর একজন আধিকারিক প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের দাবী ও সমস্যা বিষয়ে ইংলণ্ডের জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তিনি অনেক লেখালিখি করেন ও বক্তৃতা দেন। 1930-এ বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইন-বিষয়ক মহাসভার অধিবেশনে তিনি ভারতীয় আইন-প্রণালীর গুণগত মানের ওপর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। এটি কংগ্রেসের নিকট অতি উচ্চ-প্রশংসিত বলে বিবেচিত হয়। এই সময়ের ঘটনা-বলীর পরিবর্তন ও Gandhi-Irwin Pact তাঁকে অত্যন্ত হতাশ করে। 1932-এ তিনি রেঙ্গুনে গমন করেন এবং সেখানে চার বৎসরকাল ব্যারিস্টারি করেন। তিনি সেখানে বর্মা রেল কর্মী ইউনিয়ন গঠন করেন এবং এক বৎসর তার সাধারণ সভাপতি ছিলেন।

ভারত থেকে বর্মা বিচ্ছিন্ন হবার পর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে পুনর্বার

অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি এম. এন. রায়ের নেতৃত্বাধীনে কর্মরত 'র‍্যাডিকেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'তে সোস্যালিস্ট হিসাবে যোগদান করেন। 1943-তে তিনি ইংলণ্ড যান এবং তিন বৎসর পর মজদুর উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। আকস্মিক উৎসাহের প্রাবল্যে তিনি মজদুর উন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত হন নি; তার পিছনে গভীর বিশ্বাস ও আদর্শ নিহিত ছিল। স্বাধীনতালাভের পর তিনি স্যার সি. পি রামস্বামী আইয়ার প্রবর্তিত 'Independent Travancore Plan' সমর্থন করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এইটিই একমাত্র নিন্দাজনক পদক্ষেপ।

তিনি এমন একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন যিনি সমাজের ওপর জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার কুপ্রভাব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং এই অমানবিক ঘৃণ্য সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তিনি আধুনিকতার সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল। প্রথাগত ধর্মে তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না। তিনি প্রায় সর্বদাই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের বিরোধিতা করতেন। কিন্তু তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না।

তাঁর উদার চিত্তবৃত্তি তাঁকে পশ্চিমী শিক্ষা-ব্যবস্থার গুণগ্রাহী করে তুলেছিল। স্বভাবতঃ গান্ধীবাদী হওয়ায় তিনি বিশ্বাস করতেন ঈপ্সিত সমাধানে পৌঁছবার একমাত্র পথ অহিংসা।

তৎকালীন আন্তর্জাতিক বিষয়ের প্রতি তাঁর গভীর উৎসাহ ছিল এবং তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি পক্ষপাতহীন ন্যায্য ব্যবহার প্রাপ্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কখনই ভারতের ওপর ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক শাসন পছন্দ করেন নি এবং যত শীঘ্র সম্ভব এই দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসনের অবসান কামনা করতেন। তাঁর মতে কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত—'ভারতে একটি কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক শক্তির অধীনে একত্র হওয়ার পর অবশিষ্ট ক্ষমতা যেন কেন্দ্রের হস্তেই ন্যস্ত থাকে।'

তিনি ব্রিটিশ শাসনাধীনকালে জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। চিন্তায় ও কাজে তিনি অত্যন্ত তেজোময় ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত খদ্দর পরিধান করেছেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত সকল ব্যক্তির হৃদয়ই তিনি তাঁর নিষ্পাপ চরিত্র এবং মার্জিত সুন্দর ব্যবহার দ্বারা জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি 1949-এ পরলোক গমন করেন।

[A. K. Pillai—A Short Life Sketch ; Congress And Kerala (in Malayalam); Aboo Siddique—Seethi Saheb (Malayalam.)]

(এন. এম. কে. নায়ার) টি. কে. রবীন্দ্রন্

এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)
A. K. Fazlul Haq (1873-1962)

1873 সালের 26 অক্টোবর পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলার চাখার গ্রামে এক বিত্তশালী পরিবারে আবুল কাশিম ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাজী মহম্মদ ওয়াজেদ ও সৈয়ৎউন্নিসার একমাত্র পুত্র ছিলেন। বদরুন্নিসা ও আফজুন্নিসা নামক তাঁর দুই ভগিনী ছিল। ফজলুল হকের পিতা ছিলেন বরিশালের সরকারী উকিল। ওকালতি ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর পিতামহ কাজী আক্রাম আলি ফার্সিতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বরিশালে মোক্তারি করতেন। ফজলুল হকের পিতা জনহিতকর কাজের জন্যও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্র এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করতেন। সুতরাং আশ্চর্যের কিছুই নেই যে ফজলুল হক তাঁর পিতার থেকেই এই ধারা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। এমন কি, তিনি প্রয়োজনবোধে ধার করেও অন্যান্যদের সাহায্য করতেন।

ফজলুল হক তিনবার বিবাহ করেন। তাঁর প্রথমা পত্নী খুর্শেদ বেগম নবাব সৈয়দ মহম্মদ খান বাহাদুরের কন্যা এবং মতিলাল নেহেরুর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী ডঃ সৈয়দ হোসেনের ভগিনী ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন জিনৎউন্নিসা। জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে তিনি মীরাটের খাদিজা বেগমকে তৃতীয়া পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনে ফজলুল হক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রথাগতভাবে আরবী ও ফার্সিতে ইস্‌লামিক শিক্ষাসমাপনান্তে তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং 1890-তে সেই বিদ্যালয় থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সি

কলেজে অধ্যয়নের জন্য কলকাতায় আসেন এবং 1894 সালে সেখান থেকে তিনি রসায়ন, গণিত ও পদার্থ-বিদ্যায় অনার্সসহ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1896-এ তিনি গণিতবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতবিদ্যায় তিনিই প্রথম মুসলমান এম. এ। তিনি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মূলতঃ ইংরাজী নিয়ে পড়তেন কিন্তু পরে গণিতবিদ্যা-তেও নিজের ব্যুৎপত্তি প্রমাণের জন্য তিনি বিষয় পরিবর্তন করেন। 1897-এ তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

1903-04 সালে বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যাপকরূপে ফজলুল হক তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতা সম্বন্ধেও উৎসাহী ছিলেন। 1901-06 সাল পর্যন্ত তিনি "বালক" এর সম্পাদক এবং 1900-03 সাল পর্যন্ত "ভারত সুহৃদ" এর সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি একটি বাংলা প্রাত্যহিক পত্রিকা "নবযুগ" এবং আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকার সংগেও যুক্ত ছিলেন। তিনি মুসলমান যুব সম্প্রদায়ের লেখক, কবি ও সাংবাদিকদের নিয়ে এমন একটি দল গঠন করেছিলেন যাঁরা বাংলার বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে প্রভূত সহায়তা করেন। 1906-এ তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে সরকারী কাজে যোগ দেন এবং 1908-12 সালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন এবং আসীন থাকেন। 1912-এ তিনি সরকারী পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন এবং অনতিবিলম্বে সুদক্ষ উকিলরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্যার আশুতোষ মুখার্জির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং ডব্লু. সি. ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, নরেন্দ্রনাথ সেন, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, লালমোহন ঘোষ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অম্বিকা মজুমদার, শামসুল হুদা, আব্দুল রসুল, পি. সি. রায় প্রমুখ প্রথিতযশা ব্যক্তি-দের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

ফজলুল হক তাঁর যৌবনকাল থেকেই রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাংলাদেশে মুসলমানদের দুরবস্থা তাঁকে এই সমস্যা ও এই সম্প্রদায়ের উন্নতি-সাধনের প্রতি আরো মনোযোগী করে তোলে। ভারতে মুসলমান স্বার্থরক্ষার প্রধান পুরুষ হিসাবে 1906-এ ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করেন এবং মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন। কিন্তু 1913 সালে বাংলা বিধান পরিষদে প্রবেশের সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। 1934-36 এই দুই বৎসর 'সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি'র সদস্য থাকাকালীন সময় ছাড়া বঙ্গ-ভঙ্গ পর্যন্ত তিনি বাংলা বিধান-পরি-ষদের সংগে যুক্ত ছিলেন। 1913 সালে তিনি 'রয়্যাল কমিশনের' সামনে 'পাবলিক সারভিসের' পক্ষে সাক্ষ্য দেন। 1913-16 সাল পর্যন্ত তিনি 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগে'র সচিব এবং 1916-21 সাল পর্যন্ত তিনি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। মুসলিম লীগের একপ্রকার প্রথম সারির নেতা হওয়া সত্ত্বেও ফজলুল হক ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সংগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 1916 সালে কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে 'লখনৌ চুক্তি' সম্পাদনের তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। 1918-19 সালে সাধারণ সম্পাদক হবার আগে 1917-এ তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক-রূপে কাজ করেন। 1919 সালে কংগ্রেস যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর্যা-লোচনার জন্য 'পাঞ্জাব তদন্ত কমিটি' গঠন করে তখন মতিলাল নেহেরু, সি. আর. দাশ এবং অন্যান্য স্তম্ভ-স্বরূপ ব্যক্তিগণের সংগে ফজলুল হকও সদস্য নির্বাচিত হন। 1920 সালে তিনি মেদিনীপুরে আয়োজিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

অসহযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ফজলুল হক কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন। 1924 সালে বাংলা যখন দ্বৈত শাসনাধীনে তখন তাঁকে শিক্ষা মন্ত্রকের মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু স্বরাজ্য পার্টির বিরোধিতার জন্য তিনি শীঘ্রই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তিনটি গোল টেবিল বৈঠকেই (1930-1933) ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি কিছুদিনের জন্য কলকাতা পৌরসভার সদস্য ছিলেন এবং 1935-এ তিনি কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন।

'সেন্ট্রাল লেজিসলেচারে' দু'বৎসর (1934-35) থাকার পর তিনি পুনরায় 1936 সালে বাংলার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেন। জিন্না এবং অন্যান্য চরমপন্থীদের সংগে মতৈক্য না হওয়ায় তিনি মুসলিম লীগের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। 1937-এ নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে তিনি 'কৃষক-প্রজা পার্টি' নামে এক নতুন দল গঠন করেন। তিনি মুসলিম লীগ নেতা নাজি-মুদ্দিনকে পরাজিত করে বাংলা বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রথমেই তিনি কংগ্রেসের সংগে মিলিত

হয়ে এক মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব পেশ করলে বাংলার কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু এই প্রস্তাবে সাড়া দিতে আগ্রহী হন। কিন্তু কংগ্রেস হাই-কমান্ডের অদূরদর্শিতার ফলে বাংলায় এই মিলিত সরকার গঠনের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এই পদক্ষেপ কতখানি অপরিণতবুদ্ধি প্রসূত ও অপরিণামদর্শী ছিল ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী তারই সাক্ষ্য বহন করে। মুসলিম লীগ তৎক্ষণাৎ এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির সংগে মিলিত হয়ে সরকার গঠন করতে সম্মত হয়। এই সময় থেকেই বাংলায় লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফজলুল হক মুসলিম লীগের অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংগে মিলিত হতে বাধ্য হন এবং 1940-এ 'লাহোর রেজোলিউশনে' প্রথম কার্যতঃ পাকিস্তানের জন্য দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু লীগের চরমপন্থীদের প্রতি ফজলুল হকের সত্যিই কোন প্রীতি ছিল না। 1941-এ তিনি লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এর ফলে বাংলার মিলিত মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। অতঃপর তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সংগে মিলিত হয়ে এক নতুন সরকার গঠন করেন। এর অসাম্প্রদায়িকতা, প্রগতিশীলতা ও জাতীয়তাবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মুসলিম লীগ ও বৃটিশ আমলাবর্গ উভয়েই অত্যন্ত অপছন্দ করেন। তাঁদের ষড়যন্ত্রানুসারে 1943-এ ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং নাজিমুদ্দিন মুসলিম লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। ভারতের সংগে মুসলিম বিচ্ছেদবাদের জোয়ার তাঁর পক্ষে রোধ করা অসম্ভব—একথা সুনিশ্চিতভাবে অনুভব করায় 1946-এ তিনি পুনরায় মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

দেশ বিভাগের পর ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হন। 1954 সালে 81 বৎসর বয়সে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে কৃষক-শ্রমিক পার্টি নামে এক নতুন দল গঠন করেন। তিনি মুসলিম লীগের বিপক্ষে সম্মিলিত বিরোধী জোটের নেতা নির্বাচিত হন। 1954-এ তিনি পূর্ব পকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দুটি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উভয় কেন্দ্র থেকেই বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন এবং স্বল্পস্থায়ী এক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভা 57 দিন পরে বাতিল হয়ে যায় এবং গভর্ণরের শাসন প্রবর্তিত হয়। 1955-এ পাকিস্তানের নবগঠিত শাসনতন্ত্রে তাঁর দলভুক্ত অনুগামীদের মধ্যে বহু সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিরূপে গ্রহণ করা হয়। 1956-এ তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। দুই বৎসর পর কোন এক পাকিস্তানী সাংবিধানিক বিশৃঙ্খলতার ফলে তাঁকে পদচ্যুত হতে হয়। 1962-র 27 এপ্রিল ফজলুল হক দীর্ঘ কাল-পরিক্রমা শেষে পরলোক গমন করেন।

ফজলুল হকের বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে বাংলার জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক জীবনে তিন দশক ধরে তাঁর প্রবল দাপট তাঁকে 'শের-ই-বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করে। বদান্যতা ও অমায়িকতার জন্য তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পরম প্রিয় নেতা ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা ও তাঁকে অনুকরণের প্রচেষ্টা পার্টির সীমা অতিক্রম করে জাতিধর্মনির্বিশেষে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি মনে করতেন শুধুমাত্র স্বধর্মীদের মধ্যেই নয় বাংলার অন্যান্য সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করা তাঁর কর্তব্য। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে তিনি বাংলার বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের (ইসলামিয়া কলেজ অধুনা মৌলানা আজাদ কলেজ, লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ, ওয়াজেদ মেমোরিয়াল গালর্স হাই স্কুল এবং চাখার কলেজ) গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ফজলুল হক গ্রামীণ মানুষ বিশেষতঃ কৃষকদের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে আসায় তাদের প্রতি জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার ও অবিচারের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞাত ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে 'Debt Settlement Act' দ্বারা কৃষকদের আর্থিক অসুবিধা অনেকটা লাঘব হয়। ফজলুল হকের জীবদ্দশাতেই তাঁর বদান্যতা ও দান বাংলাদেশে প্রবাদস্বরূপ হয়ে ওঠে। দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য তিনি নিজে ঋণ করেছেন এমন ঘটনা বিরল নয়। ব্যক্তিগত ও বাহ্যিক জীবনের উভয় ক্ষেত্রেই সারল্য এবং অনাড়ম্বরতা ছিল তাঁর মূলধন। তাঁর সাম্প্রদায়িকতাবাদ—1940 সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান রেজোলিউশন'—মানুষের মন থেকে মুছে গিয়ে শুধু বদান্যতাটুকুই বেঁচে থেকেছে—এটিই তাঁর প্রতি এক সার্বিক অবিনশ্বর অর্ঘ্য।

ভগবৎদত্ত প্রতিভা ও শক্তির আকর হওয়া সত্ত্বেও ফজলুল হক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সারাজীবনই এক বিভ্রান্তিকর পুরুষ হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁর দুর্বলতার উৎস ছিল তাঁর অস্থিরচিত্ততা—ফলে

কোন একটি বিশিষ্ট মতাদর্শে অবিচলিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। রাজনৈতিক জীবনের এই উত্থান পতন খুব স্বাভাবিকভাবেই এই উপমহাদেশীয় জনজীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যাপারে যাঁদের সংগে তাঁর কোন মতৈক্য ছিল না তাঁরাও তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক বিভ্রান্তি সত্ত্বেও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। ফজলুল হকের মহত্বই ছিল এর একমাত্র কারণ।

[Proceedings of the Bengal Legislative Council, 1913-33 ; Proceedings of the Indian Legislative Assembly, 1934-35 ; Proceedings of the Bengal Legislative Assembly, 1937-44 ; A. K. Fazlul Haq—Bengal Today, Calcutta, 1944 ; P. Pattabhi Sitaramayya—The History of the Indian National Congress, Vol. I, Bombay, 1946 ; The Statesman, Calcutta, 28 April 1962 ; The Amrita Bazar Patrika, Calcutta, 28 April 1962 ; The Pakistan Observer ('Sher-e-Bangla' Supplements), 27 April 1964 and 27 April 1965 ; Personal interview of the Research Fellow with A.H.M. Wazer Ali, nephew and son-in-law of Fazlul Haque, and A.N.M. Yusuf Ali, nephew of Fazlul Haq.]

(অমলেন্দু দে) আবদুস সুভান

এ. টি. পন্নিরসেলভাম (স্যার) (1883-1940)

A. T. Pannirselvam (Sir) (1883-1940)

স্যার এ. টি. পন্নিরসেলভাম 1883-র 1 জুন মাদ্রাজের (তামিলনাড়ু) তাঞ্জোর জেলাভুক্ত (অধুনা তাঞ্জাভুর) পিরুমপনিয়ুর-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওডিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত (বলিষ্ঠ কৃষিজীবী সম্প্রদায়) ছিলেন। তিনি রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ছিলেন। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে তাঁর পূর্বপুরুষরা ধর্মান্তরিত হন। তিনি ত্রিচিনোপল্লির (অধুনা তিরুচিরাপল্লী) সেন্ট যোসেফ কলেজে দশম শ্রেণী (ম্যাট্রিকুলেশন) পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তিনি ইংলন্ড গমন করেন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিটারহাউসে যোগদান করেন, কিন্তু সেখানে কোন ডিগ্রী গ্রহণ করেন নি। তিনি 'ইনস্ অফ কোর্টের' একটি শাখায় যোগদান করেন এবং 'ইংলিশ বার' এ প্রবেশাধিকার লাভ করেন।

1910 এ ইংলন্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি প্রথমে মাদ্রাজে ওকালতি শুরু করেন। সম্পদশালী ও অবকাশপূর্ণ জীবন হওয়ায় (তিনি মিরাসদার পরিভারভুক্ত ছিলেন) তিনি লোকহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হন। তাঁর সমসাময়িক রাজনীতিগণের ন্যায় তিনিও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেই শিক্ষানবিশী করেন। 1918 থেকে 1920 পর্যন্ত তিনি তাঞ্জোর মিউনিসিপাল্ কাউন্সিল-এর সদস্য ছিলেন। 1922 থেকে 1930 পর্যন্ত আট বৎসরকাল তিনি তাঞ্জোর জেলা বোর্ডের সদস্য ও বেশ কয়েক বৎসর বোর্ডের সভাপতিও ছিলেন। তিনি এই চাল-উৎপাদনকারী ব-দ্বীপাকার বিশিষ্ট অঞ্চলে বহু আকাঙ্ক্ষিত রাস্তা সমূহ নির্মাণের ব্যবস্থাও করেন। তিনি 1922-25 সাল পর্যন্ত District Education Council-এরও সভাপতি ছিলেন। গোল টেবিল বৈঠকে তাঁকে রাজ্যের ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। জনহিতকর কার্যে লিপ্ত হবার পর তিনি 'জাস্টিস পার্টি'তে যোগদান করেন। 1930-এ তিনি মাদুরা-রামনাদ ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে Madras Legislative Council-এর সদস্য নির্বাচিত হন। Legislative Council-এ তাঁর ভাষণ ও তাঞ্জোরের শাসনকার্য নির্বাহ বিবরণী থেকে তাঁর যে বাস্তবসম্মত শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তার জন্য 1937-এর এপ্রিল মাসে তাঁকে Governor's Executive Council-এর সদস্য মনোনীত করা হয় এবং অভ্যন্তরীন কার্যসমূহ তাঁর পরিচালনাধীন করা হয়। ঐ একই বৎসর তাঁকে 'নাইট' উপাধি প্রদান করা হয়। 1940-এ তিনি 'Secretary of State Council'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু 1940-এর 1 মার্চ একদল ব্রিটিশ সামরিক সেনাসহ তিনি একটি বিমানে ইংলন্ড গমনকালে বিমানটি এক জার্মান বোমারু বিমান দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। এইভাবে পারস্য উপসাগরে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। 1930 সালে যখন অল্প কিছুদিনের জন্য অপেক্ষাকৃত কর্মমুক্ত ছিলেন সেই সময় তিনি ই. ভি. রামস্বামী নাইকারের 'দ্রাবিড় কাজাগাম' সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে দ্রাবিড়স্থান গঠনের দাবীতে এর থেকেই ডি. এম. কে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পন্নিরসেলভাম বাগ্মী ছিলেন না কিন্তু সুতার্কিক ছিলেন। তাঁর বক্তৃতাসমূহ ছিল বাস্তববুদ্ধি সমৃদ্ধ এবং যুক্তিগুলি ছিল তথ্য সমর্থিত। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা Legislative Executive Council-এর কার্যাবলী নির্বাহকালে তাঁর সহায়ক হয়েছিল। তাঁর সাধারণ জ্ঞান ও শাসনকার্যে দক্ষতার জন্য তিনি তাঁর সচিব ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীগণের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তাঁর শারীরিক অসুস্থতা ও অক্ষমতার মধ্যে কেটেছে। কিন্তু তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্লচিত্ত এবং যে কোন শ্রেণীর মানুষের থেকে তাঁর শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল সদাজাগ্রত। তিনি কর্মকালীন সময়েও কখনও আত্মাভিমান বা আত্মসচেতনতা প্রকাশ করতেন না। তাঁর স্বতোচ্ছ্বাসিত প্রফুল্লতা তাঁকে রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে নিয়ে গেছে। খ্রীষ্টানদের স্বার্থরক্ষায় কখনও তাঁর গোঁড়ামি প্রকাশ পায় নি। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বহু বন্ধুও তাঁর ছিল। জেলা ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রের রাজনৈতিক জীবনেই তিনি হিন্দুগণের ও হিন্দু প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যানুসারে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্য দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনে ও জনপ্রিয়তা অর্জনে কতখানি সক্ষম হতে পারেন তিনিই তার প্রমাণ।

[Proceedings of the Madras Legislative Council, 1930-40 ; Proceedings of the Round Table Conference ; The Hindu Files ; The Justice Year Book, 1929 ; Directory of the Madras Legislature, 1938 ; Who's Who in Madras, 1934.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) এম. রত্নস্বামী

এডোয়ার্ড গ্যুবার্ট (১৮৯৪— ?)

Edouard Goubert (1894— ?)

এডওয়ার্ড গ্যুবার্ট 1894 সালের 29 জুলাই পণ্ডিচেরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন জাতিতে ফরাসী। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। গ্যুবার্টের পিতা ফ্রান্সে যান এবং পরে পণ্ডিচেরীতে বন্দরের মুখ্য অফিসার হন। তাঁর মাতা ছিলেন একজন ভারতীয়। ফ্রাঙ্কো-ভারতীয় গ্যুবার্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ও ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। 1834 সালের জুলাই মাসে Salett Angeot (একজন হরিজন) নামে এক মহিলাকে প্রথমবার বিয়ে করেন। 1926 সালে তাঁর পত্নীর মৃত্যু ঘটে। 1928 সালের অক্টোবর মাসে Gladis Fonseca's সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়। 1965 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর খুড়তুতো বোন Marie Lopez-কে বিয়ে করেন।

গ্যুবার্ট ছিলেন স্বভাব নেতা। বলা হয় যে তাঁর জীবনে প্রথমা পত্নীর বিরাট প্রভাব ছিল। তিনি এ্যানি বেসান্ত এবং Lamartine, Racine এবং Corneill প্রমুখ সাহিত্যিকদের দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 7 বৎসর বয়সে তিনি পণ্ডিচেরীর এক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 1915 সালে তিনি ইন্দোচীনে যান এবং পাঁচ বৎসর পর 1920 সালে Baccalaureat ডিপ্লোমা লাভ করেন। 1921-22 সাল পর্যন্ত তিনি আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেন এবং 1925 সালে ফ্রান্সের Montpellier বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ব্যবসায়ের অনুমতি পত্র পান।

1917-1945 সাল পর্যন্ত বহুবার পড়াশুনা ও অফিসের কাজে ফ্রান্সে যান। 1948-49 সালে ভারতে ফরাসী উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্যও তিনি ফ্রান্সে যান। জাতীয় মহাসভায় তিনি ফরাসী ভারতে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন এবং ইংলণ্ডে ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করেন।

1926-এ গ্যুবার্ট সাহেব Greffier (প্রথম বিচারালয়ে রেজিস্ট্রার) পদে যোগ দেন এবং Juge de Paix (ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট) হিসাবেও কাজ করেন। পরে তিনি পণ্ডিচেরী এবং চন্দননগরে চাকরী করেছিলেন। 1951 সালের মার্চ পর্যন্ত রাজনীতি করা সত্ত্বেও তিনি Greffier পদে আসীন থাকেন (যদিও ফরাসী আইন অনুসারে যাঁরা রাজনীতিতে লিপ্ত থাকতেন তাঁদের) বিচার, প্রশাসন এবং পুলিশী বিভাগের অধীনে চাকুরি করা সম্পর্কে বিধিনিষেধ ছিল।

1945-এ গ্যুবার্ট "Les vrais causes de notre malheur" (অর্থাৎ আমাদের দুর্ভাগ্যের প্রকৃত কারণ) নামে এক রচনা প্রকাশ করেন। 1946-এ পণ্ডিচেরীর প্রতিনিধি-সভায় তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়ে সভার উপসভাপতি হয়েছিলেন। তিনি ডেপুটি

মেয়র এবং "Conseil du Government"-এর সভ্যপদেও নিযুক্ত হন। 1947 সাল পর্যন্ত সক্রিয় রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ তেমন তীব্র ছিল না। প্রথম দিকে তিনি শ্রমিক নেতা ডি. সুব্বাইয়াকে সমর্থন করে যান। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 1951-এ তিনি সমাজবাদী দল নামে একটি স্বতন্ত্র দল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই দলের সঙ্গে ফ্রান্সের সমাজবাদী দলের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সুব্বাইয়ার নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে দরিদ্র এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করা।

1947 সালের আগস্ট মাসে ভারতের স্বাধীনতা পণ্ডিচেরীর রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটায়। ফরাসীদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করাই ছিল ফ্রান্স-অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের আকাঙ্ক্ষা। ভারত এবং ফ্রান্স উভয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার কথা গ্যুবার্ট প্রথম ভেবেছিলেন। সেই সময় ফ্রান্সের সঙ্গে বিশেষ ধরনের সম্পর্ক বজায় রেখে ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ার সম্ভাবনার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করতেন। পণ্ডিচেরীকে বিশেষ মর্যাদাদানের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং 1947 সালে "L'Union et L'avenir (ভবিষ্যৎ একীকরণ) নামক একটি রাজনৈতিক নিবন্ধে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। ফরাসী ভারত ফরাসী ইউনিয়নের ভিতরেই এক স্বয়ংক্রিয় এলাকায় পরিণত হবে এবং পূর্ণ ক্ষমতা ফরাসী ভারত প্রতিনিধি সভায় দেওয়া হবে, এবং এই সভা ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখবে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি ভারত ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর করার পক্ষপাতী ছিলেন।

1948-এ তাঁর পরিকল্পনার কথা জানাতে তিনি ফ্রান্সে যান এবং নতুন দিল্লীর সঙ্গেও আলাপ আলোচনা চালান। পরবর্তীকালে তিনি মন্তব্য করেন যে নতুন দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের মতানৈক্য এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তার পরে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এটা স্পষ্ট যে 1954 সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের সঙ্গে মিশে যেতে চাননি। 1948 থেকে 1953 পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্র তথা স্থানীয় পত্রিকাগুলিও তাঁর ভারতের নীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

1951 থেকে 1954 সাল পর্যন্ত গ্যুবার্ট ফরাসী জাতীয় সভায় ফরাসী ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন।

1954-এ আকস্মিকভাবে গ্যুবার্টের মতের পরিবর্তন ঘটে। তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেন ফরাসীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হওয়ায় এবং ভারত সরকার অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলেই ভারতভুক্তি প্রস্তাবের সমর্থন করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। অন্য একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন ফরাসী সরকার তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যোগী হলে তিনি গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যই ভারতভুক্তির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। যাইহোক, তিনি পণ্ডিচেরী থেকে সরে গিয়ে নেট্টাপক্কমে পাল্টা সরকার গড়ে তুলে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা শুরু করেন। তাঁর মতের পরিবর্তনের পেছনে যে কারণই থাকুক না কেন এটা অনস্বীকার্য যে নেট্টাপক্কমে তাঁর কার্যকলাপ ভারতভুক্তির আন্দোলন জোরালো করে তোলে। 1954 এর শেষদিকে ফরাসী সরকার তাঁদের দাবী ত্যাগ করে এবং শেষ পর্যন্ত ফরাসী অধিকৃত এলাকা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকৃত হয়। গ্যুবার্ট পরে পণ্ডিচেরীতে কংগ্রেস দলের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন (1955-56) এবং সেখানকার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হন।

ভারতে ফরাসী ঔপনিবেশিকতার অবসানে গ্যুবার্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। সুচতুর এই রাজনীতিবিদ কি আকস্মিক ভাবে দেশ সেবকে পরিণত লাভ করেছিলেন তা ঐতিহাসিকদের কাছে প্রহেলিকা। যাইহোক এটা বলা চলে যে নেট্টাপক্কমে আন্দোলন নিঃসন্দেহে ফরাসী প্রভুত্বের বিলোপ সাধনে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ফরাসী ভারত থেকে বিদেশী শাসনের উচ্ছেদকল্পে গ্যুবার্টের অবদানের গুরুত্ব অনেকখানি।

[Liberation Files (1949-50) ; Jeunesse Files (1947-48) ; The Swadandiram Files (1948-54) ; The Hindu Files (1947-54) ; Proceedings of the Pondicherry Representative Assembly, 1948-54 ; Chaffard G-Les Carnets Secrets de la decotonisation, Paris, 1965 ; Goubert, E—Les Vrais causes de notre malheur, Pondicherry, 1945.]

ইমানুয়েল ডিভিয়েন **ই. ডিভিয়েন**

আম্মা এ. ভি. কুট্টিমাল্ন (১৯০৫-১৯৮৫)

Amma A. V. Kuttimalu (1905-1985)

কুট্টিমাল্ন আম্মা তাঁর মাতুলালয় অনক্কারা ভটক্কাথে (পূর্বতন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মালাবার জেলায়, বর্তমানে কেরালায়) 1905 সালে 23 এপ্রিল এক মধ্যবিত্ত নায়ার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পেরুম্পিলাভিল গোবিন্দ মেনন। তিনি মাদ্রাজ সরকারের রাজস্ব বিভাগে চাকুরী করতেন। মায়ের নাম অনক্কারা ভটক্কাথ মাধবী আম্মা। কুট্টিমাল্ন আম্মা কালিকটের একজন প্রখ্যাত কংগ্রেসী নেতা ও আইন ব্যবসায়ী কোজিপুরথ মাধব মেননের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন (1925)। তাঁদের দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

তেল্লিচেরি, মাদ্রাজ ও কালিকটের স্কুলে কুট্টিমাল্ন আম্মা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইংরেজি, তামিল মালয়ালম, তেলেগু এবং হিন্দী ভাল জানতেন এবং অনর্গল বলতে পারতেন এবং মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেবার মত কন্নড় ভাষাও জানতেন। তাঁর সৎ মাতা কে. এম. আম্মার দৃষ্টান্ত, গান্ধীজীর শিক্ষা, সরোজিনী নাইডুর দীপ্ত ব্যক্তিত্ব, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপ ও নিজের স্বামীর আদর্শ ও চিন্তাধারা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ফলে কুট্টিমাল্ন আম্মা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় 1925 সালে, যখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের যোগদান করেন। আজীবন তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। একজন সাধারণ কর্মী থেকে ক্রমশঃ তিনি কংগ্রেসের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হন। কালিকটের নগর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থেকে তিনি জেলা কংগ্রেস কমিটির (মালাবার) সভাপতি হন। 1932 সালে কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্না নেত্রীরূপে তিনি নির্বাচিত হন। তিনি তিনবার কারাবরণ করেন এবং মোট পাঁচ বছর ভেলোরের মহিলাদের প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী জীবন যাপন করেন।

কুট্টিমাল্ন আম্মা মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য (1936 এবং 1946) ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটর (1946-1952) ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যা হন। তিনি চার বছর (1954-58) কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা ছিলেন।

সমাজ কল্যাণমূলক কাজে কুট্টিমাল্ন আম্মা অত্যুৎসাহী ছিলেন। 'পুওর-হোম সোসাইটি'র তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী ও সদস্যা ছিলেন (কালিকট)। মানব-সেবায় উদ্বুদ্ধ এই সংস্থার মাধ্যমে তিনি দরিদ্র, অসহায়, নিরাশ্রয়, পঙ্গু ও কুষ্ঠরোগীদের নিরলস সেবা করেন, সর্বদা তাদের পাশে থেকে সহায়তা করেন। হরিজন কল্যাণ সাধন, অস্পৃশ্যতা নিরোধ, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন এবং খাদি আন্দোলনের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের দ্বারাই ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের আদর্শ অনুমোদিত স্বনির্ভরতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

বিভিন্ন প্রচার কার্যের মাধ্যমে ও স্বীয় জীবনের কর্মধারার মধ্য দিয়ে কুট্টিমাল্ন আম্মা মালাবার ও তামিলনাড়ুতে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

[Personal interviews with Sri K. Madhava Menon, Mukthi, Kozhikode-3, one of the prominent national leaders of Kerala and with Sm. Kuttimalu Amma ; Kerala District Gazetteers—Kozhikode, by A. Sreedhara Menon, Trivandrum, 1962 ; The Year Book and Who's Who in Madras, 1954, Compiled by N. Ahmed Koya, Kozhikode ; Nair Service Society Swarnagrandham, published by N. S. S. Golden Book Committee, Changana-cherry, December 1964, Ormakal, by E. Moidun Maulavi, Calicut, 1960 ; Congress and Kerala, by A. K. Pillai, published by the Kerala Provincial Congress Committee, 1953, The Mathrubhumi (a Nationalist daily), Ernakulam, A. I. C. C. Supplement dated 24 September 1966 and 8 May 1965]

(এন. এম. নায়ার) পি. কোচুনি পানিককুর

এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার (১৮৭৭-১৯৩৪)

A Rangaswami Iyengar (1877-1934)

এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের জন্ম 1877-এর জনুলাই-এ তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর প্রদেশের এরুকাটুর নামে এক গ্রামে। তাঁর বাবা নরসিংহ আয়েঙ্গার ছিলেন একজন ছোট জমিদার। তাঁর মা ছিলেন মাদ্রাজে রেজিস্ট্রেশনের ইনসপেক্টর জেনারেল দেওয়ান বাহাদুর শ্রীনিবাস রাঘব আয়েঙ্গারের কন্যা এবং জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক এস কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের ভগিনী। নাগাপত্তিনম, কোয়েম্বোটুর এবং মাদ্রাজ ছিল তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র। এখান থেকে তিনি কল্যাবিদ্যা এবং আইন বিষয়ে উপাধি প্রাপ্ত হন।

স্কুল এবং কলেজে প্রচুর পুরস্কার লাভ করে মাদ্রাজ সেক্রেটারিয়েটে কেরাণী হিসেবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন কিন্তু খুব শীঘ্রই তাতে পদত্যাগপত্র দাখিল করে তাঞ্জাভুরে 1902 সালে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ব্যারিস্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের আগেই কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার 'হিন্দু' নামে সংগ্রামী অথচ প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী ইংরেজী দৈনিকের (যেটা তিনি 1905 সালে ক্রয় করেছিলেন) সম্পাদনায় সাহায্য করার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠান। ম্যানেজার এবং সহকারী সম্পাদক এই দুই ভূমিকা পালন করে রঙ্গস্বামী সংবাদপত্রটির গড়ে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করেন। কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের সঙ্গে একযোগে জনস্বার্থমূলক কার্যকলাপের ব্যাপারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

1915 সালে যখন ওই সংস্থায় তার সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় তখন তিনি 'হিন্দু' থেকে ইস্তফা দেন। জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের কাছ থেকে তিনি এস রঙ্গস্বামী এবং সি. আর শ্রীনিবাসের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা চালু তামিল দৈনিক 'স্বদেশমিত্রনে'র ভার নেন এবং তার সম্পাদক হন। তাঁর সম্পাদনায় 'স্বদেশমিত্রন' তামিল ভাষায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধ চলাকালীন সময় (1914-18) তিনি শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তিন বছরের জন্য হোমরুল লীগের সম্পাদক ছিলেন। 1919 সালে কংগ্রেসের যে প্রতিনিধিদল ইংলন্ডে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের জন্য আবেদন করতে যায়, তিনি ছিলেন তার সদস্য। মন্টফোর্ডের সংস্কারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় কিন্তু রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার সাংবিধানিক পদ্ধতিতে তখনও বিশ্বাসী থাকায় তিনি এর বাইরেই থেকে যান। যখন চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের মধ্যে নতুন সংস্কারবিধির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তা বিরোধীদের বিধানসভার বাইরে রাখার জন্য নির্বাচনের লড়াই লড়ছিলেন, তখন রামস্বামী আয়েঙ্গার দক্ষিণ ভারতে স্বরাজ্য পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবির্ভূত হন। 1924 সালে তাঞ্জাভুর ত্রিচিনোপলি কেন্দ্র থেকে তিনি কেন্দ্রীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হন এবং বিধানসভায় তিন বছর স্বরাজ্য পার্টির সম্পাদক ছিলেন। 1927 সালে দ্বিতীয় দফায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। দাশের মৃত্যুর পর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বরাজ্য পার্টির নেতা হন। কেন্দ্রীয় বিধানসভায় রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ছিলেন মতিলালের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। অর্থ-নৈতিক এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলির ওপর বিতর্কে তাঁর অবদান গভীর পাণ্ডিত্য এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় উদ্বেগের পরিচয় বহন করে।

বিধানসভায় ভারতীয় শিল্পগুলিকে বিদেশ থেকে আমদানির হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি ওকালতি করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের স্বার্থকে সমর্থন করেছিলেন এবং শ্বেতাঙ্গদের বর্ণ বৈষম্যের নীতিকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন। তিনি নিরব-চ্ছিন্নভাবে যুক্তি প্রদান করেন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের মধ্যে ভারতবর্ষ-কেও সমান স্থান দিতে হবে। 1927 সালে যখন স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের সূচনা করেন তখন রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ভারতীয় ব্যাঙ্কের উন্নতির স্বার্থে তাকে সমর্থন জানান। ভারত সর-কারের বাজেটগুলি সম্পর্কে তিনি খুব সমালোচনামুখর ছিলেন এবং জনগণের খরচাপাতি এবং করব্যবস্থার মধ্যে জন-প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ানোর দাবীও তিনি তুলেছিলেন।

1928-এর জানুয়ারীতে তিনি কস্তুরী শ্রীনিবা-সনের আমন্ত্রণে 'হিন্দু'র সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। যদিও এর ফলে সমস্ত রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কাজ থেকে তাঁকে সরে আসতে হয়, তা সত্ত্বেও কংগ্রেস পার্টিতে সাংবিধানিক উপদেষ্টা হিসেবে তাঁকে রাখার প্রচণ্ড দাবী রয়েই গেল। 1931 সালে লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তিনি প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। গান্ধীজী যিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করে-ছিলেন, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের তাঁর রাজনৈতিক সচিব

এবং সাংবিধানিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

সম্মেলনের নিষ্ফল অবস্থা দেখে এবং গান্ধীর ফিরে আসার পর ভারতে যে দমননীতি চালান হয় তার ফলে রঙ্গস্বামী গভীর হতাশা বোধ করেন। তিনি তা সত্ত্বেও মনে করতেন যে কংগ্রেসের সংসদীয় কার্যকলাপ থেকে সরে আসা উচিত নয়। 1932 সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে তুলে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি—যা 1933 সালেই ক্ষয়ে যাবার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

1933 সালে রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ভারতীয় সংস্কারগুলির ব্যাপারে যুক্ত পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য আবার ইংলণ্ড যান। সেইবছর তিনি ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের খসড়া বর্ণনা করে একটি বই লেখেন যাতে সংবিধান তৈরীর সমস্যাকে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। প্রদেশগুলির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনকে তিনি সমর্থন করতেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তিনি নির্বাচকমণ্ডলী প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং তার বদলে বিধান সভা নির্বাচনের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের একটি পরিকল্পনা বেশী পছন্দ করতেন।

ফিরে আসার পর তিনি বাংলাদেশের ডঃ বি সি রায়, বোম্বাই-এর কে এম মুন্সী প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে সংযোগ রেখে কংগ্রেসের সাংবিধানিক শাখা হিসেবে স্বরাজ্য পার্টি'কে উজ্জীবিত করার কথা চিন্তা করেন। গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিয়ে আন্দোলন যখন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে সেই সময় 1933 সালের শেষ দিকে রঙ্গস্বামী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। এই ব্যাধি থেকে তিনি আর কখনো সেরে ওঠেন নি। 1934 সালের 5ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

একজন সাংবাদিক, পার্লামেন্টারী প্রথাবিদ, সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ এবং বক্তা হিসেবে রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার স্বাধীনতা আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি আনুগত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। কথাবার্তা এবং ব্যবহারে অতিশয় ভদ্র এবং অমায়িক—যে কেউ তাঁর সান্নিধ্যে আসত তার মধ্যেই উৎসাহ উদ্দীপনা, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হতেন। একজন সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা পেশার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণদের মধ্যে আগ্রহ এবং উৎসাহ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর নাম ছিল। সংগীত এবং অন্যান্য ভারতীয় শিল্পকলার অনুরাগী হিসেবে মাদ্রাজের মিউজিক অ্যাকাডেমীর গঠনের ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

[V. K. Narasinhan—Life of S. Kasturi Ranga Iyenger (Publication Division., Govt. of India) ;—Kasturi Srinivasan (Popular Prakashan, Bangalore), The Files of the Hindu, Madras]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) **ভি কে নরসিংহন**

এন. এস. বরদাচারী (১৮৯৭— ?)

N. S. Varadachari (1897— ?)

1897 সালের 25 জানুয়ারী এন. এস. বরদাচারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এন. এস. অনন্তচারী এবং মাতা সিঙ্গারাম্মল। তিরুপতির কাছে তেরানি (নাগরী থেকে এক মাইল) গ্রামে তাঁর জন্ম হয়।

মাদ্রাজের বেজওয়াদা এবং ত্রিপলিকেনে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি ইতিহাস এবং অর্থনীতিতে অনার্স পাশ করেন ; 1918 সালে তিনি বি. এল. ডিগ্রী লাভ করেন।

জীবনের প্রথম দিক থেকেই বরদাচারী ভারতের জাতীয় মহাসভার সমর্থক ছিলেন। 1919-এ কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশ্য সভায় অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার আগেই কংগ্রেসের সেবায় তিনি যেভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তারই স্বীকৃতিরূপে তিনি মাদ্রাজ জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। 1934-এ মাদ্রাজের জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি পৌরোহিত্য করেন। কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে তিনি মাদ্রাজ কর্পোরেশন কাউন্সিলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। 1937-এ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর মন্ত্রীসভায় তিনি কৃষি এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সংসদ সচিব ছিলেন। 1950-এ তিনি পুনরায় মাদ্রাজ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

বরদাচারী 'নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহ' আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং বহু জনসভা ও শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও তিনি মুখ্য সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর নেতৃত্বে বহু স্বেচ্ছাসেবক মাদক দ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতা-

দের দোকানে পিকেটিং করেন। এই আন্দোলন চলাকালে তিনি তিনবার গ্রেপ্তার হন। মাদ্রাজ জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসেবে তিনি কংগ্রেসে প্রচার কার্য ছাড়া নানাভাবে জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রচারে সাহায্য করেন।

তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করতে এবং তাঁর চেতনার অংশীদার হতে তিনি যুবক শ্রেণীকে আহ্বান জানান। ছাত্রদের আহ্বান জানিয়ে তিনি তাদের মনে করিয়ে দিলেন তাদের কর্তব্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আয়োজিত সংগ্রামে যোগ দেওয়া। এই আহ্বান ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে পেঁছে দেওয়ার জন্য তিনি বহু জনসভার আয়োজন করতেন। 1945 এর 12 অগাস্ট তামিলনাড়ু ছাত্র সম্মেলনে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন যে ব্রিটিশের কড়া পাহাড়ায় নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের পরিবর্তে শিক্ষিত দেশবাসী নিয়ন্ত্রিত সরকার গঠনই একমাত্র অভিপ্রেত লক্ষ্য, এই ধরনের নতুন রাষ্ট্র গঠনে যুবক সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের পরিবর্তন সার্থক করে তুলতে দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি বদলের প্রয়োজন তা তিনি উপলব্ধি করতেন; পরিবর্তন সার্থক করে তোলার জন্য ভবিষ্যতে এমন একটি পরিবেশের প্রয়োজন যেখানে রাষ্ট্র শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, বরঞ্চ শিক্ষাই হবে রাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ামক। তাঁর মতে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সঠিক ধাঁচের শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক উৎপন্ন করতে অক্ষম। বরদাচারী একজন সুলেখক ছিলেন, তাঁর লেখা 'Hand spinning and weaving' বইটি যে সময় তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন সেই সময়ের রচনা। সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধ বেশীর ভাগ সময়েই প্রকাশিত হতো 'স্বরাজ্য' নামে মাদ্রাজের সাপ্তাহিক পত্রিকায়।

বরদাচারী আজীবন সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; পরবর্তীকালে সি. রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র দলে তিনি যোগদান করেন। স্বয়ং নেতৃস্থানীয় না হলেও, এক যথার্থ, বিশ্বস্ত সেনাপতি রূপে তিনি নিজেকে জনসমক্ষে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

পরিবর্তনশীলতা এবং রাজনৈতিক দুর্ভোগের মধ্যেও গান্ধীজীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি বরদাচারী।

সর্বভারতীয় স্তরে তাঁকে না দেখা গেলেও স্থানীয় পর্যায়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অত্যন্ত মূল্যবান।

[Directory of the Madras Lagislature (1950); The Hindu Files.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) **এন. সুব্রামনিয়ান**

আসন. এন. কুমারন (মহাকবি) (১৮৭৩-১৯২৪)
Asan. N. Kumaran (Mahakavi)
(1873-1924)

1873 সালের 12 এপ্রিল ত্রিবান্দ্রম জেলার কায়িকারায় নারায়ণন্ ও কালী আম্মার পুত্র কুমারন আসনের জন্ম। তাঁদের পরিবারটি দরিদ্র ছিল—তাঁর পিতা একজন সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁরা 'এজাভা' সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু ছিলেন। আসন 1917 সালে এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সদস্য রাও বাহাদুর ভেলায়ুধন ও ডঃ পালপুর 'থারকৌড়িয়িল' পরিবারের কন্যা ভানুমতী আম্মাকে বিবাহ করেছিলেন। কুমারন আসনের দুই পুত্র।

তিনি 1880 সালে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মালয়ালম্ ও সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করেন। গ্রামের চিকিৎসক তাঁর খুল্লতাত কোচুরমন বৈদ্যান তাঁকে সাহায্য করতেন। পিতা মাতার ন্যায় তিনিও অধ্যয়নশীল, সঙ্গীতপ্রেমী, ধার্মিক ও গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি বাঙ্গালোরের 'চামরাজেন্দ্র সংস্কৃত কলেজে' ও তারপর কলকাতার এক কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বাঙ্গালোরে থাকাকালীন ডঃ পালপুর ও তাঁর পত্নীর সাহায্যে আসন ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন—পরে কলকাতাতে ইংরেজি শিক্ষা ব্যাপক এবং গভীরতর হওয়ার সুযোগ লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকেই হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা রূপ পেয়েছিল—সহায়হীনের সহায় দান এবং সমাজের সেবাই ধর্ম—এই নীতিতে তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকেই আসন তাঁর প্রথম জীবনের প্রেমমূলক কবিতা 'নলিনী (1911), 'লীলা' (1914) প্রভৃতি রচনা করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। সন্ন্যাসী, দার্শনিক

ও সমাজ-সংস্কারক শ্রী নারায়ণ গুরু তাঁর গুরু ছিলেন। বিবেকানন্দের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের যে স্থান ছিল আসনের জীবনে শ্রী নারায়ণ গুরুরও সেই একই স্থান ছিল। গভীর ধর্মীয় ভাবসম্পন্ন হওয়ায় তিনি স্বভাবতই পুরাণের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে Sir Edwin Arnold-এর 'Light of Asia' এবং Dr. Mackay-এর Thousand and one gems of English Poetry আসনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

তাঁর যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন তিনি নিজে যেখানে প্রথম শিক্ষালাভ করেছিলেন সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষক রূপে যোগদান করেন। কিন্তু স্থায়ী চাকুরীর পক্ষে খুব কম বয়স হওয়ায় শীঘ্রই তা পরিত্যাগ করেন। তারপর তিনি কিছুদিনের জন্য স্থানীয় জনগণকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন এবং সেই জন্যই তিনি আসন (গুরু) নামে পরিচিতি লাভ করেন। কলকাতায় শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি প্রত্যাবর্তন করে শিষ্যরূপে শ্রী নারায়ণ গুরুর গুরুকুলে যোগদান করেন। 1903 সালে যখন 'শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম্' শুরু হয় তখন তিনি এর সেক্রেটারী হন এবং 1919 সাল পর্যন্ত এই কাজেই নিযুক্ত থাকেন। এই বছরগুলি আসনের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সামান্য কিছু সামাজিক সুবিধা ছাড়া 'এজাভা'দের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একত্র হওয়ার অধিকার ছিল না। লেখা ও বক্তৃতা এই উভয়ের মাধ্যমেই আসন জাতিভেদের বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার শুরু করেন। 1909 সালে তিনি 'এজাভা'দের পক্ষ থেকে 'ত্রিবাংকুর লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে' প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অর্জন করেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের অধিবাসীগণের জন্য সাধারণ বিদ্যালয় এবং সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার লাভ করেন। সাধারণ রাস্তা দিয়ে চলাচলও তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। গুরুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে 'এস. এন. ডি. পি. যোগম'-এর পক্ষ থেকে আসন গুরুর বাণী প্রচার এবং বিশেষ করে তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কেরালার বিভিন্ন স্থানে বহু মন্দির এবং মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। আলওয়ের 'অদ্বৈতাশ্রম' তাদের অন্যতম। 'যোগমের' প্রধান কার্যালয় ছিল ভারকলা-য়। 1920 সালে তিনি 'যোগমের' সেক্রেটারী পদ ছেড়ে আলওয়ের আশ্রমের পরিচালক হন। 1923 সালে তিনি 'যোগমের' সভাপতি হন এবং এই সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

অবদমিত শ্রেণীর মুক্তির প্রচেষ্টা ও সমাজ সংস্কারের ধর্মযুদ্ধে তিনি জোরের সঙ্গে এগিয়ে চলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সাহিত্যিক ও কাব্যিক প্রতিভাকে সমসাময়িকভাবে নিরস্ত রেখেছিলেন। তাঁর প্রথম যুগের রচনা 'Veena Poovu' (1909) তাঁর কাব্য প্রতিভা প্রমাণ করে। মালয়ালাম কাব্যে এই কবিতা এক নতুন মনোমুগ্ধকর গীতিকাব্যিক সুর সংযোজন করে। আসন পূর্বের কবিদের থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন—তিনি সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে, যেমন একটি ঝরে পড়া ফুলকে কেন্দ্র করে জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। মৃত্যু অনিবার্য কিন্তু এর অর্থ সম্পূর্ণ অবলুপ্তি নয়—এটি একটি বৃত্তের অংশমাত্র এবং জীবন শুধুমাত্র এক তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা। Chintavishtayaya Seetha (দুঃখিনী সীতা) তে তিনি পার্থিব জীবনের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন—বিশেষতঃ নারীদের এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় নারীদের।

তাঁর পরবর্তীকালের কবিতাগুলি সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যধর্মী। এই সব কবিতায় জাতিভেদ প্রথার অর্থহীনতা ও দুঃখদায়ক দিকটিকেই পরিস্ফুট করা উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। 'Duravastha'-য় (1923) এই বক্তব্যকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর পূর্বেও 'Oru Thiyakuttiyute Vicharam' (1908, একটি থিয়া বালকের চিন্তা) ও 'Simlanadam' (1919) থেকে জাতিভেদ সম্বন্ধে তিনি কতোখানি উদ্বিগ্ন ছিলেন সহজেই বোঝা যায়। অপর একটি গ্রন্থ 'Duravastha' চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এছাড়া একটি সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী কবিতা 'Chandala-Dikshuki' সমতাধর্মী ভাব অবলম্বন করে এটি রচিত। এখানে দেখানো হয়েছে ভালবাসার মধ্যে কোন জাগতিক বাধা নেই। অনেকের মতে তাঁর শেষ কবিতা 'Karuna'-ই সর্বোত্তম। কারণ অসাধারণ কাব্যিক সুষমা ছাড়াও এটিতে অন্যান্যগুলির মতো কোন সামাজিক প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল না। কোন সামাজিক সমস্যাগত ভাব কেন্দ্র করে এটি রচিত নয়, এটি বৃহত্তর জীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। এই কবিতাগুলি থেকে আসনের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও লক্ষিত হয়। এই প্রভাব তাঁর রচিত 'বুদ্ধচরিতম্' (5 খণ্ড) থেকে আরও স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। এটি 'Light of Asia'-এর অনুবাদ হিসাবেই শুরু করেন কিন্তু ক্রমে এটি তাঁর মৌলিক রচনায় পরিণত হয়। আসন রচিত বহু কবিতার মধ্যে বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কবিতাগুলিই এখানে

উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে জীবনের বাস্তবতা, সমাজ চেতনা ও জীবন দর্শন সম্পর্কিত গভীর আবেগের সঙ্গে অপূর্ব কাব্যিক সুষমার মিশ্রণ ঘটেছে। কিছুকালের জন্য তাঁর প্রকাশিত দুটি পত্রিকা 'Vivekodayam' এবং 'Pratibha'-এর মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে।

সমাজ সংস্কারক, পণ্ডিত এবং কবি হিসাবে তাঁর গুরুত্ব ও পরিচিতি সুবিস্তৃত ছিল। 'ত্রিবাঙ্কুর লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্যপদ ছাড়াও 'গভর্ণমেণ্ট ল কমিটির' ও 'ত্রিবাঙ্কুর টাউন ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটি'র সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি পঞ্চায়েত বিচারকও ছিলেন। এছাড়া তিনি 'ত্রিবাঙ্কুর টেক্সট বুক কমিটি'র সদস্য পদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

'Swatantragatha' ও 'Bharatamayuram' এর ন্যায় কবিতাগুলিতে তাঁর জাতীয় চেতনা সুপরিস্ফুট। রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে সামাজিক স্বাধীনতা তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সামাজিক বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথা তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। 1922 সালে 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' তাঁর ভারত ভ্রমণকালে তাঁকে সোনার বালা, রেশমী উত্তরীয় এবং 'মহাকবি' উপাধি দানে পুরস্কৃত করেন। তিনি তপস্বীর ন্যায় জীবন যাপন করতেন। 1924 সালের 17 জানুয়ারী মাত্র একান্ন বছর বয়সে তিনি এক মর্মান্তিক নৌকা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। সামনের আরো অনেকগুলি বছর তাঁর সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। কুমারন আসন সম্বন্ধে স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার বলেছেন,—'তার সম্প্রদায়ের নেতা অগ্রণী সমাজ সংস্কারক ছাড়াও একজন স্বীকৃত সুকবি রূপে আসন মালয়ালাম কাব্যে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।'

[Personal Interview with K. Prabhakaran, Manager, Sarada Book Depot, Thonnakkal (younger son of Kumaran Asan, N.) ; Kerala Prativa (Sanskrit renderings of some famous Malayalam poems)—by N. Gopala Pillai ; In Malayalam : Mahakavi Kumaran Asan (A Biographical study)—by C. O. Kesavan ; Kumaran Asan : Literary Biography—by K. Surendran ; Kerala Bhasha Pranayikal (Malayalam Men of Letters Series) VI ; Mahakavi Kumaran Asan—by Kunnathu Janardana Menon ; Kumaran Asan Chila Smaranakal—by K. Sadasivan ; Asan Smarakagrandham—Published by Sarada Book Depot, Alwaye ; Asan Souvenir—1958 ; Karinthiri—by Joseph Mundasseri ; Veenapu Kanmunpil—by K. M. Daniel ; Kumaranasante Kavita—compiled by Kavita Samiti, Trivandrum (Published by Sarada Book Depot, Thonnakkal) ; Vivekodayan—journal ; Atmaposhini—Monthly Magazine ; Kerala Kaumudi, Malaylam Daily, Dated 27th June 1952 and 4th May 1966 ; Kumaran Asan's own publications : Veena Poovu (The fallen flower) ; Nalini ; Leela ; Sri Buddha Charitam—in five parts ; Chintavishtayaya Seetha ; Duravastha ; Karuna ; Pushpavadi ; Randu Khandakrithikal ; Chandalabikshuki ; In English : An extract of the Report of the Syndicate of the University of Madras, 1922 ; Nalini—English verson in verse and sonnets—by A. M. Lakshmanan ; Original Biographical Notes—written by Kumaran Asan, N.]

এন. এম. কে নায়ার **টি. সি. শংকর মেনন**

এন. গোগিনেনি রঙ্গা (১৯০০- ?)

N. Gogineni Ranga (1900-?)

1900 সালের 7 নভেম্বর অন্ধ্র প্রদেশের সমৃদ্ধ গুন্টুর জেলার নিদুব্রোলু গ্রামের এক মধ্যবিত্ত কৃষিজীবী পরিবারে নিদুব্রোলু গোগিনেনি রঙ্গানায়কুলুর জন্ম হয়। তিনি 'রঙ্গা' নামেই অধিক জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁরা 'খাম্মা' হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই পরিবারটি প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণা জেলার গোগিনেনি পালেমের অধিবাসী ছিলেন। সেখান থেকে পরে এরা গুন্টুরে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা সেখানকার তহশীলদার ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি

অতি অল্প বয়সেই তাঁর পিতামাতা উভয়কেই হারান এবং এক বিধবা আত্মীয়ার নিকট প্রতিপালিত হন।

পঁচিশ বৎসর বয়সে রঙ্গা ভারতী দেবীকে বিবাহ করেন। ভারতী দেবীও পার্শ্ববর্তী গ্রাম মাচাভরমের এক মধ্যবিত্ত কৃষিজীবী পরিবারের কন্যা ছিলেন।

গুন্টুরের স্থানীয় বিদ্যালয় ও কলেজেই রঙ্গা পড়াশুনা করেন। 1920 তে তিনি I. C. S. হওয়ার জন্য অক্সফোর্ডে-এ ভর্তি হন। কিন্তু পরে I. C. S. হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে 'The Economics of Handloom' বিষয়ক গবেষণাপত্র পেশ করে B. Litt ডিগ্রী লাভ করেন।

অক্সফোর্ডে থাকাকালীন রঙ্গা G. D. H. Cole, H. H. Brailsford, Miss Wilkinson, Dr. Radford এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তাশীল অন্যান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবাধীন হন। তাঁদের সাহচর্যে তাঁর ভিতরে সমাজতন্ত্রবাদের যে আদর্শ স্ফুরিত হয়েছিল পরবর্তীকালে যখন তিনি এই আদর্শ ত্যাগ করেন তখনও পুরোপুরি এই প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করেন নি।

গুন্টুরে ছাত্রাবস্থায় তিনি এক গ্রন্থাগারিক এবং এক সমাজসংস্কারকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম ব্যক্তির সাহচর্য তাঁকে সাহিত্যপিপাসু করে তোলে এবং তিনি অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত ও প্লেটোর 'Republic' অতি উৎসাহের সঙ্গে পাঠ করেন। সুসমৃদ্ধ বিজয়নগরের কাহিনী তাঁর মনে গৌরববোধ সঞ্চারিত করে। তাঁর সমসাময়িক বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য বিপ্লবীদের ভাষণও তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল। সমাজ সংস্কারের আদর্শ তাঁকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্প।

এইভাবে প্রথম জীবনে গুন্টুরে প্রাপ্ত শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তীকালে পশ্চিমী সমাজবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ভাবাদর্শ একত্র মিশ্রিত হয়ে কৃষিজীবী সমাজের মধ্যে থেকে রঙ্গাকে এক শৌর্যশালী দৃপ্ত ব্যক্তিত্বে চিহ্নিত করেছিল।

অক্সফোর্ডে থাকাকালীন রঙ্গা সেখানকার প্রজা সংগঠন, সমাজতান্ত্রিক সংস্থাসমূহ এবং সমবায় আন্দোলন পর্যবেক্ষণের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং ইংলণ্ডে থাকাকালীন সময়ে তিনি Colonial People's Freedom Front ও African Asiatic and Europeon People's Congress-এর সদস্য হয়েছিলেন। তিনি অনুন্নত কৃষকশ্রেণীর নেতা হিসাবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

রঙ্গা মাদ্রাজের Pachaiyappau's College এ ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু মাত্র বছর তিনেক পরেই তিনি Central Assembly-র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এই পদে ইস্তফা দেন। তিনি পরাজিত হলেও শিক্ষা জগতে আর ফিরে যান নি। এর পর থেকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও কৃষকশ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য সহযোগীদের সঙ্গে রঙ্গা বেশ কয়েকবার কারারুদ্ধ হন। তিনি বহু বছর A. I. C. C. র সদস্য ছিলেন। 1946 সালে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও 'Congress Legislature Party' র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। 1952 সালে তিনি সাময়িকভাবে এবং 1959 সালে যখন কংগ্রেস পার্টি 'যুগ্ম সমবায় কৃষি'র কর্মসূচী (Joint Co-operative Farming) সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করে তখন স্থায়ীভাবে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন 'Krishikar Lok Party' সংগঠন করেন। রঙ্গা 'International National Federation of Agricultural Producers' এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং লণ্ডন, হেগ এবং গুয়েলফ (কানাডায়) আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। 1954 সালে International Peasant's Union'র চতুর্থ কংগ্রেস পরিচালনার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

1959-এ স্বতন্ত্র পার্টি সংগঠনের জন্য রঙ্গা রাজাজী ও বর্তমান লেখকের সঙ্গে মিলিত হন এবং জন্মলগ্ন থেকেই রঙ্গা এর সভাপতি হন। 1962 সালে কিছুদিনের জন্য এবং 1967 সালে দুর্ভাগ্যবিশতঃ পরাজিত হওয়ার পর ব্যতীত সেই দিন থেকে তিনি পার্লামেন্টে স্বতন্ত্র দলের নেতা ছিলেন। তিনি অবশ্য পরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টে ফিরে আসেন। 1973 সালে তিনি স্বতন্ত্র পার্টি ত্যাগ করে পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

ভারতীয় কৃষকশ্রেণী এবং রঙ্গা প্রায় সমার্থক ছিলেন। কৃষকদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম ভালবাসা। বার বার কংগ্রেস ত্যাগ করা ও যোগদানের জন্য অনেকেই হয়তো তাঁকে সুযোগসন্ধানী বলে [illegible] করবেন কিন্তু তাঁর কার্যাবলী পর্যালোচনা [illegible]

সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে ভারতীয় কৃষকশ্রেণীর প্রতি তাঁর আনুগত্য অন্য সকলপ্রকার আনুগত্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং যখনই কোন দলের গৃহীত কোন নীতি কৃষকদের পক্ষে তাঁর ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছে তখনই তিনি তার বিরোধিতা করেছেন।

তিনি অস্পৃশ্যতা বিরোধী ছিলেন এবং 1923 সালেই তিনি তাঁদের পারিবারিক কুয়ো থেকে হরিজনদের জল নেবার অনুমতি দিয়েছিলেন; তিনি মেয়েদের পর্দা প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং উদাহরণ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে নিজের পত্নী এবং ভগিনীদের গুন্টুরের সারদা নিকেতনে প্রেরণ করেছিলেন। 'Andhra Provincial Women's Political Camp' স্থাপনে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। পঞ্চায়েৎ প্রথার উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল এবং গুন্টুর জেলাতেই প্রায় 700 গ্রামে তিনি পঞ্চায়েৎ সংগঠনে সাহায্য করেন। বারদোলি সত্যাগ্রহই তাঁকে কিষাণ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে। ভারতীয় কৃষিজীবী সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি একটি গ্রন্থাগার ও একটি পত্রিকাসহ নিদুব্রোলুতে 'Indian Peasant's Institute' স্থাপন করেন। তিনি জমিদারী ব্যবস্থাকে সমাজের একটি চরম কুব্যবস্থা বলে মনে করতেন এবং এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তাঁত শিল্পের নায়ক হিসাবে তিনি বেশ কিছু সম্মেলনের বিশেষতঃ 'All India Industrial Congress'র সভাপতিত্ব করেন। যখনই দুর্ভিক্ষ হয়েছে রঙ্গাই সর্বপ্রথম অকুস্থলে পেঁৗছেছেন এবং সবসময়ই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন।

রঙ্গা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সমর্থক ছিলেন। 1945-এ 'Andhra Provincial Congress Committee'র সভাপতি হওয়ার পর তিনি পৃথক অন্ধ্র প্রদেশের জন্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

খদ্দরের ধুতি ও কুর্তা পরিহিত রঙ্গা কৃষকদের ভাবমূর্তির বাহক ছিলেন। পরিস্থিতি বিশেষে রঙ্গা ও বর্তমান লেখক বহুবার তর্ক যুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছেন কিন্তু এই মতানৈক্য কখনও তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ক্ষুণ্ন করতে পারে নি।

রঙ্গা কিছুদিনের জন্য পার্লামেন্টে একক বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। অনেকবার ক্ষমতা তাঁর হাতে এলেও কখনও তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিগত মতামতের এবং কখনও বর্ণবৈষম্যগত কারণে (বিশেষতঃ তাঁর নিজ দেশ অন্ধ্র) নাগালের বাইরে চলে গেছে।

[Venkatanarasayya, Jasti and Venkatasubramoniam, Dhulipala—Acharya Ranga Jeevitakadha Pedapudi, 1947; Venkatasubhayya, Correpati Acharya Ranga (A biography), Bezwada, 1948; N. N. Mitra (Ed)—The Indian Annual Register, Vol. II, 1936; Personal Knowledge of the Contributor, a close political associate of Ranga.]

(বি কেশবনারায়ণ) এম. আর. মাসানি

এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার (১৮৮২-১৯৫৩)
N. Gopalaswamy Iyengar (1882-1953)

এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের জন্ম 31 মার্চ 1882 মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিনি ছিলেন 'হিন্দু'-র সম্পাদক এস কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের ভাগ্নে এবং এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের ছোট ভাই। তাঁর বাবা নরসিংহ আয়েঙ্গার ছিলেন ছোট মাপের ভূস্বামী।

মাদ্রাজের ওয়েসলে স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং আইন কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন।

তাঁর জনসেবার ব্যাপ্তি 45 বছরের কিছু বেশী। 1904-এ কিছুদিনের জন্য তিনি মাদ্রাজের পচাইয়াপ্পার কলেজে সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। 1905 সালে তিনি মাদ্রাজের সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং 1937 পর্যন্ত সেই পদে বৃত থাকেন। বিভিন্ন ধরনের কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ; 1919 সাল পর্যন্ত ডেপুটি কালেক্টর, 1920 সালে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর পঞ্চায়েতের রেজিস্ট্রার-জেনারেল এবং 1921 সাল থেকে সাত বছরের জন্য স্থানীয় বোর্ডের ইন্সপেক্টর। 1922-এ তাঁকে 'দেওয়ান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 1932 সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পৌরসভার কাউন্সিল ও স্থানীয় বোর্ডের ইন্সপেক্টর, জনসংযোগ বিভাগে সরকারের সেক্রেটারী (1932-34) এবং 1937 সাল পর্যন্ত বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সদস্য। 1927 সালে তিনি ছিলেন ভারতীয় বিধানসভার সদস্য এবং 1944-46 সাল পর্যন্ত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য।

1937 সালে তিনি কাশ্মীরের দেওয়ান নিযুক্ত হন। কাশ্মীরে যখন উপজাতি আক্রমণ শুরু হয় তখন রাষ্ট্রসংঘের কাছে ভারতের হয়ে আবেদন রাখার ব্যাপারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। 1947-এ কোনোরকম দফতর ছাড়াই তিনি কেন্দ্রীয় কেবিনেটে মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। পরে রেলমন্ত্রী হন, এবং রাজ্যগুলির অস্থায়ী মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন 1952-র মে মাস থেকে।

ইংরেজ আমলে রাজ্যসভার সদস্য থাকাকালীন (1944-46) তিনি সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়করণের জন্য ওকালতি করেছিলেন। তিনি ধর্ম, শিক্ষা রাজনীতির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভারত সরকারের কার্যনির্বাহক সমিতিকে সমালোচনা করেছিলেন জনপ্রতিনিধিদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার জন্য এবং জাতীয়সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালোভাবে ওকালতি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রতি ব্রিটিশ সরকার অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করুক। ব্রিটিশের করনীতিকেও তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ করেছেন এবং সারা দেশে খাদি প্রকল্প চালু করার কথা জোর দিয়ে তুলে ধরেন।

কাশ্মীরের দেওয়ান হিসেবে তিনি নানাবিধ গঠনমূলক কাজে সংযুক্ত ছিলেন এবং ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশ ভারতে প্রগতিশীল আন্দোলন গুলির প্রতি তিনি কখনও নিস্পৃহ বা উদাসীন ছিলেন না। সপ্রু কমিটিতেও তিনি কাজ করেছেন। এই সম্বন্ধে তাঁর বিশদ বিবরণ এবং জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা সাংবিধানিক সভার সদস্যদের দ্বারা যথাযথ সমাদর লাভ করেছিল। 1953 সালের 9 ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু ঘটে।

[Who's Who in Madras, 1934 ; The Modern Review, 1953, Vol. 94 ; The Indian Review Files, 1940 ; The Hindu Files, 1943-53 ; Council of States Debates (1943-46) ; Constituent Assembly Debates (1946-47)]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) এন. সুব্রামানিয়ান

এন. মাধব রাও (১৮৮৭-১৯৭২)
N. Madhava Rao (1887-1972)

ন্যায়পতি মাধব রাও ছিলেন মহীশূর রাজ্যের এক বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী ও শাসন পরিচালক। তিনি এই পদ থেকে ক্রমশঃ রাজ্যের দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। ভারতীয় সংবিধানের পরিকল্পনা কমিটির ছয়জন সদস্যের অন্যতম ছিলেন তিনি।

1887 সালের 8 জুন মাধব রাও গুন্টুর জেলার মসুলিপত্তমের এক বিশিষ্ট মাধব (দেশস্থ) ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রপিতামহ এন. শেষগিরি রাও কৃষ্ণা ও গুন্টুর জেলা-সেরেস্তাদার ছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের কার্যালয়ের অধীনস্থ অনুবাদক এন. ভেংকটকৃষ্ণ রাও-র পুত্র মাধব রাও সম্পর্কে নিজেই বলেছেন বিদ্যালয় জীবনে তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নেই। 1902 সালে মসুলিপত্তম Noble College থেকে একমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তিনি বাইবেল সম্পর্কিত পড়াশুনার জন্য পুরস্কার লাভ করেন। পরে 1904 সালে মাদ্রাজের পাচাইআপ্পা কলেজ থেকে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি মাদ্রাজে আইন নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। কিন্তু বি. এল. পরীক্ষায় বহু পূর্বেই 1907 সালে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়ে মাইশোর স্টেট সিভিল সার্ভিসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন। প্রবেশনারি অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার-রূপে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় এবং 1909 সালে বাঙ্গালোরে তিনি ডিস্ট্রিট ট্রেজারি অফিসারের পদাভিষিক্ত হন। ইতিমধ্যে তিনি সেই বছরের আইন পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ইনস্ ও কার্লমাইকেল পুরস্কার লাভ করেন।

ক্রমশঃ তিনি ডিস্ট্রিক্ট সাবডিভিসনাল অফিসার এবং তুমকুরের ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট (1910), মহীশূরের ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট (1913) এবং অ্যাসিস্টেন্ট রেভেনিউ কমিশনার (1913) পদে বৃত হন। কর্মজীবনে স্বল্পকালেই তিনি কঠোর শ্রম, সততা, দক্ষতা ও মৌলিক চিন্তাভাবনার দ্বারা উচ্চতর কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং 1914-এ তৎকালীন দেওয়ান স্যার এস. বিশ্বেশ্বরায়া তাঁকে 'এফি

সিয়েন্স অডিট অফিসার'রূপে নিযুক্ত করেন। এই বিশেষ পদে তাঁর দায়িত্ব ছিল কিছু সৃজনীমূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা যার দ্বারা শাসন যন্ত্রের কর্মোদ্যম বৃদ্ধি করা এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের অবসান ঘটান যায়। এই পদে তাঁর চার বৎসরের কার্যকালে তিনি শাসন ব্যবস্থায় বহু নতুন কর্মসূচী গ্রহণ এবং প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। প্রতিটি বিভাগই তাঁর সুপারিশে আধুনিক পন্থায় পুনর্গঠিত হয়।

1919-এ তাঁকে ভদ্রাবতীতে পরিকল্পিত 'মাইশোর আয়রন অ্যান্ড স্টীল ফ্যাক্টরী'র সচিব ও পরিচালক-রূপে নিযুক্ত করা হয়। মাধব রাও রাজ্যের এই নতুন কর্ম প্রকল্পে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং 1923 সালে এই নতুন কারখানার উৎপাদনকার্য শুরু হয়। 1924-এ যদিও তাঁকে মাইশোর সিটি মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি পদাভিষিক্ত করা হয় তবু 1940 সাল পর্যন্ত পরিচালক অথবা সদস্য তথা সচিবরূপে ভদ্রাবতী কারখানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। 'সিভিক চীফ্ এবং মাইশোর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বোর্ডে'র সভাপতিরূপে রাজধানীর নাগরিক জীবনব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

1923-33 সাল পর্যন্ত তিনি মহীশূর সরকারের প্রধান সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় 1929-এ মহীশূর রাজ্য শিল্পোদ্যোগের উৎপাদন সমূহের বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেবার জন্য তাঁকে ইউরোপ ও আমেরিকা পাঠান হয়। স্বল্প কয়েক-মাসের জন্য তিনি লন্ডনে মহীশূর সরকারের ট্রেড কমিশনাররূপেও কাজ করেছিলেন। 1931 ও 1932 সালে তিনি মহীশূরের তৎকালীন দেওয়ান স্যার মির্জা ইসমাইলের সঙ্গে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

1935 সালে তিনি মাইশোর স্টেট এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন এবং কালক্রমে এর ঊর্ধ্বতন সদস্য হয়ে ওঠেন। দেওয়ানের অনুপস্থিতিতে তিনি পদাধিকারে সভাপতিরূপে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ও 'রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসেম্বলির' সভাসমূহের সভাপতিত্ব করেছেন।

1941-এর মে মাসে শ্রী জয়চমরাজা ওয়াদেইয়ার-এর শাসনকালের প্রথম দিকে দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে তিনি রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। 1946 এর জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত তিনি এই ক্ষমতায় ছিলেন। 1940 সালের 13 এপ্রিল মহারাজা-ঘোষিত সাংবিধানিক সংস্কার কার্যকর করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হলে তিনি অত্যন্ত নিপুণতা ও উদ্ভাবন-দক্ষতায় এই কার্য সম্পাদন করেন।

দেওয়ান পদ থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি পূর্ব ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে, উড়িষ্যায় ও মধ্যভারতে সাংবিধানিক উপদেষ্টারূপে কাজ করেন। ভারতীয় Constituent Assembly তে তিনি এই রাজ্যগুলির প্রতিনিধি মনোনীত হন এবং পরবর্তীকালে ডঃ আম্বেদকারের নেতৃত্বে ভারতীয় সংবিধান পরিকল্পনা কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।

1951-52 সালে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভূমিসংস্কার কমিটির সভাপতি, 1955-56 সালে পুরাতন মহীশূর রাজ্যের এবং পরবর্তী সময়ে রাজস্থানের ফাইনান্স কমিটির সভাপতিরূপে নানা সুপারিশ ও প্রস্তাবের মাধ্যমে মাধব রাও অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন। বাঙ্গালোরের বিশিষ্ট সাংবাদিক খ্যাতনামা ডঃ ডি. ভি. গুন্ডাপ্পার মতে মহীশূর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ক্ষমতায় কর্মরত থেকে জনসাধারণের সমস্যা বিষয়ে তিনি গভীর অন্তদৃষ্টি লাভ করেছিলেন।

বাঙ্গালোর 'সিটি ডেভলপমেন্ট বোর্ডের' কাজই তাঁর শেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই সংস্থাটি শহরের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনানুসারে একটি মাষ্টার প্ল্যান রচনা করে।

তিনি 1972 সালের আগষ্ট মাসে পঁচাশি বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

1905 সালে তিনি রাজামুন্দ্রির লক্ষ্মণ রাওয়ের (মাদ্রাজ রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার) কন্যা নরসাম্মাকে বিবাহ করেন। মাধব রাও ছয়টি সন্তানের পিতা ছিলেন। 1964 সালে তাঁর পত্নী-বিয়োগ ঘটে। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র আই. এ. এস. অফিসার এবং মহীশূর রাজ্য উচ্চপদে কর্মরত। অপরজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগে-ডিয়ার।

মিতভাষী মাধব রাও তাঁর সততা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার জন্য সুখ্যাত ছিলেন। ডঃ গুন্ডাপ্পার মতে আইন শাস্ত্রে মাধব রাওয়ের জ্ঞান এত গভীর ও নির্ভুল ছিল যে তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও আইনজ্ঞ রূপে যশোপার্জন করতে পারতেন। একজন সৎ ও সুদক্ষ শাসন পরিচালকরূপে তিনি স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া এবং স্যার মির্জা ইসমাইলের মত ব্যক্তিদের আস্থা ভাজন হয়েছিলেন।

যৌবনে তিনি দক্ষ গল্‌ফ এবং টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ব্যাপক ভাবে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। উদারপন্থী নেতা গোখলের প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ফেডারেল সরকারের দ্বিখণ্ডিত আনুগত্য এবং ভারতে এর প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর নিজের যথেষ্ট সংশয় ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যাবলীর তিনি ছিলেন একজন আগ্রহী শিক্ষার্থী।

[D. V. Gundappa's article in the Sudha [Kannada Weekly], Bangalore, 22 February 1970; M.V.Krishna Rao and M .K. Bhat—Karnataka Itihas Darshana (Kannada), Bangalore, 1970 , Interviews of the Contributor with N. Madhava Rao and his son, Lakshmana Rao]

এস. ইউ. কামাথ

এন. শিবরাজ (১৮৯২-১৯৬৪)
N. Sivaraj (1892-1964)

1892-র মাদ্রাজ রাজ্যের কুম্ভাপায় এন. শিবরাজের জন্ম হয়। তিনি অন্ত্যজ শ্রেণীর দরিদ্র হরিজন পরিবারভুক্ত ছিলেন।

তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছিলেন; এর পরে আইনজীবী হওয়ার জন্য মাদ্রাজ ল' কলেজ থেকে বি. এল ডিগ্রী লাভ করেন।

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টে আইনব্যবসা শুরু করেন এবং প্রায় সতের বছর মাদ্রাজ ল' কলেজেও অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ রিপাবলিকান পার্টির প্রথমে সদস্য এবং পরে সভাপতি হয়েছিলেন। 1926-এ জাস্টিস্ পার্টিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে তার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। 1928 সালে তিনি জাস্টিস্ পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন কিন্তু রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে তিনি তখনও পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করেন নি। 1926 ও 1930-এ তিনি মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যরূপে মনোনীত হয়েছিলেন। এম. সি. রাজা প্রমুখ যাঁরা অন্ত্যজ শ্রেণীর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতেন তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন এবং প্রাদেশিক স্তরে এই শ্রেণীর উন্নতিসাধনকল্পে যথোচিত উপায় নির্ধারণের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। পরে 1940 সালে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়। তিনি সর্বসমেত এগারো বছর প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি 1952-এর নির্বাচনে পরাজিত হলেও 1957 সালে প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেচারে তিনি পুনঃনির্বাচিত হন। 1945-এ তিনি মাদ্রাজের মেয়র হয়েছিলেন। 1957-এ তিনি ভারতীয় রিপাবলিকান পার্টির সভাপতি হন। তাঁর নিজ সম্প্রদায় ও বৃহত্তর সমাজেও তাঁর মর্যাদা এবং জনস্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর কার্যাবলী তাঁকে 'রাও বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করতে ইংরাজ সরকারকে বাধ্য করেছিল। এটি নিশ্চিত এমনই এক দুর্লভ সম্মান; তাঁর সমাজের অন্য বহু সদস্যেরই পক্ষে যার অংশভাক্ হওয়া সম্ভব হয় নি। তিনি ব্যাপকভাবে বিদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন এবং কানাডাভ্রমণ করেন।

শিবরাজ প্রকৃতপক্ষে জাস্টিস্ পার্টির মতামতই অনুসরণ করতেন। এটি সহজেই বোঝা যায় যে—তিনি নিজে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় এই সম্প্রদায়ের অক্ষমতা ও অসুবিধাগুলি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন। সরকার নির্ধারিতজনস্বার্থ রক্ষানীতিগুলি যেন তথাকথিত নিম্নতর শ্রেণীর অসুবিধা দূরীকরণে সমর্থ হয় সে বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল রাজনীতিক ছিলেন এবং এই অসুবিধাগুলি তথা অন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কারসাধনও তিনি সাংবিধানিক পন্থায় সাধন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত উৎসাহী সমাজ-সেবক ছিলেন। হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারের প্রতি তিনি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন হরিজনদের মন্দির প্রবেশে অনধিকার ছিল ভারতীয় সমাজের কলঙ্কস্বরূপ। অধিকন্তু তাঁর মতে অন্ত্যজ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য আঞ্চলিক সংস্থা ও লেজিস্লেচারে এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের অধিকার ও বিনা পারিশ্রমিকে আবশ্যিক শিক্ষালাভ প্রভৃতি নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা উচিত। তিনি মনে করতেন গোঁড়ামি ও লোকপরম্পরা প্রচলিত প্রথাই ভারতের অন্ত্যজ শ্রেণীর দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। তিনি বলতেন—'এই প্রচলিত প্রথাই অক্টোপাসের মতো ভারতকে তার অসংখ্য

শুঁড় দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে'। তিনি সবসময় বলতেন বিবাহক্ষম পাত্রপাত্রীর বয়স একটু বেশী হওয়া উচিত। তিনি বলতেন—'প্রথা নামে প্রচলিত ক্ষতিকর ব্যবস্থাদি সামাজিক আইন প্রণয়নের সাহায্যে পরিবর্তিত ও দূরীভূত করা সম্ভব।' তিনি আইন প্রণয়নের সাহায্যে সমাজ সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে তিনি শিক্ষার মূল্য উপলব্ধি করতেন না। তিনি বলতেন, 'প্রকৃতই মূল্যবান শিক্ষা শুধু জ্ঞান আহরণ নয়—যথাসম্ভব সেই জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা।'

ব্রিটিশদের থেকে ভারতীয়দের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমাদের দেশবাসীর হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে আবেদন জানানো প্রকৃতপক্ষে খুবই কঠিন এবং আমি তাদের এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে চাই যে এই হস্তান্তরের ফলে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্পূর্ণ ব্যাহত হতে পারে।' তিনি সেই একচেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার অত্যন্ত নিন্দা করতেন যা জনসাধারণের মাত্র 3 ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত হত। অবশ্যই তিনি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তিনি এও বলেছেন, '1935 সালের গভর্মেন্ট অব্ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের যে ধরন নির্ধারিত হয়েছে তার ফলে রাজ্যের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অকল্পনীয় ক্ষতিসাধন হয়েছে—সংবিধানে অবাধ রক্ষণনীতি নির্ধারিত করা উচিত।' তিনি বলতেন, 'ভারতের অব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যে স্বরাজ কামনা করে সেই স্বরাজই—স্বরাজ। এতে কোন একটি সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব থাকা সম্ভব নয়।' এটি হুবহু জাস্টিস্ পার্টির মত।

শিবরাজ সম্বন্ধে স্যার পি. টি. রাজনের মূল্যায়ন, 'যদিও অন্যান্যদের মতো তাঁর সুবিধাভোগের সুযোগ ছিল না তথাপি তিনি কখনও হীনমন্যতায় আক্রান্ত হন নি। তিনি বিশুদ্ধ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি কখনও কোন লোভের বশবর্তী হন নি। তাঁর ভাগ্য তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল না। অন্যথায় তাঁর চারিত্রিক ও বুদ্ধিজাত গুণাবলী তাঁকে জীবনের শীর্ষদেশে নিয়ে যেতে পারত।'

সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে শিবরাজের প্রভাব যতটা প্রসারিত হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর কার্যাবলীও সাধারণ গণ্ডীর কিছু পরিমাণ উর্ধ্বে ছিল।

[Proceedings of the Madras Legislative Council ; Proceedings of the Central Legislative Assembly, 1940-45 ; N. N. Mitra—The Indian Annual Register ; Corporation Chronicle ; The Hindu Files ; The Justice Files.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) এন. সুব্রামানিয়মু

এন. শ্রীকান্তন নায়ার (১৯১৫— ?)

N. Sreekantan Nair (1915—?)

ত্রিবান্দ্রামের আম্বালাপুজ্জায় এক মধ্যবিত্ত হিন্দু নায়ার পরিবারে 1915 সালের 13 জুলাই শ্রীকান্তন নায়ার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ত্রিবান্দ্রামের সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নীলকান্ত পিল্লাই ও অবসর প্রাপ্তা প্রধানা শিক্ষিকা বিদুষী জানকী আম্মার একমাত্র পুত্র।

1948 সালের 24 জুন লেখক, উকিল ও ত্রিবাংকুর রাজ্য কংগ্রেস-এর সদস্য কে. কে. কুঞ্জু পিল্লাই এবং চেল্লাম্মার কন্যা মহেশ্বরী আম্মাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁরা সন্তানহীন ছিলেন।

মায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তাঁর ঘন ঘন বদলি হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি মিডিল ও হাইস্কুল-এ পাঠের পর তিনি 1932 সালে তিরুভাল্লা এম. জি. এম. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস. এস. এল. সি. সমাপ্ত করেন। 1932-34 সালে তিনি চাঙ্গানাচেরীর Berchman's College থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাঠ সমাপন করেন। 1934-37 সালে ত্রিবান্দ্রামের Maharaja's Arts College (মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ইংরাজী সাহিত্যে বি. এ. অনার্স ডিগ্রী গ্রহণ করেন।

তাঁর অদম্য শক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, সত্যবাদিতা ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি গভীর উৎসাহের জন্য তিনি তাঁর মায়ের কাছে ঋণী। ভগবৎগীতা ও বিবেকানন্দ রচনাবলী তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। একদিকে যেমন গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু ও জগৎনারায়ণের দ্বারা তাঁর জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি Marx, Engels, Lenin ও Stalin-এর দ্বারা বৈপ্লবিক সমাজবাদ সম্পর্কে তাঁর অতৃপ্ত ক্ষুধা তীব্রতর হয়ে

উঠেছিল। সর্বোপরি রাজনৈতিক জীবনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ও সমাজবাদের প্রতি অসীম উৎসাহ পোন্নারা, জি. শ্রীধরের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল। 1952 সালে একবার চীন ও 1954 সালে রাশিয়া ভ্রমণ ব্যতীত বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বা বিদেশী সঙ্গলাভ তাঁর বিশেষ ঘটেনি।

1936 সালে ত্রিবান্দ্রামে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি জনহিতকর কার্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দেন। 'The All Travancore Youth League' ই প্রথম তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। তারপর তিনি ত্রিবাঙ্কুর স্টেট কংগ্রেসে (1938-48) আসেন এবং 1942-46 এর ওয়ার্কিং কমিটির কার্য নির্বাহ করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে তিনি এর অন্তর্ভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দলটির প্রতি আনুগত্য জানান (1947)। 1948 সালে তিনি 'কেরালা সোস্যালিস্ট পার্টি' গঠন করেন। 1950-তে এটি 'Revolutionary Socialist Party'র সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। এই পার্টিরও তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বপ্রধান নেতা। সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের জন্য তিনি একাধিকবার কারাবন্দী হন। তাঁর ছয় বৎসর কালের বন্দীজীবন তাঁর দেশপ্রেমের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর।

নায়ারের লোকসভার সদস্যপদও অব্যাহত ছিল। তম্মধ্যে 1952-57 এবং 1962-67 এই প্রাথমিক পর্যায়েও তিনি সদস্য ছিলেন।

কেরালায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যাবলীর জন্যই শ্রীকান্তন নায়ার সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেন। সমাজতান্ত্রিক ধরনে সমাজ গঠনের জন্য তাঁর সংগ্রামের লভ্যাংশটুকু কাজুবাদাম কারখানার কর্মচারীগণ ও কুইলন পার্শ্বস্থিত এলাকাবাসীরাই ভোগ করার সুযোগ পায়।

নায়ারের জাতীয়তাবাদ খুব উগ্র ধরনের ছিল না। তিনি এটিকে আন্তর্জাতিকতাভিমুখী একটি পথ বলেই মনে করতেন। তিনি স্টালিন বর্ণিত আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না। ব্রিটিশ সাংবিধানিকতা, অহিংসা এবং পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা—কোনটিই বৈপ্লবিক সোস্যালিস্ট ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকরী মনে না করায় এই পন্থাগুলির প্রতি তিনি কোন আস্থা পোষণ করতেন না।

ব্রিটিশ শাসককুলকে সর্বোত্তম সভ্যজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও তিনি তাদের আমলাতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে ঘৃণা করতেন।

যদিও ইংরাজি শিক্ষাকে তিনি প্রশংসনীয় মনে করতেন কিন্তু পশ্চিমী নীতির উপযোগবাদ ও ব্যবহারিকতার প্রতি চাপই তিনি এর ব্যর্থতার কারণ বলে মনে করতেন এবং এই নীতিকে তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

তিনি ভারতে বৃহদায়তন শিল্পের দ্রুত প্রসারের পরিবর্তে সর্বাধুনিক কুটীরশিল্পের সপক্ষে ছিলেন।

ধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস খুব প্রবল ছিল না। তিনি সম্পূর্ণরূপে একজন বস্তুবাদী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ধনিকশ্রেণীর উদ্ভাবিত দরিদ্রজনের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পীড়ন করার একটি পন্থা।

[The Times of India Directory and Year Book including Who's Who (1965-66) ; Nair Service Society Suvarna Grandham, Changanacherry, 1964 ; Ponkuppnam Varkey—Thoolikachitrangal, Trichur, 1948 ; Ponnara Smaraka Grandham, Trivandrum, 1966 ; N. Sreekantan Nair—Kazhinjakalachithuangal, Trivandrum, 1950 ; The Malaya Manorama (daily), 7 October, 1959 ; The Kerala Sabdam (Weekly), Quilon, 30 May, 6 June, 20 June, 20 December to 26 December, 1965 ; Personal interview of the Research Fellow with N. Sreekantan Nair, Janaki Sadananam, Ambalapuzha.]

(এন. এম. কে. নায়ার) পি. কোচুন্নি পানিকেকর

এ. পি পাত্র (স্যার) (১৮৭৫-১৯৪৬)

A. P. Patro (Sir) (1875-1946)

1875-এ এ. পি. পাত্র তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত গঞ্জাম জেলার বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এই নামের উৎপত্তি উড়িষ্যায় হলেও পরিবারটি ছিল অন্ধ্রদেশীয়। তাঁর পিতা নারায়ণ পাত্র ছিলেন বিত্তশালী ভূমিপতি। এ. পি. পাত্র বহরম-

পুরের উচ্চবিদ্যালয়ে এবং পরে মাদ্রাজের খ্রীশ্চিয়ান কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি মাদ্রাজ আইন কলেজ থেকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তিনি বহরমপুরে ওকালতি শুরু করেন এবং তিনি এখানকার বারের অন্যতম নেতা ছিলেন।

বহরমপুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও গঞ্জাম জেলা বোর্ডের সদস্য হিসেবে তাঁর জনহিতকর কর্ম-জীবনের প্রারম্ভিক যাত্রা শুরু হয় এবং প্রায় পঁচিশ বছর তিনি এই কর্মে নিযুক্ত থাকেন। "Studies on Local Self-Government, Education and Sanitation" নামক গ্রন্থটি তাঁর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা-প্রসূত রচনা। তিনি গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কেও পড়াশুনা করেন এবং এই বিষয়েও লেখেন। ইউরোপের বহু দেশ তিনি ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করেন এবং সেইসব স্থানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করে। সক্রিয় প্রাদেশিক জনহিতকর কর্মজীবনে তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য হন এবং এর কয়েকটি অধিবেশনেও যোগদান করেন।

তিনি গঞ্জাম গ্রামীণ কেন্দ্র থেকে মাদ্রাজ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। 1919 সালে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে মাদ্রাজের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সুব্বারায়ালু রেড্ডিয়ার যখন মারা যান এবং পানাগালের রাজা যখন মুখ্যমন্ত্রী, পাত্র তখন 1921 থেকে 1926 সাল পর্যন্ত শিক্ষা ও আবগারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হন। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তাঁরই দায়িত্বে 1923 সালে প্রবর্তিত মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি রিঅরগানাইজেশন অ্যাক্ট দ্বারা সেনেট জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকৃতি লাভ এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হয়। 1926 সালের অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির অ্যাক্ট-এরও তিনি ছিলেন প্রবর্তক। এই অ্যাক্ট অনুসারে অন্ধ্রপ্রদেশে এক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মাদ্রাজ আইন সভার সদস্যপদ থেকে অবসর গ্রহণের পর 1937 সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইন-সভার উচ্চতর কক্ষ—কাউন্সিল অফ স্টেটস্-এর সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁকে লীগ অফ নেশনস্-এ ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের অন্যতম সদস্যরূপেও প্রেরণ করা হয়েছিল। 1931-32 সালে গোল টেবিল বৈঠকের একজন সদস্য হিসেবে এবং 1935 সালের গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিলের দ্বারা গ্রাহ্য জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের একজন সদস্য হিসেবে তিনি লণ্ডন যান। 1924 সালে তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং 1930 সালে তিনি K. C. S. I. হন। 1946 সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

আইন সভার সদস্য ও মন্ত্রী হিসেবে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জাস্টিস পার্টির অন্যতম নেতা হিসেবে এই পার্টিতে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এই দলের সভায় তিনি নিয়মিত ভূমিকা গ্রহণ করতেন। কয়েকটি অধিবেশনের সভাপতিত্বও তিনি করেন এবং এই পার্টিতে কিছু বলার জন্য বা কোন সক্রিয় ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যখনই আমন্ত্রিত হয়েছেন তিনি কখনই সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন নি।

মন্ত্রীরূপে পাত্র ছিলেন এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। বলিষ্ঠ ও বিশালবপু তিনি অন্যকে সুযোগ দিতেন না, নিজের জন্যও পরোয়া না করে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। তাঁর উদ্ধত ভঙ্গী, ঘূর্ণিত চক্ষুদ্বয় বন্ধুত্ব-ভাবাপন্ন অথবা শত্রুতাপূর্ণ যে কোন প্রকার মনোযোগ আকর্ষণেই কখনও ব্যত্যয় ঘটাত না। কিন্তু প্রায়শই তিনি তাঁর নিজের বাক্যবাণের শিকার হতেন। নিজের বাক্যবিন্যাসের জটে বাঁধা পড়ে তিনি অনায়াসেই তাঁর অপ্রতিহত সমালোচক স্বরাজ্য পার্টির বক্তা সত্যমূর্তির শ্লেষ ও নিন্দার লক্ষ্য হয়ে উঠতেন। তাঁর প্রাচীন হাতিয়ার যেন অপর পক্ষের তীক্ষ্ম অস্ত্রাঘাতে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হত। কিন্তু তিনি কখনও পরাজয় স্বীকার করতেন না এবং অদম্য তেজে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরাবির্ভূত হতেন। তবে শাসন কার্যের দক্ষতা তাঁকে সুনামের অধিকারী করেছিল। তিনি বলতেন অর্থনীতি ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি এত লিখেছেন যে এখন সে সব মন্ত্রী হিসেবে কার্যকরী করে তোলাই তাঁর কর্তব্য। বাস্তবিক তিনি এই ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছিলেন যদিও কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেন নি—অবশ্য এ দুটি বিষয়ই তাঁর দপ্তর বহির্ভূত ছিল। তবে সর্বদিক পর্যালোচনা করলে বিশের দশকে মাদ্রাজের রাজনৈতিক জীবনে তিনি এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন বলা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং তথাকথিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন-ধারানুসারেই তাঁর জীবনও অতিবাহিত হয়েছে।

[The Justice Year Book, 1929 ; Proceedings of the Round Table Conference, 1931-32 ; Joint Committee on India

Constitutional Reform, 1932-33, Vol. II-A ; Proceedings of the Madras Legislative Council 1920-36 ; Proceedings of the Council of the States, 1937-46 ; G. A. Nateson—Speeches at the Round Table Conference, 1931 ; N. A. Perumal—Contemporary South Indians ; Who's Who in Madras, 1934 ; The Hindu Files ; The Indian Review Files.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) এন. রঙ্গস্বামী

এ. বালকৃষ্ণ পিল্লাই (১৮৮৯-১৯৬০)

A. Balakrishna Pillai (1889-1960)

'কেশরী' নামে সমধিক পরিচিত এ. বালকৃষ্ণ পিল্লাই 1889 এর 13 এপ্রিল ত্রিবান্দ্রম-এর সন্নিকটে তম্বানুর-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারভুক্ত ছিলেন সেই অলনন্তু পরিবারটি ত্রিবান্দ্রম-এর বার মাইল দূরবর্তী নেয়াতিংকর-এ বসবাস করত। এই মধ্যবিত্ত নায়ার পরিবারটিতেই ত্রিবাংকুর এর বিখ্যাত দেওয়ান এ. অয়প্পান পিল্লাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাতা পার্বতী আম্মার বংশগত কৌলিন্য ছিল। অপর দিকে তাঁর পিতা দামোদর কর্তা ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং মালয়ালম ভাষার একজন সুবিখ্যাত লেখক। তাঁর দুই ভ্রাতার মধ্যে একজন ছিলেন ডঃ এ. পদ্মনাভ পিল্লাই। ইনি কয়েকটি প্রসিদ্ধ গবেষণা-পত্রের সম্পাদক ছিলেন। অপর ভ্রাতা বি. চন্দ্রশেখরণ পিল্লাই কেরালা সরকারের কর্মী ছিলেন।

এরূপ অভিজাত ও কৌলীন্যযুক্ত পরিবারভুক্ত হয়ে তিনি জীবনে বড় হওয়ার মত একটি অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন। 1917 সালে তিনি উত্তরপারুর-এর মদাবনাপরাম্বিল গোরীকুট্টি আম্মার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

মালয়ালাম ভাষাভাষী একটি বিদ্যালয়ে বালকৃষ্ণ পিল্লাই-এর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। নয় বছর বয়সে তাঁকে কুইলনে প্রথম শ্রেণীতে (পঞ্চম শ্রেণীর সমতুল্য) ভর্তি করানো হয়। এই সময় তিনি তাঁর পিতৃব্য অয়প্পান পিল্লাই-এর গৃহে বাস করতেন। পরের বছর তিনি ত্রিবান্দ্রম-এর একটি সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং এই বিদ্যালয় থেকেই তিনি 1904 সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ত্রিবান্দ্রমের মহারাজার কলেজ থেকে প্রধান বিষয় ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত হয়ে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইতিহাসের শিক্ষকরূপেও কাজ করেন। 1913 সালে বি. এল. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করার সূবাদে তিনি 'কাপ্লান ল' পুরস্কার লাভ করেন।

কলেজে পঠনপাঠন কালে যে সকল বিখ্যাত অধ্যাপকের নিকট থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেনঃ হজসন্, লেপ্পার, কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, এ. আর. রাজা বর্মা এবং পি. কে. নারায়ণ পিল্লাই। শেষোক্ত দুজন কৃতী পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে থেকে পঠনপাঠনে তাঁর নিবিড় অনুরাগ জন্মে এবং এর ফলেই তিনি নিজে নিজেই সংস্কৃত এবং তামিল ভাষা দুটি ভালভাবে আয়ত্ত করেন।

বালকৃষ্ণ পিল্লাই তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী ইংরাজী, মালয়ালাম, সংস্কৃত এবং তামিল ভাষায় রচিত বিভিন্ন বিষয় যথা ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতির একনিষ্ঠ অনুরাগী পাঠক ছিলেন। ফরাসী, নরওয়েদেশীয়, সুইডিস, ইটালিয়, ইংরাজী এবং আমেরিকান ভাষায় রচিত সাহিত্যেও তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল। যে সকল বিদেশী সাহিত্যিক তাঁর নিকট সমাদরের পাত্র ছিলেন তাঁরা হলেন মোপাসাঁ, ভিক্টর হুগো, ইবসেন, গোর্কি, ডিকেন্স, ইলিয়ট এবং বার্নার্ড শ। অন্তর্মুখীন না হয়ে বিষয়গত দিক থেকেই তিনি উপরোক্ত লেখকবৃন্দের পুস্তকগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল জ্ঞানের পরিধি বিস্তার ও তথ্য সংগ্রহ করা এবং এগুলি থেকে বিচার বিবেচনা করে তিনি তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন।

নিজস্ব একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সফর বালকৃষ্ণ পিল্লাই-এর অভিজ্ঞতার পরিধির বিস্তার সাধনে সহায়ক হয়েছিল। পুস্তক পাঠ কিংবা ভ্রমণ একমাত্র জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করা ছাড়া তাঁকে উল্লেখ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি।

1901 এ ত্রিবান্দ্রমের উইমেনস্ কলেজে শিক্ষকতার পদে যোগদানের মাধ্যমে বালকৃষ্ণ পিল্লাই-এর কর্মজীবন শুরু হয়। একাদিক্রমে আট বছর তিনি এই কলেজে এবং মাঝে একটি বছর মহারাজার কলেজে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকরূপে তিনি ছাত্রদের নিকট থেকে যথোচিত সম্মান পেয়েছিলেন এবং তাঁর বিশিষ্ট

বাচনভঙ্গীর জন্য ছাত্রগণ তাঁকে 'ডঃ জনসন' আখ্যায় ভূষিত করেন। 1917 এ অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে তিনি ত্রিবান্দ্রম হাইকোর্টে আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করেন। তাঁর রুচির কাছে আইনজীবীর পেশা বেমানান মনে হলে তিনি এই পেশাও পরিত্যাগ করে সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিন বছর তিনি 'সমদর্শী'র সম্পাদনা করেন। 1930 র জুন থেকে আগস্ট মাস অবধি তিনি 'প্রবোধকন'-এরও সম্পাদনা করেন। কিন্তু 1930 থেকে 1935 সাল পর্যন্ত 'কেশরী'-র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সাংবাদিকতার পেশায় তিনি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেন। 'কেশরী'র সঙ্গে তাঁর যোগ এতই সুনিবিড় হয়েছিল যে এই সময় থেকে তিনি জনপ্রিয় 'কেশরী' বালকৃষ্ণ পিল্লাই নামে সমধিক পরিচিত হয়েছিলেন। কেশরীর সম্পাদকরূপে তিনি অত্যন্ত ওজস্বী ভাষায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করে তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 1935 সালে সংবাদপত্র সমূহের মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করে প্রেস অ্যাক্ট অব ইণ্ডিয়া বিল পাশ করা হয়। একজন স্বাধীনচেতা সাংবাদিক স্বতঃই এর বিরোধিতা করবেন। ফলস্বরূপ পিল্লাই সাংবাদিকতার বৃত্তি পরিত্যাগ করে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। লেখাপড়া করে এবং নবীন লেখকদের উৎসাহ দান করে তিনি তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 'কেশরী' অনূ্যন পঁয়ত্রিশ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রূপমঞ্জরী', 'নবলোকম', 'সাহিত্য-গবেষণাঙ্গল', 'নভেলপ্রস্থানঙ্গল', 'কারমেন', 'মপাসাঁঙ্গেতে কথাকাল', 'প্রাচীন কেরালা চরিত্র গবেষণাঙ্গল', 'প্রেথাঙ্গাল', 'কেশরীযুতে মুখ প্রসঙ্গল' এবং 'সাহিত্য বিমরসনাঙ্গল।' উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি সাহিত্যের বৃহৎ পরিধিতে বিভিন্ন বিষয়ে রচিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রচলিত বিভিন্ন আঙ্গিক অবলম্বনে তথ্যবহুল ও সমালোচনধর্মী তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রথম দুটি গ্রন্থ। তৃতীয় এবং সপ্তম গ্রন্থ দুটি হল তাঁর নিজস্ব গবেষনার ফসল।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও তিনি কতকগুলি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। এক একটি বিষয়ে রচিত একটি ভূমিকা যথার্থই একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ। কেরল বর্মা বালিয়া কোইল থম্পুরণ-এর 'ময়ূর সন্দেশম্'-এর উপর তাঁর লিখিত ভূমিকাটি বিশ্বসাহিত্যের সন্দেশকাব্য সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কদমঙ্গলম্ পম্পুকুট্টির 'কদথুবঞ্চি' কাব্য সম্পর্কে তাঁর ভূমিকা অপর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রগতিশীল 'তরুণ লেখকদের পুস্তকে কেশরীর একটি ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হওয়ার অর্থই এই সকল লেখকদের খ্যাতির সোপানে আরোহণ করিয়ে দেওয়া।

তাঁর সাহিত্যিক ক্রিয়াকর্ম জ্ঞান বিস্তারে সহায়ক হয়েছে কারণ তাঁর রচিত গ্রন্থে একই সঙ্গে বহু তথ্যের সমাবেশ দেখা যায়। সাহিত্যের একজন ছাত্র তাঁর লেখা থেকে প্রচুর তথ্য আহরণ করতে পারে এবং এইসব তথ্যের সাহায্যেই মালয়ালাম সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস জানা যায়।

তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজের জন্য কেরালা সাহিত্য একাডেমি 1957 সালে পিল্লাইকে 5000 টাকা পুরস্কার দান করেন। সাহিত্য সম্পর্কিত কাজের জন্য সম্মানিত করে তাঁকে যথোচিত মর্যাদাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেরালার ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁর রচনাগুলি ইতিহাসের ছাত্র এবং পণ্ডিতগণ একবাক্যে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি যে সকল মত প্রকাশ করেছেন সেগুলি রীতিসিদ্ধ নয় এবং এ জন্যই সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি।

সাংবাদিক হিসাবে পিল্লাই পৌরুষের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং প্রগতিশীল যে কোন ক্রিয়াকর্মেই তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন কিংবা সহযোগিতা করেছেন। মন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য তিনি 1924 সালে ভাইকোন সত্যাগ্রহের প্রতি তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। 1932-এ গুরুভাবৈয়ুরে মন্দিরে প্রবেশাধিকার অর্জনের জন্য কেলপ্পন অনশন শুরু করলে পিল্লাই তাঁর সমর্থনে পর পর কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। পরিবার পরিকল্পনা এবং বিবাহের ঊর্ধ্বতন বয়সের সপক্ষে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। এমনকি প্রাচীনপন্থীগণ যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত নন তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে পিল্লাই অসঙ্গত কিছু বলেননি। ত্রিবাংকুরের মহারাজ মুকাম তিরুনল একদা বলেছিলেন, 'পিল্লাই বিকৃত মস্তিষ্ক নন; তিনি সত্য কথাই বলেন।' তিনি তাঁর উদারনৈতিক মনোভাবকে সাহিত্যেও প্রতিফলিত করেছেন। মহাকবি বল্লাথল এবং উল্লুর এস. পরমেশ্বর আয়ারের নেতৃত্বে যথাক্রমে ভাবাশ্রিত এবং অতীতাশ্রিত সাহিত্যচর্চা যে সময়ে পূর্ণোদ্যমে অগ্রসরমান সেই সময়ে প্রগতিশীল বাস্তববাদী থাকাজী শিবশংকর পিল্লাই-এর ন্যায় তরুণ লেখকদের সমর্থন করেছেন পিল্লাই। উদীয়মান,

লেখকদের নিকট কেশরী ছিলেন অনুপ্রেরণার উৎস।

মহাকবি জি. শংকর ও বর্তমান নিবন্ধকারের পিল্লাই-এর সংগে তাঁর উত্তর পারুর-এর বাসভবনে দুবার সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। দুরারোগ্য হাঁপানিতে আক্রান্ত তাঁর শীর্ণ দেহ জ্ঞান ও প্রগতির জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের শ্মশ্রুর ন্যায় অতটা পরিপক্ক না হলেও দীর্ঘায়িত শ্মশ্রুরাজিমণ্ডিত এই মানুষটির মুখাবয়ব এক পলক দেখলেই মনে হয় জ্ঞানের সাধনায় সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত তাঁর হাতে গতানুগতিক জীবন যাপনের মত কোন সময়ই ছিল না।

প্রায় সিকি শতাব্দীরও উপর বালকৃষ্ণ পিল্লাই সাহিত্য এবং ইতিহাস বিষয়ে সর্বক্ষণ পরিশ্রম করেছেন। কেশরীর গ্রন্থাবলীতে একজন সাহিত্যের ছাত্র যথেষ্ট শিক্ষণীয় এবং অনুকরণীয় উপাদান পাবে।

[P. Sreedharan Pillai—A. Balakrishna Pillai's Palippat Kunjikrishnan—Nammute Sahitya Karanmar ; Kedamangalam Pappukutty—Nhan Kanda Kesari ; C. Narayana Pillai—Poya Thalamura ; Balakrishna Pillai—Kesariyute Mukhaprasanganangal ; —Navalokam ; —Sahitya Gaveshanangal ; — Novel Prasthanangal ; —Sahitya Vimarsanangal ; Introduction to (i) Mayoorsandesam, and (ii) Kadathuvanchi.]

এন. এম. কে. নায়ার **পি. কুঞ্জিকৃষ্ণ মেনন**

এ বেদরত্নম পিল্লাই (১৮৯৭-১৯৬১)
A. Vedaratnam Pillai (1897-1961)

পিতামাতার তৃতীয় সন্তান এ. বেদরত্নম পিল্লাই 1897 সালের 25 ফেব্রুয়ারী বেদরানিয়মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিষ্ঠাবান শৈব ভেল্লার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা থাঙ্গাম্মল। পিতা আপ্পাকুট্টি পিল্লাই শ্রী বেদরাণ্যেশ্বর স্বামী দেবস্থানমের একজন জমিদার ছিলেন। তাঁদের পরিবার অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিল এবং তাঁরা আড়াইশো বছর পূর্বে বেদরানিয়মের সন্ন্যাসী থারুমানবের বংশধর বলে দাবী করতেন। সুতরাং গ্রামে তাঁদের পরিবারটি ছিল অত্যন্ত বিশিষ্ট এবং শ্রদ্ধাভাজন।

1912-এ তিনি তাঁর দূর সম্পর্কিত ভগিনী কমলাম্বলকে বিবাহ করেন। কিন্তু 1922 সালে তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্মগ্রহণের পর গান্ধীজীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করেন এবং দেশের কাজে নিজেকে সমর্পণ করেন।

প্রকৃত ভারতপ্রেমীর ন্যায় তিনি শুধুমাত্র ভারতীয় নেতৃবর্গ ও ধর্মশাস্ত্রের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। গান্ধীজী, বল্লভভাই প্যাটেল, বিনোবা ভাবে, অবিনাশলিঙ্গম চেট্টিয়ার, এন. এম. আর সুব্বারামন, ও. পি. রামস্বামী রেড্ডিয়ার এবং সি. রাজাগোপালাচারীর ন্যায় ভারতীয় নেতৃবর্গের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন পর্যন্ত তাঁদের তিনি তাঁর রাজনৈতিক 'গুরু' হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মগ্রন্থের মধ্যে থিরুক্কুরাল, ভাগবতগীতা, থেবারাম, এবং উপনিষদ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। সিংহলে তামিল সম্মেলনে যোগদান কালে একবারই তাঁর বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে।

তিনি নাগপট্টিনামে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি প্রভূত পরিমাণ সাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। একজন ভাষাবিদ্ হিসাবে তিনি মালয়ালাম, কানাড়ী, তেলেগু, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু এবং ইংরাজী জানতেন। গান্ধীজী এবং অন্যান্য কবিদের রচনা এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক তাঁর একটি গ্রন্থাগার ছিল। পরে তিনি এই গ্রন্থাগারটি কস্তুরবা কন্যা গুরুকুলমে দান করেন।

বিদ্যালয় ত্যাগের পর, তিনি পিতার কৃষিকার্য ও লবণ ব্যবসায়ে লিপ্ত হন ও সাফল্যের সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করেন। তিনি একটি বস্ত্র বিপণি স্থাপন করেন এবং এই ব্যবসায়েও প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সুতরাং বেদরানিয়মে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। সেই সময় আমাদের নেতৃবর্গ ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় এবং স্বাধীনতালাভের উপায় ও পথ পরিকল্পনায় ব্যাপৃত ছিলেন। বেদরত্নমের মধ্যে নেতৃবর্গ এমন এক বাধ্য ও তীক্ষ্ণধী ছাত্রকে পেয়েছিলেন যিনি

তাঁদের বাগ্মিতায় মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের উপদেশাবলী আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করে একজন বিরাট জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজ প্রয়োজন সাধনের জন্য সুতা কাটতেন এবং সর্বদা খদ্দরের বস্ত্র পরিধান করতেন। তিনি খদ্দর আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ বস্ত্র বিপণিও বন্ধ করে দেন এবং জনগণকে বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে খদ্দর পরিধানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।

উনিশ বছর বয়সে তিনি দেশের রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। যদিও তাঁর কার্যাবলী তাঁর নিজ দেশ বেদরানিয়ম ও তাঞ্জোর জেলাতেই আবদ্ধ ছিল তবু সর্বক্ষেত্রে তাঁর সর্ব প্রচেষ্টাই সার্থক হওয়ায় তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। 1924 সালে বেলগ্রামে আয়োজিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের সময় থেকেই তিনি কংগ্রেস অধিবেশনগুলির একজন নিয়মিত প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন এবং অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিরও একজন সদস্য হয়েছিলেন। 1929-এ বেদরানিয়মে আয়োজিত প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কনফারেন্সের সময় তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন। তিনি এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সচিব ছিলেন এবং এই অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মুখ্য ভূমিকা ছিল।

কংগ্রেস আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য 1930 সালকে চিহ্নিত করা যায়। সেই বছর মহাত্মা গান্ধী যখন তাঁর বিখ্যাত লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন, বেদরত্নম পিল্লাই তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির তৎকালীন সভাপতি সি. রাজাগোপালাচারীকে অনুরোধ জানান লবণ আইন ভঙ্গের জন্য যেন বেদরানিয়মকে নির্বাচিত করা হয় এবং এই অভিযান তাঁকেই যেন নেতৃত্ব দেওয়া হয়। তদনুযায়ী ব্যক্তিগত বিরাট ঝুঁকি নিয়ে তিনি বেদরানিয়মে এই অভিযান পরিচালনা করেন। এই ধরনের অভিযান দক্ষিণে এই প্রথম সংঘটিত হয় এবং ডাণ্ডি অভিযানের ন্যায় খ্যাতিলাভ করে। বেদরত্নম সরকারের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত করে তোলেন—পরিণতি স্বরূপ তাঁর লবণ ক্ষেত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করে নীলামে তুলে দেওয়া হয়। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তাঁর ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও দুশো টাকা জরিমানা করা হয়। 1931 সালে তিনি তিরুনেলভেলিতে আয়োজিত কৃষিবিদ সভায় যোগদান করেন এবং সেখানে লবণ সত্যাগ্রহ ও অন্যান্য আন্দোলনে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার জন্য "সর্দার" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপর তিনি সপ্তাহব্যাপী জেলা পরিভ্রমণকালে জনসভায় বক্তৃতা প্রদানের অপরাধে গ্রেপ্তারবরণ করেন। তবে তাঁকে কোন শাস্তিপ্রদান করা হয় নি। গান্ধী-আরউইন চুক্তির সময় তিনি বেশ কয়েকটি গ্রামীণ কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন এবং প্রায় একশত তাড়ির দোকানকে নীলাম হওয়া থেকে রক্ষা করেন। 1932 সালে দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁর ছয় মাস কাল সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা জরিমানা হয়। 1937 সালে যখন তিনি তিন্নিভেলি বণিক ও কৃষিজীবী সম্মেলনে সভাপতিত্বের জন্য যান তখন তাঁকে আই. পি. সির 124 ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হয় এবং আটমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 1940 সালের একক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তিনি নয় মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 1942'র আন্দোলনে যখন কংগ্রেস নেতৃবর্গ কারাবন্দী হন তখন গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচীসমূহ রূপায়নের কাজ তিনি অব্যাহত রাখেন। 1944 সালে কস্তুরবা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের পর তিনি কস্তুরবা ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ফাণ্ডের অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এই ফাণ্ডের তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপলি জেলার প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে তিনি এই দুই জেলায় কয়েকটি নারী ও শিশুকল্যাণ সংঘ ও প্রসূতি সদন স্থাপন করেন। 1946 সালে বেদরানিয়মে তিনি দরিদ্র বালিকাদের বিনাব্যয়ে থাকা-খাওয়া ও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে কস্তুরবা গান্ধী কন্যা গুরুকুলম নামে এক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হরিজন উন্নয়নে তাঁর সেবামূলক কাজের জন্য সরকার থেকে তাঁকে স্বর্ণ পদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

তিনি কংগ্রেসের বেশ কিছু কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 1935-এ তিনি ঝড়ঝঞ্ঝা এবং বন্যাত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ; 1937-এ তিনি মিউনিসিপ্যাল ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জেলা বোর্ডের নির্বাচনে তাঞ্জোর এ্যাড হক কমিটির সভাপতি হিসাবে তাঁরই দায়িত্বে কংগ্রেস পার্টি বিজয়ী হয়। ঐ একই বৎসরে যখন কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে মনস্থ করে, তখন তিনি তাঞ্জোর জেলার তিরুতুরাইপুণ্ডি

কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান ও নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তিনি কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টির দু'জনের মধ্যে একজন ডেপুটি লিডার বা উপ-সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। 1946 সাল থেকে 1961 সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি সব সাধারণ নির্বাচনে আসেম্বলিতে তাঁর আসন বহাল রাখেন। অ্যাসেম্বলির সদস্য হিসাবে তিনিই বোধহয় একমাত্র সদস্য যিনি প্রতিটি অধিবেশনে উপস্থিতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিয়মিত, তৎপর ও সময়নিষ্ঠ ছিলেন এবং প্রতি ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। এমন কি মৃত্যুর দু'দিন পূর্বেও তিনি চিকিৎসকদের উপদেশ ও আত্মীয়পরিজনের অনুরোধ উপক্ষা করে অ্যাসেম্বলিতে যোগদান করেছেন—বলেছেন—জীবনের থেকেও কর্তব্যপালন তাঁর কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে ছিলেন এবং কিছু বেসরকারী ও সরকারী কমিটির সদস্যও ছিলেন। 1929 থেকে 1939 পর্যন্ত তিনি জেলা কংগ্রেস কমিটির সচিব ছিলেন। এই সময়ে তিনি এত ভাল কাজ করেছিলেন যে জাতীয় নেতৃবর্গ তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে দক্ষিণ ভারতে তাঁর সংগঠন সমূহই ছিল উৎকৃষ্টতম। 1935-এ তিনি ভেলোরে আয়োজিত তামিলনাড়ু প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস সেশনের সভাপতি ও প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির উপ-সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঞ্জোর ডিস্ট্রিক্ট হরিজন সেবা সংঘ ও কস্তুরবা মেমোরিয়াল ফাণ্ডের সচিব ও হিন্দি প্রচার সভা ও খাদি বোর্ডের সভাপতিরূপে কার্যভার পরিচালনা করেন। তিনি ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিস কমিশন, হিন্দু কুষ্ঠ নিবারণ সংঘ, কস্তুরবা মেমোরিয়াল ফাণ্ড, তামিল বালার্চি কাজাগাম, গান্ধী ওয়ার্কস পাবলিকেশন কমিটি ও সল্ট ইণ্ডাস্ট্রিস্ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। তিনি তামিলনাড়ু গান্ধী স্মারক নিধিরও সম্পাদক ছিলেন। তিনি তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটি ও তামিলনাড়ু বেসিক এডুকেশন কমিটির উপ-সভাপতি ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসরের জন্য তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ও অল ইণ্ডিয়া রেডিওর-ও সদস্য ছিলেন।

এই সরল অনাড়ম্বর ব্যক্তিটি অত্যন্ত সুমিষ্ট জনচিত্তজয়ী ব্যবহারবিশিষ্ট ও কর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নম্রচিত্ত ছিলেন—কখনও ক্রোধ প্রকাশ করতেন না বা অপরের নিন্দাবাদ করতেন না। বস্তুতঃ তিনি এতই ভদ্র ছিলেন যে কখনও তাঁর সহকর্মীদের আঘাত দিতে বা অসন্তুষ্ট করতে পারতেন না বরং তাঁদেরও সবসময় শান্ত রাখার চেষ্টা করতেন—সেইজন্য তাঁকে সবসময় "ধর্ম-সংকটম" বলে ডাকা হত (কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের সদস্য আর. কৃষ্ণস্বামী প্রদত্ত সংবাদ)। তিনি অত্যন্ত কর্মিষ্ঠ ও উচ্চাদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কখনও একটি মিনিট নষ্ট করতেন না। তবে তাঁর কতকগুলি খুব ভাল অবসর বিনোদন চর্চা ছিল যেগুলি তাঁর শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সহায়ক হয়েছিল। তিনি যোগাভ্যাস করতেন ও সুতা কাটতেন। তিনি সন্তরণ ও সঙ্গীতপ্রিয়ও ছিলেন। বাগ্মী হিসাবে তিনি অনেক সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান করতেন।

তিনি ধার্মিক ছিলেন কিন্তু হিন্দুধর্মে সংক্রামিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতা ও মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করতেন। তিনি চাইতেন অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হোক এবং সর্বস্তরের হিন্দুদের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হোক। বেদরানিয়মের মন্দিরে হরিজন প্রবেশাধিকার অর্জনে তিনি সফলও হয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না কারণ তিনি মনে করতেন স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যারও অবসান ঘটবে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক নেতাদের কাছেও তিনি সর্বপ্রথম দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে মনোনিবেশের আবেদন করতেন। স্বাধীনতা তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল—সুতরাং তিনি স্বাধীনতার জন্য জনগণকে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার জন্য আবেদন করতেন। তিনি একজন শান্তি ও অহিংসাবাদী বিপ্লবী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন গান্ধী নির্দেশিত পথেই তাঁর উদ্দেশ্য সফল করে তোলা সম্ভব।

জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি প্রাদেশিকতার বিরোধী ছিলেন। হিন্দীর মাধ্যমেই তিনি ভাষাগত সংহতি রক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করতেন বলে তার শিক্ষা ও উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর গ্রামের জনগণকে তিনি নিজে হিন্দী শিক্ষা দিতেন এবং কারাবাসকালে অন্যান্য বন্দীদেরও হিন্দী শিক্ষণ দান করতেন।

তিনি একজন প্রকৃত গণতন্ত্রবাদী ছিলেন।

তিনি বলতেন নির্বাচকমণ্ডলীরও যথাযথ শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে কারণ শুধুমাত্র কংগ্রেসীদের আত্মত্যাগের প্রচারই যথেষ্ট নয়—কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলারও প্রয়োজন আছে।

তিনি গান্ধীজীর প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য অনুরোধ জানাতেন। বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি কস্তুরবা গান্ধী কন্যা গুরুকুলম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং থায়ুমানাভর সিনিয়র বেসিক স্কুল পরিচালনা করতেন। 1946 সালে স্টুডেণ্টস্ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সময় তিনি শিক্ষণ-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং 'ওয়ার্ধা স্কীমে'র আমূল পরিবর্তনের আবেদন জানান। কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচী রূপায়ন অব্যাহত রাখার জন্য তিনি ছাত্রদেরও আবেদন জানান।

সমাজসেবার কাজে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভূত অবদান আছে। তিনি মদ্যপানকে অপরাধ বিবেচনা করতেন এবং তার প্রতিরোধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি নারীর অধিকার রক্ষার জন্য বিধবা বিবাহ ও নারীদের নৈতিক উন্নতিসাধন প্রভৃতি সংস্কারকার্যে ব্রতী ছিলেন। নারীদের নৈতিক উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি কস্তুরবা গান্ধী কন্যা গুরুকুলম্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক কর্মসূচীর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনিও গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি গ্রামের জনগণকে জাতি গঠনে ও জাতীয় কাজে ভূমিকাগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি গ্রামীণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং গ্রামীণ হস্তচালিত চালকলের উন্নতিসাধনের জন্য কাজ করেন।

তিনি তাঁর গ্রামের জনগণের প্রতি সমর্পিত-প্রাণ ছিলেন। যখনই কোন ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার ধ্বংসলীলা ঘটত তখন ত্রাণকার্যের আয়োজন তিনিই করতেন। 1955-এর ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে যখন লবণ ব্যবসায়ীদের অপরিমিত ক্ষতিসাধন হয় তখন তিনি তাঁদের জন্য সাহায্যলাভে সফল হন এবং তাঁদের ব্যবসায় পুনর্জীবন লাভ করে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে একযোগে তিনি ত্রাণকার্য পরিচালনা ও বন্যায় বিপর্যস্ত জনগণের জন্য একটি কলোনীও সংগঠন করেন। স্বাধীনতালাভের পর তিনি তাঁর গ্রামের দ্রুত উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হন। তাঁর চেষ্টার পরিণতিস্বরূপ বিদ্যুৎ, কৃষি, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সম্ভব হয়।

তিনি ভারতে কৃষিজীবীদের অবস্থার উন্নতি, শ্রমিকশ্রেণীর জন্য ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ এবং বেকারি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের দাবী জানাতেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতিস্বরূপ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

তিনি শুধুমাত্র ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্যই নয় প্রবাসী ভারতীয়দের কল্যাণ সাধনেও অতিশয় উদ্‌গ্রীব ছিলেন। 1946 সালে তিনি বিদেশে অবস্থানকারী ভারতীয়দের অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিদেশেও কংগ্রেসসভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে উত্থাপন করেন।

মননে, বাক্যে, কার্যে একজন প্রকৃত গান্ধীবাদী বেদরত্নম ভারতের এমন একজন বীর সন্তান যিনি জাতীয় স্বার্থে তাঁর সময় সম্পদ, শক্তি সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন। দেশের জন্য তিনি রাজা থেকে ফকির হয়ে গিয়েছিলেন। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করে এবং পঁচিশ বৎসর বয়স থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় তিনি নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে দেশের সেবা করেছেন। ভারতের সৌভাগ্য যে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সর্দার বেদরত্নম্ পিল্লাই'র মতো বীর সন্তানদের আবির্ভাব ঘটেছিল—কারণ এঁদের কার্য, কষ্ট-স্বীকার ও আত্মত্যাগের জন্যই আমাদের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

[The Hindu Files ; Proceedings of the Madras Legislative Assembly, 1937-39 ; Proceedings of the Tamil Nadu Congress ; Directory of the Madras Legislature. 1942 ; Who's Who in Madras, 1940 ; Interview with Mr. R. Krishnaswami, June 1969 ; Life History Souvenir published after the demise, A. Vedaratnam Pillai ; Who's Who, Published by the Legislature Department, Madras, in 1957 ; Personal

Interview of the Research Fellow with R. Krishnaswami, a veteran Congressman and a co-worker of A. V. Pillai.]

(ইমান্যুয়েল ডিভিয়েন) বি. শালিনী দেবী

এম. এন. গোবিন্দন নায়ার (১৯১০— ?)

M. N. Govindan Nair (1910— ?)

1910 সালের 10 ডিসেম্বর ত্রিবাঙ্কুরের (কেরালা) পণ্ডালাম-এর এক মধ্যবিত্ত হিন্দু নায়ার পরিবারে এম. এন. গোবিন্দন নায়ার জন্মগ্রহণ করেন। এরিক্কুল পরিবারের ভি. আর. নারায়ণ পিল্লাই তাঁর পিতা এবং মুলক্কাল পরিবারের কুনহু লক্ষ্মী আম্মা তাঁর মাতা। উভয়েই পণ্ডালামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দুই ভ্রাতা ও তিন ভগিনী ছিল। তাঁর পিতা ত্রিবাঙ্কুরের নানা স্থানের মুন্সেফ্ আদালতের প্রধান করণিক হিসেবে কাজ করতেন।

1952 সালের 29 ফেব্রুয়ারী গোবিন্দন নায়ার পিকিং এর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত খ্যাত শাসন-পরিচালক ও রাষ্ট্রনীতিক স্বর্গীয় সর্দার কে. এম. পানিক্করের কন্যা দেবকী পানিক্করকে বিবাহ করেন। গোবিন্দন নায়ার একটা পুত্র সন্তান লাভ করেন। গোবিন্দন নায়ারের পত্নী পিতা-মাতা উভয় পক্ষ থেকেই কেরালার আলেপ্পি জেলার অন্তর্ভুক্ত কেভেলম-এর অভিজাত পরিবারভুক্ত ছিলেন।

পিতা সরকারী চাকুরে হওয়ায় নানা স্থানে বদলি হওয়ার ফলে গোবিন্দন নায়ারকে ত্রিবাঙ্কুরের বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হয়। 1926 সালে তিনি মাভেলিকারার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস. এস. এল. সি. উত্তীর্ণ হন। 1927-এ চঙ্গনাচেরীর S. B. College থেকে ইণ্টারমিডিয়েট এবং 1934-এ ত্রিবান্দ্রামের Maharaja's College থেকে বি. এ. পাঠ সমাপন করেন।

ছাত্রাবস্থায় তাঁর শিক্ষক শেষা আইয়ার তাঁর সামাজিক ও জাতীয় কর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছিলেন। সাময়িকভাবে তিনি গান্ধীজীর দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, Karl Marx, Engels এবং Lenin-এর কার্যাবলী ও রচনা তাঁকে সাম্যবাদের পথে পরিচালিত করে।

শান্তি সম্মেলনের সূত্রে তিনি 1952, 1962 এবং 1965-তে যথাক্রমে তিনবার রাশিয়ায় যান। তিনি লণ্ডন, প্যারিস ও বালগেরিয়াও গিয়েছিলেন।

1929 থেকে 1932-এ তিনি তাঁর নিজ শহর পণ্ডালামের এন. এস. এস. বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন। সেই সময় তিনি Nair Service Society-র একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি হরিজন উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ প্রভৃতি সমাজকল্যাণমূলক কাজে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যস্বরূপই তিনি নিজ শহরে হরিজনদের জন্য চেরিক্কল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে গোবিন্দন নায়ারের এই প্রকার কল্যাণমূলক কাজে গান্ধীজী বিশেষ আনন্দিত হন। অনতিবিলম্বে নায়ার গান্ধীজীর ওয়ার্ধা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি 1933 থেকে 1936 সাল Indian National Congress ও হরিজন সেবক সংঘের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করেন।

1938 সালে তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য কংগ্রেসে যোগদান করেন। এরপর ধীরে ধীরে তিনি সাম্যবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন এবং 1940 সালে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হন। 1945 সালে কুইলনের কাজু কর্মীদের আন্দোলন তিনি পরিচালনা করেন। ত্রিবাঙ্কুরের অধিকাংশ আন্দোলনের তিনিই হোতা ছিলেন। এর জন্য তাঁকে বহুবার গ্রেপ্তার ও কারাবন্দী হতে হয়। 1948 সালে কারাবন্দীকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে নাগেরকয়েলের টি. বি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি এক রাত্রে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেন।

1952 সালে তিনি ত্রিবাঙ্কুর কোচিন বিধানসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত হন। 1956 সালে তিনি রাজ্যসভায় সীমিত সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। 1967 সালে কেরালা বিধানসভায় প্রত্যাবর্তন করার পর ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে তিনি (1967-69 সালে) মন্ত্রীসভায় পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি কৃষি ও বিদ্যুৎমন্ত্রী হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি কেরালার ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং 1970 সালে কেরালা বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য।

গোবিন্দন নায়ার সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 1937-38 সালে তিনি মালয়ালাম সাপ্তাহিক 'রাজ্যাভিমানী'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তিনি মালয়ালাম পত্রিকা 'যুবকেরালাম'র সংগঠক ও অপর একটি মালয়ালাম সাপ্তাহিক ও দৈনিক 'জনযুগম'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 1955-57 সাল পর্যন্ত তিনি 'জনযুগম' প্রকাশনার অধিকর্তা ছিলেন।

ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক নেতা হিসাবে তিনি কেরালায় বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ত্রিবাংকুরের বহু শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সংগঠক এবং নানা সংগঠন ও কারখানার শ্রমিকশ্রেণীর জন্য তাঁর আন্তরিক সেবাকার্য এখনও অব্যাহত।

তাঁর বিশ্বাস শ্রেণী-বৈষম্যহীন সমাজই স্বাধীন ভারতের পূর্ণ অগ্রগতির পথের একমাত্র সহায়ক। এই ভাবাদর্শই তাঁকে হরিজন উন্নয়ন ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। হিন্দু পরিবারজাত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন ধর্মের প্রতি বা কোন ধর্মাচরণের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস নেই। তিনি একজন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট হিসাবে রুশী এবং পাশ্চমী শিক্ষাব্যবস্থার অনুরাগী। তিনি আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক সার্বিক শিক্ষানীতির পক্ষপাতী।

তিনি সর্বদাই ভারতে বিদেশী শাসনের বিরোধী ছিলেন এবং দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ভারত সর্বক্ষেত্রে স্বনির্ভর হবে এই ছিল তাঁর কামনা। তিনি দেখেছিলেন ব্রিটিশ শাসনই ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য তিনি দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পক্ষপাতী। কুটীর শিল্প সম্পর্কে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। আধুনিক বৃহদায়তন ভারী শিল্পের প্রসারের প্রতিই তিনি গুরুত্ব আরোপ করতেন। ভাবীকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় মত পোষণ করতেন।

তাঁর মতে প্রাদেশিক স্বার্থ যেন জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অথবা অনুরূপভাবে জাতীয় স্বার্থ যেন প্রাদেশিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

মহান এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটির পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত অনাড়ম্বর। দীর্ঘকাল ধরে বামপন্থী এই মহৎ রাজনীতিকের জীবন আনন্দ ও সংগ্রামের এক সমন্বয় ক্ষেত্র। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্মিতা সহজেই জনমানসকে আন্দোলিত করার ক্ষমতা রাখে।

শ্রমিক শ্রেণী ও নিপীড়িতদের লক্ষ্যে স্বার্থহীন এই কর্মী, অহিংসা নীতিতে বিদ্রোহের পক্ষপাতী ছিলেন। সব শ্রমিক বিদ্রোহেই তিনি শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। এই পথেই সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ দেশগঠন সম্ভব—এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত।

[Kerala District Gazetteers, Trivandrum ; Parliament of India, Rajya Sabha Who's Who (1957) ; Kovoor—Biography of T. M. Varghese ; Poonara Smaraka Grandham, 1966 ; Kazhinji Kala Chithrangal, Part I, 1950 ; Personal interviews of the Research Fellow witn M. N. Govindan Nair and M. N. Ramachandran Nair.]

(এন. এম. কে. নায়ার) কে. বাসুদেবন নায়ার

এম. এন. রায় (১৮৮৭-১৯৫৪)
M. N. Roy (1887-1954)

লেনিনের ভাষায় "প্রাচ্যে বিপ্লবের প্রতীক" মানবেন্দ্র রায় ছিলেন "লেনিন এবং স্টালিনের যুগের রুশেতর বিশ্বের অন্যান্য কম্যুনিস্টদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব (North and Eudin)। সমসাময়িক ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না।

1887 সালের 21 মার্চ বঙ্গদেশের 24 পরগণা জেলার অন্তর্গত আরবালিয়া গ্রামে নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য —পরে মানবেন্দ্র নাথ রায় ছদ্মনামে পরিচিত—জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য মেদিনীপুর থেকে আগত এক পুরোহিত বংশের সন্তান এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। 1898 সালে দীনবন্ধু কোদালিয়া নামে অপর একটি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। নরেন দীনবন্ধুর তৃতীয় সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় সন্তানটি ছিল দ্বিতীয়া পত্নী বাসন্তী দেবীর কন্যা।

প্রাথমিক বিদ্যা ব্যতীত নরেনের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রায় কিছুই ছিল না। তিনি আর বালিয়া ও কোদালিয়ায় বিদ্যালয়ে যেতেন। বলা হয় কলকাতায় এসে

তিনি প্রথমে অরবিন্দ ঘোষের National University ও পরে Bengal Technical Institute-এ ভর্তি হন। যদিও কলকাতায় এসে তিনি কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তিনি নিঃসন্দেহে একজন স্বশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।

নরেনের অতি ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু হরি কুমার চক্রবর্তী একবার বলেছিলেন—'বাল্যকাল থেকেই রায় অত্যন্ত ধার্মিক ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় তিনি বলতেন জ্ঞানই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের সহজাত আকাঙ্ক্ষা।' (1958 সালের 25 আগস্ট Robert North-এর সঙ্গে গৃহীত সাক্ষাৎকার) নরেন, চক্রবর্তী এবং কোদালিয়ার আরও দুটি কিশোর খুব অল্প বয়স থেকেই রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নরেন বিপ্লববাদী জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম 'অভিযান' (রাজনৈতিক ডাকাতি) কোদালিয়ার নিকটবর্তী চিংড়ীপোতা নামক রেলওয়ে স্টেশনে। এর পরেই তিনি 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা'য় লিপ্ত হয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বেনারস চলে যান এবং উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। এই সময়েই নরেন যুগান্তর দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সাক্ষাৎ লাভ করেন। শীঘ্রই নরেন নিজেকে বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম দুঃসাহসী সদস্য হিসাবে প্রতিপন্ন করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর Father Martin নামের আড়ালে জার্মান অস্ত্র সামগ্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করেন। নরেন প্রায় এক বছরের ওপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, ফিলিপাইন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত সান ফ্রান্সিসকোয় পেঁছান। আমেরিকায় থাকাকালীনই নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ওরফে Father Martin মানবেন্দ্র রায়-এ রূপান্তরিত হন। ইতিমধ্যে যতীন্দ্র নাথ ভারতীয় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন। এই সময় রায়ের বিপ্লবাত্মক জাতীয়তাবাদের ধারণাও সমাজবাদে রূপান্তর গ্রহণ করে।

আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের জীবন ক্রমশঃ বিপন্ন হয়ে উঠছিল। আমেরিকা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পর থেকেই জাতীয় বিপ্লবীরা নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে থাকেন। রায় শীঘ্রই গ্রেপ্তার হন কিন্তু জামিন লাভ করেই তিনি মেক্সিকোতে পলায়ন করেন। এখানেই Borodin-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরে চীনে তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দিলেও তাঁদের বন্ধুত্ব আজীবন অক্ষুন্ন ছিল। রায় 'Communist Party of Mexico'র প্রতিষ্ঠা করেন —সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে এটিই প্রথম সংগঠিত কম্যুনিস্ট পার্টি। লেনিনের আমন্ত্রণে রায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যাত্রা করেন এবং 'Second World Congress of Communist International' এর অধিবেশনের অল্পদিন পূর্বে সেখানে পেঁছান।

এই Second Congress-এ ঔপনিবেশিক বিপ্লবে জাতীয় কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায়ের ভূমিকা এবং কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নে রায় ও লেনিনের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বকে 'উচ্চস্তর ভিত্তিক বিপ্লব'(Revolution from above) এবং 'নিম্নস্তরভিত্তিক বিপ্লব' (Revolution from below) আখ্যা দেওয়া হয়। রায় এই শেষোক্ত বিষয়ের পক্ষে বিতর্ক করেন। রায় একেবারে প্রাথমিক স্তরে অত্যন্ত সতর্কভাবে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা প্রসূত অত্যন্ত সীমিত সুযোগ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। রায়ের মতে প্রধানতম কাজ ছিল মজদুর ও কৃষকদের সংগঠিত করা এবং 'নিম্নস্তর ভিত্তিক বিপ্লবে' (Revolution from below) তাদের সামিল করানো। লেনিন এবং রায় উভয়ের বক্তব্যই Second World Congress-এর প্রস্তাবভুক্ত করা হয়।

বিশের দশকে রায় International Communist সংগঠনে অতি শীঘ্র অতি উচ্চে আরোহণ করেছিলেন। 1922 সালে তিনি C. I.-এর কার্যনির্বাহক কমিটির (Executive Committee) পদপ্রার্থী-সদস্য এবং 1924 সালে পুরোপুরি সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি Presidium ও Secretariat এর সদস্য নির্বাচিত এবং 'Organising the Communist Movement in Asia and the training and education of Asiatic Communists'-এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ উন্নতিবিধান হিসাবে C. I. কর্তৃক চীনে বামপন্থা কার্যকর করার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা যায়।

1926 সালের ডিসেম্বরে C. I.-এর কার্য-নির্বাহক কমিটি (Executive Committee) দ্বারা গৃহীত 'Theses on the China Situation' সঙ্গে নিয়ে 1927 সালে রায় চীনে গিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থা কার্যকর করার সময় Borodin এর সঙ্গে তাঁর তীব্র

মতবিরোধিতা দেখা দেয়। 1923 সাল থেকে Borodin কুয়োমিংটানের কম্যুনিস্ট উপদেষ্টা ছিলেন। যদিও কম্যুনিস্ট কুয়োমিংটান বন্ধুত্বস্থাপন সাফল্যমণ্ডিত হয় নি তবুও 'বিশ্বের শিল্পপ্রধান অঞ্চলের তুলনায় অর্ধোন্নত অঞ্চলে মৌলিক সাম্যবাদী নীতির বিকাশ-সাধনের ক্ষেত্রে রায় লেনিন এবং মাও-সে-তুঙ্গের সমকক্ষ ছিলেন একথা বলাই বাহুল্য।' (North and Eudin)।

রায় চীন থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য জার্মানী ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে ইউরোপে ফ্যাসি-বাদ প্রকট হয়ে উঠছিল। ষ্টালিনের নেতৃত্বে Communist International-এর Sixth World Congress-এ বিশুদ্ধ এবং চরম বামপন্থীনীতি গৃহীত হয় এবং ভারতের ক্ষেত্রে তাকে সঠিকভাবে তুলে না ধরার জন্য রায়ের সমালোচনা করা হয়। Sixth World Congress-এর গৃহীত সিদ্ধান্তের এর সঙ্গে রায়ের মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি জার্মানীর Opposition Paper-এ এর সমালোচনা করেন এবং ফলে International-এর সঙ্গে তাঁকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলা হয়। এইভাবে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলেও 1934 সালে Communist International-এর Seventh World Congress-এ যখন 'Popular Front Approch' নীতি গ্রহণ করা হয় তখন রায়ের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়—কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। রায়ের C. I. ত্যাগের সঙ্গে চীনের কাজকর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না।

Communist International-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাকালীন রায় ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের উন্নতিবিধান করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি 'India in Transition', 'What Do We Want', 'One Year of Non-Cooperation', 'Aftermath of Non-Cooperation' এবং 'The Future of Indian Politics' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ও 'Vanguard' এবং 'Masses' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করে-ছিলেন। এগুলির কিছু কপি কোনক্রমে চোরাপথে ভারতে আনা হয়েছিল যদিও অধিকাংশই আটক ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁর অব্যাহত প্রচেষ্টায় বিশের দশকে কোন কোন ভারতীয় শহরে সাম্যবাদী দল গঠিত হয় এবং এগুলিকে একত্রিত করে পার্টি গঠনের চেষ্টা করা হয়। সর্বসম্মতভাবে রায় ভারতে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকৃত।

Communist International-এর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর রায় ইউরোপে তাঁর সুহৃদদের উপদেশের বিরোধিতা করেই ভারতে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি Dr. Mahmood ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ও নানা দেশে ঘুরে বেড়ান। তিনি Indian National Congress-এর করাচী অধি-বেশনে যোগদান এবং জহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি বোম্বাইতে গ্রেপ্তার হন ও তাঁকে কানপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। Kanpur Communist Conspiracy Case পুনরায় শুরু হয় এবং তাঁকে বারো বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আবেদনক্রমে এই শাস্তির কাল কমিয়ে পরে ছ'বছর করা হয়। ইউরোপ ত্যাগের পূর্বেই Ellen Gottschaulk-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। 1937 সালে রায় মুক্তিলাভ করার পর ইনি রায়ের কাছে আসেন এবং উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পরবর্তী জীবনে তিনি সর্বদা রায়ের সহযোগী ছিলেন।

মুক্তিলাভের পর রায় Indian National Congress-এ যোগদান করেন এবং A. I. C. C. তে নির্বাচিত হন। তিনি কংগ্রেসকে কার্যকরী ও গণ-তান্ত্রিক করে তোলার জন্য কাজ করেন এবং এইভাবে এটিকে জনগণের পার্টিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে অবশ্য সম্পূর্ণ চিত্ররূপটিই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ক্রমশঃ এই যুদ্ধ ফ্যাসী-বিরোধী রূপ গ্রহণ করলে এই যুদ্ধের গুরুত্ব অনুভব করে রায় মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর চাপ দেন। তাঁর মত ছিল যুদ্ধে ফ্যাসীবাদের জয় হলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আর কোন আশাই থাকবে না।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন এই প্রকার তখন তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 'Radical Democratic Party' নামে নতুন এক রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয়। অনু-রূপভাবে মিত্রশক্তির যুদ্ধোদ্যোগকে সমর্থন জানানোর উদ্দেশ্যে এক জাতীয় মজদুর সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি "Indian Federation of Labour" নামে পরিচিত ছিল। গণবিরোধিতা সত্ত্বেও এই দুই সংগঠন যুদ্ধোদ্যোগের সমর্থনে অবিরত প্রচার চালাতে থাকে এবং যুদ্ধ পরবর্তী কালে পুনর্গঠনের কাজ কি প্রকার হবে তাও নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করে। রায়ের এই সময়ের রচনাদির মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র

এবং জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। বিপুল সংখ্যক জনগণের স্বার্থ একমাত্র গণতন্ত্রবাদের মধ্যেই সংরক্ষিত হতে পারে এবং একমাত্র ফ্যাসীবাদের পরাজয়ের ফলেই তা সম্ভব—জোরের সঙ্গে এই মত তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে ফ্যাসীবাদী নীতির পরাজয় সমাজতন্ত্রবাদের পথও প্রশস্ত করতে পারত।

কিন্তু যুদ্ধান্তে যখন একদা সম্মিলিত মিত্রশক্তি আমেরিকা এবং রাশিয়া ও কিছু সময়ের জন্য ইংলণ্ড ও রাশিয়া সম্পূর্ণ দুই বিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হওয়ার পথে অগ্রসর হয় তখন রায় সোভিয়েত রাশিয়ার সমালোচনা করেছিলেন। যে সোভিয়েত রাশিয়া ফ্যাসী-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এত সম্মান এবং সুনামের অধিকারী হয়েছিল সেই সোভিয়েত রাশিয়া প্রচলিত অর্থনৈতিক নীতি ও এক কঠোর আদর্শের বশবর্তী হয়ে সমগ্র বিশ্বকে আক্রমণে উদ্যত দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। রায় সাম্যবাদের সীমা অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর উগ্র গণতন্ত্রবাদী নীতি উগ্র মানবতাবাদী নীতিতে রূপান্তর গ্রহণ করেছিল। মানবতাবাদকেই তাঁর ভবিষ্যৎ আদর্শ করে তুলে এবং উভয়ের মধ্যে অসঙ্গতি অনুভব করে তিনি 'Radical Democratic Party' ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এইভাবে রাজনৈতিক দল ভেঙ্গেছেন, সমাজের বাহ্যিক গঠনমূলক পরিবর্তনের ভিত্তিতে আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন এবং সামাজিক বিপ্লবের জন্য শর্তসাপেক্ষ এক দার্শনিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে পূর্বাপর বিতর্ক করেছেন। এইভাবেই Communist International-এর এক অন্যতম প্রতিষ্ঠান 'International of Humanists'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন নি। পূর্বেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'Indian Renaissance Institute' নামক সাংস্কৃতিক তথা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

'Radical Humanism' মতবাদটি মানুষকেই সমাজের মূল আদর্শ বলে মনে করত। সহযোগী সামাজিক সম্বন্ধ ব্যক্তিগত সম্ভাবনার বিকাশ সাধনের সহায়ক; ব্যক্তির বিকাশ সামাজিক প্রগতির পথ প্রশস্ত করতে সমর্থ। সুতরাং মূলতঃ মানুষিক প্রেরণার ফলই প্রগতি বিশেষতঃ স্বাধীনতার অভীপ্সা ও সত্যের সন্ধান। সুতরাং এক স্বাধীন নতুন বিশ্ব গঠনের জন্য বিপ্লবকে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনকে অতিক্রম করে যেতে হবে। নিম্নমানের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত অর্জিত হবে কিন্তু তা প্রকৃতই অর্জিত হবে তখন যখন সমাজ মুক্তিলাভ করবে।

এই সময়ে রায় রচিত বা রায়ের তত্ত্বাবধানে রচিত যে সকল গ্রন্থাদি বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতেও তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি—'The Russian Revolution', 'The Draft Constitution of India' এবং 'The People's Plan of Economic Development', 'Beyond Communism,' 'New Humanism', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

1952 সালের জুন মাসে যখন তিনি 'International Humanism and the Ethical Union'এ (I H E U) এবং নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দানের জন্য আমেরিকা যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সেই সময় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন এবং এই আঘাতেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুপথযাত্রী করে তোলে। মুসৌরিতে পাহাড়ে ভ্রমণকালে তিনি হঠাৎ পা ফসকিয়ে বেশ কয়েক ফুট নীচে পড়ে যান। এই আঘাতের ফলেই ক্রমে তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। এর থেকে আরোগ্য লাভ করার পর 1953 সালে তিনি দ্বিতীয়বার এই রোগে আক্রান্ত হন এবং 1954 সালের জানুয়ারী মাসে পুনরায় রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। 1954 সালের 25 জানুয়ারী রাত্রির প্রায় মধ্যযামে তিনি পরলোক গমন করেন। রায় বর্তমান শতাব্দীর একজন প্রধান রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি কোন বিশেষ মতবাদের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন না কিন্তু অবস্থানুসারে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধনে সমর্থ ছিলেন।

[G. P. Bhattacharjee—M. N. Ray and Radical Humanist, Bombay ; M. N. Roy's Memoirs, Bombay, 1964 ; M. N. Roy—Letters from Jail, Dehradun ;—Poverty or Plenty ? ;—Our Problems, 1946 ; Jawaharlal Nehru, Delhi, 1945 ; Our Differences ; Report of the Fifty-third Session of the Indian National Congress, Ramgarh, 1940 ; Bolshevik Conspiracy Case Judgement, Kanpur, 1924 ; File No. 261 of

1924 and K. W. 1924 of the Govt. of India, Home Department (Political); Meerut Conspiracy Case Judgement; The Radiance (English Weekly from Delhi) 29 March 1964, Vols. I to 36. The Radical Humanist (English Weekly from Calcutta), 14 February 1965; Personal interview of the Research Fellow with Dr. Jadugopal Mukherjee at Ranchi; Personal knowledge of the Contributor, an old associate of M. N. Roy.]

(এল. দেওয়ানী) পি. ভি. পারিখ

এম. কৃষ্ণ রাও মুতনুরি (১৮৭৯-১৯৪৫)

M. Krishna Rao Mutnuri (1879-1945)

1879-এ পশ্চিম গোদাবরী জেলার (বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ) অমলাপুরমের এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে কৃষ্ণ রাও মুতনুরির জন্ম হয়। এই পরিবারটির আদি নিবাস ছিল কৃষ্ণা জেলার দিভি তালুকভুক্ত মুতনুরু গ্রামে। পরবর্তীকালে তাঁরা মসুলিপত্তনমে স্থানান্তরিত হন। কৃষ্ণ রাওয়ের পিতা নাগভূষণম্ মসুলিপত্তনমে জেলা মুন্সেফের কাজ করতেন।

মসুলিপত্তনমের 'হিন্দু হাই স্কুল' থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ রাও 1896-এ ঐ শহরেরই Noble College এ F. A. পড়ার জন্য ভর্তি হন। তিনি F. A. পরীক্ষায় দু'বার অকৃতকার্য হন। 1898 থেকে 1902 সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজে পড়াশুনা করেন কিন্তু সেখানেও তিনি কৃতকার্য হতে পারেন নি।

মসুলিপত্তনমে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জাতীয় আন্দোলন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারমূলক কাজের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। 1903 সালে কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া যখন মসুলিপত্তনম 'কৃষ্ণা পত্রিকা'র প্রকাশনা শুরু করেন তখন কৃষ্ণ রাও তার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। 1905-এ তিনি এর সম্পাদক হন। এই পদে তিনি আজীবন আসীন ছিলেন। তাঁর সম্পাদনাধীনে এই পত্রিকাটি অন্ধ্রের একটি প্রধান জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা হয়ে উঠেছিল।

এম. কৃষ্ণ রাও খাদি এবং কুটীর শিল্পের একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। খাদির বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার করার জন্য তিনি ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে 1905 সালে মসুলিপত্তনমে 'স্বদেশী বস্ত্রালয়ম' প্রতিষ্ঠা করেন। দুই বন্ধু কোপাল্লে হনুমন্তা রাও এবং পট্টভি সীতারামাইয়ার সঙ্গে একযোগে তিনি 1907-এ 'অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা' স্থাপন করেন। এখানে হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হত। 1914-এ এই প্রতিষ্ঠানে গালিচা বয়ন শিক্ষা শুরু হয় এবং 1916 সালে 'Frame-loom' এর ব্যবস্থা করা হয়। 1921 সাল থেকে খাদিবস্ত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

জাতীয়তাবাদের জোয়ার যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (1905) আঘাতে উৎক্ষিপ্ত তখন কৃষ্ণরাও বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে বঙ্গদেশ সফরে আসেন এবং বেশ কিছু জনসমাবেশে সমাজ সংস্কার, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এক বৎসর প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার পর তিনি বিপিন চন্দ্র পালের শিষ্যরূপে মসুলিপত্তনমে এ প্রত্যাবর্তন করেন।

কৃষ্ণ রাও হোম রুল লীগের একজন সদস্য এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের গুণমুগ্ধ ছিলেন। 1908 সালে তিলকের কারাদণ্ডের পর তিনি তাঁর পত্রিকায় এমন এক জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লেখেন যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত উত্তাল হয়ে ওঠার ফলে তিনি সরকারের বিচারাধীন হন। পরিণতিস্বরূপ 1908 থেকে 1912 পর্যন্ত কৃষ্ণ রাওকে সম্পাদনা কার্য থেকে বিরত থাকতে হয়। এর পরে তিনি যখন আবার স্বকার্যে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আরো অধিক উৎসাহ ও দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি লেখনী চালনা করেন।

গান্ধীজীর পরিচালনায় যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় কৃষ্ণ রাও তখন সর্বান্তঃকরণে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রচারকরূপে অন্ধ্র সফর করেন এবং ভাষণ ও লেখার মাধ্যমে গান্ধী দর্শনের বহুল প্রচার করেন। তিনি কংগ্রেস দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। 1920-21 সালে তিনি East Krishna District Congress Committee'র সভাপতি ছিলেন। 1930 সালে লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয় এবং 1932 তে তিনি মুক্তিলাভ করেন। 1933-34 সালে আরোও দুবছরের জন্য তিনি ভেলোর জেলে আটক ছিলেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গঠনমূলক সময়টিতে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী তেলেগু দৈনিকের সম্পাদক হিসাবে কৃষ্ণ রাও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তাঁর সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে তিনি অন্ধ্রে জাতীয়তাবাদের একটি রূপ দিতে পেরেছিলেন।

[Gottipati Brahmayya—Jativelugulu, Masulipatnam ; Avutapalli Narayana Rao —Visalandharmu, 1940 ; Vignana Sarvaswamu, Vol. 4 (Published by the Telugu Bhasha Samithi, Madras) ; The Andhra Patrika (Telugu daily), dated 1 July 1945.]

(আর. নাগেশ্বর রাও) ভি. এন. হরি রাও

এম. তায়েবউল্লা (১৮৯৪-১৯৬৭)
M. Tayyebulla (1894-1967)

1894-এর মার্চ মাসে গৌহাটির এক 'কাজী' পরিবারে মুহম্মদ তায়েবউল্লার জন্ম হয়। এই পরিবারটি মূলতঃ গোয়ালপাড়ার নয়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কর্ম এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমতঃ পূর্বে মোগল বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে এবং পরবর্তীকালে পরিবারস্থ পুরুষ সদস্যদের উচ্চশিক্ষার জন্য সাধারণের কাছে পরিবারটি অত্যন্ত সম্মানভাজন ছিল। তায়েবউল্লার পিতা মাহ্নুযাতউল্লা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে জীবন শুরু করে তিনি মাসিক 450 টাকা পারিশ্রমিকে Senior Extra Assistant Commissioner পদে উন্নীত হয়েছিলেন। 1903 সালে মাত্র 49 বৎসর বয়সে তায়েবউল্লার পিতার মৃত্যু হলে তাঁর অল্প বয়সী মাকে আজীবন একাকী দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। 1930 সালে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

1921 সালে কংগ্রেস কার্যাবলীর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত থাকায় অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে তায়েবউল্লার প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়। 1935 সালে তাঁর প্রথম পত্নীর মৃত্যু হলে দু'বৎসর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। 1945-এ তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীরও মৃত্যু হলে বছর দুয়েক পর তিনি ছোট ছোট শিশুদের দেখাশোনা ও সস্নেহ সাহচর্য প্রদানের উদ্দেশ্যে পুনরায় বিবাহ করেন।

এক রক্ষণশীল সুন্নী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও এবং তার মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা হলেও তায়েবউল্লা ধর্মান্ধ ছিলেন না। তাঁর পিতা কলেজে ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং ধর্মবিশ্বাসানুযায়ী তাঁদের বিশেষ কোন ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল না। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত তায়েবউল্লা গোলঘাট ও শিবসাগরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন; প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েটের বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি লাভ করেছিলেন। 1914-এ তিনি পদার্থ বিদ্যায় অনার্সসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তিনি শুদ্ধ গণিত নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনও পড়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে 1921 সাল থেকে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর ঘটনাবহুল কর্মজীবনের সূচনা ঘটে। তিনি প্রকৃতই একজন সত্যাগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং 1922 সালের 1 জুলাই পর্যন্ত আটমাস কারান্তরালে ছিলেন। মুক্তিলাভের পর তিনি আলিগড়ের Jamia Millia National University তে দুবছর বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ে তিনি বহু বিপ্লবী শিক্ষক তথা ছাত্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন যাঁরা সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী বিদ্যালয় ও কলেজ ত্যাগ করেছিলেন। স্বদেশী দ্রব্যসামগ্রী তখন নিত্য ব্যবহার্য হয়ে উঠেছিল। তায়েবউল্লা তাঁর বিজ্ঞানাগারকে যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। জামিয়া মিলিয়াও বহুলাংশে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার অনুসারী ছিল।

1926-এ পাণ্ডু কংগ্রেস অধিবেশনে তায়েবউল্লা অভ্যর্থনা কমিটির সহ-সচিব (Asst. Secretary) ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি আসামের কংগ্রেস সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি এবং সভাপতি প্রভৃতি বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন। তিনি 1940, 1946 এবং 1948 সালে সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন।

তায়েবউল্লা বৃটিশ কারাগারের প্রায় নিয়মিত অতিথি ছিলেন—1940 সালে তিনি ছ'মাসের জন্য দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হন। 1942 সালের 9 আগস্ট যখন বৃটিশ সরকার অকস্মাৎ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানে তখন অন্যান্য বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদের সঙ্গে তারা তায়েবউল্লাকেও গ্রেপ্তার

করে। 1945 সালের 27 মার্চ তিনি মুক্তিলাভ করেন।

তায়েবউল্লার জাতীয়তাবাদ ভারতে বৃটিশদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দৃঢ় বিরোধিতা ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ স্বরূপ ছিল। তিনি বৃটিশদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কলেশহীন পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধীজীর প্রশিক্ষণে শিক্ষিত তায়েবউল্লার নিকট জাতীয়তাবাদ ও খিলাফৎ-বাদ একত্র সংমিশ্রিত ছিল। তায়েবউল্লা 1928 সালে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের Subjects Committeeর নিকট দুটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। একটি প্রস্তাবে তুর্কী, মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ইরাকের জনসাধারণকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এবং অপর প্রস্তাবটিতে চিনের জনগণকে তাদের রাষ্ট্রগঠনের জন্য অভিনন্দিত করার সুপারিশ করা হয়। এই প্রস্তাব দুটিতে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সর্বত্র এক এবং অবিভাজ্য এই কথাই বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। কলকাতা অধিবেশনে এই প্রস্তাব দুটি গৃহীত হয়। প্রসঙ্গতঃ জওহরলাল নেহরু এই দুটি প্রস্তাব সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং এই সময়েই A. I. C. C. র Foreign Contact Committee গঠিত হয়।

তায়েবউল্লা দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। প্রথম দিকে মুসলীম লীগের দু একটি সম্মেলনে যোগদান করলেও তিনি এম. এ. জিন্না প্রচারিত মুসলমান জাতিভিত্তিক পৃথকীকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর এই সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মনোভাবই 1946 সালে যখন Cabinet Mission'র কুখ্যাত 'Grouping Scheme'-র ফলে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে জটিল করে তুলেছিল তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছিল তায়েবউল্লার মনোভাব। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে তায়েবউল্লা এই পরিকল্পনা বাতিলের উদ্দেশ্যে নিউ দিল্লীর A. I. C. C. Working Committee তে প্রতিনিধিত্ব করেন।

তায়েবউল্লা আদর্শহীন সমঝোতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর প্রচেষ্টাতেই 1940 সালে কংগ্রেস মুসলীম লীগ ও Local People's Party'র পক্ষে সম্মিলিত ভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব হয় নি।

কোরাণের উপদেশ তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মতে বিশ্বের সকল অবতারের মধ্যেই ইসলামের প্রভাব বর্তমান। তিনি আধুনিকমনা ছিলেন এবং অন্যান্য নানা গ্রন্থের মধ্যে Webbদের সোভিয়েত সাম্যবাদের ওপর রচিত গ্রন্থটি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। আবার তায়েবউল্লা নিজেই স্বীকার করেছেন যে 'অহিংস সমাজবাদের' ভিত্তিতে গঠিত 'সর্বোদয় সমাজের' প্রতি তিনি বিশ্বাস রাখেন। 'Islam and Non-Violence' ও 'কারাগারের চিঠি' তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে অন্যতম।

স্বাধীনতার পর 1947 সালের নভেম্বরে তায়েবউল্লা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Assam Assembly'র সদস্য নির্বাচিত হন। 1948-এর 5 মার্চ থেকে 1950 সালের 20 জানুয়ারী পর্যন্ত বারদোলুই মন্ত্রীসভার শুল্ক ও আবগারী, তথ্য ও প্রচার এবং কারাগারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। জি. এন. বারোদলুই'র সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য ঘটায় তিনি মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন। 1952 তে তায়েবউল্লা রাজ্য সভায় নির্বাচিত হন। 1958-এ তিনি ঐ একই সভায় পুনর্নির্বাচিত হন। জীবনের শেষ ক'টি বছর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে সরে থাকেন।

আজীবন জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসাবে তায়েবউল্লা তাঁর কর্মের মাধ্যমে নিজেকে একজন প্রকৃত জাতীয় নেতারূপে প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে এবং দেশ-বিভাগের পরবর্তী সময়ে যখন সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা সমগ্র জাতিকে আঘাত হেনেছিল তখন তায়েবউল্লার ন্যায় ব্যক্তিরাই দেশের সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর ঐকান্তিকতা এত গভীর ছিল যে প্রায় সব মানুষেরই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। একজন মুসলমান হয়েও তিনি সকল প্রকার বিভেদের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন বলে সকলের ভালবাসাই তিনি অযাচিত ভাবে লাভ করেছিলেন।

[M. Tayyebulla—Karagarer Chithi, 1962 ;—Islam and Non-Violence, 1959 ; —Memoirs ; Pattabhi Sitaramayya—The History of the Indian National Congress.]

(এ. সি, ভুঁইঞা ডি. পি. বড়ুয়া

এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া (স্যার) (১৮৬১-১৯৬২)
M. Visvesvaraya (Sir) (1861-1962)

মহীশূর রাজ্যের নন্দী পর্বতশ্রেণীর নিকটবর্তী একটি গ্রামে 1861 সালের 15 সেপ্টেম্বর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার, প্রশাসক এবং রাজকর্মচারী বিশ্বেশ্বরাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষদের আদি নিবাস ছিল অন্ধ্র প্রদেশের মোক্ষগুন্ডম নামক স্থানে এবং এঁরা ছিলেন প্রাচীনপন্থী মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত। নিকটবর্তী শহর চিকবল্লপুরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। 1880 সালে বাঙ্গালোরের সেন্ট্রাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রবৃত্তি লাভ করে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার জন্য (Poona College of Science) এ ভর্তি হন। 1883 সালের নভেম্বরে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং-এ স্নাতক উপাধি লাভ করেন।

বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম একজন ইঞ্জিনীয়ারিং এর শ্রেষ্ঠ স্নাতক-রূপে বম্বে সরকারের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারের পদ প্রাপ্ত হয়ে 1884-র মার্চ মাসে কাজে যোগদান করেন বিশ্বেশ্বরাইয়া। প্রথমে তিনি নাসিক ও খান্দেশ জেলায় কাজ করেন এবং পরে ধুলিয়া শহরের জন্য জলসরবরাহ প্রকল্প রূপায়িত করেন। কিছুকাল পুণা শহরে কাজ করে তিনি শুক্কুর এবং সিন্ধুর বিশেষ জলসরবরাহ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা কার্যকরী করেন (1894-95)। সুরাট শহরে জলসরবরাহের জন্য তাপ্তী নদীগর্ভে একাধিক কূপ খনন তাঁর উল্লেখ্য কাজ। 1899 সালের এপ্রিল মাস থেকে পুণা জেলার সেচ বিভাগের দায়িত্ব পালন কালে সেচের জলের অপচয় রোধে জনসাধারণ এবং কৃষকশ্রেণী তাঁর পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এক একজনকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জলবন্টনের সুবিধাগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের বুঝিয়ে তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেন। খাদকবসলায় ফিফে হ্রদের জল ধারণের সর্বোচ্চ মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি স্বয়ংক্রিয় জলনিঃসরণের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এর ফলে মূল অতিরিক্ত বাঁধ থেকে 8 ফিট বেশি জলধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। জলের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয় এবং নির্দিষ্ট স্তরের উপর থেকে বন্যার জলের অপসারণ সহজ হয়। তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতির জন্য তিনি বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হন; কিন্তু বিনিময়ে তিনি উদ্ভাবিত পদ্ধতির জন্য প্রাপ্যাংশ নিতে অস্বীকৃত হন।

1901 সালে, যে সময় জি. কে. গোখলে পুণা পৌরসভার সভাপতি, সে সময় ঐ পৌরসভার স্যানিটারী ইঞ্জিনীয়াররূপে তিনি সর্বপ্রথম আধুনিক একটি জলনিস্কাশনের প্রকল্প রূপায়িত করেন। 1904 সালে তিনি স্থায়ী সরকারী স্যানিটারী ইঞ্জিনীয়াররূপে নিযুক্ত হলে করাচী ও আহমেদাবাদ শহরে জলসরবরাহের সমস্যাগুলির নিষ্পত্তি করেন। যখন এডেনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থার জন্য পূর্তাদি কার্য বিষয়ক বিদ্যায় পারদর্শী একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও মন্তব্য চাওয়া হয় তখন বিশ্বেশ্বরাইয়াকে প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করা হয় এবং তিনি সেখানকার জলসরবরাহ ও জলনিষ্কাশন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান বিবরণী পেশ করেন। কোলহাপুর, বেলগাঁও, ধারওয়ার এবং বিজাপুর শহরগুলির জলসরবরাহ ব্যবস্থা তাঁর তত্ত্বাবধানেই রূপায়িত হয়। 1908 সালে বম্বে সরকারের চাকুরী থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বম্বে প্রদেশে কার্যভার নিষ্পন্ন করার সময় তিনি এম. জি. রাণাডে, জি. কে. গোখলে এবং বি. জি. তিলকের ন্যায় দেশহিতৈষী নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে আসেন। 1891 সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় Deccan Club প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রটিতে তৎকালীন কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সমাবেশ হত। 1904 সালে তাঁকে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভ্য মনোনীত করা হয়। তিনি লন্ডনের Institute of Civil Engineers-এরও একজন সভ্য ছিলেন।

অবসর গ্রহণের পর তিনি যখন ইউরোপে অবকাশ যাপন করছিলেন সেই সময় 1908 সালের সেপ্টেম্বরের মুসি নদীর প্রবল বন্যায় হায়দরাবাদ শহর ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিশ্বেশ্বরাইয়াকে শহরের পুনর্গঠনের কাজে সহায়তা করতে এবং পরামর্শ প্রদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সবকিছু খতিয়ে দেখে তিনি বন্যার জল ধরে রাখার জন্য কতকগুলি জলাধার নির্মাণ এবং শহরের কিছু স্থানে নদীর পাড় উঁচু করে বাঁধার পরামর্শ দেন। জল নিস্কাশনের একটি প্রকল্প রূপায়ণ করার প্রস্তাবও তিনি পেশ করেন। 1909 সালের অক্টোবর মাসে তিনি তাঁর কাজ সমাধা করেন।

মহীশূরের মহারাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি মহীশূর রাজ্যের মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার হতে সম্মত হন এই শর্তে যে সরকার কারিগরী শিক্ষা এবং শিল্প কারখানার উন্নতি সাধনে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে

লাগাবেন। 1909 সালের 15 নভেম্বর তাঁকে রাজ্যের মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় 1911 সালের জুন মাসের রাজ্যের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা এবং আলোচনা মাফিক কর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়ে Mysore Economic Conference নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। কাবেরী নদীর উপর 124 ফিট উঁচু বাঁধ সমেত কৃষ্ণরাজ সাগর জলাধার প্রকল্পটি তাঁর অপর এক উল্লেখ্য কীর্তি। সেচের সম্প্রসারণ ছাড়াও এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল কোলার স্বর্ণখনিতে বিদ্যুৎ যোগান দেওয়ার জন্য শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিয়মিত জলসরবরাহ করা। দেশীয় ইঞ্জিনীয়ারদের সাহায্যে নির্মিত সর্ব-বৃহৎ এই জলাধারটি বহুবাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়মত 1915 সালের 1 জুলাই-এর মধ্যে নির্মাণ করা সম্ভব হয়। তিনি ব্রিটিশ কোম্পানীর পরিচালনাধীন নূতন রেলপথ স্থাপনের জন্যও উদ্যোগী হন।

রাজ্যের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য এবং পূর্তকর্মের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়নের সাহায্যে জনসাধারণ যাতে নির্দ্বিধায় কাজ করতে পারে, জীবিকা অর্জন করতে পারে এবং সুস্থভাবে বাঁচতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই মহারাজার আমন্ত্রণ-ক্রমে তিনি 1912 সালের নভেম্বর মাসে মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান (মুখ্যমন্ত্রীর) পদ গ্রহণ করেন। কার্যভার গ্রহণের একুশ মাস পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে তাঁর কাজকর্ম যদিও নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সম্পন্ন করতে হয় তবুও তিনি উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য জন-সাধারণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করা থেকে বিরত থাকেন নি।

সরকারের সঙ্গে তাঁর প্রতিপত্তি ও সদ্ভাব থাকায় তিনি একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় মহারাজাকে অধিকহারে ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। Unilateral Instrument of Transfer-নামক যে চুক্তিতে মহারাজাকে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করা হয়, তার বিকল্প একটি চুক্তি সম্পাদন করেন বিশ্বেশ্বরাইয়া। প্রতিনিধিত্বমূলক সভাকে প্রকৃত কার্যকরী করার জন্য সভ্যগণকে রাজ্যের বাজেটের উপর বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে এবং প্রশ্ন উত্থাপন করতে বিশেষ অধিকার প্রদান করা হয়। সভার প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়। পূর্বপ্রথা রহিত করে বৎসরে দু'বার সভার অধিবেশন আহ্বান করার প্রথা প্রচলিত হয়। অনুরূপভাবেই Legislative Council-কেও অধিকহারে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসাবে তিনি বিচার ব্যবস্থাকে শাসন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করেন। পৌরসভা, জেলা পরিষদ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসন সংস্থা-গুলির গঠন প্রণালীর বিধিসমূহও তিনি সরল করেন এবং অধিক সংখ্যায় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের সংস্থান রাখেন। সরকারী বিভাগসমূহের এবং সেনাবাহিনীর কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং দক্ষতা বজায় রাখার জন্য তিনি একটি দক্ষতা পরীক্ষার (Efficiency Audit) প্রথার প্রচলন করেন। অফিসের কাজকর্ম সুবিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি অফিস ও বিভাগসমূহের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন কিংবা পূর্ব প্রণীত গ্রন্থের সংশোধন করেন।

শিল্প বাণিজ্য, শিক্ষা এবং কৃষি-Economic Conference এর এই তিনটি উপশাখা সমিতির সাহায্যে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং কৃতকর্মের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা হয়। উন্নয়ন-মূলক কাজের সামগ্রিক সাফল্যের মূলে ছিলেন বিশ্বেশ্বরাইয়া। মহীশূর ব্যাংক, The Kannada Literary Academy এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের (1 জুলাই 1916) প্রতিষ্ঠায় তিনিই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষার প্রতি অবহেলাই যে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ সে বিষয় উপলব্ধি করে তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিল উত্থাপন করেন এবং এই শিক্ষার বিস্তারে বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তিনি একটি কৃষি বিদ্যালয় (1913), একটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কতিপয় শিল্প সংক্রান্ত বিদ্যালয় এবং বাঙ্গালোরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মহীশূরের Maharani's College-কে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করা হয় এবং মহিলাদের প্রথম ছাত্রী নিবাস স্থাপিত হয়।

গুটিপোকা চাষের উন্নয়ন, চন্দনতেলের প্রস্তুতি, সাবান তৈরী এবং কেন্দ্রীয় ও জেলাভিত্তিক স্তরে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি উদ্যমী হয়েছিলেন। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের ভর্তুকি দিয়ে কুটীর শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করতেন। নন্দীর শৈলাবাসের

উন্নয়ন, বাঙ্গালোরের Century Club, Modern Hindu Hotel-এর প্রতিষ্ঠা ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ে একাধিক প্রকল্পের প্রবর্তন প্রভৃতি তাঁর উল্লেখ্য কীর্তি।

কাঠ কয়লার সাহায্যে লৌহ প্রস্তুত করার জন্য The Mysore Iron and Wood Distillation Works-এর নির্মাণকার্য শুরু হয় 1918 সালে। রেল বিভাগকেও পুনর্গঠিত করা হয়। তাঁর কার্যকালে বাজেটে উদ্বৃত্ত লক্ষিত হয় এবং 332 লক্ষ টাকার মূলধন শিল্প কারখানা এবং লাভজনক সরকারী সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়।

সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে চাকুরীর অধিকারের দাবী যখন সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং এ বিষয়ে একটি সমিতি গঠন করার প্রস্তাব করা হয় সে সময় সরকারী কাজে দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁর আবেদনে কর্ণপাত করা না হলে 1918 সালের 9 ফেব্রুয়ারী বিশ্বেশ্বরাইয়া দেওয়ানের পদে ইস্তফা দেন।

পুনরায় মহারাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি Mysore Steel and Iron Works-এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। 1923 থেকে 1927 অবধি পরিচালনার দায়িত্বে থেকে তিনি এটিকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করেন। সরকার থেকে তিনি যা বেতন পেতেন তা তিনি বাঙ্গালোরে স্থিত মহারাজা শ্রী জয় চামরাজা ওয়াদিইয়ারের নামে একটি বৃত্তিশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য দান করেন। Cauvery Canal System এবং New Bangalore Water Supply Scheme সমিতি দু'টির সভাপতির পদও তিনি অলংকৃত করেন।

মহীশূরে একটি মোটর তৈরীর কারখানা স্থাপন করার বাসনা পূর্ণ না হলেও বিশ্বেশ্বরাইয়া বোম্বাই-এর Premier Automobile Company স্থাপনে সাহায্য করেন। ওয়ালচাঁদ-এর সহযোগিতায় তিনি বাঙ্গালোরের Hindustan Aircraft Factory প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হন।

বম্বে সিটি করপোরেশন (1924-25) এবং করাচী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন (1924) এর প্রশাসন এবং অর্থ দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি পরামর্শ দান করতেন। পশ্চিম ভারতের অনেক শহরের জলসরবরাহ এবং জলনিকাশী প্রকল্প তাঁরই অভিজ্ঞতা এবং সুপরামর্শের ফল স্বরূপ। 1937 সালে উড়িষ্যার বন্যার সময়ও তিনি সেই দেশের সরকারকে তাঁর অভিজ্ঞ পরামর্শ দান করেন।

Bombay Technical and Industrial Education Committee-র (1921-22) তিনি ছিলেন একজন সভ্য। কিন্তু তিনি শিক্ষা এবং শিক্ষানবিশী সম্পর্কে ইংরাজ সভ্যদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন নি। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের উন্নতি সংক্রান্ত সমিতির সভাপতিরূপে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল টেকনলজি ডিপার্টমেন্ট খোলার প্রস্তাব করেন এবং পরে তাঁর ঐ প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়।

বম্বের Irrigation Enquiry Committee (1938) এবং The Indian Economic Committee (1925) দু'টির সভাপতির পদ তিনি অলংকৃত করেছিলেন। বাঙ্গালোরের Political Disturbances Enquiry Committee-র (1929) সভাপতিরূপে তিনি একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। 1922 সালে কতকগুলি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এক সর্বদলীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। 1929 সালে ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত South Indian State People's Conterence-এও তিনি সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় তথা আঞ্চলিক সরকারে রাজ্যগুলির জনগণের অংশগ্রহণে দাবী সম্পর্কে এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর পরামর্শে ভারতীয় রাজ্যগুলির ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কে একটি স্মারকলিপিও প্রণীত হয়।

শিল্প, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নত দেশগুলির রূপরেখা সম্যকভাবে অনুধাবন করার জন্য তিনি 1898, 1908 1919, 1926, 1935 এবং 1946 সালে ছয়বার বিদেশ সফর করেন।

বম্বের Committee of the Association of Indian Industries যখন এক সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করে বিশ্বেশ্বরাইয়াকে সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ জানায়, তখন তিনি এই শর্তে রাজী হন যে এই সমিতিটি স্থায়ী রূপ নেবে এবং উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে অন্ততঃ বারজন প্রতিদিন চারঘণ্টা করে সমিতির কাজ করবেন। এইভাবেই 1941 সালের জুন মাসে All India Manufacturers' Organisation গঠনের সূত্রপাত হয় এবং তিনি বহু বৎসর যাবৎ এই সমিতির সভাপতির পদে বৃত ছিলেন।

1923 সালে ইনডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর ভাষণে গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাঙ্গালোরের

Indian Institute of Science-এর সঙ্গে তিনি প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন এবং 1940 থেকে 1947 সাল অবধি এই ইনস্‌টিট্যুটের কোর্টের সভাপতি ছিলেন। 1927 থেকে 1955 সাল অবধি তিনি Tata Iron and Steel কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্‌টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিহারে গঙ্গার উপর একটি সেতু নির্মাণ করার বিষয়ে তিনি সেই প্রদেশের সরকারকে তাঁর অভিজ্ঞ মতামত দান করেন।

90 বৎসরেরও বেশী বয়সে তিনি মহীশুরের গ্রামীণ শিল্পোন্নয়ণের এক প্রকল্প রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বহুবিধ সম্মান লাভ করেছেন। 1911 সালে তাঁকে সি. আই. ই এবং 1915 সালে কে. সি. আই. উপাধি প্রদান করা হয়। ভারত সরকার 1955 সালে তাঁকে 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভারতের প্রথম প্রকল্প রচয়িতাদের মধ্যে বিশ্বেশ্বরাইয়া অন্যতম। তাঁর ভাবধারা তাঁর রচিত গ্রন্থে পরিস্ফুট। 1920 সালে প্রকাশিত 'Reconstructing India' বিলাত প্রবাস কালে লিখিত। 1934 সালে প্রকাশিত হয় 'Planned Economy for India'। এছাড়াও তিনি গ্রামের শিল্প, শিল্পোন্নয়ণ এবং মোটর শিল্প সম্পর্কে বিবিধ রচনা প্রকাশ করেছেন। 'Memoirs of My Working Life' শীর্ষক গ্রন্থটি আত্মজীবনীমূলক। 'Sayings Witty and Wise' গ্রন্থটি তাঁর পুরাতন পত্রাদি থেকে সংকলিত। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে আদর্শ ভারত নির্মাণের জন্য প্রথম প্রয়োজন মানুষকে দৃঢ় ও সচ্চরিত্র করে তোলা। শৃঙ্খলার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম, দক্ষতা এবং বিনয় ইত্যাদি গুণগুলিকেই তিনি কর্মীদের আচরণীয় বিধিরূপে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল, 'অনুসন্ধান কর, শিক্ষা নাও এবং সংগঠিত হও'।

সৎ প্রকৃতির বিশ্বেশ্বরাইয়া যে কোন প্রকার অপবিত্রতা এবং নীচতাকে ঘৃণা করতেন। অযথা অনুগ্রহ প্রদর্শন কিংবা অসদাচরণকে তিনি সযত্নে পরিহার করতেন। নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে এবং সুপরিকল্পিতভাবে তিনি তাঁর জীবনের প্রতিদিন এবং প্রতিঘণ্টা অতিবাহিত করেছেন। তাঁর স্বদেশবাসী যাতে সুষ্ঠুভাবেকাজ করতে পারে এবং জীবিকা নির্বাহ করতে পারে সেজন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন বিনয়ী ও সরল প্রকৃতির এবং আচরণে 'বসুধৈবকুটুম্বকম' নীতি মেনে চলতেন।

1962 সালের 14 এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন।

[M. Visvesvaraya—Memoirs of My Working Life ;—Reconstructing India ;—Planned Economy for India ;—Sayings Witty and Wise ; M. Visvesvaraya by His Contemporaries and Admirers ; Speeches of Sir M. Visvesvaraya, Dewan of Mysore (1910-17), Vol. I, 1917 ; Who's Who in Madras, 1934 ; Proceedings of the Mysore Representative Assembly (1911-18) ; Gilbert Slater—Southern India, Its Political and Economic Problems ; The Times of India. 16 December 1895, 30 January 1908 and 24 March 1913 ; The Daily Post (Bangalore), 24 July 1927 ; The Hindu Files, 1940-47 and 1962 ; The Indian Review Files, 1920-45.]

(ইমানুয়েল ভিভিয়েন) **ডি. ভি. গুণ্ডুরাপ্পা**

এম. বীররাঘবচারিয়ার (১৮৫৭-১৯০৬)

M. Veeraraghavachariar (1857-1906)

1857 সালে এম. বীররাঘবচারিয়ার তামিলনাড়ুর চিঙ্গালপুট জেলার অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র গ্রামে (আত্তুর) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক রক্ষণশীল থেংগালাই ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। এই পরিবারের কিছু সদস্য ছিলেন কৃষিজীবী, আর কিছু ছিলেন সরকারী চাকুরে। তাঁর পিতা জেলা আদালতে কাজ করতেন। 1906-এর 6 অক্টোবর বীর রাঘবচারিয়ার তাঁর বিধবা পত্নী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে মারা যান। সেই সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনিয়র F. A. শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। Government Normal School থেকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার পর তিনি 1877 সালে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর কিছুদিন

তিনি মাদ্রাজের Pachaiyappa's College-এ Tutor ছিলেন। তখনই তিনি দেশপ্রেমে এতটাই উদ্বুদ্ধ ছিলেন যে সাংবাদিকতায় সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে অধ্যাপনা ত্যাগ করেন।

ভাইসরয় Lord Lytton-এর শাসনকালে জনমত তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠলেও সুসংবদ্ধভাবে তা প্রকাশের কোন উপায় ছিল না। এই সময় বীররাঘবচারিয়ার ও জি. সুব্রামানিয়া আয়ার সহ (বীররাঘবচারিয়ার এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন) আরও ছ'জন দেশপ্রেমিক যুবক সে সময়ের প্রায় মৃতকল্প "Native Opinion" এর পরিবর্তে একটি সুপরিচালিত ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশ করবেন মনস্থ করেন। 1878 সালের 20 সেপ্টেম্বর মূলতঃ এই ছ'জন "হিন্দু", সাপ্তাহিকটির প্রকাশ শুরু করলেও শীঘ্রই বীররাঘবচারিয়ার ও জি. সুব্রামানিয়া আয়ার এর যুগ্ম প্রকাশকরূপে বহাল থাকেন এবং বাকীরা অন্যান্য কাজে লিপ্ত হন। বীর-রাঘবচারিয়ার 'হিন্দু'র ব্যবসায়িক দিকটি দেখাশুনা করতে শুরু করেন। তিনি তাঁর সমস্ত উদ্যম ও প্রতিভা 'হিন্দু' ভারতের প্রধান দেশীয় পত্রিকাগুলির অন্যতম করে তুলতে তার শক্তি সামর্থ নিয়োগ করে-ছিলেন। রাজনৈতিক লেখক হিসাবে তিনি শুধু দক্ষিণ ভারতের নয় সমগ্র ভারতের প্রত্যেকটি আন্দো-লনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই কাজে তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা। 1884 সালের 16 অক্টোবর তিনি ভারতের বৃটিশ সরকার দ্বারা প্রবর্তিত নিপীড়নমূলক নীতিগুলির বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষ প্রকাশের মাধ্যমরূপে "মহাজন সভা" নামক একটি জন-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেক বছর এই প্রভাবশালী সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে কর্ম পরিচালনা করেন। তিনি বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত Indian National Congress'র প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন। 1887 ও 1894-এ যখন মাদ্রাজে Indian National Congress'র অধিবেশনের আয়োজন হয় তখন তিনি এর যুগ্ম-সম্পাদক রূপে কাজ করে-ছিলেন। এছাড়া তিনি Chingleput District Association এর সহ-সভাপতি, চিঙ্গলেপুটের দেবস্থানম্ কমিটির ও Triplicane Hindu High School Committee'র সদস্য এবং মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'Fellow' হিসাবে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। তিনি মাদ্রাজের Victoria Students' Hostel Committee'র একজন অত্যন্ত উৎসাহী ও সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁর কাজের গুণমুগ্ধ ছিলেন। Lord Wenlock ও Sir Arthur Havelock উভয়েই তাঁর কাজের উচ্চ প্রশংসা করে-ছেন। মাদ্রাজের বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর উপদেশ ও পরিচালনালাভে ধন্য ছিল। জনসাধারণের স্বার্থো-ন্নয়নজনক যে কোন কাজেই তিনি সন্তোষজনকভাবে সমাধা করতেন।

1898 সালে 'হিন্দু'র অর্থনৈতিক অবস্থা যখন সংকটজনক হয়ে উঠেছিল তখন জি. সুব্রামনিয়া আয়ার ও বীররাঘবচারিয়ারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং বীররাঘবচারিয়ার এই পত্রিকার সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হন। যদিও 'হিন্দু'কে নতুন ধাঁচে পরি-চালনায় তিনি সচেষ্ট ছিলেন তবুও এই সময় তিনিও অনুভব করেছিলেন যে 'হিন্দু'র ভিত সুদৃঢ় করার জন্য এখনই কিছু করা প্রয়োজন। পত্রিকাটিকে তিনি Public Trust করে চালানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে-ছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি এর মালিকানাস্বত্ব Public Limited Company তে পরিবর্তিত করে জনসাধারণের মধ্যে Share বিতরণ করে দেন। 1901-এ 'হিন্দু' এবং 'National Press' এই দুটি চালু প্রতিষ্ঠানকে কিনে নেবার উদ্দেশ্যে 'The Hindu Limited' এক Joint Stock Company হিসাবে সংগঠিত হয়। Agent এবং Manager হিসাবে এর কর্তৃত্ব বীররাঘবচারিয়ারের হাতেই ছিল। কিন্তু উদ্ভাবকরা যা আশা করেছিলেন শেয়ারের চাহিদা তার চেয়ে অনেক কমে যায়। সহানুভূতিহীন সরকার সরকারী চাকুরেদের এই শেয়ার গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেয়। বীররাঘবচারিয়ারকে এই উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে হলেও 1905 সালে অসুস্থ হয়ে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তিনি দুঃসাধ্য হলেও এই পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত রাখেন। 1905 সালি কস্তুরি রঙ্গা আয়েঙ্গার 'হিন্দু' কিনে নেন। তখন থেকেই বীররাঘবচারিয়ারের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং 1906 সালের 6 অক্টোবর মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যান।

সুদর্শন, বিনয়ী ও অমায়িক এই মানুষটির জীবনধারা ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর। তিনি পশ্চিমী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বহু ইউরোপীয়ের

সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি সমাজ সংস্কার-মূলক কাজের একজন প্রবক্তা এবং জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেস দলের সূচনাকাল থেকেই তিনি এর সদস্য ছিলেন এবং তিনি অবিরতভাবে এক সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গঠনের কথা বলেছেন। শাসনকার্যেও তিনি আরো অধিক ভারতীয় প্রতি-নিধিত্বের সপক্ষে ছিলেন। ভারত সম্পর্কিত বৃটিশ পার্লামেন্টকৃত কিছু Act'র ত্রুটি সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং Legislative Council এ আরো অধিক সংখ্যক সাধারণ ভারতীয়দের মনোনয়ন জন্য আবেদনের উদ্দেশ্যে তিনি বহু জনসমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি Lord Lytton'র শাসনের বিরুদ্ধে আঘাত হানলেও রিপনের 'ন্যায়ধর্ম জাতিকে উন্নীত করে' এই মতের সমর্থক ছিলেন। তাঁর পঁচিশ বছরের পরিচালনাধীনে 'হিন্দু'কে তিনবার সমালোচনামূলক লেখার বিশাল অংকের জরিমানা দিতে হয়। ভারতীয়-দের উদাসীনতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে তিনি কখনও দ্বিধান্বিত হন নি এবং সর্বদাই 'হিন্দু'র মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসী ছিলেন। সুতরাং তিনি যখন শাসকদের বলতেন যে শাসনযন্ত্রকে দেশের মানুষের প্রয়োজন ও চরিত্রানু-যায়ী তৈরী করা উচিত তখন তিনি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করতেও ভুলতেন না যে নিজেদের প্রাপ্য ভালটুকু আদায় করার জন্য ভারতীয়দেরও তৎপর হওয়া একান্ত কর্তব্য। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে নতুন আমলাতন্ত্রের আগ্রা-সনের বিরুদ্ধে ধৈর্য ও রাষ্ট্রনৈতিক চেষ্টার মাধ্যমে বাধা প্রদান করাই সঙ্গত পন্থা।

প্রায় তিন দশক ধরে বীররাঘবচারিয়ার পুরাতন অবিভক্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সর্বপ্রকার সুসংগঠিত জনমত প্রকাশের মাধ্যমের সঙ্গেই তিনি জড়িত ছিলেন। 1878-এ 'হিন্দু' আত্মপ্রকাশ করার সময় থেকেই দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা চিহ্নিত হয়। কংগ্রেসের কাজে অথবা বৈঠকের আয়োজনের ব্যবস্থাই হোক বা কংগ্রেস শিবিরে প্রতি-নিধিদের অভ্যর্থনার আয়োজনই হোক কিংবা জন-সমাবেশ বা সম্মেলনের প্রস্তুতিই হোক সব কিছুর দায়িত্ব তাঁর ওপরেই ন্যস্ত হত। এছাড়াও সামাজিক বা শিক্ষাক্ষেত্র বিষয়ক নানা কাজও তাঁকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয় পক্ষের সহযোগিতায় সম্পাদন করতে হত এবং এই সকল প্রকার কাজের সু-সমাধানের মাধ্যমে তাঁর উদ্যম, কৌশল, শক্তি, দক্ষতা ও বাণিজ্যিক ক্ষমতা প্রদর্শমান হত। জনহিতকর কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ মুহূর্ত থেকে আমৃত্যু তিনি সর্বসাধারণের কল্যাণে শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করেছেন। তাঁর কর্তৃত্বাধীনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যাকার হিসাবে দক্ষিণ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তিনি শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কংগ্রেস একজন বিশ্বস্ত নেতা ও সমর্পিত প্রাণ সেবককে হারায়।

[The Hindu and the Madras Mail Files; C. L. Parekh—Eminent Indians, Bombay, 1892; Proceedings of the Indian National Congress, 1885, 1887-94; Proceedings of the Madras Mahajana Sabha (1884); V. K. Narashinhan—Builders of Modern India, Kasturi Ranga Ayyangar (Govt. of India Publication), 1963.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) ডি. বালাসুব্রামনিয়ান

এম. ভক্তবৎসলম্ (১৮৯৭—)

M. Bhaktabatsalam (1897—)

এম. ভক্তবৎসলম্ 1897 সালের 9 অক্টোবর তামিলনাড়ুর চিংলেপুট জেলার নজরাথপেট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কানাগাসাবাপাথি এবং মাতার নাম মল্লিকা। ভক্তবৎসলম্ মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। কাকারা তাঁর লালন পালনের ভার নেন। তাঁর এক কাকা মুথুরঙ্গ মুদালিয়ার ছিলেন একজন বর্ষীয়ান কংগ্রেস কর্মী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী। ভক্তবৎসলমের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও হিন্দু-ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ মুথুরঙ্গই প্রথম জাগ্রত করেন। তিনি মাদ্রাজের খৃষ্টিয়ান মিশন এবং পি. এস. হাইস্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। পি. এস. হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি 1916 সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে বি. এ. পাশ করেন। 1920 সালে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁর কাকিমার উৎসাহে তিনি এই ঘটনার কিছুদিন পর মাদ্রাজ আইন কলেজে

যোগদান করেন এবং তৎকালীন আইনজীবী সংস্থার নেতা আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ারের অধীনে তাঁর শিক্ষানবিশী পর্ব শুরু হয়। 1920 সালে টি. ভি. গোপাল স্বামী মুদালিয়ার নামক একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীর কন্যা জ্ঞানসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রথমে কিছুদিন 'ভকিল' এবং পরে একজন 'এ্যাডভোকেট' হিসেবে ভক্তবৎসলমের কর্ম জীবন শুরু হয়।

কলেজের ছাত্র থাকাকালীনই ভক্তবৎসলম ডঃ বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সময় তিনি রাজাজীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করেন; তিনি রাউলাট বিল বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন, 1921 সালে মূলতঃ মহাত্মা-গান্ধী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এস. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের প্রধান সমর্থকদের মধ্যে ভক্তবৎসলম্ ছিলেন অন্যতম। 1921-22 সালে যখন তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তখন তিনি চিংলেপুট জেলা সমিতির একজন সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি 1923 সালে কাকিনাড়ায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর কর্ম-পন্থায় তিনি খুবই বিশ্বাসী ছিলেন এবং খাদি ও অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের বিকাশে সচেষ্ট হন। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিতে আস্থাশীল হলেও মন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে বৃহত্তর অর্থনীতির প্রতিও তাঁর আস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভক্তবৎসলম্ 1927 সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ভারতবর্ষে ইংরেজদের কুশাসন ও অত্যাচারের তিনি নিন্দা করেন। সে সময় মাদ্রাজ মহাজন সভার সম্পাদক থাকাকালীন তিনি বিশেষভাবে বৃটিশ সরকারের নিন্দায় সোচ্চার হন। 1931 সালে ভক্তবৎসলম্ তামিলনাড়ুর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। 1932 সালে অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতি তাঁর আগ্রহের ভিত্তি ছিল স্বাধীনতা-লাভের জন্য জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁর একান্ত আগ্রহ। 1933 সালে ভক্তবৎসলম্ চিংলেপুট জেলা বোর্ডের সহ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং 1937 সালে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়রের পদগ্রহণ করেন। 1933 সাল অস্পৃশ্যতা নিবারণের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে হরিজন সেবা সঙ্গম-এর সহ সভাপতির মর্যাদা দান করা হয়। তিনি টি. এন. সি. সি-র সম্পাদক হন 1934 সালে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে ভক্তবৎসলম্ এই সময় সমগ্র তামিলনাড়ু পরিভ্রমণ করেন। 1938 থেকে 1946 সাল অবধি তিনি ছিলেন মাদ্রাজ কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টির আইন পরিষদীয় দলের আহ্বায়ক। 1940-41 সালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে নয়মাস কারাবরণ করেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনেও তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কারাগারে প্রেরিত হন। 1944 সালের অক্টোবর মাসে তিনি মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাকার প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সঙ্গমে যোগ দান করেন। এই সংগঠন সাম্যবাদীদের প্রচারের বিরোধিতা করতো।

1937 সালে তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডীর সংসদীয় সম্পাদক হিসেবে ভক্তবৎসলমের সাংসদ জীবনের শুভ সূচনা হয়। পরবর্তীকালে তিনি মাদ্রাজ প্রদেশ মন্ত্রীসভার একজন সদস্য হয়েছিলেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে কাল্লু পাট্টিতে সৃজনশীল কর্মশিবির গঠন করা হয় যা পরে 'গান্ধী নিকেতন' নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিতি লাভ করে। 1946 সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বিজয়ী হলে টি. প্রকাশম ভক্ত-বৎসলম্‌কে তাঁর মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কিন্তু 1952 সালের নির্বাচনে পরাজিত হলে, তিনি তখনকার জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা 'ভারত দেবীর' পরিচালক ও সম্পাদকের পদে আসীন হন। ত্রিশের দশকে 'ইন্ডিয়া' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কাজে লাগে। পরবর্তীকালে 'ভারত দেবী' 'দিনমণি' পত্রিকার সাথে মিলিত হয়ে যায়।

1953 সালে ভক্তবৎসলম্ মাদ্রাজ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলে রাজাজীর মন্ত্রিসভায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কামরাজের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হলে তিনি সেখানেও আসন লাভ করেন। কামরাজ পরিকল্পনার জন্য কামরাজের পদত্যাগের পর ভক্তবৎসলম্ মুখ্যমন্ত্রী হন এবং 1967 সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন।

বস্তুতপক্ষে প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব কটি বিষয়ই ভক্তবৎসলমের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত বিভাগগুলির উন্নতিকল্পে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার যথাসাধ্য প্রয়োগে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সংসদ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন এবং ছিলেন দক্ষ প্রশাসক। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন তিনি কোয়েম্বাটুর কৃষি মহাবিদ্যালয়কে একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান করে তোলেন। মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। যখন তিনি হিন্দুদের ধর্মীয় ভাতা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন সে সময় মন্দিরের কার্যপরিচালনার উন্নতির কৃতিত্ব তিনিই অর্জন করেছিলেন।

[Karuppiah— Life Sketch of M. Bhaktavatsalam (in Tamil), Madras 1964 ; Hindu Files ; Proceedings of the Madras Legislative Council and of the Madras Legislative Assembly (1939-52) ; Directory of the Madras Legislature (1950) ; Madras Corporation Chronicle .]

টি. পি. মীনাক্ষিসুন্দরম্

এম. ভবানীশঙ্কর নিয়োগী (স্যার) (১৮৮৬—)

M. Bhavanishankar Niyogi (Sir) (1886—)

স্যার এম. বি. নিয়োগীর পূর্ব পুরুষেরা বাস করতেন অন্ধ্রপ্রদেশের মসলিপত্তনমে। 1861-এ তাঁর প্রপিতামহ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কার্যভার গ্রহণ করে নাগপুরে আসেন এবং নাগপুরে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করলে এই তেলুগু ব্রাহ্মণ পরিবার মারাঠী ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির অন্তর্গত একটি পরিবারে রূপান্তরিত হয়। তাঁর পিতা সুন্দরম নিয়োগী এবং মাতা কনকাবাঈ। শৈশবে তাঁর পড়াশুনা নাগপুরে সম্পন্ন হয়। 1906 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি এ ডিগ্রী লাভ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1909-এ তিনি আইনশাস্ত্রে স্নাতক হন এবং 1913-এ পুনরায় তিনি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. বি. অর্জন করেন। তিনি তিনবার দার পরিগ্রহ করেন, তাঁর তৃতীয়া জায়া ইন্দিরা বাঈ সানে, বালবিধবা এবং বিদর্ভের এক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের আত্মজা ইন্দিরা বাঈ পেশায় ছিলেন একজন চিকিৎসক। ডঃ বি. এস. মুঞ্জে, এম. ভি. অভয়ংকর এবং ডঃ পি. খানকোজে ছিলেন তাঁর সুহৃদ স্থানীয় সমসাময়িক।

ডঃ নিয়োগী ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি গভীরভাবে বুদ্ধ এবং শঙ্করাচার্যের দর্শনসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রিয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকটি হল : জাতক, ধম্মপদ, ভগবদ্গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং শঙ্কর ভাষ্য।

নিয়োগী 1934 সালে জাপান এবং 1937 সালে ইউরোপ সফর করেন। Locke, Hobbes, Rousseau'র লেখনীও তাঁকে আকৃষ্ট করত। বর্ণভেদ প্রথায় তাঁর আস্থা ছিল না। পুরাকালে এর উপযোগিতা থাকলেও এটি তাঁর মতে বর্তমান সমাজকে কৃত্রিম উপায়ে বিভক্ত করে রাখার সামিল। কারিগরী ও প্রযুক্তিগত পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষণীয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি আঞ্চলিকতাবাদের বিরোধিতা করেছেন ; অপর দিকে তিনি ঘোষণা করেছেন যে সকল ভারতবাসী মিলেই একটি জাতি। তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে দেশে দ্রুত শিল্পকারখানা এবং পৌর এলাকার বিস্তার হোক। কলেজে ছাত্রাবস্থা থেকে 1923 সাল অবধি তিনি ছিলেন কংগ্রেস দলের সদস্য। 1920 সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক এবং এ. আই. সি. সি.র নির্দেশে পরলোকগত আব্বাস তায়েবজীর নেতৃত্বে যে Dharwar Firing Enquiry Committee গঠিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার সদস্য।

1915 থেকে 1928 সাল অবধি তিনি ছিলেন নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য এবং 1925 থেকে 1928 সাল অবধি এই পৌরসভার মেয়র। 1924 সাল থেকে তিনি ছিলেন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য এবং 1932 থেকে 1936 সাল অবধি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। 1946-47 সালে তিনি হন Nagpur Improvement Trust Enquiry Committee-র সভাপতি ; 1948 থেকে 1953 সাল অবধি তিনি ছিলেন মধ্য প্রদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, 1950-51 তে এবং 1954-1956 সাল অবধি তিনি ছিলেন যথাক্রমে Prohibition Enquiry Committee এবং Christian Missionary Enquiry Committee-র সভাপতি। 1930 সালে তিনি নাগপুরের অতিরিক্ত জুডিশিয়াল

কমিশনার নিযুক্ত হন, 1936 সালে তিনি নাগপুর হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। 1946 সালে নাগপুর হাইকোর্ট থেকে তিনি প্রধান বিচারপতিরূপে অবসর গ্রহণ করেন। 1947 সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর অবধি তিনি Eastern States Agency Highcourt-এর প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1936 সালে তাঁকে সি. আই. ই. এবং 1944 সালে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেষোক্ত সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডঃ উপাধিতে ভূষিত করেন।

চৌরিচৌরা বিপর্যয়ের পর 1923 সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ব্যবহারজীবীর পেশাতেও ইস্তফা দেন। তৎসত্ত্বেও জনসাধারণের স্বার্থসংক্রান্ত সৃজনশীল কাজে নিজেকে তিনি নিয়োজিত রেখেছিলেন। এ. বি. কোলহাতকারের বম্বে থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইংরাজি পত্রিকা 'Message'-এর সম্পাদনার কাজও তিনি কিছুকাল করেন। মারাঠী দৈনিক 'সন্দেশ'-এর সম্পাদকের পদও তিনি অলংকৃত করেছিলেন।

[The Times of India Who's Who; Personal interview of the Research Fellow with Sir M. B. Niyogi]

(সরোজ এ দেশপাণ্ডে) টি. ভি. পারভাতে

এম. বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া (১৮৪৪-১৯৩৩)

M. Venkatakrishnayya (1844-1933)

বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, জনগণের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং সুলেখক। মহীশূরের মঙ্গে গ্রামে 1844 সালের 20 আগস্ট এক প্রাচীনপন্থী তেলেগু ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। সামান্য জোত জমির উৎপন্ন ফসলের সঙ্গতি থেকে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হত। 1854-এ তাঁর পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর মাতা তাঁর চার শিশুপুত্রসহ মহীশূরে আগমন করেন এবং ধনাঢ্য গৃহে রন্ধনকারিণীর কাজ করে সংসার প্রতিপালন করেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত Raja Free School-এ বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়ার পঠন-পাঠন শুরু হয়। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর মধ্যে অপরিতোষনীয় জ্ঞানস্পৃহা এবং দেশবাসীর কল্যাণকামনা করার চিন্তা লক্ষিত হয়। এই বয়সেই তিনি Bacon, Tyndall, Huxley, Herbert Spencer এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন এবং 1873-এ তিনি যখন কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন তাঁকে মহীশূরের স্বল্প কয়েকজন শিক্ষিত তরুণদের অন্যতম বলে গণ্য করা হত।

সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করলে তিনি দেওয়ান রঙ্গচারলুর পরামর্শে 1875-এ সওকার মরিমঙ্গলপপা প্রতিষ্ঠিত Anglo-Vernacular School-এ শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। 1878-এ তিনি হন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক; 1918-তে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন। পরবর্তীকালে মহীশূরে যাঁরা দক্ষ প্রশাসকরূপে এবং সেবামূলক কাজের মাধ্যমে খ্যাতির শিখরে আরোহণ করে ছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়ার ছাত্র। তিনি ছিলেন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ কিন্তু তাঁর গভীর ছাত্রবৎসলতা এবং অকুণ্ঠ মহানুভবতার জন্য তিনি ছাত্রদের নিকট থেকে যথোচিত সমাদর লাভ করেছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য পড়াতেন। পড়ানোর অবকাশে তিনি স্বদেশ ও বিদেশের মনীষীদের জীবনী আলোচনা করতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার চেতনা জাগিয়ে তুলতে অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের মনে একথা গেঁথে দিয়েছিলেন যে চরিত্র গঠনই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

তাঁর শিক্ষক জীবনেই তিনি Representative Assembly-র একজন সভ্য মনোনীত হন। শেষাদ্রি আয়ারের দেওয়ান থাকাকালীন পরিষদের যে কয়জন সভ্য সরকারকে সরকারী কার্যসমূহ সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্য একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠনের আহ্বান জানান তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

সে সময় মহীশূরে যাঁরা সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা অনেকেই জন্মসূত্রে সেই প্রদেশের মানুষ ছিলেন না। বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আন্দোলন পরিচালনা

করেন। 1912-এ যখন জন্মসূত্রে কিংবা স্থায়ী বাসিন্দারূপে রূপে যাঁরা মহীশূরের অধিবাসী কিংবা যাঁরা মহীশূর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করেছেন কেবল তাঁরাই সিভিল সার্ভিস-এ যোগ দিতে পারবেন, এরূপ প্রথা প্রচলিত হলে, তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করে।

একজন সাংবাদিকরূপে বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব, ন্যায়পরায়ণতা এবং কল্যাণকর কাজ-কর্মের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 1884-তে কন্নড় পত্রিকা 'হিতবোধিনী'-তে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয়। 1890-এ তাঁর নিজের পত্রিকা 'বিদ্যাদায়িনী' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐ একই সালে কন্নড় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বৃত্তান্ত চিন্তামণি' এবং ইংরাজী সাপ্তাহিক 'The Mysore Herald' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। দু'টি পত্রিকাই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং পত্রিকা দু'টিতে খোলাখুলি সরকারী কাজ ও নীতিসমূহের সমালোচনা প্রকাশিত হত। 1908 সালে ভি. পি. মাধব রাও-এর মুখ্য-মন্ত্রীত্বের আমলে সংবাদপত্রের স্বাধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে Mysore Newspaper Regulation বিধি আরোপিত হয়। এর প্রতিবাদে মহীশূরের অপরাপর সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীসহ বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়াও তাঁর পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করেন।

1909-এ তিনি পুনরায় "Sadhvi" এবং "Mysore Patriot" কন্নড় এবং ইংরাজী সাপ্তাহিক দু'টি প্রকাশ করেন। 1912-এর কানাড়ায় 'সম্পদা-ভ্যুদয়' এবং ইংরাজিতে "Wealth of Mysore" শীর্ষক দুটি দৈনিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন। তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু মন্তব্যকে কেন্দ্র করে 1929 সালে বাঙ্গালোরে হাঙ্গামার সূত্রপাত হলে সরকারের তরফ থেকে তাঁর পত্রিকা প্রকাশের উপর বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। পরে কিছু দিন তিনি 'Nature Cure" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে-ছিলেন ; কিন্তু হিতৈষীগণের পরামর্শে এই পত্রিকাটির প্রকাশনাও পরে বন্ধ করে দেন।

বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া ছিলেন একজন শিক্ষা-সংস্কৃতি-সম্পন্নব্যক্তি। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল এবং কানাড়া ভাষায় তাঁর লেখনী ছিল প্রাঞ্জল ও সাবলীল। তাঁর লিখনভঙ্গী সার্বিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কানাড়া ভাষায় তিনি কয়েকটি মূল্যবান নীতিশাস্ত্র এবং জীবনী-গ্রন্থ প্রণয়ন করে-ছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "Todd's Students Manual", Adventures of Telemachus" এবং "Life of Booker T. Washington"। এছাড়াও তিনি অর্থনৈতিক অগ্রগতি, স্বাস্থ্য, অর্থোপার্জন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

1922 সালে দাবানাগেরেতে অনুষ্ঠিত কানাড়া সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। 1928-এ মহীশূরে অনুষ্ঠিত মহীশূর রাজ্য কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া অভ্যর্থনা সমিতির নেতৃত্ব করেছিলেন।

1896 সালে মহীশূরের "অনাথালয়"-এর দায়িত্ব ভার তিনি গ্রহণ করেন। দরিদ্র ছাত্রদের খাওয়াপরার সংস্থান এখানে করা হত। বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে সংস্থাটিকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক।

রঙ্গচারলুর সহযোগিতায় তিনি 1880-তে মহী-শূরের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। হরিজনদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 1910-এ তিনি পঞ্চমা এডুকেশন লীগ-এর প্রবর্তন করেন। 1919-এ মহীশূরের সারদা বিলাস বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করেন। বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া "Mysore Literary Union-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সামাজিক সংস্কার আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। Mysore City Municipal Council-এর একজন সভ্যরূপে অর্ধ শতাব্দী কাল তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "Mysore Improvement Trust" এবং "The Economic Conference"-এর সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। তিনি ছিলেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের একজন সভ্য।

1933-এর 8 নভেম্বর তাঁর জীবনাবসানের প্রাক্-কাল অবধি তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর সাংসারিক জীবন একাধিক শোকাবহ ঘটনায় সুখের হয়নি। কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি তাঁর দুঃখকে বহন করেছিলেন। সাত্ত্বিক জীবন-যাপনে, হৃদয়বত্তায়, সরলতায়, মৃদু নম্রতায়, মহান আত্ম-সংযমে, গভীর দেশাত্মবোধে, অফুরন্ত প্রীতি এবং সহানুভূতিতে এবং উচ্চ আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় তিনি তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়।

বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া অকপট জীবনযাপন করেছেন, তাঁর কাছে কোন বিষয়ই ব্যক্তিগত ছিল না। প্রত্যূষ থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সর্বক্ষণ জনসাধারণের জন্য তাঁর দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এঁরা আসতেন তাঁর কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে, কিছু সাহায্য পেতে কিংবা কোন বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে। মহীশূরের এমন কোন আন্দোলন কিংবা সংস্থা ছিল না যেগুলি তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হত না, এবং তাঁর নিকট কোন অনুরোধই বৃথায় পর্যবসিত হত না। দুঃখ তিনি পেয়েছিলেন এমন সকলের নিকট থেকে যাঁরা ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সুহৃদ। কিন্তু তিনি তাঁর মনোবেদনা নীরবে একাই বহন করেছিলেন। তাঁর সেই ব্যথা অপরের নিকট ছিল অজ্ঞাত। ক্ষুধার্ত অতিথিদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল তাঁর গৃহে এবং এজন্য এই আগন্তুকদের কোন কারণ দর্শানোর প্রয়োজনই ছিল না। তিনি ছিলেন সত্যকারের একজন 'দানসাগর' এবং মহাকাব্যে বর্ণিত ভীষ্মাচার্যের ন্যায় আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাবান এবং জীবন যাপনে ও আচরণে প্রকৃত সাত্ত্বিক। তাঁর সমসাময়িককালে আপামর সাধারণের নিকট তিনি ছিলেন আশীর্বাদস্বরূপ।

এই সকল গুণাবলী ও তৎসহ সত্তর বৎসরের একাদিক্রম অক্লান্ত জনসেবার জন্য তিনি তাঁর জীবৎকালে উঁচু নীচু সকলের শ্রদ্ধা এবং সম্মান অর্জন করেছিলেন এবং "The Grand Old Man of Mysore" নামে অভিহিত হয়েছিলেন। 1969 সালে মহীশূরের কৃতজ্ঞ জনসাধারণ মহীশূরে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করে তাঁর স্মৃতিকে স্থায়ীরূপ দান করেন।

এম. বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়া সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার নথি-পত্র, এগুলি হল : দি হিতবোধিনী, দি বিদ্যাদায়িনী, দি বৃত্তান্ত চিন্তামণি, দি মাইশোর হেরাল্ড, দি সাধ্বী, দি মাইশোর প্যাট্রিয়ট, দি সম্পদাভ্যুদয়, দি ওয়েলথ অফ মাইশোর, দি নেচার কিওর, বেঙ্কটকৃষ্ণাইয়ার লিখিত অসংখ্য রচনা।

[The Files of the journals edited by M. Venkatakrishnayya : The Hitabodhini, The Vidyadayini, The Vrittanta Chintamani, The Mysore Herald. The Sadhui, The Mysore Patriot, The Sampadabhyudaya, The Wealth of Mysore, and The Nature Cure ; The numerous other writings of M. Venkatakrishnayya ; G. S. Halappa—History of the Freeeom Movement in Mysore ; Personal Knowledge of the Contributor.]

ডি. ভি. গুন্ডাপ্পা

এম. ভেঙ্কটরাম আইয়ার (১৮৬৫-১৯০৯)

M. Venkatarama Iyer (1865-1909)

1865 সালে ভি. মুথুস্বামী আইয়ারের একমাত্র পুত্র এম. ভেঙ্কটরাম আইয়ারের জন্ম হয়। আয়ার পরিবার ছিলেন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ। তাঁরা তামিলনাড়ুর রামনাথপুর জেলার কিলাভানুরের বাসিন্দা ছিলেন।

তিনি মাদুরাই-এর Government High School-এ শিক্ষালাভ করেন এবং চৌদ্দ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি কুম্ভকোণমের Provincial College-এ কলাবিদ্যা বিভাগে পড়েন এবং 1881 সালে First Arts পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি B. A. পড়ার জন্য মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তখন Dr. Duncan এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভেঙ্কটরাম ইংরেজী এবং দর্শনের একজন উৎসাহী ছাত্র ছিলেন।

খুব অল্প বয়সেই তিনি (ডঃ) স্যার এস. সুব্রামনিয়া আইয়ার এবং 'South India Mail-এর (Madurai Mail নামেও পরিচিত) প্রতিষ্ঠাতা এস. এম. সুন্দরম আইয়ারের প্রভাবাধীনে আসেন।

1888 সালে তিনি তখনকার সুদক্ষ আইনজীবী (ডঃ) স্যার এস. সুব্রামনিয়া আইয়ারের অধীনে ওকালতি শুরু করেন। স্বভাবতঃ তিনি সমাজ-সংস্কারমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ জনহিতকর কাজে উৎসাহী ছিলেন। তিনি মাদুরাই'র একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাদুরাই কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন। Hindu Permanent Fund, Edward Library এবং এই জেলার অন্যান্য বহু জনহিতকর ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনমত তাঁর সাহায্য লাভ করত। তিনি

Madurai Municipal Council এবং District Board এর সদস্য ছিলেন। অনেক বছর তিনি Madurai Taluka Board এর সহ-সভাপতি ও Legislative Council-এর সদস্য ছিলেন। . তিনি কিছুদিনের জন্য মাদুরাই-এর সরকারী উকীলও হয়েছিলেন।

1901 সালে অনুষ্ঠিত Madurai Provincial Conference'র তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠক এবং প্রাণপুরুষ। Provincial Legistative Council এর সম্প্রসারণের ফলে তিনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশ সেবার সুযোগ পান। বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকদের সমর্থনক্রমে তিনি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং মাদুরাই-তে একটি বেদ পাঠশালা প্রতিষ্ঠার জন্য 15000 টাকা দান করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মধ্য-পন্থী এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য তিনি সাংবিধানিক পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে গণ্য করতেন।

তিনি রাজনৈতিক দাবী জানানোর জন্য শান্তিপূর্ণ পন্থাবলম্বনে এবং জাতীয় সরকার গঠনের পূর্বে স্থানীয় শাসনকার্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রশিক্ষিত করে নেওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন।

[Enycyclopaedia of the Madras Presidency and adjacent States (1921).]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) এন. সুব্রামনিয়ান

এম. সি. রাজা (রাও বাহাদুর) (১৮৮৩-১৯৪৩)
M. C. Rajah (Rao Bahadur) (1883-1943)

আদি দ্রাবিড় সম্পদায়ের বিশিষ্ট নেতা এম. সি. রাজার জন্ম 1883 সালে মাদ্রাজের সেন্ট্ টমাস মাউন্টে। তাঁর বাবা চিন্না থাম্বি পিল্লাই ছিলেন মাদ্রাজের 'লরেন্স অ্যাসাইলাম প্রেসে'র ম্যানেজার। মাদ্রাজের ওয়েসলি কলেজ এবং ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশুনো শেষ করে 1906 সালে তিনি সাইদাপেতে অবস্থিত 'টিচার্স কলেজে' যোগ দিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহী উদ্যমী পুরুষ এম. সি. রাজা নিজেকে নিয়োজিত করলেন, সমাজের নিপীড়িত মানুষ যাতে সমাজে মর্যাদার সঙ্গে বাস করতে পারে সেই কাজে। শিক্ষা এবং রাজনীতি এই দুই বিষয়েই তাঁর সমান উৎসাহ ছিল। অনতিবিলম্বে রাজা তাঁর কর্মজীবনে সাফল্য-লাভ করেন। 1917-এ তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি এবং 1924 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্যপদে মনোনীত হলেন। ঐ সময়েই চিংলেপুট জেলার 'প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি', 'মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠন সমিতি' এবং মাদ্রাজের 'শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি'র সদস্য হিসেবেও তাঁকে নিয়োগ করা হ'লো। মাদ্রাজ পরিষদে তিনিই আদি দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের প্রথম প্রতিনিধি। জাস্টিস পার্টির সক্রিয় সদস্য হিসেবে শীঘ্রই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই সময় তিনি সাউথ ইন্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশন কনস্টি-টিউশানাল পার্টি''র সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। মাদ্রাজ পাবলিসিটি বোর্ড, মাদ্রাজ সৈন্য দপ্তর, মাদ্রাজ শ্রম উপদেষ্টা পর্ষদ, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সমিতি (Communal Representation Committee) সারা ভারত পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, রেলওয়ের অর্থ দপ্তর, উদ্বাস্তু উপদেষ্টা সমিতি, সাইমন কমিশনের উপদেষ্টা সমিতি, ভারতীয় কেন্দ্রীয় সমিতি—ইত্যাদি সংস্থার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এছাড়া তিনি 'হিন্দু মহাসভা'র সভাপতি এবং 'মাদ্রাজ টেম্পল্ এন্ট্রি সংগম'-এর সভাপতি নির্বাচিত হলেন। 1922 সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র উনচল্লিশ বছর, তখন তাঁকে 'রাও বাহাদুর' খেতাব দেওয়া হয়। 1928 সালে রাজা, শ্রীলঙ্কা এবং 1929 সালে ইংলন্ড ভ্রমণ করে-ছিলেন।

1915 সালে তিনি 'আদি দ্রাবিড় মহাজন সভা'র সভাপতিরূপে সভাকে ঢেলে সাজালেন। পরের বছর তিনি 'সারা ভারত নিপীড়িত সম্প্রদায় সংস্থা' (All India Depressed Classes Association) এর সভাপতি নির্বাচিত হলেন। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের একজন যোগ্য নেতা ছিলেন এম. সি. রাজা। বহু সভায় তিনি সংস্থার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রাদেশিক আইন-সভায় স্থানীয় সংস্থাগুলিতে এবং জনহিতকর কাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলির যথাযথ প্রতিনিধি-ত্বের দাবীতে অনেক বিক্ষোভসমাবেশ এবং জমায়েতে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে 'অস্পৃশ্যতা' ততদিন পর্যন্ত দূর করা যাবে না, যতদিন সমাজের সমস্ত অংশে শিক্ষা

সমানভাবে না পে'ীছাবে, কারণ, অস্পৃশ্যতার ভিত্তি জাতিভেদ প্রথার মধ্যে। তাই তিনি অনুভব করেছিলেন যে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম সরকারের চালু করা উচিত এবং ঐসব সম্প্রদায়ের লোককে সরকারী চাকরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তাই তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন—'বাস্তবে তথাকথিত অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সামাজিক অনুন্নতি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং একে অবহেলা করার অর্থ হল সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে মেনে নেওয়া।' সামাজিক অসাম্যের বিপক্ষে তাঁর এই ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করার উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখালেন বৃটেনকে—যেখানে নীচু সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালীন দুর্দশা থেকে বন্ধন মুক্তি ঘটেছে।

রাজা ভয় পেতেন যে যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকা অবস্থায় ভারতবর্ষ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, তবে হয়ত অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলিকে আবার আগের জায়গাতেই ফিরে যেতে হবে। তিনি মন্তব্য করলেন—'অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের কাছে স্বরাজের অর্থ সম্প্রদায়ের সামগ্রিক অগ্রগতি নয়, এবং তাই যেখানে সমাজের বেশীর ভাগ দুর্বল মানুষের আস্থা নেই—তা নিয়ে আইন করার কোন অর্থ হয় না। ভারতের স্বাধীন সরকার কি ভারতের সামাজিক ত্রুটিগুলির সংস্কারসাধনে সক্ষম? আগে চাই সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা। তার আগে কে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা ভাববে?' —তা সত্ত্বেও সাংবিধানিক উপায়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পক্ষেই তিনি ছিলেন। তিনি নির্বাচিত সরকার গঠনের কথা বলতেন এবং ভারত ও ইংলন্ডের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে ছিলেন। যদিও এটা তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি যে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান, স্বাধীনতা লাভ করে বা পরাধীন থেকে, কখন হবে।

একজন শিক্ষক হিসেবে তাঁর উৎসাহ ছিল শিক্ষাবিস্তারে, স্কাউট আন্দোলনে এবং স্কুলের জন্য পাঠ্যবই রচনায়। 'The Oppressed Hindus' এবং 'King George' তাঁর লেখা বই-র মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সংস্থায় সদস্য থাকাকালীন তিনি গরীব মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে এম. সি. রাজা উচ্চপদে উঠে এসেছিলেন। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের দাবীগুলিকে সাধারণ এবং সরকার সমক্ষে তুলে ধরার কাজে যে সাফল্য তিনি লাভ করেছিলেন—তা অবিস্মরণীয়। যদিও তাঁর দেশপ্রীতিতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিল না, তাও এটা স্বীকার করতে হবে যে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর একান্ত ভাবনাচিন্তা, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে অন্যান্য আরও কয়েকটি কারণে, খানিকটা বিপথে চালিত হয়েছিল। আসলে তাঁর এই আত্মবিশ্বাসের বোধহয় কিছুটা ঘাটতি ছিল যে, স্বাধীন ভারতে নিপীড়িত মানুষেরা লড়াইয়ের মাধ্যমে নিজেদের যথাযোগ্য জায়গা করে নিতে পারবে না। মহৎ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী এম. সি. রাজার ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুব সাধাসিধে। 1943 সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

[Bombay Government Memorandam, Indian Statutory Commission, 1928; Franchise Committee Report, 1921; Indian Central Committee Report 1929; The Hindu Files; The Indian Social Reformer Files; Joint Conference, Bengal, 1929; Evidence of the Depressed Classes Deputation; N. N. Mitra—Indian Annual Register; Proceedings of the Indian Legislative Assembly, 1927; Sitaramayya P.—History of the Indian National Congress; Sivashunmugham Pillai, J.—The Life, Select Writings and Speeches of Rao Bahadur M. C. Rajah, Madras, 1930; Who's Who in Madras, 1934.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) কে. রাজাইয়ান

এ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩)
Annie Besant (1847-1933)

এ্যানি বেসান্তের জন্ম লন্ডন শহরে 1847 সালের 1 অক্টোবর। তাঁর পিতা উইলিয়াম পেজ উড্ ছিলেন অর্ধেক আইরিশ, অর্ধেক ইংরেজ এবং অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন লন্ডন শহরের মেয়র এবং অন্য একজন লর্ড চ্যান্সেলার। এ্যানির মাতা এমিলি মরিস অবশ্য

ছাঁটি আইরিশ মহিলা। আত্মজীবনীতে এ্যানি বেসান্ত লিখেছেন,—'আয়ারল্যাণ্ডের ভাষা আমার কানে সঙ্গীত মূর্ছনার সৃষ্টি করে আর আয়ারল্যাণ্ডের প্রকৃতি আমার ভাল লাগে।' তাঁর পিতা পেশায় ডাক্তার ছিলেন। যখন তিনি 1852 সালের 5 অক্টোবর মারা যান তখনও এ্যানির শৈশব অতিক্রান্ত হয় নি। উড্ দম্পতির দুটিমাত্র সন্তান, ছেলে হেনরী আর মেয়ে এ্যানি। হেনরী পরবর্তীকালে হন স্যার হেনরী উড্। ঊনিশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত স্যার হেনরী উড্ লণ্ডন শহরে একটি পরিচিত নাম ছিল।

উড্ পরিবারের জীবনযাত্রা ছিল সচ্ছল, উচ্চ মধ্যবিত্ত ধরণ-ধারণের। স্বাভাবিক ভাবেই মিঃ উডের মৃত্যুর ফলে পরিবারটি বড় রকমের অর্থনৈতিক অসুবিধার মধ্যে পড়ে। এ্যানির মার পক্ষে নিজের সীমিত আয়ের মধ্যে ছেলে মেয়েদের মনোমত শিক্ষা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক চিন্তা ভাবনার পর তিনি পুত্রকে হ্যারো পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া শেখানো স্থির করেন। তিনি হ্যারোতে গিয়ে বাড়ি ভাড়া নেন এবং সেখানেই পরিবারটির পরবর্তী বার বছর কাটে।

এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে—যা এ্যানির জীবনে নতুন দিকের সন্ধান দেয়। বিখ্যাত লেখক ক্যাপ্টেন মারিয়াটের বোন মিস্ মারিয়াটের সঙ্গে বন্ধুর বাড়িতে এ্যানির পরিচয় হয়। ছোট্ট এ্যানিকে ভারি ভাল লেগে যায় ভদ্রমহিলার এবং তিনি মিসেস উডের কাছে এ্যানিকে তাঁর নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শেখানোর প্রস্তাব দেন। মিস্ মারিয়াটের কাছে আরো যে সব শিশুরা থাকত—তাদের সন্ধ্যার পর তিনি নিজে ইংরাজি, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি পড়াতেন। সঙ্গীত শিক্ষার জন্য অবশ্য অন্য একজন শিক্ষক ছিলেন। এ্যানিও মিস্ মারিয়াটকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর প্রতি এ্যানির গভীর কৃতজ্ঞতা ছিল। এ্যানি অনর্গল ফরাসী বলতে শিখলেন। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মিস্ মারিয়াট চাইতেন যে তাঁর তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজসেবায় আগ্রহী হোক। 1861 সালে মিস্ মারিয়াট এ্যানিকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিসেস উডের অনুমতি চান। প্রথমে তাঁরা যান জার্মানী, পরে ফরাসী ভাষা শিক্ষায় আরো সম্পূর্ণতা আনার জন্য প্রায় সাত মাস প্যারিসে কাটান। প্যারিস থেকে তাঁরা ইংলণ্ডে ফিরে আসেন এবং 1863 সালে মিস মারিয়াটের কাছে এ্যানির শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এ্যানি হ্যারোতে নিজ গৃহে ফিরে আসেন। সে সময় এ্যানি অত্যন্ত মার্জিতরুচি, সংস্কৃতিমনা ষোল বছরের এক কিশোরী।

1866 সালে কেম্ব্রিজের তরুণ স্নাতক রেভারেণ্ড ফ্র্যাঙ্ক বেসান্তের সঙ্গে এ্যানির পরিচয় হয়। ফ্র্যাঙ্ক বেসান্ত লণ্ডনের এক অনুন্নত শহরতলী ক্ল্যাপহাম-এ এক ছোট মিশন চার্চে ধর্মযাজকের কাজ করতেন। এ্যানি ফ্র্যাঙ্ককে বিবাহ করলেন, যদিও ফ্র্যাঙ্কের জন্য তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল না। 1867 সালে এ্যানির বিয়ে হয়। এ্যানি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে এই বিবাহ ছিল তাঁর জীবনের এক বড় রকমের ভুল। তাঁর দুটি সন্তান—পুত্র ডিগবী আর কন্যা ম্যাবেল। তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। কারণ তাঁর স্বামী তাঁকে একেবারেই বুঝতে পারতেন না এবং তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিঃশর্ত আনুগত্য দাবী করতেন। এ্যানির পক্ষে এ দাবী মানা সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত 1873 সালে তাঁরা পৃথক হয়ে যান। এ্যানির মা এই বিচ্ছেদে মর্মান্তিক আঘাত পান। এ্যানির হাতে কোন অর্থ ছিল না। যাই হোক ফোকস্টোনে তিনি একটি কাজ পেলেন—একই সঙ্গে প্রধান পাচিকা, গৃহশিক্ষিকা ও সেবিকার চাকুরি। 1874 সালে মিসেস উড্ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষ কদিন এ্যানি বেসান্তের ঐকান্তিক সেবা ও পরিচর্যাতে কাটিয়ে তিনি মারা যান।

ইংলণ্ডের 'ন্যাশনাল সেক্যুলার সোসাইটি'র সরকারী মুখপত্র 'ন্যাশনাল রিফর্মার'-এর একটি সংখ্যা 1874 সালের জুলাই মাসে এ্যানি বেসান্তের হাতে আসে। এই সংস্থা নিজেদের ঈশ্বর অবিশ্বাসী বলতেই পছন্দ করত এবং এর প্রাণপুরুষ ছিলেন স্বনামখ্যাত চার্লস ব্রাডল। শ্রীমতী বেসান্ত 1874 সালের আগষ্ট মাসে এই সোসাইটির সদস্যা হলেন। পরে তিনি 'ন্যাশনাল রিফর্মার' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদিকা হন এবং বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রকাশে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। ব্রাডল'র অনুগামীদের মধ্যে এ্যানি বেসান্তের স্থান নির্দিষ্ট হলো প্রথম সারিতে।

ধীরে ধীরে তিনি বিভিন্ন দিকে সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করেন। লণ্ডনের প্রথম ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়ে তোলায় তাঁর নেপথ্য ভূমিকা ছিল। দেশলাই-এর কারখানায় কর্মরতা মেয়েদের কাজের শর্ত ইত্যাদির উন্নতি সাধনের জন্য এ্যানি বেসান্তের নাম বিখ্যাত সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মহৎ উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তিনি ফ্যাবিয়ান সোসাইটি'র সভ্যা হন এবং সিড্নী ওয়েবস্, জর্জ বার্নার্ড শ, জর্জ ল্যান্সবেরী, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের মত স্বনামধন্য নেতাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। বলা যায়, 1889 সালে সমাজে এমন কোন নতুন সংস্কার প্রবর্তিত হয়নি যার পিছনে এ্যানি বেসান্তের প্রভাব কার্যকরী ছিল না।

1866 সালে বিখ্যাত অধ্যাত্মবাদী এ.পি. সিনেটের লেখা দুটি বই তিনি পড়েন এবং 1889 সালে তাঁকে মাদাম্ এইচ্. পি. ব্লাভাৎস্কি-র লেখা 'দি সিক্রেট ডকট্রিন' বইটির সমালোচনা করতে দেওয়া হয়। এই বইটি তাঁর কাছে আনে এক নতুন উপলব্ধি। 1889 সালের মে মাসে তিনি 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি'তে যোগ দেন এবং মাদাম ব্লাভাৎস্কির একনিষ্ঠ ছাত্রী ও সহযোগিনী হন। তিনি ঐ সংস্থার একজন উল্লেখযোগ্য কর্মী হয়ে ওঠেন এবং কর্ণেল অলকটের মৃত্যুর পর 1907 সালে তিনি সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। 1933 সালের 21 সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন।

1893 সালের 16 নভেম্বর তিনি প্রথম ভারতে আসেন। তিনি তুতিকোরিনে পদার্পণ করে দক্ষিণ ভারতে 12 টি শহরে বক্তৃতা দেন। এর পরে মাদ্রাজের আদিয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। 1894 সালে তিনি উত্তর ভারত সফর করেন ও 18 টি স্থানে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি। 1895 সালে তিনি বেনারসে স্থিত হন এবং 'ভগবৎগীতা' অনুবাদের বিরাট কাজ শেষ করেন। 1898 সালে তিনি বেনারসে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ সমকালীন বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের অনুপ্রেরণা জাগায়।

1907 সালে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবার সময় থেকে তিনি মাদ্রাজের আদিয়ারেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। 1913 সালের অক্টোবরে মাদ্রাজের এক বিশাল জনসভায় ভাষণে বেসান্ত বলেন হাউস অফ কমনস্-এ ভারতীয় বিষয়ের ঘটনাবলী অনুধাবনের জন্য একটি স্টান্ডিং কমিটি থাকা উচিত। এই কমিটির কাজ হবে ভারতবর্ষ কিভাবে, স্বাধীনতা পেতে পারে তার পথ খুঁজে বার করা। 1914 সালের জানুয়ারী মাসে রাজনৈতিক মতবাদ গঠন ও প্রচারের জন্য তিনি 'Commonweal' নামে এক সাপ্তাহিকী পত্রিকা বার করেন। 1914 সালের জুন মাসে তিনি 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকাটি কিনে এর নতুন নামকরণ করেন 'নিউ ইণ্ডিয়া'। এই পত্রিকাটিই ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সপক্ষে তাঁর মতবাদ প্রচারের প্রধান মাধ্যম। তাঁর পরিকল্পিত স্বাধীনতাকে তিনি ভারতের জন্য 'হোম রুল' নামে অভিহিত করেছেন। 1914 সালে তিনি প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীন হওয়া নিতান্তই জরুরী, কিন্তু সে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থেকে। 1915 সালে বোম্বাইতে এক জনসভায় তিনি 'হোম রুল লীগ' বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করেন। জনগণ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকাটিও পড়ত, বিশেষতঃ ডঃ বেসান্তের সম্পাদকীয়ের আকর্ষণে এবং আন্দোলনের অগ্রগতির বিষয়ে তথ্য জানবার জন্য। হোম রুল লীগের কাজ শুরু হয় 1916 সালের 1 সেপ্টেম্বর। বেসান্ত প্রথমবার বাল গঙ্গাধর তিলককে হোমরুলের সপক্ষে তাদের দুটি স্বতন্ত্র আন্দোলনকে এক স্থানে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে ব্যর্থ হন। 1916 সালে দক্ষিণ ভারতে কুড্ডালোরে একটি সমাবেশে-এ বক্তব্য রাখার পর মাদ্রাজের তৎকালীন গভর্ণর লর্ড পেনট্ল্যাণ্ড তাঁকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেন। বেসান্ত সে আদেশ অমান্য করেন। 1917 সালের জুন মাসে উটকামণ্ডে তিনি তাঁর দুই প্রধান সহকর্মী জি. এস. আরুণ্ডেল ও বি. পি. ওয়াদিয়া সহ অন্তরীণ হন। দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে সরকার এ আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। 1917 সালের আগস্ট মাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতার অধিবেশনে তিনি সভানেত্রী নির্বাচিত হন।

তাঁর প্রচারের ফলশ্রুতি রূপে এবং ভারতের জনমতের চাপে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড সংস্কার প্রবর্তিত হয়। 1918 সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস অধিবেশনে ডঃ বেসান্ত স্বীকার করেন যে, মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ডের সংস্কার তাঁর আশা পূর্ণ করেনি। যাই হোক, তিনি প্রস্তাব দেন যে এই সংস্কারগুলিকে প্রদেশে কার্যকরী হবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ধীরে ধীরে তাঁর অহিংস-অসহযোগিতার নীতি গড়ে তুলেছিলেন। 1920 সালে গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ

অভিযান শুরু করেন। 1920 সালের লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে এ্যানি বেসান্ত অন্য পাঁচজন সহ গান্ধীজীর বিপুল জনসমর্থনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। সমগ্র জীবন-ব্যাপী সাংবিধানিক ও আইনানুগ সংগ্রাম চালিয়ে এক বিপুল উত্তাল জনতার দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলনের সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই বেসান্তের জনপ্রিয়তা খুব শীঘ্রই হ্রাস পেতে থাকে। যাইহোক, ভারত-বর্ষের জন্য তাঁর সৃষ্টিধর্মী কাজ থেমে যায় নি। 1922 থেকে 1924 সালের মধ্যে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, স্যার সি. পি. রামস্বামী আইয়ার, স্যার পিঃ এস. শিবস্বামী আইয়ার, রাইট অনারেবল ভি. এস. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, স্যার হরি সিং গৌর ও অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি কমনওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া বিলের খসড়া তৈরি করেন। এই খসড়া 1925 সালের ডিসেম্বর মিঃ জর্জ ল্যানসবেরী পার্লামেন্টে পেশও করেন। কিন্তু একবার পড়ার পরে এর কাজ আর এগোয়নি।

1917 সালে শ্রীমতী বেসান্ত 'ইণ্ডিয়ান স্কাউট এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। 1921 সালে স্যার রবার্ট ব্যাডেন-পাওয়েল-এর অনুরোধে এই সংস্থা বিশ্বব্যাপী স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ডঃ বেসান্ত ভারতবর্ষের সাম্মানিক কমিশনার নিযুক্ত হন এবং 1932 সালে তিনি স্কাউট আন্দোলনের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'অর্ডার অফ দি সিলভার উলফ্' লাভ করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর কাজের অগ্রগতি ছিল। 1915 সালে তিনি দক্ষিণ ভারতের মদাপাল্লিতে ন্যাশনাল কলেজ স্থাপন করেন। 1917 সালে তিনি 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অফ ন্যাশনাল এডুকেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। 1918 সালে দক্ষিণ ভারতের আদিয়ারে তাঁর চেষ্টায় ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপাচার্য স্যার এস. সুব্রামনিয়া আইয়ার এবং অধ্যক্ষ ডঃ জি. এস. আরুণ্ডেল। তিনি ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। 1925 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম তিনটি কমলা বক্তৃতামালার তিনিই ছিলেন নির্বাচিত বক্তা।

1917 সালে তিনি 'উইমেনস্ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' চালু করেন। এই কাজে তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন ডঃ (শ্রীমতী) মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী' (ভারতের প্রথম মহিলা আইনবিদ) এবং মিসেস্ মার্গারেট কাজিনস্। 1924 সালে পুনায় প্রথম সারাভারত মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি একটি শক্তিশালী স্থায়ী সংস্থাতে পরিণতি লাভ করে।

ভারতবর্ষে তাঁর চল্লিশ বছরের সেবাজীবনে এমন কোন গঠনমূলক কাজ সংঘটিত হয়নি যার পিছনে তাঁর পরিকল্পনা বা প্রেরণা ছিল না।

1930 সাল থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে থাকে, অবশেষে 1933 সালের 21 সেপ্টেম্বর গভীর শান্তিতে তাঁর জীবন অবসান হয়। নিজের সমাধি ফলকের উপর কয়েকটি মাত্র কথা লেখা হোক তিনি চেয়েছিলেন—'তিনি সত্যকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন।' তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি এই সংকল্প পালনের চেষ্টা করে গেছেন।

[Annie Besant—Autobiography (18-93) ; My Path to Atheism (1877) ; Education as a National Duty (Benares, 1903) ; Principles of Education (Madras, 1918) ; Hindu Ideals (Benares & London, 1904) ; Universal Text Book of Religion and Morals (Adyar, 1911-15) 3 Vols ; World Problems of To-day (London, 1925) ; India : Bond or Free ? (London & New York, 1926) ; Radicalism and Socialism (London, 1887) ; Social Problems (Adyar, 1912) ; Lecctures on Political Science (Adyar, 19-19) ; How India Wrought Her Freedom : the story of the National Congress told from official records (1915) ; India : a Nation ; The Ideals of Theosophy (Adyar, 1912) ; The Religious Problems in India (Madras, 1909) ; Man's Life in Three Worlds (Adyar, 1919) ; The Future of Indian Politics (Madras, 1922) ; K. S. Venkataramani—Dr. A. Besant : A Tribute, 1933 ; C. Jinarajadana—A Short Biography of A. Besant, 1932 ; B. C. Pal—Annie Besant, A Psychological Study ; Sri Prakasa—A. Besant : as

Woman and as Leader (1941); W. T. Stead—A. Besant: A Catholic Sketch: 1891 (1946); Sir C. P. Ramaswamy Aiyar—Dr. Besant as a Comrade and a Leader (Adyar pamphlet No. 186, 1934); The Besant Spirit, Vol. 1—Compiled from the works of Dr. A. Besant (Adyar, 1938).]

রুক্মিণী দেবী

এ্যানি মাসক্রিন (১৯০২-১৯৬৩)

Anni Mascrene (1902-1963)

কেরালার একজন প্রখ্যাত সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মী এ্যানি মাসক্রিন 1902 সালের 26 মে ত্রিবান্দ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গরীব ল্যাটিন খ্রীষ্টান পরিবারের কন্যা। তাঁদের পরিবারটি এর্নাকুলাম জেলার মালায়াত্তুর থেকে এসে ত্রিবান্দ্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। তাঁর পিতা গ্যাব্রিয়েল মাসক্রিন ছিলেন একজন নিম্ন আয়ের সরকারী কর্মচারী, কিন্তু তাঁর কন্যার সুশিক্ষার প্রতি তাঁর যত্ন ছিল। বি. এ. এবং এম. এ. ডিগ্রী লাভের পর এ্যানি তিন বছর সিংহলের এক উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ত্রিবান্দ্রমে ফিরে এসে তিনি আইন কলেজে যোগ দেন এবং 1933 সালে বি. এল. ডিগ্রী লাভ করেন। শীঘ্রই তিনি আইনব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু তিন বছর পরে আইনজীবীর পেশা ত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক এবং সমাজসেবামূলক কাজকর্মে নিয়োজিত করেন। জীবনে চিরকুমারী থাকার ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

সে সময় নানা দিক দিয়ে অনুন্নত, দুর্দশাগ্রস্ত ল্যাটিন খ্রীষ্টান গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এ্যানি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তী কালে তিনি সরকারী চাকুরী এবং রাজ্য বিধানসভায় পর্যাপ্ত আসনের দাবী নিয়ে খ্রীষ্টান, এজাহ্ভা ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 'নিবর্তনম্ আন্দোলনে' যোগদান করেন।

1938 সালে ত্রিবাংকুর রাজ্য কংগ্রেস গঠিত হয়। এর নির্দেশ মেনে রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু হলে তিনি তাতে সর্বতোভাবে যোগ দেন। আন্দোলন চলাকালীন তিনি কঠোরভাবে নির্যাতিত হন, গ্রেপ্তার হন এবং বহুবার কারাবরণ করেন। রাজ্য কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলন চলার সময়েই তাঁর গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবে আসার সুযোগ ঘটে।

স্বাধীনতা লাভের পর এ্যানি মাসক্রিন গণপরিষদের (কনষ্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর) সদস্য হন। পরে তিনি রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই নবগঠিত ত্রিবাংকুর-কোচিন রাজ্যে মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে জনস্বাস্থ্য এবং শক্তি দপ্তরের দায়িত্ব পালন করলেও কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে পরে তিনি কংগ্রেস পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন।

1951-এ তিনি নির্দল প্রার্থীরূপে লোকসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। 1953 সালে তিনি কোপেনহেগেনে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক উইমেনস্ কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করেন। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে তিনি অবশ্য পরাজিত হন। এর কিছুদিন পরেই তিনি স্বাস্থ্যের কারণে সক্রিয় সমাজসেবা থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং 1963 সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। এ্যানি মাসক্রিন ছিলেন অসীম সাহসী, উদার দৃষ্টি ভাবাপন্ন এবং মনে প্রাণে স্বাধীনতাপ্রেমী একজন অসাধারণ মহিলা।

[Pankunnam Varkey—Thoolika Chitrangal (Pen-Portraits), in Malayalam; Annie Mascrene in Soviet Union (Malayalam), Published by Prabhat Publishing Co.; Hari Sharan Chhabra—Opposition in the Parliament; লেখকের ব্যক্তিগত জ্ঞাতব্য তথ্য]

(এন. এম. কে. নায়ার) জি. পি. শেখর

এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২)

Allan Octavian Hume (1829-1912)

স্কটিশ বংশজাত এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম 1829 সালে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দুর্দম

এবং নির্ভীক দেশপ্রেমিক ও সমাজসংস্কারক যোসেফ হিউম কিছুদিন ভারতেও চাকুরীরত ছিলেন। পরে তিনি House of Commons-এ Radical Party-র এক বিশিষ্ট সদস্য হয়ে ওঠেন। পিতার কাছ থেকে এ্যালান উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ, সামাজিক সমস্যার প্রতি উদার মনোভাব এবং ন্যায়ের প্রতি নির্ভীক মতপ্রকাশ করার মতো দৃঢ়চিত্ততা লাভ করেছিলেন।

মাত্র তেরো বৎসর বয়সে এ্যালান 'Vanguard' নামক ক্ষুদ্র রণতরীতে নিম্নপদস্থ কর্মচারীরূপে যোগদান করেন এবং কিছুদিন ভূমধ্যসাগরে অতিবাহিত করেন। Royal Navy তে কাজ করার ইচ্ছা থাকায় তাঁকে Haileybury তে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়। Haileybury তে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি University College Hospital-এ চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যা বিষয়ে পড়াশুনা করেন। উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও তিনি উদ্ভিদবিদ্যা ও পক্ষীবিজ্ঞানে নিজ চেষ্টায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

1849 সালে এ্যালান ও হিউম Bengal Civil Service-এ যোগদানের জন্য ভারতে আসেন এবং 1849 থেকে 1867 সাল পর্যন্ত 'District Officer' এর কাজ করেন। 1853 সালে তিনি Mary Anne Grindall কে বিবাহ করেন। সেই 1856 সালে যখন হিউম এটোয়াতে কর্মরত তখনই তিনি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের এক পরিকল্পনা করেন এবং 1857 সালের মধ্যেই ঐ জেলায় দু'জন ছাত্রীসহ 5146 জন ছাত্র সমন্বিত 181 টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং উচ্চ-শিক্ষার্থে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। 1859 সালে তিনি তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে বলেন 'একটি স্বাধীন এবং সভ্য সরকার নিশ্চয়ই তার দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্বের জন্য জনসাধারণকে আলোকপ্রাপ্ত করে তুলতে এবং এর উপযোগিতা উপলব্ধির জন্য তাদের নৈতিক ও বুদ্ধিগতভাবে সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী হবে। 1863 সালে তিনি নাবালক অপরাধীদের জেলে নিক্ষেপ করার পরিবর্তে তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ওপর জোর দেন এবং তাঁরই অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে এটোয়ার অদূরেই নাবালক অপরাধীদের জন্য সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান (Juvenile Reformatory) স্থাপিত হয়।

ভারতীয় গ্রামবাসীদের মদ্যপান রোধেও তিনি প্রয়াসী ছিলেন। হিউম আবগারি শুল্ককে 'পাপের মাশুল' বলে উল্লেখ করতেন। প্রগতিবাদী সমাজ সংস্কারক হিসাবে তিনি নারীশিক্ষার প্রবক্তা এবং শিশু-বলি ও জোর করে বৈধব্য পালন করানোর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের বলতেন রাজ-নৈতিক অগ্রগতির জন্য সামাজিক মুক্তির বিশেষ প্রয়োজন। ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত মানবতাসম্পন্ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্যই 1857 সালের বিদ্রোহের সময় তিনি তাদের সমর্থন অর্জনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিদ্রোহের সময় এই কৃতিত্বজনক কাজের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে 'Commander of Bath' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ভারতীয় কৃষিজীবীদের প্রতি হিউম পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে এক্ষেত্রে ভারতীয়দের উৎসাহ প্রদান করা উচিত যাতে আধুনিক আবিষ্কার ও নবীকরণমূলক ব্যবস্থার সাহায্যে তারা ফসলের উন্নতি ও উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। Lord Mayo-র কার্যকালে কৃষি, শুল্ক ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব হিসাবে তিনি ' Agricultural Reforms of India' নামে বিশেষ মূল্যবান গবেষণামূলক একটি রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর এই রচনায় আলোচিত প্রতিটি প্রস্তাব ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাপ্রসূত এবং তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের মধ্যেই ভারতের আবহাওয়া ও পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান পরিস্ফুট ছিল। কিন্তু Viceroy-এর সানুরাগ সুপারিশ সত্ত্বেও 'সিমলা' ও 'লণ্ডন' চক্র এর বিরোধিতা করে।

Indian Civil Service-এ যোগদান করা সত্ত্বেও হিউম যখনই সরকারের কোনও পদক্ষেপ ভ্রান্ত বলে মনে করেছেন তৎক্ষণাৎ তার সমালোচনা করতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ 1861 সালে Police Superintendent-এর হাতে সমগ্র পুলিশী ও বিচার বিভাগীয় কাজের ভারার্পণের বিরুদ্ধে তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। 1879 সালের পূর্বে Lord Lytton-এর শাসনকালে যে বিষয়েই জনসাধারণের কল্যাণ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি এতটুকু অবহেলা প্রদর্শিত হয়েছে তিনি তার সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। Lord Lytton-এর বৈদেশিক নীতির ফলে 'কোটি কোটি ভারতীয় টাকার' শ্রাদ্ধ হয়েছে। সরকারী নীতি সমূহের বিরুদ্ধে হিউমের সরাসরি সমালোচনা প্রকৃত পক্ষে তাঁকে I. C. S. থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। কারণ 1879 সালে হিউম তাঁর সমালোচনায় সরকারের বিরাগভাজন

হওয়ায় Secretariat থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। 1879-র 27 জুন 'The Englishman'-এর একটি প্রবন্ধে এই ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করা হয় 'সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে আধিকারিকদের নিরাপত্তা বা স্থায়িত্ব বলে এখন আর কিছুই নেই।' এই সময়েই তিনি Col. G. Marshall-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে 'The Game Birds of India, Burmah and Ceylon' গ্রন্থটি রচনা করেন। South London Botanical Institute প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁর উদ্ভিদ সংগ্রহ দান করেন এবং তাঁর পক্ষী সংগ্রহ দিয়ে ছিলেন British Museum-কে। পক্ষী বিজ্ঞান বিষয়ক তার অমূল্য গ্রন্থাবলীটি তাঁর সিমলার বাড়ী থেকে চুরি হয়ে যায়। 1892 সালে হিউম I. C. S. থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এখানেই একটি অধ্যায়ের শুরু ও আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা। এই সময়ে ভারতে থেকে ভারতের জন্য তিনি যে কাজ শুরু করেন তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বলা যায় Indian National Congress-এর প্রতিষ্ঠা। শিক্ষিত সমাজের প্রতি তাঁর আশা ছিল বিপুল। 1883 সালের 1 মার্চ একটি বিজ্ঞপ্তি পত্রে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের আহ্বান করে বলেছিলেন, "ব্যক্তিগত আয়েস তুচ্ছজ্ঞান করে দেশ ও দেশবাসীর জন্য আরোও বৃহত্তর স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রবল সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত কর।" এই উদ্দেশ্যে তিনি 1883 সালের মার্চ মাসে Indian National Union নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সরকারী প্রতিবেদনে হিউম স্বয়ং লিখেছিলেন যে পুণায় কলেরা শুরু হওয়ায় Indian National Union-এর অধিবেশন যখন বোম্বাইতে হবে স্থির হয় তখন হিউম নিজেই একে কংগ্রেস বলে অভিহিত করেন। প্রথম থেকেই হিউম চেয়েছিলেন প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় সংগঠনরূপে পরিচিতি লাভ করুক। 1885 সালের বিজ্ঞপ্তি পত্রে তিনি বলেছিলেন, "এই সম্মেলনে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সব প্রান্ত থেকেই ইংরাজি ভাষায় পারদর্শী প্রতিনিধিমণ্ডল, ও নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকগণ সমাবিষ্ট হবেন। এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হবেঃ (1) জাতীয় অগ্রগতির জন্য শ্রমিকদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন ; (2) আগামী বছরের রাজনৈতিক কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অপ্রত্যক্ষভাবে এই সম্মেলন "দেশীয় সংসদ (Native Parliament) গঠনের বীজবপন করবে এবং যদি যথাযথ পরিচালনা করা যায় তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয়রা প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই অভিমতের বিরুদ্ধে এক অকাট্য প্রত্যুত্তরস্বরূপ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে।" সুতরাং দেখা যায় যে প্রথম সভাপতি ডব্লু. সি. বোনার্জীসহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা যখন সামাজিক বিষয়কেই অধিক গুরুত্ব দিচ্ছিলেন তখন হিউমই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের ওপরে অধিক জোর দিচ্ছিলেন। 1884 সালের 1 ফেব্রুয়ারী বি. এম. মালাবারিকে লেখা হিউমের চিঠি থেকেও আমরা ঐ একই বক্তব্যের ইঙ্গিত পাই। 1884 সালে মালাবারি Lord Ripon-এর সরকারকে বাল্য-বিবাহও বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে দু'টি 'নোট' পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হিউম মনে করতেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয়রা রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা নিছক সময় ও শক্তির অপচয় মাত্র। প্রথম কংগ্রেসের কার্যবিবরণী হিউমকেই কংগ্রেসের জনক চিহ্নিত করছে কারণ তিনি সমাজ-সংস্কারমূলক কোন প্রশ্ন কখনও উত্থাপন করেন নি—সর্বদাই প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করেছেন।

বোম্বাই-এর গভর্ণর Lord Reay-কে লেখা Lord Dufferin-এর চিঠি থেকে মনে হয় হিউম কংগ্রেস মিটিং-এর সাত / আট মাস পূর্বেই Lord Dufferin-এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। 1885 সালের 17 May Lord Dufferin Lord Reay-কে লিখেছিলেন, "হিউম অত্যন্ত চতুর এবং ভদ্র কিন্তু মনে হয় তার মাথায় পোকা আছে। Ripon আমাকে বলেছিলেন স্থানীয় লোকদের তিনি খুব ভালভাবে চেনেন এবং আমি যেন মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করি। আমি অবশ্যি তা আনন্দের সঙ্গেই করে থাকি এবং তার ফলে আমার লাভও হয়। তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকালে আমাকে বলেছিলেন—তিনি এবং তার বন্ধুরা মিলে একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন।" Lord Dufferin হিউমকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ইংলণ্ডে মহারাণীর বিরোধীপক্ষের ন্যায় একই উদ্দেশ্য বিশিষ্ট একটি দল গড়ে তুলতে।

আগেরটির তুলনায় কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনটি অধিক জাঁকালো হয়েছিল। হিউমের প্রভাবেই কোচবিহার, দ্বারভাঙ্গা, হাতওয়া ও ডুমরাঁও-এর মহারাজাগণ সহ মহারাজা যতীন্দ্র

মোহন ঠাকুর এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপুল পরিমাণে অনুদান দিয়েছিলেন।

1887 সালে হিউম এবং কংগ্রেস নেতারা তামিল ভাষায় বীররাঘবচারিয়ার লিখিত একটি প্রশ্নোত্তর-মূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে গণ সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। কংগ্রেসের প্রতি বৃটিশ আধিকারিকদের যে সামান্যতম সহানুভূতি ছিল তাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। 1888 সালের 3 ডিসেম্বর Dufferin এক পত্রে Lord Cross-কে লিখেছিলেন—বহু লোক আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলেন যে "কংগ্রেসওয়ালাদের অবাধ্যতা সরকারের নীতি দ্বারা পরোক্ষভাবে সমর্থিত তামিল প্রশ্নোত্তর বিষয়ক গ্রন্থ এবং এজাতীয় বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করে হিউম সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা এবং অপবাদ রটনা করে বিদ্রোহের যে হুমকি দিয়েছেন তা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।" উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং অযোধ্যার Lt. Governor Sir Auckland Colvin এই প্রশ্নোত্তর পুস্তিকাদির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে হিউমকে একটি চিঠি লেখেন।

এই প্রশ্নোত্তর মূলক পুস্তিকাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ফলে 1887 সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে পূর্বাপেক্ষা অধিক সাধারণ মানুষ যোগদান করেন। "Indian Mirror"-এর সম্পাদককে হিউম লিখেছিলেন—"কংগ্রেসের গত অধিবেশনে (1887 সালে, মাদ্রাজে) বহু প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন এবং এমন কিছু বক্তা এসেছিলেন যাঁদের শুধুমাত্র নিজের মাতৃভাষার ওপরেই দখল আছে।"

1888 সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে প্রতিনিধি সংখ্যা 607 থেকে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে 1248-এ দাঁড়ায়। অত্যল্প কালের মধ্যে এটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন হিউমের ছিল তা বাস্তবায়িত হয়।

কিন্তু হিউম ভারতে শুধু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বৃটিশ জনগণকেও এর কথা জানাতে আগ্রহী ছিলেন। কংগ্রেসের ভিত্তি স্থাপনের পরই হিউম এরকম একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে "বৃটিশ পার্লামেন্ট এবং জনগণকে এর বিষয়ে অবগত করানোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সম্পর্কে" বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে ইংলন্ড গমন করেন।

তিনি যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন John Bright, Lord Ripon এবং R. T. Reid. পার্লামেন্টের সদস্য Reid এক পত্রের মাধ্যমে হিউমকে ভারতীয় বিষয়ে বৃটিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও House of Commons-এ একজন ভারতীয়ের জন্য একটি আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বাস্তবানুগ পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"পার্লামেন্টে তোমার কিছু সহকারী থাকা প্রয়োজন। ইংলন্ডে যদি তোমার মতো কিছু সক্রিয় ও হিতাকাঙ্ক্ষী কর্মী থাকত তবে House of Commons-এও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারত।" হিউম বৃটিশ সংবাদ পত্রাদির মাধ্যমেও প্রচারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সুতরাং 1885 সালে তিনি Manchester Guardian, Manchester Examiner, Leeds Mercury, Scotsman, Glasgow Daily Ma.l প্রভৃতিতে ভারতীয় সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিন্তু 1887-র পূর্বে ইংলন্ডে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। 1886 সালে দাদাভাই নৌরজী কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এবং পরের বছর তিনি ইংলন্ডে কংগ্রেসের 'Agent' হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। 1888 সালে প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি ডবলিউ, সি. বোনার্জী কংগ্রেসের অপর এক বিশিষ্ট সদস্য Eardley Norton সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংলন্ডে দাদাভাই-এর সঙ্গে যোগদান করেন এবং 1889 সালের 27 জুলাই লন্ডনে এক সুদৃঢ় Congress Agency স্থাপনে উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। Madras Times এর প্রাক্তন সম্পাদক ছিলেন তাঁর 'Part time' সেক্রেটারী। ইংলন্ডে কংগ্রেসের প্রচারের প্রথম পদক্ষেপ এইভাবেই হিউম এবং দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বাধীনে সূচিত হয়। 1889 সালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 45,000 টাকা অনুমোদিত হয় এবং 1890 সালে লন্ডনে Congress Agency বলে পরিচিত কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটি 'India' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ নির্বাচক মন্ডলীকে ভারতের দুঃখদুর্দশা ও অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অবহিত করানো। হিউম এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন দূরদর্শী—তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস পরিকল্পিত সংস্কার কর্মের সুপ্রয়োগ। 1892 সালের 16 ফেব্রুয়ারী হিউম কংগ্রেসের সব সদস্যদের উদ্দেশ্য করে 'একান্ত গোপনীয়' বলে যে বিজ্ঞপ্তি পত্রটি রচনা করেন সেটি কিন্তু এলাহাবাদের 'Morning Post' এ প্রকাশিত হয়ে যায়। এতে হিউম বলেছিলেন যে দারিদ্র্য, অন্যায় এবং হতাশা জনসাধারণকে বিদ্রোহের পথে নিয়ে

যেতে পারে। তিনি কংগ্রেস সদস্যদের আরোও অনুরোধ জানান যে তাঁরা যেন ভারতের প্রতি বৃটিশ সাধারণের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রেট বৃটেনে প্রতিনিধি পাঠানোর প্রস্তুতিও গ্রহণ করেন। কিন্তু বিদ্রোহের উল্লেখে পি. এম. মেহ্তা, ডি. ই. ওয়াচা, ডবলিউ. সি. বোনার্জী এবং অন্যান্যরা ভীত হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা এই পত্রের প্রচার বন্ধ করে দেন। 1892 সালে ডবলিউ. সি. বোনার্জীর সভাপতির ভাষণে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়—'কংগ্রেস যেটুকু আন্দোলন করেছে তা অত্যন্ত সীমিত পরিধির মধ্যে হলেও তা শুধুমাত্র শ্রীযুক্ত হিউমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আমরা করতে পেরেছি।' কিন্তু অন্যান্য অনেকে তাঁর সঙ্গে সহমত হন নি। Eardley Norton এই পত্রটিকে 'রানীর আনুগত্যের প্রতি বিশেষ বিরুদ্ধতা প্রদর্শন' বলে উল্লেখ করেন। অবশ্য জি. কে. গোখলে 'Indian National Congress তার সাত বছরের অস্তিত্বকালে যা কিছু করেছে তার সবকিছুই প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত হিউমেরই প্রয়াস' বলে হিউমের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

হিউম সম্বন্ধে গোখলের মূল্যায়ন যথাযথ। কারণ, কংগ্রেসের ওপর যদি হিউমের প্রভাব না থাকত তবে 1893 সাল পর্যন্ত তাঁকে সেক্রেটারী হওয়ার জন্য কংগ্রেসের প্রায় সব নেতাই চাপ দিতেন না। 1894 সালে ভারত ত্যাগ করার পর থেকে 1906 সালে 77 বছর বয়সে তিনি এই পদ ত্যাগ না করা পর্যন্ত বছরের পর বছর তাঁকে সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়েছে। এটি খুবই উৎসাহজনক ব্যাপার যে 1903 সালে 'A Call to Arms' শীর্ষক প্রবন্ধমালা ধারাবাহিক ভাবে লিখিত ও প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি কংগ্রেসের British Committee-র সদস্য William Wedderburn, W. C. Bonnerjee, দাদাভাই নৌরজী এবং Allan Octavian Hume দ্বারা লিখিত ছিল—অর্থাৎ ভারতের কংগ্রেস আন্দোলনের সমর্থক ও সুহৃদদের উৎসাহিত করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। নেতাদের মধ্যে আত্মত্যাগের অভাব লক্ষ্য করে বৃদ্ধ হিউম পরিতাপের সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন—'তোমরা কংগ্রেসে আস এক সাময়িক উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে। তোমরা বাকচাতুর্যে এবং আবেগের প্রয়োগে শুধু নিজেদের কৃতিত্ব জাহির কর। কিন্তু কংগ্রেস শেষ হয়ে গেলেই সোজা কথায় তোমরা যে যার ব্যক্তিগত কর্মজগতে ফিরে যাও।' এর পরিবর্তে তিনি তাঁর বন্ধুদের সারা বছর ধরে কংগ্রেসের কাজ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রভাবশালী হিউম যে কোন সময়েই কংগ্রেসের সভাপতি হতে পারতেন কিন্তু তিনি পশ্চাৎপটেই থাকতে চেয়েছিলেন। জীবনের শেষ আঠার বছর তিনি ইংলণ্ডে থেকেও কংগ্রেসের কাজ করে গেছেন।

যে ভারত এবং ভারতীয়দের জন্য তিনি কাজ করেছিলেন তারা তাঁর মহানুভবতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনেও পরাঙ্মুখ হয় নি। 1912 সালের 28 আগস্ট কলকাতার Town Hall-এ আয়োজিত এক স্মৃতি সভায় রাসবিহারী ঘোষ বলেছিলেন—"কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হিউম তাঁর অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 1912 সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের বাঁকিপুর অধিবেশনে এ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমকে Indian National Congress-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং জনক বলে স্বীকৃতি দান করা হয়। "তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন কি করে রক্তহীন সংগ্রামের মাধ্যমে সাংবিধানিক সংস্কারসাধন সম্ভব। আমরা এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিরা আগামী প্রজন্মের পর প্রজন্ম সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে শ্রীযুক্ত এ্যালান হিউমকে স্মরণ করবে।"

[A. O. Hume—Agricultural Reform in India, 1899 ; W. Wedderburn—Allan Octavian Hume, London, 1913 ; Natesan, Allan O. Hume, Madras ; R. P. Masani—Dadabhai Naoroji the Grand Old Man of India, London, 1939 ; A. P. Sinnet—Incident in the life of Madame Blavatsky, London, 1913 ; The Modern Review, Calcutta, May 1957.]

(কুমুদ প্রসন্ন) (প্যান্সী ছায়া ঘোষ)

এলানজিক্কল জন ফিলিপোজ (১৯০৩-১৯৫৫)

Elanjikkal John Philipose (1903-1955)

1903 সালে কেরালার মধ্য ত্রিবাঙ্কুরের নিরানম-এর এক সুপরিচিত "জ্যাকোবাইট সিরিয়ান" খ্রীষ্টান

পরিবারে এলানজিক্কল জন ফিলিপোজের জন্ম হয়। তিনি Travancore State Congress'-এর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতা ই. জে. জন একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। ত্রিবান্দ্রামের Maharaja's Arts College থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি Law College-এ ভর্তি হন এবং 1928 সালে B. L. ডিগ্রী লাভ করেন। পরের বছর উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করলেও কোন ডিগ্রী লাভ করার পূর্বেই তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। 1935 সালে তিনি ত্রিবাঙ্কুরে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু তিন বৎসর পর Travancore State Congress-এ যোগদান করে রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করার পর ওকালতি ছেড়ে দেন।

"নিবর্ত্তনম" আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে তিনি জনজীবনে প্রবেশ করেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল State Legislature এবং জনহিতকর কর্মক্ষেত্রে খ্রীষ্টান, এজাহ্ভা ও মুসলমানদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ অর্জন করা। ক্রমে ক্রমে 1938 সালে State Congress যখন রাজ্যে একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করে তখন তিনিও এতে যোগ দেন এবং একজন বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ঐ রাজ্যে সেই সময় প্রচলিত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি দু'বার গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। State Congress-এর আন্দোলনকালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎলাভের সুযোগ ঘটে এবং তিনি তাঁর চৌম্বকশক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হন। ত্রিবাঙ্কুরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজীকে সম্যক্ অবহিত করানোর জন্য যে প্রতিনিধি দলকে ওয়ার্ধায় প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি প্রায় তিন মাস গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন।

স্বাধীনতার সূচনাকালেই তিনি State Legislative Assembly-তে নির্বাচিত হন এবং অনতিবিলম্বে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন মন্ত্রীসভার P. W. D. এবং পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী হন। এই পদে ক্ষমতাসীন থাকাকালীন তিনি রাজ্যের জন্য গ্রামে নতুন পথ নির্মাণ, বিখ্যাত "Neyyar Dam Project" সহ নতুন কৃষি পরিকল্পনাসূচী প্রভৃতি কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

রাজনীতি ছাড়া তিনি কিছু প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি রাজ্যের শিল্প পুনরুজ্জীবনের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী এবং কয়েকটি শিল্পসংস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িতও ছিলেন। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তিনি উদারনীতি পোষণ করতেন এবং কিছু প্রচলিত ব্যবস্থার তীব্র বিরোধী ছিলেন। 1955 সালের 21 ফেব্রুয়ারী তিনি তিপান্ন বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। কাজের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে বিশিষ্টতা দান করেছিল।

[E. M. Kovoor—Life of L. M. Varughese (Malayalam); Trichur District Congress Convention Souvenir, 1958; Personal knowledge of the Contributor.]

(এন. এম. কে. নায়ার) জি. পি. শেখর

এস. অম্বুজাম্মাল (শ্রীমতি) (১৮৯৯—)
S. Ambujammal (S.M) (1899—)

শ্রীমতী অম্বুজাম্মাল 1899 সালের 8ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতা শ্রীরঙ্গনাকিয়াম্মাল ও পিতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের একমাত্র কন্যা। পিতা ছিলেন মাদ্রাজের একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা। তাঁদের পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল রামনাদ জেলায়। এই পরিবার ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল; এদের চালচলন সবই ছিল সনাতনপন্থী। অম্বুজাম্মাল বাড়িতেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রমহিলা তাঁকে ইংরেজি ভাষা, ছবি আঁকা, সেলাই, সূচীকর্ম ইত্যাদি শেখাতেন। তিনি গানও শিখেছিলেন। খুব ভাল বীণা বাজাতে পারতেন। অল্প বয়সে কুম্ভকোনমের এক মধ্যবিত্ত জমিদার পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামী এস দেশিকাচারীও একজন আইনজীবী ছিলেন।

জীবনের প্রথমে বাবা, মা ও আত্মীয়া শ্রীমতী জনাম্মল ছাড়া আর একটি মানুষের প্রভাব তাঁর উপরে গভীর ভাবে পড়েছিল, তিনি হলেন গান্ধীজী, তাঁর গঠনমূলক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের পরিকল্পনা কিশোরী অম্বুজাম্মালের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পরবর্তী জীবনে ভগিনী শুভলক্ষ্মী, ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি এবং মিসেস

মার্গারেট কাজিন্‌স প্রমুখ মহিলাদের সংস্পর্শে এসে তিনি সমাজ সেবায় আরো আগ্রহী হন। বাল্মীকি ও তুলসীদাসের রামায়ণ তাঁর খুব প্রিয় ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী ভক্তিযোগ এবং তিলকের কর্মযোগ তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করত।

1930 সাল দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করার আগেই তিনি সারদা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, এজন্য বিশেষ শিক্ষা প্রণালীও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। 1929 সাল থেকে 1936 সাল পর্যন্ত ভগিনী শুভলক্ষ্মীর অধীনে সারদা সমিতির সভ্যা ছিলেন। 1929 সালে তিনি মাদ্রাজে নারী সমিতির কোষাধ্যক্ষা হন এবং সেই সমিতি উঠে যাওয়া পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সমিতি কংগ্রেসের একটি শাখা হওয়া সত্ত্বেও কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল না। কেবলমাত্র গান্ধীজীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 1930 সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন।

1932 সালে কংগ্রেস তাঁকে তৃতীয় ডিক্‌টেটার অথবা সর্বাধিনায়িকারূপে নির্বাচিত করে। বিদেশী বস্ত্র বয়কট আন্দোলনে তিনি সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দান করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ছ'মাসের জন্য কারারুদ্ধ করেন। 1934 থেকে 1938 সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দী প্রচার সভার পরিচালনা সমিতির সভ্যা ছিলেন। হিন্দী ভাষা শেখার জন্য তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। তিনি নিজে 'বিশারদ' পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলেন এবং হিন্দী ভাষার বহুল প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 1934 সালে তিনি হিন্দী প্রচার সভার প্রতিনিধিরূপে ভারতভ্রমণে যান এবং বোম্বেতে যে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাতে যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন ও তাঁর ওয়ার্ধা আশ্রমে 1934 সালের নভেম্বর মাস থেকে 1935 সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বাস করেন। 1936 সালে তিনি মায়লাপুর মহিলা সমিতির সম্পাদিকা হন। এখানে তিনি নিয়মিত হিন্দী শেখাতেন। 1934 সাল থেকে 1942 সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় মহিলা সমিতির সম্পাদিকা ও 1947 সাল পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষা ছিলেন। এই সময়ে তিনি বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ ও দেবদাসীপ্রথা নিরোধের জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। মহিলাদের সম্পত্তিতে অধিকারের জন্য আইন প্রণয়নের দাবীতেও সোচ্চার ছিলেন। এই সমিতির পক্ষ থেকে তিনি মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সভ্যা নির্বাচিত হন। 1947 সালে মাদ্রাজে যে সর্বভারতীয় মহিলা সমিতির অধিবেশন হয় তিনি তার চেয়ারম্যান ছিলেন। 1948 সালে তিনি শ্রীনিবাস-গান্ধীনিলয়মের প্রেসিডেন্ট ও কোষাধ্যক্ষা নির্বাচিত হন। 1956 সালে তিনি ভূদান আন্দোলন জনপ্রিয় করার জন্য বিনোবা ভাবের সঙ্গে পদযাত্রা করেন। 1957 সাল থেকে 1962 সাল পর্যন্ত তিনি তামিলনাড়ু কংগ্রেস সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। 1957 সাল থেকে 1964 সাল পর্যন্ত সমাজ কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন।

শ্রীমতী অম্বুজাম্মাল তামিল এবং হিন্দী এই উভয় ভাষাতেই পারদর্শিনী। তিনি সুবক্তা এবং সুলেখিকা। বিভিন্ন তামিল পত্রিকায় নারী কল্যাণ, নারীশিক্ষা, গান্ধীজী এবং জাতীয়তা আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তামিল ভাষায় তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন—তুলসী রামায়ণম্‌, গান্ধী নিনাইভু মালাই, M. K. Gandhi ও Reminiscences of My Father।

ক্ষীণকায়া, দীর্ঘাঙ্গী, শ্রীমতী অম্বুজাম্মাল অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। কংগ্রেসের গোঁড়া সমর্থক এই মহিলা খাদি ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র ব্যবহার করতেন না। জাতীয় আন্দোলনে তিনি তাঁর সমস্ত অলংকার দান করেছেন। সেই অর্থ দিয়ে গান্ধীজী ওয়ার্ধায় মহিলা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

সংরক্ষণশীল পরিবারে জন্ম হলেও তিনি জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে উদার মতামত পোষণ করতেন। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি একমাত্র বিনোবাভাবের গ্রামাঞ্চল স্বনির্ভর করে তোলার পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্ভব। দেশে অনেক কলকারখানা গড়ে উঠলেই দেশের অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

গান্ধীজীর একনিষ্ঠ শিষ্যা শ্রীমতী অম্বুজাম্মালের শ্রদ্ধার নিদর্শন শ্রীনিবাসগান্ধীনিলয়ম 1948 সালে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় মহিলা সমিতির একটি শাখা। এখানে দুঃস্থ বালিকাদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি দাতব্য চিকিৎসালয়; একটি ছাপাখানা; একটি খাম তৈরীর কারখানা ও একটি সমবায় সমিতি এই প্রতিষ্ঠানে আছে। সমবায়-সমিতিটি দুঃস্থ মহিলাদের জীবিকা অর্জন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে।

[Hindu Files ; Information furnished by the Madras Political Who's Who Unit ; Mrs. Margaret Cousins and her work in India, Madras, 1956 ; Arun—Andhra Naal (Tamil), Madras, 1963 ; N. Perumal—Tamils of Today, 1957 ; Mitra-Annual Register ; S. Ambujammal—M. K. Gandhi (Tamil), Madras, 1963 ; —Reminiscences of My Father (Tamil), 1963 ; Information Furnished by Sm. Sarojini Varadappan, D/o. Shri M. Bhaktavatsalam, ex-Chief Minister of Tamilnad ; Information furnished by Sm. Ambujammal at a personal interview.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) বি. শালিনী দেবী

এস. কস্তুরি রঙ্গ আয়েঙ্গার (১৮৫৯-১৯২৩)

S. Kasturi Ranga Iyengar (1859-1923)

এই শতাব্দীর প্রথম পাদে সাংবাদিকতা এবং রাজনীতিতে এস কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার ছিলেন একজন প্রথিতযশা জাতীয় নেতা। জন্ম 15 ডিসেম্বর 1859। এক গোঁড়া বৈষ্ণবপন্থী ব্রাহ্মণ পিতামাতার সন্তান। এঁরা মহান সন্ত ও দার্শনিক রামানুজের ধর্মমত অনুসরণ করতেন। কস্তুরী রঙ্গের বাবা শেষা আয়েঙ্গার তাঞ্জোরে জেলা কালেক্টরের অধীনে রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী ছিলেন। তাঁদের ছিল মধ্যবিত্ত পরিবার। তখনকার দিনের প্রচলিত প্রথা ছিল ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করা যাতে তারা এই সরকারের অধীনে কাজ করতে পারে। শেষা আয়েঙ্গারের তিন ছেলের মধ্যে শ্রীনিবাস রাঘব আয়েঙ্গার মাদ্রাজ সরকারের অধীনে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন পদে উন্নীত হন এবং কিছুদিনের জন্য বরোদার দেওয়ান নিযুক্ত হন।

বারো বছর বয়স পর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ সন্তান কস্তুরী রঙ্গ, যেখানে তাঁর বাবা কাজ করতেন সেই গ্রামের স্কুলে লেখা-পড়ার প্রাথমিক পাঠ নেন। তাঁকে তারপর কুম্ভকোনম প্রাদেশিক স্কুল এবং কলেজে পাঠান হয়; যেখানে তাঁর বড় ভাই পড়াশুনা করছিলেন। স্কুলে থাকাকালীন তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী তাঁর স্বজাতীয় দশ বছরের এক বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কুম্ভকোনমে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সমাপ্ত করার পর কস্তুরী রঙ্গ মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে 1879-এ কলাবিদ্যার উপাধি লাভ করেন। তারপর তিনি সেই একই কলেজে আইন বিভাগে যোগদান করেন কিন্তু প্রথমবারের চেষ্টায় ব্যর্থ হন। 1881 সালে তিনি রেজিস্ট্রেশন বিভাগে সাব-রেজিস্ট্রারের পদ লাভ করেন। এই পদটির জন্য কোনো মাহিনা বরাদ্দ ছিল না। তার বদলে চল্লিশ টাকা মূল্যের রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলগুলির স্টাম্পের মূল্য অনুযায়ী মাসিক কমিশন পেতেন। তিন বছর চাকরীর পর তিনি আবার আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন এবং সফল হন। সমসাময়িককালে ভারতীয়দের মধ্যে অন্যতম খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ভি বশ্যম আয়েঙ্গারের অধীনে তিনি শিক্ষানবীশ হিসেবে থাকেন।

1885-র 31 মার্চ কস্তুরী রঙ্গ আইন ব্যবসা শুরু করেন। মাদ্রাজের বদলে কোয়েম্বাটুরে আইন ব্যবসা শুরু করাটাই তিনি বেশী পছন্দ করেন। এর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি লাভজনক ব্যবসা গড়ে তোলেন। শহরাঞ্চলের জনজীবনেও তাঁর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়েছিল। পৌরসভার কাউন্সিলে তিনি নির্বাচিত হন এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা পরিদর্শক নিযুক্ত হন এবং পরে কোয়েম্বাটুরে জেলা বোর্ডে মনোনীত হন। কোয়েম্বাটুরে তিনি 'কসমোপলিটান ক্লাবের' গোড়াপত্তন করেন। কোয়েম্বাটুরে ন'বছর আইন ব্যবসায়ের পর কস্তুরী রঙ্গ মাদ্রাজ শহরে চলে আসেন, তিনি আশা করেছিলেন মাদ্রাজে তাঁর ব্যবসায় এবং জনহিতকর কাজের বেশী বেশী সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। এ সময়ের মধ্যে তাঁর তিন কন্যা ও দুই পুত্রের জন্ম হয়েছে। আইন ব্যবসা সম্পর্কে যে হিসাব তিনি কষেছিলেন তা বাস্তবে পরিণত হয়নি। তার ক্ষতিপূরণ তিনি যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছিলেন প্রথমে রাজনীতিতে এবং পরবর্তীকালে সাংবাদিকতায়। মাদ্রাজ মহাজন সভার তিনি ছিলেন অন্যতম খ্যাতনামা সংগঠক। মাদ্রাজ শহরে অনেকদিন ধরে এই সংস্থাটি বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে বিরাজ করেছিল। কংগ্রেস সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

কস্তুরী রঙ্গর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 1905 সালে 'হিন্দু'র স্বত্বাধিকার অর্জন করা। পত্রিকাটি 1878 সালে সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে কয়েকজন আদর্শবাদী ব্যক্তির উদ্যোগে শুরু হয়।

তাঁদের মধ্যে জি. সুব্রমমনিয়া আয়ার এবং বীর-রাঘবচারিয়ার ছিলেন বিখ্যাত। 1889-এ পত্রিকাটি একটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয় কিন্তু তার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব অনিশ্চিত অবস্থায় চলতে থাকে এবং অবশেষে তা কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

1905 সাল থেকে শুরু করে 1923 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কস্তুরী রঙ্গর মূল কাজ ছিল 'হিন্দু'কে একটি শক্তিশালী সংবাদপত্র হিসাবে গড়ে তোলা এবং লাভজনক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছিলেন—দু বিষয়েই। সাংবাদিকতার কাজের মধ্যে তিনি সাহসিকতা এবং বিচক্ষণতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানী ব্যাঙ্কিং ফার্ম দেউলিয়া হওয়ার বিষয় আলোচনাকালে তিনি সমস্ত দুষ্কার্য ফাঁস করে দিয়ে কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ ঘটাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। একমাত্র 'হিন্দুর' একগুঁয়ে লড়ে যাওয়ার মনোভাবের জন্যই প্রধান দোষী স্যার জর্জ অরবুথনট মিথ্যা হিসাব দাখিলের দায় এবং তহবিল তছরুপের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং এর ফলে আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

'হিন্দু পত্রিকা'র নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাতে এসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে খাপ খেয়ে যায় সার ফিরোজশাহ মেহতা এবং গোখলের নেতৃত্বে নরমপন্থী এবং লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে তথাকথিত চরমপন্থীদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ। মাদ্রাজের প্রথিতযশা রাজনীতিবিদরা সবাই ছিলেন নরমপন্থীদের পক্ষে কিন্তু 'হিন্দু' পত্রিকা তিলক এবং তাঁর গোষ্ঠীকে জোরালো ভাবে সমর্থন করেছিল। 1907 সালের সুরাট কংগ্রেস সংগঠন নরমপন্থীদের দখলে ছিল তখন কস্তুরী রঙ্গ সক্রিয় রাজনীতি থেকে কার্যত অবসর গ্রহণ করেন।

যখন 1916 সালে চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের মধ্যে আঁতাতের সম্ভাবনা দেখা গেল তখন কস্তুরী রঙ্গ রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং কংগ্রেস-লীগ প্রকল্প গড়ে তুলতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ভারতে থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী এ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে পরিচালিত হোমরুল আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। এছাড়াও যুদ্ধের শেষ দিকে রাজনৈতিক সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়ে যখন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের আমলে সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া মণ্টেগু ভারত ভ্রমণে আসেন তখন রঙ্গ তার কাছে কংগ্রেস লীগ পরিকল্পনাকে সমর্থন করে একটি স্মারকলিপি দেন।

এই স্মারকলিপিতে কস্তুরী রঙ্গ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন এবং তাঁর মিত্রশক্তিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। 1918 সালের আগষ্ট মাসে যখন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ থেকে পাঁচজন সম্পাদকের একটি প্রতিনিধিদলকে ব্রিটেন এবং পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান তখন কস্তুরী রঙ্গ ছিলেন সেই দলের একজন। এই ভ্রমণসূচী পাঁচ মাস স্থায়ী হয় এবং মিত্র শক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। 1919 সালে মাদ্রাজে ফেরার পর তাঁকে বিশাল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

তিনি ফিরে আসার পরেই ভারতবর্ষের রাজনীতি একটা বেদনাময় মোড় নেয়। রাউলাট আইন তখন পাশ হয়ে গেছে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে সরকারী নিপীড়নমূলক নীতি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল জালিওয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায়। 'হিন্দু' পত্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতাদের সমর্থন করে। যদিও কস্তুরী রঙ্গ প্রথমদিকে 1920 সালে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক সূচিত অসহযোগ আন্দোলনের সম্বন্ধে সমালোচনামুখর ছিলেন পরবর্তী কালে তিনি তাঁর জোরালো সমর্থক হয়ে উঠলেন। 1920 থেকে 1922 সালের এই সংকটময় বছরগুলিতে 'হিন্দু' পত্রিকার সমর্থন স্বাধীনতা সংগ্রামের কাছে এক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। 1922 সালের মার্চে মহাত্মা গান্ধীর বিচার এবং দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হবার পর সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন এক বদ্ধ অবস্থায় পেঁৗছোয় তখন সর্বভারতীয় পরিস্থিতি অধ্যয়ন করার জন্য কংগ্রেস কমিটির অধীনে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন হাকিম আজমল খাঁ এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সি. রাজা গোপালাচারিয়ার এবং কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার। তিনজন সদস্য ভি. জি. প্যাটেল, মতিলাল নেহরু এবং হাকিম আজমল খাঁ-এর মত ছিল যে সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে আইনসভায় প্রবেশ করার নীতি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কস্তুরী রঙ্গ সহ অধিকাংশ সদস্য একমত হলেন যে দেশ গণআইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত নয়, আইনসভায় প্রবেশের বিরোধিতা করলেন এবং গঠনমূলক কর্মসূচী এবং সাময়িক ভাবে অবস্থা বিশেষে আইন অমান্য আন্দোলনের বিপক্ষে ওকালতি করেন।

1922 সালের শেষ দিকে কস্তুরী রঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 1923 সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু ঘটে। স্বয়ং গান্ধীজী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায়

লেখেন, 'শ্রীকস্তুরী রঙ্গর মৃত্যুতে ভারত তাঁর এক প্রথম শ্রেণীর নেতাকে হারাল ; সফলকাম সাংবাদিক হিসেবে তাঁর দেশসেবার কথা সুপরিচিত।' সেই মাসেই ককোনাদা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মিটিং-এ কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের মৃত্যুর ফলে যে গভীর বেদনার সৃষ্টি হল তা নথিভুক্ত করা হয় এবং তাঁর মূল্যবান অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে স্মরণ করা হয়।

যদিও কস্তুরী রঙ্গ ছিলেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ তা সত্ত্বেও তিনি খুব উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং ধীরে ধীরে সমস্ত রকমের সামাজিক বিভেদের অবসান চেয়েছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতা অপসারণে বিশ্বাসী ছিলেন, বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং নারীমুক্তি চাইতেন। তিনি জোরের সঙ্গে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গোখলের প্রচেষ্টার প্রতি সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শিল্পগত বিকাশের তিনি অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন।

কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার ছিলেন মাঝারি ধরনের লম্বা, গায়ের রঙ ছিল গৌরবর্ণ, সুপুরুষ। তাঁর স্বভাব ছিল অমায়িক এবং সহজেই তাঁর কাছে পেঁছান যেত। তিনি প্রত্যেকের কথাই ধৈর্য ধরে শুনতেন এবং কোনো একটি সমস্যার সমস্ত দিকের নিরপেক্ষ বিচার করে তারপর মনস্থির করতেন। ব্যক্তিগত অভ্যাসের ক্ষেত্রে তিনি কঠোর সাধাসিধে জীবনযাপন করতেন এবং নিজস্ব পারিবারিক ব্যাপারগুলো অবহেলা করে সমস্ত সময়টাই তিনি ব্যয় করতেন কাগজের সম্পাদকীয় লেখা এবং জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপে।

এই শতাব্দীর প্রথিতযশা ভারতীয়দের মধ্যে তিনি একটি সম্মানিত স্থান পাবার যোগ্য। তাঁর একমুখী দেশপ্রেম এবং খবর ছাপান ও প্রকাশ করার ব্যাপারে সত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, এবং যাদের সঙ্গে তিনি এক মত হতে পারতেন না কোনোরকম বিদ্বেষ বা পক্ষপাত ছাড়াই তাদের সাথে ব্যবহার করা, প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে সকলের শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে সাহায্য করেছে এবং আধুনিক ভারতের স্থপতিদের মধ্যে তাঁকে এক উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

[Diary of S. Kasturi Ranga Iyengar, The Hindu Files ; Islington Committee Report ; Letter to S. Satyamurthi and others ; Montagu's Diary, 1917 ; Letter from Fort St. George, 1915 ; Pattabhi Sitaramayya—The History of the Indian National Congress. vols I & II ; R. T. Parthasarathy—Dawn and Achievement of Freedom in India ; V. K. Narasingha—Kasturi Ranga Iyengar (Builders of Modern India, Government of India) 1963.

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) কে. শান্তনম

এস. কে. পাতিল (১৯০০—১৯৮১)

S. K. Patil (1900—1981)

সদানন্দ কান্হোজী পাতিল (সদোবা), যিনি এস. কে. পাতিল নামে সমধিক পরিচিত, রত্নগিরি জেলার মালভানে 1900 সালের 14 আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। রত্নগিরি জেলা এ সময়ে সাওন্তবাদী রাজাদের শাসনাধীন ছিল। তাঁর পিতার নাম কান্হোজী ওরফে কাকা। মাতার দিক থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিল বম্বের বিখ্যাত টোপিওয়ালে দেশাই পরিবারের সঙ্গে।

1900 সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে যে সকল ছাত্র কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, পাতিল ছিলেন তাঁদের অন্যতম। 1918 সালে মালভান হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বম্বের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যোগ দেন, কিন্তু 1920 সালে তিনি এই কলেজ ত্যাগ করেন। 1924 থেকে 1927 সালে তিনি London School of Economics-এ অধ্যয়ন করেন এবং সাংবাদিকতায় উপাধিপত্র অর্জন করেন। লন্ডনে প্রবাসকালে তিনি Harold Laski-র সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর লেখনীর দ্বারা প্রভাবিত হন। 1927 থেকে 1933 সাল অবধি তিনি একটি জাতীয় পত্রিকা "Bombay Chronicle"-এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। 1920 সালে মালভানে তিনি একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু 1924 সালে তৎকালীন সরকার কর্তৃক এই বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া হয়। জাতীয়

ভাবধারায় শিক্ষা বিস্তারের তিনি একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন।

1920 থেকে 1947 সাল অবধি কংগ্রেস দলের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সময় তাঁকে আটবার কারাবরণ করতে হয়। তাঁর জীবনের প্রায় দশ বৎসর কারান্তরালে অতিবাহিত হয়। তিনি কুড়ি বৎসর কাল বম্বে কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং 1949 থেকে 1952 সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে তিনবার তিনি বম্বের মেয়র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হন। সতের বৎসর তিনি বম্বে কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন এবং 1946 সালে তিনি এই দলের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এই বৎসরেই তিনি তাঁর গ্রন্থ "The Indian National Congress : A Case for its Re-organisation" প্রকাশ করেন। কংগ্রেস দলে তিনি সর্দার প্যাটেলের অনুসারীরূপে কাজ করেন এবং বম্বে প্রদেশকে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করেন। 1937 থেকে 1943 সাল অবধি তিনি Bombay Provincial Legislature-এর সদস্য ছিলেন। এই সময় বম্বেতে কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল শীর্ষে।

Constituent Assembly এবং পরবর্তীকালে Provisional Parliament (1947-50)-এর একজন সভ্য ছিলেন পাতিল। 1952 থেকে 1967 সাল অবধি তিনি ছিলেন লোকসভার সদস্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন সময়ে তিনি সেচ ও বিদ্যুৎ (1957), পরিবহণ ও বাণিজ্য (1958-59), খাদ্য ও কৃষি (1959-63) এবং রেল (1964-67) দপ্তরের মন্ত্রীত্বভার প্রাপ্ত হন। 1933 সাল থেকে তিনি All India Congress Committee-র সভ্য; 1960 থেকে 1964 সাল অবধি তিনি ছিলেন এর কোষাধ্যক্ষ। 1945 সাল থেকে কংগ্রেস দলের বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যেই একজন সর্বভারতীয় নেতারূপে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মারাঠী এবং ইংরাজিতে ওজস্বী ভাষায় তিনি বক্তৃতা দিতেন। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরালায় তিনি নির্বাচনী প্রচার অভিযান পরিচালনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই ইংরাজি ভাষায় লিখিত। Provincial এবং Central Assembly এই উভয় সভাতেই তাঁর বাগ্মিতা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি হিন্দী এবং মারাঠীতেও বক্তৃতা দান করতেন। "বৃহৎ ভারতীয় সমাজের" তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক এবং সভাপতি; এই সমাজ বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষায় উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। International Forum, Peace Corps, এবং Humanitarian League-এর সভাপতি ছিলেন তিনি। তিনি লাজপতরাই মেমোরিয়াল কমিটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। এই দৃষ্টান্তগুলি জনস্বার্থ, জাতীয় এবং মানবিকতার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখ্য অবদানের স্বীকৃতি।

পৌর প্রশাসন সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য 1950 সালে তিনি আমেরিকা সফর করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই দেশে আরও পাঁচবার গিয়েছিলেন। 1959 সালে ভ্রমণকালে তিনি বিখ্যাত "Wheat Deal" সম্পাদনা করেন। 1961 সালে তিনি রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপ সফর করেন। এই সকল দেশ ভ্রমণের ফলে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বাণিজ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। আমেরিকা ভ্রমণের ফলস্বরূপ তিনি কারিগরী শিল্প প্রযুক্তি, ব্যাপক কর্মসংস্থান এবং রপ্তানীর মাধ্যমে আয় ইত্যাদি পন্থার অন্যতম প্রবক্তারূপে পরিচিত হন। বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সমর্থকরূপে চিহ্নিত করে বামপন্থীগণ তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং দুর্নীতির প্রশ্রয়দানকারী হিসাবে অভিযুক্ত করেন। পাতিল অপর পক্ষে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে শিল্পকারখানাগুলি বেসরকারী ক্ষেত্রেই দক্ষতা সহকারে পরিচালিত হয়। কিন্তু ঐরূপ সংস্থাই ক্রমাবনতির পথে অগ্রসর হয় যদি সরকার সেগুলি অধিগ্রহণ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখ্য ভূমিকা নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সভাপতির পদ গ্রহণ থেকেই প্রমাণিত হয়। এগুলি হল: Local Self-Govt. Institute, Balkanji Bari, Bassein Educational Society, International Students' Forum, নেহরু বিদ্যানগর, Poona School Home For the Blind এবং Women's Education Society। তাঁর পিতা ছিলেন মালভানের একজন সামান্য পুলিশ অফিসার। এই নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পাতিল একাগ্র অধ্যবসায় সহকারে উচ্চশিক্ষা এবং সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পদ অর্জন করেন। ধর্মীয় এবং সামাজিক বিষয়ে তাঁর মত ছিল উদার।

তাঁর হিতৈষীগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অহিন্দু। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণসহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তিনি তাঁর কন্যাদের উচ্চশিক্ষা প্রদান করেছেন। 1921 সালে তাঁর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ইন্দিরা বাঈ, তাঁর সহধর্মিণী তাঁর জীবনযাত্রার উত্থান পতনের বন্ধুর পথে সত্যকারের সঙ্গিনীরূপে নিজেকে তুলে ধরেন। তিনি সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করেছেন। অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থগুলি ছিল তাঁর প্রিয়। কারান্তরালে বাসকালে তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের গ্রন্থাদি সরবরাহ করতেন। 1965 সালের 14 আগস্ট তার 65তম জন্মদিন বম্বেতে মহাসমারোহে উদযাপিত হয় এবং এই উপলক্ষে জনহিতকর কাজে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন বক্তা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। তাঁর সম্পর্কে প্রশংসাসূচক লেখন সমন্বিত একটি স্মারকপত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি জাতীয়ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ।

1969 সালে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং তিনি সিন্ডিকেট বা প্রাচীন কংগ্রেস দলভুক্ত হন। এই দল বামপন্থী হঠকারিতার বিরোধিতা করে এবং কম্যুনিস্ট ও সাম্প্রদায়িক মুসলমানগণের সঙ্গে যোগসাজসে অসম্মত হয়। তাঁর আকৃতি ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ-কারী, পরিধেয় সাধারণ। তিয়াত্তর বৎসর বয়ঃক্রম অতিবাহিত হলেও তিনি ছিলেন কর্মক্ষম।

উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রকাশিত 'Colossus with Clay Feet' শীর্ষক পুস্তিকায় তাঁর দক্ষিণপন্থী মনোভাব সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু এর ফলে তাঁর সামগ্রিক জনপ্রিয়তায় কোন হেরফের হয়নি। এস. কে. পাতিল এবং মোরারজী দেশাই-এর ন্যায় ক্ষমতা-চ্যুত দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্যতিরেকে বামপন্থী ভাবা-পন্ন ক্ষমতাসীন নব কংগ্রেস নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কিনা কিংবা কংগ্রেসের এই বিভক্তি আরও বিস্তৃত হবে কিনা তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

[Sixty-Fifth Birthday Felicitation Souvenir, 14 August 1965 ; The State Transport Review, July 1958 ; The Times of India Files, 1956-69 ; Trilochan Singh—Personalities ; S. K. Patil—The Indian National Congress : A Case for Its Reorganisation, Bombay, 1946.]

(কুমুদপ্রসন্ন) জি. ভি. কেটকার

এস. বি. আদিত্যান (১৯০৫—)
S. B. Adityan (1905—)

সাংবাদিক-রাজনীতিক এস. বি. আদিত্যান 'সি পা আদিতনার' নামে পরিচিত হতে চাইতেন। তামিল-নাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলার ক্যায়ামোজির এক হিন্দু নাদার পরিবারে, 1905 সালের 25 সেপ্টেম্বর এস. বি. আদিত্যানের জন্ম। তাঁর বাবা শিবন্থী আদিত্যান একজন আইনজীবী ছিলেন এবং মা ছিলেন কানাকাম। 1933 সালে তাঁর সঙ্গেও রামস্বামী নাদারের কন্যা গোবিন্দাম্মার বিবাহ হয় সিঙ্গাপুরে।

তিরুভাইকুনতম্ স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি তিরুচিরাপল্লীর সেন্ট জোসেফ কলেজ থেকে কলাবিভাগে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। 1928 সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে যান। তিনি লন্ডনের মিড্ল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সিঙ্গাপুর আইন ব্যবসা শুরু করেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি নিজেকে একজন সফল আইনজীবী হিসাবে ও তামিল সম্প্র-দায়ের মধ্যে জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে অবশ্য ঐ অঞ্চলে জাপানী আক্রমণের ভয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। মাদ্রাজকে তাঁর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়ে তিনি 1942 সালে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলেন। এই বছরেই তিনি তৈরি করেছিলেন 'তামিল রাজ্য পার্টি' পরবর্তীকালে যার নাম হয়েছিল 'উই তামিল', কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি রিলিফ এ্যান্ড রিহ্যাবিলি-টেশন কমিটি'র রাজ্য শাখার সম্পাদক এবং 'ফেন্ড-ইন্ডিয়া ফ্রিডম এইড কমিটি'র চেয়ারম্যান থাকাকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। 1947 সাল থেকে 1952 সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন মাদ্রাজে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এর সদস্য এবং কংগ্রেস দলের চিফ্ হুইপ। তিনি মাথুরে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং পাম গাছের উপর কর বসানোর বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ই. ভি. রামস্বামী নায়েকার ও সি. এন আন্না দুরাই-র

সহযোগিতায় তিনি 'হিন্দী বিরোধী' আন্দোলন গড়ে তোলেন ও ফলস্বরূপ কারাবরণ করেন। 1953 সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে তিনি যোগদান করেছিলেন ও 1956 সালে বিশ্ব পরিক্রমা করেছিলেন।

1967 তে তিনি 'উই তামিল' দলের প্রার্থী হয়ে মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন—এই দল অল্প কিছুদিন পরেই দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘম পার্টির সঙ্গে মিশে যায়। তিনি বিধান সভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। কিন্তু এক বছর পরে 'তেনকাসি' উপ-নির্বাচনে পার্টির কাজের জন্য সমালোচনার ফলে ঐ পদে ইস্তফা দেন। 1969 সালে তিনি পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাজ্য মন্ত্রী-সভায় যোগ দেন।

রাজনীতিতে তাঁর অবদানের চেয়ে বেশি উল্লেখ-যোগ্য বোধহয় তামিল সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান। সাংবাদিকতায় তাঁর উৎসাহের কারণ সম্ভবতঃ ছাত্রজীবনে মাদ্রাজে তাঁর একটি ছাপাখানা ছিল ও একটি প্রকাশনা সংস্থা ছিল। সিঙ্গাপুরে তিনি তামিল দৈনিক 'তামিল মুরজু'-র অনেক উন্নতিসাধন করেছিলেন। 1942 সালে দেশে ফেরার পর 'থিনা-থানথি' নামে একটি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন, যার শাখা ছিল—মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, তিরুচিরাপল্লী, মাদুরাই এবং তিরুনেলভেলিতে। তিরুচানদুরের আদিতনার কলেজ তাঁর শিক্ষার প্রসারে উৎসাহের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তামিলনাড়ুর নেতৃস্থানীয় রাজনীতিক আদিত্যান চাইতেন যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতবর্ষ, যেখানে রাজ্যগুলির হাতে যথেষ্ট স্বায়ত্ত শাসনমূলক ক্ষমতা থাকবে আর যেখানে কোন জাতপাতের বিরোধ থাকবে না। একজন সফল সাংবাদিক হিসাবে তিনি সংবাদপত্রকে কিভাবে জনপ্রিয় করে তোলা যায় তার কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।

[Hindu Files ; Madras Legislators' Directory, 1950 ; Madras Legislative Council Proceedings, 1946 ; Minister Adityanar—B. Shrimati Adityan, Madras, 1969 ; Thina Thanthi Silver Jubilee Souvenir.]

কে. রাজাইয়ান

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন)

এস. মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী (ডঃ) (১৮৮৬-১৯৬৮)

S. Muthulaksmi Reddi (Dr.)

(1886-1968)

1886 সালের 30 জুলাই পুদুকোট্টা রাজ্যে এস. মুথুলক্ষ্মী রেড্ডীর জন্ম। তিনি পিতা এস. নারায়ণ স্বামী আয়ার ও মাতা চন্দ্রাম্মালের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তাঁর পিতা পুদুকোট্টা রাজ্যের শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে মহা-পণ্ডিত এবং পুদুকোট্টার 'Maharaja's College'এর অধ্যক্ষ ছিলেন।

মুথুলক্ষ্মীর পিতা ও মাতামহ উভয়েই ছিলেন কৃষিজীবী। তাঁদের পরিবারটি ছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত এবং তাঁর পিতা যখন ঐ রাজ্যের শাসন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য হেতু নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁদের প্রচণ্ড আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। তিনিই ছিলেন ঐ রাজ্যের প্রথম ছাত্রী যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও পড়াশুনা করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি জাতীয় বৃত্তির উপর নির্ভর করেই তাঁর পড়াশুনা সমাপ্ত করেন।

1914 সালে তিনি ডঃ টি. সুন্দর রেড্ডীকে (এফ. আর. সি. এস) বিবাহ করেন। তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ ডাক্তার হলেও যথেষ্ট সংগ্রামের মাধ্যমে তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল। সুতরাং বিবাহোত্তর জীবনেও মুথুলক্ষ্মীকে আর্থিক অনটন ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধি ও শ্রমের দ্বারা তিনি তাঁর কর্মজীবনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর অতীত জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁকে দরিদ্র, পীড়িত এবং অনুন্নত শ্রেণীর প্রতি সহানু-ভূতিশীল ও মুক্তহস্ত করে তুলেছিল।

তাঁর পিতামাতা বিশেষতঃ তাঁর পিতা তাঁকে অত্যন্ত উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি ভারতীয় ও বিদেশী উভয়ের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে-ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী ও বিদেশীদের মধ্যে তাঁর বাল্যকালে দেখা সুইডিশ মিশনারীদের এবং পরবর্তীকালে Josephine Butler, Margaret Cousins এবং Annie Besant মুখ্যতঃ তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাগত Theoso-

phist Mrs. Stanford-ও তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন।

তিনি রাজনৈতিক কার্যাবলী অপেক্ষা সমাজ সংস্কারের প্রতি অধিক উৎসাহী ছিলেন—বিশেষতঃ নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধন ও শিশুদের অবস্থার উন্নতির বিধানে ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও তাঁর নীতির প্রতি তাঁর ছিল অন্ধ আনুগত্য।

প্রকৃত পক্ষে তাঁর পিতামাতা তাঁকে উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিষয়ে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং পরে তিনি ডাক্তারী পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পুদুকোট্টা রাজ্যেই ছাত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (1903)। তারপরে সব প্রথা ভঙ্গ করে তিনি Maharaja College for Men'এ প্রথম মহিলা শিক্ষার্থী হিসাবে ভর্তি এবং 1905 সালে প্রথম শ্রেণীতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1907 সালে সরকারী বৃত্তি নিয়ে মেয়েদের মধ্যে একমাত্র তিনিই Modras Medical College-এ M. B. C. M. পাঠক্রমে ভর্তি হন। পাঁচ বছরে তিনি ডাক্তারী পাঠ সমাপ্ত করে 1912 সালে পরীক্ষায় Distinction সহ উত্তীর্ণ হন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কয়েকটি স্বর্ণপদকসহ ওষধি, শল্য এবং ধাত্রী বিদ্যায় অনার্স সার্টিফিকেট লাভ করেন। অতঃপর তিনি কিছুদিন "Govt. Maternity Hospital" এ "House Surgeon"র কাজ করেন। এরপর তিনি নিজে স্বাধীনভাবে ডাক্তারি শুরু করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অর্জন করেন। 1925 সালে তিনি ভারত সরকার প্রদত্ত বৃত্তিলাভ করে ধাত্রীবিদ্যা ও শিশু চিকিৎসায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য ইংলন্ড গমন করেন।

তিনি তেলেগু ও তামিল উভয় ভাষাই জানতেন এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল।

অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য কাজ করতে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র মাদ্রাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তিনি মহান সমাজ সেবিকাদের অন্যতম ছিলেন। 1913 সালে তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যোগদান করেন এবং 1917 সাল পর্যন্ত Women's Indian Association af Madras'এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি Widows' Home এবং 1917 সালে Lady Whitehead সংগঠিত Social Service League'এ শিশু ও নারীদের চিকিৎসার জন্য Visiting Doctor হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। Muslim Ladies Association'এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন তিনি, 'সারদা হোম', Madras Seva Sadan ও Society of the Indian Ladies Samaj এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এই Society-টি নাবালিকা কন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণ করত। 1926 সালে তাঁকে Madras Legislative Council এর সদস্য মনোনীত করায় তিনিই প্রথম মহিলা Legislator হন। 1928 সালে তিনি সার্বিক ভোটে কাউন্সিলের Deputy President নির্বাচিত হন। 1930 সালে তিনি মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সদস্যপদসহ এই কার্যে ইস্তফা দেন।

1927 সালটি ছিল তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণ। এই সময় থেকে 1930 সাল পর্যন্ত সমাজসেবা ও জাতীয়তাবাদী কাজের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক। আইনসভার সদস্যা হিসেবে তিনি সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা কার্যকরী করেছিলেন। তিনি এই রাজ্যে নারীশিক্ষার উন্নতি, শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা, মাতৃত্ব ও শিশুকল্যাণের ক্ষেত্র বিস্তৃততর করার উপযোগী কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। শিশুদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বাধ্যতামূলকভাবে শিশু-স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সর্বত্র শিশুকল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং পৃথক মহিলা Director of Health নিয়োগ তাঁরই দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক। Madras Vigilance Association এর তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী এবং বহু বছর এর সদস্যপদেও আসীন ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রথম 'Rescue Home'ও প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য তিনি জনকল্যাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও Women's Institution থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য লাভ করেন। তিনি দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। হরিজন ছাত্রীদের জন্য সরকারী বৃত্তিলাভের ব্যবস্থা এবং গৃহবিজ্ঞানকে বিকল্প পাঠক্রম হিসাবে নির্দিষ্ট করা তথা বিজ্ঞানের পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতির জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। তিনি বাল্য বিবাহ এবং হিন্দু দেবমন্দিরে কন্যা সমর্পন

প্রতিরোধ করার' চেষ্টায় আইন-সভায় প্রস্তাব আনয়ন করেন। ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়ানোর জন্য তিনি Sarda Act-এর সমর্থনে সংগ্রাম করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় 1928 সালের Legislature-এ এটি পাশ হয়ে যায়। তাঁর সর্বাপেক্ষা মহান অবদান 1927 সালে Act No. 5 দ্বারা 'দেবদাসী' প্রথার বিলোপসাধন। এটি আইনগতভাবে চালু করার জন্য Hindu Religious Endowment Act'এর সংশোধন করা হয়েছিল। 1929 সালে তাঁর উদ্যোগে আইন সভা কর্তৃক গৃহীত মন্দিরে কন্যা দান ও 'Nautch' পার্টির বিলোপ সাধন (1929) তাঁর সর্বশেষ সমাজ সংস্কারের দৃষ্টান্ত। এরপরে 1930 সালে পতিতা বৃত্তি দমনের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখনীয়। তিনি তর্ক বিতর্কের ও প্রস্তাবের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে সফল হয়েছিলেন।

মাত্র সাড়ে তিন বছরে আইনসভার সভ্য হিসাবে তিনি এত কাজ করেছিলেন যে 1930 সালে তাঁর সদস্যপদ ত্যাগের সিদ্ধান্ত অনেকের কাছে মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন যে এইভাবে সরে দাঁড়ানোর ফলে আইনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (W. I. A.-এ 49 তম বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত কে. এম. বালাসুব্রমনিয়মের শ্রদ্ধাঞ্জলি)। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা তাঁর সমাজসেবার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। তিনি Women's Indian Association ও অন্যান্য নানা ভাবে সমাজ সংস্কারমূলক কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। 1930 সালে তিনি জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে অবহেলিত ও অনাথ শিশুদের জন্য মাদ্রাজের আদিয়ারে 'Avvai Home' নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে এটির কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে এবং বর্তমানে এটি একটি বহু উদ্দেশ্যসাধক কেন্দ্রে পরিণত। এখানে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদেরও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে। 1924 থেকে 1936 সাল পর্যন্ত তিনি Madras Children's Aid Society'র অবৈতনিক সচিব এবং Junior ও Senior Certified School সমূহের জন্য Juvenile Court'এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। 1930 সালে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত 5ম All India Women's Conference'র সভাপতি হয়েছিলেন এবং 1935 সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এর সহ-সভাপতি ও সভাপতি ছিলেন। তিনি All Asian Conference of Women'এর All Asian Committee-র Chairman এবং 1935 সাল পর্যন্ত এর Liaison Officer ছিলেন। 1937 সালে তিনি দু'বছরের জন্য Madras Corporation'এর প্রথম Alderwoman হন এবং এই সময়ে তিনি ভিক্ষুক সমস্যা, শিশু শিক্ষা ও কল্যাণ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন।

Women's India Association'এর একজন সক্রিয় সদস্যা হিসাবে 1917 সাল এর সূচনাকাল থেকেই তিনি W. I. A'এর সহ-সভাপতি এবং 1933 সালে শ্রীমতী বেসান্তের মৃত্যুর পর থেকে সভাপতি ছিলেন। তিনি 1926 সালে প্যারিস ও 1933 সালে শিকাগোয় অনুষ্ঠিত International Conference of Women'এ ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে তিনি All India Women's Conference'এর নীতি নির্ধারণ করতেন।

তিনি নারীদের রাজনৈতিক সমানাধিকারের প্রতিও সমভাবে উৎসাহী ছিলেন। Women's Indian Association'এর মাধ্যমে তিনি নারীদের রাজনৈতিক অধিকার সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই Association পূর্ণ বয়স্কদের ভোটাধিকার এবং নারীদের নাগরিক অধিকার নিরাপদ ও সুদৃঢ় করেছিল। তিনি নারীদের Municipal ও legislative ভোটাধিকারের জন্য Association'এর আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 1931 সাল থেকে 1940 সাল পর্যন্ত অসহযোগ কালে তিনি 'স্ত্রীধর্মে'র সম্পাদকের কাজ করেছিলেন। তিনি সমগ্র ভারত থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে Lothian Committee কে প্রভাবিত করেছিলেন। শ্রীমতী হামিদ আলি ও রাজকুমারী অমৃত কাউরের সঙ্গে তিনি একযোগে লণ্ডনে Joint Parliamentary Committee'র কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং পূর্ণ বয়স্কদের ভোটাধিকার, সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণ রীতির বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়েছিলেন। 1936 সালে তিনি যে বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তাঁর মনোযোগ স্থাপন করেছিলেন সেটি হল Cancer বা কর্কট রোগ। তিনি ঐ বছর এবং পুনরায় 1949 সালে Cancer রোধক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ 1954 সালে মাদ্রাজের আদিয়ারে Cancer Institute প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ভারতের আদি Cancer কেন্দ্রগুলির অন্যতম শুধু নয়, এটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্নও বটে।

স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি সমাজ সংস্কারমূলক কাজে সক্রিয় ছিলেন। 1952 থেকে 1957 সাল পর্যন্ত তিনি M. L. C. ছিলেন। 1954 থেকে 1957 সাল পর্যন্ত তিনি State Social Welfare Advisory Board এর প্রথম Chairman হিসাবে এর গঠন ও চরিত্রগত রূপদান করেন। 1968 সাল পর্যন্ত আমৃত্যু রাজ্যের সমাজ সংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। মাদ্রাজের সমাজ সংস্কারকদের কার্যে তিনি ছিলেন উপদেশ ও অনুপ্রেরণার উৎসস্বরূপ। 1956 সালে ভারতীয় নারী ও শিশু কল্যাণ কর্মে তাঁর উদ্যমের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তিনি ছিলেন একাধারে সরল, দৃঢ়, তেজস্বিনী এবং নৈতিক সততা এবং আত্মবিশ্বাসের অধিকারিণী, নিজ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবতী ও উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণের কথা তিনি চিন্তাও করতেন না।

তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং সব হিন্দু আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেও তাঁর কোন রক্ষণশীলতা ছিল না। তিনি অনেকটাই দার্শনিক মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সব ধর্ম সম্বন্ধেই পড়াশুনা করেছিলেন—ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন কিন্তু কোন বিশেষ তন্ত্রের প্রতিই তিনি কোন অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করতেন না। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে সব ধর্মই সমান এবং সব ধর্মের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর নিকট ধর্ম ও সমাজসেবা একে অন্যের পরিপূরক ছিল এবং তিনি মনে করতেন যে মানবধর্মের সেবার মাধ্যমেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

তিনি জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর পরিবারস্থ কেউই এই প্রথা মানতেন না। তাঁর পিতা-মাতা অসবর্ণ বিবাহ করেছিলেন এবং মুথুস্বামী ও তাঁর ভ্রাতা ভগ্নীগণও একই পথের অনুগামী ছিলেন। তিনি তামিলনাড়ুর সন্ন্যাসিনী আভাই'র বাণী বিশ্বাস করতেন—মনুষ্য সমাজে শুধুমাত্র দুটি জাত আছে স্বার্থপর এবং উদার।

তিনি আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্না ছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং সতীদাহ প্রথা অপেক্ষাও এটিকে অধিক অপরাধ বলে মনে করতেন। তিনি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ছিলেন এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আশা করতেন নারী-পুরুষ উভয়েই উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন হবেন।

জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি Legislative Council'এর Deputy Speaker পদে ইস্তফা দেন এবং স্বাধীনতার সপক্ষে আবেদন রাখার জন্য বেশ কয়েকটি জন সমাবেশের আয়োজন এবং তাতে ভাষণ দেন। তিনি ভাষা সম্পর্কে গোঁড়ামি ও প্রাদেশিকতাবাদবিরোধী ছিলেন ও এক ঐক্যবদ্ধ ভারতে বিশ্বাসী ছিলেন।

একজন কংগ্রেস সদস্যা ও উগ্র গান্ধীবাদী হিসাবে তিনি গ্রামীণ সংস্কার, খাদি ও তার প্রচার এবং কুটীর শিল্পের প্রতি গভীর উৎসাহ পোষণ করতেন। তিনি অহিংসভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

তিনি মনে করতেন একথা ঠিক যে বৃটিশ শাসনের মাধ্যমে ভারতের কিছু শুভও সাধিত হয়েছে এবং খৃষ্টান মিশনারীরা সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন ও নারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যও অনেক কিছু করেছে। তিনি ব্রিটেনের পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন।

তিনি মনে করতেন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাও অধিক। 1928 সালে তিনি Hartog Education Committee'র সদস্যা হিসাবে ভারত ও বর্মার নারীশিক্ষা কতটা প্রসারলাভ করেছে পর্যবেক্ষণের জন্যে সমগ্র দেশ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। তিনি অনুন্নত শ্রেণীর কন্যাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন যাতে তারা আলোকপ্রাপ্ত হয়ে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রতিবন্ধক স্বরূপ প্রাচীন প্রথা ও নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জাতীয়তাবাদের প্রসার ও সাংস্কৃতিক প্রগতিশীলতা এবং এগুলির সহায়তায় সমাজকে সুমার্জিত করে তোলা। যেহেতু তিনি নারী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন সেহেতু তিনি এই উভয় জাতিরই গৃহবিজ্ঞান পাঠের সপক্ষে ছিলেন।

একজন সুবক্তা হিসাবে তিনি বিভিন্ন সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন। একজন বিশিষ্ট লেখিকা হিসাবে তিনি প্রধান প্রধান ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় সামাজিক সমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখতেন। 1931 থেকে 1940 সাল পর্যন্ত 'স্ত্রীধর্মের' সম্পাদিকা হিসাবে

তিনি ইংরেজী ও মাতৃভাষা উভয় ভাষাতেই বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু পুস্তিকা রচনা করেন। আত্মজীবনী ছাড়াও তিনি 'Work of Mrs Margaret Cousins' ও 'My Experience as a Legislator' গ্রন্থ দুটির রচয়িতা ছিলেন।

ডঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি বিংশ শতকীয় ভারতের এক অন্যতম মহান নারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বহু ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম শিরোনামের কৃতিত্ব দাবী করার অধিকারিণী ছিলেন—ডাক্তারি পাঠক্রমের তিনি ছিলেন প্রথম ছাত্রী, Legislature এর প্রথম মহিলা সদস্যা, Madras Corporation'র প্রথম মহিলা Alderwoman এবং বিশেষতঃ Legislature-এ প্রথম মহিলা Deputy President। তিনি সমাজ সংস্কারমূলক এবং নারী ও শিশুকল্যাণমূলক কাজে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ যুগে জন্মগ্রহণ করে সমস্ত প্রথা ভঙ্গ করে সমাজ সংস্কারমূলক কর্মে অগ্রণী হয়ে উঠেছিলেন। নারীর অধিকার অর্জনের ধর্মযোদ্ধা হিসাবে তাঁর সমস্ত জীবন নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকার অর্জনে ব্যয়িত হয়েছিল। আজকের ভারতীয় নারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে যে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে তা মুখ্যতঃ তাঁর প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকাল তিনি যে অধিকার অর্জন করেছিলেন শুধুমাত্র তাকে সুদৃঢ় করে তোলার কাজেই ব্যয়িত হচ্ছে। একজন প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহপরায়ণা মাতা এবং স্বার্থলেশহীন জনদরদী সমাজসেবী হিসাবে ডঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী মানবিকতার এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছে ছিলেন এবং প্রখ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় কবি সুব্রামনিয়া ভারতী তাঁকে একজন আদর্শ নারীরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস করেছেন। তাঁর সাফল্য-খ্যাতির মন্দিরে, তাঁর আসন অক্ষয় করে রাখবে এবং সমগ্র জাতি এই মহান নারীর প্রতি সকৃতজ্ঞ ও গৌরবান্বিত চিত্তে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করবে।

[Joint Select Committee, Minutes of Evidence, etc. ; Proceedings of the Madras Legislative Council, 1926-30 ; S. Muthulakshmi Reddi—Autobiography, 1964 ; N. Perumal—Contemporary South Indians ; Arun—Andhra Naal (Tamil) ; Who's Who in Madras, 1934 and 1940 ; 49th Annual Report of the Women's Indian Association, 1966 ; Annual Report of the Avvai Home, 1968 ; Personal interview by the Research Fellow with Dr. S. Muthulakshmi Reddi and with Mr. Mandakrishnamurthi.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) বি. শালিনী দেবী

এস. সত্যমূর্ত্তি (১৮৮৭-১৯৪৩)

S. Satyamurthy (1887-1943)

ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক আইন এবং রাজনীতি বিশেষজ্ঞ এস সত্যমূর্ত্তির জন্ম 1887 সালের 19 আগস্ট, পুদুকোট্টা রাজ্যের থিরুমায়ামের (এখন তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী জেলার অন্তর্গত), এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন আইনজীবী, বিদগ্ধ এবং সংস্কৃতিমনা মানুষ। তিনি বড় হয়েছিলেন তাঁর মা, বাবা-র সচেতন যত্নে এবং চেষ্টায় যা পরবর্তী জীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠালাভে সহায়ক হয়েছিল। যে অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে তিনি কাজ করতেন—যে বিস্ময়কর দৃষ্টি তাঁর ছিল সমস্ত খুঁটিনাটির প্রতি,—তা সম্ভবত ছোটবেলার অনুশীলনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। নিজের শহরেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পরে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন পুদুকোট্টার 'মহারাজা কলেজ' এবং মাদ্রাজের 'ক্রিশ্চান কলেজ'-এ। তারপর কিছুদিন 'ক্রিশ্চান কলেজে' অধ্যাপনা করার পর তিনি 'মাদ্রাজ ল কলেজ' থেকে কৃতিত্ব সহকারে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মাদ্রাজ শহরে আইবব্যবসা শুরু করেন।

তাঁর কর্মজীবন ছিল অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং তিনি যদি সমস্ত মনোযোগ নিয়ে আইন ব্যবসা করতেন তাহলে বোধহয় তাঁর পেশার সমস্ত পুরস্কারই তাঁর হস্তগত হত। কিন্তু ভারতের রাজনীতির জগতে 1919 সালে মহাত্মা গান্ধীর প্রবেশ এবং সারাদেশে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর পেশা থেকে তাঁকে সরিয়ে রাখল। 1919 সালেই রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি—তামিলনাড়ু কংগ্রেসের কাঞ্চিপুরম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন সরোজিনী নাইডু। সত্যমূর্ত্তি সেখানে অ্যানি বেসান্ত

ও তাঁর সহযোগীদের প্রায় তুলোধূনো করলেন ; এখানেই তাঁর বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জীবনের শুরু। কংগ্রেসে তখন একজন প্রচার বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি উজ্জ্বল তারকা। ইংরেজী ও তামিল—উভয় ভাষাতেই তাঁর বাগ্মিতা—কি কাউন্সিল সভায়, কি জনসমাবেশে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের স্বরূপকে উজ্জ্বল করে তুলত।

1919 সালে জাতীয় কংগ্রেসের যে প্রতিনিধিদল ইংলণ্ডে গিয়েছিল—সত্যমূর্ত্তি সেই দলের একজন সদস্য ছিলেন। আবার 1925-এ যখন অনুরূপ একটি দল ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে কংগ্রেসের ভাবধারা প্রচার করবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল—সত্যমূর্ত্তি সেই দলেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে বিভিন্ন মঞ্চ থেকে সত্যমূর্ত্তি বক্তৃতা করেছিলেন এবং তার প্রতিটি বক্তৃতা ছিল গভীর দেশপ্রেমের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এই বক্তব্য কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি ইংরেজদের মনোভাবের ক্রমশঃ পরিবর্তনে খুব সহায়তা করেছিল। 1923 সালে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী হিসাবে তিনি মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিরোধী পক্ষে তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। 1923-30 সালে মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তাঁর বক্তৃতাগুলি ছিল সরকারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অভিযোগ। সরকারীদলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর ধারালো বাক্‌যুদ্ধে তিনি জয়লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন সংসদসদস্য হিসাবে সত্যমূর্ত্তি অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন। পর পর তাঁর বক্তৃতার ঝড় চলত—কখনো পরিষদীয় সভায়, কখনো পার্টির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে, কখনো উত্তাল ছাত্র সমাবেশে, কখনো মাদ্রাজ সমুদ্রতীরের বিশাল জনসভায়, আবার কখনো বা সাংস্কৃতিক ও মহিলা চক্রগুলির বিদগ্ধ সভায়। প্রতিটি সভাতেই তাঁর বক্তব্যের ধাঁচ ছিল বিভিন্ন ধরনের, শ্রোতাদের মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং বক্তৃতা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁর কণ্ঠস্বরের রেশ থেকে যেত শ্রোতাদের মনে। কখনো তাঁর বক্তৃতা হত নরম কোকিলকণ্ঠী—কখনো বা গম্ভীর সিংহনাদ ; —সবই পরিস্থিতির প্রয়োজনানুসারে। এমনই ছিল সত্যমূর্ত্তির বাগ্মিতা।

1930 সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে, সত্যমূর্ত্তি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। 1931-32 তাঁর কাটল কারারুদ্ধ অবস্থায়। 1935 সালে তিনি দিল্লীর ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হলেন। এইখানে তাঁর কার্যধারা তাঁর ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক তুলে ধরল। ভুলাভাই দেশাইর নেতৃত্বে তিনি সভায় কাজ করেছিলেন। সত্যমূর্ত্তি অ্যাসেম্বলিতে কংগ্রেস পার্টির সহনেতা ছিলেন। প্রশ্নোত্তরের সময় যখন আসত, তখন শুরু হত সত্যমূর্ত্তির অগ্নিবর্ষণ। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন, শাণিত যুক্তি সরকার পক্ষের নির্লজ্জ ফাঁকি এবং অসঙ্গতিগুলিকে নগ্ন করে দিত। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সরকারী মুখপাত্ররা, সাধারণত যাঁরা চালিত হতেন ব্রিটিশ আমলাদের দ্বারা—তাঁদের বিরুদ্ধে সত্যমূর্ত্তি ছিলেন উদ্যত অভিশাপ। সত্যমূর্ত্তির ব্যঙ্গ তাদের প্রতি শাণিত ছুরির ন্যায় ছিল। তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল—'সাপ্লিমূর্ত্তি' তাঁর সম্পূরক প্রশ্নগুলির জন্য।

1935 সালের সংবিধান অনুযায়ী 1937 সালে যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু হল সত্যমূর্ত্তি তখন কংগ্রেসের পক্ষে অবিরাম প্রচার সংগঠিত করলেন। এই সন্ধিক্ষণে তাঁর বাগ্মিতাকে তিনি ব্যবহার করে সন্দেহাতীতভাবে জনমানস জয় করলেন। কংগ্রেসের প্রচারকার্যে গ্রামোফোন রেকর্ড ব্যবহার করা হল ; তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা যার সঙ্গে জওহরলাল নেহরুর ঘূর্ণি সফর, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় মাদ্রাজে কংগ্রেসের পক্ষে বিস্ময়কর জয় এনে দিল। এত সব কিছু করে—যখন তিনি স্বায়ত্তশাসনাধীন মাদ্রাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাইলেন—তখন তিনি তা পেলেন না। ফলে সত্যমূর্ত্তি ভয়ংকরভাবে মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। কিন্তু এ ঘটনায় পার্টির প্রতি দৃঢ় বিশ্বস্ততায় কোন চিড় ধরল না। কংগ্রেসের সপক্ষে তাঁর প্রচারকাজ এবং স্বায়ত্তশাসনাধীন বিভিন্ন কংগ্রেস সরকারের সমর্থনে তাঁর প্রচার অবিরত চলল। 1939 সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সমস্ত মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করল। গান্ধীজী একক সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন। গান্ধীজীর অনুসারী সত্যমূর্ত্তি 1940 সালে আবার গ্রেপ্তার হলেন এই প্রতীকী সত্যাগ্রহে যোগদানের কারণে।

1941 সালে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি এক বছরের জন্য মাদ্রাজের মেয়র হলেন। তাঁর এই কার্যকালে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন—মাদ্রাজ শহরকে সৌন্দর্যের শহরে পরিণত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শহরে জলসরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা দূর করার জন্যও বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁরই চেষ্টায় 'পূণ্ডি জল প্রকল্প' চালু হয়েছিল।

1942 সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান

করায় আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সত্যমূর্ত্তি শুধু একজন রাজনীতিক ছিলেন না, একজন শিক্ষাবিদ্‌ও ছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। 1929 সালে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার কাজে তিনিও একজন অংশীদার ছিলেন। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আনীত প্রস্তাবকে তিনি জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন।

সত্যমূর্ত্তি শিল্পের একজন খাঁটি সমঝদার ছিলেন। তিনি সংগীত শিল্পীদের সুপ্ত প্রতিভাকে সম্মান করতেন, বহু অখ্যাত শিল্পীর প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি তাঁর সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর আজীবন বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞা শ্রীমতী কে. বি. সুন্দরাম্বল—যিনি সত্যমূর্ত্তিকে নিজের ভাই বলে পরিচয় দিতেন।

জীবনের ভালো দিকগুলোকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি বিলাসী, আরামপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু যখন তা তিনি উপভোগ করার সুযোগ পান নি, তখন তিনি কখনোই কোন রকম প্রভাব খাটিয়ে তা আদায় করতে রাজী ছিলেন না। এরকম অবস্থায় তিনি অসহিষ্ণু কখনো হন নি—অসাধারণ একাগ্রতায় নিজের কাজ করে গেছেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সূত্রে আজকের অনেক রাজনৈতিক নেতার তিনি ধর্ম্মপিতা ছিলেন। তরুণ নেতৃত্বকে সবসময় তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। কামরাজ, রাজাগোপালাচারী, কল্কি কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রভৃতি আরও অনেক নেতার প্রতি তাঁর সমর্থন, এই উৎসাহ পরবর্তীকালে তাঁদের উজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

জীবনের সায়াহ্নে সত্যমূর্ত্তি কয়েকমাস আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া নিয়েই ছিলেন। তখন তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছিল। তখন তাঁর প্রিয় কন্যাদের বড় করাই তাঁর কাছে একমাত্র কাজ ছিল। তাঁর স্বাস্থ্য আরোও খারাপের দিকে যাওয়ায় তিনি মাদ্রাজে ভাল চিকিৎসার জন্য ফিরে এসেছিলেন এবং সেখানেই 1943 সালে 20 মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর জীবন প্রকৃতই একটি মানুষের নিজস্ব সামর্থ্যে উঠে আসার এক বিশাল কাহিনী, যেখানে মানুষটি কিছু বাড়তি সাহায্য না পাওয়ার জন্য—প্রাপ্ত সম্মান পান নি।

[Satyamurthy Memorial Souvenir ; S. Satyamurthy—At The Threshold of Life ; Speeches and Addresses, in 2 Vols ; R. T. Parthasarathi—Leaders of Temilnad (in Tamil) ;—Tamilnadu Tanda Palaivargal ; Proceedings of The Madras Legislative Council, 1923—1930 ; Madras Mayor's Speeches, Vols. I & II ; The Free India, 16 June, 1963 ; The Hindu Files ; The Indian Review Files ; Mitra—Indian Quarterly Register.]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) এ. রামস্বামী

এস. নিজলিঙ্গাপ্পা (১৯০২—)

S. Nijalingappa (1902—)

সিন্দবনহল্লী নিজলিঙ্গাপ্পার জন্ম মহীশুরের বেলারী জেলার এক ছোট গ্রাম হালুভাগালুতে, মধ্যবিত্ত হিন্দু লিঙ্গায়াৎ পরিবারে, 1902 সালের 10 ডিসেম্বর। তাঁর বাবা আদিভেপ্পা ছিলেন একজন ছোট ব্যবসায়ী আর মা নীলাম্মা ভগবান শিবের একনিষ্ঠা পুজারিনী। তাঁর এক বড় ভাই ছিলেন, বীরাপ্পা ; আর ছিলেন এক দিদি পুট্টাম্মা —এখন দুজনের একজনও বেঁচে নেই। নিজলিঙ্গাপ্পার বয়স যখন পাঁচ কি ছয়, তখন তাঁর বাবা মারা যান।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা দভনগিরির 'অ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুলে'। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তিনি গেলেন চিত্রদুর্গায়। তিনি 1924-এ বাঙ্গালোরের 'সেণ্ট্রাল কলেজ' থেকে স্নাতক হলেন এবং 1926-এ পুণা-আইন কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রী লাভ করেন। শৈশবাবস্থায় তিনি বীরাপ্পা মাস্টার নামে এক শিক্ষকের কাছে সনাতনী পুরনো প্রথায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর ঐ শিক্ষক এবং আত্মীয়স্বজন, বিশেষতঃ তাঁর মায়ের প্রভাব খুব বেশী পড়েছিল নিজলিঙ্গাপ্পার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর, বাল্যাবস্থাতেই। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে তাই, অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনের বীরদের মতই, প্রথাগত এবং আধুনিক শিক্ষার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। বাসবেশ্বরের জীবন ও বচনসমূহ এবং শঙ্করাচার্যের দর্শন গভীরভাবে নিজলিঙ্গাপ্পার মনে ছাপ ফেলেছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা এবং মহাত্মা গান্ধীর

প্রভাব নিজলিঙ্গাপ্পা কখনই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে মুরিগেম্মার বিয়ে হল। দভনগিরির এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যা মুরিগেম্মা যথার্থ অর্থে তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন। এমন কি একথাও বলা যায় যে, মুরিগেম্মা না থাকলে হয়তো ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজলিঙ্গাপ্পার অবদান আজকের পর্যায়ে পৌঁছুতে পারত না।

নিজলিঙ্গাপ্পার রাজনৈতিক জীবনের শুরু অনেক দেরীতে—1936 সালে। দভনগিরি ও চিত্রদুর্গার আইনব্যবসায়ী হিসেবে তিনি কখনই সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করাটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতির প্রতি তাঁর তীক্ষ্ন নজর ছিল এবং মহাত্মা গান্ধী, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ তৎকালীন নেতাদের লেখা তিনি নিয়মিত পড়তেন। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও তিনি যোগদান করতেন, কিন্তু সক্রিয় সদস্য হিসেবে নয়, দর্শকরূপে। 1936-এ নিজলিঙ্গাপ্পা ডঃ এন. এস. হার্দিকারের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলেন এবং তিনি চিত্রদুর্গা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মনোনীত হলেন।

তারপর থেকেই নিজলিঙ্গাপ্পা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করলেন। বহুবার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি যোগদান করেছিলেন এবং একারণে অনেকবার তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। তিনি সমগ্র কর্ণাটক ঘুরে বেড়িয়েছিলেন আর কর্ণাটকের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। অসাধারণ সুবক্তা নিজলিঙ্গাপ্পা বক্তৃতামঞ্চে উঠে মানুষকে জয় করবার এবং নিজমত জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার কাজে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কেবল রাজনৈতিক বিষয় থাকত না—সমাজসংস্কার এবং গ্রামীণ অর্থনীতির কথা তাঁর বক্তৃতায় অনেকটা স্থান অধিকার করে থাকত। তাঁর মত ছিল, উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ কেবলমাত্র কেন্দ্রাভিমুখীনতা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির দুরবস্থা দূর করতে পারে এবং এই বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থা একমাত্র পারে যুদ্ধ বা অন্যান্য কারণে উদ্ভূত সঙ্কটাবস্থায় আত্মবিশ্বাস এবং অর্থনীতির সুদৃঢ় বনিয়াদ তৈরী করতে। আমাদের প্রাচীন গ্রামীণ উৎপাদন বিঘ্নিত করা বা আমাদের দেশজ সম্পদে আহরণ করে ইংলণ্ডের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির প্রবণতার জন্য তিনি প্রায়শই ব্রিটিশ সরকারকে ভর্ৎসনা করতেন। তাঁর সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় ধ্যানধারণাগুলি ছিল প্রথাগত ও আধুনিক চিন্তাধারার এক সংমিশ্রণ। তিনি বিধবা-বিবাহ ও নারীর সমানাধিকার ইত্যাদি সমর্থন করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সর্বধর্মের সমন্বয়ের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সামাজিক দুর্নীতিগুলিকে দূর করা সম্ভব।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এবং স্বাধীনতা অর্জনের পরেও তিনি কংগ্রেস দলের সঙ্গেই একাত্ম ছিলেন। কংগ্রেসের সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং সর্বোপরি সারা-ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকাকালীন কংগ্রেসে তাঁর অবদান অনন্য।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি কর্ণাটকের সংযুক্তির আন্দোলনেও তার কৃতিত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 1956-এ নিজলিঙ্গাপ্পা নতুন মহীশূর রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। 1958 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারপর আবার তিনি ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হন এবং 1968 সালের এপ্রিল পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের উন্নয়নে নিজলিঙ্গাপ্পার ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আধুনিক মহীশূরের (কর্ণাটকের) রূপকার বলা যায় তাঁকে।

নিজলিঙ্গাপ্পা কখনই সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টের পদের জন্য আগ্রহী ছিলেন না। তবু 1968-এ ঐ দায়িত্ব তাঁর উপরে বর্তায়। এক কথায় বলতে গেলে দায়িত্ব তিনি চান নি, দায়িত্বই তাঁকে চেয়েছিল। 1967-এ জনগণ যখন পার্টির প্রতি অনাস্থা জানিয়েছিল—সেই অবস্থায় তিনি দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কংগ্রেস আবার পূর্ব পদ ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু তিনি সভাপতি থাকাকালীন জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের সব চাইতে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে যায়। অন্তর্দলীয় সংঘাতে, সাংগাঠনিক ও প্রশাসনিক মতভেদের কারণে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

[Shri Nijalingappa, an article by Shivanand Joshi in the Kasturi, XII, No. 6; Nijalingappa: Vyakti Sadhane, an article in the Kasturi, XII, No. 6; An article in Bhavan's Journal, vol. XIV, No.

13, 1968; Personal interview of the Contributor with S. Nijalingappa.]

জি. এস, দীক্ষিত

এস. স্ব্রমনিয়া আয়ার (স্যর) (১৮৪২-১৯২৪)
S. Subramania Iyer (Sir) (1842-1924)

সার এস স্ব্রমনিয়া আয়ার 'মণি আয়ার' এই নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ দাদাভাই নৌরজীকে যেমন 'গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অব্ ইন্ডিয়া' নামে অভিহিত করা হত, তদ্রূপ সার এস স্ব্রমনিয়া আয়ারও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তাঁর লোকহিতকর কার্যের জন্য 'গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অব্ সাউথ ইন্ডিয়া' এই আখ্যায় ভূষিত হন।

1842 সালের 1 অক্টোবর তিনি মাদ্বরা জেলার এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্ব্রবলী স্ব্বাইয়ার মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর স্ব্বাইয়ার প্বনর্বার বিবাহ করেন এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে স্ব্রমনিয়ার জন্ম হয়।

ইংরাজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে স্ব্রমনিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা শ্বর্ব হয়; পরে মাদ্বরা জেলা স্কুলে তিনি ভর্তি হন। 1856 সালে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মিঃ উইলিয়মস্ প্রধান শিক্ষকর্বপে নিয্বক্ত হন। স্ব্রমনিয়া তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন এবং বিশেষর্বপে প্রভাবিত হন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় এবং চ্বড়ান্ত পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

মাদ্রাজে উচ্চশিক্ষার্থে তাঁকে প্রেরণ করতে তাঁর মাতা অসম্মত হওয়ায়, স্ব্রমনিয়া আয়ার সরকারী চাকুরীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি মাদ্বরার ডেপ্বটি কালেক্টরের অফিসে, কালেক্টরের অফিসে ও রামনাদের ডেপ্বটি কালেক্টরের অফিসে কেরানী র্বপে চাকুরী করেন। কালেক্টরের অফিসে কর্মরত স্ব্রমনিয়া ওকালতি পরীক্ষার জন্য পড়াশ্বনা করেন এবং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তিনি আদালতে ওকালতি করার জন্য প্রয়োজনীয় সনদ লাভ করতে অসমর্থ হন। কারণ, সনদ নেবার জন্য আদালতে প্রবেশ করে তিনি মাদ্বরার জেলা জজকে সালাম বা অভিবাদন করতে বিস্মৃত হন। যাই হোক, পরবর্তীকালে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড প্রচলিত হলে কালেক্টর তাঁকে পাবলিক প্রসিকিউটার পদে নিয়োগ করেন।

স্ব্রমনিয়া আয়ারের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে তিনি আইনজীবী হবেন। স্বতরাং 1865 সালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1866 সালে তিনি এফ. এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। দ্বই বৎসর পরে 1868 সালে তিনি বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ব্যারিস্টার জে. সি. মিলের অধীনে শিক্ষানবীশর্বপে তিনি যোগদান করেন এবং অচিরেই হাইকোর্টে ওকালতি করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

স্ব্রমনিয়া মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহ করেন কিন্তু 1884-এ তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে। তিনি কখনও দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নি। সমগ্র জীবন বিপত্নীকর্বপেই অতিবাহিত করেন। পত্নীর আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তিনি ধর্ম ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। থিওসফিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা Colonel Olcott-এর সাহচর্যে স্ব্রমনিয়াও 'থিওসফিস্ট' বা ব্রহ্মজ্ঞানীর্বপে পরিচিত হন। সহ-সভাপতির্বপে তিনি দীর্ঘকাল থিওসফিকাল সোসাইটির দায়িত্বভার বহন করেন। পরবর্তীকালে স্ব্রমনিয়া স্বীকার করেছেন যে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁকে অধিকতর মাত্রায় হিন্দ্বর্বপে র্বপান্তরিত করেছে।

বহ্ব ইংরাজী পত্রিকা ও গ্রন্থাদি তিনি পাঠ করেছেন। ইংরাজী পত্রিকাগ্বলির মধ্যে "দি সাটারডে রিভিউ" ও "দি ফোর্টনাইটলি রিভিউ" তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের 'Sociology', ড্রেপার-এর 'Conflict of Science', হাক্সলি'র 'Lay Sermons', সেক্সপীয়রের 'Macbeth' ও 'Hamlet' এবং বেকনের 'Essays' গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।

মাদ্বরাতে 1869-1885 সাল পর্যন্ত স্ব্রমনিয়া আয়ার ব্যবহারজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পসার খ্ববই লোভনীয় ছিল এবং বেশ কয়েকটি গ্বর্বত্বপ্বর্ণ মামলায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরমধ্যে বিশেষর্বপে উল্লেখ্য রামনাদ জমিদারের মামলা ও মীনাক্ষী মন্দির ভান্ডার তছর্বপের মামলা।

মাদ্বরাতে থাকাকালীন তিনি জনসেবক হিসেবে

খ্যাতিলাভ করেন। তিনি মাদুরার মিউনিসিপাল কমিশনার ও লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। মাদুরা পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান পদেও তিনি অধিষ্ঠিত হন। তাঁর মাদ্রাজ যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত (1885) সুব্রমনিয়া মাদুরা পৌরসভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের দেবস্থানম কমিটিরও তিনি সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। 1875 সালে প্রিন্স অব ওয়েলসের মাদুরা পরিদর্শনকালে তিনি পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যানের পদাধিকার বলে মাদুরার জনগণের পক্ষ থেকে তাঁকে "স্বাগত ভাষণ" জ্ঞাপন করেন। (1914 সালে অপর প্রিন্স্ অব ওয়েলসকেও সুব্রমনিয়া মাদ্রাজের জনগণের পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন)। 1877 সালের 1 জানুয়ারি দিল্লীতে লর্ড লিটনের দরবার-এর অনুষ্ঠানে জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য সুব্রমনিয়া আয়ারকে 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। 1877 সালে 'ফেমিন কমিশনে'র মাদুরা সফরকালে তিনি কমিশনে সাক্ষ্য দেন এবং জমিদার কর্তৃক ইচ্ছামত প্রজা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য আবেদন করেন।

1885 সালে তিনি যখন মাদ্রাজে কর্মস্থল স্থানান্তর করেন, তখন একজন বিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত ও পসারওয়ালা আইনজীবী রূপে তিনি বিখ্যাত। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি মাদ্রাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। তাঁর ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিচার করে সরকার 1888 সালে তাঁকে সরকারী উকিলরূপে মনোনীত করেন। 1895 সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সরকারী উকিলরূপে সুব্রমনিয়া দুইটি বিখ্যাত মামলায় অংশগ্রহণ করেন—নাগেশ্বর আয়ার জালিয়াতি মামলা ও তিরুপতি মোহান্ত মামলা। এই সকল বিখ্যাত মামলায় সাধারণতঃ তাঁর বিপক্ষের উকিলরূপে দেখা যেত তৎকালীন দুই বিখ্যাত ক্ষমতাবান উকিল ভি. ধশ্যম আয়েঙ্গার ও ইয়ার্ডলি নর্টনকে।

1884 সালে মাদ্রাজ সরকার সুব্রমনিয়াকে আইন-পরিষদের সদস্যরূপে মনোনীত করেন। যদিও আইন অনুযায়ী বেসরকারী সদস্যদের খুব একটা গুরুত্ব নাই, কিন্তু সুব্রমনিয়া আয়ার আইন পরিষদে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রধানতঃ তাঁরই একক প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে, মালাবারের রায়তদের উন্নতিসাধনে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইন পাশ করা হয়। দ্বিতীয়বার সদস্যপদে মনোনীত হওয়ার পর তিনি আইন-পরিষদের তৎকালীন পরিস্থিতির মধ্যে যথাসাধ্য নিজেকে প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যাপৃত রেখেছেন ও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

1895 সালের জানুয়ারি মাসে সুব্রমনিয়া আয়ার মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাঁর পূর্বে টি. মুথুস্বামী আয়ার অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁর সম্পর্কে এই আশা পোষণ করা হয় যে '...মিঃ সুব্রমনিয়া আয়ারের পক্ষে এটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি এই সময়ে হিন্দু সমাজের অগ্রগতির জন্য গঠনমূলক পরিকল্পনার রূপায়ণে নিজেকে নিয়োজিত করার সুয়োগ লাভ করবেন।' হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন কতিপয় মামলায় তাঁর সিদ্ধান্তের ফলে সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আরবুথনট অ্যান্ড কোং নামক একটি মাদ্রাজী ব্যাঙ্কের দেউলিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্তের বিষয়ে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি 1899, 1903 এবং 1906 সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন ছিলেন।

1900 সালের 1 জানুয়ারি ইংরাজ সরকার সুব্রমনিয়া আয়ারকে 'নাইট হুড' উপাধিতে সম্মানিত করেন। বারো বৎসর হাইকোর্টে অতিবাহিত করার পর, 1907 এর 13 নভেম্বর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারূপে যে 'সাহসী 72' জনের নাম ইতিহাসে বিখ্যাত, সুব্রমনিয়া আয়ার তাঁদের অন্যতম। 1885 সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি মাদ্রাজ শাখার নেতারূপে যোগদান করেন। আইন পরিষদে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সদস্যদের প্রকৃত ও সক্রিয় ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য কে. টি. তেলং কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের প্রতি সুব্রমনিয়া আয়ার জানান পূর্ণ সমর্থন। হাইকোর্টের বিচারপতির কার্যভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে কংগ্রেসের সকল অধিবেশনে যোগদান করেছেন এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কংগ্রেস সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলতে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হন। 1914 সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের উনত্রিশতম অধিবেশনে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যানরূপে সুব্রমনিয়া সমবেত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানান।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সদ্য-আগত এম. কে. গান্ধীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য অনুষ্ঠিত মাদ্রাজের এক বিশাল জনসমাবেশে তিনি পৌরোহিত্য করেন। গান্ধীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে তিনি ভারতের উন্নতিবিধানের নিমিত্ত কিছু কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 'আমরা চাই আত্মশক্তি। এই শক্তিকে জাগরূক করার জন্যই গান্ধীজীর সযত্ন প্রয়াস। আত্ম-শক্তি বলতে আমরা মানুষের অন্তর্নিহিত সেই শক্তিই বুঝি যার দ্বারা মানুষ প্রতিপক্ষকে বিন্দুমাত্র আঘাত না হেনে সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করতে সক্ষম হয়। এই শক্তির প্রকাশ ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মধ্যে এবং এই ভারতেও সেই শক্তির বিকাশ হওয়া উচিত।'

সুব্রমনিয়া আয়ার মিসেস বেসান্তের অত্যন্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। মিসেস বেসান্ত ভারতে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক আন্দোলনের নেত্রী এবং মাদ্রাজের হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। 1916 সালের সেপ্টেম্বর মাদ্রাজে হোমরুল লীগ স্থাপিত হলে সুব্রমনিয়া লীগের 'অবৈতনিক প্রেসিডেন্ট' হতে সম্মত হন। ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে মিসেস বেসান্ত আন্দোলনের সূত্রপাত করলে, মাদ্রাজের তৎকালীন গভর্ণর লর্ড পেন্টল্যান্ড 1917 এর 16 জুন মিসেস বেসান্তের উপর অন্তরীণের আদেশ জারি করেন। তাঁর সহকর্মীগণের প্রতিও একই আদেশ জারি করা হয়। লীগের 'অনারারি প্রেসিডেন্ট' রূপে সার এস. আয়ার মিসেস বেসান্ত ও তাঁর সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং তাঁদের মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করেন। পঁয়ষট্টি দিনব্যাপী এই মুক্তি আন্দোলনের (16 জুন —সেপ্টেম্বর 1917 সাল) নেতা ছিলেন সুব্রমনিয়া আয়ার।

এই সংকটময় মুহূর্তে, মিসেস বেসান্ত অন্তরীণ হওয়ার অব্যবহিত পরেই, সার সুব্রমনিয়া আয়ার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে ভারতে ব্রিটিশ অপশাসন সম্পর্কে সকল তথ্য জানিয়ে পত্র দিয়ে আমেরিকার জনগণ ও সরকারের সমর্থনের জন্য আবেদন জানান। তিনি তাঁর পত্রে লেখেন 'একটি সম্পূর্ণ বিদেশী জাতি, যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, যাদের সঙ্গে কোন জাতিগত ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য ভারতীয়দের নেই, তারা বলপূর্বক তাদের ইচ্ছাকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। নিজেরা প্রচুর অর্থ বেতনরূপে গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য বহু সুযোগ সুবিধাও ভোগ করছে। শিক্ষা থেকে তারা আমাদের বঞ্চিত করছে। আমাদের দেশের সম্পদ শোষণ করে নিচ্ছে। বিনা অনুমতিতে বিপুল করভার আমাদের ওপর চাপানো হচ্ছে। দেশের হাজার হাজার মানুষকে স্বাদেশিকতার অপরাধে কারারুদ্ধ করছে এবং সেই জেলখানা এতই কদর্য যে ভয়াবহ রোগে বন্দীরা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে।'

এই পত্র প্রেরণের জন্য সুব্রমনিয়া আয়ারকে হাউস অব লর্ডস-এ ও হাউস অব কমন্স-এ তীব্র সমালোচনা করা হয়। ব্রিটিশ সরকারও তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। মাদ্রাজে 1918 সালে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী নিয়ে তিনি যখন ভারত সচিব এডুইন মন্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন তাঁর কাছ থেকেও তিনি লাভ করেছিলেন বিরূপ মন্তব্য। বড়লাট চেমসফোর্ডও তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু সার সুব্রমনিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। কিছুদিন পরেই তাঁর 'সার' উপাধি তিনি পরিত্যাগ করেন এবং ফলকটি ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করেন।

1885 সালে সুব্রমনিয়া আয়ার মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেটাররূপে মনোনীত হন এবং 1907 সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেনেটের সদস্যরূপে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বহু নূতন সংস্কারের জন্য প্রস্তাব করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটেরও তিনি কিছুকাল সদস্য ছিলেন। খুব স্বল্প সময়ের জন্য তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই প্রথম মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় উপাচার্য। 1896-এ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি ভাষণ দেন। 1908 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক "ডক্টর অব ল" উপাধি প্রদান করে। 1916 সালে তিনি মাদ্রাজ ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রেরণা-উদ্দীপক ভাষণ দেন। তিনি দুই বৎসরের জন্য কাউন্সিল অব নেটিভ এডুকেশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন। বারাণসীতে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপনের কাজে তিনি মিসেস বেসান্তকে বিশেষ সহ-যোগিতা করেন। পরবর্তীকালে এই কলেজ হতেই বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

তিনি 'ধর্ম রক্ষণ সভা'র সভাপতি হন। এই সভার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের দেবোত্তর সম্পত্তি ও দাতব্য সম্পত্তির অর্থভান্ডারের অব্যবস্থার প্রতিকারের নিমিত্ত সযত্ন প্রয়াস করা হয়। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে যত্নবান হন। কাঞ্চীপুরমের পণ্ডিত-

পরিষদে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ধর্মীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীকে অবহিত করেন। তিনি "শুদ্ধ ধর্ম মণ্ডলী"রও সভাপতি হন। এই মণ্ডলী হিন্দুধর্মের উল্লেখযোগ্য প্রধান গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন।

1937 সালে অবসর গ্রহণের পরও তিনি নানাবিধ কাজে নিজেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ব্যাপৃত রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে একথা বললে অত্যুক্তি করা করা হয় না যে, প্রায় তিন দশকব্যাপী সুব্রমনিয়া আয়ার মাদ্রাজের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরূপে জনমানসে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। আইনপ্রণেতা, আইনজীবী, বিচারপতি, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ও কংগ্রেসীরূপে তিনি অক্লান্তভাবে দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন।

1924 সালের 5 ডিসেম্বর দক্ষিণ ভারতের এই "গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যানের" মহান জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। শোকাভিভূত, কৃতজ্ঞ দেশবাসী শেষ শ্রদ্ধা জানায় তাদের এই প্রিয় নেতাকে "যিনি ছিলেন শ্রদ্ধা ও সম্মানের মূর্ত প্রতীক, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ যাঁকে কখনো মোহাচ্ছন্ন করেনি এবং যিনি তাঁর সকল ক্ষমতা ও শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন জনকল্যাণে।"

[D. V. Gundappa—Speeches and Writings of Sir S. Subramania Iyer ; S. M. Raja Ramarao—Sir Subramania Iyer, A Biographical Sketch ; C. Jinarajadasa—Two Great Theosophists ; K. Sundararaman—Mahan Mani Iyer (Tamil) C. Y. Chintamani—Indian Social Reformer ; Natesan—Eminent Indian Judges ; The Indian Review, February, 1917 ; The Hindu (Madras), 8 December 1924 ; Encyclopaedia of the Madras Presidency, 1921]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) ওয়াই. শ্রীরামমূর্তি

ওয়াজির হাসান (স্যার) (১৮৭২-১৯৪৭)
Wazir Hasan (Sir) (1872-1947)

ওয়াজির হাসান উত্তর প্রদেশের জৌনপুর জেলার কালুপুরে 1872 সালের 1 মে একটি অতি সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এবং পিতামহ উভয়েই সরকারী চাকুরীতে যথাক্রমে তহশীলদার ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা স্যার সৈয়দ আহমদের আন্দোলনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ওয়াজির হাসান 1892 সালে সুকেয়াঁ-এ-তুল-ফতিমা বেগমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সবচেয়ে প্রথম যে মুসলমান নারীরা পর্দা প্রথা পরিহার করেন ফতিমা বেগম তাঁদের একজন। তিনি উদার ও প্রগতিশীল মনের অধিকারিণী ছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। একজন কংগ্রেসপন্থী হিসাবে তিনি 1937 থেকে 1952 সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ আইন পরিষদের সদস্যা হিসাবে কাজ করেন। ওয়াজির হাসান ছিলেন পাঁচ পুত্রের জনক যাঁদের মধ্যে তিনজন রাজনীতিতে যোগ দেন। এরাঁ হলেন আলি জাহির, সাজাদ জাহির এবং হুসেন জাহির।

ওয়াজির হাসান বালিয়া থেকে উচ্চবিদ্যালয়ের পরীক্ষা, আলিগড়ের এম. এ. ও. কলেজ থেকে বি. এ. এবং এলাহাবাদের ম্যুর কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। তিনি আভিজাত্যপূর্ণ জীবনযাপন করতেন এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পাশ্চাত্যমুখী। পাশ্চাত্যশিক্ষা ও বিশেষ করে পাশ্চাত্য দর্শনের দিকে তিনি আকৃষ্ট হন এবং বেশ কয়েকবার ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁর পাঁচ পুত্রই অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

1903 সালে ওয়াজির হাসান ওকালতি ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং আইনজীবী হিসাবে সফলকাম হন। 1920 সালে তিনি অযোধ্যার বিচারবিভাগীয় কমিশনার মনোনীত হন এবং 1930 সাল থেকে 1934 সাল পর্যন্ত অযোধ্যার প্রধান বিচারপতি হিসাবে কাজ করেন। বিচারকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি 1935-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় শুরু করেন এবং 1947 সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

ওয়াজির হাসানের মধ্যে অল্প বয়স থেকেই স্বদেশী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 1903 সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে 1907-এ তিনি অবশ্য এরও সভ্য হন। 1909 সালে তিনি মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদকের পদলাভ করেন। 1912 থেকে 1919 পর্যন্ত তিনি এই দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। এই সময় তিনি কংগ্রেস ও

লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট হন এবং 1916 সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর এক বিরাট ভূমিকা ছিল। তিনি হোম রুল লীগের অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন।

ওয়াজির হাসানের কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ছিল না। তিনি ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই কারণে তিনি খিলাফৎ আন্দোলনের বিরোধিতা করে মুসলীম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি অযোধ্যা আদালতে যোগদান করেন। 1920 থেকে 1934 সাল যতদিন তিনি এই পদ অলংকৃত করেছিলেন ততদিন তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি পুনরায় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 1936 সালে মুসলিম লীগের সভাপতি হন। এই দায়িত্ব গ্রহণ কালে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহ এক স্মরণীয় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমি শুধুমাত্র হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয়—বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন জানাচ্ছি। এই ঐক্য শুধু যে একটি আদর্শকেই বাস্তবায়িত করবে তা নয়, সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যেই রাজনৈতিক সমঝোতা ও সমন্বয়ের সুযোগ এনে দেবে…' আমরা শীঘ্রই দেশের অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে অন্তত কিছুটা পরিমাণ মতৈক্য সন্ধানের প্রয়াস চালাব যা আমাদের সম্মিলিত ভাবে কাজ করার সামর্থ্য জোগাবে। আমি আপনাদের বিবেচনার জন্য আমাদের আশু উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে নিম্নলিখিত কর্মসূচীর প্রস্তাব উপস্থাপিত করছি।'' এইসব কাজের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপন, দমনমূলক আইনসমূহের প্রত্যাহার, বাক্ স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করার অধিকার, ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি প্রদান, কৃষকদের আর্থিক সাহায্য দান, কর্মহীনদের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন এবং বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতির তিনি উল্লেখ করেন।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মত ও পথের বিশেষ সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয় না। প্রথমতঃ, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের মানুষ এবং গান্ধীজীর কর্মপন্থা নিয়ে তিনি আদৌ মাথা ঘামান নি। বরং মতিলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক নৈকট্য ছিল বেশী। দ্বিতীয়তঃ, তিনি গান্ধীজীর রাজনীতির সঙ্গে ধর্মভাব যুক্ত করার নীতির ছিলেন বিরোধী। এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। আর তাই তিনি 'পাকিস্তান' নামক আলাদা একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর আচরণের দ্বারা যে অনেক প্রথম সারির মুসলীম লীগ সদস্যের বিরাগভাজন হয়েছেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সখ্যতা ছিল। কিন্তু 1936 সালে মুসলীম লীগের সভাপতি হিসাবে তাঁর ভাষণদানের পর এই সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। 1937 সালে জিন্না নাটকীয়ভাবে তাঁকে লীগ থেকে বহিষ্কার করেন।

ওয়াজির হাসান 1937 সালে পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের চার আনা সদস্য হিসাবে আমৃত্যু অতিবাহিত করেন। এই সময় নানারকম ব্যবহারিক প্রয়োজনে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির বাইরে ছিলেন। এটা ভাবতে অবাক লাগে যে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর মত একজন উঁচুদরের স্বদেশী মুসলীম নেতার 1937 থেকে 1947 সাল পর্যন্ত তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না।

ওয়াজির হাসান 1915 থেকে 1921 সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। আলিগড়, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়েরও পরিচালক সমিতির তিনি সদস্য ছিলেন। অযোধ্যার প্রধান বিচারপতির কার্যভার গ্রহণের পর 1931 সালে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

যে কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন ওয়াজির হাসান তাঁদের অন্যতম। অন্যান্য লীগ নেতারা একে একে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অখণ্ড ভারতবর্ষের চেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি।

[The Indian Year Book, 1938-39, Vol. XXV (The Times of India, Bombay) ; N. N. Mitra—The Indian Annual Register, Calcutta, 1936 ; Personal interview of

the Research Fellow with Hussein Zaheer, a son of Sir Wazir Hasan.]

(মনতোষ সিং) এম. এস. জৈন

ওয়াঞ্চি আয়ার (১৮৮০ ?—১৯১১)

Vanchi Iyer (1880 ?—1911)

ওয়াঞ্চি আয়ারের জন্ম—1880 (?) খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শেনকোট্টাতে। তিনি ছিলেন এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। এই পরিবারের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। শঙ্করকৃষ্ণ আয়ারের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক ছিল। পরে তার পক্ষে চক্রান্ত করে তিনি তিরুনেলভেলীর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যাশ-কে (Mr. Ashe) হত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁর জীবনের প্রথমদিকে ওয়াঞ্চি আয়ার সুব্রামণিয়া ভারতী, ভি. ভি. এস. আয়ার এবং নীলকান্ত ব্রহ্মচারী প্রমুখ বিপ্লবীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের কাছ থেকেই তিনি বিপ্লবী উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্টান এবং ইউরোপীয় বিদেশী শাসনই ভারতীয় সামাজিক মূল্যবোধ এবং আচার অনুষ্ঠানের সংরক্ষণের পথে সাংঘাতিক অন্তরায়রূপে দেখা গিয়েছে। বাংলার 'যুগান্তর' এবং 'অনুশীলন সমিতি' নামক বিপ্লবী সংস্থা স্বদেশী আন্দোলনে প্রচণ্ড কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। এই দুটি সংস্থার আদর্শ এবং কার্যকলাপের দ্বারা তিনি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বনজ বিভাগে একজন কর্মচারী হিসেবে ওয়াঞ্চি তাঁর জীবন শুরু করেন। তামিলনাড়ু এবং বাংলার তাঁর সময়কার বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিন মাসের ছুটি নিয়ে তিনি ভি. ভি. এস. আয়ারের কাছ থেকে রিভলভার চালানোর তালিম নিতে পণ্ডিচেরী চলে যান। 1911 সালের মার্চ মাসে তিনি মাদাসামী নামক জনৈক বিপ্লবীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, ভি. ভি. এস. আয়ার এবং শঙ্করকৃষ্ণ আয়ারের সহযোগিতায় তিরুনেলভেলীর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাশ-কে হত্যা করতে যান। তিনি যখন মনিয়াচি জংশনে এসে পেঁছিলেন তার আগেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে ট্রেনে করে এসে পেঁছে-ছিলেন; সেখানে অ্যাশ-কে গুলি করে হত্যা করে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর মরণোত্তর বিচার অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াঞ্চির কাছে প্রাপ্ত একটি চিঠিকে তাঁর অপরাধের প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হয়। চিঠিতে ওয়াঞ্চির সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলা ছিল যে তারা যেন বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য ইউ-রোপীয়ানদের হত্যা করে যাতে করে সনাতন ধর্মকে পুনরায় তার পূর্ব স্থানে অধিষ্ঠিত করা যায়। দক্ষিণ ভারতে এটিই প্রথম রাজনৈতিক হত্যা বলে বিবেচিত হয় এবং এটি অনুষ্ঠিত হয় 1911 সালের 11 জুন।

ওয়াঞ্চি আয়ার ছিলেন একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির যুবক। সন্ত্রাসবাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ঝোঁক ছিল। তাঁর সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল হিংসাত্মক রাজনীতিতে পরিপূর্ণ এবং এর দ্বারা তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে একদিকে চরম গোঁড়ামি অন্যদিকে সনাতন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা যাতে টিঁকে থাকে তার জন্য যে কোনো রকম মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মতে এদেশের ব্রিটিশের উপস্থিতির ফলে প্রাচীন আদর্শের লোপ পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল—যে কারণে তিনি সন্ত্রাস-বাদকে বরণ করেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন হিন্দুধর্ম এবং সনাতন মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজের নিরাপত্তার পক্ষে সর্বাধিক বিপদ। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পর্যায় তামিলনাড়ুতে খুব অল্পদিনের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে ছিল। 1905 থেকে 1921 সাল পর্যন্ত যখন তিলক স্বয়ং যখন চরমপন্থী রাজ-নীতিক প্রবক্তা—সেই সময় এই হিংসাত্মক বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল। 1921 সালে গান্ধীজী অহিংস আন্দোলনের সূচনা করেন। জাতীয়বাদী কার্যকলাপের এই পর্যায়ে ওয়াঞ্চির ভূমিকা একটি রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত করা ছাড়া আর কোনো তাৎপর্য বহন করে না।

[The Hindu Files, 1911-12 ; History of the Madras Police]

(ইমানুয়েল ডিভিয়েন) এন. সুব্রমনিয়ান

ও. পি. রামস্বামী রেড্ডিয়ার (১৮৯৫-১৯৭০)

O. P. Ramaswami Reddiar (1895-1970)

ও. পি. রামস্বামী রেড্ডিয়ার 1895 সালে দক্ষিণ আর্কট জেলার ওমানদ্বর গ্রামে রেড্ডিয়ার সম্প্রদায়ের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর গ্রাম ওমানদ্বরের নামেই তিনি জনসমক্ষে পরিচিতি লাভ করেন। তেলেগ্ব বংশজাত রামস্বামী গোঁড়া পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হন। তিনি তাঁর গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশ্বনা করেন। রাজনীতিতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয় এবং তিনি স্বদেশী আন্দোলন শ্বর্ব হলে নরমপন্থীগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের প্রভাবাধীন হন। রামস্বামী 1926 সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে কাজ শ্বর্ব করেন এবং পরবর্তীকালে একজন আদর্শ দলীয় কর্মী, সংগঠক ও বক্তা হিসাবে স্বনাম অর্জন করেন। স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে চারবার কারাবরণ করতে হয়।

1938 সালে রামস্বামী তামিলনাদ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় কংগ্রেস দল গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। 1946 সাল থেকে তিনি মাদ্রাজ আইন-পরিষদে নির্বাচিত কিংবা মনোনীত সদস্য ছিলেন। 1947 এর মার্চ মাস থেকে তিনি দ্ববছরের জন্য সংয্বত অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা মাদ্রাজ রাজ্যের ম্বখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। 1962 সালে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে আসেন। 1964 সালে তিনি শেষবারের মত পরিষদের সভ্য হন কিন্তু অসম্বস্থতাবশতঃ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তা সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজের রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন গ্বর্বত্বপ্বর্ণ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতেন।

ম্বলতঃ মাদ্রাজকে কেন্দ্র করে 1940 থেকে 1962 সালের মধ্যে তিনি জাতীয়তাবাদী কার্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন জনসভায় ভাষণদান কালে তিনি শিক্ষিত অশিক্ষিত সব ধরনের মান্বষের কাছে ব্রিটিশ শোষণ নীতির স্বর্বপ উদ্ঘাটিত করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান ভারতবাসীর উপর ব্রিটিশের শোষণনীতি এবং বিদেশী দ্রব্যের প্রতি জনসাধারণের নির্ভরতা কিভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে। তিনি বলেন, জনগণের অবস্থার উন্নতিবিধানকল্পে গ্রামীণ শিল্পকে প্বনর্বার বহাল করতে হবে, কৃষি ও ব্যবসায়ের অগ্রগতি সাধন করতে হবে এবং খাদিকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রামগ্বলিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে স্বাধীনতালাভ অবশ্য প্রয়োজন। দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে তিনি কংগ্রেস দলের আদর্শ প্রচার করেন এবং সত্যাগ্রহকে ম্বল ভিত্তি করে গান্ধী-বাদের অহিংসনীতির ওপর বিশেষ গ্বর্বত্ব আরোপ করেন। গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসী রামস্বামী ঘোষণা করেন, 'স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সামান্য হলেও নিজ নিজ কর্তব্যপালনের বিষয়টি প্রত্যেকের অন্বধাবন করা কর্তব্য।'

ওমানদ্বর কৃষি, শিক্ষা ও ধর্মের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি কোন স্বযোগকেই হাতছাড়া করতেন না। তিনি জাতিভেদ প্রথাকে ক্ষতিকর ও অশ্বভ বলে মনে করতেন এবং শিক্ষার প্রসারই এর একমাত্র সমাধান বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি ছিলেন ব্বনিয়াদী ও বাধ্যতাম্বলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সমর্থক। হিন্দ্ব ধর্ম প্রসারের উদ্দেশ্যে 'ওমানদ্বর জ্যোতি রামলিঙ্গ মিশন সমরস সম্মার্গ সঙ্গম' ও 'ভেল্লালার ইলাম' নামক দ্বটি ধর্মীয় সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। একান্ত সাদাসিধে ও মধ্বর স্বভাববিশিষ্ট এই মান্বষটি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি সমরস সম্মার্গ সঙ্গমের উদ্দেশ্যে উইল করে যান।

[Directory of the Madras Legislature, 1950 ; The Hindu Files ; Proceedings of the Madras Legislative Council, 1946-47 ; N. Perumal—Tamils of Today, Coimbatore, 1957.]

(ইমান্বয়েল ডিভিয়েন) কে. রাজাইয়ান

ওবেইদ্বল্লা সিন্ধি (মৌলানা) (১৮৭২-১৯৪৪)

Obeidullah Sindhi (Maulana) (1872-1944)

1872 সালে শিয়ালকোটের (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) একটি গ্রামে শিখ পরিবারে ওবেইদ্বল্লার জন্ম হয়। অল্প বয়সে তিনি শিয়ালকোটের কতিপয় ম্বসলমান পীর ও মৌলভীর সংস্পর্শে আসেন ও ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমশঃ হিন্দ্বধর্ম ও

আর্যসমাজের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 'তুফাৎ-উল-হিনদ্' (ওবেইদ্ল্লা কর্তৃক লিখিত) গ্রন্থ দ্বারা তিনি এত বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন যে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তিনি ওবেইদ্ল্লা নাম গ্রহণ করেন। 1887 সালে আগস্ট মাসে তিনি ন্তন ধর্মে দীক্ষিত হন। আত্মীয় পরিজনদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি সিন্ধ্ প্রদেশে চলে যান ও সেখানেই বসবাস করেন। এই জন্যই তাঁর নামকরণ করা হয় ওবেইদ্ল্লা সিন্ধি। সিন্ধ্ প্রদেশে থাকাকালীন তিনি আরবী ভাষায় শিক্ষা-লাভ করেন ও পরে দার-উল-উল্লামে যোগদান করেন। দার-উল-উল্লাম উত্তর প্রদেশের দেওবন্দে অবস্থিত। ব্যক্তিগত স্খস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি সম্প্র্ণ উদাসীন ছিলেন ও সাধ্র ন্যায় জীবনযাপন করতেন।

1905 সালে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন ও আরও কয়েক বৎসর দেওবন্দে বসবাস করেন। 1915 সালে আফগানিস্তানের সহযোগিতায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিদ্রোহ প্রচারের জন্য তিনি কাব্লে যান। তুর্কী ও রাশিয়ার সাহায্যলাভ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 1922 সালে খিলাফৎ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে তিনি পরিব্রাজকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আরব, রাশিয়া ও তুর্কীস্থানে তিনি কিছুকাল বাস করেন। প্রথম জীবনে তিনি ব্টিশ-বিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী ও সমর্থকে পরিণত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'Safarnama-E-Kabul', 'Zaati Diary' এবং 'Shah Wali-Ullah aur unki siyasi Tahreek' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওবেইদ্ল্লা একজন নিষ্ঠাবান কট্টর ম্সলমান ছিলেন এবং ইসলাম ধর্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিবেচনা করতেন। তিনি ইসলামের বিশ্বজনীন আবেদনে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি যে ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন তার প্রধান কারণ হল, ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রচারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের তিনি বাধা-স্বর্প বলে মনে করতেন। এই ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের জন্যই তিনি ইংলণ্ডের প্রতি বিরোধী-মনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রের কাছে সহযোগিতা ও সহান্ভূতি লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি 'ভারত'কে ঐক্যবদ্ধ একটি 'নেশন' বা জাতির্পে স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে 'ভারত' হল বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলসম্হের একটি সংঘ। রোমান হরফে লিখিত হিন্দ্স্থানী ভাষা, ইংরেজী ভাষার ন্যায় ভারতের সরকারী ভাষা হওয়া উচিত—এই ছিল তাঁর অভিমত।

1939 সালে প্রায় পঁচিশ বছর বিদেশে কাটিয়ে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁকে বিশেষর্পে স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু তাঁর এই দীর্ঘ অন্প-স্থিতির মধ্যে ভারতের জাতীয় জীবনের মানসিকতা ও চিন্তাধারায় যে বিপ্ল পরিবর্তন ঘটে গেছে, যে সম্পর্কে তাঁর কোন সম্যক উপলব্ধি ছিল না। ম্সল-মান সম্প্রদায় বিনা প্রতিবাদে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ কর্ক ও উন্নত হোক—এই ছিল তার বাসনা। কিন্তু তিনি কী ম্সলমান উলেমা, কী জাতীয়তাবাদী, কাউকেই তাঁর স্বপক্ষে আকর্ষণ করতে সক্ষম হন নি। মাত্র দ্' একটি ক্ষেত্র ছাড়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃব্ন্দ সাধারণতঃ তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতেন না। 1944 সালে তাঁর ম্ত্যু হয়।

[Zaati Diary (Personal diary of Obaidullah Sindhi), published in Urdu in 1944; Muhammed Sarwas (Ed) Khutbat Obaidullah Sindhi (Urdu) 1944; Maulana Obaidullah Sindhi Ke Hallat Afkaar (Urdu); Sedition Committee (1918) Report, Tufail Ahmed Mangalory—Musalmanon Ka Roshan Mustaqbil (Urdu).]

(এল. দেওয়ানী) এম. এস. জৈন